শান্তিনিকেতন-প্রসঙ্গ

শান্তিনিকেতন-প্রসঙ্গ

ভূমিকা
শ্রীসুধীরঞ্জন দাস
উপাচার্য, বিশ্বভারতী

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর
শ্রীমতীসাধনা কর

ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি
কলিকাতা ১২

শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক কর্তৃক ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে প্রকাশিত ও শ্রীধনঞ্জয় প্রামাণিক কর্তৃক সাধারণ প্রেস ১৫ এ ক্ষুদিরাম বসু রোড, কলিকাতা ৬ হইতে মুদ্রিত

শান্তিনিকেতনের প্রতিষ্ঠাতা
মহর্ষিদেব-স্মরণে

ভূমিকা

আমার বাল্য ও কৈশোর গুরুদেবের শান্তিনিকেতন-আশ্রমে কেটেছে। সে উজ্জ্বল স্মৃতি জীবনে অমূল্য সম্পদ হয়ে আছে। শান্তিনিকেতন এবং তার বিবরণের প্রতি তাই আমার স্বাভাবিক মমতা রয়েছে প্রচুর। সেই কারণেই এই প্রবন্ধগুলির উপর চোখ বুলিয়ে মনে খুবই তৃপ্তি পেলাম। লেখাগুলির ভাব ও ভাষা যে আমার মনকে স্পর্শ করেছে তাতে সন্দেহের অবকাশই নেই।

বর্তমান কালে দেশে শান্তিনিকেতন-সম্বন্ধে ঔৎসুক্য ব্যাপকতর হয়েছে। গ্রন্থকারদ্বয়ের অন্যতম, শ্রীসুধীরচন্দ্র কর রচিত "শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ও সাধনা" ইতিমধ্যেই পাঠকদের সমাদর লাভ করেছে। এ গ্রন্থ সেটির পরিপূরক বলে সহজেই গণ্য হতে পারবে। শ্রীকরের সঙ্গে এ গ্রন্থ রচনায় তাঁর ভগিনী শ্রীমতী সাধনা করও যোগ দিয়েছেন। উভয়েরই শান্তিনিকেতনের সঙ্গে দীর্ঘকালের যোগ। সে-যোগজনিত আত্মীয়তা-হেতু তথ্য-পরিবেশন অত্যন্ত মনোজ্ঞ হয়েছে। সুতরাং বর্তমান গ্রন্থখানি যে রবীন্দ্রানুরাগী পাঠকমহলে সাদরে গৃহীত হবে সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। গ্রন্থকারদ্বয়ের শুভপ্রচেষ্টা জয়যুক্ত হোক—এই কামনাই করি। নিবেদনমিতি—

শান্তিনিকেতন

১৩ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭২ বঙ্গাব্দ

শ্রীসুধীরঞ্জন দাস

নিবেদন

শান্তিনিকেতনের কথা দেশবিদেশের লোকে জানতে চায়। শান্তিনিকেতনের জীবন-প্রবাহ—রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় ও তাঁর অবর্তমানে—দুই অবস্থাতেই কিরূপ চলেছে; কাজকর্মের রীতিনীতি সেখানে কখন্ কোন্ পথ নিয়েছে, আশে-পাশেও কোন্ ক্ষেত্রে শান্তিনিকেতনের কী প্রবর্তনা কতটা কাজ করছে,—এক-কথায়, এখানে কী-রকম কী-সব হয়ে থাকে ও তা কী উদ্দেশ্যে—এ-অনুসন্ধিৎসা অনেকস্থলে অনেকের মনেই রয়েছে;—এ কথা যে কত সত্য, তা আরো বোঝা যাচ্ছে,—যানবাহনের একটু সুবিধা হয়ে যেতেই দিনের পর দিন এখানে অগণিত অতিথি-অভ্যাগত ও দর্শনার্থীর বর্ধিত ভীড় থেকে। কাছে এসে যাঁরা দেখে-শুনে যাচ্ছেন, স্বল্প-সময়ের মধ্যে সব-কথা জানার সুবিধা তাঁদের হয় না,—দূরে যাঁরা থাকেন তাঁদের অসুবিধা আরো বেশী। জানার কাজ গ্রন্থের সাহায্যেও অনেকটা মিটতে পারে। এই ভেবেই এ গ্রন্থের অবতারণা। এর অধ্যায়ে অধ্যায়ে বর্ণিত বিষয়সমূহ শান্তিনিকেতনকে জানবার পক্ষে যদি কিছু সহায়ক হয় তবেই এর প্রকাশ সার্থক মনে করা যেতে পারে।

গ্রন্থে সর্বসমেত আছে সাতটি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায়—'ছাতিমতলা'; যেখান থেকে শান্তিনিকেতনের উৎপত্তি, সুপবিত্র সেই আদিস্থলের পরিচয় নিয়ে হয়েছে গ্রন্থের আরম্ভ। দ্বিতীয় অধ্যায়—'শান্তিনিকেতন-ভবন'। প্রথম যে-আবাস-গৃহটি তৈরী হয় এবং যার নামকরণ হয় 'শান্তিনিকেতন',—তার বিবরণ এতে সংগৃহীত আছে। এর পরে এসেছে প্রতিষ্ঠান-স্থাপনের পর্ব। শুরু থেকে তার প্রসারণের বিস্তারিত-আলোচনাপূর্ণ এই তৃতীয় অধ্যায়। নাম—'আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা'। বিভাগীয়-অধ্যক্ষের পদগুলিতে পর্বে-পর্বে নানা ব্যক্তি নিযুক্ত হয়ে থাকেন। অধ্যায়টির রচনাকালের ব্যবস্থার কথাই এতে বিবৃত হয়েছে। চতুর্থ-অধ্যায়ের আলোচ্য-বিষয়—শান্তিনিকেতনের হাতে-লেখা পত্রিকাগুলির থেকে সংকলন-করা নানা-প্রসঙ্গের রচনাংশ;—পূর্বে যা এ-প্রবন্ধে ছাড়া ছাপা হয়নি,—যেগুলি আশ্রমের গোড়াকার ইতিহাসের অপ্রকাশিত-উপকরণ-বিশেষ। অধ্যায়টির নাম—'শান্তিনিকেতনের অপ্রকাশিত অধ্যায়'। শান্তিনিকেতনের গ্রন্থাগারে বহুদিন ধরে জমা-করা ছিল, প্রাক্তন-ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্যোগে-প্রকাশিত অতি-জীর্ণ ঐ সকল হাতে-লেখা-পত্রিকাতে নানা পত্র ও প্রবন্ধাদি।—যা পুরানো-শান্তিনিকেতনের চিন্তা ও তথ্যে সমৃদ্ধ ও সাহিত্য-চর্চার নানা সরস উপকরণে

মণ্ডিত। ঐ ধরনের একটি একক-পত্র-সংগ্রহের মুদ্রিত-গ্রন্থ থেকে সংকলিত করে রচিত হয়েছে পঞ্চম অধ্যায়টি; নাম—'প্রাক্তন-ছাত্রের পত্রাবলী'। মূল-গ্রন্থখানির থেকে সাহায্য-গ্রহণ-সম্পর্কে গ্রন্থকারের পিতৃব্য ডাঃ ডি. এস সরদেশাই এবং শ্রীযুক্ত ক্ষেমেন্দ্রমোহন সেন মহাশয়দ্বয়ের নিকট আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ আছি।

শেষ ষষ্ঠ অধ্যায়—'শান্তিনিকেতনের চিঠি'। পত্রধারার আকারে সংবাদপত্রে শান্তিনিকেতনের প্রসঙ্গ-প্রবর্তন আমাদের লেখা 'শান্তিনিকেতনের চিঠি'-পর্যায় থেকেই শুরু হয়। কৃতজ্ঞচিত্তে ধন্যবাদের সহিত স্মরণ করছি,—১৯৫১ থেকে ১৯৫৮ সন অবধি আট-বছরের মধ্যে এ-সব সংবাদের প্রকাশ ঘটেছিল 'যুগান্তরে'। 'যুগান্তরে'র বার্তা-সম্পাদক শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন বসুর প্রস্তাবে এ ধারার সূচনা হয়। যতগুলি লেখা বেরিয়েছিল, তার সম্পূর্ণ-সংগ্রহ সম্ভব হয়ে ওঠেনি, সংগ্রহ যা ছিল তারও সবগুলিকে গ্রন্থে রক্ষা করা যায়নি। উৎসব-অনুষ্ঠান, খেলাধুলা, সভাসমিতি, শিশু-বিভাগ, প্রাকৃতিক-পরিবেশ, ছুটি, বিবিধ ও প্রতিবেশ ইত্যাদি পনরটি-বিভাগে সাজিয়ে-ধরা নানা সংবাদের মধ্যে পাওয়া যাবে শান্তিনিকেতনের প্রাকৃতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক-জীবনের রেখাচিত্র। সেই পরিকল্পনা-মতোই 'চিঠি'র অংশগুলিকে বিষয়ানুসারে সংকলিত করা হয়েছে, সে-সঙ্গে যথাসম্ভব রক্ষিত হয়েছে কালানুক্রমিকতা। প্রায় প্রত্যেক প্রসঙ্গের শেষে বসানো আছে লেখার বা প্রকাশের তারিখ। সেই-অনুসারে সময় অনুমেয়। একটি বিশেষ-পর্বের বাস্তব-ঘটনাগুলির বিন্যাস-সাহায্যেই এতে যা কিছু আঁকা-জোঁকার কাজ চলেছে—রং-ধরানোর কাজটুকু রাখা হয়েছে পাঠক-পাঠিকাদের খুশির উপর। কারণ, চিঠি লেখা হয় দূরের মানুষকে উদ্দেশ্য ক'রে। চলতি অবস্থা বা ঘটনার টুকিটাকি ছবি,—তা বাইরের বস্তুগত হোক বা মনের ভাবগত হোক,—উদ্দিষ্ট ঠিকানায় চালান ক'রে দেওয়ার জন্যই চলে চিঠির ব্যবহার। হুবহু সব মেলে না,—কিন্তু কিছু-কিছু যা মেলে, তাই দিয়ে চিঠির-পাঠক মনের তুলি বুলিয়ে বাস্তবের বাকি-অনেকটা ভরিয়ে নিতে পারেন। লেখকের সঙ্গে পাঠকেরও কিছু সৃষ্টির-অবকাশ এতে থাকে,—সে স্বাধীনতাটুকু—স্বল্প হোক,—মূল্য তার স্বতন্ত্র। প'ড়ে যদি কেহ শান্তিনিকেতন-প্রসঙ্গে অনুরাগী হন, কারো পূর্বের আগ্রহ কিঞ্চিৎও যদি এতে মেটে,—আশা করি, তাঁদের সকলের সঙ্গেই আন্তরিক-যোগের সূত্র হবে এই গ্রন্থ।

শেষ সপ্তম অধ্যায়,—'আলাপ-আলোচনা'। সাময়িক-পত্রে-প্রকাশিত লেখাগুলির জন্য সম্পাদকবর্গকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

নানাব্যস্ততার মধ্যেও গ্রন্থের ভূমিকাটি লিখে দিয়ে বিশ্বভারতীর মাননীয় উপাচার্য শ্রীযুক্ত সুধীরঞ্জন দাস মহাশয় আমাদের কৃতার্থ করেছেন। পরিশিষ্টের নির্ঘণ্টটি তৈরি করেছেন বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয়-গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত বিমলকুমার দত্ত। প্রকাশক শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক মহাশয়ের যত্নে এই দুর্মূল্যের বাজারেও এত বড়ো বই আজ সাধারণের সমক্ষে আত্মপ্রকাশের সুযোগ পেল। সকলের এ-সব সাহায্য ও সহৃদয়তা লাভ আমাদের সৌভাগ্যের বিষয়। এঁদের সঙ্গে স্মরণ করি শ্রীমতী রেণু গুপ্ত, দেবলা মিত্র ও উষারানী করের কথা, গ্রন্থ-রচনা-কালে এঁরা নানাভাবেই কাজ এগিয়ে দিয়েছেন। শ্রীমান সুব্রত করের কয়েকটি লেখা এতে সংকলিত আছে।

শান্তিনিকেতন
৭ই পৌষ, ১৩৭২

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর
শ্রীমতী সাধনা কর

বিষয়-সূচী

শান্তিনিকেতন-প্রসঙ্গ

আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা

"এই অনুষ্ঠানের প্রথম সূচনা-দিনে আমরা আমাদের পুরাতন আচার্যদের আহ্বানমন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেম—যে-মন্ত্রে তাঁরা সকলকে ডেকে বলেছিলেন, 'আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহাঃ'; ' বলেছিলেন, 'জলধারা-সকল যেমন সমুদ্রের মধ্যে এসে মিলিত হয় তেমনি করে সকলে এখানে মিলিত হোক।"

"প্রথমে আমি শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপন করে এই উদ্দেশ্যে ছেলেদের এখানে এনেছিলুম যে, বিশ্বপ্রকৃতির উদারক্ষেত্রে আমি এদের মুক্তি দেব। কিন্তু ক্রমশ আমার মনে হল যে, মানুষে-মানুষে যে ভীষণ ব্যবধান আছে, তাকে অপসারিত করে মানুষকে সর্বমানবের বিরাট-লোকে মুক্তি দিতে হবে। আমার বিদ্যালয়ের পরিণতির ইতিহাসের সঙ্গে সেই আন্তরিক আকাঙ্ক্ষাটি অভিব্যক্ত হয়েছিল। কারণ, বিশ্বভারতী নামে যে প্রতিষ্ঠান তা এই আহ্বান নিয়ে স্থাপিত হয়েছিল যে, মানুষকে শুধু প্রকৃতির ক্ষেত্রে নয়, কিন্তু মানুষের মধ্যে মুক্তি দিতে হবে।" —রবীন্দ্রনাথ

শিক্ষার মূলগত আদর্শ

(সমবায়, বিকাশ ও সর্বাঙ্গীণতা)

নিশাবসানের অন্ধকারের মধ্যে পাখি জানতে পায় উষার আভাস। কেউ না জাগতে তাকে জাগিয়ে তোলে তার নিগূঢ় চেতনার আবেগে; সে বেরিয়ে পড়তে চায়। বাধা পায় বাঁধা-বাসার পাতার দেয়ালে; পাখার ঝট্‌পটানিতে সকলের গোচরে আসে তার একটা-কিছু অভাববোধ ও বিদ্রোহের আভাসটা। শান্তিনিকেতনের শিক্ষা তখনো শুরু হয়নি। দেশব্যাপী বাঁধা-শিক্ষার দেয়ালে-ঠেকা মনের ঝট্‌পটানির রেশ পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের উক্তি থেকে—

"আমি বাল্যকালের শিক্ষা-ব্যবস্থায় মনে বড়ো পীড়া অনুভব করেছি। সেই ব্যবস্থায় আমাকে এত ক্লেশ দিত, আঘাত করত যে, বড়ো হয়েও সে অন্যায় ভুলতে পারিনি।···আমরা নর্মাল স্কুলে পড়তাম। সেটা ছিল মল্লিকদের বাড়ি। সেখানে গাছপালা নেই, মার্বেলের উঠান আর ইটের উঁচু দেয়াল যেন আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে থাকত। আমরা, যাদের শিশুপ্রকৃতির মধ্যে প্রাণের উদ্যম সতেজ ছিল, এতে বড়োই দুঃখ পেতাম। প্রকৃতির সাহচর্য থেকে বঞ্চিত

হয়ে আমাদের আত্মা যেন শুকিয়ে যেত। মাস্টাররা সব আমাদের মনে বিভীষিকার সৃষ্টি করত।" —বিশ্বভারতী ১৩২৮

কবির এই উক্তির মধ্যে একটা অভাব এবং বিদ্রোহের ভাব প্রকাশ পেয়েছে, সেটা নঙর্থক। যেটা তিনি চাননি সেটাই হয়েছে মুখ্য, কিন্তু ওরি মধ্যে নিহিত আছে সূক্ষ্মতরভাবে চাওয়ার জিনিসের স্বরূপ; সেটা সদর্থক। তাঁর সব কাজের সেটা আদর্শ;—শিক্ষাজগতে নূতন দিনের আলো বলা যায় সেই জিনিসটিকেই। সেদিন তিনি চেয়েছিলেন 'প্রকৃতির সাহচর্য' আর মানুষের 'প্রাণগত যোগ'। সমস্ত দিক থেকে সমবায় ঘটানোই রবীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রবর্তিত শিক্ষার অন্যতম কথা।

এই 'প্রাণগত যোগে'র পরেই আরেকটি কথা আছে—সৃষ্টি বা বিকাশ। কবি বলেন, 'বিকাশই হচ্ছে বিশ্বজগতের গোড়াকার কথা' (বিশ্বভারতী পৃ ৫৯)। কিন্তু বিশ্বপ্রকৃতি এবং বিশ্বমানবের 'প্রাণগত যোগ' ছাড়া সুষ্ঠু 'বিকাশে'র সম্ভাবনা নেই, তা সার্থকও হয় না। 'মানুষের প্রকাশের আলো একলা নিজের মধ্যে নয়, সকলের সঙ্গে মিলনে' (বিশ্বভারতী)। সকলের প্রতি প্রাণের সহযোগ-শূন্য কাজ প্রকাশের স্থলে আনে প্রচ্ছন্নতা। তার উদাহরণ, রবীন্দ্রনাথ এক স্থলে বলছেন—চীনের প্রকাশ 'বৌদ্ধধর্মে মৈত্রীবাণীতে' চীনের প্রচ্ছন্নতা 'আফিং ব্যবসায়ে।' কেবল নিজের স্বার্থের পুষ্টি লক্ষ্য ক'রে ইংরেজ একদা চীনকে আফিং-খাওয়া ধরিয়েছিল। চীনের পরাধীনতা ও আত্মক্ষয়ের ইতিহাস শুরু হয় সেই থেকে। একদিন সে-ইতিহাসের গতি ফিরল। সেদিন এল সে-দেশে প্রকাশের পালা। তার মূলে ছিল আত্মচেতনা; প্রত্যেক ব্যক্তি সেখানে নিজেকে অনুভব করেছে দেশের সকলের মধ্যে। এর থেকে প্রমাণ মিলছে কবির কথা সত্য,—"আপনাকে সকলের মধ্যে যে উপলব্ধি করে সেই হয় প্রকাশিত," কিন্তু চীন যদি কেবল তার নিজের দেশকেই একান্ত করে জানে, নিজেকে বাড়াতে গিয়ে যদি অন্য-দেশগুলিকে অনাত্মীয়-বোধে পিষে মারতে চায়, তবেই দেখা দেবে তার প্রচ্ছন্নতার অধ্যায়। বিশ্বের বড় বড় প্রকাশমান জাতির প্রচ্ছন্নতার সূত্রপাত একদিন এই ভাবেই ঘটেছে। অন্য পক্ষে, "যারা অন্যকে আপনার মতো জেনেছে, 'ন ততো বিজুগুপ্সতে', তারাই প্রকাশ পেয়েছে—এই তত্ত্বটি কি মানুষের পুঁথিতেই লেখা আছে? মানুষের সমস্ত ইতিহাসই কি এই তত্ত্বের নিরন্তর অভিব্যক্তি নয়?"

সকলের সঙ্গে 'প্রাণগত যোগ' ও 'প্রকাশে'র এই অবিচ্ছিন্নতার তত্ত্বটি জানা

থাকলে শুধু রবীন্দ্রনাথের সাধনা নয়, আশ্রম ও বিদ্যালয় থেকে 'বিশ্বভারতী'রূপে শান্তিনিকেতনের প্রকাশের তাৎপর্যও আমাদের কাছে প্রতিভাত হবে।

প্রকাশের একরকম চেষ্টা আছে, তাতে একত্র করে, কিন্তু এক করে না। কবি সে-দিকটি'ও দেখিয়েছেন। পাশ্চাত্য দেশ ভ্রমণ ক'রে এসে একবার বলেছেন—"প্রকাশের চেষ্টা মানুষের অন্তর্নিহিত ধর্ম—এই ধর্ম-সাধনায় সকল মানুষই অব্যাহত অধিকার লাভ করবে, এই রকমের একটা প্রয়াস ক্রমেই যেন ছড়িয়ে পড়ছে।" (পল্লীসেবা, শিক্ষা ৩য় সং) এতে যেমন পাশ্চাত্যের সাধু প্রচেষ্টার দিক সূচিত করছে, তেমনি অশুভ দিকের ইঙ্গিতও ফুটেছে কবির অন্য ভাষণে। সেখানে তিনি বলছেন—"বিজ্ঞানের কল্যাণে জলে, স্থলে, আকাশে আজ এত পথ খুলেছে, এত রথ ছুটেছে যে, ভূগোলের বেড়া আজ আর বেড়া নেই। আজ কেবল নানা ব্যক্তি নয়, নানা জাতি কাছাকাছি এসে জুটল; অমনি মানুষের সত্যের সমস্যাও বড়ো হয়ে দেখা দিল। বৈজ্ঞানিক শক্তি যাদের একত্র করেছে তাদের এক করবে কে? মানুষের যোগ যদি সংযোগ হল তো ভালোই, নইলে সে দুর্যোগ। সেই মহাদুর্যোগ আজ ঘটেছে। একত্র হবার বাহ্যশক্তি হু-হু করে এগোল, এক করবার আন্তরশক্তি পিছিয়ে পড়ে রইল।" কবির উল্লিখিত 'আন্তর শক্তি' উদ্দীপনার জন্য উদার যে বিশ্বানুভূতিমূলক শিক্ষার দরকার, তার অভাব আছে সর্বত্রই। তা বোধ ক'রে তিনি বলেছেন,—"এই জন্যেই আমাদের বিদ্যানিকেতন পূর্ব-পশ্চিমের মিলননিকেতন করে তুলতে হবে, এই আমার অন্তরের কামনা।...প্রত্যেক দেশেরই কেবল নিজের ভোজনশালা নিয়ে চলবে না, তার অতিথিশালা চাই যেখানে বিশ্বকে অভ্যর্থনা ক'রে সে ধন্য হবে। শিক্ষাক্ষেত্রেই তার প্রধান অতিথিশালা।"

"এই কথাই বলবার কথা যে, সত্যকে চাই অন্তরে উপলব্ধি করতে এবং সত্যকে চাই বাহিরে প্রকাশ করতে—কোনো সুবিধার জন্যে নয়, সম্মানের জন্যে নয়, মানুষের সেই প্রকাশতত্ত্বটি আমাদের শিক্ষার মধ্যে প্রচার করতে হবে, কর্মের মধ্যে প্রচলিত করতে হবে, তাহলেই সকল মানুষের সম্মান করে আমরা সম্মানিত হব—নবযুগের উদ্বোধন করে আমরা জয়ামুক্ত হব। আমাদের শিক্ষালয়ের সেই শিক্ষামন্ত্রটি এই—

যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ন ততো বিজুগুপ্সতে॥"

মানুষের মধ্যে প্রকাশের যত দিকই থাক, প্রকাশের মূলে থাকা চাই অনুভূতি।

ভারতবর্ষে সাধনার পরম কথাই—অনুভূতির বিস্তার। সকল অনুভূতির সমবায়স্থল 'সর্বানুভূ'। রবীন্দ্রনাথ বলেন—

"যদি সেই সর্বানুভূকে পেতে চাই তাহলে অনুভূতির সঙ্গে অনুভূতি মেলাতে হবে। বস্তুত মানুষের যতই উন্নতি হচ্ছে ততই তার এই অনুভূতির বিস্তার ঘটছে। তার কাব্য, দর্শন, বিজ্ঞান, কলাবিদ্যা, ধর্ম সমস্তই কেবল মানুষের অনুভূতিকে বৃহৎ হতে বৃহত্তর করে তুলছে। এমনি করে অনুভূ হয়েই মানুষ বড়ো হয়ে উঠেছে, প্রভু হয়ে নয়। মানুষ যতই অনুভূ হবে প্রভুত্বের বাসনা ততই তার খর্ব হতে থাকবে। জায়গা জুড়ে থেকে মানুষ অধিকার করে না, বাহিরের ব্যবহারের দ্বারাও মানুষের অধিকার নয়—যে-পর্যন্ত মানুষের অনুভূতি সে-পর্যন্তই সে সত্য, সে-পর্যন্তই তার অধিকার।

"ভারতবর্ষ এই সাধনার 'পরেই সকলের চেয়ে বেশি জোর দিয়েছিল এই বিশ্ববোধ সর্বানুভূতি। গায়ত্রী মন্ত্রে এই বোধকেই ভারতবর্ষ প্রত্যহ ধ্যানের দ্বারা চর্চা করেছে, এই বোধের উদ্বোধনের জন্যেই উপনিষৎ সর্বভূতকে আত্মায় ও আত্মাকে সর্বভূতে উপলব্ধি করে ঘৃণা পরিহারের উপদেশ দিয়েছেন এবং বুদ্ধদেব এই বোধকেই সম্পূর্ণ করবার জন্যে সেই প্রণালী অবলম্বন করতে বলেছেন যাতে মানুষের মন অহিংসা থেকে দয়ায়, দয়া থেকে মৈত্রীতে সর্বত্র প্রসারিত হয়ে যায়।"—শান্তিনিকেতন ১০, বিশ্ববোধ—

রবীন্দ্রনাথের নিকট প্রকাশের বিষয় হয়েছিল এই সর্বানুভূতি। প্রকাশ যখনই যেদিক দিয়ে ঘটেছে,—তা এই আদর্শেরই হয়েছে একান্ত অনুসারী। কেবল ভাবে বা কেবল কর্মে নয়, সর্বতোভাবে সকলের যোগ তিনি চেয়েছিলেন। এ জন্য তাঁর প্রবর্তিত শিক্ষা ও সাধনা হয়েছে সর্বাঙ্গীণধর্মী।

অনুভূতি ও প্রকাশের এই সর্বাঙ্গীণ বৈশিষ্ট্যের প্রভাবে কবি কেবল বিশ্ব-প্রকৃতির যোগ নিয়ে তৃপ্ত থাকতে পারেননি ; তাঁকে মানুষের সংসারেও দৃষ্টি দিতে হয়েছিল। শিক্ষা-প্রচারের কাজে উদ্যোগী হয়েও তিনি শেষে দু'টি ক্ষেত্রেই যোগ প্রসারিত করেছিলেন। লিখেছেন—

"প্রথমে আমি শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপন করে এই উদ্দেশ্যে ছেলেদের এখানে এনেছিলুম যে, বিশ্বপ্রকৃতির উদারক্ষেত্রে আমি এদের মুক্তি দেব। কিন্তু ক্রমশ আমার মনে হল যে, মানুষে-মানুষে যে-ভীষণ ব্যবধান আছে, তাকে অপসারিত করে মানুষকে সর্বমানবের বিরাট লোকে মুক্তি দিতে হবে। আমার বিদ্যালয়ের পরিণতির ইতিহাসের সঙ্গে সেই আন্তরিক আকাঙ্ক্ষাটি অভিব্যক্ত

হয়েছিল। কারণ, বিশ্বভারতী নামে যে প্রতিষ্ঠান তা এই আহ্বান নিয়ে স্থাপিত হয়েছিল যে, মানুষকে শুধু প্রকৃতির ক্ষেত্রে নয়, কিন্তু মানুষের মধ্যে মুক্তি দিতে হবে।—বিশ্বভারতী

কবির সর্বাঙ্গীণতার দৃষ্টি বিভিন্ন দেশ-কাল-পাত্রের মধ্যে অখণ্ড ঐক্যের সত্যটিকে দেখতে পেয়েছিল। তাই যোগপ্রয়াসী কবি পরস্পরের যোগে পরস্পরের সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতা সাধন করবার অপরিহার্যতা নির্দেশ ক'রে একদিন বলেছিলেন—"পূর্ব ও পশ্চিম দিক যেমন একটি অখণ্ড গোলকের মধ্যে বিধৃত হয়ে আছে—প্রাকৃতিক এবং আধ্যাত্মিক তেমনি একটি অখণ্ডতার দ্বারা বিধৃত। এর মধ্যে একটিকে পরিহার করতে গেলেই আমরা সমগ্রতার কাছে অপরাধী হব—এবং সে অপরাধের দণ্ড অবশ্যম্ভাবী।

"ভারতবর্ষ যে-পরিমাণে আধ্যাত্মিকতার দিকে অতিরিক্ত ঝোঁক দিয়ে প্রকৃতির দিকে ওজন হারিয়েছে, সেই পরিমাণে তাকে আজ পর্যন্ত জরিমানার টাকা গুণে দিয়ে আসতে হচ্ছে। এমন কি, তার যথাসর্বস্ব বিকিয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। ভারতবর্ষ যে আজ শ্রীভ্রষ্ট হয়েছে তার কারণ এই যে, সে একচক্ষু হরিণের মতো জানত না যে, যেদিকে তার দৃষ্টি থাকবে না সেই দিক থেকেই ব্যাধের মৃত্যুবাণ এসে তাকে আঘাত করবে। প্রাকৃতিক দিকে সে নিশ্চিন্ত ভাবে কানা ছিল—প্রকৃতি তাকে মৃত্যুবাণ মেরেছে।—শান্তিনিকেতন ৪, সমগ্র

"এ কথা যদি সত্য হয় যে, পাশ্চাত্য-জাতি প্রাকৃতিক ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ জয়লাভ করবার জন্যে একেবারে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে, তাহলে একথা নিশ্চয়ই জানতে হবে, একদিন তার পরাজয়ের ব্রহ্মাস্ত্র অন্য দিক থেকে এসে তার মর্মস্থানে বাজবে।"

রবীন্দ্রনাথ মানুষকে খণ্ড দৃষ্টির সংকীর্ণতা ও বিচ্ছিন্নতার এই বিপদ থেকে মুক্ত ক'রে তার সহযোগপ্রবণ উদার প্রকাশকে জয়যুক্ত করবার জন্য গড়েছিলেন 'বিশ্বভারতী'। সে-প্রতিষ্ঠানেরই (১৩৩৯) এক বার্ষিক-উৎসবের ভাষণে তিনি বলেন,—

"আমার তাই সংকল্প ছিল যে, চিত্তকে বিশেষ জাতি ও ব্যক্তির মধ্যে আবদ্ধ না ক'রে শিক্ষার ব্যবস্থা করব, দেশের কঠিন বাধা অন্ধ-সংস্কার সত্ত্বেও এখানে সর্বদেশের মানবচিত্তের সহযোগিতায় সর্বকর্মযোগে শিক্ষাসত্র স্থাপন করব; শুধু ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্যপাঠে নয়, কিন্তু **সর্বশিক্ষার** মিলনের দ্বারা এই সত্যসাধনা করব। এ অত্যন্ত কঠিন সাধনা, কারণ, চারিদিকে দেশে এর প্রতিকূলতা আছে।

দেশবাসীর যে আত্মাভিমান ও জাতি-অভিমানের সংকীর্ণতা তার সঙ্গে সংগ্রাম করতে হবে।"—বিশ্বভারতী

এখানে দেখা যাচ্ছে, পূর্বোক্ত সমবায় এবং বিকাশের কাজের মতোই শিক্ষা-ক্ষেত্রে কবি চেয়েছেন আরেকটি জিনিস, সকলের সহযোগে 'সর্বশিক্ষা'। সকল জিনিসেরই সুষ্ঠু প্রকাশের জন্য শিক্ষা প্রয়োজন। যোগমূলক অনুভূতি অর্জন ও প্রকাশের সেই শিক্ষা কেবল বিশেষ-বিশেষ বিদ্যায় বা গুণের দিকে নয়,—চরিত্রে ব্যবহারে, জীবনযাত্রার সর্বদিকেই তা লাভ করা চাই;—অর্থাৎ বিষয়ের দিক দিয়েও যাতে শিক্ষা সর্বাঙ্গীণ বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ হয়ে চলে, তার প্রতি কবির মনোযোগ ও যত্ন ছিল। সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার অভাব 'সকল দেশেই ন্যূনাধিক পরিমাণে' তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। তাই তিনি বলেছিলেন,—"আমাদের শিক্ষাপ্রণালীতে গুরুতর অভাব রয়েছে, তা দূর না হলে শিক্ষা আমাদের জীবন থেকে স্বতন্ত্র হয়ে সম্পূর্ণ বাইরের জিনিস হয়ে থাকবে। আমি এ কথা বলছি না যে, এই গুরুতর অভাব শুধু আমাদের দেশেই আছে—সকল দেশেই ন্যূনাধিক পরিমাণে শিক্ষা সর্বাঙ্গীণ হতে পারছে না—সর্বত্রই বিদ্যাশিক্ষাকে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে অ্যাবস্ট্রাক্ট ব্যাপার করে ফেলা হয়।" বিশ্বভারতী ১৩২৯

আগে কবি এ কথা বললেও, পরে একস্থলে আবার বলেছেন,—"পাশ্চাত্য দেশের চিত্তোৎকর্ষ বিচিত্র চিত্তশক্তির প্রবল সমবায় নিয়ে। মনুষ্যত্ব সেখানে দেহ, মন, প্রাণের সকল দিকেই ব্যাপৃত।"—শিক্ষার বিকীরণ, শিক্ষা

আর, বর্তমানে আমাদের দেশে তিনি যা লক্ষ্য করেছেন, সে সম্বন্ধে বলেছেন,—"বাল্যকাল থেকেই ব্যবহার-সামগ্রী সুনিয়ন্ত্রিত করবার আত্মশক্তিমূলক শিক্ষা আমাদের দেশে অত্যন্ত উপেক্ষিত হয়। সেই বয়সেই প্রতিদিন অল্প-কিছু উপকরণ যা সহজে হাতের কাছে পাওয়া যায় তাই দিয়েই সৃষ্টির আনন্দকে উদ্ভাবিত করবার চেষ্টা যেন নিরলস হতে পারে এবং সেই সঙ্গেই সাধারণের সুখসুবিধা বিধানের কর্তব্যে ছাত্রেরা যেন আনন্দ পেতে শেখে, এই আমার কামনা।"

—আশ্রমের শিক্ষা, শিক্ষা, আধুনিক সং

'গোড়ায় সাধারণ মনুষ্যত্বে পাকা করা'র কথা গোড়া থেকে কবি বলে আসছেন।

—আবরণ ১৩১৩

শিক্ষা প্রধানত ভাষাশিক্ষায় এসে দাঁড়িয়েছিল, এখনও সেই প্রাধান্য যে খুব কমেছে, এ দেশে তা বলা যায় না; তবে হাতের কাজের দিকেও লোকের দৃষ্টি পড়েছে, এইটুকু যা শুভলক্ষণ। বই-পড়া জ্ঞানের সঙ্গে জীবন যাত্রার ব্যবহারিক

দিকের সম্বন্ধ ছিল কমই। এই সব অসামঞ্জস্য সৃষ্টির জন্য দায়ী শিক্ষাবিধি। আমরা জানি এক, ভাবি আর, করি যা, তা দু'য়ের বার-কিছু। এতে অনুভূতিই বা বাড়ে কিসে, সহযোগ গড়বার সুযোগই বা মিলে কখন, জীবনের প্রকাশ সর্বাঙ্গীণভাবে সমৃদ্ধ হওয়া তো দূরের কথা। এরূপ সমস্যার স্থলে কবির কথাগুলি প্রণিধান-যোগ্য—

"বাল্যকাল হইতে যদি ভাষাশিক্ষার সঙ্গে-সঙ্গে ভাবশিক্ষা হয় এবং ভাবের সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত জীবনযাত্রা নিয়মিত হইতে থাকে, তবেই আমাদের সমস্ত জীবনের মধ্যে একটা যথার্থ সামঞ্জস্য স্থাপিত হইতে পারে, আমরা বেশ সহজ মানুষের মতো হইতে পারি এবং সকল বিষয়ের একটা যথাযথ পরিমাণ ধরিতে পারি।"

মানুষের সমস্যার অন্ত নেই, এ কথা ঠিক। কিন্তু বরাবরই কবি বলছেন,—"আমাদের সর্বপ্রধান সমস্যা শিক্ষাসমস্যা।" এবং তার মধ্যেও বিশেষভাবের সমস্যা হচ্ছে শিক্ষার সঙ্গে জীবনের খাপ-খাওয়ানো। "আমাদের এই শিক্ষার সহিত জীবনের সামঞ্জস্য সাধনই এখনকার দিনের সর্বপ্রধান মনোযোগের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।"

সামঞ্জস্যযুক্ত জীবনের প্রকাশের জন্য আমাদের কী করা প্রয়োজন, কবি সে বিষয়ে অন্যত্র বলেছেন,—"শুধু ভাষার মধ্যেই জীবনের সমস্ত প্রকাশ, পূর্ণ বিকাশ হয় না। সেই জন্য আমরা আমাদের ভাষায় প্রকাশ ছাড়া অন্য দিক দিয়েও জীবন ও অনুশীলনের প্রকাশভঙ্গী চাই। আমাদের মানুষের মন ও চরিত্রকেও ভালো করে জানতে হবে, কারণ শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হল শুধু জ্ঞান-সম্ভারের পূর্ণতায় পরিপূর্ণ হয়ে আমাদের সমৃদ্ধ করে তোলা নয়, মানুষের সঙ্গে ভালোবাসার বাঁধন রাখতে হবে, সৌখ্য আনতে হবে। আর সেজন্য মানুষকে বোঝা ও মানুষের চরিত্রকেও নিখুঁত ভাবে জানা অতি প্রয়োজন।"

—ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ, শিক্ষা ৩য় সং, পরিশিষ্ট ১৩৪১

কবি দেখলেন, প্রচলিত পদ্ধতিতে যার-যার বাড়ি থেকে ছেলেরা ইস্কুল-কলেজে আসা-যাওয়া করে, সেখানে মাস্টারকে বইর পড়া ঢুকিয়ে দিয়েই খালাস। অন্য কোনো সংস্রব নেই। প্রশ্ন নেই, প্রেরণা নেই; তাদের জীবন আমোদ-আহ্লাদ বর্জিত। ছাত্রে-শিক্ষকে দেখা-শুনা বন্ধ। শিক্ষালয় হয়ে পড়েছে 'কল'-বিশেষ। প্রাণহীন তার যান্ত্রিক পরিবেশ ও কর্মপ্রণালী লক্ষ্য ক'রে কবি বললেন,—

"স্কুল বলিতে আমরা যাহা বুঝি সে একটা শিক্ষা দিবার কল। মাস্টার এই কারখানার একটা অংশ। সাড়ে-দশটার সময় ঘণ্টা বাজাইয়া কারখানা খোলে, কল চলিতে আরম্ভ হয়। মাস্টারেরও মুখ চলিতে থাকে। চারটের সময় কারখানা

বন্ধ হয়, মাস্টার-কল-ও তখন মুখ বন্ধ করেন, ছাত্রেরা দুই-চার পাত কলে-ছাঁটা বিদ্যা লইয়া বাড়ি ফেরে।" কবি পরেও বলেছেন,—"ছাত্রদের প্রতিদিন একই ক্লাসে একই সময়ে একই বিষয় শিক্ষার পুনরাবৃত্তি করানোর চেয়ে মনের জড়ত্বের কারণ আর কিছুই হতে পারে না। শিক্ষা-সম্বন্ধে ছাত্রদের প্রধানত যে বিতৃষ্ণা জন্মে শিক্ষার বিষয় কঠিন ব'লেই যে তা ঘটে তা সম্পূর্ণ সত্য নয়, শিক্ষাবিধি অত্যন্ত একঘেয়ে বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। মানুষের প্রাণ যন্ত্রকে ব্যবহার করতে পারে, কিন্তু যন্ত্রকে আত্মীয় করতে পারে না; শিক্ষাকে যন্ত্র করে তুললে তার থেকে কোনো বাহ্য ফলই হয় না তা নয়, কিন্তু সে-শিক্ষা আত্মগত হতে গুরুতর বাধা পায়।"—পত্র, শিক্ষা ৩য় সং ১৩৩২

ইস্কুল ছাড়াও বাড়ির শিক্ষায় ছাত্রদের অনেকটা গড়ে তোলে। কিন্তু দেখা যায় সেখানেও যে-যার পরিবারের ছাঁচে বিশেষ-বিশেষ প্রকৃতি ও আচার-ব্যবহারের টানা-পোড়েনে বিশেষ মানুষ হয়ে ওঠে। চিত্তের স্নিগ্ধ উদারতা, প্রকাশের সুন্দর সবলতা কর্মে বা চরিত্রে কমই দেখা দেয়। সকল ছাত্রকে এক শিক্ষালয়ে রেখে সকল রকমের শিক্ষা দ্বারা মানব ও প্রকৃতির সহযোগে বিচিত্র বৃহৎ এক সমাজ-জীবনে অভ্যস্ত ক'রে তোলবার পক্ষে কবি জেনেছিলেন উপযোগী স্থান হচ্ছে—"বাড়ি নয় গুরুগৃহ,—আশ্রম। বাড়িতে হয় বিশেষ-শিক্ষা, আশ্রমে বিশেষ-প্রভাব-বর্জিত, সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা।"—আবরণ ১৩১৩

কবি গুরুগৃহ বা আশ্রমের আদর্শে সর্বাঙ্গীণ-শিক্ষা বিতরণ করতে নিজেই এক দিন উদ্যোগী হলেন। অভিভাবকদের দিক থেকে বাধা পাওয়ার আশঙ্কা ক'রেও তিনি সজোরে বলেছিলেন,—"আমাদের বিদ্যালয়ে সকল কর্মে সকল ইন্দ্রিয়-মনের তৎপরতা প্রথম হতেই অনুশীলিত হোক, এইটেই শিক্ষাসাধনার গুরুতর কর্তব্য মনে করতে হবে। জানি এর অন্তরায় অভিভাবক, পড়া-মুখস্থ করতে করতে জীবনীশক্তি মননশক্তি কর্মশক্তি সমস্ত যতই কৃশ হতে থাকে তাতে বাধা দিতে গেলে তাঁরা উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। কিন্তু, মুখস্থ-বিদ্যার চাপে এই সব চিরপঙ্গু মানুষের অকর্মণ্যতার বোঝা দেশ বহন করবে কী করে? 'উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ—' আমাদের শিক্ষালয়ে নবীন প্রাণের মধ্যে অক্লান্ত উদ্যোগতার হাওয়া বয়েছে যদি দেখতে পাই তা হলেই বুঝব, দেশে লক্ষ্মীর আমন্ত্রণ সফল হতে চলল। এই আমন্ত্রণ ইকনমিক্সে ডিগ্রি-নেওয়ায় নয়, চরিত্রকে বলিষ্ঠ কর্মিষ্ঠ করায়, সকল অবস্থার জন্যে নিজেকে নিপুণভাবে প্রস্তুত করায়, নিরলস আত্মশক্তির উপর নির্ভর ক'রে কর্মানুষ্ঠানের দায়িত্ব সাধনা করায়, অর্থাৎ কেবল পাণ্ডিত্যচর্চায় নয়, পৌরুষ

চর্চায়। সাধারণ ইস্কুলে এই সাধনার সুযোগ নেই, আশ্রমে আছে। এখানে নানা বিভাগে নানা কর্ম চলছে, তার মধ্যে শক্তি প্রয়োগ করাতে পারে এমন ব্যবস্থা থাকা চাই।”—শিক্ষা ও সংস্কৃতি, শিক্ষা

আরো গোড়ার দিকে, কবি যখন নিজে দেখা-শুনা করতে পেরেছেন, জীবন-যাত্রার সঙ্গে শিক্ষার যোগ রাখার বিচিত্র প্রচেষ্টা তখন বিদ্যালয়ে প্রবর্তিত হয়েছে কবির লিখিত 'আলোচনা' থেকে তখনকার কথা কিছু-কিছু সংকলিত হল। তিনি লিখছেন—“শিক্ষাকে জীবনযাত্রা থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে তাকে বিদ্যালয়ের গড়া কৃত্রিম সামগ্রী করে তুললে তার অনেকখানিই আমাদের পক্ষে ব্যর্থ হয়। এতে জীবনারম্ভের সুদীর্ঘ কাল প্রতিদিন মন ক্লিষ্ট হয়ে তার স্বাভাবিক শক্তি কত যে নষ্ট হয় আমরা তার হিসাব স্পষ্ট আকারে দেখতে পাইনে বলেই বুঝিনে।

“আশ্রমে কত গাছপালা আছে, তাদের কার কত সংখ্যা, তাদের কখন প্রথম ফুল ধরল, ফল ধরল, পাতা ঝরল, পাতা উঠল, তাদের ডালপালা-শিকড় প্রভৃতির আকৃতি ও প্রকৃতি কী রকম, নিজের পর্যবেক্ষণের দ্বারা যাতে ছেলেরা তা জানে তার উৎসাহ দেওয়া ও ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক। পশু-পাখি, এমন কি কীটপতঙ্গ সম্বন্ধেও ঐ একই কথা।

“এই অল্প-পরিধির মধ্যে বাহিরের বিশ্বের যা-কিছু জানবার বিষয় আছে তাদের সুপরিচিত করে নেওয়া দুঃসাধ্য নয়। এর মধ্যে শক্ত হবে, যিনি পরিচয় সাধনে সহায়তা করবেন এমন একজন সুদক্ষ উৎসাহী চোখ-কান খোলা মানুষ পাওয়া।

“শিক্ষায় এই যেমন জানার দিক তেমনি আবার কাজের দিকও আছে। আশ্রমের গাছপালা পশুপাখিকে সেবা করাও একটা বড়ো সাধনা।……

“আশ্রমের ভিতরে ও বাইরে নিকটবর্তী স্থানে যে-সকল পথ আছে তার দুই ধারে ছেলে-মেয়েরা নিজের জন্মদিন বা অন্য কোনো উপলক্ষে একটি গাছ রোপণ ক'রে সেই গাছ রক্ষার ভার নিজেরা নেবে।

“এই যেমন প্রকৃতির সঙ্গে যোগের কথা হল তেমনি লোকালয়ের সঙ্গে যোগও চাই। ভুবনডাঙা-গ্রাম ও সাঁওতাল-পাড়াগুলির সম্যক্ পরিচয় যাতে ছেলেরা পায় সেদিকে দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। তাদের সঙ্গে আমাদের ছাত্রদের যোগে সেবার সম্বন্ধ রাখা আবশ্যক।

“আশ্রমে ব্রতীবালক-সম্প্রদায় গড়া হয়েছে। নিকটবর্তী পাড়ায় ব্রতীসম্প্রদায় স্থাপন করে তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে চারিদিকের পাড়ার কাজ আমাদের ভালো

করে চালাতে হবে। এই ব্রতীকৃত্য শিক্ষা আমাদের অন্য কোনো শিক্ষার চেয়ে কম গুরুতর নয়।

"ছাত্রেরা আপন পরিবারের বাহিরে গুরুজনের পাদগ্রহণ করবে এটা আমি পালনীয় মনে করিনে। কিন্তু নত হয়ে নমস্কার করা তাদের কর্তব্য। আর তাঁরা সম্মুখে এলে উঠে-দাঁড়ানো চাই। যেখানে অনেকে সমবেত, সেখানে সকলে মিলে একসঙ্গে করাই শোভন।...

"কিছুকাল পূর্বে অতিথি-সেবা সম্বন্ধে ছাত্রেরা বিশেষ ভার গ্রহণ করত।... তার ভাবনা করে প্রবর্তন করা দরকার।

"কিছুকাল পূর্বে ছেলেরা পালা করে পরিবেষণ করত...সে নিয়ম থাকা উচিত।

"বাস সম্বন্ধেও ভদ্রতার রীতি আছে। ঘর ও ঘরের আসবাব ও নিজের ব্যবহার্য সামগ্রী নোংরা ও কদর্য হতে দেওয়া অভদ্রোচিত,—এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর আদর্শ আমাদের আশ্রমে থাকে তার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত।...

"এখানে ছাত্রদের মধ্যে লৌকিকতার চর্চাও তাদের শিক্ষার প্রধান অঙ্গ।

"পালাক্রমে এক-একটি ছাত্রনিবাস তার প্রতিবেশী ছাত্রনিবাসের ছেলেদের সম্মিলনীতে নিমন্ত্রণ করে সংগীত, অভিনয়, খেলা ও সৌজন্য দ্বারা তাদের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করবে। নিমন্ত্রিতদের সংখ্যা অত্যন্ত বেশি হওয়া শ্রেয় মনে করিনে।

"দেহের শিক্ষা যদি সঙ্গে-সঙ্গে না চলে তাহলে মনের শিক্ষার প্রবাহও বেগ পায় না। অনেক ছেলেকে ক্লাসে জড়বুদ্ধি দেখি তার কারণই এই যে, শিক্ষার ব্যাপারে তাদের দেহের দাবি কোনোই আমল পায় না। সেই অনাদরে তাদের মনের দৈন্য ঘটে।

"দেহের চর্চা বলতে আমি ব্যায়াম বা খেলার চর্চা বলছিনে। দেহের দ্বারা আমরা যে-সব কাজ করতে পারি সেই-সব কাজের চর্চা। সেই চর্চাতে দেহ সুশিক্ষিত হয়, তার জড়তা দূর হয়। সেই সব কাজের প্রণালীর ভিতর দিয়ে দেহের সঙ্গে মনের যোগ হয়—সেই যোগেই উভয়ের বিকাশের সহায়তা ঘটে।

"আমার মত এই যে, আমাদের আশ্রমে প্রত্যেক ছাত্রকেই বিশেষভাবে কোনো হাতের কাজে যথাসম্ভব সুদক্ষ করে দেওয়া চাই। হাতের কাজ শিক্ষাই তার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, আসল কথা, এই রকম দৈহিক-কৃতিত্ব চর্চায় মনও সজীব সতেজ হয়ে ওঠে। যে-সব ছেলেকে আমরা নির্বোধ বলে মনে করি, তাদের অনেকেরই সুপ্তচিত্ত এই দৈহিক কর্মদক্ষতার সোনার কাঠির স্পর্শ অপেক্ষা করে

আছে। দেহের অশিক্ষা মনের শিক্ষার বল হরণ করে নেয়। তা ছাড়া যার দেহ শিক্ষিত হয়নি সে যত বড়ো পণ্ডিতই হোক, সংসার-ক্ষেত্রে অধিকাংশ বিষয়েই তাকে পরাসক্ত হয়ে জীবন-ধারণ করতে হয়—সে অসম্পূর্ণ মানুষ। এই অসম্পূর্ণতা থেকে আমাদের প্রত্যেক ছাত্রকেই বাঁচাতে হবে। এ সম্বন্ধে সম্ভবত কোনো কোনো অভিভাবকের কাছ থেকে আমরা বাধা পাব।

"দেহের শিক্ষার সঙ্গে মনের শিক্ষার, দেহের সচলতার সঙ্গে মনের সচলতার যোগ আছে, এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। উভয়ের মধ্যে ভালো রকম মিল করতে না পারলে আমাদের জীবনের ছন্দ ভাঙা হয়ে যায়। এই কারণেই আমি মনে করি, পথচারী বিদ্যালয়ই বিদ্যালয়ের আদর্শ। ইস্কুলেই বদ্ধ ঘরে শিক্ষা দিলে আমাদের জীবনলীলার অধিকাংশ উদ্যমই সেই শিক্ষাপ্রণালী থেকে বাদ পড়ে যায়। তেমন খাঁচার শিক্ষায় পাখিকে বুলি-শেখানো অসম্ভব হয় না, কিন্তু তাকে উড়তে শেখানো যায় না।

"ভ্রমণ করতে করতে ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়াই শিক্ষার প্রকৃষ্ট উপায়।...প্রাণবান মানুষের পক্ষে এই রকম জঙ্গম শিক্ষা-প্রণালীই সম্পূর্ণ ফলদায়ক, ক্লাসে বদ্ধ স্থাবর শিক্ষাপ্রণালীতে তার দেহে-মনে আত্মীয়-বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেয়। তাতে দেহ থেকে যায় অনিপুণ, মন থেকে যায় নিরুদ্যোগী। তাতে বাক্য-পরিচয়ের অভ্যাস হয়, বিষয়-পরিচয়ের অভ্যাস হয় না।

"অনেক কাল থেকে বিশ্বভারতীর যোগে এই রকম পথচারী বিদ্যালয় স্থাপনের সংকল্প মনে পোষণ করে রেখেছি। দেশের লোকের কাছে আবেদনকে সার্থক করবার শক্তি যদি আমার না থাকত আর ভিক্ষায় যদি ক্ষুদ্ না মিলে ধানও মিলত, তাহলে অনেক কাল আগেই এ কাজে প্রবৃত্ত হতুম। মরবার আগে এ কাজ প্রবর্তন করে যাব এমন আশা এখনো ছাড়িনি। কেননা যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।

"আপাতত দেশ-প্রচলিত শিক্ষা-প্রণালীর প্রাচীর-ঘেরা সংকীর্ণ-ক্ষেত্রের মধ্যে ছাত্রদের দেহ-মনের যতটা চালনা সম্ভব তারই দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।"

—আলোচনা, শিক্ষা ৩য় সং

কবি পরে নানা সময়ে আরো যা বলেছেন, তারও দু'-এক কথা এখানে দেওয়া গেল,—"ছাত্রেরা যেটুকু শিখবে তার সঙ্গে-সঙ্গেই সেটুকু প্রকাশ করবার সাধনা প্রতিদিন করা চাই। শুধু তাই নয়, ছাত্রদের ভাবাতে হবে।...

"শ্রীনিকেতনের মূল সমস্যাগুলি কী...উত্তর চাওয়া উচিত। গ্রামের অর্থনীতির ভিত্তি কোথায়—সমবায়-নীতির মানে কী, আমাদের পক্ষে কেন তার প্রয়োজন,

গ্রামের লোকদের স্বভাবে, অভ্যাসে ও রীতিতে কী অভাব আছে যাতে তারা অন্নকষ্টে, জলকষ্টে, রোগে, তাপে মরে যাচ্ছে সে-কথা ওরা যাতে বিচারপূর্বক আলোচনা করতে পারে, সেটা দেখা চাই। জমিদার প্রজার সম্বন্ধের মধ্যে কোথায় গলদ আছে, তার ফল কী, কী করে তার প্রতিকার হবে এ সমস্ত কথা এখন থেকেই সুস্পষ্ট ক'রে ওদের চিন্তা করা চাই। মনে রেখো, ক্লাসের শিক্ষার চেয়ে এগুলো বড়ো শিক্ষা।" —পত্র ১০ই মার্চ ১৯২১, শিক্ষা ৩য় সং পরিশিষ্ট

"বিশ্ববিদ্যালয়ের এ উদ্দেশ্য হওয়া কখনও উচিত নয় যে, কতকগুলো যান্ত্রিক চাকার কলকব্জা হবে সে জ্ঞানের সঞ্চয়ের, আর সেই যন্ত্রের ভিতর দিয়ে ছাত্রদের কাছে শুধু সেই জ্ঞানটুকু বিস্তার করে দেবে, যাতে তারা বেশ-এক-রকম সুখে-স্বচ্ছন্দে খেয়ে-মেখে থাকে।

"শিক্ষা-আয়তনের এমন খোলা ভাব থাকা দরকার, খোলা দরজার মতো, যেখানে অধ্যাপক আর ছাত্ররা নিজেদের বাড়ির মতো মেলা-মেশা করতে পারে।... একজনের সঙ্গে কর্তৃত্বের কর্তামির আবহাওয়ায় বাস করলে চলবে না।"

সাহিত্যিক এবং আধ্যাত্মিক পরিবেশরূপে যাঁরা শান্তিনিকেতনকে জেনে আসছেন তাঁরা এখানকার শিক্ষার মধ্যে বিবিধ হাতের কাজের সঙ্গে শ্রমসাধ্য দৈনিক কৃত্যাদির প্রতি রবীন্দ্রনাথের গুরুত্ব আরোপ করা দেখা বুঝতে পারবেন, তিনি দৈহিক-চর্চাকেও জীবনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের পক্ষে কতটা অপরিহার্য মনে করেছেন।

আসবাবের ভারে শিক্ষা যে দুর্মূল্য ও ভারাক্রান্ত হবে, রবীন্দ্রনাথ তা বরদাস্ত করতে পারতেন না। শিক্ষাকে যতদূর-সম্ভব সহজ করা চাই। তা না হলে তা সর্বজনের যোগে আসবে না। উপকরণের উপর যত-বেশি নির্ভর বাড়বে, মানুষের যোগপ্রবণ আত্মপ্রকাশের তাগিদও সেই পরিমাণেই ভিতর থেকে কমে আসবে। এ স্থলেও সহযোগ, স্বাধীন বিকাশ ও সর্বাঙ্গীণতার মূলগত ত্রিবিধ প্রেরণা থেকেই যে রবীন্দ্রনাথের প্রবর্তিত শিক্ষায় হাতে-কলমের কাজ করার প্রতি বিশেষ মূল্য আরোপিত হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। কর্মেন্দ্রিয়-নির্ভর জীবনযাত্রার নৈতিক আরো উপযোগিতা আছে। এক স্থলে তিনি বলেছেন,—"বাইসিক্লের আদর কমাইতে চাইনে, কিন্তু দুটো সজীব পায়ের আদর তার চেয়ে বেশি। যে শিক্ষায় এই সজীব পায়ের জীবনীশক্তিকে বাড়িয়ে তোলে তাকেই ধন্য বলি, যে শিক্ষায় প্রধানত আসবাবের প্রতিই মানুষকে নির্ভরশীল করে তোলে তাকে মূঢ়তার বাহন বলব।

"যখন শান্তিনিকেতনে প্রথম বিদ্যালয় স্থাপন করি তখন এই লক্ষ্যটাই আমার

মনে প্রবল ছিল। আসবাব জুটে গেলে তাকে ব্যবহার করার জন্যে সাধনার দরকার নেই, কিন্তু আসবাব-নিরপেক্ষ হয়ে কী ক'রে বাহিরে কর্মকুশলতা ও অন্তরে আপন সম্মানবোধ রক্ষা করা যায়, এইটেই শিক্ষাসাধ্য। তখন আশ্রমে গরিবের মতোই ছিল জীবনযাত্রা। সেই গরিবয়ানাকে লজ্জা করাই লজ্জাকর, এ কথাটা তখন মনে ছিল, উপকরণবানের জীবনকে ঈর্ষা করা বা বিশেষভাবে সম্মান করাই যে কুশিক্ষা, এ কথাটা আমি তখনকার শিক্ষকদের স্মরণ করিয়ে রেখেছিলুম।"

শ্রমের সঙ্গে চাই সৌন্দর্য। শিল্পরুচি যে-কোনো কাজকে সুন্দর ক'রে প্রকাশের সহায়তা করবে,—কবির শিক্ষানীতির এ বৈশিষ্ট্যও এ-সঙ্গে উল্লেখযোগ্য। আনন্দ, নিপুণতা, মানসিক একাগ্রতা, ও সুবিন্যস্ততার দৃষ্টি সঞ্চারের দ্বারা শিল্প জীবনকে সমৃদ্ধ করে। শিল্পসম্মত প্রকাশকে কবি এ জন্যই বরাবর কামনা করে এসেছেন। ছোটোখাটো কাজেও জাপানী মেয়েদের সেই শিল্পানুরাগের পরিচয় পেয়ে, তিনি সেরূপ কাজকে শুধু সুন্দর ব'লে প্রশংসাই করেন নি, তাকে বলেছেন 'আরাধনা'। 'ধ্যানী জাপান' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন—

"বহু শতাব্দীর অভ্যাসক্রমে এরা [জাপানীরা] কোনো কাজই যেমন-তেমন ক'রে করে না, একান্ত নিবিষ্ট হয়ে ও শোভনভাবে করে। দেখে কেবলি মনে হয় কাজের সমস্ত প্রণালীর মধ্যে আগাগোড়া এরা সমস্ত মনকে স্থাপিত করতে শিখেছে। এটাই হচ্ছে কর্মের মধ্যে ধ্যান। একটি সাধারণ মেয়েকে খাবার সময় লক্ষ্য করে দেখেছি—পাত্র হাতে তুলে ধরা, গ্রাস মুখে-তুলে নেওয়া সমস্তই সুবিহিত যত্নে সংযতভাবে করে—আমাদের দেশে সাধারণের মধ্যে আহার-ব্যাপারে যে অসংযম ও অশোভনতা আছে, এ তার একেবারেই বিপরীত। এই মেয়েটিকেই পুষ্পপাত্রের ফুল সাজাতে দেখলেম—সে যেন কার আরাধনা, তাতে কত নৈপুণ্য, কত নিষ্ঠা।"

—শিক্ষা ৩য় সং ১৩৩৬

এ স্থলে শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর লেখা থেকে একটি কথা উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেছেন,—"আমাদের শিক্ষাদানের আদর্শ যদি সর্বাঙ্গীণ শিক্ষাদান হয়, কলাচর্চার স্থান এবং মান বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার সঙ্গে সমান থাকা উচিত। এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে এদিকে এ পর্যন্ত যা ব্যবস্থা হয়েছে তা মোটেই পর্যাপ্ত নয়।"

—শিক্ষার ধারা

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিদ্যানিকেতনে সুকুমার-শিল্পচর্চার জন্য কলাভবন খুলেছিলেন। আবার কারিগরী-বিভাগ খুলে ব্যবহারিক-শিল্পের প্রবর্তনা দ্বারা শিল্পের সর্বাঙ্গীণতা বিধান করেছিলেন। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রশিল্প-বিদ্যায়ও তিনি উদাসীন ছিলেন

না। স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র রথীন্দ্রনাথ, বন্ধুপুত্র সন্তোষ মজুমদার, কনিষ্ঠ জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে কবি কৃষি-বিজ্ঞানে উচ্চ-শিক্ষিত করে এনে দেশের হিতসাধনে নিয়োজিত করবার যে বিশেষ চেষ্টা করেছেন, তা সকলেই জানেন।

এমন কি, যখন স্বদেশী-আন্দোলনের যুগে স্বাধীন ব্যবস্থায় শিক্ষার প্রস্তাব নিয়ে তিনি তৎপর হয়ে ওঠেন, সেই উৎসাহের মুখেও—দেশের ব্যবহারিক এই বিজ্ঞান-শিক্ষার গুরুত্ব বুঝে, বহু আগে তিনি বলেছেন—

"আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি শিক্ষার বন্দোবস্ত প্রথমেই না হয়, তবে অবশ্যই তাহা ইংরেজের বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে বিদেশেও যাইতে হইবে। বিশেষ-বিশেষ শিক্ষাকে কোনো গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে চলিবে না।"—রবীন্দ্র-রচনাবলী ১২ পৃ ৬২৮

রবীন্দ্রনাথের কাছে জড়-প্রকৃতির যোগ কেবল যান্ত্রিক ও প্রয়োজন-মাফিক ছিল না, তাও ছিল প্রাণবান। বৈজ্ঞানিক নিয়ম জানার দ্বারা বস্তুর ব্যবহারের পথ সুগম হয়। যোগের বাধা কেটে যায়। বস্তুজগতে প্রবেশের জন্য এবং তার দ্বারা স্বচ্ছ অনুভূতির প্রসারে সহযোগ ও প্রকাশের ধারাকে আরো সর্বাঙ্গীণ করে তুলে আপনাকে বড়ো ক'রে পাবার জন্য বিজ্ঞান-চর্চারও বিশেষ প্রয়োজন আছে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শিক্ষার মিলন'প্রবন্ধে বলেছেন,—"বিরাট বস্তুবিশ্ব আমাদের নানা রকমে বাধা দেয়; কুঁড়েমি করে বা মূর্খতা ক'রে যে তাকে এড়াতে গেছে বাধাকে সে ফাঁকি দিতে পারেনি, নিজেকেই ফাঁকি দিয়েছে। অপর পক্ষে বস্তুর নিয়ম যে শিখেছে শুধু যে বস্তুর বাধা তার কেটেছে তা নয়, বস্তু স্বয়ং তার সহায় হয়েছে,—বস্তু-বিশ্বের দুর্গম পথে ছুটে-চলবার বিদ্যা তার হাতে…।" —১৩২৮

কবি আরো বলেছেন.—"তিনি তাঁর সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রে এই কথা লিখে দিয়েছেন,—"বস্তুরাজ্যে আমাকে না হলেও তোমার চলবে, ওখান থেকে আমি আড়ালে দাঁড়ালুম; এক দিকে রইল আমার বিশ্বের নিয়ম, আরেক দিকে রইল তোমার বুদ্ধির নিয়ম, এই দুয়ের যোগে তুমি বড়ো হও; জয় হোক তোমার, এ রাজ্য তোমারই হোক—এর ধন তোমার, অস্ত্র তোমারই। এই বিধিদত্ত স্বরাজ যে গ্রহণ করেছে অন্য সকল-রকম স্বরাজ সে পাবে, আর পেয়ে রক্ষা করতে পারবে।"

২

দেশ-বিদেশের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়

জীবনকে ও শিক্ষাকে যিনি প্রাকৃতিক আধ্যাত্মিক এবং সর্বাঙ্গীণ বিষয়ের ও সর্ব দেশের মানুষের মধ্যে বিস্তৃত করে দেখেছেন, তাঁর কাছে গতানুগতিক প্রচলিত শিক্ষার ত্রুটি যে নানা দিক দিয়েই ধরা পড়বে ও তিনি বিচিত্র-রকমের উদ্ভাবনা দ্বারা তার বহু সংস্কার-সাধন করবেন, এটা খুবই স্বাভাবিক। বস্তুত আগে নানা দিকে নানা লোকে নানা কাজে ব্রতী হলেও, এরূপ সর্বাঙ্গীণ-শিক্ষায় এমন বড়ো দৃষ্টি নিয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন একমাত্র রবীন্দ্রনাথ, এ-কথা বললে আশা করি অত্যুক্তি হবে না।

শিক্ষায় সংকীর্ণতা তাকে বহু স্থলেই বেদনা দিয়েছে। প্রথমত, ইট-কাঠের খাঁচার মধ্যে পরিসরের অভাব, দ্বিতীয়ত, পুঁথিগত ধরাবাঁধা পড়া ও পরীক্ষা-নেওয়া, —সেখানে বিষয়-বৈচিত্র্য ও জ্ঞান-প্রসারের অভাব। তিনি জানতেন,—

"মানুষের মধ্যে বৈচিত্র্যের সীমা নেই। সে তালগাছের মতো একটি মাত্র ঋজু রেখায় আকাশের দিকে উঠে না. সে বটগাছের মতো অসংখ্য ডাল-পালায় আপনাকে চারিদিকে বিস্তীর্ণ করে দেয়। তার যে-শাখাটি যেদিকে সহজে যেতে পারে, তাকে সেই দিকেই সম্পূর্ণ যেতে দিলে তবেই সমগ্র গাছটি পরিপূর্ণতা লাভ করে, সুতরাং সকল শাখার তাতে মঙ্গল।"—তপোবন, শিক্ষা ১৩১৬ আর—

"যতটুকু অত্যাবশ্যক কেবল তাহারই মধ্যে কারারুদ্ধ হইয়া থাকা মানবজীবনের ধর্ম নহে। যতটুকু কেবলমাত্র শিক্ষা অর্থাৎ অত্যাবশ্যক তাহারই মধ্যে শিশুদিগকে একান্ত নিবদ্ধ রাখিলে কখনই তাহাদের মন যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িতে পারে না। অত্যাবশ্যক শিক্ষার সহিত স্বাধীন পাঠ না মিশাইলে ছেলে ভালো করিয়া মানুষ হইতে পারে না—বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে সে অনেকটা-পরিমাণে বালক থাকিয়াই যায়।"—শিক্ষার হেরফের, শিক্ষা

লেখাপড়া-করা ছাড়া হাতে-কলমে কাজ করার শিক্ষা কিছুদিন আগে কমই ছিল। শিক্ষায় সমাজের সকল শ্রেণীর স্থান আজও তেমন হয়নি। খেলাধুলা, নৃত্যগীত, স্বাস্থ্যচর্চা, অবহেলিত হয়েই পড়ে ছিল। নিরানন্দের মধ্য দিয়ে নীরস শিক্ষা নিতে হত নিতান্ত বৈষয়িক প্রয়োজনে, তাও নিতে হত বৈদেশিক ভাষায়; মুখস্থ-প্রণালীই

ছিল পাঠ-অভ্যাসের একমাত্র ভরসা, "তোতা কাহিনী"র ব্যাপার ঘটত পদে-পদে; এ সব দেখেই কবি লিখেছেন,—

"চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তি·· দুইটি অত্যাবশ্যক শক্তি·· বাদ দিলে চলে না।" শিক্ষায় 'উদ্ভাবন ও সৃষ্টির অভাব' তারি ফল। অথচ আমরা-যে সমর্থ তার প্রমাণ, জগদীশ বসু, প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ইত্যাদি। এতৎ সত্বেও আমরা অনুন্নত ও নিরুপায় হয়ে আছি কেন, এই আত্মসম্বিৎ-এর প্রশ্ন কবি উঠিয়েছিলেন বহু আগে থেকে। তাঁর প্রবর্তিত শান্তিনিকেতনের শিক্ষার মধ্যে তিনি সেই নিরুপায়তা যথাসম্ভব স্বাধীনভাবে মোচনের চেষ্টা করেছেন।

অনেকে বলেছেন, জাতীয় দুর্গতির কারণ ছিল আমাদের রাষ্ট্র-পরাধীনতা। অনেকাংশে তা সত্য হতে পারে কিন্তু কবি বলেছিলেন, "নিশ্চিত জানি, সকল পরাশ্রয়তার চেয়ে ভয়াবহ শিক্ষায় পরধর্ম।"—শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ, শিক্ষা

"দেশের অন্ন, দেশের বিদ্যা, দেশের স্বাস্থ্য, আমরা তেমন করিয়া চাই নাই। পরের কাছে চাহিয়াছি। নিজের কাছে নহে। ওজর করিয়া বলি, আমাদের সাধ্য কম, কিন্তু আমাদের সাধনা তার চেয়েও অনেক কম।

"দেশের লোককে শিশুকাল হইতে মানুষ করিবার সদুপায় যদি নিজে উদ্ভাবন ও তাহার উদ্যোগ যদি নিজে না করি তবে আমরা সর্বপ্রকারে বিনাশপ্রাপ্ত হইব— অন্নে মরিব, স্বাস্থ্যে মরিব, বুদ্ধিতে মরিব, চরিত্রে মরিব—ইহা নিশ্চয়।"

—শিক্ষাসংস্কার, শিক্ষা ১৩১৩

খেয়ে-পরে বেঁচে-থাকার চেয়ে উচ্চ কোনো আশা-আকাঙ্খা আমাদের ছিল না। সে-অনুযায়ী চাকরিকেই আমরা জেনেছিলাম শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য। জীবিকার প্রতিযোগিতায় চাকরিও হল দুর্লভ। মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীণ-বিকাশ কোথায় রইল প'ড়ে; বাইরের জীবন তো জীবনের এক দিক, জীবনের সিদ্ধি চাইলে সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ঘটাতে হবে। চিত্তের প্রসার তার জন্য প্রয়োজন—তার অভাবে বাইরের জীবনযাত্রাও একদিন ব্যর্থ হয়ে পড়ে। কবি বলেন,—"চিত্তের ঐশ্বর্যকে অবজ্ঞা করে আমরা জীবন যাত্রার সিদ্ধিলাভকেই একমাত্র প্রাধান্য দিয়েছি। কিন্তু সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে এই সিদ্ধিলাভ কি কখনও যথার্থভাবে সম্পূর্ণ হতে পারে?"—শিক্ষা ও সংস্কৃতি, শিক্ষা ১৯৩৫

সংস্কৃতির দিকে যেটুকু আমাদের ঝোঁক গিয়েছিল—তাও পরের দেখাদেখি; বিষয়কার্যে পরের সংস্রবে এসে, বাইরের চলা-ফেরা এবং বস্তুর ঐশ্বর্যের চাকচিক্য বাড়াতেই অনেকে মেতে গিয়েছিল। ভারতবর্ষের স্বাভাবিক ধারার সঙ্গে সেই শিক্ষিত-সাধারণের পরিচয় ছিল কম। পরিচয় স্থাপনের উৎসাহে পড়েছিল মন্দা।

রবীন্দ্রনাথ সেই ধারাটিকে আগে চিনতে বলেন। তাঁর মতে, ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ পরিচয় চিত্তের ঐশ্বর্যে। পাশ্চাত্যের অনুকরণে ভারতের প্রকাশ হলে তা স্বাভাবিক হবে না। বিকৃতি আনবে বিনাশ। সেইজন্য সতর্ক হওয়া প্রয়োজন মনে ক'রে কবি বলেছেন,—"ভারতবর্ষও হঠাৎ জবরদস্তি দ্বারা নিজেকে য়ুরোপীয় আদর্শের অনুগত করতে গেলে প্রকৃত য়ুরোপ হবে না, বিকৃত ভারতবর্ষ হবে মাত্র।

"তাই আজ আমাদের অবহিত হয়ে বিচার করতে হবে যে, যে-সত্যে ভারতবর্ষ আপনাকে আপনি নিশ্চিতভাবে লাভ করতে পারে সে-সত্যটি কী? সে সত্য প্রধানত বণিগবৃত্তি নয়, স্বারাজ্য নয়, স্বাদেশিকতা নয়, সে-সত্য বিশ্বজাগতিকতা।" রাষ্ট্রে, অর্থে, আধিপত্য বিস্তার ক'রে পাশ্চাত্য বাইরে প্রবলভাবে বিশ্বব্যাপী ক'রে আপনাকে প্রকাশ করতে উন্মুখ,—কবি বলেন,—"প্রবলতার মধ্যে সম্পূর্ণতার আদর্শ নেই। সমগ্রের সামঞ্জস্য নষ্ট ক'রে প্রবলতা নিজেকে স্বতন্ত্র করে দেখায় বলেই তাকে বড়ো মনে হয়, কিন্তু আসলে সে ক্ষুদ্র। ভারতবর্ষ এই প্রবলতাকে চায়নি, সে পরিপূর্ণতাকেই চেয়েছিল।" কেননা, "ইহাই একমাত্র সত্য আদর্শ, সুতরাং ইহাই সকল মানুষের পক্ষে মঙ্গলের হেতু। প্রথম-বয়সে শ্রদ্ধার দ্বারা, সংযমের দ্বারা ব্রহ্মচর্যের দ্বারা প্রস্তুত হইয়া দ্বিতীয়-বয়সে সংসার-আশ্রমে মঙ্গল কর্মে আত্মাকে পরিপুষ্ট করিতে হইবে; তৃতীয়-বয়সে উদারতার ক্ষেত্রে একে-একে সমস্ত বন্ধন শিথিল করিয়া অবশেষে আনন্দের সহিত মৃত্যুকে মোক্ষের নামান্তররূপে গ্রহণ করিবে—মানুষের জীবনকে এমন করিয়া চালাইলেই তবে তাহার আদ্যন্ত-সংগতিপূর্ণ তাৎপর্য পাওয়া যায়।" ভারতের সেই পরিপূর্ণতা ছিল আত্মপ্রকৃতি এবং বিশ্বপ্রকৃতি উভয়ের উপলব্ধি ও শক্তি-নিয়ন্ত্রণ করা নিয়ে। "এই পরিপূর্ণতা নিখিলের সঙ্গে যোগে।" স্থূল ইন্দ্রিয়ের অপ্রত্যক্ষে যে আত্মিক জগত, তাকেও ভারতবর্ষ বাদ দেয়নি। সে দিকটিকে সমভাবে সত্য জেনে, তার সঙ্গে সংগতি স্থাপনের প্রতি লক্ষ্য রেখেই সে সংসারের বিষয়কর্ম সাধনে সচেষ্ট হয়েছে। "মানুষের আত্মাকে মুক্ত হইতে হইবে, তবে মানুষের এত কালের সমস্ত চেষ্টা সার্থক হইবে, নহিলে ততঃ কিম্, ততঃ কিম ততঃ কিম্।" "সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ বলতে যে কাকে বোঝায়, তার কল্পনা প্রত্যেক জাতির বিশেষ ক্ষমতা অনুসারে উজ্জ্বল অথবা অপরিস্ফুট। কেউ-বা বাহুবলকে, কেউ বুদ্ধিচাতুরীকে, কেউ চরিত্র-নীতিকেই মানুষের শ্রেষ্ঠতার মুখ্য উপাদান বলে গণ্য করেছে এবং সেই দিকেই অগ্রসর হবার জন্যে নিজের সমস্ত শিক্ষা-দীক্ষা শাস্ত্র-শাসনকে নিযুক্ত করেছে। পরমাত্মার যোগে সকলের সঙ্গেই যোগ উপলব্ধি করা, সকলের মধ্যেই প্রবেশলাভ করা, এইটেকেই ভারতবর্ষ মনুষ্যত্বের চরম সার্থকতা

বলে গণ্য করেছিল। ধনী হয়ে, প্রবল হয়ে, নিজের স্বাতন্ত্র্যকেই চারিদিকে সকলের চেয়ে উচ্চে খাড়া করে তোলাকেই ভারতবর্ষ সকলের চেয়ে গৌরবের বিষয় বলে মনে করেনি।

"মানুষ বিনাশ করতে পারে, কেড়ে নিতে পারে, সঞ্চয় করতে পারে, আবিষ্কার করতে পারে, কিন্তু এইজন্যেই যে মানুষ বড়ো তা নয়। মানুষের মহত্ত্ব হচ্ছে মানুষ সকলকেই আপন করতে পারে। মানুষের জ্ঞান সব-জায়গায় পৌছায় না। তার শক্তি সব-জায়গায় নাগাল পায় না, কেবল তার আত্মার অধিকারের সীমা নেই। মানুষের মধ্যে যারা শ্রেষ্ঠ তাঁরা পরিপূর্ণ বোধশক্তির দ্বারা এই কথা বলতে পেরেছেন যে, ছোটো হ'ক, বড়ো হ'ক, উচ্চ হ'ক, নীচ হ'ক, শত্রু হ'ক, মিত্র হ'ক, সকলেই আমার আপন।

"মানুষের মধ্যে যারা শ্রেষ্ঠ তাঁরা এমন জায়গায় সকলের সঙ্গে সমান হয়ে দাঁড়ান যেখানে সর্বব্যাপীর সঙ্গে তাদের আত্মার যোগ স্থাপন হয়। যেখানে মানুষ সকলকে ঠেলে-ঠুলে নিজে বড়ো হয়ে উঠতে চায় সেখানেই তার সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে। সেই জন্যেই যারা মানব-জন্মের সফলতা লাভ করেছেন উপনিষৎ তাঁদের ধীর বলেছেন, যুক্তাত্মা বলেছেন। অর্থাৎ তাঁরা সকলের সঙ্গে আছেন বলেই শান্ত, তাঁরা সকলের সঙ্গে মিলে আছেন বলেই সেই পরম একের সঙ্গে তাঁদের বিচ্ছেদ নেই। তাঁরা যুক্তাত্মা। আমাদের দেশে এই একটি সত্য ও বড়ো কথা বলা হয়েছে যে, তাঁকে পেতে হলে সকলকেই পেতে হবে। সমস্তকেই ত্যাগ করা তাঁকে পাওয়ার পন্থা নয়। সাম্রাজ্যিকতা-বোধকে য়ুরোপ যেমন পরম মঙ্গল বলে মনে করছে এবং সেজন্য বিচিত্র ভাবে সচেষ্ট হয়ে উঠেছে—বিশ্ববোধকেই ভারতবর্ষ মানবাত্মার পক্ষে তেমনি চরম পদার্থ বলে জ্ঞান করেছিল এবং এইটিকে উদ্বোধিত করবার জন্যে নানাদিকেই তার চেষ্টাকে চালনা করেছে। শিক্ষায়-দীক্ষায় আহারে-বিহারে সকল দিকেই সে তার এই অভিপ্রায় বিস্তার করেছে।"—বিশ্ববোধ, শান্তিনিকেতন ১০

এই হচ্ছে ভারতের স্বভাবগত চিন্তার ধারা। তার শিল্পে সাহিত্যে এবং প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় অবধি এই আধ্যাত্মিক ছাপ কিছু-না-কিছু পাওয়া যাবে। মূল লক্ষ্যে পরিপূর্ণতার আদর্শ থাকলেও ভারতবর্ষে আধ্যাত্মিকতাই যে প্রাধান্য পেয়েছে, একথা বলতেই হবে। সেই আধ্যাত্মিকতা আচারে-বিচারে কোথাও-কোথাও গোঁড়ামিতেও এসে ঠেকেছে। বস্তুর পরিচয় সকলে সম্যক্ না জেনেই কেবল বাপ-পিতামহের পুরোনো মত ও হৃদয়বৃত্তির ধারা রক্ষণেই জীবনের সার্থকতা মেনেছে। ঠিক যেমন পাশ্চাত্য-সমাজ জেনেছে বস্তু-বিজ্ঞান ও বিষয়-সম্পদের

প্রসারেই হবে সে সকলের উপরে জয়ী, সেই তার সিদ্ধির শ্রেষ্ঠ পথ। এবিষয়ে বিচার করে রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন—"আমেরিকায় 'বৈষয়িকতা'র ব্যাপ্তি, ভারতে ছিল 'সামাজিকতা'।" ওদের 'বৈষয়িকতা'র বাহন হয়েছে,—রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, কলকারখানা; আর আমাদের আধ্যাত্মিকতা আশ্রয় করেছে শেষে সামাজিক আচার-বিচারকে। কবি বলছেন,—"আমি বলিনে রেলওয়ে-টেলিগ্রাফ, কল-কারখানার কোনোই প্রয়োজন নেই। আমি বলি, প্রয়োজন আছে, কিন্তু তার বাণী নেই।" তিনি আরো বলেছেন,—"একঝোঁকা আধ্যাত্মিক বুদ্ধিতে আমরা দারিদ্র্যের দুর্বলতায় কাত হয়ে পড়েছি, আর ওরাই কি একঝোঁকা আধিভৌতিক চালে এক-পায়ে লাফিয়ে মনুষ্যত্বের সার্থকতার মধ্যে গিয়ে পৌঁছচ্ছে।"

"ভারতে আচারের বন্ধনে যেখানে মানুষকে এক করতে চেয়েছে সেখানে সেই ঐক্যে সমাজকে নির্জীব করেছে, য়ুরোপে ব্যবহারের বন্ধনে যেখানে মানুষকে এক করতে চেয়েছে সেখানে সেই ঐক্যে সমাজকে সে বিশ্লিষ্ট করেছে। কেননা, আচারেই হোক আর ব্যবহারেই হোক, তারা তো তত্ত্ব নয়; তাই তারা মানুষের আত্মাকে বাদ দিয়ে সকল ব্যবস্থা করে।"—শিক্ষার মিলন

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সমাজের বৈশিষ্ট্য যতই থাক্, তাদের মধ্যে আধুনিক কালে আত্মীয়তার অভাবই বড অভাব। মানুষের প্রতি দরদ নিয়ে তার চিত্তের ও বিত্তের বিকাশ ঘটাতে হবে,—এইটিই কবির পরম সিদ্ধান্ত। সর্বসাধারণের জন্য সেই আদর্শের ভিত্তিতেই সমস্ত পৃথিবীতে শিক্ষানীতি প্রবর্তিত হওয়া চাই। দেশ-বিদেশ ঘুরে, দুনিয়ার হাল-চাল দেখে-শুনে, অধ্যয়ন ও নানা আলাপ-আলোচনার অভিজ্ঞতা থেকে তিনি যা বললেন, শিক্ষাব্রতীদের পক্ষে তা বিশেষভাবে বিবেচ্য। রাষ্ট্র এবং সমাজ-পরিচালকগণেরও সে-সম্বন্ধে অবহিত হবার আছে। তাঁর প্রধান কথাই এই—

"শিক্ষার ঐক্যযোগে চিত্তের ঐক্যরক্ষাকে সভ্যসমাজ-মাত্রই একান্ত অপরিহার্য ব'লে জানে। ভারতের বাইরে নানাস্থানে ভ্রমণ করেছি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মহাদেশে। দেখে এসেছি, এশিয়ার নবজাগরণের যুগে সর্বত্রই সাধারণের মধ্যে শিক্ষা-প্রচারের দায়িত্ব একান্ত আগ্রহের সঙ্গে স্বীকৃত। বর্তমান যুগের সঙ্গে যে-সব দেশ চিত্তের ও বিত্তের আদান-প্রদান বুদ্ধিবিচারের সঙ্গে চালনা করতে না পারবে তারা কেবলই হঠে যাবে, কোণ-ঠেসা হয়ে থাকবে—এই শঙ্কার কারণ দূর করতে কোনো ভদ্রদেশ অর্থাভাবের কৈফিয়ত মানেনি। আমি যখন রাশিয়ায় গিয়েছিলুম, তখন

যেখানে আট বছর মাত্র নূতন স্বরাজতন্ত্রের প্রবর্তন হয়েছে, তার প্রথমভাগে অনেক কাল বিদ্রোহে-বিপ্লবে দেশ ছিল শান্তিহীন, অর্থসচ্ছলতা ছিলই না। তবু এই স্বল্পকালেই রাশিয়ার বিরাট রাজ্যে প্রজাসাধারণের মধ্যে যে অদ্ভুত দ্রুত-গতিতে শিক্ষাবিস্তার হয়েছে সেটা ভাগ্য-বঞ্চিত ভারতবাসীর কাছে অসাধ্য ইন্দ্রজাল বলেই মনে হল।"—শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ, শিক্ষা

দরদহীন সভ্যতার রূপ দেখিয়ে, আপন দেশে কবি 'জনশিক্ষা'র আবশ্যকতায় সকলকে সচেতন করে তোলবার জন্য বললেন,—"মুখে আমরা যাই বলি, দেশ বলতে আমরা যা বুঝি সে হচ্ছে ভদ্রলোকের দেশ। গণ-সাধারণকে আমরা বলি ছোটলোক, এই সংজ্ঞাটা বহুকাল থেকে আমাদের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করেছে। ছোটলোকের পক্ষে সকল প্রকার মাপকাঠিই ছোটো।" সর্বাঙ্গীণতার প্রতি স্বাভাবিক দৃষ্টি ছিল ব'লেই, সমাজের নিম্ন-সাধারণ শ্রেণীর অবস্থাও কবি এত গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন এবং তাই এই বিসদৃশ ব্যাপারটা ধরিয়ে দিলেন যে, "আমরা এক দেশে আছি অথচ আমাদের এক দেশ নয়।"—পল্লীসেবা, শিক্ষা ৩য় সং ১৩৩৭

সমাজকে তার অব্যবস্থার জন্য ধিক্কার দিয়ে বললেন,—"সমাজের উপরের থাকের লোক খেয়ে-প'রে পরিস্ফুট থাকবে আর নীচের থাকের লোক অর্ধাশনে বাঁচে কি মরে সে সম্বন্ধে সমাজ থাকবে অচেতন, এটাকে বলা যায় অর্ধাঙ্গের পক্ষাঘাত। সেই অসাড়তার ব্যামোটা বর্বরতার ব্যামো।"—শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ, শিক্ষা

দেশ-বিদেশের শিক্ষাপ্রসঙ্গে কবির তিন-রকম বাতির উদাহরণটি বিশেষ উপযোগী। আগে দেশে ছিল সেজের বাতি; তাতে উপরে ভাসত তেল, নিচে জল। তেল ছিল ভদ্র-সমাজের জ্ঞানের অংশ, জোলো অংশ নিম্নসাধারণের জ্ঞানের। দুয়ে মিশ না খেলেও দুয়ের যোগেই দেশের সংস্কৃতির শিখা একরূপ দীপ্তি পেত। মাঝে-মাঝে তা নিবেও যেত। পাশ্চাত্য শিক্ষা এল। সে কেরোসিনের বাতির মতো। সকলের জন্যই তার জ্ঞানের উপকরণ সমান-তেজের। আলো তার ঝাঁঝালো। কিন্তু সে-আলোও প্রকাশ পায় একটি শিখায়, সে শিখার গতি উপরের দিকে। শেষে অধুনা পাশ্চাত্য থেকেই এল বিজলি বাতি; যে তারের বাহনে তার চলাচল, সকল অংশেই তার সমান দ্যুতি, ঘরে-বাইরে আনাচকানাচ—সকল জায়গায়ই সে সমানভাবে আলো করে। এখনকার এক ধরনের পাশ্চাত্য জনশিক্ষার বিস্তারও ঘটছে সর্বসাধারণের জন্য সমভাবে। এ দেখেই কবির আশা জেগেছে, হয়তো এতদিনে মানবসভ্যতার কলঙ্ক ঘুচবে। প্রথম থেকেই তিনি বলে আসছি-লেন, দেশের সাধারণের শিক্ষার ভার সাধারণকেই স্বাধীনভাবে গ্রহণ করতে হবে।

কোনো রাষ্ট্রের অপেক্ষাতে তা ফেলে রাখলে চলবে না। এ বিষয়ে তিনি আইরিশ জাতির উদাহরণ দিয়ে বলেছিলেন—

"আইরিশ জাতি কী প্রার্থনা করিতেছে। তাহারা বিপ্লব বাধাইয়া চায় না, দেশের বিদ্যাশিক্ষার ভার তাহারা নিজের হাতে চালাইতে চায়।"

রাষ্ট্রের প্রতি নির্ভর করার বিপদ সম্বন্ধে সতর্ক করবার জন্য কবি দেশবাসীর নিকট উত্থাপিত করেন, টলস্টয়ের বর্ণিত রুশিয়ার শিক্ষানীতি।—

"It seems to me that it is now specially important to do what is right quietly and persistently, not only without asking permission from Government but consciously avoiding its perticipation. The strength of the Government lies in the people's ignorance, and the Government knows this, and will therefore oppose true enlightenment. It is time we realized that fact...And I am extremely sorry when I see valuable disinterested, and self-sacrificing efforts spent unprofitable. It is strange to see good, wise people spending their strength in a struggle against the Government, but carrying on the basis of whatever laws the Government itself likes to make". শিক্ষাসমস্যা, শিক্ষা

কবির মতে জনসাধারণকে শিক্ষা বিলাবার বাহন হওয়া চাই—মাতৃভাষা। তিনি য়ুরোপের নজির তুলে বলেন,—"ভাষা-স্বাতন্ত্র্যের সময় থেকেই য়ুরোপে সমস্ত বিদ্যার যথার্থ সমবায় সাধন হয়েছে। এই স্বাতন্ত্র্য য়ুরোপের চিৎপ্রকর্ষকে খণ্ডিত না করে আশ্চর্যরূপে সম্মিলিত করেছে। য়ুরোপে এই স্বদেশী-ভাষায় বিদ্যার মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে তার জ্ঞানের ঐশ্বর্য বেড়ে উঠল, ব্যাপ্ত হল সমস্ত প্রজার মধ্যে, যুক্ত হল প্রতিবেশী ও দূরবাসীদের জ্ঞানসাধনার সঙ্গে, স্বতন্ত্রক্ষেত্রের সমস্ত শস্য সংগৃহীত হল য়ুরোপের সাধারণ-ভাণ্ডারে।"—বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ, শিক্ষা ১৯৩৩

প্রাচ্যদেশ জাপানের কথা তিনি আগেই বলেছিলেন,—"আধুনিক সমস্ত বিদ্যাকে জাপানী ভাষার সম্পূর্ণ আয়ত্তগম্য ক'রে তবে জাপানী-বিশ্ববিদ্যালয় দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে সত্য ও সম্পূর্ণ করে তুলেছে। তার কারণ, শিক্ষা বলতে জাপান সমস্ত দেশের শিক্ষা বুঝেছে—ভদ্রলোক বলে এক সংকীর্ণ শ্রেণীর শিক্ষা বোঝেনি।"

—পল্লীসেবা, শিক্ষা ৩য় সং ১৩৩৭

'শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ' প্রসঙ্গে তিনি বলেন,—"মনের চিন্তা ও ভাব কথায় প্রকাশ করবার সাধনা শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ। মাতৃভাষায় রচনার অভ্যাস সহজ হয়ে

গেলে তারপরে যথাসময়ে অন্য ভাষা আয়ত্ত ক'রে সেটাকে সাহসপূর্বক ব্যবহার করতে কলমে বাধে না।"—শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ, শিক্ষা

এ বিষয়ে নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার কথা তাঁর এই,—"আমার অভিভাবক সেই নর্মাল স্কুলের দেউড়ি-বিভাগে আমাকে ভরতি করেছিলেন। আমি সম্পূর্ণ বাংলা-ভাষার পথ দিয়েই শিখেছিলাম ভূগোল, ইতিহাস, গণিত, কিছু-পরিমাণ প্রাকৃত বিজ্ঞান, আর সেই ব্যাকরণ যার অনুশাসনে বাংলা-ভাষা সংস্কৃত-ভাষার আভিজাত্যের অনুকরণে আপনার সাধুভাষার কৌলীন্য ঘোষণা করত। এই শিক্ষার আদর্শ ও পরিমাণ বিদ্যা-হিসাবে তখনকার ম্যাট্রিকের চেয়ে কম-দরের ছিল না। আমার বারো বৎসর বয়স পর্যন্ত ইংরেজি-বর্জিত এই শিক্ষাই চলেছিল। তারপরে ইংরেজি বিদ্যালয়ে প্রবেশের অনতিকাল পরেই আমি স্কুল-মাস্টারের শাসন হতে ঊর্ধ্বশ্বাসে পলাতক।"—শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ, শিক্ষা

"কবির বিশ্বাস, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শিক্ষাও বাংলার মধ্য দিয়া দিতে আরম্ভ করিলেই গ্রন্থ লিখিত ও প্রকাশিত হইবে।"—রবীন্দ্র-জীবনী ২য় সং ২য় খণ্ড পৃ ৪০৪

এমন কি, তিনি এতদূর পর্যন্ত বলেছেন—"যে-সব শিক্ষণীয় বিষয় জানা থাকলে আত্মসম্মান রক্ষা হয় তার জন্যে অগত্যা যদি ইংরেজি ভাষারই দ্বারস্থ হতে হয় তবে সেই অকিঞ্চনতায় মাতৃভাষাকে চিরদিন অপমানিত করে রাখা হবে।" (শিক্ষার বিকিরণ, শিক্ষা) ইংরেজি ভাষাকে রাষ্ট্রব্যবস্থায় চালু রাখা নিয়ে আজো বাদানুবাদের শেষ নেই। এ অবস্থায় কবির এই মন্তব্যটি সকলে বিশেষভাবে অনুধাবন করবেন আশা করি।

এ থেকে যা হোক, কবির শিক্ষা-আলোচনার মধ্যে জনশিক্ষা, স্বাধীন-ব্যবস্থায় শিক্ষা এবং মাতৃভাষায় শিক্ষার গুরুত্ব এতক্ষণে আমাদের হৃদয়ঙ্গম হবার কথা। আমাদের দেশে যে এক-কালে জনশিক্ষার প্রসার কিরূপ ছিল, তাও কবি দেখিয়েছেন। কথকতাকে তিনি সেদিকে খুব উচ্চ স্থান দিয়েছেন। তুলনা ক'রে বলেছেন,—"আমেরিকান টকির দ্বারা এ কাজটা হয় না," আর "আমাদের দেশে জনশিক্ষা ছিল 'স্বৈচ্ছিক,' পাশ্চাত্য দেশে হয়েছে 'আবশ্যিক'।"—এই তারতম্যের উক্তিও করেছেন তিনিই। সকলের চেয়ে আদর্শ এ-বিষয়ে তাঁর কাছে মহাভারতের শিক্ষা। বলেছেন,—

"ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম রূপ মহাভারত। সেই রূপটি একই কালে ভৌমওলিক-রূপ এবং মানস-রূপ। ভারতবর্ষের মনকে দেখেছিলেন তাঁরা মনে। সেই বিশ্বদৃষ্টির প্রবল আনন্দে তাঁরা ভারতবর্ষের চিরকালের শিক্ষার প্রশস্তভূমি

পত্তন করে দিলেন। সে-শিক্ষা ধর্মে-কর্মে রাজনীতি-সমাজনীতিতে তত্ত্বজ্ঞানে বহুব্যাপক।"

"তার উদ্দেশ্য ছিল সর্বজনীন চিত্তের উদ্দীপন, উদ্বোধন, চারিত্রসৃষ্টি। পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের আদর্শ জ্ঞানে কর্মে হৃদয়ভাবে ভারতের মনে উদ্ভাসিত হয়েছিল এই উদ্যোগ, তাকেই সঞ্চারিত করতে চেয়েছিল চিরদিনের জন্য সর্বসাধারণের জীবনের মধ্যে তার আর্থিক ও পারমার্থিক সদ্‌গতির দিকে, কেবলমাত্র তার বুদ্ধিতে নয়।"

অবিলম্বেই যে-কাজ হাতে নেওয়া দরকার, স্বদেশী-যুগ থেকে কবি সেদিকে ছাত্র-সমাজকে আহ্বান করে বলেছেন,—

"কলেজের বাহিরে যে-দেশ পড়িয়া আছে তাহার মহত্ত্ব একেবারে ভুলিলে চলিবে না। কলেজের শিক্ষার সঙ্গে দেশের একটা যোগ স্থাপন করিতে হইবে।"

আরো নির্দিষ্টভাবে কাজের উল্লেখ ক'রে কবি সংগ্রহ করতে বলেছেন,—"বাংলা-দেশের সাহিত্য, ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, লোকবিবরণ প্রভৃতি যাহা-কিছু আমাদের জ্ঞাতব্য।"—ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ

আর বলেছেন,—করা চাই দেশব্যাপী পরীক্ষার ব্যবস্থা।

কবির আরেকটি মন্তব্য-সম্বন্ধেও এখানে শিক্ষাবিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। শিক্ষাকে প্রাচীন-কালের বিষয়ে সীমাবদ্ধ না রেখে, তাকে আধুনিক-কালে প্রসারিত করে আনা প্রয়োজন। না হলে, সর্বাঙ্গীণতায় তো ত্রুটি থেকে যাবেই, শিক্ষা প্রাণবন্ত হতেও বাধা পাবে। কবি বলেছেন,—

"লণ্ডন য়ুনিভার্সিটিতে আধুনিক শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা" চলছে। "মাঞ্চেস্টর য়ুনিভার্সিটি আধুনিক ইতিহাসের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ করছে। আধুনিক সমাজের সঙ্গে যোগ চাই।"—শিক্ষার বিকিরণ, শিক্ষা

দেশের এবং বিদেশের বহুদর্শিতা থেকে কবি যে-কথাগুলি ভেবেছেন, যে-সব প্রণালী উদ্ভাবন করেছেন, বাস্তবক্ষেত্রে তার প্রয়োগের জন্য নির্ভর করেছেন বেশি নিজের-গড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর, বাইরের লোককে শুনিয়েই সব-কর্তব্য শেষ করেন নি। সে প্রতিষ্ঠানের কর্ম বহু এবং বিচিত্র, আজো তার পরীক্ষা চলছে।

৩

রূপায়িত কর্ম : ব্রহ্মবিদ্যালয়

কবি-হিসাবে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বে বিখ্যাত হয়ে আছেন। তাঁর কর্মের পরিচয়ে আরেকটি আখ্যায় বিশ্ববাসীর নিকট তিনি ক্রমেই স্থায়িভাবে বরণীয় হবেন,—দিনে-

দিনে লোকে জানবে তাঁকে মহান একজন শিক্ষাবিদ্ ব'লে। তাঁর এই বিশিষ্ট ভূমিকাতে আবির্ভাবের গোড়ায় সূক্ষ্ম যে-সূত্রটি রয়েছে তা আগেই নির্দেশ করা গেছে তাঁর বাল্যকালের নর্ম্যালস্কুলের স্মৃতির আলোচনায়। তাঁর গোটা-জীবনের স্তর-পরম্পরায় শিক্ষার প্রেরণাটি কিরূপে ক্রমবিকশিত হয়েছে, তার ইতিহাসও কিছু-কিছু জানা থাকা প্রয়োজন। তার সাহায্যে বোঝা যাবে শান্তিনিকেতনের শিক্ষা-জিনিসটা কবির কাছে একটা মত (Theory) দাঁড় করাবার উদ্দেশ্যে কতক-গুলি তথ্য-সংগ্রহের উপযোগী গবেষণার বিষয় নয়, এটা তাঁর জীবন-বিকাশের উপযোগী সত্যসাধনার অঙ্গ।—

"শান্তিনিকেতনের আকাশ ও অবকাশে পরিবেষ্টিত আমাদের যে-জীবন তার মধ্যে সত্যই একটি সম্পূর্ণ রূপ আছে। শান্তিনিকেতনের ভিতর দিয়ে মোটের উপর আমি নিজেকে কী-রকম করে প্রকাশ করেছি, সেইটের দ্বারাই প্রমাণিত হয় শান্তিনিকেতন আমার পক্ষে কী।"। (পথে ও পথের প্রান্তে, পত্র ৮, ১৯২৬) শান্তিনিকেতনের শিক্ষা-চর্চার পথ দিয়েই কবি-তাঁর শ্রেষ্ঠ সাধনা বিশ্বমৈত্রীর প্রয়োগ-ক্ষেত্রে পৌছান।

কবি ছিলেন বৈষয়িক কাজে লিপ্ত। শিলাইদহে জমিদারি দেখেন। একত্রিশ বছর বয়সের আগে শিক্ষাসম্বন্ধে তাঁর প্রকাশ্য-আলোচনার উপলক্ষ্য ঘটেনি। সে উপলক্ষ্য দেখা দিল রাজশাহী-এসোসিয়েশন থেকে যখন শিক্ষাসম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পড়ার আহ্বান এল। লিখলেন 'শিক্ষার হেরফের', সভায় তা পঠিত হল (১২৯৯)।

তখন দেশের কথা ভাবছেন। সেই ভাবনার মধ্যে রাজনীতির বিষয়ও আছে। লিখেছেন 'মন্ত্রী-অভিষেকে'র পুস্তিকা (১২৯৭)। ক্রমে কালিদাসের কাব্যপাঠে ভারতবর্ষের অতীত-গৌরববাহিনী দিনগুলি মনশ্চক্ষে ভাসছে। তপোবনের প্রেরণায় মন ভরপুর। গান অভিনয় এমন কি সামান্যভাবে চিত্রবিদ্যায়ও এর আগে থেকে দীক্ষা হয়ে গেছে। সংস্কৃতির সর্বাঙ্গীণ ধারার স্পর্শ জীবনের শুরু থেকে তিনি পেয়েছিলেন। পরে এক-স্থলে তিনি লিখেছেন, "কেবলমাত্র কলেজি বিদ্যাকে নয়, সকল বিদ্যাকেই শ্রদ্ধা করবার অভ্যাস আমাদের পরিবারে প্রচলিত ছিল।" (শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সংগীতের স্থান, শিক্ষার ধারা ১৩৪২) অন্যত্র লিখেছেন,—"বাড়িতে আত্মীয়-বন্ধুদের সংগীত-সাহিত্য শিল্পকলার চর্চার আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ হয়েছি। এটি আমার জীবনের খুব বড়ো কথা।" (বিশ্বভারতী ১৩২৯) রাজনীতি, সমাজসেবা এবং ধর্মান্দোলনের প্রেরণাও পরিবারের আবহাওয়া থেকে

জীবনের প্রারম্ভেই তাঁর পক্ষে সুলভ হয়েছিল। স্বাধীন এক নূতন-সমাজ গড়বার সূচনা ১৩০৫ সনের বঙ্গচ্ছেদ-আন্দোলনের দান। সেদিন থেকে স্বাধীনতার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বাণী ও কর্মের মধ্যে দিয়ে যা প্রকাশ পেয়ে এসেছে, 'রবীন্দ্র-জীবনী'-কারের ভাষায় তার মোট কথাটি এই যে—"পরাধীনতার কারণ বাহিরে নাই—তাহা আমাদের মধ্যেই আছে। সাধারণত স্বাধীনতা অর্থে রাজনীতিক স্বাধীনতা বুঝায়; কিন্তু উহা যে মানবের সর্ববিধ স্বাধীনতা বা মুক্তির বিষয়ে প্রযোজ্য, এ কথা সহজে স্বীকৃত হয় না। রবীন্দ্রনাথ ভারতবাসীর জন্য এই সমগ্র স্বাধীনতা চাহেন—কেবলমাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতায় তিনি তুষ্ট নহেন।"

— রবীন্দ্র-জীবনী ২য় সং ১ম খণ্ড পৃ ৩৪৮

ঢাকায় সে-সময় বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনীর অধিবেশন হয়। তাতে গৃহীত একটি প্রস্তাব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী' পত্রিকায় (১৩০৫) লেখেন—"কেবল রাজনৈতিক আন্দোলনের দ্বারা আমাদের লজ্জা দূর হইবে না। আমরা বিবেচনা করি, এই মন্তব্য-প্রকাশ ঢাকা প্রাদেশিক-সমিতির বিশেষ গৌরবের কারণ।" কবি তখন থেকেই সর্বাঙ্গীণ মুক্তির জন্য মানুষের নূতন সমাজকে সর্বাঙ্গীণভাবে সুগঠিত করবার প্রয়োজন যে অনুভব করছেন, এই মন্তব্যটি দ্বারা তা সূচিত হচ্ছে। এই সঙ্গে শিক্ষার দিকে দৃষ্টি-পড়ার আরো কারণ ঘটে। নিজের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার কথা হচ্ছে। শিলাইদহে রেখে নিজের তত্ত্বাবধানে তাদের শিক্ষার আয়োজনে তিনি ব্যাপৃত আছেন। ত্রিপুরার মহারাজা কবির বন্ধু। রাজপুত্রদের শিক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধেও অনুরোধ আসছে সেখান থেকে। সমাজের সাধারণের জন্য একটা-কিছু করার আগ্রহে এবং নিজের ঘরোয়া-দায়িত্ব থেকেও বটে,—শিক্ষাকেই কবি মানুষের সর্বাঙ্গীণ জীবনগঠনের সুষ্ঠু ক্ষেত্ররূপে বেছে নিলেন। ১৩০৮ সনের থেকে শান্তিনিকেতনে ব্রাহ্মচর্যাশ্রমের মধ্যে কবির শিক্ষাব্রত শুরু হল। তার পরে আজ ১৩৭০ সনে এসে এর ইতিহাসের বাঁকগুলির দিকে যদি ফিরে তাকানো যায়, তবে স্বতই এ কথা মনে হবে,—স্কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় দেশে অনেক রয়েছে যা বয়সে এবং বিষয়ে অনেক প্রাচীন ও অনেক বড়ো। তা সত্ত্বেও এত শীঘ্র এইটুকু প্রতিষ্ঠানের বিশ্বব্যাপী এত প্রসারের কারণ কী। সে-কথা ভেবে যখন বিস্ময় লাগে, তখন রবীন্দ্রনাথের কবিখ্যাতির প্রতিই প্রথমত দৃষ্টি পড়বে, তা স্বাভাবিক। কিন্তু এ সম্পর্কে 'রবীন্দ্রজীবনী'-কারের কথাটি আরো সুসংগত মনে হয়। কবির কবিখ্যাতি নয়, সামান্য বিদ্যালয় থেকে বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হওয়ার মূলে রয়েছে এই সাধারণ সত্যটি যে, 'ভাবের স্পর্শে রূপ তাহার সামান্যতা বিসর্জন দিয়া অপরূপ

হয়। (রবীন্দ্রজীবনী ২য় সং ২য় খণ্ড) কখন্ কোন্ ভাবের স্পর্শে এই রূপান্তর ঘটল, এবারে তা দেখা যাক।

শিক্ষার কাজ হাতে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যখন বোলপুরে শান্তিনিকেতনের ন্যায় নিরালায় এক কোণে আপনাকে আবদ্ধ করলেন, তখন অন্যান্য অনেকে দেশের নানা কাজের কথা ভাবছেন। কেবল একটা কাজ নিয়ে লেগে-থাকার বা এতটা স্বাধীনভাবে নূতন-একটা বিষয়ে কলকাতার থেকে এত দূরে এসে হস্তক্ষেপ করার সাহস ও ধৈর্য অনেকের মধ্যেই কম ছিল। সুযোগ ও সহায়তাও হয়তো ঘটে ওঠেনি। তা ছাড়া, 'লেখাপড়া'র ভালোমন্দ নিয়ে মাথাব্যথাই বা ক'জনের ছিল। স্কুলে যাওয়া, বইর নির্দিষ্ট পড়া মুখস্থ ক'রে পরীক্ষায় পাস করা চাই। তার মধ্যে দেশ আর বিদেশ কী! বরং বিদেশের হালচাল রপ্ত হলে দেশে সম্মান বাড়ে, অর্থেরও সুবিধে হয়। সে-জ্ঞান জীবন-গঠনের অন্য কাজে লাগুক আর না-ই লাগুক, মাথা ঠুকে একবার তা মগজে ভরে রাখতে পারলেই হল। তার প্রয়োগ নিয়ে তত দায় নেই, দাবি আছে অর্জনের। জীবনের সংস্রব-হীন শুধু জীবিকাসর্বস্ব অনভ্যস্ত বৈদেশিক-শিক্ষা ভেসে বেড়ায় দেশের উপরতলায় মুষ্টিমেয় সমাজে, দেশের মানুষের মধ্যে তা ভিত্তি পায় না; জাতিকে উন্নত করবার জন্য যত বড় কল্পনাই থাকুক, কৃত্রিম জ্ঞানের ব্যর্থতা থেকে মানুষকে উদ্ধার করা চাই আগে; সে-জন্য জ্ঞানশিক্ষার প্রণালীর পরিবর্তন আবশ্যক। রবীন্দ্রনাথ এই কাজটিই গ্রহণ করলেন। কাজে ব্রতী হওয়ার পর্বের কথাগুলি তাঁর এই—"জ্ঞানশিক্ষা নিকট হইতে দূরে, পরিচিত হইতে অপরিচিতের দিকে গেলেই তাহার ভিত্তি পাকা হইতে পারে।"

"আইডিয়া যত বড়ই হউক তাহাকে উপলব্ধি করিতে হইলে একটা নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ জায়গায় প্রথম হস্তক্ষেপ করিতে হইবে।" কবির শান্তিনিকেতনের কাজ সেই হস্তক্ষেপেরই যে প্রয়াস, তা বলাই বাহুল্য।

চাকুরি-মোক্ষ-করা শিক্ষার দিকে ঝোঁক, সেদিন তো তা খুবই ছিল,—আজো তা কমেনি। কিন্তু কবির অভিমত এই যে, গতানুগতিক শিক্ষায় "বিশ্বের সঙ্গে যে আনন্দের সম্বন্ধের দ্বারা বিশ্বসম্পদকে আত্মগত করা যায় তা থেকে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি;" নানা দিক থেকে নানা কারণেই তিনি প্রচলিত ধারার প্রতি বীতরাগ হয়ে উঠেছিলেন। সে-সব কারণের কথা পূর্বেই অনেকটা বলা হয়েছে। নিজে যখন নূতন-একটা বিদ্যালয় গড়তে লাগলেন, তখন তাঁর মনে আদর্শ-বিদ্যালয় সম্বন্ধে যে পরিকল্পনা ছিল, তার মধ্যে দেখা যায়,—প্রকৃতি ও মানুষের জীবনযাত্রার অচ্ছেদ্য যোগে শিক্ষাকে প্রাণবন্ত করবার কথাটাই মুখ্য হয়ে উঠেছে। জীবিকার দিকের

ব্যবস্থাও ঐ সঙ্গে আছে, কিন্তু তা আছে জীবনকেই কাজের বৈচিত্র্যে ও শক্তির চর্চায় সরস ও পরিপুষ্ট ক'রে। লিখছেন—

"আদর্শ বিদ্যালয় যদি স্থাপন করিতে হয় তবে লোকালয় হইতে দূরে নির্জনে মুক্ত আকাশ ও উদার প্রান্তরে গাছপালার মধ্যে তাহার ব্যবস্থা করা চাই। সেখানে অধ্যাপকগণ নিভৃতে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকিবেন এবং ছাত্রগণ সেই জ্ঞানচর্চার যজ্ঞক্ষেত্রের মধ্যেই বাড়িয়া উঠিতে থাকিবে।

"যদি সম্ভব হয় তবে এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে খানিকটা ফসলের জমি থাকা আবশ্যক; —এই জমি হইতে বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় আহার্য সংগ্রহ হইবে, ছাত্রেরা চাষের কাজে সহায়তা করিবে। দুধ-ঘি প্রভৃতির জন্য গরু থাকিবে এবং গোপালনে ছাত্রদিগকে যোগ দিতে হইবে। পাঠের বিশ্রামকালে তাহারা স্বহস্তে বাগান করিবে, গাছের গোড়া খুঁড়িবে, গাছে জল দিবে, বেড়া বাঁধিবে। এইরূপে তাহারা প্রকৃতির সঙ্গে কেবল ভাবের নহে কাজের সম্বন্ধও পাতাইতে থাকিবে।

"অনুকূল ঋতুতে বড়ো-বড়ো ছায়াময় গাছের তলায় ছাত্রদের ক্লাস বসিবে। তাহাদের শিক্ষার কতক অংশ অধ্যাপকের সহিত তরুশ্রেণীর মধ্যে বেড়াইতে বেড়াইতে সমাধা হইবে। সন্ধ্যার অবকাশ তাহারা নক্ষত্র-পরিচয়ে, সংগীতচর্চায়, পুরাণকথা ও ইতিহাসের গল্প শুনিয়া যাপন করিবে।

"...এই বিদ্যালয়ে বেঞ্চি টেবিল চৌকির প্রয়োজন নাই।

কেননা কবি বলছেন,—"গাছপালা, স্বচ্ছ আকাশ, মুক্ত বায়ু, নির্মল জলাশয়, উদার দৃশ্য, ইহারা বেঞ্চি এবং বোর্ড, পুঁথি এবং পরীক্ষার চেয়ে কম নয়।"

প্রথমত তপোবনের আদর্শেই কবি বিদ্যালয়কে রূপদান করতে উদ্‌বুদ্ধ হন। তিনি বলেন,—"এই আশ্রমটির মধ্যে ভারতবর্ষের একটি ভূতকালের আবির্ভাব আছে। সে হচ্ছে সেই তপোবনের কাল।—যে-কালে ভারতবর্ষ তপোবনে শিক্ষালাভ করেছে, তপোবনে সাধনা করেছে এবং সংসারের কর্ম সমাধা করে তপোবনে জীবিতেশ্বরের কাছে, জীবনের শেষ-নিশ্বাস নিবেদন করে দিয়েছে; যে-কালে ভারতবর্ষ জল-স্থল-আকাশের সঙ্গে আপনার যোগ স্থাপন করেছে এবং তরুলতা পশুপক্ষীর সঙ্গে আপনার বিচ্ছেদ দূর করে দিয়ে—সর্বভূতেষু চাত্মানং—আত্মাকে সর্বভূতের মধ্যে দর্শন করেছে।

"শুধু ভূতকাল নয়, এই আশ্রমটির মধ্যে একটি ভবিষ্যৎকালের আবির্ভাব আছে। কারণ, সত্য কোনো অতীতকালের জিনিস হতেই পারে না। একেবারেই হয়ে চুকে গেছে, যার মধ্যে ভবিষ্যতে আর হবার কিছুই নেই তা মিথ্যা, তা মায়া। বিশ্ব-

প্রকৃতির মাঝখানে দাঁড়িয়ে আত্মার সঙ্গে ভূমার যোগসাধনা এই যদি সত্য সাধনা হয়, তবে এই সাধনার মধ্যে এসে উপস্থিত না হলে কোনো কালের কোনো সমস্যার মীমাংসা হতে পারবে না। এই সাধনা না থাকলে সত্যের সঙ্গে মঙ্গলকে আমরা এক করে দেখতে পাব না। মঙ্গলের সঙ্গে সুন্দরের আমরা বিচ্ছেদ ঘটিয়ে বসব। এই সাধনা না থাকলে আমরা জগতে অনৈক্যকেই বড়ো করে জানব এবং স্বাতন্ত্র্যকেই পরম পদার্থ বলে জ্ঞান করব, পরস্পরকে খর্ব করে প্রবল হয়ে ওঠবার জন্য কেবলই ঠেলাঠেলি করতে থাকব। সমস্তকে এক করে নিয়ে যিনি শান্তং শিবং অদ্বৈতং-রূপে বিরাজ করছেন, তাঁকে সর্বত্র উপলব্ধি করবার জন্যে না পাব অবকাশ না পাব মনের শান্তি।

"অতএব সংসারের ঘাত-প্রতিঘাত কাড়াকাড়ি মারামারি যাতে একান্ত হয়ে উত্তপ্ত হয়ে না ওঠে সেজন্যে তপোবনের প্রয়োজন।" (শান্তিনিকেতন ৯, আশ্রম) পরেও কবি আরেক স্থলে লিখছেন এই কথাই,—"বর্তমান যুগের বিদ্যায়তনে সেই তপোবনকে রূপলোকে প্রকাশ করবার জন্যে একদা কিছুকাল ধ'রে আমার মনে আগ্রহ জেগেছিল।"—আশ্রমের শিক্ষা, শিক্ষা

এখানে একটি কথা বলা আবশ্যক। শেষ-জীবনে কবি নিজেও বলেছেন এবং সে-সূত্র ধ'রে অনেকে এখন বলে থাকেন যে, কবির তপোবনের আদর্শটা কেবল প্রাচীন কাব্য-সাহিত্যগত একটি আদর্শই, ওর ঐ ভাবগত ভিত্তি ছাড়া ঐতিহাসিক ভাবে কোনো কালেই কোথাও ওর কোনো বাস্তব সত্তা ছিল না; কবি নিজেও সেভাবে ওর অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না। কিন্তু কবির উপরি-উদ্‌ধৃত বাণী এবং তখনকালের আরো-অনেক অনুরূপ রচনাংশ এ বিষয়ে অন্যরূপ ধারণা জোগায় কি না, তাও বিশেষভাবেই বিচার্য। মনে হওয়া অস্বাভাবিক হবে না, যে, কবি পরে যা-ই বলুন, অন্তত এককালে তিনি ভারতবর্ষে তপোবনের ঐতিহাসিক অস্তিত্বেও দৃঢ়বিশ্বাসী ছিলেন; এ নিয়ে তাঁর মনে সেদিন কোনো প্রশ্নই ওঠেনি। বরং "যা একেবারেই হয়ে চুকে গেছে, যার মধ্যে ভবিষ্যতে আর হবার কিছুই নেই তা মিথ্যা, তা মায়া," এই তপোবন কবির ধারণায় সেই 'মিথ্যা' ও 'মায়া'-শ্রেণীর জিনিস ছিল না ব'লেই তিনি বিদ্যালয় স্থাপনে এমন যত্নবান হয়েছিলেন, এরূপ কেহ মনে করলে তা নিতান্ত অমূলক হবে না।

কবির এই উক্তির মধ্যেই আভাস পাওয়া যাচ্ছে যে, একদিন তপোবনের আদর্শে কাজ আরম্ভ ক'রে থাকলেও কিছুকাল পরে বিদ্যালয়ে অন্য-রকম আদর্শের রূপদানের আগ্রহ তাঁর মন অধিকার করে। তবে "সকালে সন্ধ্যায় প্রাচীন

তপোবনের কোনো মহৎ বাণী উচ্চারণ"—করার রীতি তখনো ছিল, এখনো আছে।

কিন্তু পরিবর্তন সে তো আরো পরের কথা। তার আগে এই গঠনের প্রথম পর্বে কবি নিজে কীভাবে বিদ্যালয়ের জন্য কাজ করেছেন, তার পরিচয়টি পাওয়া দরকার। নিজের কাজের ভূমিকা সম্বন্ধে লিখেছেন, "আমার উপর ভার রইল ছেলেদের সঙ্গ দেওয়া।" (বিশ্বভারতী : ৩২৯) ছেলেদের কবি পড়াতেন;—কিন্তু কোথায় ব'সে; তাঁর সেই জায়গাটির কথা ক'জনই বা মনে রেখেছে; তার কোনো পরিচয় আজ সুলভ না হলেও, কোনো চিহ্ন খুঁজে না পেলেও কবির লেখা থেকেই একটা নাম-মাত্র হদিশ আমরা পেতে পারি। লিখেছেন,—"আমার পড়াবার জায়গা ছিল প্রাচীন জামগাছের তলা।" (আশ্রমের রূপ ও বিকাশ—২ পৃ ২৪) এ সঙ্গে তাঁর 'গুরুদেব' নামের ইতিহাসটুকুও তাঁর ভাষা থেকেই জেনে রাখা ভালো।—

"তখন উপাধ্যায় (ব্রহ্মবান্ধব) আমাকে যে 'গুরুদেব' উপাধি দিয়েছিলেন আজ পর্যন্ত আশ্রমবাসীদের কাছে আমাকে সেই উপাধি বহন করতে হচ্ছে। আশ্রমের আরম্ভ থেকে বহুকাল পর্যন্ত তার আর্থিক ভার আমার পক্ষে যেমন দুর্বহ হয়েছে, এই উপাধিটিও তেমনি। অর্থকৃচ্ছ্রতা এবং এই উপাধি কোনোটাই আরামে বহন করতে পারিনে, কিন্তু দুটো বোঝাই যে ভাগ্য আমার স্কন্ধে চাপিয়েছেন তাঁর হাতের দান-স্বরূপ এই দুঃখ এবং লাঞ্ছনা থেকে শেষ-পর্যন্তই নিষ্কৃতি পাবার আশা রাখিনে।"—আশ্রমের রূপ ও বিকাশ

কবি যে এখানে আশ্রমের দুর্বহ আর্থিক ভারের উল্লেখ করেছেন, তার জন্য তাঁর নিজের অনেক অর্থ ও সামর্থ্য জোগাতে হয়েছে। সে-সম্পর্কে তাঁর লেখা থেকেই এ সময়কার একটি ঘটনার উল্লেখ এখানে করা যাচ্ছে,—

"সমুদ্র-তীরবাসের লোভে পুরীতে একটা বাড়ি করেছিলুম। সে বাড়ি এক দিনও ভোগ করবার পূর্বে আশ্রমের ক্ষুধার দাবিতে বিক্রি হয়ে গেল। তার পরে যে-সকল বাকি রইল তাকে বলে উচ্চহারের সুদে দেনা-করবার ক্রেডিট।"

—আশ্রমের রূপ ও বিকাশ— ৩, আশ্রমবিদ্যালয়ের সূচনা

শান্তিনিকেতনের শিক্ষার উৎপত্তি বিষয়ে সংক্ষেপে দু'কথায় কবি বলেছেন,— "নিম্নতর লক্ষ্য—ব্যবহারিক সুযোগ লাভ। উচ্চতর লক্ষ্য—মানবজীবনের পূর্ণতা সাধন। এই লক্ষ্য হতেই বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক উৎপত্তি।"—বিশ্বভারতী

কবি সেই উৎপত্তিকালে ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করেও কোন্ মহাফলের আশায় কী ভাবে এই ডাঙার মধ্যে পড়ে থেকে ছেলেদের নিয়ে দিন কাটাতেন তার বিবরণও তাঁর

ভাষাতেই বলা যাক্—"আমি মনে করেছিলাম, আমার ছেলেরা প্রাণবান হবে, তাদের মধ্যে ঔৎসুক্য জাগরিত হবে। তারা বেশি পাসমার্কা পেয়ে ভালো করে পাস করবে এ লোভ ছিল না—তারা আনন্দিত হবে, প্রকৃতির শুশ্রূষায় শিক্ষকের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তায় পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হবে এই ইচ্ছাই মনে ছিল। অল্প-কয়েকটি ছেলে নিয়ে গাছের তলায় এই লক্ষ্য নিয়েই কাজ আরম্ভ করেছিলাম। প্রকৃতির অবাধ সঙ্গ লাভ করবার উন্মুক্ত ক্ষেত্র এইখানেই ছিল; শিক্ষায় যাতে তারা আনন্দ পায়, উৎসাহ বোধ করে সেজন্য সর্বদা চেষ্টা করেছি, ছেলেদের রামায়ণ মহাভারত পড়ে শুনিয়েছি, অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় তখন এখানে আসতেন, তিনি তা শুনতে ছাত্র হয়ে আসতে পারবেন না বলে আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন। ছেলেদের জন্য নানা-রকম খেলা মনে-মনে আবিষ্কার করেছি, একত্র হয়ে তাদের সঙ্গে অভিনয় করেছি, তাদের জন্য নাটক রচনা করেছি। সন্ধ্যার অন্ধকারে যাতে তারা দুঃখ না পায় এজন্য তাদের চিত্তবিনোদনের নূতন-নূতন উপায় সৃষ্টি করেছি। তাদের সমস্ত সময় পূর্ণ করে রাখবার চেষ্টা করেছি। আমার নাটক, আমার গান তাদের জন্যই আমার রচনা। তাদের খেলাধুলোয় তখন আমি যোগ দিয়েছি। এইসব ব্যবস্থা অন্যত্র শিক্ষাবিধির অন্তর্গত নয়। অন্য বিদ্যালয়ে ক্রিয়াপদ শব্দরূপ হয়তো বিশুদ্ধভাবে মুখস্থ করানো হচ্ছে—অভিভাবকের দৃষ্টিও সেই দিকেই। আমাদের হয়তো সেদিকে কিছু ত্রুটি হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু একথা বলতেই হবে যে, এখানে ছাত্রদের সহজ মুক্তির আনন্দ দিয়েছি। সর্বদা তাদের সঙ্গী হয়ে ছিলাম মাত্র দশটা-পাঁচটা নয়, শুধু তাদের নির্দিষ্ট পাঠের মধ্যে নয়—তাদের আপন-আপন অন্তরের মধ্যে তাদের জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছি। কোনো নিয়মের দ্বারা তারা পিষ্ট না হয় এই আমার মনে অভিপ্রায় ছিল। এই চেষ্টায় সঙ্গী পেয়েছিলুম কিশোর কবি সতীশচন্দ্রকে—শিক্ষাকে তিনি আনন্দে সরস করে তুলতে পেরেছিলেন, সেক্সপীয়ারের মতো কঠিন বিষয়কে তিনি অধ্যাপনার গুণে শিশুদের মনে মুদ্রিত করে দিতে পেরেছিলেন। তারপরে ক্রমশ নানা ঋতু-উৎসবের প্রচলন হয়েছে, আপনার অজ্ঞাতসারে প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের আনন্দের যোগ এই উৎসবের সহযোগে গড়ে উঠবে এই আমার লক্ষ্য ছিল।"—বিশ্বভারতী ১৩৪২

কবি গোড়ার দিকে এ বিদ্যালয়ে একজন হেডমাস্টারও নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি কিণ্ডারগার্টেন-প্রণালীতে শিক্ষা-প্রবর্তনে উৎসাহী হন। "নানা ছক বেঁধে নিয়ম মানিয়ে ফল আদায় করবেন, এই তাঁর ঝোঁক ছিল। ছাত্রদের মন জানবার আগ্রহ ছিল তাঁর কম। তাদের মধ্যে উৎসাহ সঞ্চার করা তাঁর দ্বারা হয়ে উঠল না। তাঁকে

বিদায় দিতে হল।" যে-সব শিক্ষক ছাত্রদের ভালোবাসতেন অথচ লেখাপড়ায়ও সাহায্য করতেন প্রচুর, তাঁদের কবি জানতেন এবং নানাস্থলে সে-সব আদর্শ শিক্ষকের কথা তিনি দরদের সঙ্গে উল্লেখ করে গেছেন। শান্তিনিকেতনের এরূপ এক-জন শিক্ষাব্রতী ছিলেন স্বর্গত জগদানন্দ রায়। কবি লিখেছেন "একজন ছাত্রকে কোনো শিক্ষক তার এক বেলার আহার বন্ধ করে দণ্ডবিধান করেছিলেন। এই শাসনবিধির নিষ্ঠুরতায় তাকে (জগদানন্দ রায়কে) অশ্রুবর্ষণ করতে দেখেছি।"

—আশ্রমের রূপ ও বিকাশ ২, পৃ ২৯

গোড়াকার এই দিনগুলিতে তাঁর বিদ্যালয়ের কাজ বাংলাদেশের সীমা ছাড়িয়ে যাবে বলে কবি ভাবতে পারেননি। তিনি লিখেছেন,—"আমার প্রথম উদ্দেশ্য ছিল বাঙালীর ছেলেরা এখানে মানুষ হবে, রূপে রসে গন্ধে বর্ণে চিত্রে সংগীতে তাদের হৃদয়শতদল পদ্মের মতো আনন্দে বিকশিত হয়ে উঠবে।"—বিশ্বভারতী

তাঁর মন তখন স্বদেশের হিতচিন্তা ও গৌরবের ধ্যানে নিয়োজিত। আশ্রমের পরিচালনা-প্রণালী নির্দেশ করতে গিয়ে জনৈক শিক্ষককে তিনি লিখলেন,— "স্বদেশকে লঘুচিত্তে অবজ্ঞা, উপহাস, ঘৃণা—এমন কি, অন্যান্য দেশের তুলনায় ছাত্ররা যাহাতে খর্ব করিতে না শেখে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে চাই। আমাদের দেশের যে মহত্ত্ব ছিল সেই মহত্ত্বের মধ্যে নিজের প্রকৃতিকে পূর্ণতা দান করিতে পারিলেই আমরা যথার্থভাবে বিশ্বজনীনতার মধ্যে উত্তীর্ণ হইতে পারিব, নিজেকে ধ্বংস করিয়া অন্যের সহিত মিলাইয়া দিয়া কিছুই হইতে পারিব না—অতএব, বরঞ্চ অতিরিক্ত মাত্রায় স্বদেশাচারের অনুগত হওয়া ভালো, তথাপি মূঢ়ভাবে বিদেশীর অনুকরণ করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করা কিছু নহে।"

স্বদেশী-যুগ দেখা দিয়েছে। দেশের ছাত্রেরা দেশের ক্ষতিজনক অপমানকর রাষ্ট্র-নির্দেশের প্রতিবাদে বয়কট-আন্দোলনে যোগ দিয়ে দলে-দলে বেরিয়ে পড়েছে স্কুল-কলেজ থেকে। সে সময় রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় ছাত্রদের এই বয়কট-আন্দোলন সমর্থন করে বলেন যে, "অধ্যয়নই যে ছাত্রজীবনের প্রধান কর্তব্য এবং অধ্যয়নে যতই অবহিত হইতে পারা যায় ততই যে সফলতা লাভের বেশি সম্ভাবনা, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু এ কথাও ঠিক যে, সকল দেশেই বিশেষ সংকটের সময় এ নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়া থাকে। তখন বয়স্কেরা ব্যবসা ছাড়িয়া, যুবকেরা আমোদ-প্রমোদ ছাড়িয়া, ছাত্রেরা অধ্যয়ন ছাড়িয়া আন্দোলনে যোগদান করিয়া থাকেন। সর্বত্রই এইরূপ ঘটে, এবং এইরূপ ঘটাই স্বাভাবিক। বর্তমান সময়ে আমরা আমাদের মধ্যে নবজীবনের একটা উত্তেজনা অনুভব করিতেছি। বৃদ্ধেরাও বিষয়কর্ম

পরিত্যাগ করিয়া এমন উৎসাহের সহিত বর্তমান আন্দোলনে মাতিয়া গিয়াছেন যে তাঁহাদের আবার যদি কোনো বৃদ্ধতর অভিভাবক থাকিতেন, তবে তাঁহারা নিঃসন্দেহে বলিতেন যে, ইহাদের এই কাজ বৃদ্ধোচিত হইতেছে না।

"ছাত্রগণ এ-আন্দোলনে যোগ দিয়াছেন, তাহা নিতান্ত স্বাভাবিক, বিশেষত আমাদের দেশে।" রবীন্দ্র-রচনাবলী ১২ পৃ ৬২৭

ছাত্রেরা সাময়িক আন্দোলনে যোগ দিবে কি না এ সম্বন্ধে তিনি (কবি) তাঁহার পূর্ব-প্রকাশিত মতের পুনরুক্তি করিয়া বলেন যে "ছাত্রজীবনে যদি কাহারও স্বদেশের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষার সহিত পরিচয় না হয়, তবে পঁচিশ বৎসর বয়সের পরে যে তাহা কল্যাণকর হইতে পারে না।"—রবীন্দ্র-রচনাবলী ১২ পৃ ৬২৮

কালক্রমে কবির এ অভিমতের পরিবর্তন হয়। কিন্তু এই পর্বটি সম্বন্ধে 'রবীন্দ্র-জীবনী'কার লিখেছেন,—"বাঙালীর কাছে সেদিন দেশ সত্যই মাতৃরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল, এবং রবীন্দ্রনাথ যে সেই মহাযজ্ঞে শক্তি-মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা দেশমাতৃকার বন্দনা করিয়াছিলেন, এ কথা কবির অস্বীকৃতি বা দেশবাসীর বিস্মৃতি দ্বারা অপ্রমাণিত হইবে না।" (রবীন্দ্রজীবনী ২য় সং ২য় খণ্ড পৃ ১২৮) অসহযোগ-আন্দোলনের যুগে ছাত্র-গণ যখন স্কুল-কলেজ বর্জন করে, তখন কবিকে 'শিক্ষার মিলন'-এর বাণী প্রচারে ব্যাপৃত দেখা যায়। (১৫ আগস্ট ১৯২১) এর তিন বছর আগে থেকে কবির কাছে শিক্ষার মধ্য দিয়ে সহযোগের সাধনাই মুখ্য হয়ে ওঠে। দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিশ্বের নানা দেশ ও নানা জাতির সাংস্কৃতিক পরিচয় সংগ্রহ ও সমবায়ের কাজ গ্রহণ ক'রে কবি 'বিশ্বভারতী' নামক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। (২৩ ডিসেম্বর ১৯১৮)

তবে সহসা একেবারেই সে-পর্যায়ে কাজ পৌঁছায় নাই। বাংলাদেশের সীমা পেরিয়ে গিয়ে সর্ব-ভারতীয় ক্ষেত্রের যোগ ঘটে আগে। নূতন প্রণালীর শিক্ষাকেন্দ্র 'বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে'র নাম নানা প্রদেশে শ্রদ্ধা ও আগ্রহের সৃষ্টি করে। ১৩২৫ সনে বিদ্যালয়ে গুজরাটী এক দল ছাত্র আসে। তার আগে স্বদেশী-আন্দোলনের বাস্তব অভিজ্ঞতাও মনের ধারণাকে পরিণতি দানে সাহায্য করে। সাম্প্রদায়িক ভেদদৃষ্টি দেশের কল্যাণের পক্ষে অন্তরায় হয়ে দেখা দিল। আত্মসংগঠনের অভাবও ছিল আত্যন্তিক। পত্রে কবি লিখছেন, "পূর্ব-পশ্চিম রাজা-প্রজা সকলকেই ভারতবর্ষ সকল প্রকার বিরুদ্ধতার ভিতরেও এক ক্ষেত্রে আকর্ষণ করবার জন্য চিরদিন চেষ্টা করেছে—এই তার ধর্ম, এই তার কাজ; অন্যদেশের পলিটিক্যাল ইতিহাস থেকে এ সম্বন্ধে আমি কোনো শিক্ষা নিতে প্রস্তুত নই, আমাদের ইতিহাস স্বতন্ত্র। আমাদের দেশে মনুষ্যত্বের একটি উদার অতি বিরাট ইতিহাস সৃষ্টির আয়োজন

চলছে, এই আমার বিশ্বাস—যেমন ইংরেজ পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গকে সত্যই স্বতন্ত্র দেবার মালিক নয়, তেমনি আমরাও রাখিবন্ধনের গণ্ডি দ্বারা ভারতবর্ষে কেবল আমাদের মনের মতো জাতিকেই গড়ব এবং অন্যকে বর্জন করব তা চলবে না।… কষ্ট পেয়ে, দুঃখ পেয়ে সর্বস্ব হারিয়েও সকলকে বাঁধব সকলকে নিয়ে এক হব—এবং একের মধ্যে সকলকেই উপলব্ধি করব। বঙ্গবিভাগের বিরোধ ক্ষেত্রে এই যে রাখিবন্ধনের দিনের অভ্যুদয় হয়েছে, এর অখণ্ড আলোক এখন এই ক্ষেত্রকে অতিক্রম ক'রে সমস্ত ভারতের মিলনের সুপ্রভাত-রূপে পরিণত হোক।" মানুষে-মানুষে অখণ্ড যোগের তত্ত্বটিকে সত্যভাবে হৃদয়ংগম করতে পারলে তবেই নানা দেশের নানা জাতির মানুষ নানা গণ্ডির মধ্যে থেকেও পরস্পরকে আত্মীয় ব'লে অনুভব করতে পারে। সে-ভাব মনে থাকলে, সহযোগের পথ সহজ হয়ে আসে। বিরুদ্ধতার কারণ কমে যায়। সহ্য ধৈর্য দেখা দিয়ে পারস্পরিক উন্নতিতে সকলের উৎসাহ জাগিয়ে তোলে। জীবনের সার জিনিস টিকে থাকে মানুষের সংস্কৃতিতে। তারই অনুশীলন দ্বারা সমবায়-প্রবণ নূতন সমাজ সৃষ্টি সম্ভব হতে পারে। আনন্দময় প্রগতির দিন আসবে, সকলের জন্য সকলের মিলনকে ভিত্তি ক'রে,—তার থেকেই। মানুষের ইতিমূলক এই সংস্কৃতি-সাধনার প্রেরণাটি ভারতবর্ষের ইতিহাস থেকে কবি লাভ করেন। এদেশে নানা কালে নানা জাতির আগমন ও তাদের বিচিত্র দানের সমন্বয়কে তিনি ভাবীযুগের বিশ্বমিলনের ভূমিকা বলে বিধাতৃনির্দিষ্ট বিধানরূপেই গ্রহণ করেন। ভারতবর্ষের এই উপলব্ধি থেকে বিশ্বভারতী স্থাপনের ভূমিকা যেদিন মনের মধ্যে প্রস্তুত হচ্ছে, সেই পর্বে তিনি বলেন,—"ভারতবর্ষ কাহারও নিজস্ব সম্পত্তি নহে, এবং এক দিন যে কোনো-এক বিশিষ্ট জাতি তাহার সর্বময় কর্তা হইয়া বসিবে তাহাও নহে। ভারতবর্ষের ইতিহাস স্বত্বের ইতিহাস নহে, তাহা সত্যের ইতিহাস। যে মহান সত্য নানা আঘাত-সংঘাতের মধ্যে দিয়া পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, আমাদিগকে তাহারই সাহায্য করিতে হইবে, ব্যক্তি-বিশেষের বা সমাজবিশেষের কর্তৃত্বলাভের চেষ্টায় মর্যাদা কিছু নাই। ভারতবর্ষকে একটি অপূর্ব পরিপূর্ণাকারে গড়িয়া তুলিতে হইবে। আমরা তাহার একটি উদাহরণ মাত্র একথা যেন মনে রাখি। আমরা যদি দূরে দূরে থাকি বা নিজের স্বাতন্ত্র্যে খণ্ডাকারে প্রকাশিত হইতে চাই—সে-নির্বুদ্ধিতার জন্য আমরাই দায়ী। আমার যেটুকু মিলাইতে পারিব সেইটুকুই সার্থক হইবে। যেটুকু গণ্ডিবদ্ধ সেটুকু নিরর্থক, এবং তাহার নাশ অবশ্যম্ভাবী।"—প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ১৩১৫

কবির 'মহাভারতবর্ষ গঠনে'র প্রেরণার মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের সম্মিলনে

বিশ্বযোগের কথার উদয় হচ্ছে। জ্ঞানের সাধনা সকলকে মেলাবে, তার সূচনা তিনি এদেশে আধুনিক কালেও দেখতে পেয়ে লিখছেন—

"আজ মহাভারতবর্ষ গঠনের ভার আমাদের উপর। সমুদয় শ্রেষ্ঠ উপকরণ লইয়া আজ আমাদের এক মহা-সম্পূর্ণতাকে গঠিত করিয়া তুলিতে হইবে। গণ্ডিবদ্ধ থাকিয়া ভারতের ইতিহাসকে যেন আমরা দরিদ্র করিয়া না তুলি।

"ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ অধুনাতম মনীষিগণ এ কথা বুঝিয়াছিলেন, তাই তাহারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে মিলাইয়া কার্য করিয়া গিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ রামমোহন রায়, রাণাড়ে এবং বিবেকানন্দের নাম করিতে পারি। ইঁহারা প্রত্যেকেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাধনাকে একীভূত করিতে চাহিয়াছেন; ইহারা বুঝাইয়াছেন যে, জ্ঞান শুধু এক দেশ বা জাতির মধ্যে আবদ্ধ নহে; পৃথিবীর যে-কেহ জ্ঞানকে মুক্ত করিয়াছেন, জড়ত্বের শৃঙ্খল মোচন করিয়া মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তিকে উন্মুখ করিয়া দিয়াছেন, তিনিই আমাদের আপন—তিনি ভারতের ঋষি হউন বা প্রতীচ্যের মনীষী হউন—তাঁহাকে লইয়া আমরা মানব মাত্রেই ধন্য।

"বঙ্কিমচন্দ্রও অসীম প্রতিভাবলে বাংলা-সাহিত্যে পশ্চিম এবং পূর্বের মিলন সাধন করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যকে পূর্ণ পরিণতির পথে অগ্রসর করাইয়া, কম সার্থক করিয়া তোলেন নাই।

"অতএব আজ আমাদের এই মিলনের সাধনা করিতে হইবে, রাজনৈতিক বল লাভের জন্য নহে, মনুষ্যত্বলাভের জন্য স্বার্থবুদ্ধির পথ দিয়া নহে, ধর্মবুদ্ধির মধ্য দিয়া।"

—প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, ১৩১৪

নানা প্রবন্ধ ও ভাষণের মধ্যে তখন এইভাবের কথাই ছড়িয়ে আছে। এক স্থলে লিখেছেন—"ভারতবর্ষের সত্য হচ্ছে জ্ঞানে অদ্বৈততত্ত্ব, ভাবে বিশ্বমৈত্রী এবং কর্মে যোগ সাধনা। ভারতবর্ষের অন্তরের মধ্যে যে উদার তপস্যা গভীরভাবে সঞ্চিত হয়ে রয়েছে সেই তপস্যা আজ হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ ও ইংরেজকে আপনার মধ্যে এক করে নেবে বলে প্রতীক্ষা করছে—দাসভাবে নয়, জড়ভাবে নয়,—সাত্ত্বিকভাবে সাধকভাবে। যতদিন তা না ঘটবে ততদিন আমাদের দুঃখ পেতে হবে, অপমান সইতে হবে।"

কবির চিন্তাধারা ও কাজের পরিকল্পনার প্রগতির মূলে তাঁর পারিবারিক-সূত্রে প্রাপ্ত উপনিষদের উদার প্রভাবের কথাও আমাদের স্মরণ রাখতে হবে। কিন্তু দেশের ঐতিহ্য এবং বর্তমান ঘটনার প্রভাব ছাড়াও তাঁর শিক্ষাকেন্দ্রের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাও যে একই সঙ্গে ঐ সময়ে তাঁকে নিগূঢ়ভাবে বিশ্বদৃষ্টিলাভে উদ্‌বুদ্ধ করেছে, সে-কথা জানা যায় তাঁর নিজেরি উক্তিতে। দেশ-কালের ব্যবধান দূর হয়ে গেছে।

ঘটনার প্রভাবে বা বিচার-বিবেচনার ফলে বহুদিনে যে সত্যের ধারণা জন্মেছে, বেদনার মধ্যে তিনি সে সত্যকে পেয়েছেন কত সহজে। বলেছেন,—

"এখানকার বাঙালীর ছেলেরা তাদের কলহাস্যের দ্বারা আমার মনে একটি ব্যাকুল চঞ্চলতার সৃষ্টি করল। আমি স্তব্ধ হয়ে বসে এদের আনন্দপূর্ণ কণ্ঠস্বর শুনেছি। দূর থেকে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে মনে হয়েছে যে, এই আনন্দ, এ যে নিখিল মানবচিত্ত থেকে বিনিঃসৃত অমৃত-উৎসের একটি ধারা। আমি এই শিশুদের মধ্যে সেই স্পর্শ পেয়েছি। বিশ্বচিত্তের বসুন্ধরার সমস্ত মানব-সন্তান যেখানে আনন্দিত হচ্ছে, সেই বিরাট ক্ষেত্রে আমি হৃদয়কে বিস্তৃত করে দিয়েছি। যেখানে মানুষের বৃহৎ প্রাণময় তীর্থ আছে, যেখানে প্রতিদিন মানুষের ইতিহাস গড়ে উঠেছে, সেখানে আমার মন যাত্রা করেছে।" —বিশ্বভারতী ১৩২৮

শান্তিনিকেতনের এই ছেলেরা গুরুদেবের আদর্শ ও কর্মধারার তাৎপর্য কতটুকু তখন বুঝেছিল, তার আভাস দেয় তাদের হাতে-লেখা পত্রিকার একটি লেখায়—'প্রভাত' নববর্ষ বৈশাখ ১৩২৪ সংখ্যায় (বাগান) লিখিত হয়েছে,—

"২৫ শে বৈশাখ আমাদের পূজনীয় আশ্রম-আচার্যদেবের জন্মদিন। এ বৎসরে তিনি ষট্-পঞ্চাশৎ বৎসর অতিক্রম করিলেন। কিন্তু গুরুদেবের এত বড় সম্মান লাভের প্রধান কারণ আমাদের মনে হয় এই আশ্রম-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা।

"কিন্তু গুরুদেব শুধু তো কবি না—যদিও অনেকে বলেন যে রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি। আমার মনে হয় যে গুরুদেব কবি বটে কিন্তু তিনি যে শ্রেষ্ঠ কাজ করিয়াছেন এ রকম কাজ দেশে আরো হলে যথেষ্ট উপকার হয়। স্বদেশীর সময় তিনি শুধু দেশে ভাব দেন নাই, তিনি নূতন-নূতন কাজের 'প্ল্যান' (plan) করিয়া নিজের জমিদারিতে খাটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু স্বদেশী-আন্দোলনের সময় তিনি বুঝিতে পারিলেন যে সর্বাপেক্ষা দরকার নিজের জীবনকে গড়িয়া তোলা। তিনি আন্দোলনের গোলমাল ছাড়িয়া আশ্রমে আসিলেন। তিনি মনে করিলেন যে, দেশের সব চেয়ে বড় কাজ একটি আশ্রম-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা। স্বদেশী-আন্দোলনের উত্তেজনা দেশকে বড় করিয়া তুলিবে না।

"গুরুদেব তাই চেষ্টা করিতেছিলেন যাহাতে দেশের ছেলেরা সংস্কারের দাসত্ব হইতে মুক্তি পাইয়া স্বাধীন মনুষ্যত্বের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিতে পারে।"

—শান্তিনিকেতনের অপ্রকাশিত অধ্যায়, শ্রীসাধনা কর

রবীন্দ্রনাথ ১৯১৩ সনে নোবেল-প্রাইজ পেয়ে বিশ্ববিখ্যাত হন। তার আগে থাকতেই শান্তিনিকেতনে বিশ্বমানবের বিচিত্র সাধনাকে কার্যত সমন্বিত করার চেষ্টা

শুরু হয়, কবির প্রত্যক্ষ-প্রবর্তনায়। ১৯০১ সনের শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়ের একটি বিবরণ 'রবীন্দ্র-জীবনী' (২য় সং ২য় খণ্ড পৃ ২৩৩-৩৪) থেকে এখানে সংকলিত হল—

"অগ্রহায়ণ মাসের গোড়ায় বিদ্যালয় খুলিবার সঙ্গে-সঙ্গেই কবি শিলাইদহ হইতে শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন। এবার আশ্রমে ফিরিয়া কবি বিদ্যালয়ের নানা প্রকার বিধিব্যবস্থা লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত। বিদ্যালয়-পরিচালনার নানাপ্রকার নিয়ম-নিষেধ, অপিস-পত্তন, নানা প্রকার রিপোর্ট বা প্রতিবেদন পেশ প্রভৃতির ব্যবস্থা করিতেছেন। লাইব্রেরির পাশে একটি ঘর ছিল সেইখানে হইল অপিস। তথায় কবি নিয়মিত বসেন, স্কুলের সমস্ত খুঁটিনাটি কাজ-কর্ম দেখেন, এই কার্যে তাঁহার প্রধান সহায় হইলেন অধ্যাপক জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। জ্ঞানেন্দ্রনাথ নলহাটির অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র; অঘোরনাথ আশ্রম-প্রতিষ্ঠার পর বহু বৎসর শান্তিনিকেতনের কর্মকর্তা ছিলেন। জ্ঞানেন্দ্রনাথ বি, এ, পাশ (১৯০৮) করিবার কয়েক মাস পরে (১৯০৯ জানুয়ারি) বিদ্যালয়ের শিক্ষক হইয়া আসেন। তিনি আশ্রমের কর্মশালা সর্বপ্রথম সুব্যবস্থিত করেন।" এখানে বলা আবশ্যক, আশ্রমে যে দৈনিক কাজের ক্রমপর্যায়-মতো সময় ভাগ ক'রে ঘণ্টা-বাজাবার রীতি রয়েছে, এ ব্যবস্থারও প্রচলন করেন এই জ্ঞানেন্দ্রনাথই।

'রবীন্দ্র-জীবনী'-কার লিখছেন, "এই সময়ে বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য 'সর্বাধ্যক্ষ' পদের সৃষ্টি হয়। প্রথম 'সর্বাধ্যক্ষ' হন জগদানন্দ রায়। 'সর্বাধ্যক্ষ' বর্তমানের কর্মসচিবের ন্যায় পদ, তবে তিনি অধ্যাপক-মণ্ডলীর দ্বারাই নির্বাচিত হইতেন ও অন্যান্য শিক্ষকদের ন্যায় অধ্যাপনা করিতেন; অপিসের কাজের জন্য কোনো বিশেষ উপরি বেতন তিনি পাইতেন না। এ ছাড়া ছাত্র-পরিচালনার জন্য তিনটি বিভাগ —আদ্য, মধ্য ও শিশু—পৃথক করা হয়। প্রত্যেক বিভাগের জন্য এক-একজন অধ্যক্ষ নির্বাচিত হইতেন। শিক্ষাদি-ব্যাপার সর্বাধ্যক্ষ সাধারণভাবে দেখা-শুনা করিতেন। তবে আসল ভার থাকিত বিষয়ের পরিচালকদের উপর। ইংরেজি, বাংলা, সংস্কৃত ইতিহাস, ও বিজ্ঞানের পৃথক-পৃথক পরিচালক ছিলেন; তাঁহাদের কাজ ছিল নিজ বিষয়ের প্রত্যেক ছাত্রের পাঠোন্নতি লক্ষ্য রাখা। ইহারা মাসান্তে প্রত্যেক অধ্যাপকের নিকট হইতে তাঁহাদের নিজ-নিজ বর্গের পাঠচর্চা, প্রত্যেক ছাত্রের উন্নতি বা অবনতির বিস্তারিত সংবাদ, মাসিক বা সাপ্তাহিক পরীক্ষার ফল লিপিবদ্ধ-আকারে আদায় করিতেন। সেই প্রতিবেদন অথবা তাহাদের এই সব রিপোর্ট আলোচিত হইত। এখানে একটি কথা বলা দরকার। তখনো বিদ্যালয়ে শ্রেণী বা Class-প্রথা প্রবর্তিত হয় নাই—(Group) প্রথা ছিল। বর্গের নামকরণ করা

হইত—ছাত্রদের নাম দিয়া যেমন, অমিতাভ-বর্গ।" এখানে দেখা যাচ্ছে, কবি শান্তিনিকেতনের শিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্রদের মর্যাদা রক্ষা করতে বিশেষভাবে যত্নবান ছিলেন। আরো নানা ব্যবস্থায় সে কথা সুস্পষ্ট করে জানা যায়,—'আশ্রমসম্মিলনী'র কার্যপ্রণালী তার অন্যতম নিদর্শন।

'রবীন্দ্র-জীবনী'তে রয়েছে, "এই বর্গ-প্রথার বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, সকল ছাত্র সকল বিষয়ে একই বর্গে না-ও পড়িতে পারিত। কোনো ছাত্র বাংলায় ভালো বলিয়া এক বর্গে পড়ে, কিন্তু ইংরেজিতে কাঁচা বলিয়া ইংরেজি পড়ে অন্য বর্গে। ম্যাট্রিকের শেষ দুই বৎসর কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য পড়ানো হইত। বিদ্যালয়ে কখনো বাজারের পাঠ্য-পুস্তক পড়ানো রীতি ছিল না। Murche Science Readers, Highroads of History, Highroads of Literature, Britain and her neighbours প্রভৃতি শ্রেণীর বই নির্বাচন করা হইত ইংরেজির জন্য। উপরের ক্লাসে ইংরেজি-সাহিত্য অজিতকুমার পড়াইতেন। তখন সংস্কৃত পড়াইতেন বিধুশেখর ও ক্ষিতিমোহন; বিজ্ঞানাগারে রীতিমতো পরীক্ষা দেখাইয়া বিজ্ঞান পড়াইতেন জগদানন্দ রায়। সন্ধ্যার পর বিরাট এক টেলিস্কোপের সাহায্যে মাঝে-মাঝে আকাশের গ্রহনক্ষত্র দেখানো হইত। সন্ধ্যার পর প্রথম দুই বর্গের ছাত্রদের ছাড়া অন্যদের জন্য নিয়মিত 'বিনোদন'-পর্ব বসিত; এই-সব সময়ে অধ্যাপকেরা সাহিত্যের গল্প ছাত্রদের জন্য মনোরম করিয়া বলিতেন। এ প্রথা বহুকাল হইতে ছিল। ছাত্রদের সাহিত্যসভা হইত মঙ্গলবারে সন্ধ্যার পর—সাহিত্য, ভ্রমণ, পর্যবেক্ষণ-সংক্রান্ত প্রবন্ধ পঠিত হইত। গান বা নৃত্যে সভাগুলি তখনো ভারাক্রান্ত হয় নাই।

"ছাত্রদের ব্যক্তিগত পড়াশুনার উপর যেমন নজর দেওয়া হইত, স্বাস্থ্য সম্বন্ধেও সেইরূপ। বুধবারে মন্দিরের পর ছাত্ররা শ্রেণীবদ্ধভাবে হাসপাতালে যাইত। সেখানে প্রত্যেক ছাত্রের ওজন লওয়া হইত ও পাকা-খাতায় লেখা হইত। দুই সপ্তাহ পর-পর কাহারও ওজন কমিলে তখনই তদারক শুরু হইত। সকল ছাত্রের পক্ষে প্রাতে স্নান ও ব্যায়াম ও বৈকালে ক্রীড়া আবশ্যক ছিল। এ ছাড়া প্রত্যেক বিভাগের ছাত্ররা পালা করিয়া বাগানের কাজ করিত। এই বাগানের কাজে উৎসাহী ছিলেন সত্যজ্ঞান ভট্টাচার্য নামে একজন শিক্ষক। তাঁহার মৃত্যুর পর পুরাতন-হাসপাতালের সম্মুখ দিয়া যে-একটি রাস্তার চিহ্ন আছে, উহার নাম দেওয়া হয় 'সত্যজ্ঞান পথ'। সন্তোষচন্দ্র আমেরিকা হইতে আসিয়া আশ্রমের কাজে যোগদান করিবার পর হইতে ছাত্রদের মধ্যে ড্রিল প্রবর্তিত হয়। সেই mass

drill একটা দেখিবার জিনিস ছিল; মাঝে মাঝে তাহাদের দিয়া fire drill করানো হইত। আমেরিকায়-শেখা yell তিনি ছাত্রদের শেখান; দুই শত ছাত্রের সমবেত চীৎকার রীতিমত কম্প সৃষ্টি করিত।

"রবীন্দ্রনাথ এই সমস্ত কাজের খুঁটিনাটি সংবাদ রাখিতেন এবং প্রায় প্রত্যেক বিষয়ের জন্য নিয়মাবলী তৈয়ারি করিয়া দিতেন। তবে এই শ্রেণীর কাজ কবির পক্ষে দীর্ঘকাল করা সম্ভব ছিল না, তিনি কর্মান্তরে মনোনিবেশ করিলে অথবা স্থানান্তরে গমন করিলেই কর্মের সমস্ত সুর নামিয়া পড়িত—নিয়ম-পালনের দিকে হয়তো নিষ্ঠা থাকিত, কিন্তু প্রাণ চলিয়া যাইত; চারিদিকে স্বাভাবিক শৈথিল্য নগ্ন মূর্তিতে দেখা দিত।"

'রবীন্দ্র-জীবনী'কারের এই মন্তব্য থেকে অনুমান করা শক্ত নয় যে, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বিদ্যালয়ের জীবনীশক্তির সঞ্চালক। দেশের অন্যান্য স্থানের দশটা প্রতিষ্ঠানের মতো সাধারণ শৈথিল্য নিয়েও এবং আকারে এত ক্ষুদ্র হয়েও কবির সাক্ষাৎ সান্নিধ্য, ভাবের ঐন্দ্রজালিক স্পর্শ এবং বিচিত্র কর্মধারা-প্রবর্তনের বৈশিষ্ট্যের গুণেই যে এত শীঘ্র এ-প্রতিষ্ঠানটি প্রসার লাভ করল, সে কথা অমূলক নয়। এরূপ মহৎ ভাব ও কর্মকৌশল-প্রবর্তনার একটি ঘটনা যা এ সময়ে ঘটেছিল, 'রবীন্দ্র-জীবনী'-কারের বর্ণনায় অতঃপর তারি উল্লেখ মিলে। তিনি লিখেছেন, কবি "বিদ্যালয়ের কর্মব্যবস্থায় যেমন পরিবর্তন আনিলেন, আশ্রমের পরম্পরাগত আদর্শের মধ্যে কিছু-কিছু অভিনবত্ব প্রবর্তন করিলেন। এবার পৌষ-উৎসবে 'বড়দিন' খৃষ্টোৎসব হইল; কবি স্বয়ং মন্দিরে উপাসনা করিলেন। অনেকের ধারণা যে, এণ্ড্রুজ ও পিয়ার্সন সাহেবের আগমনের ফলে আশ্রমের এই উদার পন্থা অবলম্বিত হয়, তাহা যথার্থ নহে। এই সময়ে অজিতকুমার চক্রবর্তী 'খৃষ্ট' নামে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক রচনা করেন, রবীন্দ্রনাথ তাহার নাতিদীর্ঘ ভূমিকায় খৃষ্ট-জীবনের মূলগত কথাটি বলেন। এই বৎসর ফাল্গুনী-পূর্ণিমায় মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব উপলক্ষ্যেও মন্দিরে কবি ভাষণ দান করেন। এই বৎসর হইতে স্থির হয় যে, অতঃপর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষগণকে উপযুক্ত দিনে বা তিথিতে স্মরণ করা হইবে। এতদিন শান্তিনিকেতন-মন্দিরে আদি-সমাজীয় পদ্ধতি-অনুযায়ী উপাসনাদি চলিয়া আসিতেছে, ঔপনিষদ-ধর্ম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্মের বিশেষ আলোচনা হয় নাই। *এইবার বিশ্বমানবের বিচিত্র সাধনাকে কবি আশ্রমে স্বীকার করিয়া লইলেন। এই* সব তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের ও সামাজিক মতের ক্রম-অভিব্যক্তির পরিচায়ক।" শুধু তাই নয়, এটি যে ক্ষুদ্র বিদ্যালয়ের থেকে বিশ্বভারতীতে অভিব্যক্তির উপযোগী

সাংস্কৃতিক যোগের সূচনারও পরিচায়ক, এতে সন্দেহ নেই। শান্তিনিকেতনের শিক্ষার উৎকর্ষজ্ঞাপক এরূপ বৈশিষ্ট্য অন্য দিক দিয়েও অনেক-কিছু রয়েছে। সাধারণ খেলাধুলা, নৃত্য-গীত ও নাট্যাভিনয় এবং ঋতু-উৎসবাদির মধ্য দিয়ে শিক্ষাকে একই কালে সৌন্দর্য, সংযম ও স্বাধীনতায় মিলিয়ে কিভাবে আনন্দময় করে তোলা যায়, তারও পথ দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই শিক্ষাকেন্দ্র থেকেই। এ বিষয়ে 'রবীন্দ্র-জীবনী'কার লিখেছেন,—"রবীন্দ্র-শিক্ষাদর্শনের মূলতত্ত্ব হইতেছে স্বাধীনতা ও আনন্দের মধ্য দিয়া শিশুমনের সুকুমার বৃত্তিগুলির উন্মোচন—বিদ্যায়তন সেই অনুকূল অবস্থা সৃষ্টির ক্ষেত্র মাত্র। কবির মতে স্বাধীনতা নিয়মহীনতা নহে। সংযমও নিরানন্দময় নীতি-পালন নহে; আনন্দহীন সংযম ও বিচার-বিহীন আচার পালন নঙাত্মক গুণ মাত্র, তাহার দ্বারা বৃহৎ সৃষ্টি সম্ভবে না।

"এই কারণে আধুনিক শিক্ষার ক্ষেত্রে নাট্য ও ক্রীড়ার স্থান এত ব্যাপক। এই উভয় ক্ষেত্রে ব্যষ্টি বা ব্যক্তিকে সমষ্টির সহিত একযোগে, সংহত আবেগে কার্য করিতে হয়। স্বাধীনতার আনন্দময় রূপটি এইভাবেই প্রকাশ পায়। খেলা ও কাজ কঠোর নিয়ম-সংযমের মধ্যে সফল ও সুন্দর হয় বলিয়া আনন্দ কখনো উচ্ছৃঙ্খল উচ্ছ্বাসে পরিণত হইতে পারে না।" —রবীন্দ্র-জীবনী ২য় সং ২য় খণ্ড পৃ ১৭৬-৭৭

মনের 'আবরণ'-ঘুচানোর সাধনা আরেকভাবে কবি শান্তিনিকেতনের শিক্ষায় প্রবর্তিত করতে চেষ্টা করেছেন। সে চেষ্টা হয়েছে পঠন-পাঠনের দিকে। 'রবীন্দ্র-জীবনী'কার সে বিষয়ে লিখেছেন, "আমাদের দেহকে যেমন বৃথা আবরণে অকারণে আচ্ছাদিত করাটা সমাজের পক্ষে সভ্যতার প্রধান অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তেমনি বালকদের মনের উপর অপ্রয়োজনীয় জ্ঞান ও সংবাদ পুঞ্জীভূত করিয়া তাহাকে সভ্য বলিয়া অভিহিত করার চেষ্টায় ফল আরো মারাত্মক হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কাছে নূতন-শিক্ষা-আন্দোলনের দিনে এই কথাটিই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল যে, বই-পড়াটাই যে শিক্ষা, ছেলেদের মনে এই কুসংস্কার যেন জন্মিতে দেওয়া না হয়। বইয়ের দৌরাত্ম্য অত্যন্ত বেশি হইয়াছে। পুরাকালে গুরু শিষ্যকে মুখে-মুখেই শিক্ষা দিতেন, এবং ছাত্র তাহা খাতায় নহে, মনের মধ্যেই লিখিয়া লইত। এমনি করিয়া এক দীপশিখা হইতে আর-এক দীপশিখা জ্বলিত। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনের একটি বড়ো কথা হইতেছে এই মনের আবরণ ঘুচানোর সাধনা।" —রবীন্দ্র-জীবনী ২য় সং ২য় খণ্ড পৃ ১৫১

আজকের বুনিয়াদী-শিক্ষারও অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে 'মনের আবরণ ঘুচানো।' পুঁথির শিক্ষা কমিয়ে শিক্ষক যথাসম্ভব মৌখিক আলাপ-আলোচনার দ্বারাই

শিক্ষার্থীকে জ্ঞান-বিতরণ ক'রে থাকেন। কবি এ-প্রণালীতে শিক্ষা প্রবর্তন ক'রে শান্তিনিকেতনকে এ দেশে বহু পূর্বে আদর্শ করে রেখেছেন।

পরবর্তীকালে যখন 'বিশ্বভারতী' স্থাপিত হয়ে শান্তিনিকেতনে ছেলেমেয়ে উভয়শ্রেণীর জন্যেই সহশিক্ষা শুরু হল, তখনকার একখানি পত্রে কবির শিক্ষাপদ্ধতির আরেকটি বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ছাত্রছাত্রীদের প্রতি সন্দেহ ও শাসনের চেয়ে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা পোষণ করাই শ্রেয়।—এই ছিল তাঁর নীতি। তিনি লিখেছেন,—"আমাদের স্বভাবের মধ্যে আশঙ্কার কোনো কারণ নেই, এ কথা বলা অত্যুক্তি, কিন্তু তাকে নিয়ে বাইরে থেকে যত অতিরিক্ত বাঁধাবাঁধি করতে যাব ততই সেটা ব্যাধিতে এসে দাঁড়াবে। এই সংশয়কে অগ্রাহ্য করার দ্বারাই একে বিনাশ করা যায়। পরস্পরকে বিশ্বাস করার দ্বারাই সমাজের হাওয়া নির্মল হয়। · যাকে বিশ্বাস করিনে, সে বিশ্বাসের অযোগ্য হয়; যতই অযোগ্য হয়, ততই বাঁধন আরো কড়াক্কড় করতে হয়। মানবচরিত্রের স্খলন প্রাচীরের ভিতরে ও বাইরে সর্বত্রই আছে, ভিতরে তার উত্তেজনা আরো বেশি। বস্তুত আচারের দ্বারা মানুষের মনকে বিশুদ্ধ করা যায় না, বরঞ্চ তার বাড়াবাড়িতে চরিত্রের মূলে দুর্বলতা ও নিজের প্রতি অশ্রদ্ধা আসে। ভিতরের মানুষের পরেই দাবি রাখতে হবে, দারোয়ানের পরে নয়।…সংশয়-কণ্টকিত বেড়ার বাহুল্য করতে গেলেই ভিতরে মানুষের চিত্তবৃত্তিকে পশুর কোঠায় ফেলা হয়। আমি মেয়েদের স্নেহ করি, শ্রদ্ধা করি; এইজন্য তাদের আমি সন্দেহের কারাকুঠরির মধ্যে পৃথক রাখতে দেখতে ব্যথা পাই।…সংশয়ের চেয়ে মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাই বেশি কাজে লাগে। এই কাজে চাই চিরসহিষ্ণু অনুকম্পা।" —প্রবাসী ১৩৩৭ অগ্রহায়ণ

শান্তিনিকেতনের কর্মীদের পরিচালনা-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সহনশীল দৃষ্টি-ভঙ্গীর উদারতার পরিচয় মেলে একখানি পত্রে। সাময়িক ঘটনায় ক্ষোভের ছায়াপাত এতে যে কিছু না পড়েছে এমন নয়, তবু ধরে নেওয়া চলে, মোটামুটি তাঁর মনোভাবটি ছিল এই রকমই। তিনি এক সময়ে পিয়ার্সনকে লিখছেন,—

"In Santiniketan, some of my thoughts have become clogged by accumulations of dead matter." "I do not believe in lecturing or in compelling felloworkers in coercion ; for all true ideas must work themselves out through freedom, Only a moral tyrant can think that he has dreadfull power to make his thoughts prevail by means of subjection. It is absurd to imagine that you must create slaves in order to make your

ideas free. I would rather see them perish than leave them in the charge of slaves to be nourished. There are men who make idols of their ideas. and sacrifice humanity before their alters. But in my worship of the idea I am not a worship of Kali.

So the only course left open to me, when my felloworkers fall in love with the form and cease to have complete faith in the idea, is to go away and give my idea a new birth and create new possibilities for it. This may not be a practical method, but possibly it is the right one." —র-জী ২য় সং ২য় খণ্ড পৃ ৩৯৮

এইরূপ বহু আরো উদার ভাব ও কর্মধারার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয় রবীন্দ্রনাথের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষার দান-সৌধ বিশ্বভারতী বা বিদ্যা-সমবায় সাধনা। সকল দেশের সংস্কৃতিকে তিনি যে এনে মেলাবেন, তার ভূমিকায় আরো কয়েকটি ঘটনার যোগ উল্লেখযোগ্য।

৪

বিদ্যাসমবায় ঃ বিশ্বভারতী

ইতিপূর্বে নানা সময়ে জাপানের মনীষী ওকাকুরা, প্রতীচ্যের শিল্পী রোদেনস্টাইন, জার্মাণীর পণ্ডিত কাইজারলিং ইত্যাদির সঙ্গে কবির সাক্ষাৎ ঘটেছে; কবি বিলেত ও আমেরিকা ঘুরে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেছেন, ভাবুক ও আদর্শবাদী নানা মহলে নানা বিষয়ে আলাপ হয়েছে; আমেরিকা থেকে পত্রে জগদানন্দ বাবুকে লিখছেন (১৯১৩)—"আমার ইচ্ছা ওখানে (শান্তিনিকেতনে) দুই-একজন যোগ্য লোক এক-একটি ল্যাবরেটরি নিয়ে যদি নিজের মনে পরীক্ষার কাজে প্রবৃত্ত হন তাহলে ক্রমশ আপনিই বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি হবে। এখানে কয়েকজন খুব ভালো বাঙালী ছাত্র বিজ্ঞান ও দর্শন অধ্যয়ন করছেন। আমি যদি এঁদের মতো লোক দিয়ে ওখানে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বালোচনার একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে পারি তাহলে সেটা ক্রমশ খুব বড়ো হয়ে উঠতে পারে। এইটেই আমার অনেক দিনের সংকল্প—জ্ঞানানুশীলনের একটা হাওয়া বইয়ে দেওয়া চাই—সেই হাওয়া নিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করতে করতে ছাত্রদের মন আপনিই অলক্ষিতভাবে বিকাশ লাভ করতে পারবে।" এই সময়কার আরেকখানি পত্রে লিখেছেন,—"মানুষের শক্তির যতদূর বাড় হবার তা হয়েছে, এখন সময় এসেছে যখন যোগের জন্যে সাধনা করতে হবে। আমাদের

বিত্থালয়ে আমরা কি সেই যুগসাধনার প্রবর্তন করতে পারব না? মনুষ্যত্বকে বিশ্বের সঙ্গে যোগযুক্ত করে তার আদর্শ কি আমরা পৃথিবীর সামনে ধরব না?"

অতঃপর ১৩২২ সনে 'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধে কবি লিখেছেন—"আলোতে মানুষ মেলে, অন্ধকারে মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়। জ্ঞান মানুষের মধ্যে সকলের চেয়ে বড়ো ঐক্য। বাংলাদেশের এক কোণে যে-ছেলে পড়াশুনা করিয়াছে তার সঙ্গে য়ুরোপের প্রান্তের শিক্ষিত মানুষের মিল অনেক বেশি সত্য, তার দুয়ারের পাশের মূর্খ প্রতিবেশীর চেয়ে।"

"জ্ঞানে মানুষের সঙ্গে মানুষের এই যে জগৎজোড়া মিল বাহির হইয়া পড়ে, যে মিল দেশভেদ ও কালভেদকে ছাড়াইয়া যায়– সেই মিলের পরম প্রয়োজনের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাক, কিন্তু সেই মিলের যে পরম আনন্দ তাহা হইতে কোনো মানুষকেই কোনো কারণেই বঞ্চিত করিবার কথা মনেই করা যায় না।" এই জ্ঞানের দানপত্রে নিম্নসাধারণের জন্য ব্যবস্থা থাকা যে কত প্রয়োজন, সে সম্বন্ধেও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ ক'রে কবি বলেছেন,—"এমন কথা যারা বলে নিম্নসাধারণের জন্য যথেষ্ট শিক্ষার দরকার নাই, তাতে তাদের ক্ষতিই করিবে, তারা কর্তৃপক্ষদের কাছ হইতে এ কথা শুনিবার অধিকারী যে, বাঙালীর পক্ষে বেশি শিক্ষা অনাবশ্যক, এমন কি, অনিষ্টকর।"

জ্ঞানালোচনার কেন্দ্র প্রসারণের প্রতি কবির মনের অভিমুখীনতা একটি বিশেষ ঘটনায় বেগের সঙ্গে বাস্তবত কার্যে পরিণত হয়। পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী আশ্রমে তাঁর আশানুরূপ প্রশস্ততর সংস্কৃত-চর্চার ক্ষেত্র না পেয়ে স্বগ্রামে গিয়ে টোল খুলবার চেষ্টা করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে গবেষণার সুযোগ দিয়ে আশ্রমে ফিরিয়ে আনবার কথা ভাবতে থাকেন। এই থেকে তাঁর মনে 'বিশ্বভারতী'র পরিকল্পনা ক্রমে আরো পরিস্ফুট হয়ে প্রকাশ পেতে থাকে। তিনি সে-সময় 'বিত্থাসমবায়' প্রবন্ধে বলেন,—

"...আমাদের দেশে বিত্থাসমবায়ের একটি বড়ো ক্ষেত্র চাই, যেখানে বিত্থার আদান-প্রদান ও তুলনা হইবে, যেখানে ভারতীয় বিত্থাকে মানবের সকল বিত্থার ক্রমবিকাশের মধ্যে রাখিয়া বিচার করিতে হইবে।

"আমাদের বিত্থায়তনে বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান ও পার্শি বিত্থার সমবেত চর্চায় আনুষঙ্গিক ভাবে য়ুরোপীয় বিত্থাকে স্থান দিতে হইবে।

"পৃথিবীর সকল ঐক্যের যাহা শাশ্বত ভিত্তি তাহাই সত্য ঐক্য। সে ঐক্য চিত্তের ঐক্য, আত্মার ঐক্য। ভারতে সেই চিত্তের ঐক্যকে পোলিটিক্যাল

ঐক্যের চেয়ে বড়ো বলিয়া জানিতে হইবে; এই ঐক্যে সমস্ত পৃথিবীকে ভারতবর্ষ আপন অঙ্গনে আহ্বান করিতে পারে। অথচ, দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের বর্তমান শিক্ষা এমন যে, সেই শিক্ষার গুণেই ভারতীয় চিত্তকে আমরা তাহার স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতেছি না। লইবার জন্য অঞ্জলিকে বাঁধিতে হয়, দিবার জন্যও; দশ আঙুল ফাঁক করিয়া দেওয়াও যায় না, লওয়াও যায় না। ভারতের চিত্তকে একত্র সন্নিবিষ্ট করিলে তবে আমরা সত্যভাবে লইতেও পারিব।"

১৩২৬ সনে কবি লেখেন,—"মানব-সংসারে জ্ঞানালোকের দেয়ালি-উৎসব চলিতেছে। প্রত্যেক জাতি আপনার আলোটিকে বড়ো করিয়া জ্বালাইলে তবে সকলে মিলিয়া এই উৎসব সমাধা হইবে।"

"বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য কাজ বিদ্যার উৎপাদন, তাহার গৌণ কাজ সেই বিদ্যাকে দান করা। বিদ্যার ক্ষেত্রে সেই সকল মনীষীদিগকে আহ্বান করিতে হইবে, যাঁহারা নিজের শক্তি ও সাধনা দ্বারা অনুসন্ধান আবিষ্কার ও সৃষ্টির কার্যে নিবিষ্ট আছেন। তাঁহারা যেখানেই নিজের কাজে একত্র মিলিত হইবেন সেইখানে স্বভাবতই জ্ঞানের উৎস উৎসারিত হইবে, সেই উৎসধারার নির্ঝরিণীতটেই দেশের সত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইবে।"

প্রায় চৌদ্দ বছর পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের আদর্শ ব্যাখ্যা ক'রে 'শিক্ষার বিকীরণ' নামক বক্তৃতা দেওয়ার কালে এ বিষয়ে পাশ্চাত্য দেশের উদাহরণ দেখিয়ে কবি বলেছিলেন—"পাশ্চাত্য মহাদেশের অধিকাংশ দেশেই বিদ্যার এই অতিথিশালা বর্তমান। সেখানে স্বদেশী-বিদেশীর ভেদ নেই; সেখানে জ্ঞানের বিশ্বক্ষেত্রে সব মানুষই পরস্পর আপন। সমাজের আর-আর প্রায় সকল অংশেই ভেদের প্রাচীর প্রতিদিন দুর্লঙ্ঘ্য হয়ে উঠেছে; কেবল মানুষের আমন্ত্রণ রইল জ্ঞানের এই মহাতীর্থে। কেননা, এইখানে দৈন্যস্বীকার, এইখানে কৃপণতা ভদ্রজাতির পক্ষে সকলের চেয়ে আত্মলাঘব। সৌভাগ্যবান দেশের প্রাঙ্গণ এইখানে বিশ্বের দিকে উন্মুক্ত।" —শিক্ষার বিকীরণ ১৯৩৩

১৩২৫ সনের (১৯১৮) ২২শে আশ্বিন কলকাতায় জোড়াসাঁকোর বাড়িতে "অনেকগুলি গুজরাটি ব্যবসায়ী কবির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন; কবি তাঁহাদের নিকট সর্বপ্রথম তাঁহার 'বিশ্বভারতী' পরিকল্পনা প্রকাশ করিলেন। শান্তিনিকেতন ভারতীয় নানা জাতির মিলনভূমি হইবে, এই আদর্শ সকলকেই যেন উৎসাহিত করিল।" (রবীন্দ্র-জীবনী ২য় সং ২য় খণ্ড পৃ ৪৭৭) অতঃপর ঐ সনেই আশ্রমের

বার্ষিক-উৎসবের পরদিন ৮ই পৌষে টেনিস-গ্রাউণ্ডে 'বিশ্বভারতী'র প্রাথমিক প্রতিষ্ঠার কাজ সম্পন্ন হয়।

'রবীন্দ্র-জীবনী'কার লিখেছেন, "বিশ্বভারতীর অধ্যয়ন-অধ্যাপনা শুরু হইলে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সাহিত্য পড়াইতে লাগিলেন। ব্রাউনিং-এর বহু দুরূহ কবিতা এই সময়ে তাঁহার কাছে আমাদের পড়া। এণ্ড্রুজ্ পড়াইতেন সমালোচনা, ম্যাথু আর্ণল্ডের প্রবন্ধাবলীকে কেন্দ্র করিয়া তিনি আলোচনা করিতেন ইংরেজি সাহিত্য। *বিধুশেখর ভট্টাচার্য যাঁহার উদ্যোগে এই বিভাগ খোলা হয়, তিনি পড়ান* হিন্দুদর্শন, শ্রীযুক্ত ধর্মাধার রাজগুরু মহাস্থবির নামক একজন সিংহলদেশীয় ভিক্ষু বৌদ্ধদর্শন সম্বন্ধে উপদেশ দেন। রথীন্দ্রনাথ জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। মৈথিলী পণ্ডিত কপিলেশ্বর মিশ্র পাণিনির ব্যাকরণ পড়ান।· জ্ঞানানুশীলনের প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই কলাবিদ্যাচর্চার ব্যবস্থা হইল।·· রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা করিলেন, "বিশ্বভারতী' যদি প্রতিষ্ঠিত হয় তবে ভারতীয় সংগীত ও চিত্রকলা শিক্ষা তাহার প্রধান অঙ্গ হইবে এই আমাদের সংকল্প হউক।' সুরেন্দ্রনাথ, অসিতকুমার ও নন্দলাল এই ত্রয়ীর যোগে কলাভবনের পত্তন হইল।···

"শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ছাত্রেরা সংগীত শিখিত অজিতকুমার চক্রবর্তী ও দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট। রবীন্দ্রনাথের গানই ছাত্রেরা শিখিত।···দুই জন হিন্দুস্থানী মুসলমান ওস্তাদ আনানো হয়।·· সেই হইতেই মার্গ-সংগীতের প্রবর্তনা।···তারপরে আসেন মহারাষ্ট্র যুবক ভীমরাও।···আমাদের আলোচ্য-পর্বে আসিলেন নকুলেশ্বর গোস্বামী।···বাংলাদেশের ওস্তাদী-গানের ধারা মিলিত হইল উত্তর-ভারতের মার্গ-সংগীতের সঙ্গে।···বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত হইলে শান্তি-নিকেতনের ছাত্রদের মধ্যে মণিপুরী-নৃত্য প্রবর্তনের চেষ্টা হইয়াছিল। ত্রিপুরা হইতে বুদ্ধিমন্ত সিং নামে বিখ্যাত এক নৃত্যশিল্পীকে আনানো হয়।"

—রবীন্দ্র-জীবনী ২য় সং ৩য় খণ্ড পৃ ২০ ২১

ইতিমধ্যে নোবেল-প্রাইজ পাওয়ার পর থেকে বিশ্বের নানা দেশের সঙ্গে কবির ও শান্তিনিকেতনের যোগ ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছিল। কেবল ভারতবর্ষের সীমায় বিশ্বভারতীর কাজ সীমাবদ্ধ রইল না। কবি লিখেছেন,—"ক্রমে বিদ্যালয়ের মধ্যে আর-একটা আইডিয়া প্রবেশ করিয়াছিল—সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশ্বের সঙ্গে ভারতবর্ষের যোগ।" —বিশ্বভারতী ১৩৪২

শুধু পুঁথিপত্রে-নিবদ্ধ বিদ্যাসমবায় নয়, সংস্কৃতির জীবন্ত বাহক বিভিন্ন দেশের শ্রেষ্ঠ লোকদের 'চিত্তসমবায়' ঘটাবার কথাও কবির কাছে অপরিহার্য ব'লে উদ্ভাবিত হল।

তিনি বললেন,—"কেন সকল দেশের তাপসদের সঙ্গে আমাদের তপস্যার বিনিময় হবে না।" হার্ভার্ড-বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতার আমন্ত্রণ ছেড়ে—বিশ্বভারতীতে এলেন আচার্য সিলভ্যাঁ লেভি। প্রাথমিক-প্রতিষ্ঠার তিন বছর পর ১৩২৮ সনের "৮ই পৌষ প্রাতে শান্তিনিকেতন-আম্রকুঞ্জে বিশ্বভারতীর উদ্বোধন-সভা হইল। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল সভাপতির আসন অলংকৃত করিলেন। এই সভায় 'বিশ্বভারতী পরিষদ' গঠিত হইল এবং বিশ্বভারতীর জন্য যে বিধান (Constitution) প্রণীত হইয়াছিল তাহা গৃহীত হইল।" (রবীন্দ্রজীবনী) বাইরে বিশ্বভারতীর আদর্শ মনীষীদের কাছে কী ধারণা জাগিয়েছিল, আচার্য শীলের ভাষণের মধ্যে তা অভিব্যক্ত হয়েছে। তিনি বলেন,—

"এখানে শুধু বহিরঙ্গ-প্রকৃতির আবির্ভাব নয়, কলাসৃষ্টির দ্বারা অন্তরঙ্গ-প্রকৃতিও পারিপার্শ্বিক অবস্থায় জেগে উঠেছে। এখানকার বালক-বালিকারা এক-পরিবারভুক্ত হয়ে আচার্যদের মধ্যে রয়েছে। একজন বিশ্বপ্রাণ পার্সনালিটি এখানে সর্বদাই এর মধ্যে জাগ্রত রয়েছেন। এমনি ভাবে এই বিদ্যালয় গড়ে উঠেছে।" (বিশ্বভারতী পৃ ১৫৯, ১৩২৮) এ প্রসঙ্গেই আচার্য শীল শান্তিপূর্ণ এক আদর্শ-বিশ্বসমাজ গঠনের কার্যকর ইঙ্গিত দিয়ে বলেন,—"সর্ব মুক্তিতেই এখন মুক্তি, না হলে মুক্তি নেই। ধর্মের এই Mass Life-এর দিকটা সমাজে স্থাপন করতে হবে।"

"যদি Social fellowship of man with man হয় তবেই international peace হবে, নয়তো হবে না।"—"আজকাল য়ুরোপে Group principle-এর দরকার হচ্ছে। সেখানে Political organization, economic organization এ সবই Group গঠন করার দিকে যাচ্ছে। আমাদেরও এই পথে সমস্যা পূরণ করবার আছে। আমাদের যেমন য়ুরোপের কাছ থেকে স্টেটের Centralization ও Organization নেবার আছে তেমনি য়ুরোপকেও Group Principal দেবার আছে। আমরা সে-দেশ থেকে economic organization-কে গ্রহণ করে আমাদের village community-কে গড়ে তুলব। কৃষিই আমাদের জীবনযাত্রার প্রধান অবলম্বন, সুতরাং ruralization-এর দিকে আমাদের চেষ্টাকে নিয়োগ করতে হবে। অবশ্য আমি সেজন্যে বলছি না যে town life-কে develop করবে না; তারও প্রয়োজন আছে। কিন্তু আমাদের ভূমির সঙ্গে প্রাণের যোগ-সাধন করতে হবে। ভূমির সঙ্গে owner-ship-এর সম্বন্ধ হলে তবে স্বাধীনতা থাকতে পারে। কারখানার জীবনও দরকার আছে, কিন্তু ভূমি ও বাস্তুর সঙ্গে individual owner-ship-এর যোগকে ছেড়ে না দিয়ে Large-scale production আনতে হবে।

বড়ো আকারে energy-কে আনতে হবে, কিন্তু দেখতে হবে, কলের energy মানুষের আত্মাকে পীড়িত অভিভূত না করে, যেন জড় না করে দেয়। সমবায়-প্রণালীর দ্বারা হাতের কলকেও দেশে স্থান দিতে হবে। এমনিভাবে economic organization-এ ভারতকে আত্মপরিচয় দিতে হবে। আমাদের স্ট্যাণ্ডার্ড অব লাইফ এত নিম্নস্তরে আছে যে, আমরা decadent হয়ে মরতে বসেছি। যে-প্রণালীতে efficient organization-এর নির্দেশ করলাম তাকে না ছেড়ে বিজ্ঞানকে আমাদের প্রয়োজন সাধনে লাগাতে হবে। আমাদের বিশ্বভারতীতে তাই, রাষ্ট্রনীতি সমাজধর্ম ও অর্থনীতির যে-যে ইনস্টিট্যুশন পৃথিবীতে আছে, সে সবকেই স্টডি করতে হবে, এবং আমাদের দৈন্য কেন ও কোথায় তা বুঝে নিয়ে আমাদের অভাব পূরণ করতে হবে। কিন্তু এতে করে নিজের প্রাণকে ও সৃজনী-শক্তিকে যেন বাইরের চাপে নষ্ট না করি। যা-কিছু গ্রহণ করব তাকে ভারতের ছাঁচে ঢেলে নিতে হবে। আমাদের সৃজনীশক্তির দ্বারা তারা Coined into our flesh and blood হয়ে যাওয়া চাই।" —বিশ্বভারতী পৃ ১৬৫-৬৬, ১৩২৮

এর পরে যথারীতি বিশ্বভারতীর কাজ চলতে থাকে। আদর্শ সম্বন্ধে বিশ্বভারতীর বার্ষিক-উৎসবে কবির ভাষণে পর-পরে যা প্রকাশ পায়, তার থেকে দু'চার কথা নিয়ে সংকলিত করে দেওয়া গেল।—"সেবা করবার, ও সেবা আদায় করবার, *দান* করবার ও *দান গ্রহণ* করবার সম্বন্ধকে আমাদের তৈরি করে তুলতে হবে।"

"আজকের দিনে যে-তপঃক্ষেত্রে বিশ্বের সর্বজাতির ও সর্বদেশের মানবের তপস্যার আসন পাতা হয়েছে আমাদের সকল ভেদবুদ্ধি ভুলে গিয়ে সেখানে পৌছতে হবে।"

—বিশ্বভারতী ১৩২৯

"এই অনুষ্ঠানের প্রথম সূচনা-দিনে আমরা আমাদের পুরাতন আচার্যদের আহ্বান-মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেম—যে-মন্ত্রে তাঁরা সকলকে ডেকে বলেছিলেন, 'আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা'; বলেছিলেন, জলধারা-সকল যেমন সমুদ্রের মধ্যে এসে মিলিত হয় তেমনি করে সকলে এখানে মিলিত হোক।"...

"আমাদের শাস্ত্রে বলে অবিদ্যা অজ্ঞানের বন্ধনই বন্ধন। এ কথা সকল দিকেই খাটে, যাকে জানিনে তার সম্বন্ধেই আমরা যথার্থ বিচ্ছিন্ন।

"সেই জানবার সোপান তৈরি করার দ্বারা মেলবার শিখরে পৌছবার সাধনা আমরা গ্রহণ করেছি। এ দেশের নানা জাতির পরিচয়ের উপরে ভারতের যে

আত্মপরিচয় নির্ভর করে, এখানে কোনো-এক জায়গায় তার তো সাধনা থাকা দরকার। শান্তিনিকেতনে এই সাধনার প্রতিষ্ঠা ধ্রুব হোক, এই ভাবনাটি এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আমাদের লক্ষ্যে ও অলক্ষ্যে বিরাজ করছে।"

"ভারতের যে-প্রকাশ বিশ্বের শ্রদ্ধেয় সেই প্রকাশের দ্বারা বিশ্বকে অভ্যর্থনা করব, এই হচ্ছে আমাদের সাধনা।"

১৯১২ সনে (১৩১৯) সুরুলের কুঠিবাড়িখানি কবি রায়পুরের কর্ণেল নরেন্দ্র প্রসাদ সিংহের নিকট থেকে ক্রয় করেন। দশ বছর পরে ১৯২২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি সেখানে মিঃ এলমহার্স্ট 'গ্রাম-পুনর্গঠন কেন্দ্র' স্থাপন করলেন। এক দল কর্মী নিয়ে তিনি স্বাবলম্বনের আদর্শে জীবনযাত্রা নির্বাহ ও বিশেষ করে কৃষির উন্নতি সাধনে সচেষ্ট হন। কিছুদিন পরে তিনি আমেরিকায় চলে গেলে শান্তিনিকেতনের সন্তোষকুমার মজুমদার এসে ১৯২৩ থেকে ১৯২৬ সন অবধি এ প্রতিষ্ঠান চালনা করেন। তাঁর কালে শান্তিনিকেতনে 'শিক্ষাসত্রে'র পত্তন হয়। পরে তা শ্রীনিকেতনে স্থানান্তরিত হয়ে অদ্যাবধি সেখানেই প্রতিষ্ঠিত আছে। গ্রামের ছেলেরা স্বল্পব্যয়ে এ বিভাগ থেকে ম্যাট্রিক অবধি এখন শিক্ষা পেতে পারে। পরে প্রাথমিক-বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শিক্ষারীতি-শিক্ষণের জন্য 'শিক্ষাচর্চা' নামক আরেকটি বিভাগ এর সঙ্গে সংযুক্ত হয়। প্রধানত এলমহার্স্টের অর্থেই শ্রীনিকেতনের ব্যয় নির্বাহিত হয়ে এসেছে বহুদিন ধ'রে। পল্লীর শিক্ষার সঙ্গে পল্লীশিল্প ও পল্লীর স্বাস্থ্য-উন্নয়নের কাজও শ্রীনিকেতনের কর্মসূচীর অন্যতম বিষয়। রবীন্দ্রনাথ এ প্রতিষ্ঠানের নীতি ব্যাখ্যা ক'রে বলেছেন,—"পরাধীনতা বলতে কেবল পরজাতির অধীনতা বোঝায় না। আত্মীয়ের অধীনতাতেও অধীনতার গ্লানি আছে। আমি প্রথম থেকেই এই কথা মনে রেখেছি যে, পল্লীকে বাইরে থেকে পূর্ণ করবার চেষ্টা কৃত্রিম, তাতে বর্তমানকে দয়া করে ভাবী কালকে নিঃস্ব করা হয়। আপনাকে আপন হতে পূর্ণ করবার উৎস মরুভূমিতেও পাওয়া যায়, সেই উৎস কখনো শুষ্ক হয় না।

"পল্লীবাসীদের চিত্তে সেই উৎসেরই সন্ধান করতে হবে। তার প্রথম ভূমিকা হচ্ছে, তারা যেন আপন শক্তিকে এবং শক্তির সমবায়কে বিশ্বাস করে। এই বিশ্বাসের উদ্বোধনে আমরা যে ক্রমশ সফল হচ্ছি তার একটা প্রমাণ আছে আমাদের প্রতিবেশী গ্রামগুলিতে সম্মিলিত আত্মচেষ্টায় আরোগ্য-বিধানের প্রতিষ্ঠা।

"এই গেল এক, আর-একটা কথা আমার মনে ছিল, সেটাও খুলে বলি।

"সৃষ্টি-কাজে আনন্দ মানুষের স্বভাবসিদ্ধ, এইখানেই সে পশুদের থেকে পৃথক এবং

বড়ো। পল্লী যে কেবল চাষবাস চালিয়ে আপনি অল্প পরিমাণে এবং আমাদের ভূরি পরিমাণে খাওয়াবে তা তো নয়। সকল দেশেই পল্লীসাহিত্য, পল্লীশিল্প পল্লীগান, পল্লীনৃত্য নানা আকারে স্বতঃস্ফূর্তিতে দেখা দিয়েছে।...

"আমার ইচ্ছা ছিল সৃষ্টির এই আনন্দ-প্রবাহে পল্লীর শুষ্ক চিত্তভূমিকে অভিষিক্ত করতে সাহায্য করব, নানা দিকে তার আত্ম-প্রকাশের নানা পথ খুলে যাবে।" ১৩৪৫ সালের ২৩শে অগ্রহায়ণ কলকাতায় 'শ্রীনিকেতন-শিল্পভাণ্ডারে'র উদ্বোধন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ উপরোক্ত কথাগুলি বলেন। এর মধ্যে তাঁর মনের মূলগত সেই সমবায়-যোগে সর্বাঙ্গীণ-বিকাশের আকাঙ্ক্ষাই ব্যক্ত হয়েছে। বিশেষ ক'রে তিনি এ প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে সমাজের সাধারণ-শ্রেণীর মানুষদের মধ্যেও তাঁর এ আদর্শকে সক্রিয় করতে চান। এলম্‌হার্স্ট সে-কথা উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন,—

"It should be India to lead the way towards co-operation for life, fuller and more abundant life, both spiritual and material, because the memory of such a life in the past is not yet dead and the will to sacrifice material acquisition for the persuit of high ideals and spiritual gain is perhaps more alive in the soil of India to-day than anywhere else in the wide world."

শ্রীনিকেতনের কাজ বিভিন্ন সময়ে পরিচালনা করেন স্বর্গত কালীমোহন ঘোষ ও গৌরগোপাল ঘোষ; রথীন্দ্রনাথ বহুদিন এর কর্ণধার ছিলেন। স্বর্গত সুকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যও পর-পর সেকাজে ব্রতী হন। বর্তমানে শ্রীনিকেতনেরই প্রাক্তন সেই প্রথম কর্মীদলের অন্যতম সভ্য শ্রীধীরানন্দ রায়ের উপর সে-ভার ন্যস্ত আছে। এখানে নানা সময়ের মধ্য দিয়ে নানা কাজের প্রবর্তন হয়। সমবায়-স্বাস্থ্য-সমিতির কাজটি আশে-পাশের গ্রামাঞ্চল ও বোলপুর শহরে বিশেষ প্রসার লাভ করে। শিশু ও মাতৃমঙ্গল বিভাগটি নূতন যুক্ত হয়েছে পল্লীসংস্কার-বিভাগের সঙ্গে, ব্রতীবালক-দলের কাজও চলছে। রবীন্দ্রনাথের দ্বারা শ্রীনিকেতনে বর্ধমান বিভাগীয় সমবায়-সম্মেলনের অধিবেশনের উদ্বোধন হয় ১৯২৯ সনে; পরের বৎসর ১৯৩০ সনেও শ্রীনিকেতনে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমবায়-সমিতির প্রতিনিধিদের সম্মেলনেও কবি যোগদান করেন।

আর্থিক দিকেও সকলের সমবায়ী শক্তিতে ধনসম্পদ সৃষ্টি করে তোলবার চেষ্টায় শ্রীনিকেতনে 'ব্যাঙ্ক' স্থাপিত হয়েছে। কুটিরশিল্প-বিভাগে সাধারণ-শ্রেণীর বহু

লোক, তাঁত, কাঠ, চামড়া ও মাটির কাজ শিখে নিচ্ছে। গ্রামের তাঁতীরা 'শিল্প-ভবনে'র সাহায্যে কাপড় বুনে জীবিকা উপার্জন করছে। গৃহস্থঘরের মেয়েরাও নানা রকম শিল্পচর্চা করবার সুযোগ পাচ্ছে শ্রীনিকেতনের সংস্রবে থেকে। বুনিয়াদী শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে উঠেছে, মেয়েদের উচ্চ-শিক্ষার জন্য উচ্চ-বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাও সেখানে হয়েছে। কবি বলেছিলেন—"এখনকার কালের সাধনা লোকালয়কে আবার সমগ্র করে তোলা। বিশিষ্টে, সাধারণে, শক্তিতে সৌহার্দ্যে, শহরে গ্রামে মিলিয়ে-মিলিয়ে সম্পূর্ণ করা। নিজেকে পঙ্গু ক'রে ভালো হবার সাধনা কাপুরুষতার সাধনা। মানুষের শক্তি নানা দিকে বিকাশ খোঁজে, তার কোনো-একটিকে অবজ্ঞা করবার অধিকার আমাদের নেই।" শ্রীনিকেতনের মধ্যে দিয়ে কবির সে-কথারই সার্থকতা প্রতিপন্নের চেষ্টা সুগোচর হচ্ছে। সম্প্রতি 'সমাজসেবা-শিক্ষণ কেন্দ্র' ও 'উচ্চমানের পল্লী-শিক্ষায়তন' নামক দুটি-বিভাগ শ্রীনিকেতনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এর কর্মক্ষেত্রকে আরো বিস্তৃততর করেছে। সকল কথার শেষে কবি এই শ্রীনিকেতনের ক্ষেত্রেও বলেছেন—"মিলনের আদর্শকে যেন আমরা মনে জাগরূক রাখিতে পারি।" বিদ্যাচর্চার দ্বারা চিত্ত-সম্পদই হোক, আর, অর্থ ও কৃষিশিল্পাদি চর্চা দ্বারা বিত্তসম্পদই হোক,—যেভাবে যেদিক দিয়েই যত সৃষ্টি বা উপার্জন হোক না কেন, সে সবই সমবায়-আদর্শে সমাজের সকলের কাজে লাগা চাই। তবেই তার দ্বারা সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধিত হতে পারে। যার যেদিক দিয়ে শক্তির বিকাশ সম্ভব, সে তার শক্তিকে সেই দিক দিয়েই সমাজ-সেবায় নিয়োজিত করবে। সমাজও তার জন্য উন্নতির সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে তৎপর থাকলে সেখানে আর ব্যষ্টি ও সমষ্টির বিরোধ বাধার কারণ থাকে না। শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের মধ্যে মানুষের শক্তি-বিকাশের সেই সমবায়-যুক্ত সর্বমুখী বিকাশের পথ সৃজনের প্রয়াস করেছেন রবীন্দ্রনাথ। এ দু'জায়গায় মিলিয়ে বিশ্বভারতীতে আজ নানা বিষয় শিক্ষার নানা বিভাগ রয়েছে। নানা দেশের নানা জাতির লোকই তা শিখতে পারে। সামাজিক সর্বাঙ্গীণ-কল্যাণের পরম লক্ষ্য সাধনের জন্য বিশ্বভারতীর উদ্বোধনের দিনে বিশ্ব-সমাজের সকলকে আহ্বান জানিয়ে কবি যেদিন উচ্চারণ করলেন—**'আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা,'** সেদিন কেবল ভারতীয় সমাজ ও সভ্যতা নয়, সকল দেশের সমাজ ও সভ্যতার জন্যই শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ও সাধনার দ্বার সকল দিকে প্রসারিত হল। বিদ্যালয়ের জন্য বিদেশের দান সংগ্রহে যে-কবি আগে অস্বীকৃত হয়েছেন, পরে তিনি নিজেই দেশে-দেশে তা সংগ্রহ করে ফিরেছেন। (দ্র রবীন্দ্র-জীবনী ২য় সং ২য় খণ্ড পৃ ৪৩৯) এক-কালের তপোবনের বিশেষ আদর্শ ও কর্মপ্রণালী নূতন ও আধুনিকতর এই

বিশ্বপরিবেশগত বিস্তীর্ণ বাস্তব প্রয়োগ-ক্ষেত্রে এসে স্বভাবতই নানা দিকে পরিব্যাপ্ত হতে লাগল। খাওয়া-দাওয়া, নৃত্যগীত, সামাজিক ব্যবহার, ধর্ম-অনুষ্ঠান, ভাষা ও শিক্ষার বিষয়ে পরস্পর আদান-প্রদানে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং উদারতা বৃদ্ধি পেতে লাগল। বৈদেশিক পণ্ডিত, ভ্রমণকারী, পরিদর্শক, ছাত্র ও অতিথি ইত্যাদি কত না লোকের যাতায়াত ঘটতে শুরু হল। এঁদের মধ্যে স্থায়ীভাবে এলেন এণ্ড্রুজ পিয়ার্সন ও এলমহার্স্ট। কবি এঁদের পেয়ে বলেছেন—"*আমার মনে গর্ব জন্মেছিল যে, আমি স্বদেশের জন্য অনেক করছি,—আমার সামর্থ্য আমি স্বদেশকে উৎসর্গ করেছি, আমার সেই গর্ব চূর্ণ হয়ে গেল যখন বিদেশী এলেন এই কাজে। তখনই বুঝলুম, এ তো আমার কাজ নয়, এ তাঁরই কাজ, যিনি সকল মানুষের ভগবান।*" —বিশ্বভারতী পৃ ১১২-১৩

শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ও সাধনা সার্থকতা পাবে সেখানেই, যেখানে বিদেশী সকলেই অনুভব করবেন, এটি সকলেরই ঘর। বিদেশীর কাছে এ আশ্রম সে-রকম ঘরোয়া আবহাওয়াই জোগাতে পেরেছে। তাঁরা এখানকার সম্বন্ধে বলেছেন,—

"Life was lived in common, in comradeship." এখানকার শিক্ষা সম্বন্ধে বলেছেন, "Children would imbibe education as they imbibe food." —Santiniketan P. 9

আজ পুরোনো-দিনের শান্তিনিকেতনের রূপটি খুঁজে পাওয়া কঠিন। পুরোনো লোকজন কমে গেছে। বাড়িঘরের চেহারাও গেছে পাল্টে। নূতন-দিনের পরিচয় বিচিত্র। তার 'ভবন'গুলির কথা জানা দরকার। আশ্রমের প্রাচীনতম ভবন 'শান্তিনিকেতনে' অর্থাৎ পুরানো 'গেস্ট হাউসে' এখন কেন্দ্রীয় অফিস-অংশ অবস্থিত। বিশ্বভারতীর শুরু থেকেই 'বিদ্যাভবনে'র কাজ চলে আসছে। প্রথম অধ্যক্ষ হন বিধুশেখর শাস্ত্রী; পরে তাঁর স্থলবর্তী হন ক্ষিতিমোহন সেন; বর্তমানে ডঃ কালিদাস ভট্টাচার্য সে-কাজের ভার নিয়ে আছেন।

১৯২৬ সনে 'শিক্ষাভবন' নামে কলেজ-বিভাগ খোলা হয়। প্রথম অধ্যক্ষ হন স্বর্গত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। কলকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে এই সূত্রে শান্তিনিকেতনের নিয়মানুগত্যতার সম্বন্ধ স্বভাবতই সৃষ্টি হয়। কেবল পরীক্ষায় পাশ-করার দিকেই একান্তভাবে ঝোঁক না বাড়ে, কবি এ বিষয়ে পরবর্তী অধ্যক্ষ নলিনচন্দ্র গাঙ্গুলিকে সতর্ক থাকতে বলেন। আশ্রমের প্রাক্তন-ছাত্র ডঃ ধীরেন্দ্রমোহন সেন ও শ্রীঅনিলকুমার চন্দ বিলাত থেকে কৃতবিদ্য হয়ে ফিরে এলে, পরে-পরে দু'জনেই কলেজের অধ্যক্ষতা করেন। বর্তমানে অধ্যক্ষ আছেন শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

বিদ্যাভবনের ধারায় বহির্ভারতের সাংস্কৃতিক-যোগের প্রত্যক্ষ-কেন্দ্র সর্বপ্রথম গড়ে উঠল 'চীন-ভবনে'। চীনা-সংস্কৃতির চর্চাকল্পে এ প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয় ১৯৩৪ সনে অধ্যাপক তান-য়ুন-সানের উদ্যোগে; তিনিই প্রতিষ্ঠাকাল থেকে সেখানে পরিচালক-পদে বৃত আছেন।

হিন্দি-সাহিত্যের পঠন-পাঠন, গবেষণা ও প্রচারের উদ্দেশে 'হিন্দিভবন' স্থাপিত হল ১৯৩৮ সনের ১৬ জানুয়ারি। দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ এর ভিত্তি-স্থাপয়িতা। প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন ডঃ হাজারিপ্রসাদ দ্বিবেদী। ত্রৈমাসিক হিন্দী 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'খানি তাঁর সম্পাদনায় এখান থেকে আগে প্রকাশিত হত। এখন এ ভবনের কার্যভার অর্পিত হয়েছে শ্রীতোমরজীর উপর।

'কলাভবনে'র কথা আগে বলা হয়েছে। অধ্যক্ষ শ্রীনন্দলাল বসু কয়েক বছর আগে অবসর গ্রহণ করেছেন। সেখানে পরিচালনার ভার নিয়ে আছেন শ্রীবিশ্বরূপ বসু।

'সংগীত-ভবনে'রও সূত্রপাত হয় বহু আগে। নূতন বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কাল থেকে শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদারের অধ্যক্ষতাতে এ বিভাগের কাজ চলে আসছিল; এখন বিভাগটি চালাচ্ছেন শ্রীওয়াজেল ওয়ার।

গুরুদেব আশ্রমের ছাত্রীনিবাসটির নাম দেন 'শ্রীভবন'। ১৯৩৪ সনের জুলাইতে নূতন বাড়িতে ঐ নামেই গুরুদেবের উপস্থিতিতে শ্রীভবনের গৃহপ্রবেশ-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এর আগে 'দ্বারিক'-গৃহে এ-ভবনটি অবস্থিত ছিল। তখন বহুদিন শ্রীমতী হেমবালা সেন এর পরিচালনা করেন। শ্রীমতী স্নেহলতা সেন ছিলেন প্রথম পরিদর্শিকা, বর্তমানে পরিদর্শিকা রয়েছেন শ্রীমতী সুধা দেবী।

'কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার' অতি প্রাচীন। আশ্রমের মিলনকেন্দ্র বলা যায় একে। বাড়ির বৈঠকখানার মতো ঘরে-বাইরে সকলেরই এটিতে প্রত্যহ আনাগোনা চলছে। 'ব্রহ্মবিদ্যালয়ে'র কাল থেকে এর কাজ চলে আসছে। 'বিশ্বভারতী' স্থাপিত হওয়ার সময় গৃহটি দ্বিতলে পরিণত হয়। পুরানো দিনের শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় অবসর গ্রহণ করার পরে এর অধ্যক্ষপদে আসীন রয়েছেন এখন শ্রীবিমলকুমার দত্ত।

'রবীন্দ্র-সদন' কবির প্রয়াণের পরে যথারীতি নামকরণ ক'রে স্থাপিত হয় ১৯৪১ সনে। তখন থেকে এখানে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কিত যাবতীয় উপকরণ সংগ্রহ ও অনুশীলনের কাজ চলে আসছে। বর্তমানে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত আছেন

শ্রীমোহনলাল বাজপেয়ী। আর, রবীন্দ্র-অধ্যাপকের পদে বৃত আছেন শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন।

'বিনয়-ভবন' বিভাগটিতে শিক্ষক-শিক্ষণ-এর কাজ চলছে। প্রায় ১০।১২ বছর হল, শ্রীক্ষিতীশ রায়ের পরিচালনায় সে কাজ শুরু হয়। বর্তমান অধ্যক্ষ রয়েছেন শ্রীজয়গোবিন্দ রায়।

বিশ্বভারতী স্থাপিত হওয়ার সমকালে 'রতনকুঠি'র ভিত্তি স্থাপিত হয় ১৩৩০ সনের নববর্ষের দিনটিতে। বোম্বাইয়ের পার্সী স্যর রতন টাটা পঁচিশ হাজার টাকা দান করেন বিদেশী-অধ্যাপকদের বাসের ব্যবস্থার জন্য। তাঁর নামেই এ গৃহের নামকরণ হয়। কলকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্সী-অধ্যাপক ডঃ তারাপুরাওয়ালা এর ভিত্তি স্থাপন করেন। ইনি পরে বিশ্বভারতীতে 'জরথুস্ট্রের ধর্ম' সম্বন্ধে ধারাবাহিক কয়েকটি বক্তৃতা দেন। প্রসঙ্গত বলা যায়, কবি জীবিত থাকতেই, 'জৈন' ধর্ম ও সাহিত্য-চর্চার কাজে একদল ছাত্র সঙ্গে ক'রে আচার্য মুনি জিনবিজয়জী কিছুদিন আশ্রমে কাটিয়ে যান। 'বাগান-বাড়ি'তে তাঁদের বাসস্থান ছিল। কবির মৃত্যুর পরে, এই গৃহেই 'সংস্কার-ভবন' নামক একটি সাময়িক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কাজ চলে। আশ্রমের ও বাহিরের গরিব ও দুর্গত-সাধারণ এখানে থেকে শিক্ষালাভ করত। তিন বছর পরে 'সংস্কার-ভবনে'র কাজ স্থানান্তরিত হলে কলেজ-বিভাগের গরিব ছাত্ররা এ বাড়িতে থাকতে পায়। আরো পরে এটি আশ্রমের সাধারণ কর্মীদের আবাসে পরিণত হয়েছিল। লোকের মুখে তখনো চলিত ছিল 'সংস্কার-ভবন'ই। গৃহটি অল্পদিন হল ভেঙে ফেলা হয়েছে।

'দীনবন্ধু ভবন' স্বর্গত এণ্ডুজ সাহেবের স্মৃতিরক্ষা-কল্পে নির্মিত হয়েছে ১৯৫০ সনে। খৃষ্টান ধর্মের সঙ্গে বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা এবং বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগের কাজ এখান থেকে সম্পন্ন হয়ে থাকে। মিস্ মার্জারি সাইক্স্ এ কাজ ১৯৪৮ সন থেকেই শুরু করেন। বর্তমানে এই বিভাগটি বিদ্যাভবনের অন্তর্গত হয়ে আছে।

'গ্রন্থনবিভাগ'-এর প্রধান কেন্দ্র কলকাতাতে অবস্থিত। করুণাবিন্দু বিশ্বাস এ-বিভাগের প্রথম পরিচালক। বর্তমানে শ্রীগোপেশচন্দ্র সেনের অধ্যক্ষতায় এর কাজ চলছে।

আশ্রমের চিকিৎসা-বিভাগ 'আরোগ্য সদন'-এর নামকরণ হয় আশ্রমের প্রিয় সুহৃদ্ স্বর্গত পিয়ার্সন সাহেবের নামে। ১৯২৮ সনে এ বিভাগটি নূতন বাড়িতে স্থানান্তরিত হয়। বর্তমানে ডাঃ শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এর পরিচালনা করছেন।

আশ্রমে সকল বিভাগের চেয়ে পুরানো আদিবিভাগটি হল 'পাঠভবন'। এর প্রথম অধ্যক্ষ ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। বর্তমানে এর পরিচালনার ভার শ্রীঅমিয়কুমার সেনের উপর ন্যস্ত রয়েছে।

বিশ্বভারতীর প্রথম উপাচার্য ছিলেন স্বর্গত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বর্তমানে সে-পদে অধিষ্ঠিত আছেন শ্রীসুধীরঞ্জন দাশ।

পাঠভবনের ছাত্রদের মধ্যে যারা ছাত্রাবাসে থাকে, তাদের পক্ষে পালনীয় নিয়মাবলী, সকালে সন্ধ্যায় আবৃত্তি করবার মন্ত্র এবং দৈনিক কর্মসূচী নিম্নে দেওয়া গেল,—

বিশ্বভারতী পাঠভবন-ছাত্রাবাসের পালনীয় নিয়মাবলী

১। প্রাতে উঠিবার ঘণ্টা পড়িবামাত্র প্রত্যেকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে লাইনে সমবেত হইবে।

২। ইহার পর যথাক্রমে ঘরঝাঁট, শয্যা গুছাইয়া রাখা, ব্যায়াম প্রভৃতি সময়মতো করিবে।

৩। প্রত্যেককে নিজ-নিজ কাপড় পরিষ্কার করিয়া কাচিয়া নির্দিষ্ট স্থানে মেলিয়া দিতে হইবে এবং শুকানো কাপড় যথাসময়ে তুলিয়া রাখিতে হইবে।

৪। বৈতালিকের ঘণ্টা পড়িবামাত্র সকলে নির্দিষ্ট স্থানে শান্ত ও সুশৃঙ্খল ভাবে দাঁড়াইবে।

৫। ক্লাসের সময় কোনো অবকাশপ্রাপ্ত ছাত্র পাঠচর্চার স্থান বা তাহার আশেপাশে খেলা বা গোলমাল করিবে না।

৬। প্রত্যেক ছাত্রকে তাহার বিছানা, বই ও কাপড়-চোপড় যথাস্থানে গুছাইয়া রাখিতে হইবে।

৭। পড়িতে বসিবার ঘণ্টা (Study hour) পড়িবার পর কোনো সুস্থ ছাত্র অধিনায়কের বিনা অনুমতিতে পড়িবার ঘরের বাহিরে থাকিতে পারিবে না।

৮। কোনো অধ্যাপক বা অতিথি কোনো ছাত্রের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলে ছাত্র উঠিয়া দাঁড়াইয়া মনোযোগের সহিত তাঁহার কথা শুনিবে।

৯। প্রত্যেক ছাত্র নিজ সম্পত্তির তালিকা রাখিবে। কিছু হারাইলে গৃহাধ্যক্ষকে জানাইবে। গৃহাধ্যক্ষের অনুমতি ব্যতীত কেহ কোনো দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় বা দান করিতে পারিবে না।

১০। কোনো ছাত্রই নিজের নিকট টাকাকড়ি বা কোনো মূল্যবান দ্রব্য রাখিতে পারিবে না। সেগুলি গৃহাধ্যক্ষের নিকট জমা দিতে হইবে।

১১। গৃহাধ্যক্ষের অনুমতি অথবা তাঁহার অনুপস্থিতিতে সম্পাদক বা সম্পাদিকার অনুমতি ব্যতীত কোনো ছাত্র-ছাত্রী আশ্রমের সীমানার বাহিরে যাইতে পারিবে না। (নির্দিষ্ট সীমানা:—উত্তরে: উত্তরায়ণের সোজা রাস্তা, পশ্চিমে: সংগীত-ভবন ছাত্রাবাসের সামনের রাস্তা, পূর্বে: পান্থশালার সামনের রাস্তা থেকে শান্তিনিকেতনের প্রধান ফটক, দক্ষিণে: গুরুপল্লীর সামনের রাস্তা)। নিজ ছাত্রাবাস ভিন্ন অপর কোনো ছাত্রাবাস, খাওয়ার সময় ছাড়া রান্নাঘর এবং খেলার সময় ছাড়া খেলার মাঠও নির্দিষ্ট সীমানার বাহিরে বলিয়া গণ্য হইবে।

১২। কোনো সুস্থ ছাত্র হাসপাতালের নির্দিষ্ট সময় ব্যতীত অন্য কোনো সময়ে রোগী দেখিতে যাইতে পারিবে না।

১৩। সকল ছাত্রকেই বিকালের খেলার লাইনে উপস্থিত থাকিয়া খেলায় যোগদান করিতে হইবে।

১৪। সান্ধ্যোপাসনায় প্রথম ঘণ্টা পড়িবামাত্র সকলে হাতমুখ ধুইয়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইয়া উপাসনা-স্থলে যাইবে ও শান্তভাবে উপাসনায় বসিবে। উপাসনা শেষ হইয়া গেলে সকলে নিঃশব্দে পড়িবার ঘরে চলিয়া যাইবে।

১৫। বিনোদন-পর্বে যে-যে বিনোদনের ব্যবস্থা হয় তাহাতে এবং ছাত্রগণ পরিচালিত অনুষ্ঠানে সকলেই উপস্থিত থাকিবে। যথাযোগ্য কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত এগুলি হইতে কেহই অনুপস্থিত থাকিতে পারিবে না।

১৬। রাত্রে শুইতে যাইবার পূর্বে সকলেই হাত-পা ধুইয়া শয্যায় যাইবে। শুইবার ঘণ্টা পড়িবার পরই সকলে শুইয়া পড়িবে।

১৭। প্রত্যহ প্রাতে প্রথম যখন দেখা হইবে, অধ্যাপক, অতিথি ও পরস্পরকে যথোচিত অভিবাদন করিবে। ক্লাস আরম্ভ হইলে অধ্যাপক আসা মাত্র দাঁড়াইয়া নমস্কার করিতে হইবে। অধিনায়ক ও গৃহনায়ক ছাত্র-ছাত্রীদের সর্বপ্রকার শৃঙ্খলা রক্ষার তত্ত্বাবধান করিবেন।

"মনে রাখিও এ বিদ্যালয় তোমরাই গড়িতেছ এবং বিদ্যালয় নিয়ম-পালন প্রভৃতি সব বিষয়ে তোমাদের সাহায্য চায়। সর্বপ্রকার ভদ্র আচরণ বিদ্যালয় তোমাদের নিকট আশা করে।"

মন্ত্র

প্রাতঃকালীন—ওঁ পিতা নোঽসি পিতা নো বোধি নমস্তেঽস্তু মা মা হিংসীঃ।

বিশ্বানি দেব সবিত দুর্রিতানি পরাসুব। যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব। নমঃ সম্ভবায় চ ময়োভবায় চ নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্করায় চ নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

অর্থ—তুমি আমাদের পিতা, পিতার ন্যায় আমাদিগকে জ্ঞান শিক্ষা দাও। তোমাকে নমস্কার। আমাকে মোহজাল হইতে রক্ষা কর, আমাকে পরিত্যাগ করিও না, আমাকে বিনাশ করিও না। হে দেব! হে পিতা! পাপ সকল *মার্জনা কর। যাহা কল্যাণ তাহা আমাদের মধ্যে প্রেরণ কর। তুমি যে সুখকর,* কল্যাণকর, সুখকল্যাণের আকর, কল্যাণ ও কল্যাণতর, তোমাকে নমস্কার।

সায়ংকালীন—ওঁ যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ যো ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

অর্থ—যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলেতে, যিনি বিশ্বসংসারে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন, যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে আছেন, সেই দেবতাকে নমস্কার করি।

শান্তিনিকেতনের কর্মপরিধি অল্প সময়ের মধ্যে বিস্তীর্ণ হয়ে পড়েছে। কবির চিন্তা-ধারার অগ্রগতির সঙ্গে রূপ নিতে গিয়ে বাস্তবে এর কর্মবিভাগগুলি এবং কতকাংশে এখানকার জীবনযাত্রাও প্রয়োজনীয় পরিণতিলাভের উপযুক্ত যথেষ্ট সময় পায়নি। সকলের মধ্যে স্থায়ী সংহতির সুব্যবস্থাও তাই সর্বত্র গড়ে ওঠেনি। সাময়িক অবস্থানকারী বাইরের লোকের চোখে যে ত্রুটি ধরা পড়েনি, কবির দৃষ্টিতে তা পড়েছিল। তিনি বলেছেন, "এখন অনেক ছাত্র অনেক বিভাগ হয়েছে, সকলই বিচ্ছিন্ন অবস্থায় চলছে। কর্মী সমগ্র অনুষ্ঠানটিকে চিন্তার ক্ষেত্রে দেখার ক্ষেত্রে এক ক'রে দেখতে পাচ্ছেন না—বিচ্ছেদ জন্মাচ্ছে।" (বিশ্বভারতী ১৩৪২) ভুল-ত্রুটি সব শুধরে যাবে, যদি কবির মূল-প্রেরণায় সকলের দৃষ্টি একান্ত নিবদ্ধ থাকে। সমস্ত শিক্ষা ও সাধনার সেই হচ্ছে সুচির লক্ষ্য; সর্বোত্তম সিদ্ধিও আনবে তাতেই—চাই সকলের পক্ষে সমবায়-মূলক সর্বাঙ্গীণ বিকাশ; কবির সেই কথাই কেবল স্মরণীয়, —"মানুষ শুধু কবি নয়। বিশ্বলোকে চিত্তবৃত্তির যে বিচিত্র প্রবর্তনা আছে তাতে সাড়া দিতে হবে সকল দিক থেকে; বলতে হবে ওঁ—আমি জেগে আছি।" আর, শান্তিনিকেতনের ভিতরে বাইরে সকল জায়গার লোকেই জানবেন প্রধান যেটি বাণী—কবি বলে গেছেন,—"এখানকার আবহাওয়ার মধ্যে একটি আহ্বান আছে—আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা।" (বিশ্বভারতী ১৩৪৫) সমাজের সকলের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ চেয়ে সকলকেই প্রীতির সঙ্গে এখানে গ্রহণ করতে হবে।

শান্তিনিকেতনের অপ্রকাশিত অধ্যায়

১

পত্রিকা-পরিচয়

শান্তিনিকেতন গঠনের ইতিহাস এবং রবীন্দ্রনাথের প্রবর্তিত শিক্ষার ইতিহাস আলোচনায় আশ্রমের হাতে-লেখা পত্রিকাগুলি মূল্যবান উপকরণ। ছাত্রদের কী ভাবে রবীন্দ্রনাথ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, এই আশ্রম-স্থাপনের আদর্শ কী, শিক্ষক ও কর্মিগণ কতটা আন্তরিকতার সহিত এখানকার কাজে যোগ দিয়েছিলেন, ছাত্রদের শিক্ষা ও সাহিত্যচর্চার প্রচেষ্টা প্রভৃতি সম্বন্ধে নানা তথ্য এইসব পত্রিকা থেকে পাওয়া যায়। আশ্রম এবং রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অনেক পুরোনো সংবাদও এসব কাগজে সংকলিত রয়েছে।

আজ অবধি আশ্রমের ছাত্র-ছাত্রীদের পরিচালনায় কমপক্ষে ত্রিশখানা হাতে-লেখা পত্রিকা বের হয়েছে। বাংলা ইংরাজী হিন্দী মিলিয়ে প্রায় পঁচিশখানা* পত্রিকার চিহ্নাবশেষ এখনও দেখতে পাওয়া যায়। আরো যে অনেক পত্রিকা বের হয়েছে, এবং লোপ পেয়েছে—এসব পত্রিকা থেকেই সে-সংবাদ জানা যায়। প্রাচীনতম পত্রিকা মিলছে 'শান্তি'; ১৩১৪ সালে প্রথম তা প্রকাশিত হয়,—সম্পাদক ছিলেন মনোরঞ্জন চৌধুরী। এই পত্রিকার এক সংখ্যায় লেখা আছে "আমরা যদি মনে করি 'শান্তি' পত্রিকা বড় ছেলেদের কিংবা কোনো-একজনের তবে অত্যন্ত ভুল করা হইবে। একথা অতিমাত্র সত্য যে 'শান্তি'র জীবন আশ্রমস্থ প্রত্যেক ছাত্রের উপর নির্ভর করিতেছে।"

'প্রভাত' বের হয় ১৩১৬ সালে মাঘ মাসে। প্রথম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যাতে লেখা আছে, "আমরা শিশু, আমাদের পত্রিকার নামও প্রভাত, আমাদের জীবনেরও প্রভাত।" 'প্রভাত' ১৩২৫ ফাল্গুন-সংখ্যায় আছে—"আজ 'প্রভাত' নবম বর্ষ অতিক্রম করিয়া দশম বর্ষে পদার্পণ করিল। এই পত্রিকাকে একপক্ষে আশ্রমের প্রথম পত্রিকা বলিতে পারি। কারণ—মাঝে 'শান্তি' একরকম উঠিয়া গিয়াছিল, সেই সময় ভূতপূর্ব ছাত্র শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 'প্রভাত' পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত করেন। এই পত্রিকা প্রথমে শিশু-বিভাগ হইতে প্রকাশিত হয়। * * *

---

* ১। শান্তি ২। প্রভাত ৩। বাগান ৪। আশ্রম ৫। The Ashram ৬। Culture ৭। শিশু ৮। সাথী ৯। কানন ১০। বিকাশ ১১। দৈনিক ১২। অরুণ ১৩। পঞ্চমী ১৪। মধ্যাহ্ন ১৫। নিশীথ ১৬। যাত্রী ১৭। বীথিকা ১৮। ছবি ১৯। লাদম ২০। বুধবার ২১। গবেষণা ২২। প্রমা ('হিন্দী) ২৩। বিশ্বভারতী পত্রিকা ২৪। রবীন্দ্র-পরিচয় পত্রিকা ২৫। সাহিত্যিকা

অজিতকুমার চক্রবর্তী মহাশয় ও শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাহাদিগকে উৎসাহিত করেন।” ‘প্রভাত’ (১৩২১ মাঘ) পত্রিকার নিবেদনে রয়েছে—“সে আজ প্রায় পাঁচ-ছ’ বছর আগেকার কথা। এখন যে বাড়িতে* Mr. Pearson ও মহাত্মা গান্ধীর ছাত্রগণ থাকেন, সেখানে আমাদের শিশুবিভাগ ছিল। সে সময় বড় আনন্দেই কাটিয়াছিল, বাস্তবিক শিশুবিভাগে আনন্দিত হইবার অনেক জিনিষ ছিল।”

এর পরে ‘প্রভাত’ পত্রিকা যে কখন প্রকাশিত হয়, এবং প্রথম সংখ্যার মলাটের উপরে অজিত চক্রবর্তী মশায় যে একটি কবিতা লিখে দিয়েছিলেন, সে সব খবর দিয়ে অজিত চক্রবর্তী সম্বন্ধে লেখা হয়েছে—“তাঁহার আশীর্বাদ আজ আমরা স্মরণ করিতেছি। তিনি তখন শিশুবিভাগেই থাকিতেন। তাঁহার প্রধান চেষ্টা ছিল শিশুদের মধ্যে প্রকৃতির প্রতি ভালবাসা জাগাইয়া তোলা। তিনি শিশুবিভাগের জন্য তখন সত্য সত্যই অনেক নূতন নূতন চমৎকার নিয়ম করিয়াছিলেন।

“রোজ সকালে উঠিয়া আমাদের শিশুবিভাগের ছেলেদের বাগানের ফুলগাছে জল দিতে হইত। তারপরে জলখাবারের ঘণ্টার পূর্বে শিশুরা ছোট ছোট মাটির সবায় করিয়া ছাতু প্রভৃতি পাখিদের খাওয়াইত। শালগাছের তলায়-তলায় কাঠবিড়ালীর জন্য ছাতু ছড়াইয়া রাখা হইত। ছাতু আমরা ভাণ্ডার হইতে নিয়মিতরূপে পাইতাম। তিনি মাঝে মাঝে ভোরবেলা উঠিয়া সূর্যোদয়ের পূর্বে শিশুদের বেড়াইতে লইয়া যাইতেন। শিশুরা সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত খেলা করিত, সূর্যোদয়ের সময় চুপচাপ হইয়া থাকিত।

“সন্ধ্যাবেলায় শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মহাশয় গায়ত্রী মন্ত্র ও আজকালকার সমবেত উপাসনার মন্ত্র হারমোনিয়মের সঙ্গে ছেলেদিগকে সুর করিয়া গাইতে শিখাইতেন।”

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে লেখা হয়েছে—“তিনি আমাদিগকে তখন তাঁর নিজের লেখা, সাহায্য ও উৎসাহ দিয়া খুব উপকার করিয়াছেন।”

পত্রিকা বের করবার সার্থকতা সম্বন্ধে সম্পাদকীয় মন্তব্যে আছে,—“আশ্রমের ছেলেদের মধ্যে যাহাতে বাংলা-সাহিত্যের আলোচনা হয় এইজন্যেই ‘শান্তি’ ‘প্রভাত’ ‘বাগান’ প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছিল। তাহারা যদি কিছুমাত্র আমাদের সাহিত্যের স্বাদ দিয়া থাকে তবেই তাহাদের সার্থকতা।

‘প্রভাত’ আরো দুই বছর বাঁচিয়া থাক্‌, কি আজই লোপ পাউক, তাহাতে

---

*নূতন-বাড়ি

বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, কিন্তু সাহিত্যের চর্চা Nature Study প্রভৃতির দিকে আমাদের মন থাকিলেই পত্রিকা সার্থক হইবে।"

এ সব কাগজের মূল্য কতখানি,—শিশু ছাত্রগণ সে-সম্বন্ধে লিখেছে—'প্রভাত' প্রত্যেক আশ্রমবাসীরই আদরের ধন, কেননা এ যে আশ্রমের জিনিস। সেই পাঁচ ছয় বছরের আগেকার আশ্রমের ছেলেরা আগে কি রকম ছিল, কী ভাবিত, তার পরিচয় তো 'শান্তি' 'প্রভাত'ই বহন করিয়া আজ পর্যন্ত আসিয়াছে।"

'প্রভাত' (১৷২৩ মাঘ) পত্রিকায় এ সব খবরের সঙ্গে আর-একটি খবর আছে -"তখন শিশুবিভাগে একটা পুরস্কার ছিল, যে পাখিকে হাত হইতে খাবার খাওয়াইতে পারিবে সে ১০৲ টাকা পুরস্কার পাইবে।"

এই পত্রিকাটির অন্যতম সাহায্যকারী ছিলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

১৩১৭ সালে অনেকগুলি পত্রিকা বের হয় শ্রাবণ মাসের শেষ দিকে। কালীমোহন ঘোষ মহাশয় তখন আশ্রমের বাগান-বাড়ির ছাত্রদের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। তিনি শুধু ছাত্রদের দেখাশুনা করতেন না, তাদের নানা ভাবে প্রেরণা দিয়ে গড়ে তুলতে উদ্যোগী ছিলেন। বাগান-বাড়ির সামনে তিনি ছেলেদের বাগান করতে শিক্ষা দেন। এইভাবে বাইরের পরিবেশটির শ্রী ফুটিয়ে তুললেন এবং মনের ফসল সৃজন করবার উৎসাহ দিয়ে বের করালেন 'বাগান' নামে এক পত্রিকা। প্রথম বর্ষের অষ্টম সংখ্যা ফাল্গুনের 'বাগান' পত্রিকার ভূমিকায় আছে—"আমরা বাহিরে যেরূপ বাগান করি, আমাদের অন্তরেও সেইরূপ একটি বাগান করা উচিত। * * *

"আমাদিগকে সর্বদা এই কথা মনে রাখিতে হইবে যে, আমরা যে মহাত্মার সাধনার ক্ষেত্রে থাকিয়া অন্তরে ও বাহিরে বাগান করিয়া তুলিতেছি তিনি অল্প বয়স হইতে নিজের অন্তরে বাহিরে বাগান করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং তিনি অল্পকালের মধ্যেই সেই বাগানকে ফুলে ফলে সুশোভিত করিয়া তুলিয়াছিলেন।"

'আশ্রম' 'কুটির' প্রভৃতি পত্রিকাও এই বছরেই বের হয়। ছোট ছোট ছেলেদের জন্যই বিশেষ ভাবে 'আশ্রম' লিখিত। এটি বাংলা কাগজ। The Ashram নামে ইংরাজি পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৯১৩ সনে, এণ্ড্রুজ সাহেবের উৎসাহে। তখনো বিশ্বভারতী কিংবা কলেজ স্থাপিত হয়নি; ম্যাট্রিক ক্লাসের ছেলেরাই এই পত্রিকাটি চালনা করত। গুরুদেব, এণ্ড্রুজ সাহেব, সব সময় এতে সাহায্য করতেন। "At the present time, we get help from many different sources. Our Rev. Gurudev and Rev. C. F. Andrews often have helped us

wherever asked for and then Mr. W. W. Pearson and Babu Anil Kumar Mitra have been helping us with regular contributions." (The Ashram. 1914. Vol. 1. August)

স্কুল-কলেজের পর স্কা-পাশের ইংরাজি শেখাবার জন্য এ কাগজ বের করা হয়নি। ইংরাজি সাহিত্যের রসগ্রহণ ও ইংরাজ কবি এবং ইংরাজি সাহিত্যের ভিতর দিয়ে বিশ্ব-সাহিত্যের চিন্তাধারার সঙ্গে ছাত্রদের পরিচিত করানোই ছিল এর প্রধান উদ্দেশ্য। ভূমিকায় সে-উদ্দেশ্যটি ব্যক্ত করা হয়েছে। ইংরাজি কাগজ মাত্র একটাই ছিল না। ১৩১৭ অগ্রহায়ণ 'শান্তি' পত্রিকায় আশ্রমের খবরের মধ্যে 'Culture' নামে আর-একটি পত্রিকা প্রকাশিত হবে বলে লেখা আছে। এর একটিমাত্র সংখ্যা পাওয়া যাচ্ছে। তার মধ্যে 'Culture'-এর উদ্দেশ্য লেখা আছে। 'শিশু' ১৩১৮ সালে প্রকাশিত হয় শিশুদেরই জন্য। শ্রীপ্রমথনাথ বিশি অনেক কাগজের সম্পাদক ছিলেন। এ সব পত্রিকাতে দেখা যায় তখনো তিনি প্র. না বি. নামে প্রচুর গান কবিতা প্রবন্ধ নাটক লিখেছেন। এখানকার ছাত্রদের মধ্যে সেসময় সাধারণভাবে এমনি সংক্ষিপ্ত নাম লেখা প্রচলিত ছিল। অনেক নাম এরকম সংক্ষেপে লেখা আছে 'ভূ. চ. সে,' 'সু. কা. রা. চৌ' ইত্যাদি।

'সাথী' 'কানন' 'বিকাশ' 'দৈনিক' 'অরুণ' 'পঞ্চমী' 'মধ্যাহ্ন' 'নিশীথ' 'যাত্রী' 'বীথিকা''ছবি' 'লাদম' 'বুধবার' 'গবেষণা' 'প্রমা' (হিন্দী) প্রভৃতি আরো অনেক পত্রিকা বের হয়েছে। ক্রীড়া-বিষয়ক পত্রিকার দু'একখানি মাত্র পাওয়া যায়।

'ছবি' নামে পত্রিকাটি শুধু কেবল নানারকমের ছবি নিয়েই বের হত, তাতে কোনো লেখা থাকত না। 'লাদম' পত্রিকাটি একটি মাত্র কাহিনী নিয়েই প্রায় লেখা, সে এক অদ্ভুত লোকের কাহিনী। পত্রিকার উপরে মজার এক ছবি আঁকা। এ কাগজে দু'একটি হাসির গল্পও পাওয়া যায়। ১৩২৩ সালের মাঘের 'লাদম' পত্রিকায় 'চুট্‌কি চটাং' বলে একটি ছোট গল্প আছে—"একবার কলিকাতায় কোনো-এক সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররা তাহাদের সংস্কৃত-পণ্ডিত চতুর্ভুজের নিকট হইতে ছুটি লইয়াছিল। পণ্ডিত Principal-কে বলিয়া তাহাদিগকে ছুটি দিয়াছিলেন। সেই হইতে ছাত্ররা প্রায়ই তাহাদের পণ্ডিত মহাশয়কে বলিয়া ছুটি লইত। ইতিমধ্যে একদিন পণ্ডিত ও Principal-এ ঝগড়া হয়। তারপর একদিন ছাত্রেরা ছুটি চাহিল। তিনি বলিলেন যে, আমার আর ছুটি দিবার হাত নাই। তখন ছাত্রেরা দুঃখিত হইয়া লিখিল যে 'চতুর্ভুজস্য ভূজো নাস্তি, অপরে কিম্ করিষ্যন্তি।' তাহা দেখিয়া Pruncipal তাহাদিগকে ছুটি দিয়া দিলেন।"

বেশির ভাগ পত্রিকাতে লেখা থাকত হস্তপ্রেসে মুদ্রিত। সাধারণ "পাঠমঞ্চে রক্ষিত।" বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত হবার পরে 'বিশ্বভারতী' পত্রিকা ১৩২৮ সালে বের হয়। সম্পাদক-সংঘে ছিলেন—ফণীন্দ্রনাথ বসু, অসিতকুমার হালদার, বিভূতিভূষণ গুপ্ত এবং প্রমথনাথ বিশি। কলেজ, কলাভবন প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীগণ অধ্যাপক এবং কর্মিগণ এ কাগজে লিখতেন। তিনটি ভাগ ছিল—ইংরাজি, বাংলা এবং হিন্দী। প্রথম বর্ষের 'বিশ্বভারতী' পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্যে আছে "'বিশ্বভারতী' বিশ্বভারতীরই কাগজ। এর উদ্যোক্তা বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ও ছাত্রগণ।" আশ্রমের অন্যান্য পত্রিকার তুলনায় এ পত্রিকা শিশু হলেও এ পত্রিকার সম্মান ও দায়িত্ব ছিল সবচেয়ে বেশি। এর লেখার মাপকাঠিতে বিশ্বভারতীর শিক্ষার মান যাচাই হবার কথা। 'বিশ্বভারতী' বাছাই-করা লেখা নিয়ে বের হত। প্রথম সনের কাগজে 'বিশ্বভারতী'র বাণী (Motto) লেখা আছে—

"প্রান্ত হতে প্রান্তান্তরে পৃথিবীর সুদূর সীমায় আছে যেথা মানবের ইতিহাস, আছে সুধাময় বিশ্বগীতি—হোক্ সেথা প্রচারিত, হউক ধ্বনিত বিশ্বভারতীর সুমঙ্গল বাণী।"

আশ্রমের কর্মিগণ 'রবীন্দ্র-পরিচয় সভা' স্থাপন করেছিলেন, 'রবীন্দ্র-পরিচয় পত্রিকা'-ও একখানি প্রকাশিত হত। অন্য সব পত্রিকা লাইব্রেরিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এ কাগজটি আছে 'রবীন্দ্র-ভবনে'। 'রবীন্দ্র-পরিচয়' পত্রিকার উদ্যোক্তাদের প্রার্থনা পূরণ করবার উপলক্ষ্যে গুরুদেব 'নিঃস্ব' নামক কবিতাটি রচনা করেন। সে কবিতাটি পরে 'বীথিকা' কাব্যে সংকলিত হয়েছে।

এর পরে নূতন বাংলা পত্রিকা বের হয় 'সাহিত্যিকা' ১৯৩৮-৩৯ সনে। এটাও কলেজ কলাভবন সংগীতভবন সব বিভাগের মিলিত কাগজ। এ সমস্ত পত্রিকার আবার খুব সমারোহ করে বার্ষিক করা হোত।

"Two grand anniversary Ceremonies viz.—those of 'Bithika' and 'Bagan' were celebrated in our Ashrama last month with great eclat. We wish these papers a prosperous happy new year and many returns of the same." (The Ashram, 1913, Sep.)

২

শিক্ষা

"বৃহস্পতিবারের মন্দিরের উপদেশ যাহার ভাল হইবে তাহারই লওয়া হইবে।" (প্রভাত ১৩১৭ কার্তিক) এ থেকে জানা যাচ্ছে শান্তিনিকেতনের মন্দিরে উপাসনা তখন বৃহস্পতিবারে হত। ছাত্রগণের কেবল উপদেশ শুনে গেলেই চলত না, নিজেদের ভাষায় তার সারমর্ম সবাইকে লিখতে হত, সবচেয়ে ভাল লেখাটি ছাত্রদের পত্রিকাতে বেরত। গুরুদেবের মন্দিরের উপদেশের একটিতে আছে—"আমরা আশ্রমে কিসের জন্য আসিয়াছি। আমাদের স্বভাব ও চরিত্রের উন্নতি হইবে। * * * সপ্তাহখানেক পরে তোমরা ও আমি এস্থানে জড়ো হই। * * * এই দিন বড় পবিত্র।" (গুরুদেবের বৃহস্পতিবারের উপদেশ, 'আশ্রম', ১৯১০ সন ২য় সংখ্যা)

আরেকদিন মন্দিরের উপাসনায় তিনি বললেন যে, ছাত্রগণ অনেকেই কিছুদিন পরে এ আশ্রম থেকে সংসারে ফিরে যাবে, সাংসারিক কাজকর্মে লোভ-ক্ষোভের মধ্যে তাদের জীবন কাটবে। তখন তাদের পাথেয় থাকবে এখানকার শিক্ষা। গুরুদেব বলছেন—"তবে যেখানেই যাও—আর যেখানেই থাক, আমার কোনো ভাবনা নাই। আমি সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত হতে পারি, যদি তোমরা শ্রেষ্ঠ অনুভূতি লাভ করতে পার, তাহলে দুঃখে পড়েও তোমরা বিপথে যাবে না। শোকেও ম্রিয়মাণ হয়ে পড়বে না।" (১৭ই কার্তিক, বুধবারে মন্দিরে প্রদত্ত গুরুদেবের উপদেশ, 'শান্তি' ১৩১৭)

ছাত্রগণ প্রত্যেকেই যে এক-একজন বড়ো জ্ঞানী-গুণী হবে এ আশা রবীন্দ্রনাথ করেন নি। প্রতিভার অনুকূল বিচিত্র পরিবেশ তিনি তাঁর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে সৃষ্টি করে রেখেছিলেন। কিন্তু প্রতিভায় বড়ো হবার চেয়েও জীবনে এবং সংসারে চলতে রুচি, সংস্কৃতি ও চরিত্রের দরকার। প্রত্যেকটি ছাত্র সাধারণভাবে এ শিক্ষা পাবে, এ দিকেই গুরুদেবের লক্ষ্য ছিল। বিশেষ করে চরিত্র-গঠন চাই। যে-কোনো সুযোগে ছাত্রদের তিনি এ কথা বোঝাতে চেষ্টা করতেন। 'শান্তি' (১৩২ মাঘ) পত্রিকায় প্রকাশিত জনৈক ছাত্রের 'একটি চিঠি' থেকে জানা যায় যে, আশ্রম-সম্মিলনীর যে-সকল অধিবেশনে গুরুদেব সভাপতির আসন গ্রহণ করতেন তাতে সব-সময় একটি কথাই বারবার বোঝাতে চেষ্টা করেছেন—এ আশ্রমের উদ্দেশ্য কী।

"লেখাপড়া শিক্ষা করবার মতন বিদ্যালয় ভারতে অনেক আছে। কিন্তু যেখান হইতে ছেলেরা নিজেদের চরিত্র গঠন করিতে পারে এমন বিদ্যালয় অতি বিরল।"

আশ্রমে ছাত্রগণ অল্পদিনের জন্য আসত। যতদিন আশ্রমে থাকত ঠিক নিয়মমতোই চলত কিন্তু চরিত্রগঠনের পক্ষে এখানকার অল্পকাল লীন প্রভাব কতখানি স্থায়ী হবে সেই ছিল গুরুদেবের ভাবনা। ছাত্রদের জন্য তিনি উদ্বিগ্ন ছিলেন। জীবনে অনেক ভুল ক'রে অনেক জটিল পথ পেরিয়ে মানুষ তবে তার ঠিক পথটি খুঁজে পায়। ছাত্রদের যাতে সে ভুলভ্রান্তি না হয়, তারা এখানকার শিক্ষায় যাতে সহজেই জীবনের সত্যকে জানতে পারে, সেই ছিল তাঁর একান্ত চেষ্টা। ছাত্রদের জীবনের সফলতাকে গুরুদেব নিজের জীবনের সাফল্য বলে মনে করতেন। বলতেন, "এত সব ভুলভ্রান্তি আমাদের হলেও তোমাদের ভিতর দিয়েই তিনি এই অনুভূতিটি ফুটিয়ে তুলবেন, আজ হোক্ কাল হোক্ তোমরা একদিন এই সফলতা লাভ করবেই এবং আমরাও সেটি আমাদের জীবনের সফলতা বলে ধরে নেব।" (১৭ই কার্তিক, বুধবারের মন্দিরে গুরুদেবের প্রদত্ত ভাষণ 'শান্তি' ১৩২৭)

কেবল আশ্রমের শান্ত উন্মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে বসেই গুরুদেব উপাসনা করেন নি; যখন বিলাতে গেছেন, সেখানেও জনকয়েক আশ্রমবাসীকে নিয়ে উপাসনা করেছেন। সেখানকার পথে-ঘাটে মানুষের প্রচণ্ড সংগ্রামের মধ্যেও চিত্তের প্রশান্তি রক্ষা করবার উপদেশ দিয়েছেন; সে-কথাগুলি আশ্রমের ছাত্রদের জন্য কালীমোহন ঘোষ মহাশয় চিঠিতে লিখে পাঠিয়েছিলেন, ছাত্রদের পত্রিকায় তা প্রকাশিত হয়েছিল। আশ্রমের সর্বসাধারণের পক্ষে এ পত্রিকাগুলি তখন শিক্ষা, সংযোগ, সাহিত্য ও সংবাদের বাহন ছিল।

'শান্তি' (১৩২১ বৈশাখ) পত্রিকায় গুরুদেবের আরেকটি উপদেশ আছে—(১০ই বৈশাখ ১৩২১) "তোমরা যে সময়ে আশ্রমে শিক্ষা সমাপ্ত করে সংসারে যাবে তখন তোমাদের কেবল আশ্রমের আমোদ-আহ্লাদ, খেলা-ধুলোর কথাই কি মনে পড়বে? প্রাতে সন্ধ্যায় যে নমস্কার করেছ, সে কথা যদি মনে না হয়, কেবল আমোদ-প্রমোদের কথা মনে হলে সবই বৃথা

"এটি যে তোমাদের রণক্ষেত্র। ইতিহাসে দেখতে পাই যে, মানুষ তাদের রণক্ষেত্রকে চিরস্মরণীয় করে রাখে। তেমনি তোমাদের এই আশ্রমটি রণক্ষেত্র বলে কি তোমাদের কাছে স্মরণীয় হবে না?"

কিসের রণক্ষেত্র? দিনের পর দিন মিথ্যার বিরুদ্ধে পাপের বিরুদ্ধে লড়াই। বীরগণ যেমন দেশরক্ষার জন্য প্রাণ বিসর্জন করেন, "তেমনি তোমরা প্রতিদিন

বীরের মতো লড়াই করবে, কত রক্তপাত কত সংগ্রামের পর সে আসনটি পাতা হয়।"

এ আসন বীরের গৌরবের সিংহাসন। আশ্রম থেকে সংসারক্ষেত্রে গিয়ে এ আসন লাভ করতে হবে। বলছেন, "আশ্রমদেবতা তোমাদের জয়বর্ম পরিয়ে ললাটে তিলক দিয়ে রণক্ষেত্র পাঠাবেন, জানি না জয় হবে কি না। কিন্তু সংগ্রাম ছাড়বে না, বীরের মতো লড়াই করবে।"

এ পথ যে সহজ পথ নয়, আজীবন যে এর জন্য সংগ্রাম করে যেতে হবে, সে-সব উপদেশ দিয়ে গুরুদেব বলছেন, "প্রতিদিন আমি আশ্রমের আদর্শটি সামনে রেখে সংগ্রাম করেছি। এটি তোমরা যখন ভাববে তখন তার যে আনন্দ খেলা-ধূলার স্মৃতির আনন্দের চেয়ে তা যথার্থ, প্রকৃত আনন্দ।" এ জিনিসটিই যে গুরুদেব একান্তভাবে চাইতেন সে-কথা তিনি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, "সংসারে গিয়ে যখন এই সংগ্রাম করবে তখন এই কথাটিই মনে হবে, 'হ্যাঁ, ওখানকার ওঁরা আমার কাছে যা প্রত্যাশা করেন, আমি তাই করছি। অলস ব্যক্তি যেমন শুয়ে ঘুমিয়ে কাটায় তেমনি ভাবে আরামে কাটাই না যেন।"

গুরুদেবের এরকমের অনেক উপদেশ, তা ছাড়া শিক্ষক, ছাত্র এবং বাহিরের অনেক লোকের অনেক কথা ও ঘটনার বিবরণ সকল সময় বাইরের পুঁথিপত্রে মুদ্রিত হয়নি। এগুলি একেবারে শান্তিনিকেতনের ঘরোয়া জিনিস। আজ এর কোনো-কোনো কথা কারো-কারো কাছে তুচ্ছ মনে হতে পারে ; কিন্তু বিকাশোন্মুখ আশ্রমের জীবন্ত ভাবটি মনে মুদ্রিত করে দেবার পক্ষে এরা বিশেষ সহায়ক। ক্ষুদ্র হয়েও সেই হেতু এরা সুন্দর, এরা মূল্যবান।

মন্দিরে গুরুদেব উপস্থিত না থাকতে পারলে অন্য কোনো অধ্যাপক উপদেশ দিতেন। শ্রীক্ষিতিমোহন সেন, শরৎ রায়, বিধুশেখর শাস্ত্রী, নেপালচন্দ্র রায় প্রভৃতি অনেকেই ছাত্রদের নিয়ে উপাসনা করতেন। মন্দিরের কয়েকটি উপদেশ কার দ্বারা প্রদত্ত তা লেখা নেই, তবে দেখা যায় তার মধ্যেও শিক্ষার কথা আছে।

নানা দেশ থেকে ছাত্রগণ তখন আসতে শুরু করেছে ; আশ্রমজননীর কোলে তারা এক-পরিবারের শিশুর মতো শিক্ষা পাচ্ছে ; মন্দিরের উপাসনায় একটি ভাষণে সকলকে স্নেহ-ভালবাসায় সম্বদ্ধ হয়ে বাস করবার উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। নিজেদের ভিতরকার দৈনন্দিন দোষত্রুটির কথাও অকপটে আলোচিত হয়েছে। সে প্রসঙ্গে বিভিন্ন দেশীয় লোকের সঙ্গেও আত্মীয়ভাবে মিলেমিশে থাকার উপদেশ দিয়ে আচার্য বলছেন,—"আমরা আশ্রমে যাহারা বাস করি তাহাদিগকে পরস্পরে

যেন ভালবাসিতে পারি। আমরা নানা দূর দেশ হইতে আসিলেও এই আশ্রম-জননীর সন্তান। গৃহে জননীর অনেক সন্তান থাকিলে তাহারা যেমন পরস্পরকে ভালবাসে সেইরূপ আমরা এই আশ্রম-জননীর কোলে থাকিয়া পরস্পরে যেন বিবাদ না করি।"

এ সম্বন্ধে গুরুদেবেরও একটি উপদেশ আছে 'বাগান' (১৩১৮ অগ্রহায়ণ) পত্রিকায়, "তোমরা দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছ, দেখিতে দেখিতে বড় হইতেছ। ইহাতে তোমাদের তেমন চেষ্টা কিছুই নাই। *** কিন্তু প্রকৃত বড় হইতে হইলে তোমাদের নিজের চেষ্টা ভিন্ন কিছুতেই কিছু হইবে না, সেজন্য তোমাদের সর্বক্ষণ সতর্ক থাকতে হবে। *** কুঁড়ি ফুটে উঠে তখন তার সুগন্ধে যেমন চারিদিক আমোদিত করে তোমাদের হৃদয়গুলিও তখন ভক্তির সুবাস ছড়াইয়া সকলকে মুগ্ধ করিবে।

*** আমি শুনিতে পাই যে তোমরা ঝগড়া করিয়া পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে কথা বল না, তোমাদের এই শিশু-হৃদয়ের মতি, কত অসরলতা, কত অন্যায়—পাপ সমস্ত আছে যখন সে সব শুনি তখন আমার মনে অত্যন্ত আঘাত লাগে। তোমরা এ সমস্ত হতে যাতে নিজেদিগকে মুক্ত রাখিতে পার তাহার জন্য আশ্রমে আসিয়াছ।"

আরেকটি উপদেশে আছে—"আমি তোমাদের গুরু নই। তোমরা মনে কোরো না যে তোমাদিগকে উপদেশ দিচ্ছি। আমি তোমাদের সকলের নীচে ধুলায় দাঁড়িয়ে বলছি—এস না সবে আমরা চলি। শুয়ে-গড়িয়ে আরামে আমরা দিনগুলি না কাটাই। আমরা দুঃখের ব্রত নেব।

"তোমরা এখানে শিক্ষা পেয়েছ বলে তোমরা আমার শিষ্য—তাই তোমাদিগকে আমি বড় কথা বলছি এমন কথা ভেবো না। তোমাদিগকে স্নেহ করি বলে তোমাদিগকে উপদেশ দিচ্ছি তা-ও না। আমি যে তোমাদের মধ্যে মনুষ্যত্ব দেখেছি তাই দেখে বলছি তোমরা মনুষ্যত্বের গৌরব মনে রেখো।"

—আশ্রম ১৯১০ ২য় খণ্ড ২য় সংখ্যা

মন্দিরের উপদেশগুলিতে নানা ঘটনার উল্লেখ থাকত। তাতে কথাগুলি সহজে বোঝা যেত। লাটসাহেব আসবেন, সকলে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, কত মাজা-ঘষা চলে, পরিবেশটি সুন্দর করে তোলবার তাড়া লাগে। কোনো জায়গায় এ কথার উল্লেখ ক'রে মন্দিরের ভাষণে বলা হয়েছে,—"আমাদের নিজেদের মধ্যে যে লাটসাহেবটি আছেন, যেখানে আমাদের আত্মসম্মান জেগে রয়েছে সেখানে তাকে প্রতিদিন অপমানিত করতে আমাদের বাধে না।"

আশ্রমের ক্রীড়াবিভাগ সম্বন্ধে যত্ন নেওয়া হত। দেশী-বিদেশী খেলা—ফুটবল, হকি, ক্রিকেট, লাঠি ও ছোরা খেলা প্রভৃতি তো ছিলই, জাপানী যুযুৎসুও শেখানো হত। ক্রীড়া-বিভাগটি উন্নত ছিল। 'বাগান' ১৩১৯ পৌষ-সংখ্যায় খবর আছে "ক্রীড়া ও প্রদর্শনী' সম্বন্ধে। বীরভূমের প্রধান শহর সিউড়িতে সেবার ক্রীড়া ও প্রদর্শনী হয়েছিল। আশ্রমের ত্রিশ-চল্লিশ জন ছাত্র ও শিক্ষক তাতে যোগদান করেন। "ক্রীড়া-প্রদর্শনীতে আমাদের এখানকার ছাত্রগণ প্রায় সমস্ত বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া সম্মানের সহিত উৎকৃষ্ট পুরস্কারগুলি প্রাপ্ত হইয়াছেন।"

প্রদর্শনীতে আশ্রমের গোশালার একটি বলদ প্রথম পুরস্কার পেয়েছিল। দূরে এসে খেলার মাঠে সভা হয়; ইহাতে অধ্যাপক নেপালচন্দ্র রায় এবং অন্যান্য শিক্ষকগণ ছাত্রদের শরীরের যত্ন নিতে উৎসাহিত করেন; খোলা মাঠে রোদে বৃষ্টিতে ঘুরে শরীর মজবুত হয়, সঙ্গে-সঙ্গে খেলা-ধুলা করা এবং প্রত্যেকের ঘরের সামনে বাগান করাতে, মনের স্ফূর্তি এবং শারীরিক পরিশ্রমের ক্ষমতাও বাড়ে।

আশ্রমকে ছাত্ররাই তাদের পরিচালনায় গড়ে তুলবে, এজন্যে গুরুদেব বিভাগে-উপবিভাগে সমস্ত আশ্রমের কাজ ভাগ করে দিয়েছিলেন। ছেলেদের হাতে-লেখা পত্রিকা থেকে সে-পরিকল্পনার আভাস পাওয়া যায়। 'শান্তি' (১৩২৮ সাল ভাদ্র) পত্রিকাতে 'আমাদের আশ্রম' নামে একটি লেখা আছে। তাতে আশ্রমের আদর্শ কী, আশ্রমের ছাত্র ও শিক্ষকগণ আশ্রমের বাইরে কী-কী কাজ করছেন, আশ্রম কেমন ভাবে ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে তার বিবরণ দেওয়া আছে। একজন লিখেছেন,—"প্রত্যেক ঘরে ও বিভাগে একজন করে অধিনায়ক আছেন। ইহা ব্যতীত আশ্রমেরও একজন অধিনায়ক আছেন। *** পনেরো দিন অন্তর আবার নূতন অধিনায়ক ছেলেরা ভোট দিয়া নির্বাচন করেন। *** আশ্রম-সম্মিলনীর সম্পাদকই ছাত্রদের দিক হইতে আশ্রমের প্রধান। এই আশ্রম-সম্মিলনীকে আমার মতে Parliament বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।" এ সংখ্যাতেই আছে—"লেখাপড়াই যে আশ্রমের একটিমাত্র আদর্শ বা উদ্দেশ্য তা নয়। আমাদের আদর্শ হচ্ছে স্বাধীনতা ও যাতে মনুষ্যত্বের বিকাশ হয় তার চেষ্টা করা।"

আশ্রম-সংঘ বা সম্মিলনী ছিল ছাত্রদের প্রতিষ্ঠান। 'শান্তি' (১৩২৫ আষাঢ় ও শ্রাবণ) পত্রিকায় একটি চিঠি আছে। সেটি তৎকালীন একজন ভূতপূর্ব ছাত্রের লেখা। তার থেকে আশ্রম-পরিচালনার একটি সুন্দর খসড়া পাওয়া যায়। এ পরিকল্পনাটি ছাত্রটির নিজের। কিন্তু এমনি একটি পরিকল্পনার খসড়া গুরুদেব নিজের হাতে লিখে দিয়েছিলেন ব'লে প্রাক্তন-ছাত্রদের মুখে শোনা যায়। আশ্রমের

সে-পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজের ধারাটা কিছু পরিমাণে বজায় ছিল। ছাত্রটি সেটিকে ধরেই নিজের পরিকল্পনা জানাচ্ছেন—আশ্রম-সংঘ বা সম্মিলনীকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলতে হবে; তার একটি অফিস সংস্থাপন করা চাই। সেটাই আশ্রমের অফিস হবে। শিক্ষকগণ শুধু লেখাপড়া শেখাবেন এবং অভিভাবকদের সঙ্গে যোগ রাখবেন, এ ছাড়া আশ্রম-পরিচালনার বাকি সমস্ত ভার এই আশ্রম-সম্মিলনীর উপর ন্যস্ত থাকবে। সে সভাই আশ্রমের ব্যবস্থা পরিদর্শন ও সেবা-ভাণ্ডার পরিচালনা করবে, রান্নাঘরের দেখাশোনা ক'রে পাচক এবং ভৃত্যদের সাহায্য করবে। খেলা, বাগান করা, আয়ব্যয় দেখা, ম্যানেজারি করা, আশ্রমের জন্য নিয়ম-প্রণয়ন করা, সাহিত্য ও শিল্পকলা সংক্রান্ত লাইব্রেরি প্রভৃতির উন্নতি সাধন করা—সব কিছুই ছাত্রগণ করবে। শিক্ষকগণ শুধু তাদের পরামর্শদাতা-রূপে কাজ করবেন। অপরিণত-বয়স্ক সাংসারিক-জ্ঞানশূন্য ছাত্রগণ শিক্ষকদের সাহায্যে এ-সব দায়িত্বপূর্ণ কাজ করতে করতে হাতে-কলমে সব রকম জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হবে। এজন্য কাজের ভাগ থাকবে। বিভাগীয় নায়ক, গৃহনায়ক, পরিদর্শক প্রভৃতি থাকবে; তাদের তত্ত্বাবধানে ছাত্রদল এক-এক বিভাগের কাজ শৃঙ্খলার সঙ্গে চালাবেন। আশ্রম-সম্মিলনীর সভায় প্রত্যেক নায়ক তাঁদের হিসাব দাখিল করবেন, অভিযোগ থাকলে জানাবেন, বিচার পরামর্শ সব এ সভাতেই হবে, সবাই সেটা মেনে নেবেন। আশ্রমবাসী ছাত্র, ভৃত্য, শিক্ষক, কর্মী প্রত্যেকের সুখ-সুবিধার প্রতি ছাত্রগণই লক্ষ্য রাখবেন। শুধু আশ্রমই নয়, আশ্রমের আশে-পাশের গ্রামোন্নয়ন, প্রতিবেশী সাঁওতালদের শিক্ষা দেওয়া, দরিদ্রদের ও বন্যাপীড়িত দুঃস্থদের সাহায্য করা এসব কাজও ছাত্রদের অবশ্য করণীয়। এভাবে একটা সজীব শিক্ষার মধ্যে ছাত্রগণ মানুষ হবে, ছাত্ররা নিজেদের ভিতর থেকেই নিজেরা সে কথা ভাবতে পারছে,—ভাববার সঙ্গে সঙ্গে কাজ করবার দায়িত্ববোধও জাগছে। এসব সম্ভব হয়েছে গুরুদেবের কার্যপদ্ধতির গুণে। ছেলেদের উপর প্রবল বিশ্বাসে এতখানি ভারই তিনি ছেড়ে দিতে ব্যগ্র ছিলেন। ছাত্রটি লিখছেন, "আশ্রমের সমস্ত ভার গুরুদেব বারবার আশ্রমের ছেলেদের উপর দিতে এসেছেন, আমরাই সে-রকমভাবে গ্রহণ করতে পারি নি।"

মহাত্মাজি যখন আশ্রমে এসেছিলেন, তিনি উপরন্তু আরও চেয়েছিলেন—আশ্রমে ভৃত্য, পাচক প্রভৃতি থাকবে না, ছাত্রগণ নিজেরাই সব করবে। তাঁর নির্দেশ-মতো শিক্ষকগণ ছেলেদের উপর ভার দিয়ে দূরে সরে গিয়েছিলেন। পাচক ও ভৃত্যের কাজ ছাত্ররাই গ্রহণ করেছিল। এ প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হবার কারণ দেখিয়ে

ছাত্রটি লিখেছেন,—"কিন্তু তখনই এক দোষ করা হয়েছিল, তাঁদের (শিক্ষকদের) co-operation চাওয়া ও নেওয়া হয়নি। শিক্ষক ছাত্র ভৃত্য আশ্রমবাসী সকলের সমবেত চেষ্টা এবং co-operation-এর অভাবে গান্ধীজির মহৎ চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়।" আধুনিকভাবে সমস্ত শিক্ষা পেতে গেলে রান্না, বাসনমাজা প্রভৃতি স্থূল কাজগুলি ছেলেদের পক্ষে প্রতিদিন সম্পন্ন করা সম্ভবপর হবে না,—গুরুদেবের সেই বিবেচনা ছিল। নাচগান, খেলাধুলা, অভিনয়, সাহিত্য, শিল্পকলা, সেবা,—সব-কিছুই প্রত্যেকের শেখা চাই। রান্নাবান্না ও জলটানার কাজগুলি নির্দিষ্ট লোকেরা করুক, কিন্তু রান্নাঘরের পাচক-ভৃত্য প্রভৃতিকে দেখাশোনা এবং তাদের সাহায্য করা, নিজের-নিজের সাধারণ যা-কিছু কাজ তা নিজেরাই সম্পাদন করা—এ সবই এখানে ছাত্রদের শিক্ষার মধ্যে আবশ্যিক বলে ধরা হয়েছিল। শেষ-পর্যন্ত তাই হল; ছেলেরা রান্না, বাসনমাজা, জলটানার কাজ বাদ দিল। আশ্রমে যে যাই করুক, ছাত্রদের সঙ্গে মিলিতভাবে করবে, তাদের তদ্বিরে আশ্রম চলবে, এসব কথা লেখার পরে ছাত্রটি লিখেছেন "তা-হলেই গুরুদেবের ইচ্ছা খানিকটা পূরণ করা হবে।" ভাগে-ভাগে কাজের দায়িত্ব ছাত্রদের উপর ছেড়ে দেওয়া হত। একটি ঘটনার উল্লেখ আছে 'বাগান' (১৩২৪ পৌষ) পত্রিকায়। 'আশ্রম-সংবাদে' লেখা হয়েছে—"আমাদের অধ্যাপকেরা সকলে একমত হইয়া আগুবিভাগের ছেলেদের হস্তে নিজেদের আহারের ভার প্রদান করিয়াছেন। * * * ইহাতে আগুবিভাগের ছেলেদের খুব উপকার হইবে। কি করিয়া নিজেকে গুছাইয়া চলিতে হয় তাহা তাহারা শিক্ষা করিবে।" (বাগান ১৩১৯ তৃতীয় বর্ষ, কার্তিক ও অগ্রহায়ণ) ঐ পত্রিকাতেই আছে "গোশালা, আশ্রম-সম্মিলনী, সাহিত্য-সভা, ক্রীড়া, অভিযোগ ইত্যাদি বিষয়ের ভার এক-একজন সভ্যের উপর অর্পিত হইয়াছে।"

ছেলেরা নিজেদের কাপড়-কাচা, ঘর ঝাঁট-দেওয়া, শিক্ষক ও অতিথিদের সেবা-যত্ন করা প্রভৃতি কাজ করতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হত না। এসব ক্ষেত্রে গুরুদেব অন্য ছেলেদের থেকে নিজের ছেলেদের একটুও তফাত করেন নি। কালীমোহনবাবু শমীন্দ্রনাথ এবং তাঁর বন্ধু শ্রীশ মজুমদারের পুত্র সরোজ ওরফে ভোলা সম্বন্ধে 'শান্তি' (১৩১৭ অগ্রহায়ণ ও পৌষ) পত্রিকায় লিখেছেন যে, প্রথম যখন তিনি আশ্রমে আসেন শমীন্দ্রনাথ আর সরোজ তাঁর হাত-পা ধোবার জল এনে দিয়েছিল, বিছানা পেতে দিতে গিয়েছিল। "এগার বৎসরের এই ক্ষুদ্র বালকটির কাছ হইতে সেবা গ্রহণ করিতে আমার সংকোচ বোধ

হইতেছিল।" তার পরিচয় পেয়ে আরো সংকোচ বোধ ক'রে কালীমোহনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন "তোমাদের এসব ছোট কাজ করতে ইচ্ছা হয়?"

উত্তরে শমীন্দ্রনাথ বললেন যে, এসব কাজ করতে তাদের খুব ভাল লাগে।

'যাত্রী' পত্রিকায় তৎকালীন ছাত্র শ্রীসুহৃদ্‌কুমার মুখোপাধ্যায় "বিলাতে গুরুদেবের কথোপকথন" নাম দিয়ে অনুবাদমূলক একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। তাতে একস্থলে শান্তিনিকেতনের বিধিব্যবস্থা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মত সংকলিত করা রয়েছে। তিনি বলেন—" 'শান্তিনিকেতন'—আমার মনে হয় সেখানকার আবহাওয়াই হইতেছে সবচেয়ে আশ্চর্য জিনিস। উহার প্রণালী সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই নূতনত্ব নাই। বালকদিগকে গড়িয়া তোলা, তাহাদের দায়িত্ববোধকে জাগরিত করা, তাহাদিগকে সুরুচিসম্পন্ন করা এবং দেশের অবস্থা ও জীবন বুঝিতে সক্ষম করা অতি মহৎ কার্য। অন্য বিদ্যালয় হইতে কিসে ইহার পার্থক্য তাহা বলা শক্ত—কেবলমাত্র কতকগুলি পুণ্যপ্রভাব ব্যতীত আর বিশেষ কিছুই নয়। সেখানকার কার্যপ্রণালীর তালিকা হইতে কিছুই বুঝিতে পারা যাইবে না। বাহিরের দিক হইতে দেখিতে গেলে—ইহা মাঠের মাঝখানে স্থাপিত, বিদ্যালয়-গৃহ বলিয়া কোন গৃহ নাই, ছাত্রগণ গাছের ছায়ায় আসনে বসিয়া পড়া করে। ছাত্রদিগকে গান-বাজনা শিক্ষা দেওয়া হয়—মাঝে মাঝে অভিনয়ও হইয়া থাকে। ইহার চারদিকে একটি culture-এর atmosphere আছে। একটি টেকনিক্যাল কারখানা বিভাগ আছে। যাহারা যন্ত্রাদি চালনে পটু হইতে চায় ও ব্যগ্রতা দেখায় তাহারা সেখানে উৎসাহ লাভ করে। সেখানে সব-কিছুই আছে তাই কোনো বিশেষ পাঠবিধি না থাকা সত্ত্বেও ছাত্রগণ আপনা-আপনি নানারূপ আদর্শ ও ভাব গ্রহণ করিতে থাকে।

"অধুনা আমাদের দেশে শিক্ষাপদ্ধতি এতই বিদেশী যে আমাদের সমস্ত মৌলিকতা নষ্ট করিতেছে। আমাদের শিক্ষার আদর্শ এমন হইবে যাহাতে আমরা আমাদের নিজেদের সভ্যতা ও আদর্শ প্রচার করিতে পারি। ইহাই আমার নিকট সর্বাপেক্ষা বাস্তব ও স্পৃহনীয় মনে হয়।" —যাত্রী, শারদীয় সংখ্যা ২য় বর্ষ, ১৩২৭

নানা কারণে এ শিক্ষা বা পরিকল্পনা সম্পূর্ণভাবে রূপ ধ'রে উঠতে পারে নি। ছাত্রগণ ত্রুটি স্বীকার করে বলেছেন, "আমরাই (ছেলেরা) ইহার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী। পূজনীয় গুরুদেব আমাদেরই উপর আশ্রমের সমস্ত ভার দিয়াছেন।"

বিশ্বভারতী স্থাপিত হবার পরে 'বিশ্বভারতী' পত্রিকার সম্পাদক লিখেছেন যে, কোনো জায়গায় অধ্যয়ন করতে গিয়ে সেখানে ছাত্রগণ কেবল অধ্যয়নই করবে,

সেই বিদ্যালয়ের প্রতি তাদের কী কর্তব্য আছে না আছে তা আর তাদের দেখবার প্রয়োজন নেই—ছাত্রদের এ ধারণা অত্যন্ত ভুল। কেন না ছাত্রদের উপরেই বিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানের গড়ে-ওঠা অনেকাংশে নির্ভর করে। "যিনি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেন শুধু তাঁর বা জনসাধারণের ও শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর যে সেই বিদ্যালয়ের প্রতি কর্তব্য আছে তা নয়, ছাত্র-ছাত্রীদেরও সমানভাবে সেই বিদ্যালয়ের প্রতি কর্তব্য আছে, এবং সেই বিদ্যালয়ের উন্নতি ও অবনতির জন্য তাঁহারাও কতক দায়ী।"—বিশ্বভারতী (হাতে লেখা পত্রিকা) ২৮।৩।২৪

এ আশ্রম স্থাপিত হলে এর আদর্শ দেশে-বিদেশে উৎসাহ সঞ্চার করেছিল। তার থেকে সেদিন অন্যান্য জায়গায়ও এমনি আরো আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল। দামোদরের তীরে মহারাজা মনীন্দ্র নন্দী যে-আশ্রম খুলেছিলেন সেটি এই ব্রহ্মচর্যাশ্রমের অনুরূপ। মনীন্দ্র নন্দীর স্কুলটি এখানকার একজন ছাত্র দেখতে গিয়েছিলেন। গুরুদেবকে চিঠি লিখে তিনি সেখানকার খবর জানিয়েছেন—"তাঁরা বলেন যে তাঁরা বোলপুরেরই অনুকরণে এ আশ্রম খোলেন। আমাদের ওখানকার নিয়মাবলী প্রভৃতি আনিয়েছেন। * * * যোগানন্দ আশ্রম start করবার আগে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন। * * * তাঁরা আপনার suggestion নিতে খুব উৎসুক।"

রবীন্দ্রনাথের মতের উদারতা, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈশ্য, শূদ্র সব একত্র থাকা-খাওয়া, এরকম উন্মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে মানুষ হওয়া এবং ছাত্রদের নানা বিষয়ে শিক্ষালাভ করা প্রভৃতি তখন সকলের মধ্যে একটা প্রেরণা জাগিয়েছিল। বাংলাদেশের যুবকগণ এখানকার ছাত্রদের প্রতি কিরূপ আশা পোষণ করতেন, তার আভাস দিয়ে একটি চিঠি 'শান্তি' (১৩১৭ ভাদ্র) পত্রিকাতে বের হয়েছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজের একটি ছাত্র কয়েকদিনের জন্য আশ্রমে বেড়াতে এসেছিলেন; তিনি কলকাতা গিয়ে এখানকার ছাত্রদের নিকটে এক পত্র দেন। তার মধ্যে এখানকার বিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য, এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রভৃতির উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন, "আশা করি একদিন কবির স্বপ্ন সফল হইবে। বোলপুর আশ্রমের ছাত্রেরা একদিন আমাদের মাতৃভূমির মুখ উজ্জ্বল করিয়া তুলিবেন।"

এখানকার ছাত্রগণ লিখেছেন—"বাংলাদেশ এই আশ্রমের প্রতি আশান্বিত নয়নে চাহিয়া আছে। কিন্তু জানি না আমরা তাহার কতটুকু উপযুক্ত হইতে পারিতেছি।"

শুধু বাংলাদেশ নয়, অন্যান্য প্রদেশের লোকও আশ্রমে আসছে। 'যমুনা-

লালজী' (বাজাজ?) 'মধ্যদেশবাসী অতিথি।' তিনি মধ্যপ্রদেশে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। একবার এখানে বেড়াতে এসে তিনি বলেন—"আমার এই আশ্রমটি খুব ভাল লাগিয়াছে। * * আমি চেষ্টা করিব যাহাতে সেই বিদ্যালয়টি এই আশ্রমের মতন হয়। এই আশ্রমটি দেশের মঙ্গলের জন্য স্থাপিত হইয়াছে।"—*বাগান ১৩২৪ পৌষ*

সে-সংখ্যাতেই আছে, "ইহার পর পূজনীয় আচার্যদেব একটি উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা দেন—সমস্ত পৃথিবীর চোখ আমাদের এই আশ্রমের উপর পড়িয়াছে। যেটি সবচেয়ে বড় জিনিস সেটি আমাদের লাভ করিতে হইবে। এই আশ্রমে এমন-একটি জিনিস আছে যাহা দ্বারা বিশ্বের মঙ্গল করা যায়। তোমাদের এখন সেই জিনিসটি কাজে লাগাইতে হইবে। সেইটি লাভ করিতে হইবে।"

প্রতিষ্ঠানকে তার ছাত্রদলই গড়ে তুলবে, বাঁচিয়ে রাখবে—এই ছিল গুরুদেবের গভীর আকাঙ্ক্ষা। একটি পত্রিকাতে ছাত্রগণ নিজেরাই লিখছে, "আশ্রমের যে এখন এমন অবস্থা ইহার জন্য দায়ী কাহারা? আমরাই ইহার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী। পূজনীয় গুরুদেব আমাদেরই উপর আশ্রমের সমস্ত ভার দিয়াছেন। আমরা সানন্দে সে ভার গ্রহণ করিয়াছি। এখন যদি আমরা আশ্রমকে ভাল করিয়া গড়িয়া তুলিতে না পারি তাহার জন্য দায়ী অন্য কেহ হইবে না। সকল দোষ আমাদিগকে নতমস্তকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।" তার পরে কিভাবে আশ্রমকে পুনরায় সজীব করিয়া তোলা যায় সে-পরিকল্পনাও দেওয়া হয়েছে। এখানেও দেখা যায় ছাত্রগণ এ-প্রতিষ্ঠানের ভালোমন্দ সম্বন্ধে চিন্তা করছেন।

বিদেশের জ্ঞানী-গুণী এবং জনসাধারণও যে এ-আশ্রমটিকে কি-ভাবে দেখেছেন তারও নিদর্শন পত্রিকাগুলি থেকে পাওয়া যায়। অধ্যাপক কালীমোহন ঘোষ বিলাত থেকে এক চিঠিতে অধ্যাপক সন্তোষ মজুমদারকে লিখেছেন—"এ দেশের লোক ভারতবর্ষকে চাহিতেছে এবং আমাদের আশ্রমের ভিতর দিয়া চাহিতেছে। আজ আমরা আবার নূতন আশায় বুক বাঁধিয়া আশ্রমের সেবায় লাগিব।

"* * * আমি বুঝিতেছি আমাদের আশ্রমবাসীদের জীবন সাধারণ-জীবন নহে। আমাদের জীবনের একটা purpose আছে, একটা mission আছে। সেই Divine mission-এ আত্মোৎসর্গ করিতে হইবে।"—শান্তি ১৩১৯ ভাদ্র ও আশ্বিন

পিয়ার্সন সাহেবের শান্তিনিকেতন-আগমন সম্বন্ধে লিখিত হয়েছে—

"সন্তোষবাবু সাহেবকে দূর হইতে আশ্রমের সন্ধ্যামূর্তি দেখাইলেন। অল্প

অল্প জ্যোৎস্নায় মাঠের সাদা গৃহসকল আশ্চর্য সুন্দর দেখাইতেছিল। পিয়ার্সন আশ্রমের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—'তাহা হইলে আমি এখন আমার মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছি।'"—শান্তি ১৩১৯ ভাদ্র ও আশ্বিন

পিয়ার্সন আশ্রমে এসে প্রত্যেকটি জিনিসকে দেখেছিলেন। গুরুদেবের প্রতি একান্ত ভক্তিই শুধু এ রকম গভীর শ্রদ্ধার কারণ নয়; আশ্রমের অনেক ছাত্র ও শিক্ষকের সঙ্গে বিলাতে থাকতেই তাঁর আলাপ-পরিচয় হয়েছিল,—সে থেকেও এ আশ্রম সম্বন্ধে তাঁর উচ্চ ধারণা জন্মেছিল। নিবন্ধের লেখক লিখছেন,—"পিয়ার্সন একটি গভীর শ্রদ্ধা লইয়া আশ্রমে প্রবেশ করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার অন্তরের গূঢ়তম স্থান হইতে এই কথাটি আজ হঠাৎ এমন সুন্দরভাবে প্রকাশিত হইয়া পড়িল। তিনি স্থির হইয়া বসিয়া আশ্রমের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।"

৩

সাহিত্য

প্রথম থেকেই এখানে সাহিত্য এবং চারুশিল্পের একটি সহজ পরিবেশ রবীন্দ্রনাথ গড়ে তুলেছিলেন। তখনো সাহিত্য-সভা এবং পত্রিকা প্রভৃতি ছিল না, ছাত্র ছিল অল্প, ছাত্র-অধ্যাপকে মিলে ঘরোয়া সাহিত্য-চক্র ছিল। ১৯০৩ সন থেকে এ সাহিত্য-চক্রের খবর পাওয়া যায়। গুরুদেবের অনুরাগী খ্যাতনামা সাহিত্যিক সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র ১৩৪৭ সালে এখানে এসে 'সাহিত্যিকা'-সভার এক অধিবেশনে সভাপতি হন। তিনি যে লিখিত ভাষণ পাঠ করেন, 'আশ্রম-স্মৃতি' নামে সেটি 'সাহিত্যিকা' পত্রিকাতে বের হয়। সুরেন্দ্রনাথ ১৯০৩ সনে গ্রীষ্মের সময় প্রথম শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। অল্পদিনের জন্য গুরুদেবের সঙ্গে নিকটতম হবার সুযোগ পান। মধ্যমা কন্যা রেণুকার রোগবৃদ্ধি সংবাদে গুরুদেবকে তখন তাড়াতাড়ি আলমোড়া চলে যেতে হয়। সুরেন্দ্রনাথ সপরিবারে আশ্রমে কিছুদিন বাস করেন। সে-সময়কার বর্ণনা দিয়ে তিনি 'আশ্রম-স্মৃতি'তে লিখেছেন, "দুপুরে আমাদের সাহিত্যিক মজলিশ বসত।"

বিজ্ঞান এবং সাহিত্য দুই-ই সমানভাবে চর্চা করার ব্যবস্থা ছিল। সকালবেলা ফিজিকস্, কেমিস্ট্রি প্রভৃতি নিয়ে ছোটখাটো নানারকম পরীক্ষা চলত আর "সেই সঙ্গে তাদের ব্যাখ্যা, কতকটা কিণ্ডারগার্টেনের মতো।"

দুপুরবেলা সাহিত্যের মজলিশে সেক্সপীয়রের নাটক পড়া হত, রবীন্দ্রনাথের কাব্য পাঠ এবং আবৃত্তি হত। "আমাদের পাঠক সতীশচন্দ্র ও অজিত চন্দ্র।" শুধুই পাঠ চলত না, পঠিত অংশের বিষয়-বস্তু নিয়ে বিচার-বিতর্ক টীকাটিপ্পনিও চলত। "গুরু শিষ্য সকলেই সমপ্রাণ। * * * সকালবেলা আমি ছিলাম বিজ্ঞানের উপাধ্যায় এবং দুপুরবেলা কাব্যালোচনায় ছেলেদের সতীর্থ।"

সেই সাহিত্যিক মজলিশে গায়ক ছিলেন দিনেন্দ্রনাথ, ভরপুর সাহিত্যপ্রাণ। "মনে পড়ে একদিন দুপুরবেলা খেয়েদেয়ে বসেছি আমাদের পাঠচক্রে, এমন সময় দিনু বললেন—আজ আর পড়া নয়। সকলে মিলে চাঁদা করে একটা কবিতার মক্শ করা যাক।"

সবারই মনে কবিত্বের ভাব জমে উঠল। দিনেন্দ্রনাথ বলে উঠলেন—

"এস্রাজ শোনা আজ সুমধুর তান,
মধুর সংগীতে তোর ভরে যাক কান।"

উত্তরে সতীশচন্দ্র রায় বললেন—

"কহিল এস্রাজ শত কান করি খাড়া
এ গরমে গান কী রে, ওরে লক্ষীছাড়া।"

তারপরে সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের পালা। তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে উঠলেন—

"তবে যদি শালী বলি মলি দাও কান
গান বাহিরিতে পারে দুই চারি খান।"

সমস্ত গ্রীষ্মের দুপুর এমনি হাসিগল্পে কাব্যপাঠে কবিত্বে রম্যভাবে কাটত। "রোদ পড়ে এলেই আমরা দল বেঁধে বাহির হতাম মাঠে।"

সারাদ (charade) খেলার মধ্য দিয়েও যে কেমন বুদ্ধির বিকাশ এবং অভিনয় শিক্ষা হত, সুরেন্দ্রনাথ সে কথাও লিখেছেন। একদিন বিকেলে বেড়িয়ে ফিরছেন, হঠাৎ—"ঠাণ্ডা দমকা হাওয়ার সঙ্গে বিদ্যুৎ ও বজ্রের ঝিলিক আর হুংকার।"

সবাই দৌড়ে গিয়ে একটি কুটিরে আশ্রয় নিলেন। "মুষলধারে বৃষ্টি নামল। সময়টা কাটে কী ক'রে। খেয়াল হল, একটা সারাদ (charade) অভিনয় করা যাক্। তাড়াতাড়ি দুই অংকের একটা নাটিকার এক খসড়া ঠিক হয়ে গেল। রথী হলেন পুত্র, আমি পিতা, দিনুর ভূমিকাটা মনে নেই। * * *

এইটুকু শুধু মনে আছে, সে হেঁয়ালী নাট্যের ভিতর কথাটা হচ্ছে 'বিদ্যুৎ!' প্রথম অংকে 'বি' এবং দ্বিতীয় অংকে 'দ্যুৎ'।"

এর পরে সাহিত্যসভা এবং পত্রিকার খোঁজ মেলে ১৯০৭ সন থেকে। 'শান্তি'র অধিকাংশ প্রবন্ধই শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ছাত্রসভায় পঠিত।

সাহিত্য-সভার উদ্দেশ্য গল্প-কবিতা প্রভৃতি হাল্কা চর্চা নয়, গুরুদেব কী চেয়েছিলেন, এর মধ্য দিয়েই ছাত্রদের লেখা থেকে তা জানা যায়। 'শান্তি' পত্রিকার এক সংখ্যায় আছে, "বিদ্যালয়স্থ সকলকেই আমরা ভাল ভাল প্রবন্ধ এবং চিন্তার ফল এখানে উপস্থিত করিতে আহ্বান করিতেছি। * * *

নানাপ্রকার অনুসন্ধান

"সকলেই যদি কিছু-কিছু অনুসন্ধান করেন (যেমন পিপীলিকা, উই, গাছ-পালা প্রভৃতি সম্বন্ধে) এবং তাহার ফল এই সভায় উপস্থিত করেন তবে খুব ভাল হয়। আমাদের দেশে ইহার অত্যন্ত অভাব।"

গুরুদেব সাহিত্য-সভার মারফত জ্ঞানচর্চার এক সুন্দর পন্থা প্রবর্তন করে-ছিলেন। মাঝে-মাঝে পুরস্কার ঘোষণা করা হত। "ভ্রমণ, গল্প, Nature Study (প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ), ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক ও মহাপুরুষ-চরিত্র সম্বন্ধে 'বাগানে' একটি প্রতিযোগিতা হইবে। যাঁহারটি সর্বোৎকৃষ্ট হইবে তাঁহাকে এক বৎসরের 'Boys Own Paper' দ্বারা পুরস্কৃত করা হইবে।"

প্রত্যেক পত্রিকাতে প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, ছবি, আশ্রম-সংবাদ, দেশ-বিদেশের খবর, পত্রিকা-সমালোচনা ইত্যাদি থাকত। প্রবন্ধগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়—

(ক) শিক্ষামূলক রচনা ও চিঠিপত্র।

(খ) জীবনী, ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি বিষয়ক।

(গ) প্রকৃতির রূপ-বর্ণনা—জলপথে স্থলপথে ঋতু বর্ণনা প্রভৃতি।

(ঘ) প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণ—জ্যোতির্বিজ্ঞান, ফুল-ফল, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি।

(ঙ) সাঁওতাল গ্রাম, সাঁওতাল এবং অন্যান্য গ্রাম সম্বন্ধীয়।

(চ) শিল্প-বিষয়ক।

(ছ) রস-রচনা।

রবীন্দ্রনাথ এখান থেকে ছাত্রদের বিদেশে পড়তে পাঠিয়েছিলেন, সঙ্গেও নিয়ে গেছেন অনেককে।—কালীমোহন ঘোষ, মুকুল দে, দেবল, এণ্ডরুজ, নন্দলাল বসু প্রভৃতি অনেকে বিদেশ থেকে অনেক রকম চিঠি লিখে পাঠাতেন। কালীমোহন বাবুর নিজের লেখা চিঠিগুলি শিক্ষা-বিষয়ক। 'শিশু' পত্রিকাতে প্রকাশিত তাঁর চিঠিতে বিলাতের খ্রীষ্টোৎসবের বর্ণনা রয়েছে। খ্রীষ্টোৎসবের পরদিন তিনি রোদেনস্টাইনের বাড়ি বেড়াতে গিয়ে দেখেন একটি গাছকে ওরা সাজিয়েছে; তার সামনে যে পুতুল সাজিয়েছে তার সাজ-পোশাক ও অলংকার ভারতীয়। ইংলণ্ডে খ্রীষ্টোৎসবে গাছ-সাজানোর ব্যাপারটি জার্মানরা প্রবর্তিত করেছে। আরো প্রসঙ্গ আছে; ও-দেশের শিশু-প্রদর্শনীর সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ লিখেছেন। "ইংলণ্ডের ছোট ছোট শিশুদের এই ছুটির সময় বিশুদ্ধ আমোদ-প্রমোদ ও শিক্ষার জন্য এই প্রদর্শনী।" সেখানে ঢুকে তিনি দেখলেন কৃত্রিম হ্রদে ছোট ছোট জাহাজ ভাসছে, শিশুরা সেগুলি দেখছে, কলকব্জা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। তাতে ওদের একদিকে অত্যন্ত আনন্দ হচ্ছে, আবার কলকব্জা সম্বন্ধে জ্ঞান-লাভও হচ্ছে। তারপরেই একটা পরীর রাজ্য। জ্যান্ত পরী শিশুর দল; লণ্ডনের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা একত্র হয়ে অদ্ভুত পরীর পোশাক প'রে সুন্দরভাবে নাচছে। এক-এক বিদ্যালয়ের এক-একদল। "আমাদের শারদীয় উৎসবে তোমরা 'নবীন ধানের মঞ্জরী দিয়ে', ডালি সাজিয়ে নেচে নেচে যে গান করেছিলে এ সেই ধরনের।" সে-প্রদর্শনীতে আরো ছিল—'বাগান-বাড়ির দৃশ্য', 'Boy Scout'; তাছাড়া রয়েছে অতি পুরানো যুগ থেকে আধুনিক সময় অবধি শিশু-সাহিত্যের ক্রমবিকাশ এবং শিশুদের হাতের শিল্পকারিকরি দেখানোর ব্যবস্থা। লিখেছেন—বড়-বড় শিক্ষাবিদ্‌দের পরিকল্পনা তার পিছনে রয়েছে; স্কুল-কলেজের ক্লাস ছাড়াও, শিশুরা ছুটির দিনে কত তথ্য কত রকম সাধারণ জ্ঞান যে সেখানে লাভ করতে পারে, চিঠির বর্ণনা থেকে তা বোঝা যায়।

'বাগানে'র আরেকটি সংখ্যায় কালীমোহনবাবুর পত্র থেকে বিলেতের ছাত্র-সম্মিলনীর খবর পাওয়া যাচ্ছে। সেখানে খাট বা মাচা নেই। মাটির উপরে এক-হাত খড়ের বিছানায় রয়েছে শোবার বন্দোবস্ত; চাদর-বালিশও নেই, শুধু দুটো মোটা কম্বল। "ইংরাজ যুবকদের মহত্ত্ব এই যে এদের যে-সব বড়লোকের ছেলে সর্বদা আরামে বর্ধিত তাহারাও কষ্টসহিষ্ণুতায় অভ্যস্ত। রুটি, মাখন ও চা খেয়ে সাতদিন অনায়াসে কাটাতে পারে।"

সেই ছাত্র-সম্মিলনীর খেলাতে ছেলে-বুড়ো, বিদ্বান ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও অনায়াসে যোগ দিয়ে আনন্দ করেন। "সেদিন পাদ্রীরাও যেন শিশু হইয়া যায়। ছাত্র

অধ্যাপকে কোনো ভেদ থাকে না। * * * এদের দেখিলাম যারা সভামণ্ডপে খুব গভীর আধ্যাত্মিক বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছেন তাহারাই আবার Sporting Ground-এ ছেলেদের সঙ্গে 'হাতী দৌড়ে' যোগ দিচ্ছেন, এক-পায়ে লাফাচ্ছেন।"

এসবের বর্ণনা করে তার পাশে শান্তিনিকেতনের অনেক শিক্ষক যে ছাত্রদের সঙ্গে এমনিভাবে মিলেমিশে থাকতেন, তারও উল্লেখ করে লিখছেন,—"এদের যারা বৃদ্ধ তারা প্রায় সকলেই আমাদের 'নেপালবাবু'র মতো। শিশুবিভাগের দলে ভিড়িয়া 'ডাংগুলি' খেলতেও পারেন, আবার ফুটবল Ground-এ (বড়) ছেলেদের সঙ্গে মন খুলিয়া মিশতেও পারেন।"

খেলার এবং সম্মিলনীর কয়েকটি ছবিও কালীমোহনবাবু পাঠিয়েছিলেন, সেগুলি পত্রিকাতে সাঁটা রয়েছে। 'শিশু' (ভাদ্র ও আশ্বিন ১৩১৮) পত্রিকায় কালীমোহন-বাবুর আরেকটি পত্র আছে; তাতে লিখেছেন, এ-দেশের শিশুরা ছোটকাল থেকে কত সহজভাবে জ্ঞান অর্জন করে। "সবচেয়ে বড় খেলা হচ্ছে—পুকুরের জলে জাহাজ-ভাসান। * * কোন্ দিকে হাল ফিরালে পালের জোরে জাহাজ কোন্ দিকে যাবে, কোন্-মুখো হাওয়াতে পালটাকে কোন্ দিক ঘুরাতে হবে এ সব তত্ত্ব এরা ছয়-সাত বৎসর বয়সে ঐ গোল-পুকুরে খেলার-ছলে শিক্ষা করে।"

কালীমোহনবাবু Westminister Chapel-এ একবার খ্রীষ্টানদের উপাসনা দেখতে গিয়েছিলেন। সেখানকার বর্ণনা দিয়ে লিখছেন,—"একদল গায়ক বেদীর সম্মুখ হইতে গান ধরিল, আর তিন হাজার লোক শ্রদ্ধাভরে দাঁড়াইয়া গানে যোগ দিল। * * * আমরা আশ্রমে যখন দুশো ছেলে 'ওঁ পিতা নোহসি' উচ্চারণ করি—গলার মিল রাখতে পারিনে, আর এরা তিন হাজার লোক একত্র হয়ে স্তব গান করছে, এদের মিল তো ভঙ্গ হয় না। তোমরা একটি কাজ করবে, যখন সকাল-সন্ধ্যায় স্তোত্র পাঠ করবে এ বিষয় দৃষ্টি রাখবে।"

'বাগান' (আষাঢ় ১৩২৩) পত্রিকায় সন্তোষ মজুমদার 'আমাদের শিক্ষা' প্রবন্ধে লালা লাজপত রায়ের একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। তাতে জানা যায়,—আমাদের দেশের ছেলেরা যে-শিক্ষা পেয়ে বিদেশে যায়, বিদেশের পক্ষে তা এত কম, যে, সব বিষয়ে তারা অনুপযুক্ত প্রমাণিত হয়।

"লালা লাজপত রায় বলিতেছেন 'আমি দেশের বাহিরে আসিয়া দেখিতেছি ভারতবর্ষের বাহিরে ভারতবর্ষের কলেজের বিদ্যার কোনও আর্থিক মূল্য নাই।

"* * * কিন্তু আমরা যে কত অসহায় তাহা ভারতবর্ষের বাহিরে উপার্জন করিবার চেষ্টা করিতে গেলেই বুঝিতে পারি। ভারতবর্ষ হইতে এণ্ট্রান্স, এফ. এ.,

বি. এ., পাস করিয়া আমাদের ছাত্ররা আমেরিকায় আসিয়া হঠাৎ বিপন্ন হইয়া পড়েন, তখন বাসন-মাজা, ঝাঁট-দেওয়া, ক্ষেত্রে কোদাল-পাড়া ছাড়া অন্য কোনও কাজ তাঁহাদের জোটে না। যে-শিক্ষা তাঁহারা ভারতবর্ষে পাইয়া আসিয়াছেন, তাহাতে এ কাজ করাও তাঁহাদের পক্ষে যে সহজ হয় তাহা নহে। হাত-পা'র ব্যবহার করিতে তাঁহারা কোনও দিন তো শিক্ষা পান না।

"* * বস্তুত শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা ছোট শিশুর মতো সর্বপ্রকারে অক্ষম।

"* * এই তো গেল একদিক। শিক্ষায় মনের 'কালচারে'র যে একটা দিক আছে সে সম্বন্ধে আমাদের তো কোনো ধারণাই নাই। সংগীত সম্বন্ধে আমাদের কান একেবারে নাই। ভাল ছবি কি পেন্টিং দেখিবার চক্ষু আমাদের নাই।"

এর পরে উপসংহারে কালীমোহনবাবু বলছেন, "আমাদের আশ্রমে কোনো কোনো ছাত্রের মুখে শোনা যায় 'এখানকার চেয়ে ওখানে ভাল পড়ান হয়, এখানে গানে লেখায় অভিনয়ে এত সময় নষ্ট হয়, নিজে বাসন মাজা ঘর ঝাঁট দেওয়া, কোদাল-পাড়া—এ কি অদ্ভুত' ইত্যাদি। * * লাজপত রায়ের এই কথাগুলি তাঁহারা যদি ভাল করিয়া পড়িয়া দেখেন তবে বুঝিতে পারিবেন 'গানে খেলায় অভিনয়ে বাসন-মাজায় ঘর ঝাঁট-দেওয়ায় এত সময় নষ্ট করা কেন দরকার।"

জার্মেনীর কিন্ডারগার্টেন শিক্ষা, ইংলণ্ডের নানা রকম শিক্ষা এবং আমেরিকার গ্রামার স্কুল এবং স্কুলের পদ্ধতি সম্বন্ধে নানা লেখা এসব পত্রিকায় আছে। 'বাগানে' (১৩২১ অগ্রহায়ণ ও পৌষ) প্রকাশিত, আমেরিকার স্কুল সম্বন্ধে একটা চিঠি পাওয়া যায়। "সকাল নয়টা হইতে বৈকাল ৩টা পর্যন্ত গ্রামার স্কুল-এ পাঠের সময়। তিনটার পর ইচ্ছা করিলে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত কোনো ক্লাব অথবা কোনো ভদ্র-পরিবারে এই সকল ছাত্ররা কাজ করিতে পারে, এবং ইহার জন্য খাওয়া ও ঘরভাড়া ছাড়া মাসিক পনর টাকা সহজেই পাওয়া যায়।"

ওদেশের "দরিদ্র ছাত্রগণ ইচ্ছা করিলেই" স্টেটের শরণাপন্ন হতে পারে, কিন্তু সে দেশে পৌরুষ জিনিসটা এমন জাগ্রত যে, "ছোট ছোট ছেলেরাও সহজে তাহাতে সম্মত হয় না।" পত্রের মধ্যে বিলাতের ডাক্তারের ব্যবস্থা, মেয়েদের শিক্ষা, শারীরিক উন্নতির ব্যবস্থা, প্রত্যেকটি বিষয় সহজ সরস ভাষায় আশ্রমের ছাত্রদের জানাবার জন্য লেখা হয়েছে।

ঐতিহাসিক প্রবন্ধগুলির কয়েকটিরই লেখক হচ্ছেন 'রবীন্দ্র-জীবনী'কার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। 'টিউটনিকদের পৌরাণিক কাহিনী' 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা', 'মিশরের ইতিহাস' ইত্যাদি তাঁর লেখাগুলি শুধু তথ্যপূর্ণ

নয় চিন্তামূলকও। 'শান্তি' (১৩১৭ কার্তিক) পত্রিকায় তিনি 'পূর্ণতা ও প্রতিক্রিয়া' প্রবন্ধে ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব—প্রত্যেকটি ধর্মের পূর্ণতা ও পতনের কারণ আলোচনা করেছেন। বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে বলেছেন—" 'হীনযান' বৌদ্ধধর্ম যে 'মহাযান'-এর দ্বারা স্থানান্তরিত হইল, তাহার কারণ মানুষ একটা-কিছু আঁকড়াইয়া ধরিতে চায়। 'মহাযান' বৌদ্ধধর্ম বুদ্ধকে পূজা আরম্ভ করিল। ** অপর দেশে চীনে জাপানে বৌদ্ধধর্ম 'মহাযান' আকারে রহিয়াছে। সেখানে বুদ্ধ দেবতা।"

জীবনী লেখা হয়েছে দেশ-বিদেশের জ্ঞানী, কর্মী, কবি, ভক্ত মহাপুরুষদের অনেকের। 'মহামান্য তিলক,' 'কর্মবীর রমেশচন্দ্র,' 'বিদ্যাসাগর', 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ', 'বুদ্ধদেব', 'নানক', 'রামমোহন রায়', 'রবীন্দ্রনাথ' এমন-কি কবি প্রিয়ংবদা দেবীর একমাত্র পুত্র 'তারাকুমারে'র জীবনীও সংকলিত হয়েছে। এখানকার পরলোকগত ছাত্রদের মধ্যে আছে সতীশ রায়, সরোজকুমার, সুহৃদকুমার প্রভৃতির কথা।

ছেলেরা যেখানেই ভ্রমণে যেত সেখানকার কথা পত্রিকাতে লিখত, সবাই তা পড়ত। 'পুরী', 'গৌহাটির কাছে বশিষ্ঠধারা,' 'যশাইকাঠি গ্রাম,' 'জয়দেব,' 'নবদ্বীপ,' 'মুরশিদাবাদ,' 'হেতমপুর,' 'লাভপুর,' 'দামোদর,' 'অজয়'—কত দেশ, কত গ্রাম মন্দির পাহাড় নদনদীর খবর বিতরণ করা হয়েছে। নানা রকম তথ্য ও প্রাকৃতিক বর্ণনার সঙ্গে লেখকের নিজের মনের স্পর্শটুকু তাতে পাওয়া যায়। 'বশিষ্ঠধারা' ঝরনার ভীষণ-মধুর রূপটি আঁকা রয়েছে দু-একটি কথায় * * "ডান পাশে বশিষ্ঠধারা আপনার খরস্রোতে প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড পাথর বিদীর্ণ করে ঝর্ ঝর্ করে এঁকে-বেঁকে ধেয়ে চলেছে।"—বাগান ১৩২১ শ্রাবণ

সহজ আবেগে এমন লেখা বেরিয়ে এসেছে। 'পদ্মাবক্ষে' যেতে যেতে একজন প্রাকৃতিক বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন,—"একটা প্রকাণ্ড বটগাছ জলের মধ্যে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। যেন আপন শরীর জলে অর্ধেকটা ডুবাইয়া। তার ডালে একটাও পাতা নাই। * * জলের উপর ভারী সুন্দর রঙ পড়িয়াছে। সূর্য অস্ত গেল। * * অনেকদিন এমন সূর্যাস্ত দেখি নাই।"—বাগান ৬ষ্ঠ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

'বাগান' (শ্রাবণ ১৩২৪ সংখ্যায়)-এ জলপথের বর্ণনায় লেখা আছে—"স্টেশনে উন্মুক্ত প্রান্তরে সবুজ তৃণাসনের উপর একটি কাপড় বিছাইয়া বসিয়া আছি। * * শুধু জল, আর কিছুই দেখা যায় না। নদীর অপর পার আমাদের কাছে শুধু একটি অস্পষ্ট মসীরেখার মতো। এপারে কাশবনগুলি নদীর জলে অর্ধেক শরীর ডুবাইয়া সোঁ-সোঁ শব্দ করিতেছে।"

দীর্ঘ ছুটিতে ছেলেরা দূরের দেশে বেড়াইতে যায়। 'প্রভাত' (ফাল্গুন ১৩২৩

গুরুদেবের বিদেশ হইতে আগমনোপলক্ষ্যে প্রকাশিত বিশেষ সংখ্যা) পত্রিকায় 'রেলের যাত্রী' (মুর্শিদাবাদের পথে) শীর্ষক একটি রচনায় আছে—"প্রমোশন হইয়া গেল, মনে হইল মাথা হইতে যেন একটা মস্ত বোঝা নামিয়া গিয়াছে। প্রায় সকলেই বেরিয়ে পড়ার জন্যে খুব চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। কেউ প্রস্তাব করিলেন 'গৌড়' যাইব। কেউ বলিলেন—'নবদ্বীপ বৈষ্ণবের তীর্থ, ছুটির ফাঁকে যদি ফাঁকি দিয়া পুণ্য লাভ করা যায়, মন্দ কি', কাহারও বা মতে মুর্শিদাবাদে যাওয়া ঠিক হইল। জনকয়েক হাঁটিয়াই বক্রেশ্বরে রওনা হইলেন। তাঁহারা কী রকম করিয়া ভ্রমণটিকে উপভোগ করিলেন শীঘ্রই শুনিবার আশা রাখিতেছি।"

বুধবারের সাপ্তাহিক ছুটিতে এবং প্রত্যহ বিকেলের দিকে আশ্রমের আশে-পাশের গ্রামে ও বনে ছাত্রদের বেড়াবার অভ্যাস ছিল। পূর্বদিকে রেললাইন পেরিয়ে পারুলডাঙা, পারুল-বন। 'শিশু' পত্রিকার এক সংখ্যায় একজন লিখছে "পারুল বন আমাদের বড় প্রিয় জিনিস। আমরা যে আশ্রম-মাতার ক্রোড়ে বাস করিতেছি এই বনটি যেন তাঁহার সহোদরা ভগ্নী। তাই মাঝে-মাঝে এই মাসিমার কাছে আসিয়া আমোদ-প্রমোদ খেলায় স্নেহে উৎসাহে মত্ত হইয়া উঠি। পাখির মতো আমাদের মন তাহার শাখায় শাখায় খেলিয়া বেড়ায়।"

এখান থেকে একবার সিউড়ি ক্রীড়া-প্রদর্শনীতে ছাত্র ও শিক্ষকগণ যোগ দিয়েছিলেন। তাঁরা ট্রেনে সিউড়ি গিয়েছিলেন। একদল ছাত্র আবার গিয়েছিলেন পায়ে হেঁটে। শান্তিনিকেতন থেকে প্রায় বিশ ক্রোশ দূর। সেই হেঁটে যাওয়ার সম্বন্ধে দুটি লেখাই পত্রিকায় দেখা যায়। যাঁরা হেঁটে গেছেন, লিখেছেন—"গায়ে জামা, খালি পা, লাঠি-হাতে, গায়ে আলোয়ান জড়ানো—আমরা এগারটি যাত্রী। হাঁটা আরম্ভ হইল। গোয়ালপাড়া অতিক্রম করিয়া শীতের কোপাইয়ের তুষার-শীতল জল পার হইয়া কস্‌বার মাঠে পা দিলাম, তখন সূর্য পশ্চিম-দিগন্তে এলাইয়া পড়িয়াছে। * * মাঠের মধ্য দিয়া রাস্তা। ক্বচিৎ দুইধারে দুটো গাছ। দূরের গাছগুলি গোধূলির আলো-অন্ধকারে একটু অস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।"

পথের এবং গ্রামের বর্ণনা দিয়ে নিজেদের সম্বন্ধে বর্ণনা দেওয়াতে প্রবন্ধটি আরো চিত্তাকর্ষক হয়েছে—"আমাদের দলে সকল রকমেরই লোক ছিল। সংগীতজ্ঞ, কবি, গম্ভীর, চঞ্চল, রসিক, ব্রাহ্মণ—প্রত্যেকেই একটু বিভিন্ন ধরনের। নানাপ্রকার বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন একটি জিনিস সম্পূর্ণ করিয়া তোলে, আমরাও তেমনি আমাদের এই ক্ষুদ্র দলটিকে সৃষ্টি করিলাম।" 'বাগান' (চতুর্থ

বর্ষ অগ্রহায়ণ ও পৌষ) পত্রিকায় 'মহাকাল-ভ্রমণ' প্রবন্ধটিতে আছে, "দার্জিলিং-এর নিকট উচ্চ শৃঙ্গে মহাকাল নামক শিব-মন্দিরটি অবস্থিত। হিন্দু এবং বৌদ্ধ উভয় জাতিই এখানে পূজা দিয়া থাকে। এই মহাকাল-মন্দিরটি দেখিতে একটি অদ্ভুত জিনিস। ইহা একটি ইঁটের তৈয়ারী মন্দির নয়। একটি চার-হাত আন্দাজ পাথরকে কেন্দ্রস্বরূপ করিয়া তাহার চারদিকে বাঁশের পতাকা ও ত্রিশূল পোঁতা আছে। পতাকাগুলির কাপড়গুলি অধিকাংশই লাল রঙে রঙানো, এবং তাহাতে সহস্রবার করিয়া বুদ্ধ-নাম লেখা আছে। বৌদ্ধ ভক্তরাই কেবল পতাকা পুঁতিয়া দেয়। হিন্দুরা ত্রিশূল দেয়।"

অনেকরকম তথ্য এবং মহাকাল-সংক্রান্ত নানা প্রচলিত কাহিনীতে লেখাটি সরস ও সারবান।

অন্য একটি ভ্রমণ-কাহিনীর পাদটীকায় তার লেখকের মন্তব্য ;আছে—"দেশ-ভ্রমণে যেরূপ বিমল আনন্দ উপভোগ করা যায় তেমন আর-কিছুতে নহে ; রাজার রাজপ্রাসাদে বাসও ইহার নিকট তুচ্ছ।"

কাব্য-সমালোচনায় লেখক ও কবিদের সমালোচনা আছে। রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রানী' নাটক, সেক্সপীয়রের নাটক, এমন কি Euripedes-এর Madea নাটকের এবং সোফোক্লিসের লেখার অবধি সমালোচনা করা হয়েছে।

প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণ করে লেখা 'ব্যাঙ', 'পিঁপড়ে-খেকো ফুল', 'কীট-পতঙ্গ', 'কুমীর'—অনেক-কিছু আছে। অনেকগুলি খবর বেশ মজার। "আমাদের মধ্যে তিন রকম ব্যাঙ আছে। জোলো ব্যাঙ, গেছো ব্যাঙ এবং স্থোলো ব্যাঙ। গেছো ব্যাঙরা খুব লাফাইতে পারে ও অত্যন্ত ছোট হয়। জোলো ব্যাঙের মধ্যে দুই রকম মানুষে খায় ও বলে খাইতে খুব সুস্বাদু।

"সৌভাগ্যবশত আমি স্থোলো ব্যাঙ, নয়তো জোলো ব্যাঙ হইলে, মানুষেরা আমাকে খাইয়া ফেলিত।" — ব্যাঙের আত্মকাহিনী, বাগান ভাদ্র ১৩১৫

আরেকটি পত্রিকায় পোকা সম্বন্ধে নানা রকম তথ্য দিয়ে লেখা আছে—"আমাদের আশ্রমের কয়েকটি ছেলে পোকামাকড় নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে থাকে এবং সময়-সময় অনেক সুশ্রী পোকামাকড় জোগাড় করে। পোকামাকড় রক্ষার জন্য বিলেতে অবশ্য অনেক রকম কাঠের বাক্স তৈরি হয়ে থাকে। কিন্তু আমরা পোকা-মাকড় রক্ষার জন্য সাধারণ-ধরনের কাঠের বাক্স প্রস্তুত করিয়েছি। এই বাক্সে অনেক থাক আছে। প্রত্যেক থাককে বিশেষভাবে চেনার জন্য বিশেষ নম্বর

দিয়েছি—যেমন ১, ২, ৩ এই রকম আর কি। আমাদের পর্যবেক্ষণের খাতিরে এখানে অনেক কীট-পতঙ্গকে স্বাধীনতা খোয়াতে হয়েছে।"—প্রভাত ফাল্গুন ১৩২১

সাঁওতালদের সম্বন্ধে গবেষণা করবার জন্য একটি সমিতি ছিল। বর্তমান সভ্যতার চাপে পড়ে যারা ক্ষয় পেয়ে চলেছে, এই সকল প্রতিবেশী লোকদের সম্বন্ধে ছাত্রগণের ঔৎসুক্য ছিল। সাঁওতালদের জীবনযাত্রা, বিবাহ-পদ্ধতি কিরূপ তাদের মধ্যে কালীপূজা কিভাবে বোয়া-পূজায় পরিণত হয়েছে—এ সব অনেক তথ্য একটি প্রবন্ধের মধ্যে পরিবেশিত হয়েছে।

"সাঁওতালদের অন্যান্য অনেক প্রকার আমোদ-আহ্লাদের মধ্যে বিবাহোৎসবটি খুব কৌতূহলোদ্দীপক। * * আমাদের দেশে যেমন বিবাহের পূর্বে ঘটকের আনাগোনা অতি ঘন-ঘন হইতে থাকে—সাঁওতালদের মধ্যেও সেইরূপ প্রথা প্রচলিত আছে। * * পিতামাতার সহিত কথা ঠিক হইলে কন্যা ও বর উভয়েই উভয়কে দেখিতে গমন করে। * * তাহার পর নিমন্ত্রণ-প্রথাটি খুব চমৎকার। প্রত্যেক গৃহে বিবাহের কয়েক দিন পূর্বে কয়েক গাছি হলুদ রঙের সুতা একত্রে বাঁধিয়া দিয়া আসে। তাইতেই সকলে তাহার তাৎপর্য বুঝিয়া লয়। কবে দিন ঠিক হইয়াছে তাহাও তাহা হইতে বুঝা যায়। যে কয়গাছি সুতা একত্রে বাঁধা থাকে নিমন্ত্রণের সেই কয়দিন পরে বিবাহ হয়।"—শান্তি ১৩২১ শ্রাবণ

চিত্রকলা সম্বন্ধে শ্রীনন্দলাল বসুর চিঠি, শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্তের 'জাপানের চিত্রকলা,' শ্রীঅসিত হালদারের লেখা 'শিল্প-কথা', গুরুদেবের লেখা 'বাগগুহা' এবং শ্রীরমেন্দ্র চক্রবর্তীর লেখাও পত্রিকাগুলিতে পাওয়া যায়। নন্দলাল বসু গুরুদেবের সঙ্গে চীন-ভ্রমণে গিয়েছিলেন। পিকিং-এ একটি একজিবিশন-এ কয়েকজন প্রসিদ্ধ চীনা চিত্রকরের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল। তাঁর মধ্যে একজনের সঙ্গে চিত্র সম্বন্ধে আলোচনা হয়। সেই চিত্রশিল্পী একজন বড় রাজকর্মচারী ছিলেন, সাহিত্যচর্চাও তিনি করতেন। চীনদেশের সমাজে চিত্রকরদের কিরূপ স্থান সে সম্বন্ধে আলোচনা হয়।

চীনের পুরাতন প্রথায় শিক্ষিত একজন সৈনিককে পর্যন্ত যুদ্ধবিদ্যা ছাড়াও নৃত্যবিদ্যা, পুষ্পবিন্যাস (Flower decoration), চিত্রবিদ্যা, দর্শন ইত্যাদি জানতে হয়, শিখতে হয়। সত্যিকার প্রতিভাশালী চিত্রকর, সাধারণ চিত্রকর (Professional artist) এবং পোটো শিল্পী, এ তিনের মধ্যে পার্থক্য, চিত্রে রঙের ব্যবহার এবং ভারতের ও চীনের চিত্রের মধ্যে প্রধান-প্রধান পার্থক্য সম্বন্ধে আলোচনা করে তিনি লিখেছেন, প্রথম শ্রেণীর চিত্র খুব প্রাচীন নয়, খ্রীষ্টের কয়েক শতাব্দীর পর

থেকে আরম্ভ হয়েছে। চীনের শিল্প আরম্ভ হয়েছে Crafts থেকে, ভারতীয় শিল্পের আরম্ভ ভাব থেকে। * * আমাদের চিত্র ভাবপ্রধান চীনাদের Technique-প্রধান; ভাব এবং Technique যেখানে মিলেছে, সেখানেই ভাল আর্টের সৃষ্টি হয়েছে।"

'বিশ্বভারতী' (প্রথম বর্ষ ১৩২৮-২৯) পত্রিকায় জাপানের চিত্রকলা সম্বন্ধে শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্তের রচনা পাওয়া যায়। রচনাটি মস্ত বড়; ক্রমশ দিয়ে দু'তিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। লেখক বলছেন—"মস্ত বড় একটা গাছের গুঁড়ি তার উপরে ফড়িং বসে—এ একটা জাপানী ছবি, বর্তমান যুগের একজন শ্রেষ্ঠ চিত্রকরের আঁকা।

" * * নগণ্য কীট-পতঙ্গ জাপানী চিত্রকরদের দৃষ্টি এড়ায় না। জাপানীরা কিছুকে ছোট বলে অবহেলা করে না। পৃথিবীর সমস্ত পদার্থের মধ্যে তারা এক মহা সৌন্দর্য অনুভব করে। নরনারীর মধ্যে যে মহিমা প্রকাশিত হয়েছে তা পশুপক্ষী বা ছোটো ছোটো কীট-পতঙ্গেও হয়েছে।"

শ্রীঅসিতকুমার হালদারের গ্রন্থ পড়ে তার ভূমিকা-স্বরূপ 'বাগগুহা' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ একটি ছোটো প্রবন্ধ লিখেছিলেন; সেটি হাতে-লেখা 'বিশ্বভারতী' পত্রিকাতে (১৩২৮-২৯, ১ম বর্ষ) তখন বের হয়েছিল। "পুরাতন যে-ভারতের আদর্শ আধুনিককালের ভারতবাসীদের মনে অনেক দিন থেকে ফুটে উঠেছে সেটি হচ্ছে প্রধানত ধর্মশাস্ত্রের ভারতবর্ষ, দর্শনশাস্ত্রের ভারতবর্ষ, জপতপঃক্লিষ্ট ভারতবর্ষ। কিন্তু এই নিরবচ্ছিন্ন ধ্যানপরায়ণ, চিন্তাপরায়ণ ভারতবর্ষই যে সম্পূর্ণ সত্য নয় তা ইতিহাসের নূতন আবিষ্কৃত তথ্যগুলির দ্বারা অল্প-কিছুদিন থেকে আমরা কিছু-কিছু অনুভব করতে আরম্ভ করেছি। একটি জিনিস আমরা বিশেষ করে দেখছি এই যে, বৌদ্ধযুগের এবং তার অব্যবহিত পরবর্তীকালের ভারতবর্ষের প্রভাব এশিয়ার যেখানে-যেখানেই বিকীর্ণ হয়েছে সেইখানেই চিত্র স্থাপত্য ভাস্কর্য কলার অভ্যুদয় হয়েছে। শুদ্ধমাত্র দার্শনিক তত্ত্বালোচনা কখনই কলাবিদ্যার অনুকূল হতে পারে না। কেননা দর্শন রূপলোকের জিনিস নয়, তা রূপাতীত লোকেরই জিনিস।

"যদি দেখা যায় কোনো-একটি নদী যেখান দিয়ে গেছে সেইখানেই তীরে-তীরে বিশেষ কোনো জাতের গাছ জন্মেছে তা হলে বুঝতে হবে যে সেই নদীর উৎসের কাছে এই জাতের অরণ্য আছে এবং অরণ্য থেকে বীজ পড়ে নদীর স্রোতে দেশে-দেশে সঞ্চারিত হয়েছে। তখনকার দিনে ভারত-সভ্যতায় কলাবিদ্যা-চর্চা বিশেষ সজীব ছিল সন্দেহ নেই, নইলে এই সভ্যতার স্পর্শে দেশান্তরে এই বিদ্যার উৎসাহ এমন প্রবল হয়ে উঠতে পারত না।

"চিত্রকলাকে আধুনিক ভারত অনেক দিন থেকে অবজ্ঞা করে এসেছে। এ সম্বন্ধে আমাদের চিত্তের অসাড়তা এত দূর এগিয়েছে যে আমরা যে কেবলমাত্র চিত্রসৃষ্টি করতে পারি নে, তাকে আমরা ব্যঙ্গ করতে ছাড়িনে।

"আমরা যখন স্বাদেশিকতার অভিমানে উন্নত হয়ে উঠি তখন এই কথাটি বুঝতে পারি নে যে, যে-জাতি কলাবিদ্যায় আপন চিত্তের পরিচয় দেয় নি সে-জাতি মহাপ্রাণ জাতি নয়। তা ছাড়া এ কথা আমরা মনের দৈন্যবশতই ভুলেছি যে, একটুকরো কাগজে একটুখানি ছোটো ছবি যদি সত্য করে আঁকতে পারি তার দ্বারা নিত্যকালের কাছে দেশের যে-পরিচয় প্রকাশ হবে তা রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে খবরের কাগজের বড় বড় ধ্বজা আস্ফালন করেও হবে না। অজন্তার সময়কার রাষ্ট্রীয় ঐশ্বর্যের একটি ক্ষুদ-কুড়োও আজ ভারতের ভাগ্যে বাকি নেই,—কিন্তু অজন্তা-গুহার ভিত্তিচিত্রে তখনকার ভারত যে লিপিখানি লিখে গেছে, সেই লিপি যুগ হতে যুগান্তর আপন বাণীকে প্রচার করে চলেছে।

"এই কারণেই সম্প্রতি বাগগুহার চিত্রগুলির যে আবিষ্কার ও অনুলেখন হয়েছে সে আমাদের এখন বহুমূল্য। প্রাচীন ভারত পঞ্জিকার তিথি-বার গণনা করে কেবল উপবাস করে নিজেকে শুকিয়ে মারত না, বারম্বার তার প্রমাণ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হওয়া দরকার। আমাদের ইতিহাসে জাতীয় চিত্তের সজীবতার নিদর্শন যতই পাব ততই আমরা বুঝব জীবনের ধর্ম কী, তার প্রকাশ কিরূপ।

"ভাগ্যক্রমে বাগগুহার চিত্রের অনুলেখাগুলি আমি দেখেছি। দেখে কেবল যে তার আশ্চর্য কলারস প্রচুর-পরিমাণে উপভোগ করেছি তা নয়, সেই সঙ্গে এটুকু প্রত্যক্ষ করেছি যে, তখনকার কালের মানুষেরা তাসের বিবি বা গোলাম ছিল না। তখন বৈরাগ্যের শক্তি বড় ছিল, কেননা রাগ-অনুরাগের শক্তি সজীব ছিল। যারা জগৎকে জীবনকে পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে জানে, তারাই ত্যাগ করতে জানে।"

একটি প্রবন্ধে আশ্রমের তৎকালীন ছাত্র শ্রীসুহৃদকুমার মুখোপাধ্যায় অমৃতসরের হত্যাকাণ্ড, ভারতের রাজনীতি এবং শিক্ষা সম্বন্ধে গুরুদেবের মত সংগ্রহ করে লিখেছেন। 'বিলাতে গুরুদেবের সহিত কথোপকথন' শিরোনামযুক্ত এই লেখাটির শিক্ষাবিষয়ক অংশ পূর্বে সংকলিত হয়েছে। রাজনীতি-বিষয়ে আলোচনাস্থলে তিনি লিখছেন—"বিলাতের Britain and India নামীয় সংবাদপত্রের সম্পাদক ভারতবর্ষের সর্বজনপ্রিয় কবি ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত গত সপ্তাহে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। আলোচনা-প্রসঙ্গে কবি আবেগের সঙ্গে বলিয়াছেন যে অমৃতসরের

হত্যাকাণ্ডের অপরাধী যদি শাস্তি না পায় তবে ভারতে বিরক্তি ও অশান্তি অত্যন্ত প্রবল হইবে।" —যাত্রী শারদীয় সংখ্যা ২য় বর্ষ ১৩২৭

বিলাতে অনেকেই তখন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। সকলেই "বর্তমান সময়ের গতিবিধি সম্বন্ধে তাঁহার মতামত জানিতে চাহে।" রবীন্দ্রনাথ সকলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেছেন, কিন্তু তবু তাঁর চারিদিকে এমন একটি দূরত্বের ব্যবধান রয়েছে যে মনে হয় তিনি ধরাছোঁয়ার ঊর্ধ্বে। সম্পাদক লিখেছেন—"যাঁদের মনে দেশের প্রাচীন সভ্যতার ও বিরাট মহত্ত্বের একটি সজাগ বোধ থাকে কেবল তাঁহাদেরই চারিদিকে এই আবরণ থাকে।"

—যাত্রী শারদীয়া সংখ্যা ২য় বর্ষ ১৩২৭

এর পরে তিনি গুরুদেবের সঙ্গে ভারতবর্ষের তখনকার অবস্থা সম্বন্ধে কথা বলতে যেতেই অমৃতসরের হত্যাকাণ্ডের প্রসঙ্গ এল। রবীন্দ্রনাথের মন এ ব্যাপারে যে কতটা গভীরভাবে আলোড়িত হয়েছিল তাঁর সেই কথোপকথন থেকেই বোঝা যায়।

"তিনি বললেন 'যে-সকল অত্যাচার হইয়া গেল ভারতবর্ষ এজন্য অত্যন্ত অশান্তি বোধ করিতেছে; এ-দেশের লোক সেই সব অত্যাচারকে গর্হিত কর্ম বলিয়া প্রচার করিবে সেই আশা করিয়া ভারতবর্ষ অপেক্ষা করিতেছে। যদি সহানুভূতি না দেখাইয়া ঘোর প্রতিবাদ করেন তাহা হইলে হয়তো আমরা এই অন্যায় ভুলিতে পারিব। আমি মনে করি না যে ঐরূপ প্রতিবাদ এ যাবৎ হইয়াছে। এমন কি, ঠিকমতো প্রতিবাদ হইবে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে, কারণ পার্লামেণ্টকে এ বিষয়ে ব্যগ্র দেখিতেছি না। কিন্তু যদি এমন হয় যে পার্লামেণ্ট বিশেষ-কিছু না করিয়া এই অত্যাচারকে উপেক্ষা করেন ও জেনারেল ডায়ারকে নিষ্কৃতি দেন তবে আমার মনে হয় ভারতবর্ষের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীণ হইবে। আমার দেশের লোক এ কথা চিরদিন মনে রাখিবে এবং শেষকালে ভীষণ অশান্তিতে ইহার পরিসমাপ্তি হইবে।"

এ ব্যাপারের সঙ্গে বিলাতের কোনো সংস্রব নেই, পার্লামেণ্টের কার্যকলাপ দেখে গুরুদেবের তাই মনে হয়েছিল; ভারতবর্ষ ইংরাজ সৈন্যদলের দ্বারাই পরিচালিত হয়ে থাকে এবং পার্লামেণ্ট ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একরকম নিরুৎসুক, নিষ্ক্রিয়—এ সব কথা জানিয়ে গুরুদেব বলছেন—"কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, দেখিয়া মনে হয় ব্রিটেনের নিজের এত জটিল সমস্যা আছে যে ভারতবর্ষের এত গভীর মর্মবেদনায় মনোনিবেশ করিবার মতো হয়তো যথেষ্ট সময় নাই।"

তখন সম্পাদক তাঁকে নূতন সংস্কারবিধি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। রবীন্দ্রনাথ বললেন—"সত্য কথা বলিতে কি, আমি এসব বিষয়ে বেশি মাথা ঘামাই না। কারণ আমার কাছে ইহা অত্যন্ত অবান্তর বলিয়া মনে হয়। আমাদের দেশের আদর্শের উপর ভিত্তি স্থাপনপূর্বক গঠনকার্য করিতে আমার ইচ্ছা। এই শাসনবিধি আমাদের যথার্থ স্বাধীনতা দিবে না। * * *আমরা নিজেরা আত্মত্যাগের দ্বারা এবং সামাজিক অনুষ্ঠানের দ্বারা কী করিতে পারি সেই দিকে আমার বিশেষ দৃষ্টি। এইরূপে আমাদের মুক্তিপথ আমরা নিজেরাই করিয়া লইতে চাই। আজকালকার রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান কেবল ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ও অসন্তোষের সৃষ্টি করে। * * * আমি রাষ্ট্রনীতিকে ঘৃণা করি এবং এ বিষয়ে কথা বলিতে ইচ্ছা করি না। * * * কিন্তু দৃষ্টি দিবার মতো এ সব হইতে অধিক প্রয়োজনীয় কাজ আছে।"

সম্পাদক তখন রবীন্দ্রনাথকে ভারতবর্ষের উন্নতির সবচেয়ে সত্য পথ কী, এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। তার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেন—"আমার অনুরাগ শিক্ষার দিকে, সাহিত্যের দিকে, এবং শিল্পের দিকে—যাহার দ্বারা আমরা আমাদের নিজেদের জিনিসকে পরিস্ফুট করিতে পারি ও আকার দান করিতে পারি সেই জন্য আমাদিগকে প্রস্তুত করিতে চাই। আমাদের মধ্যে যাহা-কিছু মহত্ত্ব আছে তাহাকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিব এবং মানব-সভ্যতার পরিপুষ্টি-সাধনে আমরাও সাহায্য করিব।"

কবি নিজে কোন্ বিশেষ দিকে কাজ করছেন সম্পাদক এ কথা জিজ্ঞাসা করলে, গুরুদেব বলেন—"আমি একজন গ্রন্থকর্তা—আমি ভাবকে ভাষায় পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করি এবং অলক্ষ্যে স্বাভাবিকভাবে জাতীয় জীবনের আদর্শ আমার রচনায় প্রকাশ পায়। প্রত্যেক কবি নিজের দেশের জ্ঞানই তাঁহার রচনার দ্বারা প্রকাশ করেন এবং আমিও তাহাই করিতেছি। হঠাৎ আমি আমার কয়েকটি রচনা ইংরাজিতে তর্জমা করিয়াছিলাম এবং সেইগুলি আমার ঝুলি হইতে বাহির হইয়া পশ্চিমে আসিয়া পড়িয়াছে এবং আমি সকলের গোচর হইয়া পড়িয়াছি। ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় আমি কয়েকটি নিকট-বন্ধু লাভ করিয়াছি। কিন্তু আমি আমার নিজের দেশের লোকের জন্যই বাংলাভাষায় লিখিতাম—তাহাদের ভাব প্রকাশ করিবার জন্যই।"

পত্রিকাগুলিতে এ-সব রচনা ছাড়াও আছে কতকগুলি মৌলিক চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ, আর, কতকগুলি আছে রস-রচনা। সাধারণ বিষয়ও যে কতটা সরস হতে

পারে তা বিশেষ করে শিশুদের লেখাতে দেখা যায়। আধুনিক 'প্রভাত' পত্রিকার এক সংখ্যায় আছে, "একদিন দুপুরে আমি ভাবছি সাহিত্য-সভায় কী গল্প দেব, এমন সময় দেখি সোনাঝুড়ি গাছে একটি বুলবুলি পাখি বসে আছে।" বাস, সেই পাখি এবং গাছ নিয়ে একটি রচনা হয়ে গেল। সামান্য একটি খেলার পাহাড়ও লেখার বিষয় হয়েছে—"আমরা সতীশ-কুটীরের সম্মুখে একটি ছোট পাহাড় প্রস্তুত করিয়াছি। এই পাহাড়টি আমাদের পক্ষে বড়ই সুন্দর হইয়াছে। তার ঝরনা হইতে দুই-একটি নদী বহিয়াছে, সেই নদী সমুদ্রে যে স্থানে পড়িয়াছে সেখানে একটি সাঁকো প্রস্তুত করা হইয়াছে। সেই সাঁকোর উপর দিয়া অনায়াসে আটটা পিপীলিকার গাড়ি পাশাপাশি চলিতে পারে।" —শিশু ১৩১৮ ভাদ্র ও আশ্বিন

এইটুকুই সম্পূর্ণ একটি রচনা। শিশুমনের কল্পনা, আনন্দ, পাহাড় তৈরী করা ও তা নিয়ে লেখা,—সব-কিছুর একটা সহজ ভাব সামান্য ক'টি পংক্তিতে প্রকাশ পেয়েছে।

'বাগান' (১৩২৪ চৈত্র) পত্রিকায় 'লিখতে যাওয়ার বিপদ' প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, প্রথমে ছোট-ছোট গল্প নিয়ে মানুষ লেখা শুরু করবে। ধীরে-ধীরে বড় প্রবন্ধের দিকে অগ্রসর হতে হবে। ছোট জিনিস এবং সাধারণ জিনিস নিয়ে লিখতে গিয়ে ছোটদের মনে সংকোচ আসে। তারা ভাবে এ-সব ছোট ঘটনা সামান্য বিষয় নিয়ে লেখা, এতটুকু রচনা কেই বা পড়বে। তাই ছোটরা বা অল্পবয়সী লেখকগণ নিজেদের কথা ছেড়ে কতগুলি বড় বড় নিষ্ফল কথাকে ফেনিয়ে লিখতে বসে। লেখা হয় ব্যর্থ। "নিজে যা জান, যে বিষয়ে বেশ চিন্তা করছ—তাই বেশ গুছিয়ে সবার সামনে এনে উপস্থিত কর। হো'ক না তোমার জিনিস ছোট, কিন্তু সে তো নূতন।" এ রচনার কিশোর-লেখকটি হচ্ছেন শ্রীধীরেন্দ্রমোহন সেন, অধুনা যিনি পশ্চিমবাংলার শিক্ষা-বিভাগের সচিবপদে অধিষ্ঠিত।

গল্পের মধ্যে স্বরচিত রচনা তো থাকতই, ইংরাজি গল্পের থেকে অনুবাদও খুব বেশি থাকত।

একজন রামায়ণের রাম-সীতার বিবাহ ঘটনাটিকে গুরুদেবের 'যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ' এবং 'দেনা-পাওনা'—গল্প দুটির মতো করে লিখে দিয়েছে। দেশের পণপ্রথা নিয়ে তীব্র ব্যঙ্গ-কৌতুক আছে গল্পটিতে। মিথিলাধিপতি জনকের কন্যা সীতাদেবীর বয়স বারো হয়েছে, কন্যা অরক্ষণীয়া, যোগ্যপাত্র খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। শ্রীরামচন্দ্র সদ্য ব্যারিস্টারী পাশ করে এসেছে। তাকেই জনক যোগ্যপাত্র বিবেচনা করলেন। দেনা-পাওনা বা যে-কোনো-কিছু সম্বন্ধেই তাকে জিজ্ঞাসা করা গেল, সে কেবল

বললে—"আমার বিবাহ সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না, পিতৃদেব জানেন।" দশরথ অনেক পণ এবং অলংকারাদি চাইলেন। হাতে-পায়ে ধরে পাঁচশ টাকা মাত্র কমানো গেল। তখন—"ঘৃত দুগ্ধে জনক করিল সরোবর"। তাতেও বর-পক্ষ সন্তুষ্ট হল না। বরযাত্রীরা বাড়িতে হাট বসিয়ে দিলে। "মুহূর্তে তাহাদের পান সিগারেট সরবৎ জোগাইতে জোগাইতে ভৃত্যেরা শ্রান্ত হইয়া পড়িল, কিন্তু তবু তাহারা তৃপ্ত নয়।" এরও চরম পরিণতি ঘটল বরকনে বিদায় নেবার বেলা। শিক্ষিত বরযাত্রীগণ বিবিধ উপায়ে বৃদ্ধ জনকের অপমান করল। পিতৃভক্ত রামচন্দ্র নির্বাক রইলেন। দশরথ বললেন—বরযাত্রীরা ও-রকম উৎপাত একটু করেই থাকে।

সীতা লজ্জায়-দুঃখে-অপমানে বললেন—

"মা হইয়া পৃথিবী মায়ের কর কাজ, এ ঝিয়ের লাজ হৈলে তোমার যে লাজ।" ধরিত্রী দ্বিধা হল, সীতা পাতালে প্রবেশ করল, বরযাত্রীদল 'হিন্দু-সমাজ কী জয়' চীৎকার করতে করতে চলে গেল।"

এককালে বিশ্বভারতীর ছাত্র হয়ে সৈয়দ মুজতবা আলি এখানে ছিলেন। 'বিশ্বভারতী' (১৩৩১ সাল) পত্রিকাতে তাঁর দু-তিনটি গল্প এবং প্রবন্ধ পাওয়া যায়। সেগুলির মধ্যেও লেখার তীক্ষ্ণতা এবং সরসতা ফুটে উঠেছে। বোঝা যায় এ কলম ব্যর্থ হবার ছিল না। ১৩৩০ সালের বিশ্বভারতীতে 'নেড়ে' নামে তাঁর একটি গল্প আছে। ভাষায় বর্ণনায় অতি সুন্দর। পুজোর ছুটির পরে তিনি দেশ থেকে আশ্রমে ফিরছেন। চাঁদপুর-স্টেশনে এসে পৌছলেন। বেজায় ভীড়। কোনো রকমে জায়গা পেয়ে বিছানা পেতে বসেছেন, দেখেন—একজন ব্রাহ্মণ-ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েছেন। না পাচ্ছেন বসবার জায়গা, না পাচ্ছেন স্ত্রীর গয়না-কাপড়ের বাক্সের খোঁজ। মহা বিপন্ন। ভদ্রলোক দিশেহারা হয়ে উঠেছেন। সৈয়দ মুজতবা আলি এগিয়ে গিয়ে তাঁকে সাহায্য করলেন। ভিড় ঠেলে নীচে নেমে কুলি খুঁজে ভারী-ভারী বাক্স-বিছানা দুটো বয়ে উপরে আনলেন। তাঁরই বিছানায় ভদ্রলোক এবং তাঁর স্ত্রী বসবার জায়গা পেলেন। ভদ্রলোক সরকারী চাকুরে; খুব গল্পগুজব করলেন; তারপাশায় নেমে-যাবার সময় পরিচয় নিয়ে জানতে পারলেন—একজন মুসলমান যুবকের বিছানায় বসে তাঁরা ফলার সেরেছেন। ভদ্রলোক তখন মহাখাপ্পা! মুখ খিঁচিয়ে বললেন—"* * খাবার সময় বললে না কেন তুমি মুসলমান?"

"আমি অবাক হয়ে বললুম—'আপনি যে বললেন জাত মানেন না।' তিনি তেড়ে এসে আমার নাকের সামনে হাত নেড়ে বললেন—'মানি নে, খুব মানি। * * আবার প্রাচিত্তির করে ফেললে। হতভাগা—নেড়ে।"

এ-সব পত্রিকার লেখকদের মধ্যে শ্রীপ্রমথনাথ বিশি ও সৈয়দ মুজতবা আলি বিশিষ্ট সাহিত্যিকের খ্যাতি অর্জন করেছেন, আর 'রবীন্দ্র-জীবনী'-কাররূপে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন শ্রীপ্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়। কিন্তু যাঁরা সাহিত্যের আসরে খ্যাতি লাভ করেন নি, এ পথ ত্যাগ করে সংসারের নানাকর্মে জীবন-যাপন করছেন, তাঁদের অনেকের এই সময়কার লেখা পড়ে বিস্ময় লাগে।

'বিশ্বভারতী' এবং 'The Ashram' নামক পত্রিকা-দুটিতে Winternitz, Sylvan Levy, V. L. Lesney, F. Benoit প্রভৃতি বৈদেশিক জ্ঞানীদেরও লেখা আছে।

সাধারণ ছাত্রদের চিত্রকলা-চর্চার ক্ষেত্র ছিল এই পত্রিকাগুলি। প্রত্যেকটি পুরোনো ও নূতন পত্রিকাই চিত্রসম্ভারে পরিপূর্ণ। এ সব চিত্রকরদের মধ্যে কয়েক জন খ্যাতনামা হয়েছেন—যথা, রমেন চক্রবর্তী, অসিত হালদার, মুকুল দে, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মা, মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত প্রভৃতি। যাঁরা ছাত্রহিসাবে চিত্রের চর্চা করেছেন তারপরে এদিক ছেড়ে দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যেও কয়েকজনের চিত্র দেখলে মনে হয়—চর্চা করলে এ পথে নিশ্চিত এঁরা বড় হতে পারতেন। চিত্রকরগণ নিজেরাই হয়তো ভুলে গেছেন যে কোনো কালে তাঁরা ছবি আঁকতেন। এঁদের মধ্যে দুজন এখনও আশ্রমেই আছেন—একজন শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সেন, কণ্ট্রাক্টর। আরেক জন, সন্তোষ মিত্র—ডেয়ারি এবং ফার্ম নিয়ে তাঁর দিন কেটেছে। সব ছবিই যে গভীর বিষয় নিয়ে আঁকা হত তা নয়, মজাদার ছবিও অনেক আছে। সে সবের মধ্যেও প্রতিভার আভাস পাওয়া যায়। একটি খুব মজার এবং সুন্দর ছবি আছে 'গুরুদেবের মামা'; টাক মাথা ও স্থূলকায়—অতি সুদক্ষ হাতে লাইনে-আঁকা। গুরুদেবকে ছেলেরা যে ভয় পেত না, তার একটি মধুর নিদর্শন এইটি। শ্রদ্ধা-মণ্ডিত আরেকটি ছবি আছে 'ঋষি প্রকাশচন্দ্র।' নিশ্চয় ইনি ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের পিতা, কিছুকাল আগেই তিনি সাতই পৌষের উৎসবে আশ্রমে এসেছিলেন। একখানা ছবি পাঠিয়েছিলেন আর্থার গেডিস্ "The Tree of the centuries or Epedes'। তার পাশে তার সম্বন্ধে সব অর্থ এবং তথ্য লেখা আছে,—

"The following notes and drawing have followed from a graphic presentation at European History thought out by Pr. Patrick Geddes and designed by John Dun-cun for a stained glass window in the Out look Tower at Edinburgh"

A. Geddes এর নামাঙ্কিত নোটটি। তারই সঙ্গে আরেকখানা রয়েছে পেন্সিল-স্কেচ। মনে হয় সেখানা এখানকারই কারও হাতের আঁকা ছিল, যদিও নাম নেই, সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এক সংখ্যার পত্রিকার চিত্র-সূচীতে গগনেন্দ্রনাথের আঁকা আশ্রমের 'মন্দির' নামক চিত্রখানির উল্লেখ রয়েছে, ছবিটি নেই। পাতায় পাতায় শুধু হাতে-আঁকা ছবি নয়, ভালো-ভালো প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং বড়ো-বড়ো মনীষীদের ফটোও প্রকাশ করা হয়েছে।

সমালোচনা প্রায় প্রত্যেক পত্রিকাতেই থাকত। নিজেদের পত্রিকার সমালোচনা করা এবং আশ্রমের ব্যবস্থার সম্বন্ধে নানারূপ মন্তব্য করা দেখে প্রত্যেকটি জিনিসের উন্নতি-অবনতির দিকে ছাত্রগণের কতটা লক্ষ্য ছিল তা বোঝা যায়। 'শান্তি' (১৩২১ বৈশাখ) পত্রিকাতে ১৩২০ চৈত্র সংখ্যার 'প্রভাত' এবং 'বীথিকা' সম্বন্ধে সমালোচনা আছে।

'প্রভাত' সম্বন্ধে লেখা হয়েছে—"প্রচ্ছদপট নিতান্ত সাদাসিদেভাবে অঙ্কিত হইলেও ভাবসম্পদে নিতান্ত দরিদ্র নহে। শ্রীমণি গুপ্ত অঙ্কিত 'শ্রান্ত পথিক' চিত্রটি এই সংখ্যার মধ্যে উৎকৃষ্ট। নামহীন কবির 'হর্ষবিষাদ' কবিতাটি মন্দ নহে। মহারাষ্ট্রের রাজ-নারায়ণ পেশোয়ারের মৃত্যু সম্বন্ধে শ্রীমান শ্যামকান্ত সরদেশাই একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—বেশ পাঠ্য ও শিক্ষাপ্রদ রচনা"।

'বীথিকা' সম্বন্ধে আছে—"প্রচ্ছদ-পটেই দক্ষশিল্পীর দ্বারা অঙ্কিত বর্ষশেষের একটি সুন্দর চিত্র। এই সংখ্যা 'বীথিকা'র ইহাই একমাত্র সম্পদ। অন্যান্য চিত্রগুলি উল্লেখযোগ্য নহে।"

"আশ্রম-পত্রিকাগুলি ছাত্রগণ দ্বারাই পরিচালিত হওয়া বাঞ্ছনীয়—ছাত্রগণের রচনা-লিখন-প্রণালী লইয়াই বোধ করি আশ্রম-পত্রিকাগুলির প্রচার। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আলোচিত পত্রিকাখানিতে তাহার নিতান্তই অভাব দৃষ্ট হইল।"

৪

সংবাদ

সাহিত্যের সঙ্গে পত্রিকাগুলির শেষ-দিকে সংবাদ যা দেওয়া আছে, তার কয়েকটির বিষয় এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

একবার আশ্রমের রান্নাঘরে রাঁধুনি-ব্রাহ্মণেরা, তাদের খাবার অন্যজাতিতে ছুঁয়েছিল বলে, অত্যন্ত অভদ্র ব্যবহার করে। হাতে-লেখা 'বিশ্বভারতী' পত্রিকায়

তার কঠোর সমালোচনা করা হয়েছিল। উপসংহারে লেখা হয়েছে—"সব চেয়ে একটা আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমরা ইংরাজগণের অত্যাচারে জর্জরিত হইয়া তাহার প্রতিকার করিবার জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। কিন্তু নিজ-নিজ সমাজে গোঁড়ামি বিনাশ করিবার জন্য চেষ্টা খুবই কম করিয়া থাকি।"

'শান্তি' (১৩২১) পত্রিকার সংবাদে আছে, "পূজনীয় গুরুদেব কলিকাতায় কলা ও শিল্পের উন্নতির জন্য একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন—ইহার নাম হইয়াছে কলাভবন। এই কার্যে ব্যাপৃত থাকায় তিনি অধিকাংশ সময় আমাদের মধ্যে উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। কিছুদিন হইল তিনি এখানে আসিয়াছেন। ছুটির পূর্বে 'শারদোৎসব' অভিনীত হইবে, তিনি সন্ন্যাসীর অংশ অভিনয় করিবেন।"

'পঞ্চমী' (১৩২৮ আশ্বিন) পত্রিকায় আছে—"বুধবার ১৯শে ভাদ্র ১৩২৮ সন্ধ্যার সময় 'বীথিকা'-ঘরে একটি নিজ-হাতে-বানানো পুতুলের 'বাল্মীকি-প্রতিভা' পূজনীয় গুরুদেবকে দেখানো হয়। পূজনীয় গুরুদেব তাহাতে খুব খুসী হইয়াছিলেন।"

সে-সংখ্যাতেই আছে—"আমাদের আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্ররা বর্ধমানে একটি (Cup) ম্যাচ খেলিতে গিয়াছিল, আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্ররা জিতিয়াছেন এবং Cup টি পাইয়াছেন। * * চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় শীঘ্রই আশ্রমে আসিবেন।"

এক চিঠিতে কালীমোহন ঘোষ লিখছেন—"৪ঠা মে রবিবার পাঁচটার সময় গুরুদেব Golders Green এ Arnest Rhys-এর বাড়ি গিয়াছিলেন, সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ, রথীন্দ্রনাথ ও বৌদি ছিলেন। * * মিসেস রীজের অনুরোধে কবি স্বয়ং 'গীতাঞ্জলি'র কয়েকটি পাতা পাঠ করেন। 'সে যে আসে আসে আসে' এইটির ইংরাজি পাঠ করিয়া পরে বাংলায় গানও করিয়াছিলেন। * * Dr. Waldo নামে একজন শ্রেষ্ঠ সংগীতবিদ্ উপস্থিত ছিলেন।"

কালীমোহনবাবু আরেকটিতে লিখছেন—" * * আমি চোখ বুজিয়া বসিয়া আছি, রদেনস্টাইন আমাকে আঁকছেন আর গল্প করছেন, এমন সময় গুরুদেব এসে উপস্থিত। হাতে Manuscript—শীঘ্রই কাব্য আরেকখণ্ড বাহির হইবে।"

এণ্ড্রুজ সাহেবের পত্রে গুরুদেবের খবর জানা যায়। রেঙ্গুনের পথে জাহাজের খবর লিখছেন—

"প্রিয় কালীমোহন,

আমি এমনি একেবারে আমার সেই প্রতিজ্ঞা-পূরণের চেষ্টা করিতে চাই। বিদ্যালয়ের সকলকে আমাদের এই যাত্রার খবর লিখিতে আরম্ভ করিলাম।"

জাহাজে সীট-পাওয়ার বিড়ম্বনা, একদিন দেরী করে জাহাজ ছাড়বার দরুন কষ্ট

পাওয়া প্রভৃতি অনেক খবর দিয়ে তারপরে লিখছেন—"আজকেই গুরুদেব তাঁর সমস্ত ক্লান্তি আশ্চর্যরকমে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছেন। * * গঙ্গার মোহনা বাহিয়া উভয় তীরের ছোট-ছোট গ্রামগুলির দিকে তাকাইতে তাকাইতে তিনি চলিয়াছেন। তাঁর মুখের উপর তৃপ্তিপূর্ণ বিশ্রামের স্নিগ্ধদৃষ্টি দেখা যাইতেছে। আজ অপরাহ্নে তিনি চেয়ারে খুব শান্তির সহিত নিদ্রা যাইতেছেন। এখনি তিনি পিছনে হেলিয়া বিশ্রাম করিতেছেন। তাঁহার সুন্দর মুখের উপর চিন্তার রেখামাত্রও নাই।"

পথে যেতে যেতে সমুদ্রে ভয়ংকর ঝড় উঠে'ছিল। সেই বিপদের সময় গুরুদেবের স্থৈর্য এবং নির্ভীক ভাবের বর্ণনা করে এণ্ডরুজ লিখছেন,—"একটার পরে আমাদিগকে নীচে নামিতে দেওয়া হল; আর ডেকে থাকবার অনুমতি দিলেন না। তখন উপরের ডেক ও নীচের ডেকের উপর দিয়া ঢেউ চলতে লাগল, অনেক সময় পুলের উপরও জল উঠছিল। * * এই সময়টা অত্যন্ত বিশ্রী লাগতে লাগল। গুরুদেব স্তব্ধ হয়ে চোখ বুজে ধ্যানস্থ হয়ে রইলেন; তাঁকে দেখাচ্ছিল—ঠিক যেন প্রলয়ের মাঝে শান্তির মূর্তি। গ্যালিলির সমুদ্রের ঝড়ের মধ্যে খ্রীস্টের নিদ্রিত ছবির কথা মনে ক'রে খ্রীষ্টানের মনে যে রকম ভাব হয় গুরুদেবকে দেখে আমারও ঠিক সেই কথা মনে হচ্ছিল। আমি ঘুরে ঘুরে বারে বারে গুরুদেবের কাছে গিয়ে তাঁর থেকে বললাভের চেষ্টা করিয়াছিলাম। * * যাক্ বিপদ কেটে গেছে, সেজন্য আমরা কৃতজ্ঞ। ঠিক গুরুদেবের জন্মদিনের আগের দিন হয়েছিল। তিনি আর-এক বৎসর পরমায়ু লাভ করলেন, তার জন্যও আমরা কৃতজ্ঞ।" (বাগান আষাঢ় ১৩৩৩) এণ্ডরুজ সাহেবের চিঠি কালীমোহবাবু বাংলায় তর্জমা করে পত্রিকায় দিতেন।

সাতই পৌষ তখন মাত্র একটি দিন হত। 'শিশু' ১৩১৮ পৌষ ও মাঘ সংখ্যায় সাতই পৌষের একটি দিনের উৎসবের বর্ণনা আছে একজনের লেখায়। সকালে উপাসনা হবার পর ছাতিমতলায় সভা হত। দুপুরে ছাত্রগণ শিশুবিভাগে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে নানা গল্প শুনত। বিকেলের দিকে শুনতে যেত যাত্রা। রাত্রের মন্দিরের উপাসনায় বড়-ছেলেরা যোগ দিত। তারপরে বাজি-পোড়ানো হত। এত বড় মেলা তখন হত না। সাধু-সজ্জনের আগমনে উৎসব পূর্ণ ছিল। রবীন্দ্রনাথকে দেখা এবং তাঁর উপদেশ-শোনাই ছিল আগন্তুকদের প্রধান উদ্দেশ্য। একবার সাতই পৌষ উৎসবে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের পিতা প্রকাশচন্দ্র রায় এখানে আসেন। 'শান্তি' (১৩১৭) পত্রিকাতে খবরের মধ্যে আছে, "৭ই পৌষ পূজ্যপাদ মহর্ষিদেবের দীক্ষা-দিন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন-আশ্রমে প্রতি-বৎসর এই দিনে উৎসব ও

তাহার সঙ্গে দিবসব্যাপী একটি মেলাও হইয়া থাকে। প্রাতঃ ও সন্ধ্যাকালে মন্দিরে নিয়মিত উপাসনা হয়। প্রতি-বৎসরই পূজনীয় গুরুদেব মন্দিরের কার্য পরিচালনা করেন। এই উৎসব সাধুসজ্জন-সমাগমে মধুর ও পবিত্র হইয়া উঠে। স্বর্গীয় মহর্ষিদেবের দীক্ষাদিনের উৎসবে এইবার আরেকটি প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মার শুভাগমন হইয়াছে। ইঁহার নাম শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র রায়। ঋষিপ্রতিম এই বৃদ্ধ মহাত্মাকে দর্শন করিলেই মুগ্ধ হইতে হয়—ইনি সমগ্র বাংলাদেশের শ্রদ্ধাভাজন।"

" * * সাধুসজ্জন সঙ্গমেচ্ছু অনেক মহাত্মা ও যুবক এই উৎসব উপলক্ষে আশ্রমে আসিয়াছেন।"

সেই পত্রিকাতেই আরেকটি খবর রয়েছে—এই যে,—

"আশ্রমের অন্যতম অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি-এ মহাশয় মহর্ষিদেবের দীক্ষার বিংশ সাম্বৎসরিক উৎসবের পুণ্য প্রভাতে তাঁহার সাধনাক্ষেত্রে সপ্তপর্ণবৃক্ষের বেদিকামূলে পরম পূজনীয় গুরুদেবের নিকট ব্রাহ্ম-ধর্মের দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মহাশয়ের চিত্ত ধর্মের পিপাসা হইতে কিছুতেই নিবৃত্ত হইল না—তাই ৭ই পৌষের শুভদিনে শুভলগ্নে উপযুক্ত গুরুর চরণ-প্রান্তে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন।"

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন 'কবীর', শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী 'পালি-প্রকাশের ভূমিকা', শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বঙ্গভাষার অভিধান' প্রণয়নে ব্যাপৃত আছেন, এ সব খবর দিয়ে এক পত্রিকা মন্তব্যে লিখেছে—"কিন্তু শুধু গৌরব করিলে হইবে কি? আমরা যদি শিক্ষানুক্রমে তাঁহাদের ন্যায় অক্লান্ত শ্রমশীলতা, অনির্বাপিত উৎসাহ লাভ করিতে পারি তবেই হয়।" ছাত্রদের মনে শিক্ষকদের কাজের প্রভাব কী রকম জীবন্ত হয়ে উঠছে, এই থেকে তা জানা যায়।

'The Ashram' (Vol. 1 P.14) পত্রিকাতে 'Gandi's Speech in the Mandir' শীর্ষক একটি লেখা আছে। মহামান্য গোখ্‌লের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে গান্ধীজি আশ্রম থেকে চলে যান। যাবার আগে মন্দিরে একটি বক্তৃতা দেন। গোখলে সম্বন্ধে বলেন, "He is dead, but his work is not dead, for his spirit lives.' গোখ্‌লের কাছে একবার এক হিন্দু-সন্ন্যাসী এসে হিন্দু-ধর্ম বোঝাতে গিয়ে মুসলমানদের সম্বন্ধে কিছু বক্রোক্তি করেন, তাতে গোখলে বলেছিলেন, "If this is Hindui m I will have nothing of it"। মরবার আগে তিনি বলে গিয়েছেন—"I do not want any memorial or any statue. I want only

that men should love their country and serve it with their lives." এটি যে সারা ভারতের বাণী একথা জোরের সঙ্গে ব'লে গান্ধীজি বলছেন—

"If we can love India in the same way as he did, we have done well in coming to Santiniketan to learn how to guide lives for India's sake."

'দৈনিক' নামে একটি পত্রিকা প্রত্যহ বের হত। তার থেকে সংগ্রহ করে নিয়ে 'বাগান' পত্রিকাতে উদ্ধৃত করা হয়েছে—'মহারাজ গান্ধী' শীর্ষক সংবাদটি। "আমরা গতকল্য অভ্যর্থনা সম্বন্ধে লিখিয়াছিলাম যে, যদি আমাদের হৃদয়ের ভক্তি অকৃত্রিম হয়, তাহা হইলে গান্ধী মহারাজ আনন্দোজ্জ্বল দৃষ্টিতে আমাদের আশীর্বাদ করবেন। আমাদের সেই আশা সফল হইয়াছে।"

'শান্তি' (১৩২০ মাঘ ও ফাল্গুন) পত্রিকাতে ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের লেখা একখানি চিঠি আছে। কলকাতা থেকে ব্রজেন্দ্রনাথ লিখছেন—

"শ্রদ্ধাস্পদেষু

Gardener পাইবামাত্র আপনাকে আমি প্রাপ্তিস্বীকার করিয়া পত্র লিখিয়াছিলাম, তখনও কবিতাগুলি পাঠ করি নাই। Gardener আমাকে Gitanjali অপেক্ষা কম চমৎকৃত করে নাই। এ সকল কবিতা যে এরূপভাবে এক ভাষায় রূপান্তরিত করা যায়, তাহা আমার ধারণাই ছিল না।

শুনিতে পাই নাকি বিলাতে কেহ-কেহ Gardener-এ Love-poems দেখিয়া dissappointed হইয়াছেন। তাঁহারা কেবল Divine Love-এর প্রার্থী, human "flesh and blood," human heart-কে তাঁহারা mystic-এর নিকট হইতে দূরে রাখিতে প্রয়াস পান। কিছুদিন পূর্বে আমি Rothenstein-কে এই বিষয়ে লিখি,—

I do not understand all this...Our Rabindranath has not been a mystic all his life, He has had springtide fancies, has passionate "Lifehunger" his storm and stress of soul; and it is because of these stirrings in the blood, this deep-veined humanity, that he has come to the realisation of life, has become a seer, a true "Eastern-Western Divina," such as Goethe dreamt of, but could never be in his own person.

এইরূপভাবে লিখিয়াছিলাম। এখনও দুই একটি কাজ বাকি রহিয়াছে।

(1) ইংরাজি Stage-এ চিত্রাঙ্গদা ও আপনার অন্য কোনো play-র অভিনয়।

ইহাতে English plays-এ একটা নূতন Movement আসিবে, তাহা সামাজিক চিন্তা ও জীবনের atmosphere-টি পরিষ্কার করিবে।

(2) ছোট ছোট গল্পগুলির translation, ইহাতে কেবল England-এ নয়, Continent-এ-ও short stories রচনা বিষয়ে নূতন যুগ আসিবে। বিশেষতঃ Short stories গুলি French ভাষায় translate করা একান্ত আবশ্যক।

আমার যদি এই এপ্রিল মাসে বিলাত যাওয়া হয় তাহা হইলে এই শেষ বিষয়ে চেষ্টা করিব।

যাহাতে এই চিঠি নিশ্চিত আপনার নিকট পহুঁছে সেইজন্য registered করিয়া Tagore Castle ঠিকানায় Post করিতেছি। সেখান হইতে আপনার address-এ redirected হইয়া যাইবে। আশা করি আপনার শরীর সুস্থ আছে। আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানিবেন।

শ্রদ্ধাবনত ও বশম্বদ

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ শীল।"

আচার্য সিলভ্যাঁ লেভির শান্তিনিকেতন-আগমন সম্বন্ধে বিশ্বভারতী (১৩২৮ কার্তিক ও অগ্রহায়ণ) পত্রিকায় একটি লেখা আছে। "৯ই নভেম্বর (১৯২১) বুধবার দিন ৪টার সময় আচার্য লেভি সস্ত্রীক আশ্রমে পদার্পণ করেন।

"কলকাতা এসেই সিলভ্যাঁ লেভি গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তখনই বেলপুরে যাবার গাড়ি আছে কি না জিজ্ঞেস করেছিলেন। আশ্রমের পক্ষ থেকে দেশীয় প্রথায় তাঁকে অভিনন্দন দেওয়া হয়েছিল। দূর থেকে আচার্য লেভি "I see you I see you" বলে গুরুদেবের দিকে ছুটে এলেন। ব্যস্ততায় তাঁর টুপি পড়ে গেল। * * গুরুদেব তাঁকে ও মাদাম লেভিকে এনে তাঁদের আসনে বসালেন ও চন্দন ও মাল্য দিয়ে তাঁদের অভ্যর্থনা করলেন।"

এরপরে গুরুদেব ইংরাজিতে যে অভিনন্দন পাঠ করেছিলেন তার সারমর্ম দেওয়া আছে—

"Dear Acharya,

On behalf of our Santiniketan Ashram, I offer you a hearty welcome. You know the wisdom, which flowed in ancient India, had its source in the depth of the Tapovanas. It was there that our seers had their communion of soul with the Infinite being in the peace of nature, in the heart of boundless

space and limitless light. *** We thank you for having so. generously accepted our invitation, for bringing sympathy and fellowship from the West for the cause which our institution represents, the cause of the Spiritual Union of races."

এই অভ্যর্থনার উপসংহারে আচার্য লেভি একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা দিয়ে সকলকে ধন্যবাদ দেন। তাতে বলেন—

"Too long had the scholars of different nations been working in a narrow groove, each confined within the limits of his own country. But the time has now come for a closer fellowship in work. I have, therefore, come to the Ashram to help in this task of intellectual raproachment, to suggest if possible new modes of research. The ideal of humanity would be realised soon in this way than in any other."

এই বলে তিনি পূজনীয় গুরুদেবের দিকে মাথা নত করে বললেন—এখানেই পূর্ব পশ্চিমের মিলন হয়েছে।

"Here indeed we have met the East and West."

'বিশ্বভারতী'-পত্রিকা চতুর্থ বর্ষ প্রথম সংখ্যায় গুরুদেবের একটি গান স্বরলিপি-সমেত প্রকাশিত করা হয়েছে, তাতে সুরকার-হিসাবে নাম দেওয়া রয়েছে শ্রীভীমরাও শাস্ত্রীর।

গান

কোথা যে উধাও হল
মোর প্রাণ
উদাসী আজি ভরা শ্রাবণে।
ঘন ঘন গুরু গুরু গরজিছে
ঝর ঝর দিকে দিগন্তে বারিধারা
মন ছুটে দূরে দূরে আনন্দে অশান্ত বাতাসে।

সুর—মিয়া মল্লার

তাল—তিলওয়াড়া (১৬ মাত্রা বিলম্বিত লয়)

কথা—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুর ও স্বরলিপি—

শ্রীভীমরাও শাস্ত্রী

গুরুদেবের চিঠি—যাত্রী—শারদীয় সংখ্যা, ২য় বর্ষ, ১৩২৭ :—

Bonlogne Sar Seene
Aug., 20, 1920,

"* * * We are in a delightful country in a delightful place, meeting with people who are so human. They actually believe in their ideal and have enthusiasm for them. The founder of the institution whose guest I am is a great personality. He is a banker of European reputation who is one of the presiding deities of economic meterology of Europe. And yet his soul is not dead. He is thinking great thoughts, carrying out great ideas, living the abstenious life of a tapaswi. He is devoting his immense resources for the good of humanity—not through any comfortable and respectable path of sentimental charity but by discovering and systematically attacking the root of the evil from which human beings are suffering. It requires a stupendous amount of organised information in all branches of knowledge and human activity—and this is the kind of work about which he has thought deeply and for long, made plans, and has set a huge host of workers to carry them out. It is an amagingly comprehensive scheme for which an extra-ordinary power of thinking and organizing is needed. Above all is required that spiritual love which does not depend for its fire upon repeated supplies of fuel of immediate success. It is an inspiration for me to know this man and to talk to him. I feel clearly when I am in touch with men of this type that the ultimate reality of man's life is his life in the world of ideas, where he is emancipated from the gravitational pul of the dust and where he realises that he i, spirit. We, in India, live in a narrow cage of petty interests. We do not believe that we have wings, for we have lost our sky; we chatter and hop and peck at one another within the small range of our obstructed opportunity. It is difficult to achieve greatness of mind and

character where our whole life occupies and affects an extremely limited area. And yet through cracks and chinks of our walls we must send out our starved branches to the sunlight and air, and roots of our life must pierce the upper start of our soil of desert sands till they reach the springs of water which is exhaustless. The most difficult problem is ours, which is how to gain our freedom of soul inspite of the crampedness of the outward circumstances, how to ignore the perpetual insult of our destiny to be able to uphold the dignity of man. Our Shantiniketan is for this *tapasya* of India. We who have come there often forget the greatness of our mission mostly because of the obscurity of insignificance with which the humanity of India seems to be obliterated. We do not have the proper life and perspective in our surroundings to be able to realise that our soul is great and therefore we have as if it is doomed to be small for all time."

* * *

বিশ্বভারতীর পর্ব শুরু হয়েছে। কবি ইউরোপ-ভ্রমণে গেছেন। সে সময় এ চিঠিখানি তিনি লিখেছেন। "রবীন্দ্র-জীবনী"র সাহায্যে জানা যায়,—"রবীন্দ্রনাথ ফ্রান্সে আসিয়াছেন শুনিয়া প্যারিসের বিখ্যাত ধনী (Kahn) কবিকে তাঁহার Autour de mondeএ থাকিবার জন্য আমন্ত্রণ করিলেন; ৮ অগস্ট (১৯২০) প্যারিসের শহরতলীতে কাহনের অতিথিশালায় তাঁহারা আশ্রয় লইলেন। প্যারিশ থেকে একটু তফাতে নিরিবিলি জায়গায়, সীন নদীর ধারে।" (রবীন্দ্র-জীবনী ২য় সং, ৩য় খণ্ড পৃ ৪১) মৈত্রভাব-অনুপ্রাণিত যে-কজন মনীষী দেশেবিদেশে সংস্কৃতি সাধনার সূত্রে মানবজাতির যোগস্থাপনায় উদ্যোগী ছিলেন, তাদের মধ্যে সিলভ্যাঁ লেভি, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল প্রমুখ ব্যক্তিদের মতো এই কাহন-ও ছিলেন রবীন্দ্রনাথের গভীর অনুরাগী। তাঁর 'Autour de monde' নামক প্রতিষ্ঠানের কথাই উপরোক্ত পত্রে কবি উল্লেখ করেছেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানটির উল্লেখ ক'রে অন্যত্র প্রকাশিত কবির আরেকখানি চিঠিতে লেখা আছে—'যা হোক এই বাড়িতে যে দেশ-বিদেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এসে থাকতে পারেন এবং মিশতে পারেন কেবল তাহাই নয়,

Autour du monde-এর উদ্দেশ্য ও কর্মণ্যতা আরো বিস্তৃত। প্রত্যেক দেশ থেকে দুজন চারজন করে লোককে তাঁরা টাকা দিয়ে এক বছরের জন্য পৃথিবী ঘুরতে পাঠিয়ে দেন। * * * Lowes Dickinson এই বৃত্তি নিয়ে ভারতবর্ষ, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে গিয়েছিলেন।" শান্তিনিকেতন-পত্রিকা ১৩২৭ ভাদ্র

বাংলাদেশের এক কোণে শিশুদের নিয়ে 'কাজ-কাজ খেলা' পেতেছিলেন বিচিত্র এক ভাবের মানুষ রবীন্দ্রনাথ। শিশুদের সঙ্গে খেলতে খেলতে, নিজের মনও ভরে নিয়েছেন সেই খেলার রসেই। তাতেই তাঁর কাছে সংসার আর সংগ্রামক্ষেত্র হয়ে দেখা দেয়নি। সে হয়েছে 'খেলাঘর'। জীবনের কাজগুলিকে গড়ে তুলেছেন খেলার পরম ঔৎসুক্যে; যখন তা ছেড়ে যেতে হয়েছে, ছেড়ে গিয়েছেন খেলোয়াড়ের মুক্ত মনোভাবে। উদ্দীপনাময় এই খেলার দৃষ্টি ধরিয়ে দিতে চেয়েছেন তিনি মানুষের চোখে,—এই তাঁর শিক্ষার একটি অন্যতম দান।

কবি একখানি পত্রে লিখছেন,—"খেলার জগতে শিশু হয়ে জন্মেছি এই ঘটনাটির মধ্যে অস্তিত্বের মূল সত্যটি আমাদের জীবনের ভূমিকারূপে লিখিত হয়েছে, এই কথাটি কিছুকাল থেকে বারবার আমি ভাবচি এবং 'শিশু'র কবিতায় এক-রকম করে প্রকাশ করার চেষ্টা করেচি। দায়িত্ববোধরূপ ব্যাধি মানুষের বয়স্কতাকে কড়া করে পাকা করে তোলে, সে অবস্থায় সে খেলাকে অবজ্ঞা করতে থাকে, এবং খেলার সঙ্গে কাজের চির-বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিয়ে কর্তব্যসাধন করচে বলে গৌরব বোধ করে। জানে না সে যা বলে তাতে জগৎকর্তার নিন্দা করা হয়, কেন না খেলা ছাড়া তাঁর কোনো কাজ নেই—তাঁর দায় নেই বলেই তিনি আনন্দ-ময়। আজকাল আমার প্রায়ই সেদিনের কথা মনে পড়ে যখন তাঁর সঙ্গে আমার মিল ছিল, যখন আমার কোনো দায় ছিল না। হাসিকান্না খুব তীব্র ছিল, কিন্তু সে সমস্তই জীবনের লীলার সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। তাতে যে কোনো ফুল ফোটে নি, ফল ফলে নি তা নয়—তার অনেক ফুল এখনো ম্লান হয় নি, তার অনেক ফল এখনো টিকে আছে। সেই ফুল-ফলেই পৃথিবীতে আমার পরিচয়। যে কাজ দায়িত্বের সে কাজ ক্ষণকালের—যে কাজ খেলার সৃষ্টি সেই কাজেই চির-কালের ছাপ। আমার ভয় হচ্ছে বিশ্বভারতীতে খেলার চেয়ে দায়িত্ব পাছে বড় হয়ে ওঠে। এ রকম অনুষ্ঠানের মধ্যে যে অংশটা আইডিয়া সেইটেই বিশুদ্ধ আনন্দ—আর যে-অংশটা ব্যবস্থা সেইটেই হচ্চে বিষম দায়—সেটা যদি আইডিয়াকে চাপা দিয়ে আটে-ঘাটে আষ্টে-পৃষ্ঠে পাকা হয়ে ওঠে তা হলেই পাকা বুদ্ধির লোকে খুসি হয়ে ওঠে, কিন্তু সৃষ্টিকর্তার তাতে বিতৃষ্ণা হয়; মানুষ ক্তি পেতে চায়, তার মানে সৃষ্টি-কর্তার স্বরূপ ও অধিকার

পেতে চায়; অর্থাৎ কাজ পরিহার করে মুক্তি নয়, কিন্তু খেলাকেই কাজ করে তুলে তার মুক্তি। বৈষ্ণবের তত্ত্ব হচ্ছে যুগল-মিলনের তত্ত্ব—কাজের সঙ্গে খেলার একাত্ম মিলনই হচ্ছে সেই যুগলমিলন। ইতি—২৭ বৈশাখ, ১৩২৯ (চিঠিপত্র ৫ম খণ্ড পৃ ৪৪-৪৫)

কবির স্কুল-গড়ার ইতিহাসটুকু সংক্ষেপতঃ তাঁরই কথায় বলতে গেলে এই,—

"আমার অতি বাল্যকালেই মা মারা গিয়াছিলেন—তখন বোধ হয় আমার বয়স ১১।১২ বৎসর হইবে। তাঁহার মৃত্যুর দুই-এক বৎসর পূর্বে আমার পিতা আমাকে সঙ্গে করিয়া অমৃতসর হইয়া ড্যালহৌসী পর্বতে ভ্রমণ করিতে যান—সেই আমার বাহিরের জগতের সহিত প্রথম পরিচয়। সেই ভ্রমণটি আমার রচনার মধ্যে নিঃসন্দেহে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সেই তিন মাস পিতৃদেবের সহিত একত্র সহবাসকালে তাঁহার নিকট হইতে ইংরাজি ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতাম এবং মুখে-মুখে জ্যোতিষ-শাস্ত্র আলোচনা ও নক্ষত্র পরিচয়ে অনেক সন্ধ্যা সময় কাটিত। এই যে স্কুলের বন্ধন ছিন্ন করিয়া মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে তিনমাস স্বাধীনতার স্বাদ পাইয়াছিলাম ইহাতেই ফিরিয়া আসিয়া বিদ্যালয়ের সহিত আমার সংস্রব বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। এই শেষ-বয়সে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া তাহার শোধ দিতেছি—এখন আমার আর পালাইবার পথ নাই—ছাত্ররাও যাহাতে সর্বদা পালাইবার পথ না খোঁজে সেইদিকেই আমার দৃষ্টি। ইতি—২৮শে ভাদ্র ১৩০৭।"

১৩৩৮ সনের সপ্ততিতম জয়ন্তী-উৎসবের "প্রতিভাষণে" শৈশবের কথায় লিখছেন—"ইস্কুল-ঘরের বাইরের যে অবকাশটা বাধাহীন সেইখানে আমার মন হা-ঘরেদের মতো বেরিয়ে প'ড়ছিল।" নিজে বেরিয়ে প'ড়ে ছেলেদের জন্য পরবর্তীকালে তিনি যে না-বেরবার উপায় বের করলেন, তার পিছে তাঁর সরস পড়ানোর সঙ্গে কত গল্প গান কবিতা অভিনয় খেলাধুলা উৎসব, বন-ভোজন সভাসমিতি, পরিভ্রমণ এবং ছেলেদের সঙ্গে পরামর্শেরও কত উপলক্ষ্যময় একটা মধুর ছলনার শিকল তৈরি করতে হয়েছে, তার হিসাব কে রাখে।

পরিণত জীবনেও সংসারের কাজকে সরস, সাবলীল ও স্ফূর্তিময় করে তোলবার পক্ষে এ শিক্ষার যে দরকার আছে, রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র আয়োজনভরা শিক্ষায়তনের নানাদিকে উদ্যমসমৃদ্ধ জীবনের খবরগুলি থেকে তা বিশেষরূপেই জানা যায়। হাতে-লেখা ক্ষুদ্র পত্রিকাগুলিও সেই 'কাজ-কাজ-খেলার'ই একটা বিশিষ্ট অঙ্গ। খুশি থেকে এদের উৎপত্তি, রুচি দিয়ে এরা অলংকৃত, উৎসাহে এদের গতি, প্রীতি বিলিয়ে এরা কৃত-কৃতার্থ। শিক্ষার পাশাপাশি ক্ষেত্রে চলেছে স্বাধীন সৃষ্টি।

শিশুকাল থেকে পত্রিকা-পরিচালনা বিষয়ে স্বাভাবিকভাবে ছেলেরা এখানে দক্ষতা লাভ করে থাকে। একটি পত্রিকাকে সুচারুরূপে সাজিয়ে সকলের সামনে প্রকাশ করবার আনন্দই তাদের কাজের মূল্য।

ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপিত হয় ১৯০১ সনে। ১৯০৭ সন থেকে হাতে-লেখা পত্রিকাগুলি দেখতে পাওয়া যায়। ধারাবাহিকভাবে এ সব রক্ষিত নেই; বিভিন্ন পত্রিকার সংখ্যাগুলি বিশ্বভারতী-গ্রন্থাগারে যা রয়েছে তাও আছে বিচ্ছিন্নভাবে। প্রথমদিকের পত্রিকাগুলিতে মেয়েদের লেখা খুব কম আছে। বোঝা যায়, ছাত্রীসংখ্যা তখন মুষ্টিমেয় ছিল। তারপরে আশ্রম বড় হয়েছে; ছাত্রছাত্রীদের সম্মিলিত চেষ্টায় কত সাহিত্য-সভা গঠিত ও পরিচালিত হয়েছে এবং হাতে-লেখা পত্রিকাও কত বের হয়েছে; ধারাবাহিকভাবে সেগুলি পাওয়া গেলে আশ্রমগঠনের সম্পূর্ণ ইতিহাসটি এবং গুরুদেবের শিক্ষাধারার পরিপূর্ণ রূপটি আরো পরিষ্কারভাবে প্রকাশিত হবার সাহায্য হত।

শিশুদের নিয়ে শুরু-করা খেলা প্রাণের বেগে যখন বিশ্বের বড়োদের মেলায় গিয়ে দাঁড়াল,—তখন এর কল-কাকলী ছাপিয়ে গেছে দেশবিদেশের সীমা। এর খবরাখবর হাতে-লেখা পত্রিকার গুটি-গুটি অক্ষরে আর বাধ মানেনি। সংবাদপত্র এবং সাহিত্য-পত্রিকায় পৌঁছে গেছে এর নানা কথা। শান্তিনিকেতনেরও নিজস্ব মুদ্রিত সাময়িক-পত্রিকা বের হয়েছে। ক্রমে দেখা দিয়েছে 'বিশ্বভারতী নিউজ' মুখপত্র। হাতে-লেখা পত্রিকাগুলি শান্তিনিকেতনে তাদের ধারা রক্ষা ক'রে এখনও চলেছে। তবে, ৭।৮ বছর ধ'রে তারাও এসে পড়েছে বাইরের জনসমক্ষে। বছরের সে-সব পত্রিকা থেকে বাছাই করে রচনা নিয়ে 'আমাদের লেখা' নামক একটি বার্ষিকী সংকলন এখন বেরয় প্রতি-বছরই।

শান্তিনিকেতনে স্কুল-বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্য থেকে তাদেরি সম্পাদনা ও পরিচালনায় প্রথম যে-সাহিত্য-পত্রিকাখানি মুদ্রিত হয়ে বেরিয়েছে, তার নাম 'স্ফুলিঙ্গ'। তের-চৌদ্দ বৎসর বয়সের ছাত্র শ্রীঅলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত নিজেই সম্পাদনা ক'রে তার প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। পাঁচ-ছয় বছর আগে সেটির কয়েক সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। আজকাল অলোকরঞ্জন উদীয়মান নবীন কবিদের মধ্যে অন্যতম।

শান্তিনিকেতন যখন থেকে তার অরণ্যবাসের নিভৃত জীবনধারা পরিবর্তন ক'রে বিশ্বজীবনের অপেক্ষাকৃত প্রত্যক্ষ যোগাযোগে ঘনিষ্ঠতর হল, সেই বিশ্ব-ভারতীর পর্বে মুদ্রিত পুঁথিপত্রের অধ্যায়ে এসে তার পুরোনো দিনের নেপথ্য ঘরোয়া প্রসঙ্গের-ও এখানে দাঁড়ি টানা গেল। কারণ, পরবর্তী অধ্যায় নানাভাবেই অনেকটা জানা হয়ে আছে।

মন্তব্য

১

DHIRENDRA NATH MUKHERJI,
M. A. B. T.
Head Master,
Raghunathbari R. T. H. E. School.
Examiner, Calcutta University.

Raghunathbari, P. O.
Dist, Midnapore
৩০শে পৌষ ১৩৬০

প্রীতিভাজনেষু

সুধীরবাবু, আপনার প্রেরিত আপনার বোনের লেখা 'অপ্রকাশিত অধ্যায়' পেয়ে আপ্যায়িত এবং আনন্দিত হলাম। লেখাটি পড়ে খুবই ভাল লাগল, সুতরাং আপনার বোনকে অর্থাৎ লেখিকাকে বিশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, দয়া করে পুস্তিকাটি আমাকে মনে করে পাঠিয়েছেন ব'লে।

লেখিকা খুবই পরিশ্রম করেছেন, নানা পত্রিকার জীর্ণ পাতা ঘেঁটে সঞ্চয় করেছেন, তার চেয়ে বাহাদুরি সেগুলি সুন্দর মনোজ্ঞ করে পরিবেশন করেছেন। আমাদের তো ভাল লাগবেই, কেননা এখানি পড়লেই আমাদের শৈশবের কীর্তিকলাপ, আমোদ-প্রমোদ সবই মনে পড়ে যাবে। আর মনে পড়বে, এ সবেরই পিছনে যে-যাদুকরের অক্লান্ত চেষ্টা রয়েছে, তাঁর কথা। আমাদের সময়ে প্রথমদিকে অজিতবাবুর যুগই ছিল, গুরুদেবের ভাবে ও উপদেশে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি সমস্ত কাজে অনুপ্রেরণা দিতেন। ঐ যে পাখিদের খাওয়ানো প্রভৃতি, ও-সবই গুরুদেবেরই আইডিয়াকে অজিতবাবু কাজে পরিণত করতে চেষ্টা করতেন।

প্রথম সংখ্যা ও পরবর্তী অনেক সংখ্যার 'প্রভাতে'র প্রচ্ছদপটের ছবি মণি গুপ্তের আঁকা, সে তখন শিশুবিভাগের ছাত্র, আমি নায়ক বা captain. প্রথম সংখ্যার প্রচ্ছদপটের উপরে শ্রদ্ধেয় অজিতবাবু নিজের হাতে নিজে একটি কবিতা লিখে দিয়েছিলেন—বোধ হয় এখনও আছে।—

প্রথম পাতাখানি মেলেছে শতদল
নবীন জীবনের হায়—
'প্রভাত' শুভাশীষ কিরণোজ্জ্বল
যেন রে তাহারে ফুটায়।

'প্রভাতে'র প্রতিষ্ঠাতা আমি—লেখিকা ঠিকই পরের লেখা থেকে উদ্ধার

করেছেন—যদিও সম্পাদক বোধ হয় ছিল প্রভবদেব মুখোপাধ্যায়। আমার একটা রোগ ছিল, নিজের নাম না-দেওয়া। এখন প্রচারের যুগে মনে হয়, বড় বোকামি করেছি। যে-গুলি সম্পাদকীয় বা বেনামী, তার অনেকগুলিই ('প্রভাতে'র) আমার লেখা। এমন কি, প্রভব বা যার হাতের লেখা ভাল, তাদের না পেলে আমার শ্রীহস্তের লেখাই জায়গায়-জায়গায় বোধ হয় আছে। অনেক লেখা আমার আবার 'অনাথ শর্মা' নাম দিয়ে বের হত। এই নাম না-বের-করার রোগ এমন কি, পরে যখন শিক্ষক হয়ে যাই, তখনও ছিল। 'শান্তিনিকেতন'-পত্রিকার প্রথম দিকের সংবাদগুলি (যে-গুলিতে কোন নাম নেই) সেইগুলি প্রায় অধিকাংশই আমার লেখা। সুহৃদ্ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম-দেওয়া সংবাদও কোনো-কোনো সংখ্যায় আছে। সংবাদ আমি লিখে গুরুদেবকে দিতাম, তিনিই সেগুলি সংশোধন করে বাড়িয়ে বা বাদ দিতেন। সন্তোষবাবুও লিখতেন।

পুস্তিকার দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় যে-বাড়িতে "Mr. Pearson ও মহাত্মা গান্ধীর ছাত্রগণ" সে-বাড়িটিকে 'বাগানবাড়ি' বলা হয়েছে—এটা ভুল। শিশুবিভাগ ছিল যেখানে এক-সময় শেষের দিকে রমেশ সেন প্রভৃতি সপরিবারে থাকতেন—এ বিষয় ভাল বলতে পারবেন প্রভাতবাবু, তেজেশবাবু প্রভৃতি। সে বাড়িটার এখন কী নাম বলতে পারি না। 'বাগানবাড়ি' ছিল মন্দিরের কাছে জলহীন পুকুরটার দক্ষিণপাড়ে।

পাঁচ পৃষ্ঠায়—মন্দির তখন বৃহস্পতিবার হত। এটাও ঠিক না। তখন বুধবার হত বড়-ছেলেদের, বৃহস্পতিবার হত ছোট-ছেলেদের। '৮' পৃষ্ঠায় আশ্রমসংঘ বা সম্মিলনী—ছাত্রদের প্রতিষ্ঠান। আশ্রম-সম্মিলনীই ছিল ছাত্রদের প্রতিষ্ঠান। আশ্রম বা আশ্রমিক সংঘ ছিল বরাবরই প্রাক্তন-ছাত্রদের প্রতিষ্ঠান। আচ্ছা, আশ্রম-সম্মিলনীর পুরানো প্রতিবেদনের খাতা প্রভৃতি কি কোথাও আছে? এক-সময়ে ছাত্রদের মধ্যে চুরি প্রভৃতি দোষ দেখে গুরুদেব সম্মিলনীর সম্পাদককে সম্বোধন করে একখানি সুন্দর চিঠি দেন, এ সম্বন্ধে ছাত্রদের মধ্যে public opinion সৃষ্টি করবার জন্য। সে চিঠি কি কারো কাছে পাওয়া যায়? আশ্রম-সম্মিলনীর সম্পাদক প্রথমে আমি, (তখন আমি শিক্ষক) পরে অনাদি দস্তিদার, সাধক নন্দী প্রভৃতি ছিলেন। সে চিঠি সম্বন্ধে অনাদি হয়ত কিছু সন্ধান দিতে পারে।

১১ পৃষ্ঠায় যোগানন্দের (ইনি পরে আমেরিকায় আশ্রম করেন) সেই দামোদরের তীরের আশ্রমটি আমি ও নরেন নন্দী দেখতে যাই এবং এ চিঠিখানি আমার লেখা এবং ওর উত্তরে গুরুদেব আমাকে যে চিঠি দেন, সে চিঠি আমাকে

লেখা চিঠিগুলির মধ্যে কিছুদিন আগে 'দেশ' সাপ্তাহিক পত্রিকায় বের হয়েছে, পুলিন সেন জানে। যোগানন্দের সেই আশ্রমই বর্তমান রাঁচী ব্রহ্মচর্য-বিদ্যালয় আর সেখানকারই এক বিশিষ্ট কর্মী আমাদের কলেজের সহপাঠী স্বামী সত্যানন্দ গিরি এখন ঝাড়গ্রামের সেবায়তনের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য।

২২ পৃষ্ঠায় আধুনিক 'প্রভাত' দেখে কৌতূহল হচ্ছে, এখনও 'প্রভাত' বেঁচে আছে কি? এখানকার স্কুলেও ২০ বছর হল এসে ছেলেদের 'প্রভাত' পত্রিকা বের করিয়েছি, এবং ছাত্র-সম্মিলনীও আছে। তবে সে প্রাণ কোথায়? ২৩ পৃষ্ঠায় ধীরেন সেনের লেখাটি মনে হয় গুরুদেবেরই কথা, কেননা সাহিত্য-সভায় অনেক সময় গুরুদেব এ রকমের কথাই বলতেন। এ সম্বন্ধে বর্তমান শিক্ষাসচিব-সাহেব কী বলেন?

বর্তমান লাইব্রেরির পূব দিকের দেওয়ালে দৈনিক পত্রিকা বের হত—একটি বের হত 'চাবুক' নামে। শৈশব অবস্থায়ও কি বিশী প্র-না-বি নামে লিখত, মনে হচ্ছে না। সেও শিশুবিভাগে ছিল। হঠাৎ বইখানি পেয়ে অনেক-কিছু মনে হল এবং ব্যক্তিগত চপলতাও কিছু করে ফেললাম—ক্ষমা করবেন আপনারা। কিছু-কিছু আশ্রম-স্মৃতি অসম্পূর্ণ অবস্থায় লেখা পড়ে আছে—উইয়ে কাটছে। কেবল ছেলেদের পরীক্ষায় পাশ করাচ্ছি। ষাটের কোঠায় পড়লাম, শীঘ্রই রেহাই পাব। লেখিকাকে স্নেহাশীষ ও আপনাদের সশ্রদ্ধ প্রীতি নমস্কার—ইতি

আপনাদের ধীমুদা

২

শ্রীমতী সাধনা করের রচিত ছোট্ট কয়েক পৃষ্ঠার বইটিতে তত্ত্বকথা নেই, তথ্যেরও অভিমান নেই; সহজ সরল ভাষা, অনেক দিনের পুরানো শান্তিনিকেতনের কতকগুলি টুকরো-টুকরো ছবির সমাবেশ এতে আছে। হয়তো 'ছবি' বললে ভুল বলা হয়, যাঁরা শান্তিনিকেতনে নূতন এসেছেন বা নূতন পরিচয়ের অতিরিক্ত কিছু এখনও পাননি তাঁদের কাছে এই ছোট বইটিতে লেখা ঘটনাবলীর কোনোটিই ছবি হয়ে ফুটে উঠবে না। কিন্তু যাঁরা শান্তিনিকেতন-আশ্রমের আদি যুগের সঙ্গে পরিচিত তাঁদের মনে এই পুস্তিকার সামান্য-সামান্য ঘটনার উল্লেখ অবলম্বন ক'রে বেদনা-মধুর ছবির সৃষ্টি হবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন ও শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে যাঁদের ঔৎসুক্য আছে তাঁদের পক্ষেও পুস্তিকাটি কম মূল্যবান নয়। একাধিক প্রবন্ধে গল্পে কবিতায় রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাদর্শনের যতটুকু সাধারণভাবে

প্রকাশ করে গেছেন তার পরিপূরক হিসাবে এ পুস্তিকার ব্যবহার হতে পারে। তাঁর চেষ্টার দিকটি তখনকার ছাত্রদের লেখা নানা নামের পত্রিকার মধ্যে নানা ভাবে ফুটে উঠেছিল; চিন্তার রূপগ্রহণ চলেছিল কত ছোটখাট খুঁটিনাটির ভিতর দিয়ে তার আভাস রয়ে গেছে তখনকার আশ্রম-বালকদের সাহিত্য-সৃষ্টিতে। সেইগুলি অনুধাবন করলে অনেক মূল্যবান্ তত্ত্ব লাভ হতে পারে।

আজকাল পঠন-পাঠন বিষয়ে নানা জনের নানা পদ্ধতির কথা শুনতে পাওয়া যায়, সেইসব কোলাহলের মধ্যে একটি অতি সত্য অথচ অতি সোজা উপদেশ চাপা পড়ে যায়। ছাত্রদের কাছে পড়া-লেখার তাগাদা দেওয়াটা শিক্ষদের একটি বিশেষ দায়িত্ব হলেও তার চেয়ে অনেক বড় দায়িত্ব রয়েছে অন্যদিকে। ছাত্রদের বড় করে তুলতে হলে তাদের কাছে বড় করে দাবি করতে হয়, তাদের প্রাণের দ্বারে বারে বারে বড় হবার আহ্বান জানাতে হয়। এই আহ্বান যেন কখনো ছোট সংকীর্ণ না হয়, কখনো যেন ক্ষীণ হয়ে না পড়ে। কিন্তু এ দাবি জানাবার কোনো নির্দিষ্ট পদ্ধতি নেই। এটা নিতান্তই শিক্ষকের, গুরুর প্রাণের দাবি। গুরুর প্রাণের এই আহ্বান ছাত্রের প্রাণে জাগায় প্রবল আশার আলোড়ন। কেমন করে কোথায় যেন গুরুর প্রাণের স্পর্শ ঘটে যায় ছাত্রদের প্রাণে-মনে, গুরু ও শিষ্যের মধ্যে যেন একটা আত্মিক যোগ ঘটে। এই যোগ সম্ভব হতে দেখা যায় বড়-র ভূমিকায়, ছোট দাবির দুর্বল টান সুকুমার প্রাণে জোয়ার সৃষ্টি করতে পারে না। তাই দেখি গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিরাট মনের দুর্বার শক্তিতে ছাত্রদের কাছে আহ্বান জানাচ্ছেন, বড় হবার দাবি করছেন—তাদের ভালোতে তাঁর কত আনন্দ, তাদের দুর্বলতায় তাঁর প্রাণে দুঃখ কত সহজভাবেই গভীর হয়ে ওঠে। ছাত্রদের একটি পত্রিকায় আছে, "আচার্যদেব বলিয়াছেন, 'সমস্ত পৃথিবীর চোখ আমাদের এই আশ্রমের উপর পড়িয়াছে। যেটি সব চেয়ে বড় জিনিস সেটি আমাদের লাভ করিতে হইবে। এই আশ্রমের এমন একটি জিনিস আছে যাহা দ্বারা বিশ্বের মঙ্গল করা যায়। তোমাদের এমন জিনিসটি কাজে লাগাইতে হইবে। সেইটি লাভ করিতে হইবে।' " বিশ্বের মঙ্গল সাধনের আহ্বান, এই-ই রবীন্দ্রনাথের আহ্বান, রবীন্দ্রনাথের আশা। সকল পঠন-পাঠন নিয়ম-কানুন ভেদ করে এই ডাক, ক্ষুদ্র প্রাণের এতটুকু শক্তির নিকট বিশ্বের ডাক, বিশ্বের আশা। এমনি করেই বড়-র আহ্বানে ক্ষুদ্র বড় হয়ে ওঠে। তত্ত্বের মতো দু-এক জায়গায় রবীন্দ্রনাথ এ কথা বলেছেন। কিন্তু তাঁর নিজের বিদ্যালয়ে তাঁরই আচরিত ধর্ম এবং তাঁর তত্ত্ব যে একই সে-কথা অপ্রকাশিতই তো রয়েছে।

আর-একটি পত্রিকায় গুরুদেব প্রাণের দুঃখ প্রকাশ করেছেন—"আমি শুনতে পাই যে তোমরা ঝগড়া করিয়া পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে কথা বল না, তোমাদের এই শিশুহৃদয়ের মতি, কত অসরলতা, কত অন্যায়—সমস্ত আছে যখন সে-সব শুনি তখন আমার মনে অত্যন্ত আঘাত লাগে।" একাধিক শোক যে-মনকে আঘাত করেও বিচলিত করতে পারেনি শিশুদের ত্রুটি শিশুদের অন্যায় সেই মনকে আহত করেছে। এ যে তাঁরই সাধনার ব্যর্থতা, শিশুদের মধ্যেই যে তাঁরই প্রাণ বিকাশশীল। মনোবিজ্ঞানে এর যে নামই থাক্—Identification, Suggestion—এর কার্যকারিতা কেউ-ই অস্বীকার করতে পারেন না।

শান্তিনিকেতনে এই মহান্ একাত্মতার আবহাওয়া বর্তমান ছিল। অধ্যাপকরা তাঁদের চিন্তা জ্ঞান অনেক সময়েই ছাত্রদের পত্রিকায় প্রকাশ করতেন, কৃপা করে নয়, স্বাভাবিক সংগত বলেই। ছাত্ররা তাদের শিশুসুলভ অভিজ্ঞতা প্রকাশ করবে যে-পত্রিকায়, শিক্ষকরাও তাঁদের জ্ঞানচর্চা করবেন সেই পত্রিকাতে, এইটাই গুরুশিষ্যের সম্মিলিত সাধনার পরিবেশে স্বাভাবিক ছিল। বিলাতে ভ্রমণ করার সময় অধ্যাপকের নব-নব অভিজ্ঞতা এই ক্ষুদ্র আশ্রমটির শিশুদের কাছে পৌছত, প্রকাশিত হত তাদের কোনো-না-কোনো পত্রিকায়।

'শান্তিনিকেতনের অপ্রকাশিত অধ্যায়' অনেকটা বাতায়নের মতো, যতটুকু তার আয়তন তার শতগুণ প্রকাশ করে দেয়। হয়তো এর মূলে আছে পুরাতন দিনের অশ্রুস্নাত স্মৃতি, অন্নের স্পর্শেই যা বড় হয়ে ওঠে, ছবি হয়ে ওঠে। তবু এ কথা ঠিক, স্মৃতিপীড়িত মন যাঁদের নয় তাঁরাও এর ভিতর রবীন্দ্রনাথ জাত-শিক্ষকের কথা যা বলেছেন, শৈশবের যে spirit-এর ইঙ্গিত আজীবন দিয়ে এসেছেন তার আভাস পাবেন।

[শ্রীসমীরণ চট্টোপাধ্যায়, গ্রন্থপরিচয়, বিশ্বভারতী-পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৪

প্রাক্তন-ছাত্রের পত্রাবলী

যতই দিন যাবে, ততই অনেকের মনে হবে শান্তিনিকেতনের একখানি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের কথা। সে গ্রন্থ যেদিনই লেখা হোক, তার মালমশলার জোগাড় চাই আগে। ইতিমধ্যে নানা গ্রন্থ এবং সাময়িক রচনাদি প্রকাশিত হয়েছে। আশা করা যায় আরো হবে। কিছুই তুচ্ছ নয়;—যেদিক থেকে যা পাওয়া যায়, সবই চাই,—কুড়িয়ে-বাড়িয়ে-রাখা। সাজাই-বাছাই চলবে পরে। খবর যোগায়, এমন-কতকগুলি পত্রের বিষয় আজ আলোচনা করা যাচ্ছে। পত্রগুলি ইংরেজি ও মারাঠীতে লেখা।—ঘরোয়া-চিঠি যেমন হয়ে থাকে। দেশ ছেড়ে এক কিশোর এসেছে দূরের এক বিদ্যালয়ে। বাড়িতে সে পত্র লিখছে। পত্র জুড়ে বসেছে বিদ্যালয়ের কথায়। ছেলেটি ছিল আদর্শবাদী এবং হৃদয়বান্। বিদ্যালয়কে সে এবং বিদ্যালয় তাকে কীভাবে কতখানি আপন ক'রে নিয়েছিল, তা জানা যায় এই পত্রগুচ্ছে।

ছাত্রটির নাম শ্যামকান্ত সরদেশাই। মহারাষ্ট্র-প্রদেশের বরোদা-শহরের এক সমৃদ্ধিশালী সরদেশাই-পরিবার থেকে ১৯১২ সনের নভেম্বর মাসে শান্তিনিকেতনের স্কুলে সে পড়তে আসে। একসঙ্গেই আসে তারা দু'ভাই—শ্যামকান্ত ও জয়রাম। শ্যামকান্ত ১৯১৬ সনে এখান থেকেই ম্যাট্রিকুলেশন পাশ ক'রে ভরতি হয় গিয়ে পুণার ফার্গুসন কলেজে। সেখানকার পড়া শেষ করে সে স্টেট্-স্কলারশিপ নিয়ে যায় জার্মেনী। যুবক শ্যামকান্ত সেখানে এম. এস. সি., পি. এইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ করে। দুর্ভাগ্যবশতঃ মাত্র-পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে যক্ষ্মারোগে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পরে তাঁর লেখা চিঠি-পত্রাদি একত্র ক'রে পরিবার থেকে ৩৯৬ পাতার এক গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়। গ্রন্থটির নাম—শ্যামকান্তের পত্রাবলী (শ্যামকান্তচীঁ পত্রেঁ)।

পত্রসমূহ কয়েক খণ্ডে ভাগ করা। প্রথম খণ্ডেই মুদ্রিত রয়েছে শান্তিনিকেতন থেকে লেখা চিঠিগুলি। শিরোনাম—'প্রথম খণ্ড—শান্তিনিকেতন। ডিসেম্বর ১৯১২-১৯১৬।' গ্রন্থের বেশির ভাগ পত্রই শ্যামকান্তের মাতামহ এবং পিতাকে লেখা।

গ্রন্থটির গোড়াতেই আছে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে মুদ্রিত এক পত্র।—শ্যামকান্তের মৃত্যুর পরে লেখা। গুরুদেব লিখছেন:

'শ্যামকান্ত সরদেশাই একদা শান্তিনিকেতন আশ্রমে প্রবেশ করেছিল অপ্রত্যাশিতভাবে, তখন আমাদের বিদ্যালয়ে অন্য-প্রদেশের ছাত্র প্রায় কেউ ছিলনা।'

১৯১২ সনে রবীন্দ্রনাথ নোবেল-প্রাইজ পাননি; কবিখ্যাতি তাঁর ভারতবর্ষ ও ভারতের বাইরে পরিব্যাপ্ত নয়—ব্রহ্মচর্যাশ্রম তো সবে-মাত্র দশ-বারো বছর স্থাপিত হয়েছে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে ছাত্রছাত্রীর আনাগোনা তখনো তেমন শুরু হয়নি। সে-সময় মহারাষ্ট্রের নিষ্ঠাবান হিন্দু সরদেশাই-পরিবার থেকে দুটি ছেলে পাঠানো খুবই অভাবিত ব্যাপার। আশ্রমের ব্যয়ভার কম ছিল না। সরদেশাই-পরিবার ধনী ছিলেন, শ্যামকান্তর মাতামহ আহমদ-নগরের মোরোপন্ত কীর্তনে যাংচেকডে মহারাষ্ট্রের বরোদা-স্টেটে কাজ করতেন। ইংরেজি স্কুলে রেখে ছেলে-পড়াবার ক্ষমতা তাঁদের যথেষ্টই ছিল এবং সে-যুগে সেভাবে শিক্ষা দেওয়াই ছিল স্বাভাবিক। সেস্থলে দেশীয় স্কুলে, বিশেষ ক'রে ব্রাহ্ম-আশ্রমে রেখে ছেলে পড়াবার অভিলাষ যে তাঁদের হয়েছিল, এটা অমন নৈষ্ঠিক পরিবারের ব্যাপার ছিল বলেই বিস্ময়কর। শ্যামকান্ত নিজেই এক পত্রে তাঁর পিতাকে লিখছেন:

[I know, there were very few families like our's in our society at present time.······I know in our country no other guardian would dare to send his son to so far a country. No other guardian would permit his children so much liberty as you are all now *giving*.]

আমি জানি বর্তমানে আমাদের সমাজে খুব কম পরিবারই আছে যারা আমাদের পরিবারের মতো উদার। আমাদের দেশে অন্য কোনো অভিভাবকই এত দূর-দেশে তাঁদের ছেলে পাঠাতেন না এবং ছেলেদের এ রকম স্বাধীনতাও দিতেন না। [পত্রসংখ্যা-১৯

শ্যামকান্ত এখানে এসে আশ্রমকে একান্ত আপন করে নিয়েছিলেন। গুরুদেব লিখছেন:

"কিন্তু সে যেমন সকল দিক থেকে আমাদের আশ্রমের সঙ্গে একীভূত হয়েছিল এমন অন্য কোনো ছাত্র আমরা দেখিনি। পড়া মুখস্থ করে পরীক্ষায় ভালোরূপ সিদ্ধিলাভ করবার উপযুক্ত মেধা আমাদের দেশের ছেলেদের মধ্যে দুর্লভ নয়—কিন্তু বোধশক্তিবান যে চিত্তবৃত্তি বিদ্যাকে এবং চারিদিকের পরিকীর্ণ প্রভাবকে সমঞ্জসীভূত ক'রে সজীব সত্তায় পরিণত করতে পারে তা অল্পই দেখা যায়। সেই শক্তি ছিল শ্যামকান্তর। তাই সে আমাদের অত্যন্ত আপন হয়ে উঠেছিল, কিছুই তার কাছে বিদেশী ছিল না।"

আশ্রমে বিদেশীরা এসে কতখানি একাত্ম হয়ে উঠতে পারে শ্যামকান্ত তার প্রকৃষ্ট

উদাহরণ। আশ্রমবাসীর পক্ষ থেকেও সহৃদয়তার অভাব হয়নি, উভয়পক্ষের প্রীতিতে গভীর বন্ধন গড়ে উঠেছিল। শ্যামকান্ত আশ্রমকে ভালবেসেছিলেন, আশ্রমবাসীরাও তাঁকে কাছে টেনে নিয়েছিলেন। গুরুদেব লিখছেন :

"সে আমাদের আশ্রমকে হৃদয়ে গ্রহণ করেছিল, জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল এবং সে অধিকার করেছিল আমাদের হৃদয়। আমরা তাকে সকলেই ভালবেসেছিলুম।"

এই ভালোবাসাতেই শ্যামকান্ত শুধু আশ্রমবাসীকে নয়, বাংলাভাষাকেও সম্পূর্ণ আয়ত্ত করেছিলেন। এ বিষয়ে বাঙালী ছাত্রদের চেয়েও তাঁর কৃতিত্ব ছিল অধিক। রবীন্দ্রসংগীতেও অনুরাগ এবং অধিকার ছিল তাঁর প্রগাঢ়। গুরুদেব লিখছেন :

"তার সময়কার এমন কোনো ছাত্র আমাদের ওখানে ছিল না বাংলাভাষার অধিকারে যে তার সমকক্ষ ছিল। তা ছাড়া আমাদের সংগীতে তার অনুরাগ এবং প্রবেশ ছিল স্বাভাবিক। এই দুই পথ দিয়েই তার মন আমাদের আশ্রমের আদর্শ ও জীবনযাত্রায় নিজেকে সহজেই বিস্তার করতে পেরেছিল। দূর গৃহ থেকে এসেছিল শ্যামকান্ত, কিন্তু আপন হৃদয়-মনের শক্তিতে সে আমাদের একান্ত নিকটস্থ হয়েছিল এবং এখনো নিকটেই আছে।"

তৎকালীন আশ্রম-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অধ্যাপক জগদানন্দ রায় শ্যামকান্ত সম্বন্ধে এক চিঠিতে তাঁদের পিতাকে লিখছেন—ছেলে দুটিই অত্যন্ত সচ্চরিত্র। তাদেরকে আশ্রমে পেয়ে আমরা খুব গর্ব বোধ করছি। বাংলা শিখতে তাদের এখানে পাঠিয়েছেন এ জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ।

[Both the boys are exceptionally good in their conduct, we are really proud in getting them as inmates of the Ashram. I do not know how to thank you for sending your boys here for the benefit of learning Bengali here.]

এ ভাবে বাঙালী ও অবাঙালীতে মেলামেশার সুফল যে কতখানি তাও জগদানন্দ রায় জানিয়েছিলেন :

ওদের আসাতে আশ্রমের উপকার হল, এতে আপনাদের মারাঠী সাহিত্যের সৌন্দর্যও আমাদের কাছে প্রকাশ পাবে।

[This will do much good to the Ashram ; the beauty of your literature must not remain unrevealed to us.]

এ প্রসঙ্গে এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় শ্যামকান্তর

কাছ থেকে অনেক মারাঠী কবিতা সংগ্রহ করেছিলেন। এক পত্রে শ্যামকান্ত লিখেছেন—

আমি বাবাকে রামদাস, তুকারাম একনাথ, নামদেব প্রভৃতির কতগুলি মারাঠী কবিতা পাঠাতে লিখেছিলাম। তিনি আমার চিঠির উত্তর দেননি। আমাদের একজন শিক্ষক ক্ষিতিমোহন সেন আমার কাছে কবিতাগুলি চেয়েছেন। তাড়াতাড়ি তোমরা কতগুলি কবিতা পাঠিয়ে দিয়ো।

[I had written to Aba to send some Marathi poems of Ramdas, Tukaram, Eknath, Namdev etc. But he did not answer my letter. One of my teachers Kshitimohan Babu wants to have Marathi poems from me. So please send some poems of the famous Marathi poets as soon as you can.]

১৯১২ সনে শ্যামকান্ত যখন আশ্রমে আসেন তখন গুরুদেব আমেরিকায়। শ্যামকান্তের আসার খবর জগদানন্দ রায় গুরুদেবকে জানান। এখানকার ছাত্রদের প্রতি গুরুদেবের আগ্রহ ছিল প্রবল—সব সময় তাদের খবর রাখতেন। জগদানন্দ রায়ের চিঠি পেয়ে তিনি খুশী হয়ে চিঠি দিয়েছিলেন। জগদানন্দবাবু সেকথা শ্যামকান্তর পিতাকে লিখে জানান :

—বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এখন আমেরিকায় আছেন। আপনার ছেলেদের সম্বন্ধে আমি তাঁকে লিখেছিলাম। তিনি উত্তরে অতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। এবং আশ্রমিকদের মধ্যে তাদের পেয়েছি ব'লে আমাদের শুভ কামনা জানিয়েছেন।

[I wrote to Babu Rabindranath Tagore, who is now in America, about your boys and in reply he has expressed great satisfaction, and has congratulated us in getting the boys among the inmates of the Ashram.]

পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিখ্যাত হয়েছেন, দেশবিদেশে তাঁর কবিপ্রসিদ্ধি বিস্তৃতি লাভ করেছে। শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়ে বহুদেশের ছাত্রছাত্রীর আনাগোনা ঘটেছে, কিন্তু সে-সময় ব্রহ্মচর্যাশ্রমে অবাঙালী ছাত্র আসা আশ্রমবাসী এবং গুরুদেবের কাছেও এক অভাবনীয় আনন্দের বিষয় ছিল। ছাত্রসংখ্যা ছিল স্বল্প, এত শিক্ষক-শিক্ষিকাও ছিলেন না, তখন আশ্রমের প্রসারই-বা কী? জগদানন্দ রায় শ্যামকান্তর পিতাকে লিখে জানাচ্ছেন—আপনি জানিয়েছেন শ্যামকান্তর শিক্ষা

ও ব্যবহারে আপনি সন্তুষ্ট হয়েছেন। এখানে দুশো ব্রহ্মচারী পড়ছে, তাদের মধ্যে শ্রীমানই সব দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ ব'লে গণ্য হয়েছে আমাদের কাছেও।

[We are all here to learn that Sriman Shyamkant has satisfied you. Sriman seems to us now in every respect a best boy among two hundred Brahmacharies who are being educated here.]

আশ্রমের শিক্ষার উদ্দেশ্যই ছিল তাই,—শুধু পড়াশুনার কৃতিত্বে নয়, স্বভাব-চরিত্র এবং বোধশক্তিতেও সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে ছাত্রগণ। শ্যামকান্ত সে-উদ্দেশ্য সফল করতে পেরেছিল। এখানকার শিক্ষার সঙ্গে অন্যান্য বিদ্যালয়ের শিক্ষার কী তফাৎ, শ্যামকান্ত নিজেই তা লিখেছেন :

—শান্তিনিকেতনে এসে আমি অনেক দিক থেকে উপকৃত হয়েছি। এখানে খ্যাতনামা জ্ঞানীগুণীজনের সমাগম হয়, তাঁদের দেখতে পাই, বক্তৃতা শুনতে পাই এবং গুরুদেব উপদেশাদি দেন। বরোদাতে থাকলে কি আর এসব সৌভাগ্য হত!

[I am sure, by living here, at Santiniketan, I have had many benefits. I could see so many great men and hear their lectures and hear Gurudev's sermons. I am sure that had I been at Baroda I could never have had these benefits.]

শান্তিনিকেতনে এসেই শ্যামকান্তর প্রথম কাজ হল,—ঠাকুর-পরিবারের ইতিহাস রচনা। মনে রাখতে হবে সে-সময় বাংলাদেশেও রবীন্দ্রনাথের জীবনী বা ঠাকুর-বংশ সম্বন্ধে কোনো আলোচনা শুরু হয়নি, এ বিষয়ে তেমন কোনো কৌতূহলও দেশবাসীর মনে জেগেছিল কি না সন্দেহ। কিশোর বালক প্রথমেই এ বিষয়ে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। সেটা ঐতিহাসিক রচনা নয়, বালকের পক্ষে সে সম্ভবও ছিল না, কিন্তু তথ্যসংগ্রহে কৌতূহলী হওয়াটাই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এবং সে-সব তিনি সংগ্রহ করেছিলেন দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে। মাতামহকে এক চিঠিতে লিখছেন :

—পরের পত্রে আমি তোমাকে ঠাকুর-বংশের ইতিহাস লিখে পাঠাব।

[The next time I shall write the account of the Tagore family to you.]

পরের চিঠিতেই তালিকা পাঠিয়ে দেন এবং লেখেন : আমি পারিবারিক নামগুলি দিনেন্দ্রনাথের কাছে পেয়েছি। ঠাকুরবংশের তালিকা থেকে তাঁর নামটি দেখে নিয়ো।

[I got these family names from Mr. Dinendranath Tagore. Find out his name from the Tagore family.]

সে-সঙ্গে শ্যামকান্ত এও জানিয়েছেন যে, ছোট-ভাইদের সে-তালিকাটি দেখালে তারা নিশ্চয় খুশী হবে। এ থেকেই বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে শ্যামকান্তর কতখানি শ্রদ্ধা ছিল।

শুধু কি রবীন্দ্রনাথ, আশ্রমকেও কত গভীরভাবে তিনি ভালোবেসেছিলেন বোঝা যায় তাঁর প্রতি-পত্রে; শান্তিনিকেতনের খুঁটিনাটি তথ্য পর্যন্ত মাতামহ এবং পিতাকে পরিবেশন করেছেন। ব্যক্তিগত দিক থেকে সে-সব তাঁদের খুব প্রয়োজনীয় ছিল না, কিন্তু শান্তিনিকেতনের দিক থেকে প্রয়োজনীয়।

আশ্রমে তখনই সাহিত্যসভার চলন হয়েছিল—তার নাম ছিল 'বাংলা-সাহিত্য সভা'। মাসে দুবার সে-সভা হত। এ বিষয়ে বিশদ্ আলোচনা অন্যত্রও আছে। শ্যামকান্তের পত্রে আছে:

গত বুধবার বাংলা-সাহিত্য-সভা হয়েছিল; আমি তাতে বরোদা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেছি। সেটি তারপরে শিক্ষকগণ সংশোধন করে দেন এবং আমাদের (হাতে লেখা) মাসিক-পত্রিকা 'প্রভাত'-এ বের হয়।

[The last Wednesday the Bengali Literary Meeting......was held. I had written an essay on Baroda and read it.......It is now corrected by teachers and written in one of our monthly magazines called Prabhat.]

একটি ছিল ইংরেজি-সাহিত্য-সভা, তার অধিবেশন হত সপ্তাহে একবার। [Sahitya-Sabha is held twice a month and the English Literary Club, once in a week. I speak both in the Bengali Sahitya-Sabha and the English Literary Club.]

সাহিত্য-সভা প্রসঙ্গে আসে এখানকার পত্রিকাগুলির কথা। এ সব হাতে-লেখা পত্রিকা থেকে নানা তথ্য ও রচনার সংগ্রহের দ্বারা ইতিমধ্যে পুস্তিকা মুদ্রিত হয়েছে। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী এবং শ্রদ্ধেয় সুধীরঞ্জন দাস মশাই তাঁদের নিজ-নিজ গ্রন্থেও এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। 'রবীন্দ্র-জীবনী'তেও আলোচনা আছে। তখন ছেলেরা হাতে-লেখা পত্রিকার জন্মতিথি পালন করত। শ্যামকান্ত লিখছেন:

—এখানকার ছেলেরা পরশু দিন 'বীথিকা'-পত্রিকার বার্ষিক জন্মতিথি পালন

করল। 'বীথিকা' মানে তরুচ্ছায়াচ্ছাদিত পথ। আশ্রমে এ-রকম পত্রিকা অনেক আছে। সেগুলি ছাপাখানায় ছাপানো হয় না, হাতে লেখা হয়।

[The boys here celebrated an anniversary the day before yesterday. Because that day was the brith-day of a monthly magazine named Bithika............ It means an avenue. There are many such magazines in the Ashram. They are not printed by a printing press but written by hands.]

বহু পত্রিকা ছিল। ছেলেরাই সে-সব পত্রিকার সম্পাদকতা করত এবং এক-এক ঘর থেকে এক-একখানি পত্রিকা বের করা হত।

[শান্তিনিকেতনের অপ্রকাশিত অধ্যায়, সাধনা কর

—আশ্রমে আমাদের বাংলা পত্রিকা আছে। সে-সব ছেলেরা নিজেরাই লেখে এবং প্রত্যেকটির এক কপি থাকে। আশ্রমের ছেলেরা এই পত্রিকার সভ্য। আমি বাগান এবং প্রভাত পত্রিকার সভ্য।

[We have many Bengali magazines too in our Ashram......... প্রভাত, শান্তি, বাগান,শিশু, বীণাপাণি, বীথিকা,........................All these magazines are written by the boys and there is only one copy of each, Many boys of our Ashram are the members of some of these magazines. I am the member of both বাগান and প্রভাত।]

[শ্যামকান্তের পত্রাবলী

এ-সব পত্রিকার বার্ষিক-জন্মতিথির কথা শ্যামকান্ত একাধিক পত্রে লিখেছেন, এ বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ছিল প্রবল।

১৯১৩ সনে নভেম্বর মাসে গুরুদেব ছাত্রসভা স্থাপন করেন। এ ছাত্রসভার উদ্দেশ্য ছিল ছাত্ররাই আশ্রম পরিচালনা করবে। শ্যামকান্তর চিঠি এ বিষয়ে মূল্যবান একটি রেকর্ড রেখেছে :

—পূজাবকাশের পরে আমরা আশ্রমে ফিরে এলাম। একটি গৃহে ছাত্র এবং শিক্ষকগণ সমবেত হলাম, গুরুদেবও ছিলেন। গুরুদেব বললেন—ছাত্রগণ, আজ তোমাদের আমি ছাত্রসভা সম্বন্ধে কিছু বলব। তোমরাই আশ্রমের ছাত্রদের সব কিছু দেখাশুনা করো, সেটাই বাঞ্ছনীয়। নিজেদের সুবিধার জন্য তারা নানারকম নিয়ম তৈরি করবে, তারাই সব পরিচালনা করবে। শিক্ষকগণ তাদেরকে নিয়ম-পালনে বাধ্য করবেন না। শুধু নূতন নিয়মাবলী রচনাকালে তারা তাঁদের স্বীকৃতি

'নেবে, এর জন্যে ছাত্রসভা গঠিত হবে এবং মাসে একবার করে হবে তার অধিবেশন।

[After we came back from the Puja vacation, we were assembled in a house, where Gurudeo and the other teachers were present. Gurudeo sade 'Boys, I am going to speak to you about the ছাত্রসভা. It would be better if the students themselves see everything of the Ashram. They should make any rules they like for their convenience; they should be given the management in their own hands. Teachers shall not make them observe certain rules. Of course, when they make new rules they must ask permission of their teachers. For this purpose a meeting named ছাত্রসভা shall be held at certain times in a month where the students only shall be present.]

গুরুদেব একথা বলে চলে যাবার পরে সে-ছাত্রসভায় সভাপতি নির্বাচিত হল এবং জন-পনেরো ছাত্র নিয়ে একটা কার্যকরী সমিতি গঠিত হল। সেবার ছাত্রসভা-গঠনের পর একটি বিশেষ অধিবেশন হয় ডিসেম্বর মাসে। শিক্ষকগণও তাতে যোগ দেন। নেপাল চন্দ্র রায় হন সভাপতি। এই অধিবেশনটি ছিল দক্ষিণ-আফ্রিকার নিপীড়িত ভারতবাসীদের জন্য। এণ্ডুজ এবং পিয়ার্সন সাহেব এর এক সপ্তাহ আগে দক্ষিণ-আফ্রিকায় চলে গিয়েছিলেন। এণ্ড্রুজের সঙ্গে এ বিষয়ে গোখলের চিঠিপত্র আদান-প্রদান হয়েছিল। এণ্ড্রুজ জানিয়েছিলেন যে আশ্রমের ছেলেরা পরিশ্রম ক'রে অর্থ সঞ্চয় করেছে এবং দক্ষিণ-আফ্রিকায় পাঠিয়েছে—প্রথম কিস্তিতে ত্রিশ টাকা। গোখলে গুরুদেবকে লিখলেন :

—কোটি কোটি লোকের মধ্যে আপনি অদ্বিতীয় এক। আপনি আমাদের দেশের গৌরব। আপনার পক্ষে আপনার জীবন বিপন্ন করা উচিত হবে না। (দক্ষিণ-আফ্রিকায় সাহায্য পাঠানো তখন ইংরেজের বিপক্ষে যাওয়া—গুরুতর অপরাধের সামিল)। এ সব আমাদেরই উপযুক্ত কাজ এবং দক্ষিণ-আফ্রিকার জন্য আমরাই যা করবার করব।

[You are one among a million. You have brought a great glory to our country. So it is not good for you to put

your life in danger. We are fit for it, and we shall work hard for South Africa.] [শ্যামকান্তের পত্র

চিঠিপড়ার পর নেপালচন্দ্র রায় মশায় এ বিষয়ে ছাত্রদের অভিমত জানতে চাইলেন। ছাত্রগণ আফ্রিকার সাহায্য পাঠাবার পক্ষে অভিমত দিল। এবং পরিশ্রম করে সে অর্থ উপার্জন করতে রাজী হল।

১। যদি ছাত্রগণ একরাত্রি খাবার গ্রহণ না করে তবে অন্তত পঁচিশ টাকা বাঁচবে।

২। বড় ছেলেরা না খেলে যদি বিকেলে বাগান করে তবে খেলার চাঁদা দেওয়া যাবে।

৩। ডাক্তারের মতে তেল আর ঘিয়ের উপকারিতা একই। ঘি ব্যবহার না করে রান্নাঘরে তেল ব্যবহার করলে প্রত্যহ দু-টাকা লাভ থাকবে।

৪। সাতই-পৌষের উৎসব নিকটবর্তী। অনেক অতিথি আসবেন। ছেলেরা স্টেশনে গিয়ে তাঁদের জিনিসপত্র আনবে, কুলির পারিশ্রমিক নেবে। ছেলেরাই তাঁদের সব কাজ করে দেবে। ছেলেদের গলায় কাগজে লেখা থাকবে—'দক্ষিণ-আফ্রিকার সাহায্যের জন্য'।

৫। সাতই-পৌষের সময় অনেক ঝি-চাকরের প্রয়োজন হয়, ছেলেরাই সে-সব কাজ ক'রে মাইনে নেবে।

৬। আশ্রমে দু'তিনখানা বাড়ি তৈরি হচ্ছে। ছেলেরা সে বাড়ি তৈরি করবে, অর্থ পাবে।

[Mr. Pearson and Reverend Andrews started for South Africa from our Ashram, about a week ago. Firstly one of our teachers read a letter from Mr. Pearson who was on board the ship for three days. Secondly, Mr. Gokhle's letter to Gurudev was read. Rev. Andrews had written to Mr. Gokhle before somedays informing him that our Santiniketan boys are working hard as labourers and getting wages. These wages shall be sent to South Africa. He also had sent Rs. 30 as the first instalment earned by the boys of Santiniketan. Gokhle wrote to Gurudev. :

'You are one among a million. You have brought a glory to

[illegible] So it is not good for you to put your life in [illegible]. We are fit for it, and we shall work hard for South Africa.

Lastly, Mr. President asked the boys to suggest some ways of getting money, which shall be sent to South Africa. Nearly 7 suggestions were made by the boys. The following are the suggestions :

(1) If the boys do not take their meal for one night nearly Rs. 25 would be saved.

(2) If the older boys do not play and work at gardens in the evening the subscription of the sports will be saved.

(3) In the doctor's opinion the quality of oil is as good as the ghee. If oil is used instead of ghee, nearly Rs. 2 a-day shall be saved.

(4) An উৎসব is made on account of the establishment of this Ashram on 7th Poush.

(5) On the 7th Poush, many servants are required for small works. If the boys work instead of the servants they can get the wages of the servents.

(6) Some two or three houses are to be built. If the boys work as labourers at the house, they can get the wagess of the labourers.

Some did not like to use oil instead of ghee. But oil or ghee is used very little in our food and we can hardly get the small of oil or ghee.

Lastly Nepalbabu the president began to speak.]

নেপালবাবু সেদিন বলেছিলেন যে,—কাউকে জোর করা হবে না। 'দক্ষিণ-আফ্রিকার দেশবাসী যারা ক্রীতদাস হয়ে রয়েছে তাদের ভালোবেসেই আমরা সাহায্য করব। দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয়েরা খেতে পায় না, আর আমরা এখানে ঘি আর নানারকম মিষ্টি খাব? তারা খেতেই পায় না, আর আমরা একটু ঘিয়ের

পরিবর্তে তেল খেতে পারব না? দেশের জন্য একটু ত্যাগ স্বীকার সকলেরই করা উচিত।'

নেপালবাবুর কথায় শেষে সেদিন সকলেই সাগ্রহে উপরোক্ত প্রস্তাবে সম্মত হল। একমাত্র ছোট-ছেলেরা ভিন্ন, বড়ো-ছেলেরা সে-রাত্রে উপোস করে রইল। কুড়ি টাকার মতো সে রাত্রে বেঁচেছিল। বিকেলবেলা অনেক ছেলে বাড়ি-তৈরির কাজ করল। শ্যামকান্ত চিঠিতে এ সবের বিশদ্ বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন:

ছেলেদের নিয়ম ছিল,—তাদের ঘরদুয়ার জিনিসপত্র ও বিছানা সুন্দর করে সাজিয়ে রাখতে হবে। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রত্যেকদিন সে-সব দেখাশুনা করে মন্তব্য লিখতেন এবং 'দৈনিক' নামক এক কাগজে সে সব লিখে দেয়ালে টাঙিয়ে দিতেন। 'দৈনিকে' আশ্রমের প্রতিটি খবর দেওয়া থাকত। এ বিষয়ে শ্যামকান্ত আটাশ-সংখ্যক পত্রে লিখেছেন:

[A teacher, named Dinubabu examines all the rooms every day and gives remarks and publishes them in the Daily Newspaper of our Ashram which is to stuck to a board on a wall. It is called দৈনিক. All the news of the Ashram is published in the aforesaid newspaper. We can ever know the names of the boys who are ill in the hospital.......]

মাসের শেষে গৃহসজ্জায় যে-ঘর প্রথম হত তাদের ক্যাপটেনকে ছাত্রসভাতে মালা দেওয়া হত। বিজয়ী ছেলেদের সেদিন কী আনন্দ!

[In the end of the month the marks of each room are added and the captain of the house which stands first in tidiness and cleanliness, gets a garland in the ছাত্রসভা. O, how then the boys of that room are filled with joy !]

এই মালা পাবার জন্য ছাত্রদের চেষ্টার ত্রুটি থাকত না। 'Each house tries to be the first.'

জানা যায়, গুরুদেব নিজেও অনেক সময় ঘরে-ঘরে গিয়ে দিনচর্চার নানাবিষয়ে নম্বর দিতেন।

এণ্ড্রুজ এবং পিয়ার্সন দক্ষিণ-আফ্রিকা থেকে ফিরে এসে পুরোপুরি আশ্রমে যোগ দেন। তাঁদের আসার পরে আশ্রমে একটি সভা হয়। এণ্ড্রুজ দক্ষিণ-আফ্রিকা

সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। তাঁর কাজের প্রেরণা হিসাবে তিনি আশ্রম থেকে নিয়ে গিয়েছিলেন—শান্তি :

[He also told us how he carried away Shanti from our Ashram to South Africa. The people of South Africa had no idea of India, he said, and most of the Europeans in South Africa kept a copy of Gitanjali with them. They asked Rev. Andrews to lecture on Gurudev and to tell them about life in India and everything of India that made Rabindranath write such poems.]

এণ্ড্রুজের বক্তৃতার শেষে গুরুদেব সকলের কাছে এণ্ড্রুজ এবং পিয়ার্সন সাহেবকে পরিচিত করিয়ে দেন। অর্থদৈন্যের মধ্যেও তাঁরা কোনো-কিছু চিন্তা না করে এই আশ্রমে এসেছেন, আশ্রমদেবতা তাঁদের মঙ্গল করুন,—এই ইচ্ছা তিনি প্রকাশ করেন। ১৯১৪ সনের নভেম্বর মাসে দক্ষিণ-আফ্রিকার ফিনিক্স-স্কুলের ছাত্রগণ গান্ধীজির নেতৃত্বে ভারতবর্ষে এসে প্রথমে শান্তিনিকেতনেই স্থান পেয়েছিলেন। ইংরেজের বিষ-নজরের ভয়ে সেদিন কেউ তাঁদের স্থান দেয়নি। শ্যামকান্তর চিঠিতে আছে :

মিষ্টার গান্ধী ষোলজন ছাত্র এবং দুজন অভিভাবককে তাঁর দক্ষিণ-আফ্রিকার স্কুল থেকে এখানে পাঠিয়েছেন। তাদের মধ্যে প্রায় কেউই এর আগে ভারতবর্ষে আসেনি। কী কালো তাদের গায়ের রঙ। মিষ্টার গান্ধীর তিন ছেলেও তাদের সঙ্গে এসেছেন।

[Mr. Gandhi has sent here sixteen boys and two guardians from his school in South Africa. Most of the boys had not visited India before.···The complexion of most of the boys is black. Mr. Gandhi's three sons have also come with them.]

১৯১৪ সনে পূর্ববাংলায় একবার খুব দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, তার প্রথম কারণ যুদ্ধ। পূর্ববাংলার পাটই প্রধান শস্য। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় সেই পাটের ব্যবসা প্রায় অচল হয়ে গিয়েছিল। পাটের দাম ষোল-সতেরো টাকার থেকে নামে দু-তিন টাকায়। তারই ফলে দুর্ভিক্ষ লাগে। আশ্রমে একদিন এজন্য সভা হল। পিয়ার্সন সে সভায় বক্তৃতা দেন :

কিছুদিন আগে তোমরা দক্ষিণ-আফ্রিকার জন্য অনেক কাজ করেছ এবং অনেক ত্যাগও করেছ। তোমাদের নিজেদের দেশের জনগণের জন্যও আবার

তেমনি ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। পূর্ববাংলায় যারা দুর্ভিক্ষে প্রপীড়িত তাদের সাহায্য করো।

[...You worked hard and secrinced yourself in South Africa some months ago. Now it is time for you again to help your country-men and sacrifice yourself for them, who are distressed by famine and who are starving in Eastern Bengal.]

পিয়ার্সন সাহেবের পরে কালীমোহন ঘোষ মশায় উঠে পূর্ববাংলার কৃষক এবং অন্যান্য অধিবাসীদের অবস্থা সম্বন্ধে বলেন। সে-সভায় পিয়ার্সন তাঁর ঘড়ির সোনার ঢাকনাটি পঁচিশ টাকায় বিক্রি ক'রে সে-টাকা পূর্ববঙ্গের সাহায্যের জন্য দেন এবং প্রতি মাসে সাত টাকা করে সাহায্য পাঠাবার প্রতিশ্রুতি-বদ্ধ হন। শ্যামকান্তর চিঠিতে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এ সব তথ্য দেওয়া আছে।

এ-প্রসঙ্গে শ্যামকান্তর আরেকখানি চিঠি উল্লেখযোগ্য। তখন আশ্রমের ছাত্রগণ ছুটিতে-ছুটিতে শিক্ষকদের সঙ্গে নানা স্থান পরিভ্রমণে বাইরে যেত; শ্যামকান্ত ক্ষিতিমোহনবাবুর সঙ্গে এরূপ একবার পূর্ববঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলেন; সেখান থেকে লেখা চিঠিগুলিতে শুধু আশ্রম-সম্বন্ধে নয়, বাংলাদেশ সম্বন্ধেও তাঁর অনুসন্ধিৎসা কত গভীর ছিল তা জানা যায়। ক্ষিতিমোহনবাবুর জন্মস্থান ঢাকা-সোনারং থেকে শ্যামকান্ত লিখছেন:

আমরা হাফলঙ্ থেকে অক্টোবরে চাঁদপুর হয়ে এখানে এসেছি। পদ্মা পার হয়ে নারায়ণগঞ্জ এসে নৌকোতে সোনারং পৌঁচেছি। এদেশে কেবল খাল আর খাল এবং ঘরে-ঘরেই নৌকা আছে। তবে মাঠে-মাঠে জল নেই, ডাঙায় হাঁটবার রাস্তাও আছে। ঢাকায় এসে মিউজিয়াম দেখলাম। [পত্রসংখ্যা ৪৩

ছাত্র ও শিক্ষকদের সঙ্গে শ্যামকান্ত আসামের হাফলঙ্, ঢাকা, পুরুলিয়া, দার্জিলিং, দ্বারভাঙা, প্রভৃতি ঘুরে দেখেছেন। ছাত্রদের দেশবিদেশে ভ্রমণ করানো বর্তমানে শিক্ষার অঙ্গ বলে পরিগণিত হয়েছে। শান্তিনিকেতনে এ জিনিস রবীন্দ্রনাথ বহুপূর্বেই প্রচলন করেন এবং এখনো বড়দিনের ছুটিতে দেশভ্রমণ এখানকার কার্যতালিকাভুক্ত।

এখানকার পরীক্ষা-পদ্ধতি প্রথম থেকেই অন্য জায়গার পরীক্ষা-পদ্ধতি থেকে আলাদা। কেবলমাত্র বার্ষিক-পরীক্ষার ফলাফলের উপর সেটা নির্ভর করে না, মাসে-মাসে পরীক্ষা নেওয়া হয়, সব পরীক্ষার নম্বর যোগ ক'রে ছাত্রদের উপরের ক্লাসে তোলা হয়। শ্যামকান্ত ছোটভাই শ্রীবান্তবকে লিখছেন:

এখানে বার্ষিক-পরীক্ষায় পাশ করলেই উপরের ক্লাসে তোলা হয় না। মাসিক পরীক্ষা ও বার্ষিক পরীক্ষার ফল মিলিয়ে পাশ করানো হয়।

[Here they do not promote any boy to a higher class if he passed in the annual examination. But they add the mark of all the months and if he passed on the whole, he is promoted.]

তখন খ্যাতনামা ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার মহাশয় পাটনা থেকে মাঝে-মাঝে এখানে আসতেন এবং ম্যাজিক-ল্যাণ্টার্নের সাহায্যে শিক্ষাবিষয়ক নানা জিনিস দেখাতেন।

[Mr. Jadunath Sarkar had come here on the 7th Poush anniversary. He showed us a magic-lantern.]

প্রথমে যেবার 'বসন্তোৎসব' হল, সে-প্রসঙ্গে শ্যামকান্ত লিখছেন :

—মাঘোৎসব নিকটবর্তী, ছেলেরা গান শিখতে আরম্ভ করেছে। কলকাতায় সে গান হবে। ছেলেরা 'বসন্তোৎসব' অভিনয় করবে। এটি গুরুদেবের নূতন নাটক। খুব বেশী-দামের টিকিট বিক্রি হচ্ছে। সে-অর্থ কোনো সৎকাজে ব্যয় করা হবে।

[The Maghotsava is nearing now and the boys are learning songs which will be sung at Calcutta.···The boys are going to act Vasantotsava, a new play by Gurudeo. High rates are kept for the tickets and the money thus get will be utilised for some good purpose.]

আরেকটি পত্রে লিখছেন :

—ছেলেরা মাঘোৎসবে কলকাতা গিয়েছে। সারা কলকাতা ঘুরে তারা মজা উপভোগ করছে। এখানকার ছেলেরা বনভোজন, খাওয়া-দাওয়া এবং খেলা-ধূলায় মত্ত আছে। একমাত্র আমিই কোনো-কিছুতে যোগ দিতে পারছি নে।

[Boys have gone to Calcutta for Maghotsava. Through the whole of calcutta, they are all enjoying. Here also the boys are having feasts, picnics and games and so on. But I cannot join them.]

শ্যামকান্ত মাঝে-মাঝে খুব অসুস্থ হয়ে পড়তেন, শরীর তাঁর মোটেই ভালো ছিল না।

উৎসব-বর্ণনা প্রসঙ্গে সাতই-পৌষের কথাও আছে। একবার এই দীক্ষাদিনে গুরুদেব মারাঠী-সাজে মারাঠী ছেলেদের সঙ্গে ফোটো তুলিয়েছিলেন। ফোটোটি গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট আছে। গুরুদেব, ভীমারাও শাস্ত্রী, শ্যামকান্ত ও দেবল এই চারজনের ফোটো তোলেন রথীন্দ্রনাথ। সাতই-পৌষের উৎসব হত তখন একদিন।

[You know our anniversary was over the day before yesterday. It was for Maharshi Devendranath having taken দীক্ষা in Brahmaism. On that occasion Rathindranath Tagore, Gurudev's son, took a photograph of all the Marathi members of this institution with Gurudev. He was dressed in a silk Dhoti of Nagpur pattern, a Poona turban, Poona slippers and a Poona উপর্ণে. He took these dresses from Bhimarao Shastri who bought them for him during the last vacation.]*

আশ্রম-প্রকৃতি ও পরিবেশ সম্বন্ধেও শ্যামকান্ত এক পত্রে মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়েছেন। তার সঙ্গে আজকের আশ্রমের সব-কিছু আর মিলবে না। নূতনদের কাছে পুরোনো দিনের বর্ণনা কৌতূহল জাগাতে পারে। ছোটভাই শ্রীবাস্তব ও মকরন্দকে এক পত্রে শ্যামকান্ত লিখেছন:

—আমি এবার তোমাদের আশ্রম-পরিবেশ সম্বন্ধে জানাচ্ছি। আশ্রম বহুবিধ তরুলতায় পরিকীর্ণ। উত্তরদিকে ঘনতরুর শ্রেণী। যখন আশ্রমের বাইরে যাই তখন আশ্রমের গাছগুলিই কেবল চোখে পড়ে। উত্তরদিকের মাঠে বালুতে ছোট একটা জলের ফোয়ারা আছে, তার চারপাশে লালমাটি এবং জলের ধারা খুব ক্ষীণ। এই লালমাটির মাঠকে বাংলাতে বলে 'খোয়াই'। ফোয়ারাটি ঘিরে অনেক কেয়া-ঝোপ—ফুলের কী অপূর্ব গন্ধ, ফোয়ারার পাশের বাতাস সে-গন্ধে ভরপুর। আমরা রাশি-রাশি কেয়া তুলে আনি। সেদিক থেকে তাকালে মনে হয় আশ্রমটি সবুজ ঘাসে আচ্ছন্ন। আশে-পাশের জমি থেকে আশ্রমের জমি বেশ উঁচু—চারপাশে মাঠের শেষে দূরে দূরে বন। দক্ষিণ দিকে আছে একটা তাল দীঘি। তার অপর পারে সাঁওতালদের কুঁড়েঘর। সাঁওতালরা কালো, তারা লেখাপড়া জানে না। চারপাশের দৃশ্য বড় মনোরম।

[I am now going to describe the surrounding part of our Ashram. First of all I must tell you that our Ashram is full of many kinds of trees. To the north, there are thick trees. When

we go outside the Ashram, we only see a plane ground having some trees upon it. When we go a few steps to the north of the Ashram we find a small sandy spring having a slow current and red soil. It is called খোয়াই in Bengal. When we trace the spring we find many screw-pine (কেওড়া) about the spring. We often bring many screw-pine flowers. When we stand outside the Ashram we can view a large plane ground covered with grass. Our Ashram is situated on a higher ground than the surroundings. Beyond the pond are the huts of the uneducated black people, called Santals. Ah, what a beautiful scenery it is.]

বর্তমানে আশ্রমের চারপাশে মাঠের সে কেয়া-ঝোপ আর দেখা যায় না। বাড়ি-ঘর, বাঁধ ও রাস্তায় সব ছেয়ে গেছে। সাঁওতাল ছেলেরা যে রাশি-রাশি কেয়া ও পদ্ম বেচতে আসত তারাও আর তেমন আসে না।

গুরুদেব ছাত্রদের সুবিধার জন্য বহুবিধ চেষ্টা করতেন, নানা চিঠিপত্রের থেকে সে কথা জানা যায়। একটি পত্রে শ্যামকান্ত লিখছেন :

—গুরুদেব বর্তমানে ছেলেদের খাদ্য-পরিবেশন করার এক পদ্ধতি প্রচলন করতে চেষ্টা করছেন। একটি কাঠের বারকোষে নানারকম খাবার সাজিয়ে নিয়ে ছেলেদের একবারে পরিবেশন করা হবে। কিন্তু এ পদ্ধতি খুব সফল হচ্ছে না। বারকোষে সাজাতে অনেক সময় লাগে এবং তা অসুবিধাজনক।

[Gurudeo is at present experimenting a new contrivence for serving food to the boys. A small wooden carriage is made to serve this purpose. In this carriage the buckets of various foods are kept and the boys get all the things at the sametime. But this does not prove successful. It takes much time and is very inconvenient.]

শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয় আগে ছিল কলকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে। আশ্রমে পরীক্ষা-কেন্দ্র ছিল না। ছাত্ররা প্রথমে গিয়ে পরীক্ষা দিত সিউড়িতে, তারপরে কলকাতায়; অবশ্য, অনেক পরে একদিন এখানেই পরীক্ষা-কেন্দ্র স্থাপিত হয়। শ্যামকান্ত লিখছেন :

আমি পরীক্ষার জন্য কলকাতা যাব না, এখান থেকে ত্রিশ মাইল দূরে সিউড়ি যাব।

[I am not going to Calcutta for the examination, but to Suri about thirty miles from Bolpur.]

গুরুদেব যতদিন সুস্থ-সমর্থ ছিলেন, নিজে এসে তিনি আশ্রম পরিদর্শন করতেন; অনেকের লেখাতেই এ সংবাদ পাওয়া যায়। শ্যামকান্ত পিতামহকে এক পত্রে জানাচ্ছেন :

—গুরুদেব এখন ভালো আছেন। বর্তমানে আশ্রম-পরিদর্শনে আসছেন না; মাইল দুয়েক দূরে সুরুলে বাস করছেন। সেখানে তাঁর একটি সুন্দর বাড়ি আছে। সেখানেই বিশ্রাম নিচ্ছেন।

[Gurudeo is better now. He does not come to the Ashram now-a-days, but he lives in the forest of Surel (Surul) a mile or two away. There he has a decent house where he rests.]

এণ্ড্রুজকে-লেখা গুরুদেবের (শান্তিনিকেতন ৪ঠা অক্টোবর ১৯১৪) চিঠিতে এ খবরটি সমর্থিত হয়। গুরুদেব লিখছেন :

"আমরা সবাই সুরুল থেকে শান্তিনিকেতনে ফিরে এসেছি। এই জায়গা-বদলটুকুতে আমার উপকার হয়েছে।"

অতীতের কুহেলি ঠেলে প্রাক্তনদের পত্রাদি এমনিতেই যেন কী-এক কুহকে জাগিয়ে কথা কয়ে ওঠে। বিস্মৃত অবহেলিত লুপ্ত হয়ে-ওঠে জাগ্রত জীবন্ত সত্য। শান্তিনিকেতনের ইতিহাসের এরা আভ্যন্তরীন সাক্ষ্য। ছাত্রদের লেখা শান্তিনিকেতনের তথ্যসম্বলিত এ রকম গ্রন্থে-নিবদ্ধ পত্রসংগ্রহের সংখ্যা বিরল।

শান্তিনিকেতনের চিঠি

উৎসব-অনুষ্ঠান

["শান্তিনিকেতন-আশ্রমকে কেবল শিক্ষার ক্ষেত্র মনে করলে খণ্ডিত করে জানা হবে; এটি যেমন শিক্ষায়তন তেমনি মহর্ষির তপস্যা-ক্ষেত্র এবং ঠিক সেইরূপই এখানে রচিত হয়েছে কবির 'আনন্দ-লোক'। শান্তিনিকেতনের উত্তরদিকের প্রধান তোরণের শীর্ষদেশে লৌহফলকে লেখা আছে—'আনন্দরূপম্ অমৃতম্ যদ্বিভাতি।' রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী সৃজনীপ্রতিভার একটি ধারা শান্তিনিকেতন-আশ্রমের কর্মজীবনের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে গড়ে তুলল এই 'আনন্দ-লোক'।]

গুরুদেব চলে গেছেন, কিন্তু রেখে গেছেন তাঁর এই আনন্দলোকের রূপ, ভাষণে তিনি জানিয়ে গেছেন তাঁর আবেদন, গানে-গানে রেখে গেছেন তাঁর সৃষ্টি-উৎসবের প্রত্যাশা।

শান্তিনিকেতন-আশ্রমে আনন্দধারার প্রধান প্রস্রবণ উৎসব-অনুষ্ঠান। দেশের প্রাচীন উৎসব-অনুষ্ঠানের মামুলি ধারাবাহিকতা রবীন্দ্রনাথের ভাবস্রোতে পেল নতুন রূপ, নতুন প্রাণ। আজ দেশের অনেক স্থানেই ঋতু-উৎসবের প্রচলন হচ্ছে। বাইরের লোকের কাছে ঋতু-উৎসব খানিকটা রসসৃষ্টির উদ্দেশ্যরূপে প্রতিভাত হলেও গুরুদেবের কাছে এর মর্যাদা ছিল স্বতন্ত্র। এই ঋতু-উৎসব তাঁর সৃষ্টিকে সমৃদ্ধ করেছে ভাবসম্পদে, প্রসারিত করেছে লেখার অজস্রতায়। এ'কে অবলম্বন করেই তাঁর অগুন্তি গান ও কবিতা রচিত, কত পালাগান-নাটক-অভিনয়ের অভ্যুদয়। শুধু তাই নয়, এই উৎসবের অসংখ্য অভিভাষণে সুযোগ পেয়েছেন তিনি তাঁর মনের কথা খুলে-বলবার। ভাবের অভিব্যক্তিমূলক সুরুচিসম্মত নাচ, ভদ্র মেয়ে-ছেলেদের নাটক-অভিনয়ে যোগদান, এ সবও ঋতু-উৎসবের অভিব্যক্তি-ধারায় প্রবর্তিত। আমাদের দেশের ধর্ম-অনুষ্ঠানগুলি যেমন কোনোক্রমেই বন্ধ থাকা নিষিদ্ধ, আশ্রমে ঋতু-উৎসবও ছিল তেমনি। এর জন্য বাইরে থেকে বাধা এসেছে অনেক, নানা রকম কথা পৌঁচেছে কানে, তবু তিনি তা বন্ধ করতে নারাজ ছিলেন। 'বসন্ত-উৎসব' নামক ভাষণে তিনি বলেছেন :

'বৎসরে-বৎসরে আশ্রমের এই আম্রকুঞ্জে দোল-উৎসবের দিনে আমাদের নৃত্যে কাব্যে ছন্দে সুন্দরের অভ্যর্থনা করে থাকি। বসন্তের দক্ষিণ-সমীরণে যে দৈববাণী ঊর্ধ্বলোক থেকে নেমে এসেছে এই ধরণীর ধুলায়, তাকে অন্তরের মধ্যে প্রতিধ্বনিত করে নেবার জন্যে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন।'

আশ্রম-জীবনের আদিপর্বে জ্ঞানালোচনার আবহাওয়া ছিল একান্ত প্রবল। অনুষ্ঠান ক'রে ঋতু-উৎসবের রেওয়াজ সে-সময় এখানে প্রবর্তিত হয়নি। আনন্দ-উৎসবের উপলক্ষ্য ছিল গুরুদেবের নিত্যনূতন গান। তাঁর 'সকল গানের ভাণ্ডারী, সকল নাটের কাণ্ডারী' আচার্য দিনেন্দ্রনাথ রাখতেন আসর জমিয়ে। বিনোদন-পর্বে প্রতি সন্ধ্যায় গুরুদেব ছাত্র ও অধ্যাপকদের নিয়ে গানে, গল্পে, পাঠে ও হেঁয়ালি-নাট্যাভিনয়ে থাকতেন মশগুল।

গুরুদেবের অন্তরে পৌরাণিক ঋতু-উৎসবের প্রতি আকর্ষণ ছিল। শান্তি-নিকেতনের বিনোদন-পর্বের মনোরম কারুকলা দেখে তা নতুন করে জেগে উঠল। সে-কথা তিনি একদিন ক্ষিতিমোহনবাবুকে বললেন। ক্ষিতিমোহনবাবু কাশীর ও অন্যান্য তীর্থের দেবমন্দিরে উৎসব-আড়ম্বর দেখে এসেছিলেন। এর পরে এখানেও তার আয়োজন করতে উন্মুখ হলেন। সেই বছরই বর্ষাকালে কার্যগতিকে গুরুদেব আশ্রমে কিছুদিন অনুপস্থিত ছিলেন। প্রকৃতিতে দেখা দিল বর্ষার ঘনঘটা, উন্মুক্ত প্রান্তরে তার উদ্দাম নৃত্য উন্মত্ত করে তুলল শাল-তাল-ঝাউ-দেওদারের শাখা-প্রশাখা। গুরুদেবের কথা স্মরণ করে ক্ষিতিমোহনবাবু আরম্ভ করলেন বর্ষা-উৎসব। ছেলেদের আনন্দ-কোলাহলে, দিনুবাবুর প্লাবন-ডাকানো গানে, ফুলে-পল্লবে ধূপধুনায়, সংস্কৃত শ্লোকে আর দিনুবাবু ও অজিত চক্রবর্তীর ইংরেজি বাঙলা আবৃত্তিতে অনুষ্ঠান জমে উঠল। ছেলেরা পরেছিল গাঢ় নীল রঙের ধুতির সঙ্গে উত্তরীয়ের পীতরেখা-টানা পরিচ্ছদ, মাথায় দিয়েছিল কেয়াপাতার মুকুট। আমবাগানে মাটির উঁচু ঢিবি তৈরি করে তার চারিদিক তাল ও কেয়াপাতায় ঘিরে উৎসব-স্থান রচিত হয়েছিল। দিনুবাবু গুরুদেবের-দেওয়া সুরে 'এ ভরা বাদর মাহ ভাদর' গানটি গাইলেন। বেদের পর্জন্য-প্রশস্তিও সেবার তাঁরই কণ্ঠে পেল সুর। আচার্য বিধুশেখর শাস্ত্রীও ভালো ভালো সংস্কৃত শ্লোক সংগ্রহ করে দিলেন। উৎসবের সাফল্য সবাইকে অভিভূত করল। গুরুদেব আশ্রমে এসে পৌঁছবার আগেই দিনুবাবুর পত্র-মারফত সে কথা তাঁর গোচরে গেল। উৎসবের অতিরিক্ত প্রশংসা কবির প্রাণে ঔৎসুক্য জাগাল। কিন্তু বর্ষার তখন বিদায় নেবার পালা, শরতের রঙ লেগেছে বনে বনে। শিশিরে শিশিরে তার আভাস। এমন দিনে বর্ষা-উৎসব জমবে কিনা গুরুদেবের সে দ্বিধা ছিল। তিনি বললেন, 'বর্ষা-উৎসব দেখবার ইচ্ছে এবার আমার অপূর্ণ থাক, আমি তোমাদের শরতের গান বেঁধে দেব, তেমনিভাবে তোমরা শারদলক্ষ্মীকে আহ্বান করো'।

দিনুবাবুর পত্র পাবার পরে, আশ্রমে ফিরে আসবার পূর্বেই তিনি শরতের

দু-একটা গান তৈরি করে ফেলেছিলেন। এখানে এসে বাকি গানগুলি রচনা করলেন। সেই গানগুলি দিয়েই সেবার আশ্রমে শারদোৎসব হবার কথা। এ সম্বন্ধে ১৩৩৩ সালের শান্তিনিকেতন-পত্রিকার 'জন্মোৎসব'-সংখ্যায় প্রকাশিত স্বর্গীয় অধ্যাপক জগদানন্দ রায়ের 'স্মৃতি' নামক প্রবন্ধে আছে:

'ইহার অনেকদিন পরের ঘটনার কথা মনে পড়িল। তখন গুরুদেব ছেলেদের সঙ্গে লাইব্রেরির উপরকার দোতলায় খড়ের ঘরে থাকিতেন। সেই ঘরের ছেলেরা বড়ো উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল। তাই তাঁহাকে কিছুকাল সেখানে থাকিতে হইয়াছিল। হয়তো ছেলেদের মনোরঞ্জন করিয়া সংযত রাখিবার জন্য ঐ ঘরে বসিয়া তিনি একখানি নাটক লেখা আরম্ভ করিয়া দিলেন। দিনে-দিনে নতুন নতুন সুরে গান রচনা হইতে লাগিল। সন্ধ্যার পর সেখানে বসিয়াই ছেলেদের সেই সব গান শিখাইতে লাগিলেন। আনন্দের আর সীমা রহিল না। আশ্রমে যে একটা থমথমে ভাব ছিল, তাহা কাটিয়া গেল। ইহাই সেই সুপ্রসিদ্ধ 'শারদোৎসব' নাটক। এই নাটকখানি যেদিন আশ্রমবাসী সকলকে ডাকিয়া আগাগোড়া শুনানো হয় তাহাও মনে পড়ে, তখন সবে নাট্যঘরের মাঝের অংশটা নির্মিত হইয়াছে। গুরুদেব সেই ঘরে সভা করিয়া একদিন 'শারদোৎসব' পড়িয়া শুনাইলেন। ইহার পরেও লক্ষ্য করিয়াছি, কোনো কারণে যখন আশ্রমে কোনো ক্ষোভ দেখা দিয়াছে, তখন অভিনয়াদির আয়োজনে সবই পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। আমাদের আশ্রমে এখন যে ঋতু-উৎসবের অনুষ্ঠান হয়, তাহার সার্থকতাও কম নয়।'

আশ্রমে 'শারদোৎসব' প্রথম ১৯০৮ সালে অভিনীত হয়। তখন আশ্রমের সমস্ত উৎসবই দেশীয় প্রাচীন রূপটি পরিগ্রহ করছে। সবার মনে জেগে উঠল প্রাচীনকালের অনুষ্ঠানের পূর্বে গঠিত নান্দীর কথা। বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় একটি সংস্কৃত নান্দী রচনা করতে অনুরুদ্ধ হলেন। তিনি তা রচনা করবেন, এমন সময়ে আশ্রমে সমাগত সাহিত্যিক চারু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রস্তাব করলেন, নান্দী কবিতা হওয়া চাই গুরুদেবের রচনা; এবং বাংলা নাটকের নান্দী রচিত হবে বাংলাতেই। প্রথমে গুরুদেব নারাজ হলেন, কিন্তু রেহাই পেলেন না। কিছুক্ষণ পরেই ডেকে বললেন—'নাও, হয়ে গেছে তোমাদের নান্দী'। দেখা গেল, অচির-পূর্ব-রচিত একটি গানকে সেদিনই পাকাপাকিভাবে সুর দিয়ে তিনি করে দিয়েছেন উদ্বোধন সংগীত; গানটি হচ্ছে 'তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে, এসো গন্ধে বরনে গানে।' গান পাওয়া গেল, দাবি উঠল,—'গান তো হল, কবিতাও যে চাই।'

দাবি কি অপূর্ণ থাকে। স্বল্পক্ষণের মধ্যেই রচিত হয়ে এল একটি কবিতাও—তার প্রথম পঙ্‌ক্তিটি হচ্ছে—'শরতে হেমন্তে শীতে বসন্তে নিদাঘে বরষায়।' সব ব্যাপারটা হল অভিনয়ের দিনই।

সেবার 'শারদোৎসব' নাটক খুব জমেছিল। যজুর্বেদে শরৎ-ঋতুর সুন্দর একটা বর্ণনা আছে। 'শারদোৎসবে' এই শ্লোক-কয়টি সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন বিধুশেখর শাস্ত্রীমহাশয়। আশ্রমের দিক থেকে প্রত্যেক ঋতুতে প্রকৃতির সাদর অভ্যর্থনার সেই হল সূচনা।

এই উৎসবে যেভাবে মন্ত্রপাঠ ও অনুষ্ঠানাদি হয় তাতে আপত্তি উঠল দু-দিক থেকে। প্রাচীনপন্থী যাঁরা, তাঁরা বাধা দিলেন এই বলে যে, এইভাবে প্রাচীন দেবযোগ্য বস্তুকে নবীনভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে মানুষের ব্যবহারে; আর নবীন-পন্থীর দল শঙ্কিত হলেন এতে মানুষ-পূজার সম্ভাবনায়। রক্ষণশীল ব্রাহ্ম হিন্দু সবাই বিতর্ক তুললেন। তারপরে ১৯১৫ সালে মহাত্মা গান্ধি সস্ত্রীক শান্তিনিকেতনে আসেন। তখনও ঠিক এই রীতিতেই বিরাট আকারে তাঁদের অভ্যর্থনার আয়োজন হয়। এবারও উৎসাহী উদ্যোক্তাগণ গুরুদেবের ভরসায় সব প্রতিকূল মন্তব্য এড়িয়ে কাজ এগিয়ে নিয়ে চললেন। ২১টি তোরণ রচিত হল। বীথিকার সামনে আম্রকুঞ্জের কাছে ছিল সভাস্থল। বর্তমান পূর্বদিকের প্রধান গেট থেকে সভাস্থল পর্যন্ত ২১টি তোরণ সাজানো হয়েছিল। এক-একটি তোরণের দুই দিকের দুই স্তম্ভমূলে স্থাপিত হয়েছিল—১। মহী ২। গন্ধদ্রব্য ৩। শিলা ৪। ধান্য ৫। দূর্বা ৬। পুষ্প ৭। ফল ৮। দধি ৯। ঘৃত ১০। স্বস্তিক ১১। সিন্দুর ১২। শঙ্খ ১৩। কজ্জল ১৪। গোরোচনা ১৫। শ্বেতসর্ষপ ১৬। কাঞ্চন ১৭। রৌপ্য, ১৮। তাম্র ১৯। চামর ২০। দর্পণ ২১। দীপ—মোট এই ২১টি বস্তু। মূল অভ্যর্থনা বেদিও ছিল ২১টি মাঙ্গল্য-দ্রব্যে পরিপূর্ণ। তাকে আরো শোভন করে তুলেছিল অর্ঘ্যপত্র, পুষ্পপাত্র, ধূপ, দীপ, পঞ্চব্রীহি, মধুপর্ক ইত্যাদিতে। নানাস্থান থেকে আগত দর্শকদের অনুকূল এবং প্রতিকূল আলোচনার মধ্যেও সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করল এইভাবে উৎসব-করাটা। ক্রমে আশ্রমে অনুষ্ঠিত গুরুদেবের জন্মোৎসব এবং সংবর্ধনার রীতিতেই গুরুদেবকে অভ্যর্থনা করা কলকাতায়ও শুরু হল।

সাজসজ্জা: এই উৎসবগুলির সাজসজ্জা ব্যক্তি-বিশেষের খেয়াল-খুশির থেকে উদ্‌গত নয়। হাজার-হাজার বছর আগে ভারতের বিদগ্ধজনচিত্ত, ভারতের রূপ-রসিক শিল্পীমন জনসমাগমের মিলনক্ষেত্রে শুধু মুখের কথায় মনের ভাব প্রকাশ করাটাকে

ভব্যতার অঙ্গহানিকর বলেই মনে করত। তাই উৎসবে, উদ্বোধনে, বিজয়যাত্রায়, অভ্যর্থনায় সর্বক্ষেত্রেই নানা আনুষ্ঠানিক বিচিত্র সজ্জা-প্রকরণ, যন্ত্র, মুদ্রা এবং পল্লীগ্রামের আলপনাদির প্রচলন দেখা দেয়। এ ছিল একটা ভাষার প্রকাশ, আর্য ভারত সে ভাষাতেই কথা বলে এসেছে। শুভ ইচ্ছা জ্ঞাপনের এ সব হচ্ছে সাংকেতিক রূপ। যেমন, অভ্যর্থনার উৎসবে আঁকা হত বটপত্রের আলপনা। বক্ষস্থলের আকারের অভিব্যক্ত বটপত্র। সেই 'যন্ত্র'টির (চিত্রটির) অঙ্কন দ্বারাই কৌশলে জানিয়ে দেওয়া হত, 'হে ভদ্র, সমস্ত হৃদয় পেতে তোমাকে আমার অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করছি।' সহৃদয়তার এই অভিব্যক্ত মুখের ভাষায় প্রকাশ করার চেয়ে শিল্পের আবেদনে গাঢ়তর উপলব্ধির বস্তু হল। আরেকটি অনুষ্ঠান, ধরা'যাক, শুভাশীর্বাদ দ্বারা বরণ। সে ক্ষেত্রে আঁকা হত একটি ত্রিভুজের উপর আর একটি ত্রিভুজ। কিম্বা কুণ্ডলায়িত একটি সর্পমূর্তি। একদিন সমাজের আচার-অনুষ্ঠানের সৌকর্যের প্রতি এমনি সজাগ ছিল ভারতের শিল্পীমন। কিন্তু দিনের পরিবর্তনে ভারতের সে চিত্তপ্রকর্ষ লুপ্তপ্রায়। তার কিছু-কিছু চিহ্ন পড়ে ছিল পল্লীগ্রামের আলপনায়, পূজা-অর্চনার ক্ষেত্র-সজ্জায়, মন্দিরের বিগ্রহ-প্রসাধনে বা স্বল্পজনবিদিত তন্ত্রশাস্ত্রের নিগূঢ়মুদ্রায়, যন্ত্রে ও স্থণ্ডিল-বিধানে। তন্ত্র-অনুশীলনে, এ সবের মর্মার্থ জেনে ক্ষিতিমোহনবাবু বিস্মিত হলেন। তিনি সেই মুদ্রা, যন্ত্র, স্থণ্ডিলাদি উদ্ধার করে প্রয়োগ করলেন আশ্রমের উৎসব-সজ্জার ব্যাপারে। ভালো লাগল তা গুরুদেবেরও। তিনি পরম সমাদরে সেই প্রাচীন লুপ্তরত্নের উদ্ধার-প্রচেষ্টাকে আরো ভালোমতো প্রকাশের পথ করে দিলেন। এই আলপনা বা তান্ত্রিক মুদ্রাদি গতানুগতিক মতে গা ঢাকা দিয়ে চলছিল। হয়তো তারা সেখানে সেভাবেই চলত আত্মবিলোপের দিকে, চোখে পড়ত না কারো। কিন্তু গুরুদেব তাঁর গানে, অভিনয়ে, নৃত্যে ও ভাষণে সেগুলিকে বিশ্বভারতীর পটভূমিতে লোকচক্ষুর সম্মুখে এনে দাঁড় করালেন। তখন থেকেই হল এর পুনরুজ্জীবন। ক্রমে দিনে-দিনে এসব স্বীকৃত হল শিক্ষিতসমাজের উৎসব-অনুষ্ঠানে। বংশগত ধারায় গুরুদেব ছিলেন বিশিষ্ট হিন্দু-অভিজাত-পরিবারের রুচি ও সংস্কৃতিবাহী; সেদিক থেকে এই প্রাচীন ভারতীয় সজ্জা ও আচার-প্রক্রিয়ার সৌন্দর্যের আবেদন তাঁকে আনন্দ দিয়েছিল। অন্যদিকে মহর্ষি-প্রবর্তিত উদার সাধনার সংস্পর্শের ফলে তিনি যে-কোনো মহৎভাব ও শিল্প-সমৃদ্ধ জাতীয় সংস্কারকে সহজেই অন্তর খুলে বরণ করতে পেরেছিলেন। শুনেছি, তাঁর বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথও ছিলেন এ সবের প্রবল অনুরাগী। তাঁদের পরিবারগত উদার স্বীকৃতিই

সেদিন বাধাবিঘ্ন পেরিয়ে আধুনিক এই উৎসব-অনুষ্ঠানগুলির পুনঃ-প্রচলন সম্ভব করেছে।

নৃত্য : শুধু পরিকল্পনা, পরামর্শ বা মৌখিক উৎসাহ দিয়ে নয়,—একেবারে হাতে-কলমে, মানে, নৃত্য-করার ব্যাপারে গুরুদেবই হচ্ছেন অগ্রগামী। তাঁর ভিতরে পরিণত-বয়সেও নৃত্যের প্রবর্তনা উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। তাঁর গোড়ার দিকের নাটকগুলির অভিনয়কালে তিনি বাউল বা ঠাকুরদা প্রভৃতির ভূমিকায় গানের সঙ্গে সাধারণ-রঙ্গমঞ্চে নিজে নেচেছেন এবং সাধ্যমতো নাচিয়ে ছেড়েছেন তাঁর অভিনয়-সহচরদেরও। প্রথম-দিককার 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের অভিনয়ে জনসাধারণের দৃশ্যে 'মাধবপুরের দলের নৃত্য' পুরোনো আশ্রমিকদের কাছে রসালাপের এক মধুর প্রসঙ্গ হয়েছিল। তা ছাড়া 'ফাল্গুনী' অভিনয়ে একতারা-হাতে অন্ধ-বাউলের বিখ্যাত ছবিতে তাঁর সেদিনের মনোহর নৃত্যভঙ্গিমা উজ্জ্বল হয়ে আছে।

আগে নৃত্যকে লোকে হেয় স্তরে দেখত। গুরুদেব দেখলেন, সেখান থেকে এ'কে তার নিজস্ব স্থানে পৌঁছে দিতে হলে বিশেষ করে ভারতভূমিতে চাই এর অধ্যাত্ম গরিমার বিকাশ।

নৃত্যের প্রবর্তনাক্ষেত্রে কবির জাভা ও বলীদ্বীপ-ভ্রমণও অনেকদিক দিয়ে কাজে এসেছে। সে দেশের নৃত্যের রূপ ও রস, তার বাদ্যযন্ত্রাদি, রঙ্গমঞ্চসজ্জা, রূপ-প্রসাধন ইত্যাদি গভীরভাবে কবি-শিল্পীর রসবোধ এবং সৃষ্টিপ্রেরণাকে উদ্বোধিত করেছে।

সংগীত : এ ক্ষেত্রে গুরুদেবই স্বয়ম্ভূ, যেমন কথা ও সুরের সৃষ্টিতে, তেমনি প্রয়োজনার কাজে। গান নেই অথচ উৎসব, এ যেন রবি-নেই-প্রভাতের মতোই অসম্ভব ব্যাপার।

নাট্যশিল্পের চর্চা, তার অভিব্যঞ্জনার নূতন ধারা প্রবর্তন ও মান-উন্নয়ন রবীন্দ্রনাথের একটি বিশেষ কীর্তি।

আশ্রমের প্রাচীন অধ্যাপক হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, সেই সুদূর অতীতে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে তিনি গুরুদেবের 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র অভিনয় দেখেছিলেন। সেইটি ছিল বোধ হয়, গুরুদেবের দ্বিতীয় বারের অভিনয়। 'শ্যামা, এবার ছেড়ে চলেছি মা'—এই বিখ্যাত গানটি গাইতে গাইতে বাল্মীকির বেশে যখন তিনি রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, তখনকার সে দৃশ্য অবর্ণনীয়। লোকের চক্ষে অশ্রুবন্যা বয়ে যেত। ঘন ঘন উচ্চরবের অনুরোধে আবার তাঁকে ফিরে আসতে হত পাদপ্রদীপের সামনে। তাঁর বাল্মীকি, জয়সিংহ, ঠাকুরদা, রাজা, বিক্রম, নটীর পূজার 'ভিক্ষু উপালী'—এ সব ভূমিকা তিনি যেমন লিখেছিলেন, তার রূপও তিনি দিয়ে গেছেন

তেমনি জীবন্ত ক'রে। রবীন্দ্রসাহিত্যের মর্মোদ্‌ঘাটন যেমন রবীন্দ্রনাথ অনেকক্ষেত্রে নিজেই করে দিয়ে গেছেন তাঁর নানা লেখায়, ভাষণে ও ব্যাখ্যায়—তেমনি রবীন্দ্র-নাটকের অপূর্ব নায়ক-চরিত্রগুলিকে রূপায়িত করবার কলা-কৌশলের আদর্শও তিনি রেখে গেছেন তাঁর নিজস্ব অভিনয়-নৈপুণ্যের ধারায়।

উৎসব : শান্তিনিকতনের প্রধান উৎসব হল ঋতু-উৎসব। সেই ঋতু-উৎসবের মধ্যে অগ্রগণ্য হচ্ছে 'বর্ষামঙ্গল', 'শারদোৎসব' ও 'বসন্ত-উৎসব', ; বর্ষামঙ্গলের সঙ্গে গুরুদেবের হালের দিনের সংযোজনা 'বৃক্ষরোপণ' (১৯২৮, ১৪ই জুলাই) ও 'হলকর্ষণ' (১৯২৮, ১৫ই জুলাই) অনুষ্ঠান। কী ভাবের দ্বারা প্রবুদ্ধ হয়ে তিনি এই উৎসব প্রচলন করেন, ১৯৩৯ সালের হলকর্ষণে পঠিত তাঁরই অভিভাষণ থেকে সেই সম্বন্ধে খানিকটা উদ্ধৃত করা গেল :

'পৃথিবীর দান গ্রহণ করবার সময় লোভ বেড়ে উঠল মানুষের। অরণ্যের হাত থেকে কৃষিক্ষেত্রকে সে জয় করে নিলে, অবশেষে কৃষিক্ষেত্রের একাধিপত্য অরণ্যকে হটিয়ে দিতে লাগল। নানা প্রয়োজনে গাছ কেটে কেটে পৃথিবীর ছায়াবস্ত্র হরণ করে তাকে দিতে লাগল নগ্ন করে। তাতে তার বাতাসকে করতে লাগল উতপ্ত, মাটির উর্বরতার ভাণ্ডার দিতে লাগল নিঃস্ব করে। অরণ্যের আশ্রয়হারা আর্যাবর্ত আজ তাই খর সূর্যতাপে দুঃসহ। এই কথা মনে রেখে কিছুদিন পূর্বে আমরা যে অনুষ্ঠান করেছিলুম সে হচ্ছে বৃক্ষরোপণ, অপব্যয়ী সন্তান কর্তৃক মাতৃ-ভাণ্ডার পূরণ করবার কল্যাণ-উৎসব। আজকের অনুষ্ঠান পৃথিবীর হিসাব-নিকাশের উপলক্ষে নয়। মানুষের সঙ্গে মানুষের মেলবার, পৃথিবীর অন্নসত্রে একত্র হবার যে বিদ্যা, মানব-সভ্যতার মূলমন্ত্র যার মধ্যে, সেই কৃষিবিদ্যার প্রথম উদ্বোধনে আনন্দ-স্মৃতিরূপে গ্রহণ করবে এই অনুষ্ঠানকে।'

শান্তিনিকেতন আশ্রমের অনেক বৃক্ষশিশু গুরুদেবের স্বহস্তে রোপিত। নাচে-গানে আনন্দে-উৎসবে তাদের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়েছে। ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, মরুৎ, ব্যোমের দ্বারা পৃথিবীতে বৃক্ষের অস্তিত্ব; সেই পঞ্চভূতকে আহ্বান করে তাদের স্নেহ-ধারায় বৃক্ষকে প্রাণবান করে তোলবার আয়োজন করা হয়। দুবার এখানকারই পাঁচজন আশ্রমিককে পঞ্চভূত সাজানো হয়েছিল। সে অনেক বৎসর আগেকার কথা (৫ই শ্রাবণ, ১৩৩৫)।

'বৃক্ষ-রোপণ' বর্ষামঙ্গলের আংশিক অনুষ্ঠান। আশ্রমের প্রাঙ্গণ-সীমার ভিতরে তরুশিশুকে স্থান দেওয়াই প্রচলিত পদ্ধতি। কোনো কোনো সময় তার ব্যতিক্রমও ঘটে। বাঁধের জল উৎসর্গ করা সে বিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

'হলকর্ষণ' শ্রীনিকেতন-উৎসবের অন্তর্গত, বর্ষামঙ্গলের আগে কিংবা পরে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে নাম দেওয়া হয়েছিল 'সীতা-যজ্ঞ', ১৩৩৬ সনের ২৫শে শ্রাবণ তারিখে এর প্রথম উদ্বোধন। 'সীতা' হালের রেখার এক নাম, তার উৎসবই যজ্ঞ নামে অভিহিত। বর্তমানে 'হলকর্ষণ' নামেই এর প্রসিদ্ধি। একজোড়া হালের বলদকে সাজিয়ে তাদের সামনে আহার্যরূপে কলাপাতায় গুড় যব প্রভৃতি দেওয়া হয়। পরে লাঙল যোজনা করে কিছুক্ষণ চলে ভূমি-কর্ষণ, সঙ্গে সঙ্গে প্রাঙ্গণতল গানে-মন্ত্রে মুখর হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ গরু ও লাঙল নিয়ে স্বহস্তে একবার হলকর্ষণ-উৎসবের উদ্বোধন করেছিলেন।

'শারদোৎসব' আশ্রমের ঠিক তেমন একটি আনুষ্ঠানিক উৎসব নয়। কিন্তু শরৎকালেই বাঙালির মহোৎসব; আগমনীর সুরে বাঙলার ঘরে ঘরে আনন্দ জাগিয়ে তোলে। ছুটির রসে ভরপুর উৎসব-মুখরিত রঙিন দিনগুলো ছেলেমেয়েদের মনকে মাতিয়ে দেয়। বাঙালির মানসলোকে শরৎকালের সঙ্গে উৎসবের আনন্দোজ্জ্বল স্মৃতি অচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত। বাঙলা দেশে এবং বিশেষভাবে শান্তিনিকেতনে প্রকৃতির দিগদিগন্তে শারদশ্রীও ফুটে ওঠে ঝলমল হাস্যে। ছুটির বাঁশি বেজে ওঠে কিশোর-চিত্তে আর কবির মনে। সেই আনন্দের বন্দনা-গান উৎসারিত হল 'শারদোৎসব' নাটক-রচনায়। আশ্রম-বালকদের সঙ্গে মিশে কতবার রবীন্দ্রনাথ এ নাটকের অভিনয় করেছেন। ক্রমে পুজোর ছুটির আগে একটা-কিছু অভিনয় করা প্রায় নিয়মের মতো দাঁড়িয়ে গেল। তার সঙ্গে যোগ হল 'আনন্দবাজার'-মেলা। বহুকাল পর্যন্ত গ্রীষ্মাবকাশেরই আগে বসত এই মেলা। একবার কী কারণে সেই রীতির পরিবর্তন হয়ে 'আনন্দবাজার' বসল পুজোর ছুটির আগে। শরৎকালের সুরের সঙ্গে আনন্দোৎসবটি খুঁজে পেল আপন সুরের স্বাভাবিক ঐক্য, তারপর থেকেই কায়েম হল এই নতুন নিয়ম।

আশ্রমের শালবীথিকায় 'আনন্দবাজারে'র মেলা বসে সায়াহ্নে। সকাল থেকেই ছাত্র-ছাত্রীরা যার-যার দোকান পসরা সাজিয়ে-গুছিয়ে তুলতে ব্যস্ত হয়। বিচিত্র তার আয়োজন—মিঠাইমণ্ডা, চা-শরবত, ম্যাজিক, সার্কাস, চানাচুরওয়ালা, ভাগ্যগণনা-কার্যালয়, প্রত্নতত্ত্বাগার—কোনো-কিছুরই অভাবে থাকে না। যাত্রা, কীর্তন, কবিগানও বাদ পড়ে না। শখের মেলা আনন্দবাজার, জিনিসপত্রের দাম একটু শৌখিন রকমের থাকবে, তার আর আশ্চর্য কী। যার দোকানে যত বেশি লাভ তারই তত কৃতিত্ব। মেলা শেষে সব দোকানের লভ্যাংশ সংগৃহীত হয়ে আশ্রমের দরিদ্র-ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়। তারপর সম্মিলিত নির্মল

আনন্দের স্মৃতি মনে নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা পূজাবকাশে চলে যায় বাপমায়ের কাছে।

সাধারণতঃ দোলপূর্ণিমা-তিথিতেই আশ্রমের 'বসন্ত-উৎসব' অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। গুরুদেব দোল ও হোলিকে সমস্ত প্রাদেশিকতা এবং প্রাকৃতজনগত অসংযম থেকে মুক্ত করে সুন্দর ও সুরুচিপূর্ণ 'বসন্তোৎসবে' রূপান্তরিত করেছেন। বসন্তের দিনে আশ্রমবাসীদের বসনে-ভূষণে লাগে বাসন্তী রঙ। গুরুদেব বর্তমান থাকতে আমবাগানে গিয়ে সবাই জড়ো হত। সেখানে ছাত্রীগণ গুরুদেবের চারপাশে পুষ্পপাত্রের অর্ঘ্য এনে সাজিয়ে রাখত। গানে-গানে হত বসন্তের উদ্বোধন; কবি-কণ্ঠের কবিতা-পাঠে এবং সংস্কৃত শ্লোকের আবৃত্তিতে উৎসবটি বাস্তবে রূপ পেত। একবার গুরুদেব ঠিক করলেন, বসন্তের সংবর্ধন করা যাক সবার স্বরচিত অর্ঘ্য-নিবেদনে। গাছে গাছে ফুলে ফুলে পাতায় পাতায় যখন আপনাকে বিলিয়ে দেবার আয়োজন, সে-সময় মানুষের দিক থেকেও যে যত দিতে পারে ততই বেশি আনন্দ। কলাভবনের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকগণ নতুনভাবে আমবাগান সজ্জিত করলেন, আঁকলেন বিচিত্র আলপনা। যাঁরা কবিতা লিখতেন, তাঁরা সকলেই রচনার ডালি এনে দিলেন। গুরুদেবও নতুন কবিতা, নতুন গান লিখে আনলেন এবং নিজের কবিতাপাঠের সঙ্গে নাম করে-করে পড়লেন অন্য-সবাকার লেখা। 'মহুয়া' ও 'বনবাণী'র অনেক কবিতা সেই উৎসবের সময়ে রচিত ও পঠিত হয়।

শান্তিনেকেতন ও শ্রীনিকেতনের বার্ষিক দুই উৎসবের পরে বড়ো উৎসব আর নেই বললেই চলে। 'নববর্ষ', 'বর্ষশেষ' ও 'নবান্ন', ছোটো হলেও তাদের চিত্ত-বিনোদনকারিতা অপূর্ব। প্রতিবছরেই আশ্রমের রান্নাঘরে অগ্রহায়ণ মাসে 'নবান্নে'র পিঠে-পায়েস তৈরি হয়, আশ্রমের মেয়েরাই সে-কাজে উৎসাহে যোগদান করেন।

আশ্রমের আর-একটি স্মরণীয় উৎসব 'পঁচিশে বৈশাখ', বর্তমানে বাঙলার সর্বত্রই তা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তখন আশ্রম গ্রীষ্মাবকাশের জন্য বন্ধ থাকে; তাই গুরুদেবের জন্মোৎসব ১লা বৈশাখ নববর্ষ-দিনে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

আশ্রমের প্রধান-প্রধান এইসব নিয়মিত উৎসবগুলি ছাড়াও আরো-অনেক অনুষ্ঠান আছে, সেগুলি ঠিক উৎসবের পর্যায়ে পড়ে না, কিন্তু তাতেও সুর মেশানো থাকে উৎসবের।

আশ্রমের 'গান্ধি-দিবস' একটি আনন্দপূর্ণ স্মরণীয় দিন। ১৩২১ সালে গান্ধিজী

শান্তিনিকেতনে এসে কিছুদিন বাস করেছিলেন। তখন তিনি আশ্রমের প্রত্যেক বিভাগে এবং কার্যক্ষেত্রে আশ্রমিকদের সম্পূর্ণভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার আদর্শে অনুপ্রাণিত করেন। আশ্রমের প্রতিদিনকার জীবনযাত্রায় তাঁর মহান আদর্শকে কার্যকর করে তোলা সম্ভবপর হয়নি, কিন্তু তার অন্তর্নিহিত প্রেরণাটিকে গুরুদেব শ্রদ্ধা করতেন। তাই প্রতি বৎসর ১০ই মার্চ তারিখে 'গান্ধি-দিবস' প্রতিপালিত হয়। আশ্রমে সেদিন সকালে চলে অনধ্যায়; লেখাপড়া বন্ধ থাকে; ছাত্রছাত্রী, অধ্যাপক ও কর্মীবৃন্দ জীবনযাত্রানির্বাহের ছোটোবড়ো সব কাজেই সেদিন পরিপূর্ণভাবে আত্মনির্ভরশীল ও স্বাবলম্বী হন। সমাজ-জীবনের অপরিহার্য অথচ অপেক্ষাকৃত নিম্নবৃত্তির কাজকর্মকে তাঁরা শ্রদ্ধার চোখে দেখতে শেখেন। আশ্রমে সেদিন মহাসমারোহে এক নতুন ধরনের মহোৎসব জমে। রান্নাঘরে ধোয়ামোছা, বাসন-মাজা থেকে আরম্ভ করে শত-শত লোকের রান্না, পরিবেশন, বাটনা-বাটা, কুটনো কোটা ইত্যাদি সমস্তই ছাত্র-ছাত্রীরা সমাধা করে দল বেঁধে সানন্দ উৎসাহে। ওদিকে একদল জোটে জল-টানার কাজে, মেথর সাজে অন্যদল। বলা বাহুল্য আশ্রমের ঝি-চাকর মেথর-পরিচারক সবাই সেদিন পূর্ণ অবকাশ উপভোগ করে।

আশ্রমে আবার এমন-অনেক অনুষ্ঠান আছে, যার উৎসমূলে থাকে নিছক রঙ্গরস, কৌতুক ও আমোদপ্রিয়তা। ১৯১৫ সনে আশ্রমের "হৈ হৈ সংঘ' 'ভরসামঙ্গল' অনুষ্ঠান করেছিলেন। স্বয়ং গুরুদেব ছিলেন উৎসাহী। তিনি এই বিচিত্র অনুষ্ঠানের জন্য নিম্নোক্ত চারিটি নতুন গান রচনা করেন—

১। পায়ে পড়ি শোনো ভাই গাইয়ে

২। কাঁটাবন বিহারিনী সুরকানা-দেবী

৩। ও ভাই কানাই, এ বড় মোর দুঃখ

৪। না-গাওয়ার দল রে আমরা না-গলাসাধার

আর, এই অনুষ্ঠান উপলক্ষেই চতুর্থবার তিনি অন্যের রচিত কবিতা বা গানে আপন সুর সংযোজন করেন। সুর বসিয়েছিলেন সুকুমার রায়ের বিখ্যাত 'ভীষ্মলোচন গাইছে ভীষণ' কবিতাটিতে।" [শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ও সাধনা

নববর্ষ

"এবার আমাদের পয়লা বৈশাখ সমুদ্রের মাঝখানে দেখা দিয়েছে...সকালবেলায় যখন সব যাত্রীরা ক্যাবিনে পড়ে ঘুমুচ্চে তখন আমরা তিনজনে সেলুনের এককোণে বসে নববর্ষের উপাসনা করলুম। যতদিন থেকে আমার ইস্কুল হয়েছে—পয়লা বৈশাখটা বরাবর সেইখানেই সম্পন্ন করেছি—এগারো বৎসরের মধ্যে এইবার প্রথম বাদ পড়ল।"—রবীন্দ্রনাথ

১লা বৈশাখ।—প্রভাত-ফেরির গানে ঘুম ভাঙল। প্রতিদিনেরই মতো পাখি ডাকছে। আজ লাগছে কানে আরো কাকলী। সূর্য তো তেমনি উঠবে। পূবদিকটা কি আজ আরো রাঙা!—দূরে গেয়ে যাচ্ছে—"ভেঙেছে দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়";—না, আর হেলা-ফেলা নয়। দিনটা তো আর আসবে না। শ্রান্তি-ক্লান্তি কুঁড়েমি,—সবই ঝেড়ে ফেলতে হল। যারা ঘুমিয়ে ছিল, জেগে উঠল। এত ভোরে এমন ক'রে তাদের কে ডেকে যায়!

বছরের আজ প্রথম দিন। আশ্রমে তার উপরে আছে আরেক আনন্দের উপলক্ষ,—'গুরুদেবের জন্মোৎসব'। পয়লা-বোশেখই শান্তিনিকেতনে হয়ে দাঁড়িয়েছে 'পঁচিশে বোশেখ'। এখানে সকলের সুবিধের জন্য এই দিনটিতেই রবীন্দ্র-জন্মতিথি পালন করা হয়ে থাকে। নয়তো, জল শুকিয়ে যায়, স্কুল-কলেজ ছুটি হয়ে যায়,—সকলে মিলে উৎসবের সুযোগ আর হয়ে ওঠে না। শুধু রবীন্দ্রনাথকে নয়, সকল মহাপুরুষকেই এইদিনে আমরা স্মরণ করব। এটি যে মহামানবের জন্মদিন,—"ঐ মহামানব আসে"।

বেলা হল। ঘরে-ঘরে সাড়া পড়ে গেল।—মন্দিরে উপাসনা আছে। বন্ধু বন্ধুকে ডাকতে চলল। নূতন লোক। এসেছে, ঘুরে-ঘুরে চারদিক দেখছে। নূতন জায়গায় নূতন সূর্য-ওঠা! ডেকে নিয়ে যে-যার মন্দিরে গিয়ে বসল। পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন ভাষণে বললেন,—"আজকে যে আলোকের সন্ধান পাব, তা অন্যদেরও দেখিয়ে যেতে হবে,—শুধু নিজে জাগলে চলবে না, আমাদের সকলের কর্তব্য হবে সকলকে জাগানো। একা যে সকলের হয়ে লড়ে সেই তো বীর। আমরা দুঃখ পাব, কিন্তু তারও মাঝখানে যে অটল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে, তারই মহত্ত্ব। মহৎ লোকেরা ডাক দিয়ে যান,—ঘুম ভাঙাতে চান,—যারা

সাড়া দেয় না তারাই দুর্ভাগা। নববর্ষ সম্বন্ধে গুরুদেবের বাণী পড়া হল। পূর্বদিগন্তে সূর্যোদয় হচ্ছে। তাকিয়ে দেখো, সকলকেই তিনি ডাকছেন। তাঁরাই ধন্য, 'প্রথম আলোর চরণধ্বনি' যাঁরা শুনতে পান।"

শিশুদের মন ছটফট করছে, কতক্ষণে উপাসনা শেষ হবে। কারণ, এরই পরে তাদের আনন্দের পালা রয়েছে বকুলকুঞ্জে, সেখানে হবে কুশল আলাপ ও নমস্কারের পালা চুকিয়ে 'জলযোগ'। পুরোনো ছাত্রছাত্রীও অনেকে এসেছেন ' অতিথি-অভ্যাগত আশ্রমবাসী সকলে এসে মিললেন। নমস্কার-বিনিময় ও জলযোগ শেষ হল। এবার আম্রকুঞ্জে বসল 'জন্মোৎসবের আসর'। এরই ফাঁকে ছোটো-ছোটো ছেলেমেয়েরা তাদের 'আমাদের লেখা' নামক বার্ষিকী বইখানি নিয়ে ছুটাছুটি লাগাল। সারা বছরের সাহিত্য সভার মধ্যে যার যে রচনা ভালো হয়, তা দিয়ে এই সংকলনটি সাজানো। প্রতিবারই এটি এসময়ে বেরয়। নববর্ষের মেলানি এটি। এই নিয়েই জমে তাদের এক আনন্দ।

জন্মোৎসব আরম্ভ হল। গান হল। আবৃত্তি হল। ফরাসী, ইংরেজী, রুশীয়, তুর্কী, ইন্দোনেশীয়, চীনা, হিন্দী—নানা ভাষায় রবীন্দ্রনাথের কবিতার অনুবাদ পড়া হল। পড়লেন নানা দেশের নানা জাতীয় লোকেরা। মানে না বুঝলেও—শুনতে বেশ লাগছিল। আর এটুকু সাক্ষাৎ-বোঝবার সুযোগ পাওয়া গিয়েছিল যে,—কত দেশে রবীন্দ্রনাথ আসর জমিয়েছেন,—জয় করেছেন কত দেশের হৃদয়। এভাবে বিশ্বের ভারতীকে এক-জায়গায় প্রত্যক্ষ করার উপলক্ষ তৈরি ক'রে রবীন্দ্র-জন্মোৎসবের একটি সুন্দর সার্থকতা শান্তিনিকেতনে দেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠান শেষ হ। কবির সেই গানটি দিয়ে যাতে তিনি বলেছেন—'যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে।' ১৮।৪।১৯৫২

নববর্ষের-দিন রাত্রে বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয়-গ্রন্থাগারের বারান্দায় রবীন্দ্রনাথের 'কালের যাত্রা' নাটিকার অভিনয় হল। এখানে এই নাটকটি খুব কমই অভিনীত হয়েছে, সেদিক থেকে সম্পূর্ণ একটি নূতন জিনিস আজকের দর্শকগণ দেখতে পেয়েছেন। ছোটো হলেও নাটিকাটি সুঅভিনীত হয়েছিল। শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে সবাই বেশ উপভোগ করেছে। নাটকের ভিতরকার কথাটি সেদিনকার বিতর্ক-সভার প্রশ্নেরই অনুরূপ—কালের রথ অচল হল কেন? সে চলবে কার টানে, কোন্ পথে? 'কালের যাত্রা'য় পুরোহিত বলছেন—"রথ তারা চালাবে কিসের জোরে। বুঝিয়ে বলো"; কবি বলছেন—"গায়ের জোরে নয়, ছন্দের জোরে।

আমরা মানি ছন্দ, জানি একঝোঁকা হলেই তাল কাটে। মরে মানুষ সেই অসুন্দরের হাতে।"

এই ছন্দহীন বেতাল অসুন্দরের হাতেই আজ মানুষের মার চলেছে নানাভাবে। অর্থনীতি রাজনীতি সমাজনীতি ইতিহাস সবার মূলে রয়েছে মানুষ। সেই মানুষ তার লোভে তার মদমত্ততায় সংসারের প্রাণের বন্ধনকে চলার ছন্দকে বিকৃত বিভ্রান্ত করে তুলেছে,—'কালেব যাত্রা'য় কবি বলছেন :

"ওদের মাথা ছিল অত্যন্ত উঁচু
মহাকালের রথের চূড়ার দিকেই ছিল ওদের দৃষ্টি—
... মানুষের সঙ্গে মানুষকে বাঁধে যে-বাঁধন তাকে ওরা মানেনি,
রাগী বাঁধন আজ উন্মত্ত হয়ে ল্যাজ আছড়াচ্ছে—
দেবে ওদের হাড় গুঁড়িয়ে।"

সেদিনকার বিতর্ক-সভার প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল 'কালের যাত্রা' নাটিকাটিতে। সেখানকার কবি নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে সহজভাবেই বলেছেন :

"যুগাবসানে লাগেই তো আগুন।
যা ছাই হবার তাই ছাই হয়,
যা টিঁকে যায় তাই নিয়ে সৃষ্টি হয় নবযুগের।"

এই কথাটিই রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে মানুষকে শুনিয়েছেন—গানে কবিতায় নাটকে ভাষণে,—যা মিথ্যা যা ভঙ্গুর যা ছন্দহীন তালহীন তা একদিন না একদিন বিনষ্ট হবেই; কিন্তু সেখানেই সৃষ্টি থেমে থাকবে না, নবযুগের সৃষ্টি হবেই নূতনকে নিয়ে। ২৩।৪।১৯৫৫

১লা বৈশাখ থেকে পঁচিশে বৈশাখ অবধি গুরুদেবের জন্মোৎসব-উপলক্ষে বিশ্বভারতী-শিল্পসদনে একটা নির্দিষ্ট কম-মূল্যে শ্রীনিকেতনের তাঁতের কাপড় ও গুরুদেবের গ্রন্থাবলী বিক্রি হচ্ছে। এই সুলভ মূল্য-নিয়ন্ত্রণের প্রভাবে শিল্পসদনে সারাদিন ক্রেতার ভিড়ের অন্ত নেই। শ্রীনিকেতনের শিল্পজাত দ্রব্য ও গুরুদেবের গ্রন্থাবলীর চাহিদা যে কত, এ উপলক্ষে তা বিশেষ ভাবে বোঝা যাচ্ছে।

মূল্যের উচ্চহারের জন্য অনেক ক্ষেত্রেই দেশের লোক ভাল গ্রন্থ বা দ্রব্যাদি ক্রয়ে বিমুখ হয়ে থাকে। এভাবে দ্রব্যের মূল্য হ্রাস করে দেশের কাছে তা সহজলভ্য করে তোলা সাধারণের শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে উন্নত করবার একটি প্রকৃষ্ট উপায়। সেদিক থেকে বিশ্বভারতীর এ সাধু প্রচেষ্টা বিশেষ সার্থকতা লাভ করবে তাতে সন্দেহ নেই। ৬।৫।১৯৫৫

বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে গুরুদেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হল গত ১লা বৈশাখ। অন্যান্য বছর ঐ-দিনে 'নববর্ষ' উৎসব উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে কিন্তু শান্তিনিকেতনে নতুন ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী ১লা চৈত্র 'নববর্ষ' হয়ে গেছে। তাই এবার ১লা বৈশাখ শুধু জন্মোৎসব। গুরুদেবের জন্মদিন ২৫শে বৈশাখ বিশ্বভারতীর ছুটি হয়ে যায়, তাই কবির নির্দেশে তাঁর জীবদ্দশা থেকেই ১লা বৈশাখ জন্মোৎসব পালিত হয়ে থাকে।

এবারে ১লা বৈশাখ ভোরে হল বৈতালিক। "ভেঙেছে দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়" গান গেয়ে ছাত্রছাত্রীরা আশ্রম-পরিক্রমা করলেন। তারপর সকাল ৭টায় সকলে সমবেত হলেন মন্দিরের উপাসনায়। উপাসনা পরিচালনা করলেন শ্রীনিতাইবিনোদ গোস্বামী। মিতা আর্যনায়কম্ "মন মোর গহন" গানটি করার পর উপাসনা শুরু হয়। আচার্যের ভাষণে গোঁসাইজী বলেন যে, "আজ ১লা বৈশাখ। আমাদের গুরুদেবের জন্মদিনকে স্মরণ করে আমরা উৎসবের আয়োজন করেছি। ২৫শে বৈশাখ তাঁর জন্মদিন। সেটি হল পঞ্জিকার চিহ্নিত দিন। মহামানবদের পরম আশ্চর্যময় আবির্ভাব একটি বিশেষ দিনকেই অবলম্বন করে ঘটে থাকে বটে, কিন্তু কালক্রমে তা স্থান-কালকে অতিক্রম করে যায়। মনোজগতেই তখন চলে নিত্য-আবির্ভাব-লীলা। সেইটিকেই বিশেষ করে উপলব্ধি করার জন্যে একটি দিন চাই, যেদিনে জন্মোৎসবের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও ভূমার মধ্যেই অনুভব করব। এই জন্মলাভের মহিমাকে স্মরণ করে আজ আমাদের সারাদিনের উৎসব। এই উৎসব-মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করা হয়েছে প্রত্যুষেই—গানের চাবি দিয়ে। আমরা প্রভাতের প্রথম আলোকে স্নাত হয়ে—যিনি আমাদের সর্বকর্ম সর্বচেষ্টা সর্বচিন্তা সর্ব আনন্দের নেতা, যিনি 'আনন্দরূপম্ অমৃতম্' সেই উৎসব-পতির কাছে ভক্তি নিবেদন করে প্রার্থনা করতে এখানে সমবেত হয়েছি।" অতঃপর তিনি গুরুদেবের বাণী থেকে বিভিন্ন অংশ পাঠ করেন। প্রসেনজিৎ সিংহ ও মানসী বসু যথাক্রমে "মোরে ডাকি লয়ে যাও" এবং "অরূপ বীণা রূপের আড়ালে" গানগুলি গাওয়ার পর উপাসনা শেষ হয়। ২৩।৪।১৯৫৭

উপাসনার পর আম্রকুঞ্জে জন্মোৎসবের অনুষ্ঠান হল। পৌরোহিত্য করলেন উপাচার্য শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু। শ্রীনগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কর্তৃক মন্ত্রপাঠের পর উৎসবের সূচনা হয়। রবীন্দ্র-সাহিত্য থেকে পাঠ ও আবৃত্তিতে অংশ গ্রহণ করেন শ্রীনিতাইবিনোদ গোস্বামী, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীহিমাদ্রি রায়, শ্রীইন্দ্রাণী বাগ্‌চি, শ্রীপ্রভাতী দত্ত, শ্রীজয়িতা চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসুপ্রতীক বসু, শ্রীসমীরণ চট্টোপাধ্যায় ও

শ্রীক্ষিতীশ রায়। "বাণী তব ধায়," "হে নূতন", "তোমার আনন্দ ওই এল দ্বারে" প্রভৃতি গানগুলি সমবেতভাবে গীত হয়। শ্রীনীলিমা সেন, শ্রীপূর্ণেন্দু সিংহ ও শ্রীশান্তিদেব ঘোষ যথাক্রমে "যে পেয়েছি প্রথম দিনে", "আনন্দ ধারা বহিছে ভুবনে" ও "আমি চঞ্চল হে" গানগুলি পরিবেশন করেন। "আমার মুক্তি আলোয় আলোয়" গানের পর অনুষ্ঠান শেষ হয়। তারপর বকুলবীথিতে উপস্থিত আশ্রমবাসীদের জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়।

বিকালে শ্রীযুক্তা ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণীর উদ্যোগে 'দ্বিজেন্দ্র-স্মরণ' অনুষ্ঠিত হয় ছাতিমতলায়। এই উপলক্ষে, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আশ্রমে যে-বাড়িতে বাস করতেন, 'নীচু বাংলা' নামে যার পরিচয়, সেখানে 'দ্বিজ-আশ্রম' নামে একটি প্রস্তর-ফলক স্থাপিত হয়। প্রাচীন আমলকী, মহুয়া, শাল, আম-বাগানের মধ্যে এই বাড়িটি অবস্থিত। এই নির্জন-নিস্তব্ধ স্নিগ্ধ আশ্রমে বর্ষীয়ান দার্শনিক গুরুদেবের 'বড়দাদা' (গান্ধিজী ও এণ্ড্রুজ সাহেবও তাঁকে ঐ নামে ডাকতেন) এবং আশ্রমের 'বড়বাবু' শান্তিনিকেতন-প্রতিষ্ঠার প্রথম হতে এখানে বাস করে গেছেন। ১৯২৬ সালে ঐ বাড়িতেই তিনি দেহত্যাগ করেন। এই মহাপুরুষকে দেখেই গান্ধীজী বলেছিলেন যে, ভারতীয় জ্ঞানী পুরুষের যে আদর্শ তাঁর মনে ছিল, দ্বিজেন্দ্রনাথের মধ্যে তার জীবন্ত রূপ তিনি দেখলেন। আর দ্বিজেন্দ্রনাথও বলেছিলেন যে, গান্ধীজীর মতো মহাপ্রাণ মহাপুরুষের অপেক্ষাতেই তিনি ছিলেন, এতদিনে তাঁর সাক্ষাৎ পেলেন—এখন আর দেশের জন্য কোনো চিন্তা নেই। পরে গান্ধীজী যখন অসহযোগ-আন্দোলন আরম্ভ করেন তখন দ্বিজেন্দ্রনাথের আনন্দের অবধি ছিল না। আর তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভা? শ্রীপ্রমথনাথ বিশী এক জায়গায় বলেছেন যে, " 'মেঘনাদ বধকে' ছাড়িয়া দিলে 'স্বপ্ন-প্রয়াণকে' দীর্ঘ বাংলা কাব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলা যাইতে পারে।"

নীচু-বাংলাকে 'দ্বিজাশ্রম' নাম দিয়ে আশ্রমের কাছে তাঁকে স্মরণীয় করে রাখা হল। নীচু-বাংলার অনুষ্ঠানে দ্বিজেন্দ্রনাথের "করো তাঁর নাম গান" গানটি গীত হয়।

সন্ধ্যায় জ্যোৎস্নালোকিত উন্মুক্ত গৌরপ্রাঙ্গণে শ্রীশান্তিদেব ঘোষ ও শ্রীবীরেন পালিতের পরিচালনায় একটি বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন হয়। রাত্রে "পথ দিয়ে কে যায় গো চলে" গান দিয়ে বৈতালিক হয় ও জন্মোৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটে। ২৩।৪।১৩৫৭

পঁচিশে বৈশাখ

শান্তিনিকেতনে ২৫শে বৈশাখ এল। তার আগমনী জানাল সেদিন ঘরের শঙ্খে নয়,—বাইরের জিজ্ঞাসায়। সকাল থেকে লোক আসছে। দু'চার জন করে এখানে-সেখানে ঘুরছে। সাধারণ-ঘরের ছেলে। দল বেঁধে বেরিয়েছে। ঘুরে যাবে শান্তিনিকেতন। দেখে যাবে এক পলক। ব'সে শুনেও যাবে, যদি কিছু শোনার থাকে। কিন্তু অত-কিছুর অপেক্ষা নেই। কবির জায়গাটিতে একবার আসা গেল,—এই যথেষ্ট। এর আকাশে-বাতাসে গাছপালায়, রাস্তাঘাটে আছে সেই শান্তি,—আছে সেই মধু,—যার জন্তে এখানে না-এসে তারা থাকতে পারেনি।—দূরের থেকে এসে শুধু ঘুরে গিয়েই তাদের সে পাওয়া হল। সংখ্যায় তারা বেশি ছিল না। এখানেও ছিল না কিছু নূতন আয়োজন। সন্ধ্যায় জলসা হল উত্তরায়ণে। রীতি-রক্ষা গোছের। মন্দিরের কাছে দু'চারজন ঘোরাফেরা করছিলেন বিকেলে। তাঁরা আশ্রমেরই। প্রবীণ মহলের। তাঁদের মন উন্মুখ হয়েছিল উপাসনায়। বাইরে যার আবির্ভাবে উৎসবের জোয়ার বইছে, আশ্রমে তাঁর এই নীরব-অভ্যর্থনায় মনে পড়েছিল কেবল সেই দুটি কথাই—

> কখনো স্মরিতে যদি হয় মন
> ডেকো না, ডেকো না সভা, এসো এ-ছায়ায়
> যেথা এই চৈত্রের শালবন।

আজ শালবনের তলা দিয়েই লোক ঘুরে গেল। কিন্তু যারা ঘুরে গেল তারা বোধ হয় এ কবিতা পড়েনি। ১৪।৫।১৯৫২

২৫শে বৈশাখ। পুণ্য বৈশাখ মাস—বছরের আরম্ভ; বুদ্ধদেব ও রবীন্দ্রনাথের জন্মমাস। নববর্ষের প্রথম-দিনটিতেই আশ্রমে মহামানবের জন্মোৎসবের জয়গান ঘোষিত হয়ে ওঠে; তার পরে সারাটি মাস দিকে দিকে আনন্দ-কলরব ধ্বনিত হতে থাকে। অন্যান্য বছর পঁচিশে-বৈশাখের বহু আগেই আশ্রমের স্কুল-কলেজ বন্ধ হয়ে যায়। এবার দিন সাতেক আগে মাত্র (১লা মে) বন্ধ হয়েছে। ঠিক দু'মাস ছুটি। ছুটিতে আশ্রমে যাঁরা থাকেন, ক'জনে মিলে তাঁরা পঁচিশে বৈশাখ রাত্রে ছোটোখাটো-রকমের একটি জলসার আয়োজন করেন। আশ্রম এবার সকাল থেকে ভরে উঠল অতিথি-অভ্যাগতে।

গ্রামের লোকই তার মধ্যে বেশী। কলকাতা-জোড়াসাঁকোর মহর্ষি-ভবনে এ সময় দেখা দেয় মহাসমারোহ। কিন্তু জনসাধারণ, বিশেষতঃ গ্রামের লোকেরা রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে এখানে না এসে পারে না। রবীন্দ্রনাথের হাতে-গড়া এই আশ্রম, রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘদিনের বাসস্থান এই শান্তিনিকেতন, তাদের কাছে তীর্থক্ষেত্রস্বরূপ; পঁচিশে-বৈশাখের বিশেষ দিনটিতে কবির সাধনস্থল শান্তিনিকেতন পরিক্রমা ক'রে তারা দেশীয় ধারায় পুণ্যতিথি পালন করে থাকে। আশ্রম-বাসিগণও এ দিনটিতে আশ্রমে একটু উৎসব না করে তৃপ্তি পান না। এবারকার পঁচিশে বৈশাখের জলসাটি বেশ মনোজ্ঞ হয়েছিল এবং জনসাধারণ যাঁরা এসেছিলেন আশ্রম দেখতে, তাঁরাও আনন্দ পেয়ে গেছেন। ১৩।৫।১৯৫৪

*　　　*　　　*

রবীন্দ্র-সপ্তাহ

রবীন্দ্রনাথ একদিন বলেছিলেন—'আমাকে হারালে বাঙালী আপনাকে হারাবে।'—রবীন্দ্র-আলোকে রবীন্দ্র-পরিচয়।

বাইশে-শ্রাবণ এসে হরণ করে নিয়ে গেছে তাঁকে, কিন্তু ভক্তি তাঁকে হারায়নি। তাই দেখি পঁচিশে বৈশাখে দিকে-দিকে ওঠে আনন্দ-গীতি; বাইশে-শ্রাবণে শত-সহস্রের শ্রদ্ধাঞ্জলি হয় নিবেদিত। বাঁধা তিনি প্রেমে, বাঁধা ভক্তিতে। এগারো বছর আগের তফাৎটা তক্ষুনি হয়ে যায় ভুল, যেমনি বছরের বাইশে-শ্রাবণ দিনটি এসে দেখা দেয়। মৃত্যুতে দুঃখ করা নয়, জীবনের লীলাখেলারূপে মৃত্যুকে গ্রহণ করাই—ভারতীয় মত। সে-মতেই রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুকে গ্রহণ করেছেন; সে-ভাব ব্যক্ত করে গেছেন গানে, সাহিত্যে, ভাষণে। কিন্তু তবু কি বাস্তবকে সহজে ভুলে যাওয়া যায়। বাইশে-শ্রাবণ যেই আসে, সেই প্রয়াণের কথা মনে দেয় জাগিয়ে, অমনি যে মন ভরে ওঠে দুর্নিবার বেদনায়। দর্শনের তত্ত্ব দিয়ে তাকে শমিত করতে হয় পরে। বেদনা-নম্র হৃদয়ে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ ক'রে প্রতি-বছর বলতে হয়—তোমার দেশবাসী আমরা, তোমার আরব্ধ কাজের ভার বহন করবার যোগ্যতা দাও আমাদের।

বাইশে-শ্রাবণ। আশ্রমে সকালের-অনুষ্ঠান মৃত্যুবাসর; বৈকালিক-উৎসব বৃক্ষরোপণ। জীবন ও মৃত্যুর পূর্ণতার প্রতীক আশ্রমের এ দিনটি।

বাইশে-শ্রাবণের পর সাতদিন রবীন্দ্র-সপ্তাহ। ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা-দিবসের উৎসব-শেষে এই অনুষ্ঠানধারা সারা হয়। সারাদিন আশ্রমের প্রাত্যহিক কাজ চলে, সন্ধ্যায় সিংহসদনে সবাই সমবেত হন; রবীন্দ্রনাথের আদর্শ, তাঁর কাব্য, তাঁর সংস্কৃতি প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা হয়, বিশেষ ক'রে জানা হয় তাঁকে।

বিশ্বভারতী সরকারী-রীতিতে বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে। এবার রবীন্দ্র-সপ্তাহের আলোচ্যবিষয় ছিল রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষাদর্শ'। স্বাধীনদেশে শিক্ষাদান এবং তার পদ্ধতি নিত্য-নূতন গবেষণার বিষয়। শিক্ষার প্রথম কথা হচ্ছে মনুষ্যত্বের বিকাশ এবং মানুষকে কালের উপযোগী করে গড়ে তোলা। শিক্ষাক্ষেত্র মানুষেরই একটা প্রধান সৃষ্টির ক্ষেত্র, আনন্দ-ক্ষেত্র। কুমারী মন্তেসরির জীবনের সফলতায় দেখি তার রূপ; এবং গুরুদেবেরই লেখা "আমেরিকার একটি বিদ্যালয়" নামক প্রবন্ধে জানা যায় মিস্ মার্থা-বেরীর সামান্য চেষ্টায় সেই ব্রত-উদ্‌যাপনের বিবরণ। আমাদের দেশে

ইংরেজী শিক্ষা-পদ্ধতি যে দেশোপযোগী, কালোপযোগী হয়নি—সেটা আজ জানা কথা। রবীন্দ্রনাথ ছেলেবেলায় স্কুলে শিক্ষা পেতে গিয়ে যে দুঃখ অনুভব করেছিলেন, সেই দুঃখই ইংরাজি-শিক্ষা-পদ্ধতির ব্যর্থতা সম্বন্ধে তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছিল। বাইশ-তেইশ বছর বয়সেই তিনি শিক্ষার বিষয়ে লিখতে থাকেন। আজ শিক্ষা সম্বন্ধে যে যা বলুক বা করুক, এ বিষয়েও রবীন্দ্রনাথকে পথপ্রদর্শক বলে মানতেই হবে। তিনি স্মরণীয় শুধু তাঁর লেখার দানে নয়, তাঁর কাজের দানেও। শান্তিনিকেতন সংস্কৃতি-শিক্ষাক্ষেত্র, শ্রীনিকেতন কারিগরী-শিক্ষাক্ষেত্র। এতেও কবি সন্তুষ্ট থাকেননি, পল্লীতে-পল্লীতে শিক্ষাবিস্তারের পরিকল্পনা করেছেন, রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন, এমন কি শেষ-বয়সে স্থাপন করে গেলেন 'লোক-শিক্ষা-সংসদ' প্রতিষ্ঠান, যাতে ঘরে বসেই সাধারণ মেয়ে-পুরুষ সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, ভূগোল, স্বাস্থ্য, অঙ্ক প্রভৃতি শিক্ষা পেতে পারে। লেখায়-গানে রইল তাঁর ভাবধারা, প্রতিষ্ঠানে রইল তাঁর আদর্শের বাস্তবরূপ।

রবীন্দ্র-সপ্তাহে কবির শিক্ষার ভাবধারা এবং আদর্শের দিকটাই সম্যক আলোচিত হয়েছে ইংরেজি ও বাংলা পঠন-পাঠন, গান এবং আবৃত্তি দ্বারা। সভাপতি কেউ ছিলেন না। আশ্রমের অধ্যাপক, শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, কর্মী, আশ্রমিকগণ এবং শ্রীনিকেতন ও বোলপুরের শিক্ষাব্রতী সবাই মিলিত হয়েছিলেন; পর-পর এক-একজন ইংরেজি, বাংলা গদ্য-পদ্য পাঠ এবং আবৃত্তি করে উদ্‌যাপন করেছেন এ-সপ্তাহটি। বিশ্বভারতীর আদর্শ, ধর্মশিক্ষা, বিজ্ঞান শিক্ষা, ইতিহাস শিক্ষা, সাহিত্য শিক্ষা, প্রাকৃতিক শিক্ষা, শিক্ষার বিকিরণ, নারীর শিক্ষা, সৌন্দর্য শিক্ষা, লোক-শিক্ষা, ছাত্রদের শিক্ষাপদ্ধতি, দেশবিদেশের শিক্ষা—গ্রন্থাগারিক শিক্ষা, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা—গুরুদেবের নানা বিষয় নিয়ে লেখাগুলি ছিল একদিনের সভায় পাঠ্য। তৃতীয় দিনের অধিবেশনে চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় গুরুদেবের 'তোতাকাহিনী' গল্পটি পড়ে শোনান। প্রারম্ভে তিনি বলে যান তখনকার শিক্ষার কিরূপ আবহাওয়ার মধ্যে গুরুদেব এ গল্পটি লিখেছিলেন। ইংরেজ-আমলে, বিশেষ করে তাঁরা যখন কলেজের ছাত্র ছিলেন, তখন শিক্ষার ব্যয়ের ষোলভাগের দশ ভাগ খরচ হত শিক্ষার তত্ত্বাবধানে অর্থাৎ তত্ত্বাবধায়ক ইংরেজদের পিছনে। ১৯০৩ সন, চারুবাবু তখন তৃতীয়-বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। প্রেসিডেন্সীতে পড়ছেন। দুজন ইংরেজ এলেন শিক্ষাবিভাগে। একজনের নাম স্টেপ্‌ল্‌টন—ফিজিক্স পড়াতেন। দু'লাইন অঙ্ক লিখেই তিনি বই খুলে খুলে ফরমূলা দেখতে থাকতেন। তবু যেহেতু ইংরেজ,—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের উপরে

পেলেন স্থান। বেশীদিন নয়। তাঁর পড়ানোর অক্ষমতা উপরওয়ালাদের অগোচর রইল না। তাঁকে কলেজ খেকে সরানো হল। কিন্তু তাঁর মান বা বেতন খর্ব করা যায় না। তাঁকে ইন্সপেক্টর ক'রে এ-কূল ও-কূল দুকূল রাখা হল। তিনি যে কী রকম ইন্সপেক্টর ছিলেন তার একটা ঘটনা চারুবাবু উল্লেখ করেন। একবার স্টেপল্‌টন সাহেব পূর্ববঙ্গের কোনো জায়গায় বিদ্যালয় পরিদর্শনে গিয়েছেন। পথে শুনতে পেলেন স্কুলের দুটি ছেলে 'বন্দেমাতরম্' বলে চেঁচাচ্ছে। স্কুলে গিয়ে সাহেব হেড্‌মাস্টারকে হুকুম দিলেন তিনি তিনদিন সেখানে থাকবেন। সেই ছেলে দুটিকে প্রত্যেকদিন পাঁচশবার ক'রে লিখে আনতে হবে—

"It is useless,
It is fruitless
It is foolishness to utter 'বন্দেমাতরম্'।

এমনি ছিল শিক্ষার ধরন-ধারন। এ নিয়ে অনেক বিক্ষোভও যে না হত তা নয়। ১৯১৯-এ বসল স্যাড্‌লার কমিশন। স্যাড্‌লার সাহেব রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিন-চারবার সাক্ষাৎ করেন, অনেক আলোচনাও হয়। শিক্ষার বিশেষ অদল-বদল যে তাতে হল তা নয়। তবে এর অনতিকাল পরেই রবীন্দ্রনাথ 'তোতা-কাহিনী' গল্পটি লেখেন। সঙ্গে-সঙ্গে সেটা ইংরেজিতে তর্জমা ক'রে এক কপি স্যাড্‌লার সাহেবকেও পাঠানো হয়েছিল।

এর পরে চারুবাবুর পড়া ঐ গল্পটি সেদিন ছোট-বড়ো সকলেরই বেশ উপভোগ্য হয়েছিল। তোতাপাখি লাফাত, নাচত, গাইত উন্মুক্ত বনে। রাজা মন্ত্রীকে ডেকে বললেন যে, পাখিটাকে শিক্ষা দিতে হবে। সেই শিক্ষা দিতে গিয়ে তার পিছে এল কত সাজসরঞ্জাম, পাইক-বরকন্দাজ আরো কত-কী। শেষ অবধি তোতার মুখ গেল বন্ধ হয়ে, প্রাণ গেল বেরিয়ে, পেটের মধ্যে কেবল গজগজ করতে লাগল কাগজ। সরস কাহিনীর মধ্য দিয়ে ইংরেজের শিক্ষাব্যবস্থা-পদ্ধতির উপর রবীন্দ্রনাথ যে কটাক্ষ করেছেন, চিরকালই সকলে তা উপভোগ করবে। শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় ও শ্রীলীলা রায়ও এ সভায় পাঠ করেছিলেন। সভার আরম্ভে এবং শেষে ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা দুটি করে গান হত। প্রথম দিনের প্রথম গান ছিল বেদের স্তোত্র—তারপরে গুরুদেবের গান—"বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা", "সংকোচের বিহ্বলতা", "মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গন", "মোদের যেমন খেলা তেমনি যে কাজ জানিসনে কি ভাই", "আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে," "আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল"—প্রভৃতি; গানের মধ্যে দিয়েও যে কত শিক্ষণীয় বিষয় আছে

সে সবও ব্যাখ্যা করে বলেন রবীন্দ্র-সপ্তাহের উদ্যোক্তা অধ্যাপক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন। দু'দিনের পাঠ গান আবৃত্তির মধ্য দিয়ে বাঙালী-অবাঙালী সবাই গুরুদেবের শিক্ষার ভাবধারাটি অনুধাবন করেছেন। এ রকম আলোচনা-সভার একটা বিশেষ মূল্য আছে। অনেক সময় বড় বড় প্রবন্ধগুলি শুনে-ওঠার ধৈর্য থাকে না, অনেক শিক্ষিত লোকেরও অভ্যাস নেই এ সব পড়ার। রবীন্দ্র-সপ্তাহে যে-সকল সুনির্বাচিত অংশবিশেষ পড়া হয়েছে, সে-সব গুরুদেবের বড়-বড় রচনাগুলির নির্যাস-স্বরূপ। ছাত্র এবং শিক্ষাব্রতী যাঁরা দেশের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ স্রষ্টা, তাঁদের মধ্যে এগুলির প্রচার হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এগুলিকে তাঁরা শিক্ষা দান এবং গ্রহণের পাথেয় রূপে গ্রহণ করতে পারবেন। এজন্যই মনে হয়, সভার শেষদিনে এই সুনির্বাচিত অংশগুলি দিয়ে সংকলিত একখানি মুদ্রিত-পুস্তিকা সাধারণের জন্য সুলভ করলে ভালোই হত।

আশ্রমের প্রাক্তনদের প্রতি গুরুদেব সস্নেহে নির্ভর রেখে গেছেন। যেভাবে আশ্রমের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ রাখতে বলে গেছেন তাঁর "প্রাক্তনী" গ্রন্থে, সে আদর্শে কাজ করলে প্রাক্তনগণ এবং আশ্রমবাসীরা পরস্পর কখনো বিযুক্ত হবেন না, লাভবানই হবেন। প্রবীণ প্রাক্তন-ছাত্র শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীনির্মল চট্টোপাধ্যায় "প্রাক্তনী" বই থেকে এ সব পড়ে শোনান।

ধর্মশিক্ষা সম্বন্ধে গুরুদেবের সার কথা হচ্ছে—"ধর্মেই মানুষের শ্রেষ্ঠ পরিচয়।...... স্বাস্থ্য যেমন সমস্ত শরীরকে জুড়িয়া আছে, ধর্ম তেমনি মানুষের সমগ্র-প্রকৃতিগত।" ধর্মশিক্ষা কী ভাবে দেওয়া যায় এ সম্বন্ধে তাঁর অভিমত—"মা যখন সন্তানকে অন্ন দেন তখন একদিকে তাহা অন্ন, আর-একদিকে তাহা তাঁহার হৃদয়। এই অন্নের সঙ্গে তাঁহার হৃদয় সম্মিলিত হইয়াই তাহা অমৃত হইয়া উঠে। আশ্রমও বালকদিগকে যে বিদ্যা-অন্ন দিবে তাহা হোটেলের অন্ন ইস্কুলের বিদ্যা নহে—তাহার সঙ্গে সঙ্গে আশ্রমের একটি প্রাণরস, একটি অমৃতরস অলক্ষ্যে মিলিত হইয়া তাহাদের চিত্তকে আপনি পরিপুষ্ট করিয়া তুলিতে থাকিবে।" আশ্রম হচ্ছে সেই ক্ষেত্র—"কোনো সংকীর্ণ দেশকালপাত্রের দ্বারা কর্তব্যবুদ্ধিকে খণ্ডিত না করিয়া যেখানে বিশ্বজনীন মঙ্গলের শ্রেষ্ঠতম আদর্শকেই মনের মধ্যে গ্রহণ করিবার অনুশাসন গভীরভাবে বিরাজ করিতেছে—যেখানে পরস্পরের প্রতি ব্যবহারে শ্রদ্ধার চর্চা হইতেছে, জ্ঞানের আলোচনায় উদারতার ব্যাপ্তি হইতেছে, যেখানে ছোট-বড় বালক-বৃদ্ধ সকলেই একাসনে বসিয়া নতশিরে বিশ্বজননীর প্রসন্ন হস্ত হইতে জীবনের প্রতিদিনের এবং চিরদিনের অন্ন গ্রহণ করিতেছে।"

গ্রন্থাগারের মূল্য সম্বন্ধে একটি প্রধান কথা আছে, এবং সেটি প্রকাশ পেয়েছে রবীন্দ্রনাথেরই ভাষায়। সে কথাটা হচ্ছে, গ্রন্থ গারের মর্যাদা পুস্তক-সংগ্রহে নয়, পাঠকমণ্ডলী-সৃষ্টি করাতে। নানাভাবে মানুষের মধ্যে পড়ার স্পৃহা জাগিয়ে তুলে এই পাঠকমণ্ডলী গড়ে তুলতে হবে।

নারীদের-শিক্ষা পাওয়া শুধু পুরুষদের সমান মর্যাদা লাভ করে অহংকৃত হওয়ার জন্য নয়, তাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য নারীর মাধুর্য এবং তেজ-শক্তি বৃদ্ধি করে সংসারকে মঙ্গল এবং সুন্দর করা। শিক্ষা-গ্রহণেচ্ছু নারীর সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—"সংসারের লোকে যাহাকে সুখ বলে সেটাকে তিনি আদর্শ করিবেন না।' একথা তাঁহাকে মনে রাখিতে হইবে, সন্তান গর্ভে ধারণ করাই তাঁহার চরম সার্থকতা নয়। তিনি পুরুষের আশ্রিতা, লজ্জাভয়ে-ভীতা লীলাসঙ্গিনী, সামান্য ললনা নহেন; তিনি তাহার সংকটে সহায়, দুরূহ চিন্তায় অংশী এবং সুখে-দুঃখে সহচরী হইয়া সংসার-পথে তাহার প্রকৃত সহযাত্রী হইবেন। যাহা-কিছু জানিবার যোগ্য তাহাই বিদ্যা, তাহা পুরুষকেও জানিতে হইবে, মেয়েকেও জানিতে হইবে—শুধু কাজে খাটাইবার জন্য যে, তাহা নয়, জানিবার জন্যই।"

কিন্তু এখনো কি মেয়েরা শিক্ষাকে এভাবে নিতে পেরেছেন? এখনো অধিকাংশই অর্থের ভিত্তিতে শিক্ষাকে গ্রহণ করছেন; জীবনে পুরুষের অর্থচিন্তা লাঘব করতে পারাটাই শিক্ষার চরম মনে করছেন। কিন্তু এতে একটা অনর্থ ঘটছে এই যে, শুধু অর্থের সমকক্ষতায় মেয়ে-পুরুষের ভিতরের ঐক্য অনেক সময় যায় কমে। ভিতরে বাইরে দু-ক্ষেত্রে দুজনের দুরকম সহযোগিতা না থাকলে জীবনের সুখ-দুঃখ বিচিত্রভাবে প্রীতিরসে মধুর হয়ে ওঠে না।

নারীর শিক্ষার মূল কথাটা সবার জানা থাকলে স্ত্রীপুরুষ দুয়ের জীবনই সুন্দর হয়ে উঠতে পারে, জীবনের আদর্শ এবং ভিত্তি শক্ত হতে পারে।

আধুনিক যুগের শিক্ষাকে কিভাবে লোকশিক্ষার বিষয় ক'রে সাধারণের মধ্যে বিস্তৃত করা যায়, আমাদের আগের জনশিক্ষা কী-পদ্ধতিতে দেওয়া হত, এখনও কিভাবে দেওয়া উচিত, বিশ্বভারতী ও আশ্রম-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য কী,—সে-সংক্রান্ত লেখাগুলির মর্মপাঠে তা সবার সুখশ্রাব্য ও সহজবোধ্য হয়েছিল।

ছাত্রদের নিয়েই চিরকাল সমস্যা। কেমন ব্যবহার করলে তারা ঠিক-পথে চলবে, কোন্ পথে চালালে তারা আনন্দে বিকশিত হয়ে উঠবে, এইটি শিক্ষার মধ্যে প্রধান চিন্তার বিষয়। সে-সমস্যা এখন আরো কঠিন হয়ে উঠছে। তাই দেখি পদে-পদে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শিক্ষাদানব্রতীদের সংঘাত। দুয়ের সম্পর্ক কিছুতেই

সহজ হতে চায় না। গুরুদেবের 'ছাত্র-শাসনতন্ত্র' প্রবন্ধ প্রেসিডেন্সী-কলেজের ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে এক সংঘর্ষের উপরে লেখা। কিন্তু যে-সমস্যা তখনো প্রবল ছিল, অমীমাংসিত ছিল, এতদিন পরে এত ভাবনা-চিন্তার পরেও দেখি সে-সমস্যা দূর হল না। শিক্ষা-পদ্ধতির গলদে ছাত্র-শিক্ষকে ব্যবধান রচে আছে, অপঘাত ঘটে আছে। গুরুদেব ছাত্র-শিক্ষক দু'পক্ষের সম্বন্ধেই বিচার করেছেন, বলেছেন—"ছাত্রদিগকে কড়া শাসনের জালে যাঁরা মাথা হইতে পা পর্যন্ত বাঁধিয়া ফেলিতে চান, তাঁরা অধ্যাপকদের যে কত বড় ক্ষতি করিতেছেন সেটা যেন ভাবিয়া দেখেন······ছাত্রদের মধ্যে অবজ্ঞার কারণ তাঁরা নিজে ঘটাইয়া তুলিয়া তাহাদের অবমাননার দ্বারা নিজেকেই অহরহ অবমানিত করিতে থাকিবেন। অবজ্ঞার ক্ষেত্রে নিজের কর্তব্য কেহ সাধন করিতে পারে না।

"অপর পক্ষ বলিবেন, তবে কি ছেলেরা যা-খুশি-তাই করিবে আর সমস্তই সহিয়া লইতে হইবে। আমার কথা এই, ছেলেরা যা-খুশি-তাই কখনোই করিবে না। তারা ঠিক-পথেই চলিবে, যদি তাদের সঙ্গে ঠিকমতো ব্যবহার করা হয়। যদি তাহাদিগকে অপমান কর, তাহাদের জাতি বা ধর্ম বা আচারকে গালি দাও, তাহারা যদি দেখে তাহাদের পক্ষে সুবিচার পাইবার আশা নাই, যদি অনুভব করে যোগ্যতা সত্ত্বেও তাহাদের স্বদেশীয় অধ্যাপকেরা অযোগ্যের কাছে মাথা হেঁট করিতে বাধ্য, তবে ক্ষণে-ক্ষণে তারা অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিবেই—যদি না করে, তবে আমরা সেটাকে লজ্জা এবং দুঃখের বিষয় বলিয়া মনে করিব। শ্রদ্ধার সঙ্গে দান করিলেই শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করা সম্ভব হয়। যেখানে সেই শ্রদ্ধার সম্পর্ক নাই, সেখানে আদান-প্রদানের সম্বন্ধ কলুষিত হইয়া উঠে।"

কবির ছেলেবেলার শিক্ষা সম্বন্ধে পাঠ করা হয়। ছেলেবেলায় তিনি স্কুল-গারদ থেকে পালিয়েছিলেন। বড় হয়েও সে দুঃখ তিনি ভুলতে পারেন নি। তাই ছাত্রদের জন্যই কবির চিরকাল বেদনা এবং ভাবনা ছিল। নিজে যে শিক্ষার মধ্যে মুক্তি পেয়েছিলেন, আনন্দ পেয়েছিলেন, সেই শিক্ষাই তিনি দিতে চেয়েছেন ছাত্রদের। সে-পরিবেশ গড়ে তুলতে তাঁর কত চিন্তা, কত প্রযত্ন। "আত্ম-পরিচয়" গ্রন্থের শেষে গুরুদেবের একখানা চিঠির পাণ্ডুলিপি ছাপা আছে। শেষ পংক্তিগুলিতে সে কথা বিশদ করে বলা হয়েছে—"সেই তিন মাস পিতৃদেবের সহিত একত্র সহবাসকালে তাঁহার নিকট হইতে ইংরাজি ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতাম এবং মুখে-মুখে জ্যোতিষ-শাস্ত্র আলোচনা ও নক্ষত্র-পরিচয়ে অনেক সময় কাটিত। এই যে স্কুলের বন্ধন ছিন্ন করিয়া মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে তিন মাস স্বাধীনতার স্বাদ

পাইয়াছিলাম ইহাতেই ফিরিয়া আসিয়া বিদ্যালয়ের সহিত আমার সংস্রব বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। এই শেষ-বয়সে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া তাহার শোধ দিতেছি, এখন আমার আর পালাইবার পথ নাই--ছাত্ররাও যাহাতে সর্বদা পালাইবার পথ না খোঁজে সেই দিকেই আমার দৃষ্টি।"

শাসন, আইন এবং আবদ্ধতার মধ্যে শিক্ষা-পাওয়া দেহমনের পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যকর নয়, এই অভিমত গুরুদেব সব-সময় ব্যক্ত করেছেন, তিনি ছাত্রদের শিক্ষা দিতে বলেছেন মুক্তির মধ্যে, আনন্দের মধ্যে. কিন্তু তার মানে ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খলতা নয়, ছাত্রদের আত্ম-শাসন। নিজের জীবনেই সে শিক্ষার পরিচয় তিনি দিয়ে গেছেন; সেই শিক্ষা-পদ্ধতি শিক্ষাক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট শিক্ষার ধারা প্রবর্তন করেছে। তার মূল্য আজ সবার উপলব্ধি হয়েছে বলেই বিশ্বভারতী জাতীয়-বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হল। সেই 'শিক্ষাদর্শ' এখন বিশেষ করেই সবার জানা এবং তাকে ঠিকমতো রূপ দেবার চেষ্টা করা দরকার।

পনেরই আগস্ট—স্বাধীনতা-দিবসের অনুষ্ঠানও রবীন্দ্র-সপ্তাহের মধ্যে পরিগণিত; তাই স্বাধীনতার অর্থ কী এবং শিক্ষা কী, সে-সব বিষয়ই নানা অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে ব্যক্ত করা হয়েছে। সকালে বুধবারের মন্দিরের অনুষ্ঠানের মধ্যে স্বাধীনতা-দিবসের উদ্বোধন হল। "ওরে নূতন যুগের ভোরে," "নাই নাই ভয়" এবং শেষে গান হল "আমার মুক্তি আলোয় আলোয়, এই আকাশে"।

অভিভাষণে ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় ধর্ম এবং স্বাধীনতার মধ্যে যে ঐক্য আছে তা বুঝিয়ে বলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা লেখা ব্যাখ্যা করেন; সে যুগে ভারতে ধর্মের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার ঢেউ যে কিরূপ জেগেছিল মহর্ষিদেবের লেখাতে সে ভাবটাই পরিস্ফুট হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের জন্মের পাঁচদিন আগে মহর্ষিদেব এ ভাষণটি দেন মন্দিরে। তার সারমর্ম বুঝিয়ে ক্ষিতিমোহনবাবু বলেন—রাজনীতির মধ্যে যেটা স্বাধীনতা, ধর্মের মধ্যে সেটা সাধনা। অন্য দেশে স্বাধীনতা মানে কারুর বা কোনো-কিছুর বশ না হওয়া। আমাদের দেশে স্বাধীনতা মানে আত্মার অধীনতা, যে আত্মা পরমাত্মা। স্বেচ্ছাচার নয়, আত্মার উপলব্ধিতে পাপ থেকে মুক্তি পেলেই প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ হয়। প্রবৃত্তির মোহ, লালসা, ঈর্ষা, দ্বেষ যে জয় করতে পেরেছে, কে তাকে পরাধীনতা-পাশে বাঁধতে পারে! আপনি তখন পরও আপন হয়ে ওঠে; মানুষ স্বার্থ-বিসর্জন দেয় এবং বৃহতের মধ্যে মানুষের স্বাধীনতা লাভ হয়। সে স্বাধীনতা কেউ হরণ করতে পারে না। মহর্ষিদেব যে-কথা লিখেছেন, হাজার-হাজার বছর আগে তেমনি কথা বলা

হয়েছে বেদের যুগে বেদ-মন্ত্রে ;—জ্যোতির্ময় আত্মার মধ্যে মুক্তিলাভ করে সমস্ত স্বার্থ-বন্ধন ছিন্ন করো, তবেই সব-রকম স্বাধীনতা লাভ হবে। চার-পাঁচশ বছর আগে মধ্যযুগের সন্ত-কবিগণও এমনি কথাই বলেছিলেন—আত্মার মধ্যে মুক্তি পেয়ে মুক্ত হয়েছি, এখন আমার ডাইনে মুক্তি, বাঁয়ে মুক্তি, আগে মুক্তি পিছে মুক্তি—এই পায়ের তলায় ধরণী আর উপরে অনন্ত আকাশ, কোথাও আমার মুক্তির অভাব নেই।

রবীন্দ্রনাথও তাঁর গানে সে-কথাই বলে গেছেন—"আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে।" আজ এই দুর্দিনের মধ্যে দিয়ে যে স্বাধীনতা আমাদের দ্বারে এসেছে, তাকে রক্ষা করতে চাই সেই ধর্মের সাধনা, যে-সাধনা স্বার্থকে জয় করবে, নীচতাকে, কুশ্রীতাকে দূর করবে, দুঃখকে বরণ ক'রেই হবে দুঃখোত্তীর্ণ। শান্তচিত্তে আমাদের সেই সাধনাকেই গ্রহণ করতে হবে স্বাধীনতা-দিবসে।

মন্দিরের অনুষ্ঠানের পর গৌরপ্রাঙ্গণে জাতীয়-পতাকা উত্তোলিত হয়। প্রাঙ্গণতলে মণ্ডলাকারে শুধু ফুল আর পাতা দিয়ে আলপনা দেওয়া হয়েছিল। মালা দিয়ে সাজানো হয়েছিল পতাকা-দণ্ড। প্রথম 'বন্দেমাতরম্' গান হয়। তারপরে শঙ্খধ্বনির সঙ্গে একটি বালক এবং একটি বালিকা পতাকা উত্তোলন করেন, সমবেত আশ্রমিকগণ সবাই নতশিরে জাতীয় পতাকাকে অভিবাদন জানান। গান হয়—"তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি"। সর্বশেষে গীত হয় জাতীয়-সংগীত—"জনগণমনঅধিনায়ক জয় হে।"

বিকাল পাঁচটাতে জাতীয়-পতাকা নামানো হয়। সন্ধ্যা সাতটায় সিংহসদনে বিনোদন-পর্বে ছিল কবির স্বদেশী-গানের জলসা। শুরুতে এই বিদ্যালয়-আশ্রমের প্রথম ছাত্র এবং বিশ্বভারতী-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বাধীনতা এবং ছাত্রদের কর্তব্য সম্বন্ধে অভিভাষণ দেন। সংক্ষেপে তিনি বলেন—শিক্ষায়তনকে মুক্তির প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে তুলতে হবে। সেখানে ছাত্রগণ নিষ্ক্রিয় থাকলে চলবে না, শিক্ষকদেরও হতে হবে সহৃদয় সচেষ্ট। প্রচলিত-পদ্ধতির গলতিতে শিক্ষিতদের সঙ্গে দেশের জনসাধারণের যে প্রাণের যোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, তাকে আবার স্থাপন করতে হবে। শিক্ষা যেন সক্রিয় হয়ে ওঠে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে লোক-চেতনায়। শিক্ষার এ আদর্শই বিশ্বভারতী-বিশ্ববিদ্যালয়ে আদর্শ। স্বাধীনতাকে ছাত্রগণ শিক্ষার স্বাধীনতা দিয়েই মর্যাদা দিতে সক্ষম হবে। ছাত্রদের কর্তব্য আত্মশাসন করে বিকাশলাভ করা এবং দ্বিতীয় প্রধান কাজ হচ্ছে পারিপার্শ্বিক

দৈনন্দিন সমস্যাকে দেখে-শুনে তার মীমাংসা করতে প্রবৃত্ত হওয়া। যেমন, আজকাল খাদ্য-সমস্যা দেশে প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে। ছাত্রগণ যদি চাষীদের কাছে গিয়ে তাদের সঙ্গে যোগস্থাপন করেন, তবে চাষীরাও উপকৃত হয়, ছাত্রগণও নানা বিষয়ে শিক্ষালাভ করে জ্ঞানবান্ হতে পারেন এবং দেশের সমস্যা মেটাতে সক্ষম হন। এমনি ভাবেই তাদের শিক্ষাকে সজীব করে তুলতে হবে বইয়ের জ্ঞানে এবং বাস্তব জ্ঞানে।

অভিভাষণের পরে রথীন্দ্রনাথ তাঁর একটি অভ্যাসের কথা বলেন। তিনি যেখানে যা ভাল কিছু পড়েন, তার থেকে অংশবিশেষ লিখে রাখেন। কোনো ইংরাজি পত্রিকাতে স্বাধীনতা-বিষয়ে একটি সুচিন্তিত লেখা পড়েছিলেন, তার এক পরিচ্ছেদ তিনি পড়ে শোনান।

এরপর আরম্ভ হয় গান। দশ-বারোটি সমবেত এবং একক গানে এই অধিবেশন সমাপ্ত হয়। "জয় হোক নব অরুণোদয়", "মোরে ডাকি লয়ে যাও মুক্ত দ্বারে", "অয়ি ভুবন-মন-মোহিনী", "ও আমার দেশের মাটি", "সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে" প্রভৃতি গানের মধ্যে দিয়ে স্বাধীনতা এবং দেশপ্রেমের যে-একটি ভাবরূপ মূর্তি ধরে উঠেছিল, সে-ভাবের প্রথম আস্বাদন পাওয়া যায় ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের "আনন্দ-মঠ" পাঠ ক'রে এবং পূর্ণতর রূপে অনুভূত হয় কবিগুরুর এইসব গানে।

সভার শেষে শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয় রবীন্দ্র-সপ্তাহের সমাপ্তি ঘোষণা করে বলেন—এবার এই আশ্রম-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হল। এবার বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম-প্রতিষ্ঠা। এই সময় গুরুদেবের "শিক্ষাদর্শ"কে ছাত্র, শিক্ষক সবার সমক্ষে প্রকাশ করাই এই রবীন্দ্র-সপ্তাহ অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল; যদি সবাই তা উপলব্ধি করে থাকেন তবেই এর সার্থকতা।

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র-স্মরণ সপ্তাহের প্রথম অধিবেশনের দিন। অন্যান্য সান্ধ্য-অনুষ্ঠান এ ক'দিন বন্ধ থাকে। এবার ১২ই আগস্ট আশ্রমের পূর্বতন আচার্য স্বর্গীয় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মতিথি পালিত হবে। সেদিন রবীন্দ্র-স্মরণ-তিথির অনুষ্ঠান বন্ধ থাকবে। ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা-উৎসবের সূচী। ১৬ই আগস্ট রবীন্দ্র-স্মরণ-সপ্তাহের শেষ অনুষ্ঠান-দিবস।

গত বছর স্মরণ-সপ্তাহের সূচী ছিল রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষা'-বিষয়ক আলোচনা। এবারকার সূচী 'ঋতু-উৎসব'; রবীন্দ্রনাথের ঋতু-উৎসবের মধ্য দিয়ে কী তাৎপর্য

প্রকাশ পেয়েছে, মানবের শিক্ষাধারার সঙ্গে তার যোগাযোগ, বিশ্ব ঋতুর সঙ্গে মানব-মনের ঐক্য ইত্যাদি বিষয়কে পাঠ, আবৃত্তি, ভাষণ এবং সংগীতের মধ্য দিয়ে রূপ দেবার চেষ্টা হবে।

প্রথম-দিনের ভাষণ দিলেন শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী। আশ্রম-উপাচার্য সভায় উপস্থিত ছিলেন।

ক্ষিতিমোহনবাবু বলেন—ভারতীয় ঋতু-উৎসব অতি প্রাচীন। ঋগ্বেদের শ্লোকে ঋতুর অতি চমৎকার-সব বর্ণনা পাওয়া যায়। বাল্মীকি-রামায়ণেই বা বর্ষার কী বর্ণনা।

সেই ব্রহ্মচর্যাশ্রমের যুগে ঋতু যে ভারতীয় শিক্ষার মধ্যে কত বড়ো স্থান অধিকার করেছিল, গুরুর প্রশ্নোত্তরেই তা জানা যায়। ছাত্রগণ ব্রহ্মচর্যাশ্রমে গেলেই গুরুগণ প্রথম জিজ্ঞাসা করতেন—

তুমি কার ছাত্র? অর্থাৎ কার কাছে শিক্ষা পাবার অভিলাষে এসেছ?

উত্তর হত—আপনার কাছ থেকে।

গুরু বলতেন—আমার নয়, ছাত্র হবে বিশ্ব-প্রকৃতির। আমার কাছে শিক্ষা পেলে তোমরা আর কতটুকু শিক্ষা পাবে?

এমনি বৃহতের কাছে বৃহৎ গণ্ডীর মধ্যে ছাত্রদের শিক্ষা মিলত।

গুরুদেব প্রকৃতির মধ্যে শিক্ষা দেওয়া শুরু করেছিলেন, কিন্তু প্রথমে ঋতু-উৎসবের শিক্ষা বা তাৎপর্যের প্রতি মনোযোগ দেননি। ১৩০৮ সাল, শিলাইদহে যাচ্ছেন, বললেন—প্রাচীন-সাহিত্যে ঋতুর বর্ণনা নেই? ঋতু-উৎসবের কী রূপ পাওয়া যায়, তাঁকে সেই ঋগ্বেদ-যজুর্বেদ থেকে শ্লোক শোনানো হল, তিনি অত্যন্ত মুগ্ধ হলেন। বললেন—অতি সুন্দর জিনিস, বর্ষার গান তো আমার অনেক আছে, আশ্রমে ঋতু-উৎসব হোক্ না। উৎসাহে বাছা-বাছা শ্লোক জড়ো করা হল—বেদ, বাল্মীকি এবং কালিদাস থেকে। কিন্তু গুরুদেব শিলাইদহে। ফেরবার অপেক্ষা করা গেল। বর্ষা পেরিয়ে ভাদ্রে শরতের ছোঁয়া লাগল; অপেক্ষাও আর অপেক্ষা মানে না। অগত্যা কবিকে বাদ দিয়েই আশ্রমে বর্ষা ঋতু-উৎসব অনুষ্ঠিত হল। আশ্রমে কোথায় তখন কলাভবন, কোথায় বা এত সাজসজ্জার ধুম। মেয়েরাও ছিলেন না, শুধু ছেলের দল মিলে উৎসব। বিদ্যাভবন অর্থাৎ আজকালকার লাইব্রেরির পিছনের দিকে ছোটো একটু জায়গা;—ছেলেরাই নিজেদের হাতে মাটির বেদী তৈরি করলে, তালপাতা দিয়ে সাজালে, কিন্তু সেকালে যেমন আশ্রম-বালকগণ নীল কাপড়ে নীবীবন্ধ পরত, তেমনি সাজ হল সবার। দিনেন্দ্রনাথ, অজিত চক্রবর্তী এঁরা রয়েছেন। দিনেন্দ্র-

নাথের সেই মেঘমন্দ্রিত গলা, রবীন্দ্র-সংগীত গাইলেন, একার গলাতেই যেন পাঞ্চজন্য বাজছে। রবীন্দ্রনাথ আবার বাল্মীকির বর্ষা-বন্দনা, "আস্থাদ……………………" শ্লোকে স্বর দিয়ে গিয়েছিলেন। সে-গান হল; যজুর্বেদ, বাল্মীকি, কালিদাস রবীন্দ্রনাথ থেকে পাঠ আর আবৃত্তি হল; রবীন্দ্রনাথের বর্ষার গান হল; অজিত চক্রবর্তী ইংরাজি থেকে বর্ষা-বর্ণনাও কিছু পড়লেন। ঘরোয়া ছোটো-খাটো উৎসব; কিন্তু চমৎকার লাগল সবার। বাইরের কেউ জানে না, সেই ১৩০৮ সালে আধুনিক ভারতে এই আশ্রমে প্রথম প্রাচীন-ভারতের ঋতু-উৎসবের আনন্দ পরিবেশিত হল। গুরুদেবকে চিঠিতে জানালেন দিনেন্দ্রনাথ। তা জেনে গুরুদেব অত্যন্ত খুসী। আশ্বিনে ফিরলেন আশ্রমে। চারদিকে কাশের ঝালর-দোলায়, শিউলি ঝরে-পড়ায়, সোনার রোদে শরত ঝলমল করছে। গুরুদেব এসে বললেন—প্রাচীন সাহিত্যে শরত-ঋতুর বর্ণনা নেই? নিশ্চয় আছে। শোনানো হল তাঁকে।

গুরুদেব বললেন—করো তোমরা শরতবরণ, গান দিচ্ছি। অনেকগুলি গান। সবাই ভাবছে, শুধু কেবল গান? (নাচ তখনো অজানা), একটা নাটক হলে উৎসবটা জমত ভালো। ছেলেরা গিয়ে ধরল। গুরুদেব বললেন—এবার তো সে হচ্ছে না। গান দিয়েই ঋতু-উৎসব করো। ছেলেরা বলে—ছাড়ব না, নাটক চাই।

তারপরে একদিন এক-ব্যাপার। রোজ গুরুদেব প্রত্যূষে বেড়াতে বেরোন, আমরা দেখি। সেদিন তাঁকে দেখিনে, ঘর থেকে বেরোন নি, কাছে যাওয়াও নিষেধ। কী ব্যাপার! অসুখ হল, না মন খারাপ—কিছু বুঝিনে। তাঁর পরিচারক উমাচরণ; বলি—কী হল আজ?

—লিখছেন। তা রোজই তো লেখেন, এ তো তাঁর নতুন নয়। বেড়ানো তো বাদ যায় না, কারু প্রবেশ নিষেধ হয় না। সারাটা দিন গেল, সন্ধ্যা হল; সেই একদিনেই লিখে ফেললেন 'শারদোৎসব' নাটক। শরতের আলাদা গানগুলিকে সব তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। "শারদোৎসবে"র অভিনয় হল। কলকাতা থেকেও লোক এলেন দেখতে। চমৎকার,—বলে গেল।

সেই যে ঋতু-উৎসব এবং ঋতু-নাট্যের আরম্ভ হল, রবীন্দ্রনাথের একটা ধারাই সে-থেকে গেল খুলে। ঋতু-উৎসবের মধ্য দিয়ে যে মানুষের কতবড় একটা শিক্ষার জিনিস আছে, কত নিগূঢ় আনন্দ অনুভব করবার আছে, তাই প্রকাশ করে গেলেন রবীন্দ্রনাথ।

আমরা যেন তীর্থযাত্রী, বিশ্বপ্রকৃতিকে জানবার জন্য তীর্থযাত্রা করেছি জ্ঞানের

মধ্য দিয়ে। আমরা কেবল ছুটাছুটি করি, ব্যতিব্যস্ত হই। আর আমাদের ঘরের দোরে প্রাণের দোরে এসে উপস্থিত হয় বিশ্বপ্রকৃতি নিজে, তার প্রেমের তীর্থযাত্রায়। ভারতীয় ঋতু-উৎসব এবং রবীন্দ্রনাথের ঋতু-উৎসবের ধারার তাৎপর্যের বিশদ্ আলোচনা করলে বোঝা যায়, কত সুন্দর এবং কত প্রশস্ত একটা আনন্দময় জ্ঞান ও প্রেমের মিলনক্ষেত্র খুলে দেওয়া হয়েছে আমাদের সামনে, সেই ধারার যোগে আমাদের জীবনের পরিপূর্ণতা।

এই ভাষণের পরেই রবীন্দ্রনাথের "পারবি নে কি যোগ দিতে এই ছন্দে রে" গানটি দিয়ে এদিনকার কার্যসূচী আরম্ভ হল। উপাচার্য মশায় গুরুদেবের একটি ঋতু-বিষয়ক ইংরাজি প্রবন্ধ পড়েন। রবীন্দ্রনাথের গদ্য-পদ্যের সুনির্বাচিত অংশ-বিশেষ আবৃত্তি ও গান প্রভৃতির মধ্য দিয়ে সন্ধ্যাটি উপভোগ্য হয়েছিল। ১২।৮।১৯৫২

হিমের রাতে হেমন্ত-লক্ষ্মী ধূমেল রঙের আবেশ মাখা, তারই মধ্যে বসন্তের আমেজ নিয়ে আসে পূর্ণশশী; ঘুমহারা নাম-না জানা পাখির ডাকে কার মধুর স্মরণ এনে দেয় কবিচিত্তে, কিন্তু তবু কাব্যের আবেগ তেমন জেগে ওঠে না। হেমন্তের শীর্ণ নদীর মতোই কাব্যের বেগ মন্থর হয়ে আসত কবির অন্তরে। 'রবীন্দ্র-সপ্তাহ' উপলক্ষে ১২ই আগস্ট 'রবীন্দ্রনাথ ও হেমন্ত ঋতু" নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বক্তাদের একজন বললেন—

"আজ রচনাবলী ঘাঁটিতে-ঘাঁটিতে দেখলাম, হেমন্তের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের রচনা অত্যন্ত অল্প। তারপরে শীতের রচনা; গ্রীষ্ম ও শরৎ সম্বন্ধে তবু কিছু চোখে পড়ে। বসন্ত সম্বন্ধে রচনা এদের দু'তিন গুণ বেশি। বর্ষার কবি রবীন্দ্রনাথ—বর্ষার কাব্য-গান-ছড়ার অজস্রতায় একেবারে ডালি ভরে দিয়ে গেছেন। বসন্তের রচনা থেকে পাঁচ-সাত গুণ বেশি তার সংখ্যা।

রবীন্দ্রনাথ নিজেই ঋতু-অনুযায়ী ছেলেদের শিক্ষা দেওয়ার সম্বন্ধে এক জায়গায় বলেছেন, যে, সব-ঋতুতে ছেলেমেয়েদের সমান রকমের পড়বার উৎসাহ এবং মনোযোগ থাকে না। ঋতুর সঙ্গে মনের বিশেষ যোগ আছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্য রচনার কাজেও ঋতুর বিশেষ প্রভাব দেখা যায়। হেমন্তে নদীর স্রোত শুকিয়ে আসে, শীতের আমেজ লাগে, একটা ভাঁটার ভাব আসে মনে। এ সময় কবির কাব্য-সৃষ্টিতেও লাগত মন্দা। এ ঋতুতে বেশি লিখতেন ধর্ম রাজনীতি প্রভৃতি নিয়ে প্রবন্ধাদি। গানের সৃষ্টি জাগত না। শীতের তীব্রতায় সামান্য উত্তেজনা পেতেন, শীত নিয়ে কিছু লিখেছেন, কিন্তু খুব বেশী নয়। শীতের পরেই সমস্ত প্রকৃতি

বসন্তের নবীন আবেগ নিয়ে এসে উপস্থিত হয়। আমাদের দেশে বসন্তের অপূর্ব মোহন রূপ এবং উন্মাদনা তেমনভাবে উপভোগ করতে পারিনে বরফ-পড়া শীতের দেশে বসন্ত যেমনভাবে উপভোগ করা যায়। তবু আমাদের দেশে বসন্তকে বলা হয়েছে ঋতুরাজ; দোল, বসন্তোৎসব এবং বাসন্তী পূজার আনন্দের মধ্যে তাকে উপভোগ করবার আয়োজন হয়েছে। কিন্তু দিনে-দিনে বসন্ত-ঋতু আমাদের দেশ থেকে বিদায় নিচ্ছে। আজকাল দিন-পনেরোও বসন্তকে ঠিকমতো পাওয়া যায় না, আরম্ভ হয়ে যায় অগ্নিতাপ-দগ্ধ গ্রীষ্ম। দেহ ক্লান্ত করে, মনের স্থৈর্য করে নষ্ট। এর পরে যখন আসে বর্ষা, তার মেঘ-স্নিগ্ধ শ্যামলতা আমাদের দেহ-মনে অপূর্ব আনন্দের আবেগ এনে দেয়। বর্ষাই আমাদের দেশে স্থায়ী ঋতু। রবীন্দ্রনাথ এ ঋতুতেই সবচেয়ে বেশি উদ্দীপনা পেতেন।

১ই আগস্ট। শীত-ঋতু ও রবীন্দ্রনাথ নিয়ে আলোচনা করবার দিন ছিল। ডঃ সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য রবীন্দ্রনাথ, কালিদাস এবং ঋতু নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করেন।

১৩ই আগস্ট। এবারকার রবীন্দ্র-সপ্তাহের আজ শেষ দিন। এদিনকার সভানেত্রী হবার কথা ছিল ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর। অসুস্থতাবশতঃ তিনি সভায় আসতে পারেননি। তাঁর একটি লেখা সভায় পাঠ করা হয়। তাতে তিনি বলেন—"রবীন্দ্রনাথ ও ঋতু" নিয়ে আলোচনা দ্বারা রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির একটা বিশেষ দিক দেখানো যায়। ভাষার ছন্দে কবি অতি নিপুণ অতি সুন্দর রেখার ছবি এঁকে রেখে গেছেন। প্রত্যেকটি ঋতু শুধু নয়, প্রত্যেক মাস নিয়েই রবীন্দ্রনাথের রচনায় ছবি পাওয়া যায়। অনেক দিন থেকে আমার ইচ্ছে ছিল, রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও গান থেকে ঋতুর বিশেষ-বিশেষ অংশ নিয়ে তাদের ফুটিয়ে তুলে ছবি এঁকে একটি বই করার। সরলা দেবী আমাকে "ভারতী"তে রবীন্দ্রনাথের ঋতু-সম্বন্ধে কিছু লিখতে বলেছিলেন। সে সময়ে আমি এ নিয়ে লিখেছিলাম। এরপরে আমি একবার শান্তিনিকেতনে আসি, "রবীন্দ্র-পরিচয়-সভা"র থেকে আমাকে কিছু লিখতে বলা হয়েছিল। ঋতু সম্বন্ধেই আমি খুব বড় একটা প্রবন্ধ লিখি। অবনীন্দ্রনাথের নাতনী পূর্ণিমাকে দিয়ে অনেকগুলি ছবিও আঁকিয়েছিলাম।

এরপরে অন্য-একজন বক্তার ভাষণে শোনা গেল এইরূপ,—আজকের সভার "বসন্ত জাগ্রত দ্বারে", "দক্ষিণ দুয়ার খোলা" প্রভৃতি গান এবং নানা রকম গদ্য-পদ্য পাঠের মধ্য দিয়ে বসন্ত-ঋতুর উন্মাদনার দিকটাই যে শুধু উপলব্ধি করা গেল তা নয়, কেবল বসন্তের মোহন রূপটিই নয়, উপলব্ধি হল, বসন্তের আরেকটি গভীর দিকও রবীন্দ্রনাথের কাব্যে, গানে ফুটে উঠেছে,—সে হচ্ছে বসন্তের নিরাভরণ তাপসের

ভাব। কুমারসম্ভবে কালিদাস গৌরীর ফুলের সাজ-খুলে-ফেলা যেই তাপসী-মূর্তি এঁকেছেন, সেই রূপটি বসন্তের ভিতরে দেখেছেন রবীন্দ্রনাথ।—

বসন্তে কি শুধুই ফোটা ফুলের মেলা রে,
দেখিস্‌নে কি শুকনো পাতা
ঝরা ফুলের খেলা রে।

বসন্তের মোহন এবং করুণ—এই দুই রূপ সবচেয়ে সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে 'চিত্রাঙ্গদা'-কাব্যে।

ফাল্গুনের মধ্যে যৌবনের যে উচ্ছ্বাস তাতেই তার পূর্ণতা মেলে না। তার ভিতরে-ভিতরে সাজহীন পূর্ণতার সাধনা চলতে থাকে এবং সে পূর্ণতা মেলে বর্ষা ঋতুতে—

বহুদিন হল কোন্‌ ফাল্গুনে
ছিনু আমি তব ভরসায়
এলে তুমি নব-বরষায়।

এমনি ভাবে ফুল, ফল, পাতা, আলো, হাওয়া আমাদের বহিরিন্দ্রিয়কে রূপ-রস-স্পর্শ শব্দ দ্বারা চঞ্চল করে, আনন্দিত করে। প্রকৃতির সঙ্গে এটা বাইরের যোগ। এই সময়ে বলতে হয়—"আমার প্রাণের উপর দিয়ে চলে গেল কে
বসন্তের এই বাতাসটুকুর মতো"

প্রকৃতির সঙ্গে অন্তরঙ্গ হওয়া মানে তার বৈচিত্র্যটিকে জানা, মা যেমন করে জানে ছেলেকে, দূরে গেলেও বলতে পারে তার বিশেষত্ব, তার প্রতিটি ভাবান্তর। প্রকৃতির সঙ্গে সেই অন্তরঙ্গ যোগ ঘটলেই আমাদের মন বলে ওঠে—"শরত তপনে প্রভাত স্বপনে কী জানি পরান কী যে চায়।"—প্রকৃতির প্রতি-ঋতুতে উদাস-করা ভাবটি, তার চঞ্চল-করা আনন্দটি,—প্রকৃতির প্রত্যেকটি বেদনা তখন মনের তারে বাজতে থাকে। এইভাবে বিশ্বপ্রকৃতি এসে স্থান নেয় মানুষের অন্তর-প্রকৃতিতে, একটা ঐক্য দেখা দেয়। এই ঐক্যবোধের থেকেই মানুষের অনুভূতি আরো উচ্চস্তরে গিয়ে পৌছয়। তখন শুধু বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানব-প্রকৃতি নয়, সমস্ত বিশ্বজগতের সঙ্গে সমস্ত মানব-প্রকৃতি এবং বিশ্বপ্রকৃতি এক হয়ে মিলে যায়। তখন তুমি নয়, আমি নয়, বিশ্বসৃষ্টির বৃহৎ ঐক্যের মধ্যে সবাই লীন হয়ে একটি ভৈরবী সুরের নৃত্য চলতে থাকে, তখনই দেবলোকের বৃহত্তর আসরে মানুষের আসন হয় পাতা। জগতের মাঝে কত বিচিত্ররূপিণী যিনি, তিনি এসে অন্তর মাঝে একটি আসন নেন; তারপরে "বলাকা'র শা-জাহান কবিতার পথ

বেয়ে উপলব্ধি গিয়ে মিলে "পূরবী"র সৃষ্টির আদিম প্রাণনিকেতনে 'সাবিত্রী' কবিতার সুরে। তখন সেই 'সবিতা'র সৃষ্টির সঙ্গে সৃষ্টি এবং স্রষ্টা এক হয়ে গেছে।

রবীন্দ্রনাথের এই অনুভূতির সত্য সব-সময় আমরা অনুভব করতে পারি নে। কাব্য পড়তে পড়তে কখনো মনে হয় এ কেবল কবিরই অনুভূতি। কিন্তু যখন ঠিক প্রকৃতির এক-একটি বিশেষ বৈচিত্র্যের মধ্যে আমরা নিজেকে অনুভব করি, তখনই মুহূর্তে বুঝতে পারি কবির অনুভূতি কত সত্য। সেদিন মনে হয়েছিল সারা জীবন কাব্য পড়েও যেন রবীন্দ্রনাথকে ভালো বুঝিনি, সেই এক-মুহূর্তের অনুভূতিতে তাঁকে যতটা বুঝেছি। ২৪।৮।১৯৫২

মেঘমুক্ত আকাশ। প্রশান্ত গম্ভীর পরিবেশ। অতি-প্রত্যূষে বৈতালিক-গানে স্মরণীয় দিনটিকে বরণ করা হল—"দুঃখ আমার অসীম পাথার পার হল গো পার হল।"

সকাল সাড়ে-সাতটার সময় আশ্রমবাসী এবং আগত অতিথিবৃন্দ মন্দিরে সমাগত ;—শ্রাদ্ধবাসর। তারের যন্ত্র-বাঁধার ঝংকার, আমলকী-বীথির লাল কাঁকরের রাস্তা বেয়ে চারদিক থেকে স্তব্ধ-সাগ্রহ জনতার অবিচ্ছিন্ন আগমন। মন্দির থেকে থালায় পুষ্প-অর্ঘ্য নিয়ে শঙ্খ বাজাতে বাজাতে উত্তরায়ণে তা রেখে আসা হল। ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় শ্রাদ্ধ-বাসর অর্থাৎ "তিরোহিতের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন" করলেন। বললেন—গুরুদেব বারবার বলতেন, আমার শ্রাদ্ধ-বাসরের এই যেন হয় মন্ত্র: মধুবাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধব। এই সুন্দর মন্ত্রোচ্চারণ করার চেয়ে শ্রাদ্ধ-বাসরে শ্রদ্ধা নিবেদনের উপযুক্ত মন্ত্র কী হতে পারে? জীবন মৃত্যু এবং জগত-সংসারের সমগ্রকে যুক্ত করে দেখাই—মহাপুরুষদের কাজ। রামমোহন রায় যে বৃহৎ কাজ অসমাপ্ত রেখে গিয়েছিলেন, তাই বৃহৎভাবে সম্পন্ন করলেন গুরুদেব। তিনি ধর্ম সাহিত্য রাজনীতি শিল্প সৌন্দর্য জীবন এবং মৃত্যু সমস্তকে যুক্ত করে দেখে মহান আনন্দ উপলব্ধি করেছেন এবং সবার জন্য দান করে গেছেন। গুরুদেব রাজনীতি-প্রসঙ্গে বলতেন—"যাকে আমি ভালোবাসি তাকে সমগ্ররূপে দেখেই আনন্দ পাই। তার একখানা কাটা-হাত এনে সামনে ধরলে আমার মন শিহরিত হবে না কি? তেমনি রাজনীতিকে যদি ধর্ম সাহিত্য জীবন—সব থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখি তবে সেও আমার কাছে অমনি বোধ হয়। সমস্ত ছিন্ন তথ্যকে যুক্ত করে দেখাই জীবনের সত্য লাভ করা।" "সম্মুখে শান্তি পারাবার" এবং আরো চার-পাঁচটি গান হল মন্দিরে। মন্দির থেকে বেরিয়ে সকলে মিলে "আগুনের পরশমণি" গান গেয়ে ছাতিমতলা প্রদক্ষিণ করা হল।

তারপরে সেই গান গেয়েই উত্তরায়ণে উদয়নের সামনে গিয়ে গুরুদেবের উদ্দেশ্যে প্রণতি জানিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষ হল।

এইদিনই বিকাল সাড়ে চারটের সময় এণ্ড্রুজ মেমোরিয়েল-হলের সামনের প্রাঙ্গণে বৃক্ষ-রোপণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বন-মহোৎসবের সময়ও ডাকঘরের সম্মুখে বৃক্ষরোপণ হয়েছিল। কিন্তু এদিনের বৃক্ষ-রোপণ আশ্রমের বাৎসরিক উৎসব। গুরুদেবের বর্তমানে, এ-উৎসব 'বর্ষামঙ্গল এবং বৃক্ষরোপণ উৎসব' নামে অনুষ্ঠিত হত। আষাঢ়ের শেষ-সপ্তাহের দিকে গ্রীষ্মের ছুটি শেষে আশ্রম তখন সবে খুলত। কিন্তু এখন গ্রীষ্মের ছুটির পরে আশ্রমের বড়ো অনুষ্ঠান গুরুদেবের মৃত্যুদিন। মন্দিরে সকালে শ্রাদ্ধ-বাসর, বিকেলে বৃক্ষরোপণ। মৃত্যুর দিনে এটুকু আনন্দের অনুষ্ঠান গুরুদেবেরই স্মরণে। তাঁরই গানে জীবন-লীলার মূল কথা নিহিত:

আছে দুঃখ আছে মৃত্যু বিরহ-দহন লাগে।
তবুও শান্তি তবু আনন্দ তবু অনন্ত জাগে।

তাঁর মৃত্যুদিনের তাৎপর্য এইখানে।

বৃক্ষরোপণে বৃক্ষ-শিশুকে পঞ্চভূতের বরে করা হয় সমর্পণ। পাঁচটি মানব-শিশু ফুলের সাজে সজ্জিত হয়ে বসে; তারা সাজে যথাক্রমে ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম। পঞ্চভূতের সম্বন্ধে সংস্কৃত বৈদিক মন্ত্রের অনুবাদ আছে গুরুদেবের রচিত পদ্যে। পাঁচজন বড়ো ছেলেমেয়ে তাই আবৃত্তি করে। তারপর পাঁচটি আমলকি কৃষ্ণচূড়া প্রভৃতি বৃক্ষ-শিশুকে বহন করে এনে রোপণ করা হয়। শ্রীক্ষিতিমোহন সেন বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণে তাদের জল-সিঞ্চন করে দিলেন। "আয় আমাদের অঙ্গনে, অতিথি-বালক তরুণদল" গানটি গীত হয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হল।

সন্ধ্যাবেলা আর-কোনো অনুষ্ঠান হয় না। তখন উত্তরায়ণে হয় গুরুদেবের পারিবারিক শ্রদ্ধা-নিবেদন। গৃহকোণে অপ্রকাশ্য অনুষ্ঠান। ভাগবৎ উপনিষৎ পাঠ, তারই সঙ্গে গুরুদেবের রচিত গান বা ব্রহ্মসংগীত গীত হয়।

সন্ধ্যার সময় একটু ঝিরিঝিরি বৃষ্টি হয়ে ২২শে শ্রাবণের বারিপাত অক্ষুণ্ণ রেখেছে। রাত্রি সাড়ে-নটাতে শ্রাদ্ধ-বাসরের মন্দিরের অনুষ্ঠানটি রেডিয়োতে এখান থেকে রীলে করা হল।

২২শে শ্রাবণ অর্থাৎ ৭ই আগস্ট থেকে ১৪ই আগস্ট অবধি চলে রবীন্দ্র-সপ্তাহ উদ্‌যাপন। প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলা সিংহসদনে এক-একজন গুরুদেবের সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ বা আলোচনা করেন।

একদিন যাঁরা এসেছিলেন এ জগতে, আর-একদিন যাঁরা গেলেন চলে, তাঁদের

সঙ্গে মানুষ বিচ্ছেদ ঘটতে দেয়নি। প্রতিদিনের নানাকাজের ভিড়ে মানুষকে ব্যস্ত থাকতে হয়, বিগতদের স্মৃতি তাঁদের চলার পথে বাধা সৃষ্টি করে থাকেনি, কিন্তু মানুষ বিস্মৃতির কবল থেকে একটি দিনকে বাঁচিয়ে রাখে, বিগতদের বিশেষভাবে স্মরণ করে—সেই দিনটি মৃত্যু-বার্ষিকী—মৃত্যুকে অস্বীকার ক'রে জীবনের প্রেম-জীবনের চির অমরতার জয় ঘোষণা করা। বাইশে-শ্রাবণ একদিন এসেছিল, রবীন্দ্রনাথের মতো প্রতিভাকেও তা করেছিল বিলুপ্ত; কিন্তু মানুষেরই গৌরবের দীপ্তিতে মানুষের জীবনে চিরস্মরণীয় হয়ে রইল বাইশে-শ্রাবণ।—গুরুগুরু শ্রাবণদেয়ার গর্জনে প্রিয় কবির স্মৃতি নিকটতম হয়ে ওঠে। প্রতিবারের মতো এবারেও তেমনি বাইশে-শ্রাবণে শান্তিনিকেতনের মন্দিরে আগন্তুক জনতা এবং আশ্রমবাসী শ্রদ্ধান্বিতচিত্তে এসে বসলেন। ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় শান্তগম্ভীর কণ্ঠে বললেন—বারো বছর আগে রবীন্দ্রনাথ আমাদের মধ্যে থেকে তিরোধান করেছেন। সে তিরোধান মানে দূরে সরে যাওয়া নয়, সে বিচ্ছেদ তাঁকে আমাদের ঘনিষ্ঠতর করেছে—সে যোগ শ্রদ্ধায়, সে যোগ স্মরণতর্পণে। কাছে থাকতে তাঁর যে মূল্য তাঁকে দিতে পারিনি, যে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে পারিনি, আজ আমরা তাঁকে সে মূল্য যেন দিতে পারি, সে শ্রদ্ধা একান্ত ভক্তিভরে তাঁকে যেন অর্পণ করতে পারি। প্রভাতে তাঁকে শ্রদ্ধা অর্পণ করব, মধ্যাহ্নে তাঁকে শ্রদ্ধা অর্পণ করব, সন্ধ্যায় তাঁকে শ্রদ্ধা অর্পণ করব। সেই শ্রদ্ধা অর্পণই হচ্ছে বিগত লোক ও কালের সঙ্গে যোগ স্থাপন। এর পরে ঋগ্বেদের শ্লোক পড়ে তিনি পারলৌকিক ক্রিয়া সমাপন করলেন। সেদিন গানে-গানেও শোনা গেল,—অসীমের মধ্যে মনপ্রাণ নিয়ে যতদূর যাওয়া যাক্‌, কোথাও দুঃখ নেই, মৃত্যু নেই, বিচ্ছেদ নেই। অপূর্ণ মানুষ তার দুঃখ বেদনা-বিচ্ছেদভারে কাতর হয়ে থাকে, কিন্তু পূর্ণের মধ্যে সব বিরাজ করছে। এ জগতে দুঃখ আছে, মৃত্যু আছে, শান্তি আছে, আনন্দ আছে। তরঙ্গের পর তরঙ্গ উঠছে-পড়ছে, তবু প্রাণ বেয়ে চলছে নিত্যধারায়, তার আর বিরাম নেই। এই জীবন-লীলার শেষে অজানার মধ্যে কোন্‌ ভরসায় পাড়ি দেবে? চিরবিশ্বাসের ধ্রুবতারকা জ্বলছে, এইমাত্র তার সম্বল। এইদিন বিকালে সাঁওতাল-পাড়ার মাঠে বৃক্ষরোপণ-উৎসব ছিল। বিকেল হতে-না-হতে প্রবল বর্ষণ শুরু হল। তারই মধ্যে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হল বৃক্ষ-শিশুর।

সকালে শ্রীনিকেতনে পশ্চিমবঙ্গের পুনর্বাসন-মন্ত্রী রেণুকা শ্রীযুক্তা রায় হলকর্ষণ উৎসবের উদ্বোধন করেন। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন,—বর্তমানে কৃষিবিদ্যার খুবই প্রয়োজন। শুধু কৃষি নয়, হাতে-কলমে যাবতীয় শিক্ষা গ্রহণ করা

প্রত্যেক দেশবাসীর কর্তব্য। শিক্ষার সেইরকম একটি প্রতিষ্ঠান শ্রীনিকেতন। গুরুদেবের প্রতিষ্ঠিত এই জায়গায় এসে আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি। কৃষি কিভাবে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখছে তা আমাদের জানতে হবে, বুঝতে হবে। কৃষিকে বাঁচিয়ে রাখাই এখন প্রধান কাজ।

সেদিন সন্ধ্যায় বিনোদনপর্বে রবীন্দ্র-সপ্তাহের প্রথম অধিবেশন হল। প্রত্যেক বছর শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মশায় প্রথম ভাষণদান করেন। এবারে পারিবারিক একটি দুর্ঘটনার দরুন তিনি উপস্থিত থাকতে পারেন নি। বিশ্বভারতী কর্মি-মণ্ডলীর সম্পাদক এবং রবীন্দ্র-সপ্তাহের আহ্বায়ক শ্রীঅমিয়কুমার সেন মুখবন্ধে বলেন,—এবার রবীন্দ্র-সপ্তাহে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন সাধনার ধারার—ধর্ম, শিক্ষা, সমাজ, সাহিত্য প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা হবে। প্রথমদিন ধর্ম-সাধনার আলোচনা এবং সমস্ত সাধনার মোটামুটি পরিচয়টি পাওয়া যাবে। অতঃপর শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর—'My father as I saw him' নামক একটি ইংরাজি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তার মধ্যে রবীন্দ্র-প্রতিভার বিচিত্র পরিচয়, তাঁর ব্যক্তিগত স্বভাব এবং অভিরুচির কথা, এই আশ্রম গড়ে-ওঠবার ইতিহাস প্রভৃতি অনেক বিষয় বিবৃত করেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার স্বরূপটি তাতে বোঝা যায়। তারপরে বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রী ও কর্মিগণ গুরুদেবের ইংরাজি, বাংলা প্রবন্ধ ও কবিতা পাঠ করেন। উপসংহারে প্রবোধ সেন মশায় সংক্ষেপে রবীন্দ্রনাথের সাধনার মূল কথাটি বলেন। তার মর্ম এইরূপ,—ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল থেকে দুটি ভাবধারা বয়ে চলেছিল। উপনিষদে বলা হয়েছে—এ জগতের জন্ম আনন্দ থেকে, আনন্দে সে বিধৃত, আনন্দেই তার বিলয়। আনন্দাদ্ধেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। কিন্তু জগতে দুঃখ অত্যন্ত বেশি, খাওয়া-পরা, রোগ-শোক-মৃত্যু—কত আঘাত-সংঘাতে মানুষ জর্জরিত। পরবর্তী-কালে তাই আরেকটি ভাবধারা দেখা দিল—দুঃখবাদ। জীবন দুঃখময়, এ দুঃখের হাত থেকে মানুষ মুক্তিলাভ করতে চাইল। এ জগতে দুঃখের হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। তাই মানুষ পরলোকের দিকে দৃষ্টি ফেরালে। চাইলে মুক্তি, নির্বাণ। শুধু বৌদ্ধধর্ম নয়, তখনকার দিনের সব ধর্মচিন্তাই পরলোকের দিকে মুখ ফিরিয়ে ছিল। দু-হাজার বছর ধরে ভারতবাসী এই ভাবনা নিয়েই কাটিয়ে দিল। তাতে যে দুঃখ কিছু দূর হয়েছিল তা নয়, বরঞ্চ দুঃখের মাত্রা বেড়েই গিয়েছিল। জীবনের উন্নতির দিকে লক্ষ্য ছিল না, ভারতবাসী পরলোক নিয়ে ব্যস্ত ছিল। এই ভাবধারার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ প্রথম আনলেন আরেকটি নূতন ভাবধারা। তিনি ভারতবাসীর দৃষ্টি ফেরালেন ইহলোকের দিকে, বললেন—জীবনে দুঃখও আছে, আনন্দও

আছে, দুই নিয়েই সে পূর্ণ। দুঃখের সঙ্গে আনন্দের বিরোধ নেই, দুঃখের বিপরীত হচ্ছে সুখ: জীবনে পরিপূর্ণ আনন্দের লীলা চলছে, এই লীলার বিস্ময় তাঁর কখনো ঘোচেনি। কত দেখেছেন, কত অনুভব করেছেন, তবু সব-কিছুই ছিল তাঁর কাছে চিরনূতন। তিনি বাইশ বছর বয়সে বললেন—

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই॥

তারই সঙ্গে বললেন—সর্বাঙ্গীণ পূর্ণ মনুষ্যত্বের কথা। শিক্ষায়, ধর্মে, সমাজে, রাষ্ট্রে—সব দিকের সব জ্ঞান আহরণ করে পূর্ণ শক্তিলাভ ক'রে মানুষ এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকবে, জীবনের দুঃখ আনন্দকে সমভাবে উপভোগ করবে—এই হবে মানুষের সাধনা। রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র সাধনার মূল কথাটিও এই।

সভায় শেষ গানটি হল—

প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে মোরে
আরো দাও প্রাণ।

এই প্রাণের বাণী বহন করে এনেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তাই দান করে গেছেন সকলের মধ্যে। ১২।৮।১৯৫৩

৯ই আগস্ট। রবীন্দ্র-সপ্তাহের দ্বিতীয় দিন। প্রথম দিনের আলোচনার বিষয় ছিল—রবীন্দ্রনাথের জীবন-সাধনা; দ্বিতীয় দিন—শিক্ষার সাধনা। ভাষণে অধ্যাপক শ্রীসুনীলচন্দ্র সরকার বলেন,—রবীন্দ্রনাথের একটা সাধনা থেকে আরেকটা সাধনাকে আলাদা করা যায় না। তাঁর জীবন-সাধনার মধ্যেই শিক্ষা-সাধনা, কর্ম-সাধনা প্রভৃতি রয়েছে; প্রত্যেকটির সঙ্গে প্রত্যেকটি আবার ঐক্যসূত্রে গাঁথা। রবীন্দ্রনাথ পূর্ণাঙ্গ মানুষ। তিনি শিক্ষাবিদ্ রাজনীতিবিদ্, তিনি কবি, তিনি দার্শনিক, উচ্চ গুণাবলীর কোন্‌টি যে তিনি জীবনে সাধনা করেননি এবং তাতে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেননি তা বলা কঠিন। রবীন্দ্র-নাথের আগে যাঁরা শিক্ষাবিদ্ জন্মেছিলেন তাঁরা কেবল শিক্ষাবিদ্‌ই ছিলেন বা রাজনীতি যাঁরা করেছেন, তাঁরা রাজনীতিবিদ্‌ই ছিলেন। অর্থাৎ তাঁরা কেবল বিশেষ একটি দিকের চর্চাই করেছেন বা এখনো তাই করে থাকেন। রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর সর্বতোমুখী প্রতিভা নিয়ে শিক্ষাচর্চার দিকে মন দিলেন তখন নিশ্চয় তাঁর স্বকীয় কিছু দেবার ছিল। জগতে অনেক রকম শিক্ষাধারা প্রচলিত আছে, তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ কী দান করলেন, নূতন কিছু শিক্ষাপদ্ধতি তাঁর শিক্ষাধারার মধ্যে পাওয়া যায় কী না,—এ সব প্রশ্ন আমাদের

মনে উঠবে বা উঠছে এবং এর উত্তরও আমাদেরই খুঁজে বের করতে হবে।

প্রাচীনকাল থেকে প্রাচ্যে এক-রকমের শিক্ষাধারার প্রচলন ছিল, পাশ্চাত্ত্যে আর-এক রকমের। পাশ্চাত্ত্যে গ্রাসে এ্যারিস্টটলের শিক্ষাপদ্ধতি দু'রকম ছিল—একটি Practical Reasoning অর্থাৎ জাগতিক শিক্ষা। এই পৃথিবীতে জীবনধারণের জন্য যে-যে বিষয় জানা দরকার, শেখা দরকার, Practical Reasoning-এর শিক্ষায় তারই চর্চা করা হয়। আরেকটি শিক্ষারীতি ছিল, যাকে তিনি বলেছেন Contemplation-এর শিক্ষা, অনেকটা আমাদের দেশের ধ্যান-ধারণার মতো, যাতে মানসিক উৎকর্ষ লাভ করা যায়। এ শিক্ষা নৈর্ব্যক্তিক, বিস্তৃততর;—বিশ্বজগতের সঙ্গে মিলন-সাধনের শিক্ষা। এ্যারিস্টটলের Practical Reasoning শিক্ষাধারাই পাশ্চাত্ত্যে প্রভাব বিস্তার করেছে বেশী। আমাদের দেশের শিক্ষাধারা এবং এ্যারিস্টটলের আরেকটি শিক্ষাধারা ও-দেশ গ্রহণ করেনি।

এ্যারিস্টটল ছাড়াও অনেক বড়ো-বড়ো শিক্ষাবিদ্ পাশ্চাত্ত্যে জন্মগ্রহণ করেছেন, অনেক শিক্ষাপদ্ধতি জগতে প্রচলিত আছে। তার মধ্যে বিশেষ একটি হচ্ছে—The idea of growth, একে বলা যায় স্বয়ং-শিক্ষাপদ্ধতি। বাইরের অনুশাসন, নিয়মকানুনের ধরাবাঁধা-পদ্ধতিতে শিক্ষালাভ করা নয়। মানুষের স্বাভাবিক গ্রহণশক্তির ক্ষমতানুসারে জগতের নানা জিনিস দেখে শুনে হাতে-কলমে শিক্ষা লাভ করে জীবনধারণের উপযুক্ত হওয়া। এ শিক্ষাপদ্ধতিও খুব প্রচলিত আছে। কিন্তু এ সব শিক্ষাপদ্ধতির একটিও পূর্ণ শিক্ষাপ্রণালী নয়। কিছু-না-কিছু ত্রুটি রয়েই গেছে। রবীন্দ্রনাথ নিজের মনের স্বাভাবিক অনুপ্রেরণায় অভিনব একটি শিক্ষাপদ্ধতি বের করলেন। শুধু জাগতিক শিক্ষা নয়, শুধু স্বয়ং-শিক্ষাও নয়, তিনি শিক্ষায় সত্য ও আনন্দের সমাবেশ ঘটালেন। মানুষ জগতের সত্যকে জানবে, বিশ্বপ্রকৃতি মানবপ্রকৃতি সবার সঙ্গে মেলামেশায় জীবনের উপযুক্ত হয়ে উঠবে, কিন্তু সেখানেই আবদ্ধ থাকলে তার সম্পূর্ণ বিকাশ ঘটে না। তাঁকে শিক্ষার আনন্দ, জীবনের আনন্দ পেতে হবে, বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে ঐক্য লাভ করতে হবে, জীবনের উদ্দেশ্যকে বুঝতে হবে। সাধারণ মানব-জীবনের চাইতে একটি বৃহত্তর মানব জীবনের রসকে উপলব্ধি করতে হবে। এই পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাধারা প্রবর্তনের জন্যেই রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী স্থাপন করেছেন, এত বৈচিত্র্যের সমাবেশ ঘটিয়েছেন এবং সব দেশের লোককে ডাক দিয়েছেন এখানে,—রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাসাধনের এইটিই বিশেষত্ব।

সেদিনকার সভায় রবীন্দ্রনাথের গানে, কবিতায় এবং তাঁর লেখার অংশ-বিশেষের ইংরাজী বাংলা পাঠের মধ্য দিয়ে এই সর্বাঙ্গীণ-শিক্ষাধারার পরিচয় বিশেষভাবে পাওয়া যায়।

* * * *

১০ই আগস্ট। তৃতীয় দিনের অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথের ধর্ম-সাধনার রূপ কী, অন্য প্রচলিত ধর্মসাধনার সঙ্গে তাঁর ধর্মমতের তফাৎ কোথায়,—এসব বিষয় আলোচিত হয়। উদ্বোধন গানটি ছিল—

"নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে
রয়েছ নয়নে-নয়নে।"

বালক-বয়সে রবীন্দ্রনাথ যে-ভাবটি প্রকাশ করেছিলেন তাঁর গানে, পরবর্তী জীবনে তারই পরিণতি দেখতে পাওয়া যায় তার ধর্মমতে। তিনি নানা প্রবন্ধে কবিতায় তাঁর ধর্মের স্বরূপ এবং মর্মকথাটি বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। ধর্মের মোহকে, মূঢ়তাকে সুযোগ পেলেই ধিক্কার দিয়েছেন। এসম্বন্ধে তাঁর বিখ্যাত কবিতা পঠিত হল—

ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে
অন্ধ সে-জন মারে আর শুধু মরে।

সে-সঙ্গে শোনা গেল 'কালান্তর' গ্রন্থের অংশবিশেষ থেকে সেই বাণী,—যে অধর্ম আচরণ করে, একদিন সে সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

কবির আসল ধর্ম কী তা পরিষ্কার ব্যক্ত হল 'পরিশেষ'-কাব্যের 'পান্থ' কবিতা পাঠে—

শুধায়ো না মোরে তুমি, মুক্তি কোথা,
মুক্তি কারে কই।
আমি তো সাধক নই,
আমি কবি, আছি
ধরণীর অতি কাছাকাছি
এ পারের খেয়ার ঘাটায়।

সভাপতির ভাষণে ডঃ প্রবোধ বাগচি মশায় বললেন,—আজকে এই সব পাঠ এবং গানের থেকে যে দু'-একটা কথা আমার মনে হল সে হচ্ছে এই যে, কবি নিজেকে কোনো ধর্মমতের মধ্যে আবদ্ধ রাখেননি। তিনি হিন্দু কি ব্রাহ্ম এই নিয়ে অনেক সময় তর্ক উঠেছে। তিনি নিজেকে বলেছেন—হিন্দু। তাঁর দৃষ্টিতে হিন্দুধর্মের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম, খ্রীস্টান সবার স্থান হতে পারে। হিন্দুধর্ম বৃহত্তর

বিস্তৃততর ধর্ম। তাঁর নিজের কোনো বিশেষ ধর্মমত ছিল কি না বিচার করা দরকার। তিনি উপনিষদের ধর্মমত ব্যাখ্যা করেছিলেন, কিন্তু তাই বলে তাঁর ধর্মমত আর উপনিষদের ধর্মমত এক নয়। উপনিষদের মতে ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। রবীন্দ্রনাথ কখনো জগতকে মিথ্যা বলেননি। ব্রহ্মকে তিনি অতীন্দ্রিয় বলেছেন, আবার তাঁকে জগতের সমস্ত রূপ-রস ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করবার কথাও বলেছেন। ১৯।৮।১৯৫৩

তেইশে শ্রাবণ। সান্ধ্যোপাসনার পর। রবীন্দ্র-সপ্তাহের প্রথম-দিবসের উদ্বোধন হল। ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় সভাপতি। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন প্রথমত রবীন্দ্র-সপ্তাহের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করলেন। গুরুদেবেরই লিখিত 'কবি-জীবনী' প্রবন্ধ থেকে তিনি কিছু অংশ পাঠ ক'রে যা বললেন তার মর্মার্থ এই—রবীন্দ্র-সপ্তাহের বিশেষ অর্থ গুরুদেবকে গভীরভাবে উপলব্ধি করা। তাঁর গুণালোচনা করা, রচনাদি পাঠ এবং গান করা—এ সবের দ্বারাই তাঁকে সুন্দর করে জানা সম্ভব।

এরপরে 'ভারত-তীর্থ' কবিতাটি পঠিত হয়। উদ্যোক্তা প্রবোধবাবু বললেন,—এ বছরের রবীন্দ্র-সপ্তাহের বিশেষত্ব এই যে,—গুরুদেবের মধ্যে এক-একটা যুগধর্মের কতটা আত্ম-প্রকাশ ঘটেছে তার আলোচনা।

১। বৈদিক, রামায়ণ এবং মহাভারতের যুগ। ২। বৌদ্ধ যুগ। ৩। কালিদাসের যুগ। বাকি দু'দিন হবে মধ্যযুগ এবং দুদিন হবে আধুনিক যুগের আলোচনা।

এরপরে সেদিনের কাজ আরম্ভ হল। বেদের দুটি সূক্ততে গুরুদেব সুর দিয়েছিলেন। একটি তার "য আত্মদা বলদা" অন্যটি "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।" আর একটি সূক্ত বাংলা-গানে অনুবাদ করেছিলেন—"যদেমি প্রস্ফুরন্নিব ……. অনূদিত বাংলা গানটি হচ্ছে: "যদি ঝড়ের মেঘের মতো আমি ধাই।" আশ্রমের বার্ষিক-উৎসবে এই শেষের দুটি গান প্রতি-বছর গীত হয়। "য আত্মদা বলদা" গানটি দিয়ে সভার আরম্ভ হল। জনপূর্ণ অথচ নিঃশব্দ সিংহ-সদন। অস্পষ্ট ফ্যানের শব্দ এবং বিদ্যুতের উজ্জ্বল আলো, তবু যখন বৈদিক সূক্তটি ধীরোদাত্ত মনোরম সুরে গীত হচ্ছিল,—মনের মধ্যে অনুভূত হচ্ছিল কোন্ সে কালের ভুলে-যাওয়া সেই বৈদিক যুগ, যেদিন সকাল-সন্ধ্যায় এমনি সুরে বেদগান নিস্তব্ধ পরিবেশে বিরাট শূন্যে উত্থিত হত।

গানের শেষে গীতা উপনিষৎ এবং মহাভারতের মর্ম সংক্ষেপে পঠিত হল। আরো

পঠিত হল—রামায়ণ-মহাভারতের সম্বন্ধে গুরুদেবের গদ্যলেখার অংশবিশেষ; তাঁরই কৃত বেদমন্ত্রের অনুবাদ, রামায়ণ-মহাভারতের ঘটনা নিয়ে লেখা কবিতার অংশ, দু' একটা সম্পূর্ণ কবিতা, 'নবজাতক' ও 'প্রান্তিক' প্রভৃতি থেকে বেদমন্ত্রের অনুসৃত হয়ে রচিত যে কবিতা তারও দু'তিনটি। মাঝে-মাঝে গান হচ্ছিল।

কার্যসূচী যথেষ্ট দীর্ঘ হয়ে পড়েছিল। রাত্রি ন'টাতে সভাপতির বক্তব্য আরম্ভ হল। সময়াভাবে তিনি সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বললেন, কিন্তু সেদিনের সভার মূল কথাটি তার মধ্যেই তিনি উদ্ঘাটিত করেছিলেন। বেদ-মন্ত্রের বিশেষত্ব হল, সংক্ষেপে প্রকাশ—brevity। দু'চারটি পংক্তিতে দু'চারটি কথার এক-একটি শ্লোক। কিন্তু তার মধ্যে কত গভীর ভাব, কত সৌন্দর্য মাধুর্য। এই যে গুরুদেবের 'ব্রাহ্মণ' কবিতাটি পড়া হল,—'অন্ধকার বনচ্ছায়ে সরস্বতী-তীরে', এটি বেদেতে মাত্র চার-পাঁচটি পংক্তিতে আছে। গুরুদেবের মনে চিরদিন একটি বিক্ষোভ ছিল। তিনি বারবার বেদ-পুরাণ প্রভৃতির আলোচনায় বলতেন—অমন সংক্ষেপে কেন লিখতে পারি নে। আমাদের লেখা কেবলই বড় হয়ে যায়। এক-একটি-মাত্র শ্লোকে কেমন এক-একটি কথা প্রকাশ পেয়েছে। একবার তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—আপনি বলতে পারেন ঋগ্বেদের মূল কথা কোন্ শ্লোকে নিহিত? তিনি বললেন—নিশ্চয়—"য আত্মদা বলদা": যিনি নিজেকে দিয়েছেন তিনি সব দিয়েছেন এবং তিনিই সমস্ত প্রাপ্ত হন। গুরুদেব আরো যে-দুটি বেদের শ্লোক ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন বক্তা সেগুলিও বললেন। তিনি আরো বললেন—"বেদ পুরাণ রামায়ণ মহাভারত ব্যাখ্যা করে আমাকে বলতেন গুরুদেব। এরকমভাবে প্রায় সম্পূর্ণ পুরাণ-গ্রন্থের গুরুদেব-কৃত ব্যাখ্যা আমি লিখেছি। আমি সেগুলি কাশীর পণ্ডিতদের কয়েকজনকে একবার দেখিয়েছিলাম। তাঁরা সাগ্রহে বলেছিলেন—আপনি নিশ্চয় এ জিনিস ছাপাবেন। এ রকম ভাষ্যের দরকার আছে। কিন্তু নানা কারণে এখনো তা ছাপানো হয়ে ওঠেনি। মহাভারত সম্বন্ধেও কবি কাজ করতে আগ্রহান্বিত ছিলেন। কিছু-কিছু কাজ আরম্ভও করেছিলেন। কিন্তু সে চেষ্টা তেমন ফলবতী হয়নি। এত বড়ো বৃহৎ কাজ সম্পন্ন করবার মতো সময় তিনি পেলেন না। সারা জীবন তাঁকে এক মুহূর্ত আলস্যে বিশ্রাম করতে দেখা যায় নি। তিনি তাঁর ভাব দ্বারা আমাদের প্রবুদ্ধ করতে চাইতেন। কিন্তু তাই কি হয়, তাঁর কাজ কি আমরা করতে পারি।

কিন্তু এই-যে বেদের মতো সংক্ষিপ্তরূপে প্রকাশ করবার বেদনা এ তাঁর পূর্ণ হল। ১৯৩৭ সনে মৃত্যু-তোরণ পেরিয়ে তাঁর যে রোগমুক্তি ঘটল, সে যেন তাঁর নবজীবন

লাভ।—দেহে-মনে তিনি হলেন সম্পূর্ণ নূতন, সম্পূর্ণ ভারতীয়। 'প্রান্তিক' থেকে দেখি তাঁর লেখাতে একেবারে বেদের মতো গাঢ়বদ্ধতা এসে গেছে। সব কবিতায় বেদমন্ত্রের সেই গভীরতা, সেই আনন্দোপলব্ধি। মৃত্যুর কয়েক মাস আগে তাঁকে এ কথা বলাতে তিনি বলেছিলেন—হাঁ, এ লেখাগুলি অত্যন্ত সহজে সংক্ষিপ্তরূপে প্রকাশ পেয়েছে। আমারই আশ্চর্য লাগে।" ক্ষিতিমোহনবাবু এখানে একটি বেদের মন্ত্র উদ্ধৃত করে বললেন যে, "মন্ত্রে বলছে: স্রষ্টা এই বিশ্ব সৃষ্টি করে নিজেই বিস্মিত মুগ্ধ। এ-কী অপরূপ সৃষ্টি করেছেন। তিনি নিজেই যে তার কূল-কিনারা পাচ্ছেন না।"

তাঁকে বলা হয় ভারতবর্ষের তপস্যার ফল। তিনি সত্যি তাই। সকল যুগের ভারতের মর্মকথা তাঁর মধ্যে প্রকাশিত। অনেকে বলেন, তাঁর মধ্যে শেলী-কীটস্-এর দর্শন পাই। তা ঠিক নয়। তিনি সম্পূর্ণ ভারতীয়। ভারতের যে-ভাবধারা বিশ্বের এবং তারই যেটুকু ইউরোপীয় ভাবধারায় মিশেছে, গুরুদেবের মধ্যে তাই পুনরুজ্জীবিত হয়েছে।

মনের দিক থেকে ভারতীয় ভাবধারার সামঞ্জস্য দেখিয়ে তিনি কবির দৈহিকক্ষেত্রের উপমা দিয়েও তা দেখালেন। বললেন—আগে গুরুদেবের মধ্যে তার পারিবারিক প্রতিকৃতি কিছুমাত্র লক্ষ্য করিনি। কিন্তু রোগশয্যা থেকে সেরে ওঠবার পরেই অর্থাৎ মৃত্যুর চার-পাঁচ বছর আগে দেখি ক্রমে-ক্রমে তাঁর চেহারা ঠিক বড়বাবু অর্থাৎ তাঁর বড়-দাদার মতো হয়ে উঠল এবং ক্রমে মহর্ষিদেবের মূর্তি তাঁতে পরিস্ফুট হতে লাগল। দেহের দিক দিয়ে যেমন দেখলাম বৃদ্ধ হয়ে তিনি ঠাকুর-পরিবারের হলেন, তেমনি শেষ ক' বছরে দেখলাম তাঁর মধ্যে একেবারে ভারতীয় খাঁটি ভাবধারা—সেই প্রাচীন বেদের সূক্তগুলির মতো তাঁর কবিতাগুলিতে তিনি খাঁটি ভারতীয় হয়ে উঠেছেন।

রাত্রি সাড়ে ন'টার সময় 'রবীন্দ্রসপ্তাহের' প্রথম অধিবেশন সমাপ্ত হল।

আগস্টের দ্বিতীয় সপ্তাহে আশ্রমে রবীন্দ্র-সপ্তাহ উদ্‌যাপন করা হয়েছে। সন্ধ্যায় বিনোদন-পর্বে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক গান পাঠ ও আবৃত্তি বিভিন্ন বিভাগ থেকে শোনান হল। দু'তিন বছর থেকে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাধারার সঙ্গে সর্বসাধারণের পরিচিতির চেষ্টা চলছে রবীন্দ্র-সপ্তাহে। এবারকার কার্যসূচীটি ক্রমানুসারে লক্ষ্য করলে এ সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা হয়। ৮ই আগস্ট—শান্তিনিকেতনের আদর্শ ও তার পরিণতি—আশ্রমিক সংঘ। ৯ই আগস্ট—রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক শিক্ষা—শ্রীনিকেতন ও বিনয়ভবন। ১০ই আগস্ট—

বিশ্ববিদ্যার কেন্দ্রস্বরূপ বিশ্বভারতী—বিদ্যাভবন। ১১ই আগস্ট—রবীন্দ্রনাথের জীবনের আদর্শ—পাঠভবন। ১২ই আগস্ট—রবীন্দ্রনাথের শিল্প ও সাহিত্যাদর্শ—কলাভবন ও সংগীতভবন। ১৩ই আগস্ট—বিশ্বভারতীর ছাত্রজীবন—ছাত্রছাত্রীগণের আলোচনা। ১৪ই আগস্ট—বিশ্বভারতীর আদর্শ—কর্মিগণের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। ছাত্রছাত্রী ও সাধারণের পক্ষে প্রবেশ ছিল নিষিদ্ধ। কিন্তু বৃষ্টির জন্য কর্মিগণের আলোচনায় বিঘ্ন ঘটে এবং সেই অসম্পূর্ণ আলোচনা তাঁরা ২১শে আগস্ট পুনরায় সম্পন্ন করেন।

১৩ই আগস্টের ছাত্রছাত্রীদের মৌখিক আলোচনাটিও একটি নূতন ধরনের জিনিস ছিল। ছাত্রদের মধ্যে থেকেই সভাটি পরিচালনা করা হয় এবং বিভিন্ন বিভাগের বাঙালী অবাঙালী ছাত্রছাত্রীগণ রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার বিশেষত্ব, শান্তিনিকেতনের শিক্ষা, সাহিত্য, আমোদপ্রমোদ, খেলাধূলা, শারীরিক পরিশ্রম, সামাজিক কার্যকলাপ, ছাত্রছাত্রী-নিবাসের অভিজ্ঞতা, শ্রীনিকেতন শিক্ষাচর্চা-কেন্দ্রের জীবনধারা প্রভৃতি বহু বিষয় আলোচনা করেন। বিতর্ক নয়, কিন্তু আলাপ-আলোচনা করে ছাত্রছাত্রীগণ এসব সম্বন্ধে নিজেদের চিন্তা ও মতামত ব্যক্ত করে সবার আনন্দ বর্ধন করেন। এরকমভাবে স্বাধীন চিন্তার ক্ষমতা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে গড়ে উঠুক—এটিই রবীন্দ্রনাথের আকাঙ্ক্ষিত ছিল। ২।৯।১৯৫৪

বুদ্ধ-জয়ন্তী

গ্রীষ্মের শান্তিনিকেতন এবার অপেক্ষাকৃত উপভোগ্য। অন্যান্য-বারের মতো দারুণ অগ্নিবাণে আশ্রমবাসীর প্রাণ অতিষ্ঠ নয়, প্রথম থেকেই গরমটা কম ছিল। বোঝা যাচ্ছিল এখানে বৃষ্টি-বাদল না হলেও আশেপাশে হচ্ছে। এখন তো মাঝে-মাঝেই ঝড় আসছে, জল হচ্ছে, ঠাণ্ডা পড়ছে। এক-এক সময় অবশ্য বোশেখ-জ্যৈষ্ঠি মাসের অসহ্য গরমও ভোগ করতে হচ্ছে, তথাপি এবার আশ্রম শুষ্ক-প্রেতের রুদ্রজ্বালায় ঝল্‌সে খাক্ হওয়ার হাত থেকে রেহাই পেয়েছে। তার শ্যামল-শোভা এখানে-সেখানে চিকচিক করছে। বোশেখ-জ্যৈষ্ঠি মাসে এমন আবহাওয়াটি পাওয়া আশ্রমবাসীর পক্ষে কম সৌভাগ্যের বিষয় নয়। তাই বোধহয় এই দীর্ঘ ছুটিতেও আশ্রম এবার লোকে পরিপূর্ণ।

বৈশাখী-পূর্ণিমাতে বুদ্ধ-জয়ন্তী উপলক্ষে চারদিকে যে বিপুল আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে আশ্রমেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে,

আশ্রমে বুদ্ধের স্মরণোৎসব এই প্রথম নয়। রবীন্দ্রনাথ এই মহামানবের প্রতি যে কিরূপ শ্রদ্ধাবান ছিলেন তা শুধু তাঁর গান কবিতা প্রবন্ধ নাটক প্রভৃতির মধ্যেই প্রকাশ পায়নি, প্রত্যক্ষভাবেও আশ্রমে তার বহু প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। বহু বছর থেকে আশ্রমে আষাঢ়-পূর্ণিমায় বুদ্ধের ধর্মচক্র-প্রবর্তন-প্রথা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। আগে ঐ দিনটিতে ছুটি থাকত এবং রাত্রে সভায় বুদ্ধদেব সম্বন্ধে আলোচনা হত। য়ুনিভার্সিটির যুগে এখন ছুটি অবশ্য বন্দ হয়েছে, কিন্তু রাত্রের সভাটি নিয়মমতো হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালেই 'নন্দনে'র সামনে কন্‌ক্রীটের বিরাট বুদ্ধমূর্তি এবং তারই অদূরে পায়সান্নের ভাণ্ড মাথায় সুজাতা মূর্তি তৈরি হয়েছিল। চীনভবনের হল-ঘরে আচার্য নন্দলাল বসু অঙ্কিত মারপরিবৃত প্রসন্নধ্যানী বুদ্ধদেবের দেয়ালচিত্র দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে। চীনভবনের দেয়ালে অঙ্কিত রয়েছে 'নটীর পূজা'র দৃশ্য। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে কলাভবনের যে নূতন ছাত্রাবাসগুলি নির্মিত হয়েছে তাদের একটির দেয়ালে যীশুখৃস্ট ও বুদ্ধের জীবনীর ফ্রেস্কো রয়েছে। এবারকার বুদ্ধ জয়ন্তীর উৎসব আশ্রমবাসিগণ অত্যন্ত আগ্রহ ও গাম্ভীর্যের সহিত পালন করেছেন। প্রত্যুষের বৈতালিক গানে শুভদিনটি সূচিত হল। সকালে মন্দিরে উপাসনা দ্বারা উৎসব উদ্বোধনকালে উপনিষদের মন্ত্র, বুদ্ধের বাণী এবং ১৩৪২ সনে বুদ্ধ-জয়ন্তী উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ-প্রদত্ত ভাষণটি পঠিত হয়েছে। রাত্রে চীনভবনে বুদ্ধের দেয়ালচিত্রের সামনে শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবীর সভানেত্রীত্বে একটি আলোচনা-সভা হল। প্রধান বক্তা অধ্যাপক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দেন। তাতে বর্তমান বুদ্ধ-জয়ন্তী অনুষ্ঠানের তাৎপর্য, বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন, ভারতে বৌদ্ধধর্মের পুনরুজ্জীবন, আধুনিক যুগের মনীষিগণের বুদ্ধদেব সম্বন্ধে অভিমত, বাংলার রবীন্দ্রনাথ, বিশেষ করে, বিবেকানন্দ প্রমুখ মনস্বীদের উপর এই মহাপুরুষের প্রভাব প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়।

বুদ্ধের পরিনির্বাণের আড়াই হাজার বছর পূর্ণ হয়েছে বলেই যে দেশ-বিদেশে বার এই মহৎ বুদ্ধ-জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হচ্ছে তা নয়। আসলে ভারতবর্ষে নূতন করে একটা জাগরণ এসেছে, তারই ফলে ভারতবাসী আজ নূতন করে সেই 'নরোত্তম পুরুষসত্তম'-কে স্মরণ করতে প্রয়াসী হয়েছে। একদিন যে-মহাপুরুষ জীবৎকালে এবং মৃত্যুর পরে বহু বছর যাবত গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন,—ভারতবর্ষ, চীন, জাপান, জাভা, কম্বোডিয়া, মধ্য এশিয়া প্রভৃতি দেশগুলি একদিন যাঁর ধর্ম ও দর্শনের বলে অনন্যরূপে গড়ে উঠেছিল, তাঁকে এতদিন ভারতবর্ষ

"চলো চলো দেখবে মজা আনন্দবাজারে
ছেলেমেয়ে বেচে কেনে কাতারে কাতারে।"

আশ্রমের ছাত্রছাত্রীরাই 'আনন্দবাজারে' বেচাকেনা করেন। পুজোর ছুটির আগে ছেলেরা দিন গোনে কখন আসবে 'আনন্দবাজার'। কে কী দোকান করবে তাই নিয়ে আলোচনা চলে বেশ-কিছুদিন। শেষে এসে পড়ে দিনটি, ভোরবেলায় সানাইয়ের সুর আশ্রমবাসীকে জাগিয়ে দিয়ে আনন্দবাজার-উৎসবের আগমন ঘোষণা করে। প্রাক্-কুটীরের বারান্দায় বেজে ওঠে ঢাক। অমনি, ছেলেমেয়েরা আরম্ভ করে তাদের দোকান সাজাতে। গৌর-প্রাঙ্গণের চারদিকে গজিয়ে ওঠে ছোট-বড় দোকান। ছেলেরা কেউ বাঁশ পুঁতে সামিয়ানা খাটাচ্ছে। আবার একদল ছেলেমেয়ে টুল-টেবিল বইছে, মেয়েরা কোমরে আঁচল বেঁধে—বাঁ হাত দিয়ে কপালের চুল সরাতে সরাতে ডান হাতে উনুন নিয়ে এক পাশে ঝুঁকে পড়ে হন্তদন্ত হয়ে চলেছে। খাবারের দোকানই বেশী। যেমন আশ্রম-সম্মিলনী, শিক্ষা-ভবন, বিদ্যা-ভবন এঁরা সকলেই খাবারের দোকান করেছেন। কয়েকটি ছেলেমেয়ে আবার ব্যক্তিগতভাবে দোকানও করে। 'বাজারে'র দোকানগুলির নামও বেশ মজার, যেমন—হৈ-চৈ, খাই-খাই, চারইয়ারী, হট্টগোল, তিনসঙ্গী ইত্যাদি। এবারে বিশ্বভারতী ছাত্র-সম্মিলনী গ্রন্থাগারের বারান্দায় করেছিলেন একটি চিত্র-প্রদর্শনী। তাছাড়া ফুলের দোকান, মুখোশের দোকান, ছবির দোকান তো আছেই। আবার অনেকে হাতে করে ঘুরে-ঘুরে পানও বিক্রি করে বেড়ায়। এই দিনের বাজারে যে টাকা লাভ হয় তা যায় আশ্রমের দরিদ্র-ভাণ্ডারে। সেজন্য জিনিসপত্র কিংবা খাবারের দাম বেশী নিলেও কারও কিছু বলবার নেই। এসঙ্গে সংসারে বেচাকেনা সম্বন্ধেও ছাত্রছাত্রীদের একটু অভিজ্ঞতা হয় বৈকি!

* * *

যা-হোক, সকাল তো গেল দোকান সাজাতে আর খাবার তৈরি করতে। বিকেলের দিকে 'বাজারে' বেচাকেনা শুরু হয়। কাদের দোকানে বেশী লাভ হবে এই নিয়ে চলে প্রতিযোগিতা। যাঁরা বেশী লাভ ক'রে দরিদ্র-ভাণ্ডারে বেশী টাকা জমা দিতে পারবেন তাঁদেরই বাহাদুরি বেশী তাতে আর সন্দেহ নেই। সেই প্রতিযোগিতায় জিনিসপত্রের দামও বেড়ে চলে। অবশ্য তারও একটা সীমা আছে, যার বেশী দরে বিক্রি করা হবে না। প্রত্যেক দোকান থেকে ছাত্রছাত্রীরা এসে ক্রেতাদের ধরে ধরে নিয়ে যাচ্ছে, তাদের দোকানে কিছু-না-কিছু কিনতে হবে কিংবা খেতে হবে। ওদিকে কলাভবনের ছেলেমেয়েরা দোকান করেন না, তাঁরা

টিকিট করে নাটক অভিনয় করেন। সংগীত-ভবনেরও এই ব্যবস্থা। তাই কলাভবন এবার "লক্ষ্মণের শক্তিশেল" আর সংগীত ভবন 'চশমা' অভিনয় করেছেন। একই সময়ে সব-কিছু চলতে থাকে। তাতেও বেশ ভীড় আছে। মোট কথা বিকেল চারটা থেকে রাত্রি ন'টা পর্যন্ত গৌরপ্রাঙ্গণ সরগরম।

*   *   *

খাবারের দোকানে ঢুকলে পয়সা খসবে বেশী। প্রথমত খাবারের নামগুলি এমন অদ্ভুত হবে যে আপনি 'মেনু' দেখে বুঝতেই পারবেন না খাবারটির প্রকৃত রূপ কী। 'চীনা-প্সু' বলে যে খাবার আপনার সামনে দিয়ে যায় তার সত্যিকারের নাম হচ্ছে 'চা'। এইভাবে সরবতের নাম দেওয়া হয় 'মেঘমল্লার', সিঙাড়াকে 'ত্রিশৃঙ্গধারিণী'। এছাড়া চীনা, ফরাসী কিংবা উর্দু ভাষায় এমন সব নাম দেওয়া হয় যে, ঐ ভাষাগুলির পণ্ডিতদের সাধ্যও নেই যে তার প্রকৃত অর্থ বুঝতে পারেন। এমনি করে খাওয়া-দাওয়া করে যখন গৌরপ্রাঙ্গণে অন্যান্য দোকানে যথারীতি হাজিরা দিচ্ছেন হঠাৎ ঘণ্টা পড়ে 'বাজার' শেষ হয়েছে নির্দেশ আসে। কখন যে সাড়ে-আটটা বেজে গেছে জানতেও পারা যায়নি। বেচাকেনা যায় বন্ধ হয়ে, 'আনন্দবাজারে'র হয় শেষ। এবার হিসাব-নিকাশের পালা। কর্মী ছেলেমেয়েরা দোকান গুটাতে ব্যস্ত থাকে, ক্যাশিয়ার করেন হিসাব। অন্যান্য ছেলেমেয়েরা আস্তে-আস্তে ঘরে ফিরে যায়। কাল হবে ছুটি। সারাদিন আনন্দ করার পর হঠাৎ বিদায় নেবার ক্ষণ এসে উপস্থিত। দূরে ছেলেমেয়েরা ক্লান্ত গলায় "ছুটির বাঁশী বাজল যে ঐ নীল গগনে" গান ধরেছেন। কর্মী ছেলেমেয়েরা দোকানে বসে সারাদিনের ঘটনার আলোচনা করেন। কার কত লাভ হল সেই নিয়ে হয় তর্ক-বিতর্ক। ক্যাশিয়ার যখন লাভের অঙ্কটা সকলকে জানালেন তখন খোশ-মেজাজে তাঁরাও আরম্ভ করেন গল্প-গুজব আর সেই সঙ্গে গান। জিনিসপত্র ঠিক-ঠিক জায়গায় পৌছিয়ে দিয়ে টাকার হিসাব কর্তৃপক্ষকে বুঝিয়ে দিয়ে "কী পাইনি তারি হিসাব মিলাতে মন মোর নহে রাজি" গান করতে করতে ফিরে যান স্বস্থানে।
২৩।১০।১৯৫৬

'আনন্দ-বাজার।'—মেলা নয়। শুধু আনন্দ করা। আশ্বিন মাস। পূজার সাজ-সাজ রব চারদিকে। ছেলেদের মন ছুটেছে বাড়ির দিকে। এমনি সময় প্রতি-বছর জ'মে ওঠে আমাদের 'আনন্দ-বাজার'।

আগের রাত্রি থেকে আমাদের চোখে আর ঘুম নেই। অনেক রাত্রে মা-ঠাকুরমার ধমকানি খেয়ে শুয়ে পড়লাম। মাঝে মাঝে জেগে উঠছি, নানা রকম

স্বপ্ন দেখছি, আবার কখন্‌ ঘুমিয়ে পড়লাম। কখন ভোর হয়ে গেল, সানাইয়ের সুর উঠল। লাফিয়ে উঠে পড়লাম। আজ যে 'আনন্দ-বাজার', কতদিন থেকে অপেক্ষা করে আছি এ-দিনটির।

উঠে ভাবলাম নিশ্চয় সবার আগে উঠেছি, এখনো কেমন আবছা রয়েছে। সঙ্গীদের ডাকতে চললাম। গিয়ে দেখি সঙ্গীরা সব কত আগে উঠে গেছে, ফুল তুলছে। অপ্রস্তুত হয়েও কাজে লেগে গেলাম। সবাই ভাবছি 'এবার নিশ্চয় আমাদের দোকানেই বেশি লাভ হবে'। ফুল তুলে বোনদের দিয়ে গেলাম মালা গাঁথতে, দোকান সাজাব। তারপরে বেরিয়ে পড়লাম বাঁশের খুঁটির খোঁজে। যারই সঙ্গে দেখা হয়, এই কথা—কিসের দোকান দিচ্ছিস রে? খাবারের? মণিহারী? আমরা দেব ফুল আর পুতুলের।

বাঁশ আর পেলাম না। কত দল আগের ভাগে এসে চেয়ে নিয়ে গেছে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে। আমরা এখন করি কী? একটা ছিল আধখানা-তৈরি বাড়ি। বাঁশ খুঁটি বাখারি মেলা প'ড়ে। টেনে নিয়ে এলাম তাই। দড়ি দিয়ে ঘেরাও ক'রে কাপড় টাঙিয়ে যখন মালা দিয়ে সাজালাম—বাঃ দিব্যি। বড়ো বড়ো দোকানগুলি তখনো সাজাচ্ছে। ছেলেমেয়েরা ক্লান্ত, তবু অস্থির। দৌড়াচ্ছে, মাটি খুঁড়ছে, এক ভাবে কাপড় টাঙাচ্ছে, আবার খুলছে, মনোমত হচ্ছে না। দেখে-দেখে একটু হেসে আবার ছুটলাম নিজেদের কাজে—পদ্মফুল আনতে।

আশে-পাশের গাঁয়ে পুকুরে এ সময় মেলা পদ্মফুল। ফুল আর কুঁড়িগুলি দেখতে এমন সুন্দর, খুব বিক্রি হয়। কিন্তু পুকুরে নাবাই মুস্কিল। অনেকেই গেল, বেশির ভাগই মুখ শুকিয়ে ফিরে এল। পদ্মফুল আনবে কী ক'রে, কেউ জানে না সাঁতার, কারু বা জোঁকের ভয়। মুখের সামনে থেকে রসগোল্লা যেন কেড়ে নিয়ে যাওয়া হল; যারা পেল না তাদের এমনি মনের কষ্ট। আমরা অনেক চেষ্টায় কিছু পদ্ম আর কুঁড়ি জোগাড় করলাম। আমাদের সঙ্গীরা তো আমাদের ঘিরে নাচতে লাগল। পাশের দোকানের সবারই দেখি মুখ কালো। তারা পদ্ম জোগাড় করতে পারেনি। আমরা কয়েকটা দিলাম; আর, তারা নতুন উদ্যমে আশ্রমের সমস্ত ফুল নিয়ে ফুলের তোড়া, মালা, হাতের মাথার গয়না ক'রে নিয়ে এল। তাদের আরেক সান্ত্বনা—তাদের মা তাদের খাবার তৈরি করে দিয়েছেন—কুড়্‌মুড়্‌-ভাজা। বাদামের সন্দেশ,—আরো কত কী!

বেলা বারোটার মধ্যেই দোকানগুলি প্রায় সাজানো হয়ে গেল। ছোটরা বড়-বড় দোকানগুলির দিকে তাকিয়ে অবাক—কেমন ক'রে এমন সুন্দর করে তুলল!

লাইব্রেরি আর 'সিংহসদনে'র সামনের মাঠটা চেনা যায় না। লাল নীল কাপড় উড়ছে, ফুলের মালা দুলছে, সানাই ঢোল বেজে চলেছে। তিনটের সময় ঘণ্টা পড়তে লাগল। দোকান খুলল। প্রত্যেক দোকানে চেয়ার টেবিল সাজানো। সুন্দর সুন্দর ঢাকনায় ঢাকা। একটি ক'রে ফুলদানি। বেলা পড়তে লাগল, আলো জ্বলল, আর মেলা জমে উঠল।

সবাই আসছে আনন্দমেলা দেখতে। কী খুশী। আমরাও মেতে উঠলাম। অনবরত চেঁচাচ্ছি—এই যে আসুন, এখানে পদ্মফুল, বাঘ, সিংহ; এই যে এখানে পান; আসুন আসুন হাতে-আঁকা ছবি, হাতে-তৈরি আসন; খাবার চাই-তো এখানে; এখানে পাবেন লস্‌সী, হিং-টিং-ছট্, আবার-খাবো, খানুনা, জীবনে খাননি এমন চা, জীবনে ভুলবেন না এমন সরবৎ—ফুরিয়ে গেল, ফুরিয়ে গেল।

রাত্রে 'সিংহসদনে' টিকিট কেটে জলসা। ঘর ভরতি। গিয়ে দেখবার ফুরসুৎ পেলাম না। মেলাটা তবু খানিক ঘুরে দেখে এলাম, একটু খেলামও। আর, নিজেদের দোকানে বসে বসে বিক্রি করলাম। রাত আটটা বাজতে না বাজতে মেলা প্রায় ভেঙে এল, ছোট-ছোট দোকানে সব জিনিস ফুরিয়ে গেছে; দোকান গুটিয়ে নিতে ব্যস্ত, বড় দোকানগুলি কিছুটা চলছে, ন'টা বাজতেই সব শেষ।

টাকা হিসেব করতে করতে পাশের দোকানে মণ্টু বললে,—দেখলি তো, পূরো ষোলটি টাকা ওঠালাম। বলেছিলাম কী, যদি একটি ঘুথ্‌নিদানাও মুখে দি',—আমার নাম মণ্টু নয়! মা বলেছিলেন,—কখনই পারবি নে, নিজেরাই সব খেয়ে দোকান ফেল পড়িয়ে দিবি। হুঁ, দেখলি?

শিবু ব'লে উঠল—সত্যি রে, বড়রা অমনি সব বলেন, নয় তো আমরা কী-না পারি! —সুব্রত কর

সাতই পৌষ

এসে পড়ল পৌষ-মেলা। এখন চলছে তারই আয়োজন। সবাই নানাদিকে ব্যস্ত। ওদিকে ক্রিকেটে মেতেছে একদল। এদিকে চলেছে মন্দিরে আলপনা। সংগীত-ভবন গানের মহড়ায় মুখরিত।—"পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে, আয়রে চলে আয় আয় আয়।" ২৩।১২।১৯৫১

শান্তিনিকেতনে—৭ই পৌষ।—শান্তিনিকেতনের ছোট-বড়ো যে যেখানে আছে—তাদের কাছে এই শব্দটুকুই যথেষ্ট।—সকলেরই মনে পড়ে যাবে আশ্রমের সবার বড়ো উৎসবের এই দিনটিকে। তার মেলা, তার সভাসমিতি, প্রদর্শনী, কবি, যাত্রা—তার ছাতিমতলা, আমবাগান—সেই বহুশ্রুত বহু গীত—'কর তাঁর নাম গান' সংগীত—বৈতালিক ও আচার্যের ভাষণ—কত কী একসঙ্গে সব ভেসে উঠবে শ্রবণ-নয়ন ও মনপ্রাণ ভ'রে। আশ্রমের উত্তর প্রান্তে সেই মেলার আসর,—আর দু'দিনের মধ্যেই ভরে যাবে সব তালপাতায়-ছাওয়া কুটীর। চিঠিপত্র, লোকজনের আনাগোনা বেড়েই চলেছে। মেলার উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে গঠিত অতিথি-সেবক সমিতি আর দোকানপাটের ব্যবস্থাপক সমিতির কাজই এখন বেশি। গতবার গেছে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার পঞ্চাশ বছর। এবার মেলার ৬০ বছর। ১২৯৮ সালে এ মেলা শান্তিনিকেতনে মন্দির-প্রতিষ্ঠার উৎসবের সঙ্গে প্রথম অনুষ্ঠিত হয়। রবীন্দ্র জীবনী ১ম খণ্ড এ বছরের মেলার গুরুত্ব এইটুকু। সকলেই ৬০ বছর আগেকার এই দিনটির কথা একবার এসময়ে আশা করি মনে করবেন। কত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে মেলা এসেছে। আজ জনসাধারণকে শিক্ষিত সাধারণের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে সে শিক্ষা ও আনন্দের উপলক্ষ্য হয়ে উঠেছে। সমভাবে তার ধর্ম-প্রবর্তনা লোকের মধ্যে প্রসার লাভ করলে আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষিদেবের উদ্দেশ্য আরো যে সার্থক হত তাতে সন্দেহ নাই।

বিগত ২২শে নভেম্বর শান্তিনিকেতনে কর্মিমণ্ডলীর একটি অধিবেশন হয়। তাতে স্থির হয় যে, এবারে আশ্রমের তিনজন বিশিষ্ট ব্যক্তির কর্মাবসানকালে তাঁদের সংবর্ধনা-জ্ঞাপন উপলক্ষ্য যথাবিহিতরূপে উৎসবের অনুষ্ঠান করা হবে। শ্রদ্ধেয়া শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, শ্রীনন্দলাল বসু ও শ্রীক্ষিতিমোহন সেন বহুদিনের অক্লান্ত উদ্যমে আশ্রমকে সেবা করে এসেছেন, এখনও করছেন। এঁদের মতো ব্যক্তিত্বের সাহচর্য দুর্লভ। এঁদের গৌরবময় কর্মজীবনের পুণ্য আদর্শকে প্রণাত জানাবার এই উপলক্ষ্যটি যাতে সাফল্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে, এজন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা হচ্ছে। সকলেই উৎসাহের সঙ্গে একাজে সহযোগিতা করছেন। আগামী বার্ষিক-উৎসবের প্রারম্ভেই উৎসবটি অনুষ্ঠিত হবার কথা। ১৩।১২।১৯৫২

১৯শে ডিসেম্বর—শান্তিনিকেতনের সাংবৎসরিক-উৎসব সারা হল, সরগরম পরিবেশ শান্ত হয়ে এল। পৌষের পয়লা-দোসরা থেকেই মেলার মাঠে ঘরবাড়ি তৈরি হচ্ছিল, গরুর গাড়ি-বোঝাই জিনিসপত্র আসছিল, সাধারণ লোকেরা বলাবলি

করছিল—এবার বীরভূমের এ অঞ্চলে ধান ভাল হয়েছে, গৃহস্থের ঘরে-ঘরে আনন্দ, সাতই-পৌষের মেলা খুব জমবে। মেলার মাঠের পাশে পান্থশালায় বাজিকর বাঁশ চেঁছে কাগজ কেটে বাজী তৈরি করেছে, ছেলেমেয়ের ভিড় সেখানে লেগেই ছিল। তাদের মুখে-মুখেই আশ্রমে রটে গিয়েছিল—এবার খুব ভাল বাজি হবে; জাহাজ থেকে আর দুর্গ থেকে গুলি-বারুদে লড়াই হবে, দুটো সাপের খেলা হবে, আরো কত-কী!

এদিকে আবার অতিথি আসার ধুম আছে। ছেলেমেয়েদের মধ্যে কেবলই জল্পনা-কল্পনা চলছে, খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে—কার বাড়িতে কে-কে আসছে, কোন্ মেয়ের মা-বাবা আসার কথা, কোন্ ছেলের বা মাসী-পিসী, বন্ধু-বান্ধব? হোস্টেলের ছেলেমেয়েরা অফিসে ছুটোছুটি করেছে জায়গা রাখতে। প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী, বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবক প্রভৃতির থাকবার ব্যবস্থার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়, তারই সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ-অতিথিদের থাকবার ব্যবস্থাও হয়ে থাকে। তবে সবাইকে একটু আগে থেকেই মেলা-সমিতির কর্মিমণ্ডলীকে আসবার কথা জানাতে হয়। অনেক সময় অতিথিরা খবর না দিয়েই হঠাৎ দলে-দলে চলে আসেন। তাতে অসুবিধা বাড়ে দু'পক্ষেরই।

পাঁচই পৌষ আসতে না আসতে বাসায়-বাসায় অতিথির ভিড় লেগে গেল। ছেলেমেয়েরা ভলাণ্টিয়ার সেজে ছুটোছুটি শুরু করলে, মেলার মাঠে সোরগোল শোনা গেল, উৎসব জমে উঠল ছয়ই পৌষ থেকে।

সাতই-পৌষের ভোর। ছাতিমতলায় উপাসনা। সমস্ত উৎসবটির উদ্বোধন অনুষ্ঠান। জনশূন্য ছাতিমতলায় একদিন মহর্ষি শান্তিলাভ করেছিলেন; সে ছাতিমতলা আজ লোকে-লোকারণ্য,—তাঁরই দীক্ষামন্ত্রটি শুনবার জন্য। এ উৎসবটির পরেই সকালবেলায় এবার আরেকটি বিশেষ অনুষ্ঠান ছিল—আম্রকুঞ্জে পণ্ডিত শ্রীক্ষিতিমোহন সেনকে প্রাক্তন-ছাত্র-ছাত্রীগণের তরফ থেকে সংবর্ধনা জানানো হল। তিনি দীর্ঘকাল যাবত এ আশ্রমের কাজে আত্মোৎসর্গ করেছেন। এ আশ্রমের সুখ-দুঃখ ও ক্রমবিকাশের সঙ্গে তাঁর প্রতিদিনের জীবন জড়িত; তাঁর জীবনসায়াহ্নে প্রাক্তন-ছাত্রছাত্রীগণ কর্তৃক তাঁকে শ্রদ্ধার্ঘ্য দানের এই অনুষ্ঠানটি অতি মনোজ্ঞ হয়েছিল। এইদিন দুপুরে কবিগান ছিল, তারপর শ্রীবিষ্ণু ঘোষ মশাই তাঁর ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে শারীরিক ক্রীড়া প্রদর্শন করলেন। সেই সুনিপুণ ক্রীড়া দেখে দর্শকবৃন্দ প্রীতিলাভ করেছে। রাত্রে বাজি দেখবার জন্য হাজার-হাজার লোক সমবেত হয়েছিল। এবার বাজিপোড়ানোর মাঠটি ছিল প্রশস্ত; আশ্রমের

ভলান্টিয়ার এবং জাতীয় সৈন্য-বাহিনীর ছাত্রদল খুব তৎপরতার সঙ্গে শৃঙ্খলা বিধান করেছেন। বাজি সবাই বেশ ভালোমতো দেখতে পেয়েছে। বাজির শেষে ছিল যাত্রা।

পরদিন ভোরে আম্রকুঞ্জে সমাবর্তন-উৎসবে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ এলেন। এই প্রথমবার বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, ডিগ্রি দেওয়া হল। এরই সঙ্গে কলা-ভবন, সংগীত-ভবন, বিনয়-ভবন প্রভৃতির স্নাতকদেরও মানপত্র দেওয়া হল। শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন এবং শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুকে বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে দেশিকোত্তম (ডক্টর) উপাধি দানে সম্মানিত করা হল। রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁর লিখিত ভাষণ পাঠ করেন বাংলায়। তাঁর অভিভাষণে মহর্ষি ও রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা বিশ্লেষিত হয়ে আশ্রমের মূল উদ্দেশ্যটি সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। রাষ্ট্রপতির শুভেচ্ছা নিয়ে আশ্রম নূতন প্রেরণা লাভ করল।

বিকালে ছিল স্থানীয় সাঁওতালদের নানারকম খেলা। এটি প্রত্যেকবারই মনোরঞ্জক হয়ে থাকে। আটই পৌষ থেকে মেলাটি স্থানীয় জনসাধারণের সমাগমে পূর্ণমাত্রায় জমে ওঠে। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সবাই আসে। এমন কি, মুসলমানদের বৌ-ঝিরা অন্য মেলায় যেতে পারে না, কিন্তু শান্তিনিকেতনের মেলায় তারা অবধি নিঃসংকোচে এসে যোগ দেয়। এখানকার ব্যবস্থার উপর এতটাই তাদের বিশ্বাস। নয়ই পৌষ, দশই পৌষ দেখা যায় খুশী হয়ে লোকে কিনে নিয়ে যাচ্ছে হাতা, খুন্তি, কড়াই, টিনের বাক্স, চুড়ি আর মেঠাই। মনে হয় সারা বছরের জমানো টাকা তারা মেলাতেই খরচ করবার জন্য তুলে রাখে। রাতে দেখে বাজি; আর দেখে সাঁওতালদের নাচ। সারারাত গান গেয়ে মাদল বাজিয়ে সাঁওতালরা নাচ-গান করে।

মেলাতে যেমন আসে সাধারণ লোক, তেমনি আসে ভদ্রজন। আশ্রমের নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আছে এবং আছে মেলায় যাত্রা, কবি প্রভৃতি বাইরের অনুষ্ঠান। তসর গরদ তাঁত ও খাদিভাণ্ডারের বস্ত্রাদি, হাতীর দাঁতের কাজ, গালার কাজ প্রভৃতি নিয়ে চারুশিল্পকলা ও উচ্চতর রুচির নিদর্শনের পাশাপাশি আছে জনসাধারণের উপযুক্ত মিঠাইমণ্ডা, চুড়ি, কাচ, লোহা, পাথর, মাটি, কাঠের জিনিস-পত্র। এই মেলার বিশেষত্বই এটি। নয়ই পৌষ আম্রকুঞ্জে আশ্রমিক-সংঘের বার্ষিক সভা হয়। ভোরবেলাকার অনুষ্ঠান ছিল আশ্রমের মৃতদের শ্রাদ্ধবাসর। শ্রীক্ষিতি-মোহন সেন তাতে পৌরোহিত্য করেন। বেলা ৯টায় সেখানে সভাপতিরূপে শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় মেলার জনসংযোগের কথা বিশেষ ক'রেই বললেন। সবার মধ্যে

সাতই পৌষের উৎসবটি সহজে স্থান পেয়েছে। এইটি তিনি দেখতে পেয়ে খুশী হয়েছেন।

দশই পৌষ, পঁচিশে ডিসেম্বর একটিমাত্র বিশেষ অনুষ্ঠান হয়—যীশুখৃস্টের জন্মোৎসব। সন্ধ্যাবেলা মন্দিরের উপাসনায় মঙ্গল ও আনন্দের সুরটি বেজে ওঠে। এবার এই অনুষ্ঠানটিতে ইউরোপীয় ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ দুটি গান করেছিলেন। উপাসনায় আচার্য শ্রীক্ষিতিমোহন সেন বললেন,—আমাদের সাতই পৌষের উৎসব শুরু হয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সাধনার দ্বারা আর শেষ হয় মহাপ্রভু যীশুর জন্মোৎসবের আনন্দের মধ্যে। উৎসবের আদিতে অন্তে দুটি মহান সুর ধ্বনিত হয়ে ওঠে। প্রায় চুয়াল্লিশ বছর আগে এ দিনটিতে এই মন্দিরে গুরুদেব প্রথম এই মহাসাধকের জন্মদিনের উপাসনা করেছিলেন। তখন কারু প্রশ্নোত্তরে তিনি বলেছিলেন—এ মন্দিরে আমাদের উপাসনার মূলমন্ত্র হচ্ছে 'ওঁ পিতা নোঽসি', সুতরাং এ মন্দির এই মহাসাধকের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ উপাসনা-স্থল। তিনি যে মন্ত্র সাধনা করেই প্রাণ দিয়েছেন। ব্যবসায়ীরা ভগবানকে মানুষের থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল, বলে রেখেছিল—তিনি গুরু, তিনি অলভ্য। যীশুই এসে বললেন—না তা নয়, তিনি পিতা আমাদের সকলের পিতা। পিতার কাছে সন্তানের স্থান সকলের আগে; তিনি সবচেয়ে কাছের, তিনি সবার। সেই মহাপ্রেমিকের জন্মদিনে সকলেরই প্রাণের মন্দিরে উপাসনা হওয়া উচিত। ৩১।১২।১৯৫২

সাতই-পৌষ উৎসবের আর দেরী নেই! বিবিধ আয়োজনের সাড়া পড়ে গেছে আশ্রমের কর্মিমণ্ডলীর মধ্যে। চব্বিশে নভেম্বর কর্মিমণ্ডলীর একটি জরুরী সভা আহ্বান করে আসন্ন মেলা সম্বন্ধে আলোচনা হয়। শোনা যাচ্ছে, মেলা তিনদিনই হবে, বাজি হবে একদিন এবং খুব বেশি দোকান-পসার বসতে না দিয়ে ভাল-ভাল নানা রকম প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হবে। শান্তিনিকেতনের মেলা যেন জনসাধারণ এবং উচ্চ-রুচিসম্পন্ন বিদগ্ধজনের আগ্রহের বস্তু হয়ে ওঠে সে চেষ্টাই করা হচ্ছে। ৯।১২।১৯৫৩

১৫ই পৌষ—পৌষ মাসের শুরু থেকেই আশ্রমে উৎসবের আমেজ লেগেছিল; পনেরো দিন অতিক্রম করল উৎসব শেষ হয়েছে, কিন্তু এখনও তার রেশ পাওয়া যায়। মেলার মাঠে বহু রকম চিহ্নাবশেষ রয়ে গেছে; আশ্রমিকদের বাসায়-বাসায় ছেলেমেয়ের দল বাঁশি বাজাচ্ছে, ঝুমঝুমি বাজাচ্ছে, আর খেলা জমিয়ে তুলছে মেলায়-কেনা খেলনার রাশি দিয়ে। ৫ই পৌষ থেকে আশ্রমের ছুটি আরম্ভ হয়েছে। সেদিন সকালে শিল্পাচার্য শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুকে আশ্রমিক-সংঘ থেকে শ্রদ্ধার্ঘ্য

নিবেদনের উৎসব ছিল। 'নন্দন' গৃহের সম্মুখে গাছের তলায় অনুষ্ঠানটি হয়েছিল। বহুকালের পুরাতন ছাত্রছাত্রী অনেকে এসেছিলেন—রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সত্যেন্দ্রনাথ বিশি, ধীরেন দেববর্মা, রাণী চন্দ প্রভৃতি। আশ্রমিক সংঘের পক্ষ থেকে শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মাঙ্গলিক মন্ত্র এবং অভিনন্দন পাঠ করেন।

সাতই পৌষের মেলা এবার একটু নূতন ধরনে হয়েছে। মেলার শৃঙ্খলা-বিধানের জন্য অর্ধেক মাঠ টিনের বেড়া ও খড়ের চাল দিয়ে ঘেরাও করা হয়েছিল; তারই মধ্যে দোকানপসার সাজানো ছিল, বাকি অর্ধেক মাঠ ছিল কবি, যাত্রা, কীর্তন ও নাটকের আসরের জন্য। এতে খুব সুবিধা হয়েছিল; ভিড়ের ঠেলাঠেলি পোহাতে হয়নি। সার্কাস ও পান-বিড়ি প্রভৃতির দোকানের ভিড বন্ধ করে দেওয়াতে মেলার একটি পরিচ্ছন্ন রূপ ফুটে উঠেছিল। হাতের কাজের জিনিসই এসেছিল বেশি। আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয়, এবারকার মেলাতে গাঁয়ের জনসাধারণের সমাগম হয়েছিল ভদ্রজনের চেয়ে বেশি। এথেকে মনে হয়, সাতই পৌষের উৎসব সাধারণের অন্তরের জিনিস হয়ে উঠছে।

আটই পৌষে বিশ্বভারতী-বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন-উৎসবে মান্য অতিথি হয়ে এসেছিলেন পাটনা হাইকোর্টের জাষ্টিস্ এবং আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র শ্রীযুক্ত সুধীরঞ্জন দাশ। তাঁর অভিভাষণে তিনি আশ্রমের প্রাক্তন জীবনের একটি সুন্দর ছবি এঁকেছেন।

নয়ই পৌষ বিকালে সমাবর্তন-উৎসবের মান্য অতিথি শ্রীযুক্ত সুধীরঞ্জন দাশের আহ্বানে চীনভবনে আশ্রমের কর্মীদের একটি ঘরোয়া সভা হয়। তাতে তিনি বিশ্বভারতীর দায়িত্বের গুরুত্বের কথা সবাইকে বুঝিয়ে বলেন এবং সকলের মধ্যে যাতে ঐক্য গভীর হতে থাকে তারই চেষ্টা করতে বলেন। দশই পৌষ রাত্রে মন্দিরে যথারীতি খৃস্টোৎসব পালন করা হল। দুবছর যাবত এইদিনের মন্দিরে বিদেশিগণও গান করেন। এবার তাঁরা দুটি ইংরাজী গান করেন। ভাষণে শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন বলেন—গানে বলা হয়েছে কোন্ আলোকে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আস। সকল দেশের মহাপুরুষগণ একই আলোর বাণী বহন করে আনেন; পৃথিবীর সকল দেশে সকল জাতিই সে-আলোর অধিকারী হয়। সে অধিকারের মধ্যে কোনো ভেদ নেই। পঁচিশে ডিসেম্বর এমনি এক মহাপুরুষ পশ্চিমে যে-আলোক বহন করে এনেছিলেন, সকল দেশের সকল লোকই সে আলো গ্রহণ করে জীবন সার্থক ও সমুজ্জ্বল করতে পারে। সে মহাপুরুষ জন্মেছিলেন পশুর

খাদ্যগ্রহণের পাত্রের মধ্যে। সে স্থানই তাঁর উপযুক্ত ছিল। কারণ, আমাদের সকলের হৃদয়েই পশু রয়েছে; তিনি সে-হৃদয়ে স্থান নিয়ে সে-পশুকে তাড়িয়েই তো আলো দান করবেন, প্রাণীকে মুক্তি দেবেন।

এগারোই-পৌষ উৎসব-শেষে বিভিন্ন বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীগণ দেশ-ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন। ১৭ই পৌষ শিক্ষা বিভাগগুলি খুলবে—এ ক'দিন সব বিভাগের ছাত্রছাত্রীগণ নানা জায়গা বেড়িয়ে নানারকম জিনিস দেখে আসবে। এখন তাদের ঘরের উৎসব শেষ হয়ে বাইরের উৎসব চলছে।

৬।১।১৯৫৪

১লা জানুয়ারি—মহর্ষি ব্রাহ্মধর্মের দীক্ষা-গ্রহণের পুণ্যতিথি ৭ই পৌষ। ১২৯৮ সনে (ইং ১৮৯১) এই দিনটিতে শান্তিনিকেতনে মহর্ষিদেবের ইচ্ছায় মন্দির বা মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়; সেই থেকে এখানে সাতই পৌষের উৎসব চলে আসছে। ১৩০৮ সনে (ইং ১৯০১) রবীন্দ্রনাথ সেই পুণ্য দিনটিতেই এখানে বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এবার মন্দির প্রতিষ্ঠার তেষট্টি বছর ও বিদ্যালয় স্থাপনের তিপ্পান্ন বছর পূর্ণ হল। সাতই-পৌষের উৎসবও অর্ধশতাব্দী যাবত সম্পন্ন হয়ে আসছে। আজকাল দেশ-বিদেশের জনসমাগমে উৎসব বিশেষ একটি আন্তর্জাতিকরূপ লাভ করেছে বলা যায়। এবার ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও বিশ্বভারতীর আচার্য জওহরলাল নেহেরুর আগমনে উৎসবটি পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

মাসখানেক আগে থেকেই চারদিকে উৎসবের রব উঠেছিল; তিন-চারদিন আগে থেকে তো রীতিমতো মেলাই শুরু হয়ে গেল। সাতই পৌষ সকালে বৈতালিকদল 'আঁধার রজনী পোহাল, জগত পুরিল পুলকে' গানটি গেয়ে আশ্রম প্রদক্ষিণ করতে লাগলেন, ওদিকে মেলার মাঠের চৌমাথায় নহবৎখানায় নহবৎ বাজতে লাগল। এই নহবৎখানাটি বহু বছর ধরে এই চৌমাথায় তালগাছের চারটি গুঁড়ির উপর খাড়া ছিল এবং সাতই পৌষ উৎসবের তিনদিন প্রহরে-প্রহরে সেখানে নহবৎ বাজত। কয়েক বছর হল, গাছটি ভেঙে পড়ে গিয়েছিল; নহবৎ বাজত 'শান্তিনিকেতন' বাড়ির উপর। এবছর কারুকার্যমণ্ডিত হয়ে নতুন নহবৎখানা তৈরি হয়েছে এবং তাতে মেলার শোভা বাড়িয়েছে।

নহবৎ বাজিয়েছেন, কলকাতার আলি হোসেনের সম্প্রদায়। সাতই পৌষ উৎসবের উদ্বোধন-উপাসনা বছর তিনেক ধরে মন্দিরে না হয়ে ছাতিমতলায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বহু জনসমাবেশ হওয়া সত্ত্বেও এবারকার উপাসনা খুব শান্ত-গম্ভীর পরিবেশে সেখানেই সম্পন্ন হয়েছে। উপাসনার শেষে আগের মতো আর

ছাতিমতলা ঘুরে 'কর তাঁর নাম গান' গাওয়া হয়নি; গানটি ছাতিমতলায় দাঁড়িয়ে গেয়ে প্রণাম জানিয়ে সবাই চললেন উত্তরায়ণে 'আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে' গান ক'রে। মহর্ষিদেবের নিভৃত নির্জন ছাতিমতলার উপাসনার মধ্যে যে উৎসবানন্দের বীজমন্ত্র নিহিত ছিল, রবীন্দ্রনাথের সাধনায় সফলতা লাভ করে সেটি আজ ৭ই পৌষ উৎসবের বৃহৎ রূপ ধারণ করে চলেছে—উৎসবের আরম্ভে দুই সাধকের উদ্দেশে প্রণতি জানিয়ে উৎসবের মঙ্গলাচরণ সারা হল।

উপাসনা শেষ হলে এদিকে জমে উঠল মেলা, ওদিকে চলল জওহরলালের আগমন-প্রতীক্ষা ও তাঁর অভ্যর্থনার আয়োজন। বেলা দুটার সময় তিনি পানাগড় থেকে খোলা গাড়িতে দাঁড়িয়ে শান্তিনিকেতনে এলেন। বোলপুরের রাস্তায় বোলপুর বালিকা-বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ জওহরলালকে 'গার্ড অব অনার' দেন। একটি ছোট্ট শিশু তাঁকে মালা দেয়। জওহরলাল অত্যন্ত খুশী হয়ে তার মালা গ্রহণ করেন। শান্তিনিকেতনে উত্তরায়ণের ভিতরে তাঁকে 'গার্ড অব অনার' দেওয়া হয়। সাতই পৌষ বিকেলে ছিল বিশ্বভারতী-পরিষদের অধিবেশন। উত্তরায়ণের ভিতর সেটি সম্পন্ন হল। সারা বিকেল জওহরলাল কর্মব্যস্ততার মধ্যে কাটালেন। তার মধ্যেও একবার হঠাৎ এসে খোলা গাড়িতে ঘুরে গেলেন মেলা।

লোক অতিমাত্রায় উৎফুল্ল হয়ে উঠল। মেলা-ফিরতি লোকের মুখে এবার কেবল শোনা গেছে—আমিও জওহরলালের কাছকে গিয়েছিলাম। কেউ বা বলছে—আমার পাশেই এসেছিলেন একেবারে। ভাল করে দেখে নিয়েছি।

পরদিন আটই পৌষ রাত থাকতে আম্রকুঞ্জে লোক আসতে শুরু করলে। বেলা সাতটার পরে বহু লোক সমাবর্তন-উৎসব দেখতে এসে ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরে গিয়েছে। **পুলিশ ও আশ্রমের ছাত্রছাত্রী ভলাণ্টিয়ার দল অতি কষ্টে জনতা নিয়ন্ত্রণ করেছেন।** জওহরলালকে অবধি সময় সময় উৎকণ্ঠিত মনে হচ্ছিল। কিন্তু যেমনি তিনি ভাষণ দিতে শুরু করলেন অমনি সেই পনেরো হাজার লোকের জনতা মুহূর্তে চুপ হয়ে গেল; মনোযোগ দিয়ে সকলে তাঁর ভাষণ শুনতে লাগল। আশ্রম থেকে দেওয়া বাতিকের-চাদরটি গলায় ঝুলিয়ে ধীর স্থিরভাবে তিনি বক্তৃতা দিয়ে চললেন; **সভা শেষে 'আমাদের শান্তিনিকেতন' গান গাওয়া শেষ হওয়া অবধি তিনি মঞ্চ থেকে নিচে নেমে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপরে জনতার চাপের মধ্যে পড়ে অতি কষ্টে গাড়িতে গিয়ে উঠলেন।** বিকেল বেলা তাঁর শ্রীনিকেতন দেখবার কথা ছিল; কিন্তু সমাবর্তন সেরেই সকালে তিনি চলে গেলেন শ্রীনিকেতনে। সেখান থেকে

ফিরে এসে আশ্রমের ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের অনুরোধে, বলা-কওয়া-নেই রান্নাঘরে এসে সকলের সঙ্গে মিলে খেতে বসে গেলেন। সেদিন রান্নাঘরে রান্না হয়েছিল শুধু মুসুরির ডাল, বেগুন ভাজা, সীম আলু বেগুন ও কপির ডাঁটা দিয়ে একটা চচ্চড়ি, আলু কপির ডালনা আর লাউয়ের চাটনি। খুশী হয়ে তিনি তাই খেলেন। রান্নাঘরের ঠাকুর-চাকর সবার সঙ্গে হিন্দীতে আলাপ করে এলেন। কোথায় বা রইল পুলিশ আর কোথায় বা ভলান্টিয়ার। তাঁর পেছনে-পেছনে অগুন্তি জনতার ভিড় চলেছে,—সেও এক মেলা! এদিকে মেলায় চলছে তখন বিকিকিনি, ঘুরছে নাগরদোলা, ওদিকে বাউল, কবি গান, সব মিলে চারদিকে একটা হৈ হৈ,—সমস্ত আশ্রম আনন্দে মাতোয়ারা। রাত্রে উত্তরায়ণের ছাদে বসে জওহরলাল বাজি-পোড়ানো দেখলেন। ৯ই পৌষ সকালে তিনি আশ্রম ছেড়ে যাবার সময় আশ্রমের ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপক, কর্মী সবাই 'আমাদের শান্তিনিকেতন' গান গাইলেন। তিনি খোলা গাড়িতে দাঁড়িয়ে জোড়হাতে সবার নমস্কার গ্রহণ করতে করতে বোলপুরের পথে এগিয়ে চললেন। ভুবনডাঙার পথে কত বৃদ্ধ-বৃদ্ধা তাঁকে ফুল দিয়েছেন, তিনি হাত বাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করেছেন। জওহরলাল চলে গেলে অর্ধেক আনন্দ যেন কমে গেল। সবাই মনোনিবেশ করলে মেলায়।

৯ই পৌষ সকাল সাতটায় ছিল মৃত আশ্রমিকদের স্মরণসভা এবং ২টায় আশ্রমিক সংঘের বার্ষিক-সভা। বার্ষিক-সভায় আশ্রমের প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রীপ্রমদারঞ্জন ঘোষ সভাপতি হয়েছিলেন। তিনি সভ্যদের আশ্রমের প্রতি কর্তব্যের কথা বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দেন এবং বলেন—কাজের মধ্যে মতের বিভিন্নতা থাকতে পারে কিন্তু সে মতান্তর যেন মনান্তরে পর্যবসিত না হয়।

এর পরে বিশ্বভারতীর প্রাক্তন ছাত্র বাংলার প্রাক্তন অর্থসচিব শ্রীনীহারেন্দু দত্ত মজুমদার বলেন, প্রায় উনচল্লিশ বছর আগে আমি শান্তিনিকেতনের ছাত্র ছিলাম। এতদিন পরও যেই এখানে এসেছি অমনি মনে হয় যেন সেদিনকার মতোই নিজেদের মধ্যে এসেছি। চিরদিনই শান্তিনিকেতন এ আনন্দ আমাদের দেবে। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ মাটির স্তর খুঁড়ে খুঁড়ে সব অজানা জিনিস আবিষ্কার করে যে আনন্দ পান, তেমনি আনন্দ পাওয়া যায় এখানকার আদিপর্ব থেকে বর্তমানকাল অবধি পর্বের পর পর্ব পর্যবেক্ষণ করে। যুগের মহা-সন্ধিক্ষণে ঋষি কবি ও দ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ এ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কাজে ব্রতী হন। উনবিংশ শতাব্দীতে জাতির স্রষ্টা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ প্রভৃতি মহাপুরুষদের কাজ শেষ

হয়ে গেলে, বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই দুই মহাপুরুষের আবির্ভাব হয় ভারতের ইতিহাসে; এঁরা দুজন হচ্ছেন—রবীন্দ্রনাথ ও অরবিন্দ। অরবিন্দ প্রত্যক্ষত বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েছিলেন, পরে তাঁর দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল জাতির ভবিষ্যৎ। তিনি বলেছিলেন—নিশ্চিত জানি ভারতবর্ষ একদিন স্বাধীন হবেই; কিন্তু ভারতবাসী সে-স্বাধীনতা নিয়ে করবে কী? তারা হবে কী? তাই অরবিন্দ মানুষকে আধ্যাত্মিক আদর্শে গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। রবীন্দ্রনাথও ঠিক সেই কাজই আরম্ভ করেছিলেন শান্তিনিকেতনে। ধ্যান দৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছিলেন জাতির ভবিষ্যৎ; এই প্রতিষ্ঠান গড়ে নৃত্যে-গীতে, শিল্পে, সাহিত্যে তিনি জাতির ভবিষ্যৎ চিত্র সেদিন ধরেছিলেন সবার সামনে। রাশিয়া ঘুরে এসে তাঁর মনে সে চিত্র আরো সুস্পষ্ট রূপ ধরল, তিনি বললেন—আজ রাশিয়ার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যে যা দেখে এলুম, অনেকদিন আগে পাবনা-সম্মিলনীতে আমি জাতির সম্মুখে সে চিত্রই তুলে ধরেছিলুম এবং তারপরে শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠানে তারই রূপ দিতে বসেছি। তাঁর সেই বৃহৎ ভারতের চিত্ররূপ আজ কিছুটা প্রকট হয়ে উঠেছে এ প্রতিষ্ঠানে। তিনি এখানে গড়তে চেয়েছেন জ্ঞানী, ধ্যানী, কর্মী; গড়তে চেয়েছেন পূর্ণতর মানুষ। এখানকার ভাবধারার মধ্যে সে আদর্শ ছড়িয়ে রয়েছে। এ প্রতিষ্ঠান শুধু বাঙালীর নয়, শুধু ভারতবাসীর নয়, বিশ্ববাসীর। ভারতের মন্ত্র চিরদিনই বিশ্বের মন্ত্র, ভারতের বাণী—বিশ্বের বাণী। রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠান বিশ্বের প্রতিষ্ঠান হয়ে ভারতের আদর্শ বিশ্বে ছড়িয়ে দেবে। শুধু প্রাক্তন ছাত্র হিসাবে নয়, স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসাবে আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব রয়েছে এই প্রতিষ্ঠানের আদর্শকে ও প্রতিষ্ঠানকে বাঁচিয়ে রাখবার। প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল তাই আজ এর প্রতি একান্ত দৃষ্টি দিয়েছেন। আমাদের সম্মিলিত চেষ্টায় এখানে মানুষ গড়ে উঠুক, এই হোক আমাদের সবার কামনা।

৯ই পৌষ দুপুরে ছিল সাঁওতালদের খেলা। সেটি প্রতিবারের মতো এবারও খুব জমে উঠেছিল। ৪টায় প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের সভা হয় উত্তরায়ণে। রাত্রে খৃস্টোৎসব হল মন্দিরে। অন্যান্য বার দশই পৌষ এই উৎসবের তারিখ পড়ে। মেলা তখন অনেকটা ভেঙে আসে, কোলাহল ক্ষীণ হয়ে যায়। এবার পরিপূর্ণ মেলার দিনে খৃস্টের জন্মোৎসব পালিত হল গান ও বাইবেলের স্তোত্রপাঠে। শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন অধ্যাপক গুরুদয়াল মল্লিক ও বর্তমান ইংরেজির অধ্যাপক মি. নর্থ উপাসনায় আচার্যের পদ গ্রহণ করেন। মন্দিরে ভিড় হয়েছিল যথেষ্ট।

দূর-দূরান্তরের গ্রাম থেকে যাঁরা মেলা দেখতে এসেছিলেন তাঁরাও উপাসনায় যোগ দিয়েছেন। মেলা কোলাহলের মধ্যে খৃস্টের প্রেমের বাণী শুনে গেলেন তাঁরা।

তিনটে দিন যে কোথা দিয়ে আনন্দে কর্মব্যস্ততায় কেটে গেল, বোঝাই গেল না। ৪।১।১৯৫৫

২০শে ডিসেম্বর—মেলা এসে গেছে। দলে-দলে লোক আসছে—এদিক-সেদিক যেদিকে চাওয়া যাবে—দেখা যাবে লোকের সারি। নর-নারী-শিশু-বৃদ্ধ—বাঙালী-অবাঙালী-বিদেশীও আছে কত—ঘুরেফিরে এরা সোজা এসে দাঁড়াবে একবার 'শ্যামলী'-প্রাঙ্গণে। তার এপাশ-ওপাশ, আনাচ-কানাচে তারা চোখ মেলে-মেলে তাকিয়ে ফেরে—যা দেখতে চায়,—দেখবেই,—নাই বা থাকুক তা সামনে;—এতকাল ছিল ফাঁকা; দেহলীর গায়ে আঁকা জোড়া দৌবারিক মূর্তির একটি হঠাৎ গত বাদলায় ভেঙে পড়েছিল, মাটির চালাও গিয়েছিল খসে;—ভাঙাচোরা কোথায় গেল মিলিয়ে—জাদুর ছোঁওয়ায় ঝল্‌মল্ করে উঠল মায়াপুরী। আঙিনাটি নিকোনো, জমির উপরে নূতন আস্তরণ,—সাদা-হলুদে ফুলেভরা কাঠগোলাপের বাঁকানো গাছটিকে সামনে রেখে আগের মতোই তেমনি যেন বুকভরা কোন্ সম্পদের গর্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কবির 'শেষবেলাকার ঘরখানি'—এই 'শ্যামলী'। 'উদয়নে' চলছে লোকের আনাগোনা, শ্যামলী-অঞ্চলও কর্মচাঞ্চল্যে সজীব। বিশ্বভারতীর স্থানীয় প্রকাশনা-বিভাগটি সদ্য স্থানান্তরিত হয়েছে শ্যামলী গৃহে। জানলায়-জানলায় কাগজপত্র সাজানো টেবিলগুলি দিন ভুল করিয়ে দেয় পুরানো-চোখে; স্ট্যাম্প-সন্ধানী শিশুবিভাগের দলও দেখা দেয় সকাল-বিকালে; লেপাপোঁছা-ঝাঁটপাটের কাজে নিরত থাকে সাঁওতাল মেয়ে; কাক, কাঠবিড়ালি, দোয়েল, চড়াই নড়ায়-চড়ায় ব্যস্ত রয়েছে চারদিকে; প্রজাপতির পাখায়-পাখায় আলোর ঝলক লেগে রঙের মেলা মিলেছে হরেক রকমের। কাজ চলছে টুক্‌টাক। টুপ্‌টাপ্ ফুলের পাপড়ি আর পাতা ঝরারও শেষ নেই,—কাঠ-গোলাপের ঝরাপাতার পসরাটি মেলা রয়েছে সামনেই;—কালোপাড়-মোড়া অর্ধচন্দ্রাকার বেদীর সামনে দাঁড়িয়ে দর্শকগণ ফিরতিমুখে মিলিয়ে দেয় তাদেরো মনের অর্ঘ্য নীরব বন্দনায়।

'উদয়নে' বসেছে দরবারের মেলা। ঘাসের ঘেরাটোপ ঘুরিয়ে নিয়ে আঙন পরেছে গেরুয়া-কাঁকরের ঘাঘরা। চাতাল ঘিরেছে চন্দ্রমল্লিকার সাদা ঝাড়ে, মরশুমির রঙীন বুটিদার ঝালরে ঝিক্‌মিক্ করছে দেউড়ি। ধোয়া-মোছা রং-করা তার ঘরে বাইরে; চলেছে সাজের সমারোহ। দোতলার অফিসঠাসা কক্ষগুলি,—

খালি হয়ে এবারে রূপান্তরিত হচ্ছে সমৃদ্ধতর বেশে অতিথিশালায়। বিশ্বভারতী তার প্রিয় আচার্যের অবস্থানের জন্য যথাসম্ভব সুচারু বাসোপকরণে সাজিয়ে রাখছে সেখানকার গৃহতলা। কবিপুত্রবধূ স্বয়ং শ্রীযুক্তা প্রতিমা দেবী গৃহের ঐতিহ্যানুরূপ মাননীয় অতিথিদের সেবা ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যবিধানের তত্ত্বাবধানে যত্নবান রয়েছেন,—উপাচার্য শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সনির্বন্ধ আগ্রহও রয়েছে তার পিছনে। উপাচার্যের মোটর সকাল-বিকাল ঘোরাফেরায় সরব আছে 'উদয়ন'-প্রাঙ্গণে—দেখাশুনা, পরামর্শ, হাঁক-ডাকে—বোঝা যায় একটা-কিছু হচ্ছে বটে। বিশ্বভারতীর সরকারী সভাসমিতি চলেছে একটার পর একটা; প্রবীণ সভ্যদের হাবভাবে খেলে বিপুল দায়িত্বের আভাস; কর্মের মেলা জমেছে যত ঝানু জাঁদরেল কর্ম-সচিব কক্ষে। অ্যানুয়েল রিপোর্ট, অডিট্, একজামিনেশন্ আর নানা এন্‌গেজমেণ্ট, ইণ্টারভিয়ুতে একাকার তাঁর 'মুখ্য' আসর; সঙ্গে সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলেছেন গভীর বিষয়জ্ঞ হিসেব-সচিব মশায়; নথিপত্রের ফাইলকক্ষে তাঁর ধীর-গম্ভীর গতিবিধিতে আর ওদিকে ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের কর্মীদের হাজার রকমের ট্যানা-হ্যাঁচড়াময় ব্যবস্থা উদ্যোগে মেলার আবহাওয়া ভরে উঠেছে বিচিত্রভাবে। সুখের বিষয় বহুদিন বাদে প্রাক্তন আশ্রম-সচিব ও শিল্পী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর মহাশয়কে দেখা যাচ্ছে আশ্রমের নানা ব্যবস্থাপনার সহায়তায়। বিশেষ করে সমাবর্তন-আসরের সমস্ত সাজ-সজ্জার কাজ তাঁরই নির্দেশে নির্বাহিত হচ্ছে। সাব-কমিটির ভারপ্রাপ্ত কর্মিগণ ঘন ঘন ঘুরে যাচ্ছেন কেন্দ্রীয় অফিসে, ফোনে-ফোনে হচ্ছে খবর-চলাচল। কবে কে আসবে, কোথায় কে থাকবে, কারা কাদের দেখবে-শুনবে—এরি চলছে সমাধান। এবার আবার আরো ব্যাপার। একটা না মিটতেই আর একটা—'সাতই পৌষে'র পর সমাবর্তন। বাইরে থেকে লোকে ভাবছে, কোনটাতে যাই; এখানকার লোকের ভাবনা—কোন্‌দিক সামলাই। দু'দিনকার কথা মনে রেখেই সকলের সব আয়োজন চলছে। প্রথমটায় আসবে 'মেলার' আকর্ষণে লোক, পরেরটায় বসবে 'লোকে'র আকর্ষণে মেলা। আজকাল যা হয়ে দাঁড়িয়েছে—'নেহেরু' মানেই লোকের মেলা—সে মেলা আবার মেলা-লোকের মেলাই নয়, দেশে-দেশেরও মেলা। বিশ্বভারতী সেই মেলারই তো নামান্তর মাত্র। তার আচার্য শ্রীনেহেরু, নেহেরুর কাজ বৃহত্তর-বিশ্বভারতীরই কাজ। আজ আরো সেটা প্রকট। এই কারণে বিশ্বভারতীয় পক্ষে আরো তা আনন্দের হয়েছে। মেলার আনন্দের পাশেপাশে সেই কথাটি মনে উঠে লোকের আরও আগ্রহ বাড়ছে। পরবর্তী সমাবর্তন-উৎসবে নেহরুর ভাষণ, সে যে বিশ্ববাসীর কাছে বিশ্বভারতীরই

ভাষণ। বিশ্বভারতীর কর্মী ও ছাত্রছাত্রীদল তাঁদের প্রাণের প্রদীপ জ্বেলে নেবেন নূতন ক'রে নবযাত্রাপথে সেই ভাষণের আলো থেকে,—আর, কণ্ঠে-কণ্ঠে মিলিয়ে বেজে উঠবে আমবাগানে একতানে সেই চিরানন্দগীতি—

—'আমাদের শান্তিনিকেতন'—

এতদিন বেজে আসছে যা এখানে পথে-ঘাটে, বিশ্বভূমিকায় বৃহৎ হয়ে আজ মিলছে-না কি তারি ধারা 'শান্তির দূত' শ্রীনেহেরুর কথা ও কাজের অনুকরণে। ২৬।১২।১৯৫৬

৩০শে ডিসেম্বর—সাতই পৌষ চলে গেল। মেলাও ভাঙল। মাঠে যা পড়ে আছে—ধূলি, ধোঁয়া, ছাই-পাশ। সাফাই চলেছে সকালে-বিকালে,—খাটছে মজুর-মজুরাণী, উড়ছে কাকের দল।—কোথা থেকে হাজার হাজার লোক এল, কদিন ধ'রে উঠল কত কল-কাকলী, হাসি বাঁশি-গানে-আলাপে, জনস্রোতের এলোমেলো চলাচলে চারদিক হল মুখরিত, আন্দোলিত; ঘরে-ঘরেও কত অতিথি-অভ্যাগতের ভীড়;—কেনাবেচা দেখাশুনা সব পাট চুকিয়ে দিয়ে,—সকলকে মিলিয়ে, মেলা এবার মিলিয়ে গেল বছরের মতো। সমাবর্তনের অভাবে আমবাগান গেল ফাঁকা; সভা-সমিতি বা কীর্তনের আসরেও সে-ফাঁকা ঢাকা পড়েনি। মেলার মাঠে এবার দোকানপাটও কিছু কম এসেছিল, তা সত্ত্বেও বিকেল থেকে লোকে-লোকারণ্য—পথ-চলা হয়েছে দায়। কবি, কীর্তন, বাউল, যাত্রা—সবই হয়েছিল; তেমনি ছিল সিনেমা, আতশবাজি, খেলাধুলার বিচিত্র আয়োজন। লোকের চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা হয়েছে বরাবরকারই মতো। এর মধ্যে প্রায় একটানা আসর চলেছিল—বাউলদেরই। গ্রামের লোকের সঙ্গে শহরবাসীর, পুরানোর সঙ্গে নতুনের, এ সমাবেশ হয় বছর-বছরই; কান-ও পাতে লোকে আসরে-আসরে,—কিন্তু প্রাণ-মাতাবার বস্তু মিলে কচিৎ। কেবল একটা-কিছু নিয়ে ভিড়ে থাকা, সবই একটু-একটু চেখে যাওয়া মাত্র। পরিবেশকের গলায় নেই সুর, সুরে নেই বৈচিত্র্য, কথায় নেই রস, রসে নেই গভীরতা, ভাবভক্তি দূরে থাক্, অকৃত্রিম আবেদনটুকুও যদি রক্ষা পেত;—মড়া আগলে রাখার মতো ক'রে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে লোকে বাঁধি-বোল নিয়ে পড়ে আছে—জীবনের জোগান মরে এসেছে—জেগে উঠ্‌ছে আর্টের জলুস। তাই নূতন গানও আর তেমনি তৈরি হয় না, যা হয় তাতে সাড়া তোলে না। জীবনভোর সাধনার মুখে আপ্তবাক্যের মতো উত্থিত যে গান, আজো তার সূক্ষ্ম প্রতীক্ষা ফিরছে হৃদয়ে-হৃদয়ে—আসরগুলির অকুলান জনসমাগম তারই আভাস দেয়, তেমনি তাতে অতৃপ্তির অধৈর্য প্রকাশ করে সেই জনসমাগমের

অবিরাম অস্থিরতা। কী চেয়ে কী যে মিলে না। পশ্চিমবঙ্গের সমৃদ্ধ লোক-সংস্কৃতির অন্যতম বাণীরূপ ছিল কবি-কীর্তন-বাউল সংগীত। আজ সর্বত্রই তার এই দশা বললে বোধহয় অত্যুক্তি হবে না। সম্প্রতি আবার শহরের টানে তাকে ধরেছে;—সে টান কোথায় নিয়ে ছাড়ে,—সেও আবার এক ভাবনার বিষয়। বৈচিত্র্য বাড়বে সন্দেহ নেই—কিন্তু বেচাকেনার জিনিস হয়ে সে তার বাঁচবার প্রাণবস্তু না হারালেই ভালো। কেবল কবিত্ব আর কলাখচিত সুরেলা গলারও জিনিস নয় এরা,—তাহলে, সিনেমা ও রেডিয়োর রং-দার হাজারপ্রযোজনার দৌলতে এদের উজ্জীবনের জন্য আর ভাবনা থাকত না; কিন্তু জগৎ মাতিয়েছে যে ন্যাড়া বাণী ক'টি রবীন্দ্রনাথের হিবার্ট-লেকচারের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মেরে,—তাদের পেছনে জোড়া ছিল যে সাধকজীবনের উপলব্ধির উৎস, আজ কি সে-সবের দেখা মেলে আর স্টুডিয়োতে বা এই মেলার মাঠে? অথবা, আচার্য ক্ষিতিমোহনের মতো ক'জনই বা তেমন খুঁজে ফেরেন তাদের গাঁয়ে-গাঁয়ে আখড়ায় মঠে? রবীন্দ্রনাথেরও একদিন সংযোগ ঘটেছিল এই মরমী জীবনধারার সঙ্গে—শিলাইদহের পর্বে তার পরিচয় নিহিত আছে; কুষ্টিয়ার লালনফকির, সাজাদপুরের বৈষ্ণবী—আর শিবু কীর্তনীয়ার সুরের আবর্তনে কী অপূর্ব ভাবের ফোয়ারা যে স্ফুর্ত হয়েছে কবির সাহিত্যে, তাঁর ধ্যানদৃষ্টিকে আরো গভীর ও সর্বাশ্রয়ী হয়ে উঠতে বেগ জুগিয়েছে কত যে এদের সহজ মানবিক-প্রবর্তনা, —সর্বাস্তিবাদী রবীন্দ্রনাথের সে সব রহস্য নিগূঢ় অনুধ্যানের অপেক্ষা রাখে। "—গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথে"-র পাশে বসা আসরগুলিতে সেই পুরানো স্মৃতিই নূতন করে জাগিয়ে দেয়। শান্তিনিকেতনের মেলার বৈশিষ্ট্য একটি এই যে, এখানে শহর এসেছে গ্রামের আওতায় গুরু'গৌরব ছেড়ে, আর গ্রাম মেলে ধরেছে তার সামান্য মেলানি অকুণ্ঠ আমন্ত্রণে। সমাবর্তন এবার সঙ্গে না থাকায় শিক্ষিতের আমদানি ক্ষীণ হবার কথা; সে হিসাবে বাইরের অতিথি যথেষ্টই এসেছিলেন বলতে হবে; এতে এই কথাটাই বোঝা গেল, মেলার আকর্ষণও এখন কম নয়। জিনিসপত্রের মধ্যে কাঠের দরজা-জানালার বহর ছিল বেশি; বিক্রিতে জিতেছে মিষ্টান্নভাণ্ডারগুলি। সাঁওতালরাও এসেছিল দলে দলে, যেমন আসে প্রতিবারই—কিন্তু তারা এখন যে আত্মসচেতন হয়ে উঠছে—এবারই প্রথম তার পরোয়ানা জারি হতে দেখা গেল। আদিবাসী-উন্নয়ন-সমিতির হয়ে সাঁওতাল যুবকরা মাইকযোগে জোরালো বক্তৃতা ও সংগীত শুনিয়ে সকলকে আকৃষ্ট করেছিল। ওদিকে বিদ্যাভবনের গবেষক ছাত্রমণ্ডলী নেমে পড়েছিলেন যাত্রার আসরে তাঁদের 'রাজসিংহ' পালাভিনয়ে।

শ্রীনিকেতনের সমাজসেবাশিক্ষণ-কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত—মানবকল্যাণে বিশ্বসংস্থার (য়ুনেস্কোর) কাজের সচিত্র বিজ্ঞপ্তি-সজ্জিত স্টলটি সাধারণকে বহু তথ্য জানবার সুযোগ দিয়েছে। বছরে এই ৭ই পৌষ উপলক্ষ্যেই একবার আবাল-বৃদ্ধ নরনারীর বাঁধা আগমন হয়ে থাকে শান্তিনিকেতনে। এসময়ে 'কলা বেচা' যে যাই করুক, বিশ্বভারতী বা ঠাকুরের 'রথ'টাও তারা দেখে নিতে চায় অনেকেই। কিন্তু তখন আশ্রমের বিভাগগুলি থাকে বন্ধ। বাইরে-বাইরে ঘুরে গিয়ে মেটে না লোকের আগ্রহ, প্রত্যক্ষে পায় না তারা এর কোনো বিশেষ পরিচয়। মেলার একটি বিস্তৃত স্টলে,—বিক্রির জন্য নয়, বোঝবার সুযোগ দেবার জন্য,—বিশ্বভারতীর সমস্ত বিভাগের উদ্দেশ্য ও কাজের পরিচয় দিয়ে, নানা জিনিস ও পুঁথিপত্রের একটি সুশৃঙ্খল সমাবেশ রাখলে, প্রতিবেশের সঙ্গে হয়তো হৃদ্যতা প্রসারের পথ আরো প্রশস্ত হত। বিশেষ ক'রে এ প্রস্তাবটি ওঠবার কারণ ঘটেছে এবারেই—যেহেতু সঙ্গে সমাবর্তন নেই। সমাবর্তন-সভায় আচার্য উপাচার্য ও প্রধান অতিথিদের ভাষণে বিশ্বভারতীর কাজের কথা অনেকটা জানা যেত, যদিও তখনো দেখবার এবং আরো-কিছু শুনবার অভাব লোকে বোধ করত প্রতিবারই। অগণিত আগন্তুকের মধ্যে এবার একজন বয়স্ক পল্লীবাসী গিয়ে হাজির 'শ্যামলী'-প্রাঙ্গণে। খুঁজছে ঠাকুরের জায়গাখানি। সেখানে উপস্থিত ছিলেন এক সম্ভ্রান্ত মহিলা। তিনি বললেন,—'গুরুদেব তো নেই, মারা গেছেন।' লোকটি জিভ কেটে অমনি বললে, "না না ওকথা বলবেন না,—বলতে নেই; তিনি আছেন; 'গুরু'দের কি মৃত্যু হয়?" 'শ্যামলী'তে কবি থাকতেন জেনে, সেখানকার মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে মহিলাকে অবাক করে লোকটি চলে গেল। আর-একদিন এলেন সশিষ্য একতারাধারী এক বৃদ্ধ বৈষ্ণব সাধু। মেলা তখন শেষ হয়ে গেছে। শুধানো গেল, "এখন আসা কী মনে করে?" সে বললে, "আমাদের আর সবাই মেলা দেখে গেছে; আমি এলাম 'বাবা'-র জায়গাটি একটু দেখে যেতে—তিনি অবতার ছিলেন। এ যে পুণ্যতীর্থ।" বাড়িটির উদ্দেশ্যে নমস্কার ক'রে সৌম্যশান্ত সাধুজি যখন স্নিগ্ধ মুখটি তুললেন তখন তাঁকে বুঝিয়ে বলার আর কিছু ছিল না—ভিতরে তিনি পেয়ে গেছেন যেটুকু পেতে ছিল তাঁর প্রত্যাশা। রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত এসেছিলেন মেলার মধ্যে—সে খবর বিশ্ববিদিত,—তার সঙ্গে 'ওরা'ও যে আজ খবর করতে আসে—সে খবরাখবর না রাখলে, দেখা দেবে না শান্তিনিকেতনের মেলার পুরো সার্থকতা। ২।১।১৯৫৭

১৯শে ডিসেম্বর—আসছে রবিবার শান্তিনিকেতনের ৭ই পৌষের মেলা শুরু

হবে। দেশেবিদেশে এই দিনটির কথা অনেকের মনে হবে, অনেকে চলে আসবেন শান্তিনিকেতনেই। প্রতিষ্ঠানের আচার্যরূপে স্বয়ং আসছেন শ্রীনেহরু; এর আকর্ষণও কম নয়। সঙ্গে-সঙ্গেই লোকের মনে জাগবে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ বার্ষিক সমাবর্তনের সমৃদ্ধি দেখবারও ঔৎসুক্য। তারপরে আছে, বিশ্বভারতী পরিষৎ, আশ্রমিক সংঘ, ইত্যাদি নানা সভা-সমিতি, এবং বৈতালিক, উপাসনা, কীর্তন, যাত্রাভিনয়, বাজি, সাঁওতালদের খেলাধূলা, কবিগান, বাউলের আসর, আধুনিক সংযোজন—সিনেমা, বহুবিধ জ্ঞান ও আনন্দের আয়োজন; এর সঙ্গে মেলায় আছে লোকের মেলা, দোকানপাটে বেচাকেনা, ঘোরাঘুরি, দেখাশুনা, আলাপসালাপ,—নিজেকে হাজারখানা করে দেখবার এবং মাঝে-মাঝে আবার হাজারের মধ্যে নিজেকে বাজিয়ে নেবার আজব কত কাণ্ড-কারখানা। মেলা এবং সমাবর্তন, যদিও এ দুইটিই আজ প্রাধান্য পেয়ে চলেছে—তবু গোড়ার কথাটা ভুলবার নয়; বরং বলা যায়, সে কথাটাই আজ স্মরণের বড় কথা, শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ও অনুষ্ঠান ইত্যাদির সব-কিছুর ভিত্তিতে রয়েছে তারি অনির্বাণ শুভ্র মহিমা। এই ৭ই পৌষে হয়েছিল শান্তিনিকেতনে মন্দির-প্রতিষ্ঠা। ১২৯৮ সালের ৭ই পৌষ থেকে এখানে এ দিনটি ধন্য হয়ে এসেছে আশ্রম-স্থাপয়িতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের একটি মহৎ উদ্দীপনার উপলক্ষ্য হয়ে। শান্তিনিকেতনে ৭ই পৌষের শুরু যে উৎসবটি নিয়ে তার কথা উপরে বলা গেল, কিন্তু মনে রাখতে হবে মূলে ৭ই পৌষ হচ্ছে মহর্ষিদেবের নিজের দীক্ষালাভের প্রথম দিন।

৬ই পৌষ রাত্রিতে বৈতালিক দিয়ে উৎসবের ভূমিকা হয়ে থাকে। ৭ই পৌষ প্রাতে ছাতিমতলায় হয় উপাসনা; পরে আম্রকুঞ্জে চলে বিশ্বভারতী পরিষৎ-এর অধিবেশন; ৮ই পৌষ প্রাতে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব সম্পন্ন হয় আম্রকুঞ্জেই; পরে উদয়নে বিশ্বভারতী-সংসদের বার্ষিক অধিবেশন হয়। ৯ই পৌষ প্রাতে আম্রকুঞ্জে হয় আশ্রমিক সংঘের বার্ষিক অধিবেশন; অপরাহ্ণে প্রাক্তন ছাত্রসংঘের অধিবেশন হয়ে সভা-সমিতির পাট একপ্রকার সমাধা হয়। কিন্তু ১০ই পৌষ বড়দিনের উৎসবটি এসে পড়ে, তাই সেদিন সন্ধ্যায়ও দীপালোকিত মন্দিরে খৃষ্ট উৎসব চলে পরম গম্ভীর একটি মধুর পরিবেশে। পরদিনের ভোরবেলা মেলার দিকে আর রাস্তাঘাটের দিকে তাকালে বোঝা যায়,—যবনিকার পালা এল। বাইরের সমারোহের টানে ছেদ পড়ে, কিন্তু ভিতরে যে স্পর্শটুকু এরি মধ্যে মনে লেগে যায়, তারি টানে ফিরে-ফিরেই মনে পড়ে এই ৭ই পৌষকে। যেখানেই থাকা যাক্ না কেন, যাঁরা একবার এসে গেছেন, তাঁরাও আবার ফিরে আসেন,

যাঁরা আসেননি তাঁরা না-আসার বেদনার মধ্যেই-বা পান শান্তিনিকেতনকে। এ'রকমই চলছে বছরের পর বছর।

মহর্ষির মূল সাধনাকে রবীন্দ্রনাথ ব্যাপ্তি দিয়েছেন বিচিত্র ক'রে বিশ্বভারতীতে। সেই ব্যাপ্তি দিনে-দিনে ঘটছে নূতন প্রেরণায় নূতন প্রচেষ্টার যোগে নূতন কত লোকের হাতে। রবীন্দ্রনাথ সকলকেই ডাক দিয়েছিলেন উপলব্ধিতে ও কাজে. শান্তিনিকেতনের প্রসার সাধনায়। নূতনকালে সে আহ্বান কী সার্থকতা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে,—প্রতিবারকার ৭ই পৌষে উৎসবের ভাবোদ্দীপনার মধ্যেও বাস্তব আকারে তারই পরিচয় লাভের সুযোগ উপস্থিত হয়। কেবল সমাবর্তন-অনুষ্ঠানে নয়, সমগ্র উৎসব এবং মেলার দিনগুলি ভ'রেই সাধারণে শান্তিনিকেতনের সে পরিচয় সংগ্রহ করে থাকে।

গড়পড়তা পনর হাজার লোকের সমাবেশ হয় পাঁচদিনে।—গাঁয়ের ও শহরের লোক তাঁরা। এত আদিবাসী সাঁওতাল, তারি পাশেই আবার এত বেশি শিক্ষিত শ্রেণী আর কোনো মেলায় বড় একটা দেখা যায় না। এত খোলা মনেও হয়তো তাঁরা অন্যত্র সাধারণের সঙ্গে মেলেন না। সিউড়ি, বর্ধমান, ডুমকা—কলকাতা, সবদিক থেকেই নারীপুরুষ প্রায় সমান সংখ্যাতেই আসতে থাকে ট্রেনে, মোটরে, গোযানে, পায়দলে—দলে-দলে কাতারে-কাতারে। বাংলার বিভিন্ন শিল্পকেন্দ্র, ওদিকে বিহার-উড়িষ্যা এবং আসাম, জয়পুর, মাদ্রাজ প্রভৃতি বহু প্রদেশ থেকেই আমদানি হয় বহু দোকানের। প্রতি বছরই প্রায় এখন এসব দোকান এসে থাকে। বিশেষ ক'রে সাঁওতালদের কুটিরশিল্প, আর কাপড় ও খাবারের দোকানের সংখ্যাই হয় বেশি। কমপক্ষে শ'তিনেক দোকান বসে লাইন ধ'রে। ফেরিওয়ালাও জন পঞ্চাশেক মিলে জমিয়ে রাখে গোটা প্রান্তর। ৫টা ভাত খাবার হোটেল, ২০টা চায়ের দোকান, তেলেভাজাও ৩০টা কি না আসে! মিষ্টির দোকান বোধ হয় বীরভূমের মেলারই একটা বড় বৈশিষ্ট্য—তা, খান চল্লিশেক তো হবেই। তার পরেও আছে ফল, পান ইত্যাদির ছুটকো দোকান, ত্রিশটার কম হবে না সেগুলিও। সব মিলে দোকান ১২৫।১৫০ হবে এইসব খাবারের জোগান নিয়েই।

আশে-পাশে গ্রামের তৈরি কারুশিল্পের সংগ্রহ থাকে বিশ্বভারতীর শ্রীনিকেতন-স্টলে। কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল, বাঁশের বাঁশি, মুর্শিদাবাদী হাতির দাঁতের খেলনা, জয়পুরী সাজ,—এসবের সঙ্গে প্রচুর আমদানি-করা বাঁশের ছড়ির কথাটাও এখানে না বললে নয়।

বাঁশের ছড়ি আর নাগরদোলা—ছেলেমেয়েদের কাছে মেলায় এ একেবারে

যেন অপরিহার্য অঙ্গ। তারপরে আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থায় আছে সাঁওতালদের খেলাধুলা, সেটি আশ্রমের সঙ্গে তাদের মনখোলা মেলামেশার একটি সহজ উপলক্ষ্য—প্রতিবারই তা অনুষ্ঠিত হয়,—প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র-সম্প্রদায় একদিকে, অন্যদিকে থাকে সাঁওতাল যুবকগণ—এভাবে চলে হাডুডু-খেলা। উপাসনা ও বিভিন্ন সভা-সমিতিতে শান্তিনিকেতনের নিজস্ব সংগীতধারা আনন্দের একটি অন্যতম প্রস্রবণ। তা ছাড়া, বটতলায় বাউলের আসর চলছে দিনরাত, সেখানে বড়দের সঙ্গে ছোটরাও ভিড়ে যায় আগ্রহের সঙ্গেই। অপরাহ্ণে জমিয়ে রাখে মেলার আসর,—কোনোদিন কীর্তনে, কোনোদিন কবিগানে; সন্ধ্যায় আসরে নামে সিনেমা; সিনেমা ফুরোতেই যেটা আসে, আড়ম্বরে যেমন তা বিপুল, আকর্ষণেও সে অনন্য,—'কারখানা'-র কাণ্ডকারখানাই আলাদা; 'বাজি' না দেখলে মেলা কিসের! 'দুম' শব্দে প্রাণ আঁৎকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ আসে ফিরে। এর পরে রাত জাগবার জোগান মিলে যাত্রায়। ভোর হতে না হতে প্রথমদিন থেকেই মন হরণ করে নেয় সানাই,—ভৈরবী আর রামকেলির মিঠে আবেশ উষার অরুণ-ছোঁয়ার মতই সকল জড়তা মুছিয়ে দিয়ে আঁধার থেকে এনে ফেলে এক অপূর্ব আলোর রাজ্যে—হাজার গোলযোগের পারে জেগে শান্তিনিকেতনকে অনুভব করবার সে এক শুভক্ষণের পরম আমন্ত্রণ। এ ছাড়া, খোঁজ-খবর ক'রে নিলে আনাচেকানাচে সংগীতের জলসাও দু'একটা না মিলে এমন নয়। এবার তো লোকসংগীতের আসর একটি বিশেষ ক'রেই আয়োজিত হয়েছে—মেলাপ্রাঙ্গণেই। জুয়া, লটারি, মাদকদ্রব্যের চল নেই তা বলাই বাহুল্য।

এখানকার ধর্মাচার বলতে ধ'রে নিতে হয়, ৭ই পৌষের উদ্বোধন যে আদি অনুষ্ঠানটিতে—সেই উপাসনার কৃত্যটিকেই। আর, উৎসবের বাণীসুধা ছাড়া, প্রসাদ বলতে কী ইবা নেবার আছে। উৎসবের প্রারম্ভে, সেই চিরন্তন সুধার আহ্বানটি বিলিয়েই এবারে ইতি দেওয়া গেল—

"জাগো, সকলে অমৃতের অধিকারী—।" ২০।১২।১৯৫৭

শান্তিনিকেতন ক্রমেই বেশি আগ্রহের স্থল হয়ে উঠছে। দর্শক ও অতিথির সংখ্যা যেন বাগ মানছে না। শীতের মরশুমে এ সময়টায় সাধারণত বাইরের লোকের আসাযাওয়া একটু বেড়েই থাকে। এবার বাড়ছে অষ্টপহর। অলিতেগলিতে লোকের আনাগোনা চলছে। সামনে রয়েছে বৃহৎ ব্যাপার—সমাবর্তন। বড়ো বড়ো মান্য অতিথিদের সমাগম হবে—তার ভূমিকাটা এখন থেকেই মন্দ জমে উঠছে

না। সুবিস্তৃত উত্তরায়ণ-প্রাঙ্গণ জুড়ে উঠছে তাঁবু-আচ্ছাদিত সভামণ্ডপ। তিন-চার হাজার লোকের বসবার ব্যবস্থা হচ্ছে। 'কার্ড' দিয়ে ঢোকবার কথা। এতকালের খোলা-দরজার দরাজ ব্যবস্থায়-অভ্যস্ত বিশ্বভারতীর-বাইরের লোকদের পক্ষে একটু অসুবিধা হল বটে। আয়োজনটা আগে আগে দেখে নেবার জন্যও কৌতূহল জাগে। কে ঠেকাবে ভিড়। অতিথিশালার অধ্যক্ষের কথা স্বতন্ত্র—তাঁর পক্ষে বছর ভরেই চলেছে উৎসব;—নিত্যনূতন দলের আসর তাঁর এলাকায় লেগেই আছে। রতনকুঠী আর রেললাইন-পারের বাঁধা আস্তানা,—দু-মহলেই রোজ তাঁকে ছুটতে হয়। 'আসবার'-আয়োজনেও যেমন মহাপূজার ব্যাপার, 'এল-না'-র জের সামলাতেও হুড়াহুড়ি তেমনি কম নয়; আবার 'চলে-যাবার' পরে নিশ্বাস ফেলে সাধ্য কার। গত ৩।৪ দিনে ১২০০ লোকের দেখাশুনা চলেছে। তাও, বড়দের কথা ছেড়েই দেওয়া যাচ্ছে। অবিরাম এই লোকপ্রবাহের বেগ বাগিয়ে চালাতে নিরত রয়েছেন দুটি ব্যক্তি। অতিথিশালার অধ্যক্ষের সহকর্মী-ভদ্রলোক ভাগ্যিস বয়সে তরুণ—নয়তো দলের সঙ্গে পরিদর্শকের কাজে হেঁটে হেঁটে তাঁর 'এলে'-যাবারই কথা ছিল; আর যাঁকে এ কাজে দেখা যায়,—তিনি সর্বদিকে প্রবীণ বটে, কিন্তু নিশ্চয়, শান্তিনিকেতনের স্বনামধন্য বাক্-শিল্পী সেই সুধাকান্তবাবুকেও বেকাদায় পড়তে হয়। শত-শত সংখ্যার এক-একটি শিক্ষার্থী-মণ্ডলী—তাঁদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে তাঁদের হাজারো প্রশ্নের সমাধান জোগাতে গিয়ে বকে-বকে তাঁকে কাবু হতে হয় নাকি? একটা জীবন্ত লাইব্রেরি আর চলন্ত ক্লাশ বললেই চলে তাঁর এই সদল-পরিক্রমাকে,—যে-ক্লাসের ছাত্র হচ্ছেন সাধারণত নানাদেশের মাস্টারমশায়রা। চারদিক ঘুরিয়ে নিয়ে দলটিকে যখন একবার রবীন্দ্র-সদনে এনে ফেলা গেল, তখন চলে সেখানকার অধ্যক্ষের পালা। দস্তুরমতো সে একটা লেকচারের কাজ,—ঝাড়া এক ঘণ্টা। নোবেল-পুরস্কার থেকে আরম্ভ করে পুঁথিপত্র, ফোটো, ছবি, হাতের লেখা, দেশবিদেশের উপহার, অনুবাদ, কাটিংস, কবির ব্যবহার্য দ্রব্যাদি, মূর্ত বাস্তব এ-সব নজির দেখানোর সঙ্গে বিমূর্ত ভাবের মৌখিক ব্যাখ্যাটুকুও ঠেকিয়ে চলতে হয়; কেবল জিনিসের গায়ে-আঁটা লেবেলের লেখা থেকে লোকের কথার স্পর্শটুকুর আস্বাদ যে স্বতন্ত্র, তা বলাই বাহুল্য। দর্শকদের পক্ষে তা উপভোগ্য হয়,—বিশেষত রবীন্দ্রনাথের আওতার লোক এবং "বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি"র মতন উঁচু পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্তক্ষিতীশ রায় স্বয়ং যখন হন ব্যাখ্যাতা। কমবেশি, ভবনে-ভবনে এই ব্যবস্থাতেই অতিথি-অভ্যাগতের আপ্যায়ন চলে থাকে। নানা অসুবিধাহেতু অতিথিদের দু-তিনদিনের বেশি জায়গা

দেওয়া সম্ভব হয় না এবং বেশি লোককেও বলা যায় না থাকতে;—উপযুক্ত জিনিসপত্রের অভাবে যথোচিত তাঁদের আরামবিরামের ব্যাঘাতের কথাও ভাবতে হয়;—তা সত্ত্বেও, যতটা পারা যায়, সঙ্গে থেকে দেখানো-শোনানোর এই ব্যবস্থা দ্বারা সাধারণকে সাহায্য দিতে বিশ্বভারতী সচেষ্ট; শুধু কর্মী নয় ছাত্রছাত্রীরাও অনেক সময় এ-কাজে এগিয়ে আসে। আশ্রমের আয়তন যতদিন না বেড়েছে, তারা ততদিন সাহায্য করতে পেরেছে; এখন এতটা পারা কষ্টকর হয়ে পড়ে। বিশেষত বিদেশাগত ছাত্র ও অতিথিদের দেখাশুনা বিশেষ একটি প্রয়োজনীয় কাজ। এবার থেকে তা'রা একটা স্থায়ী ব্যবস্থা হ'ল। সম্প্রতি শ্রদ্ধেয় উপাচার্য মশায় এ বিষয়ে যত্নবান হয়েছেন। বিশ্বভারতীর জনসংযোগ-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মী আশ্রমের প্রাক্তন-ছাত্র শ্রীরণজিৎ রায়কে তিনি বৈদেশিক ছাত্রদের অভাব-অভিযোগাদির সুরাহা এবং সুখসুবিধা-বিধানের ভার দিয়েছেন। সাংস্কৃতিক সংযোগ স্থাপন উদ্দেশ্যে মধ্যপ্রাচ্য থেকে এসেছেন এক ছাত্রসংঘ,—আছেন তাঁরাও বিশ্বভারতীর অতিথিভবনেই; গোটা জানুয়ারি মাসই তাঁরা সেখানে কাটাবেন; এ-দলে আছেন চারজন ছাত্র—সকলেই মুসলমান; তাঁদের একজন এসেছেন সিরিয়া থেকে, একজন ইজিপ্সিয়ান, অন্য দুইজন আফগানিস্থানবাসী। উপাচার্য মশায় একদিন তাঁদের আমন্ত্রণ ক'রে কর্মসচিব ও শ্রীনিকেতনসচিব সহ অতিথিশালার ভোজনকক্ষে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রাতে চা-পান করেন। অতিথিশালার সামনেই শোভা পাচ্ছে উদ্যানপরিবৃত প্রাসাদোপম একটি শুভ্র দ্বিতল বাটী। সাময়িক-ভাবে তা নির্দিষ্ট হয়েছে উৎসবের অতিথি-সংস্থানের জন্য। যদি সবাই আসেন তবে আগামী সমাবর্তনের দিনগুলিতে হয়তো অন্যতম অকর্ষণ হবে এরি আশপাশ। কারণ, নূতন তোরণ যা রচিত হচ্ছে তার একটি এখনো দেখা যায় এই অতিথিশালারই পথে,—অন্যটি মাথা তুলেছে নিশ্চিত-অস্থিরতায় উত্তরায়ণের চৌমাথাতে। লোকের মুখে শোনা যাচ্ছে কেবল এক কথা—কার্ড। কে পেল না পেল, কোথায় কার্ড মিলে,—না মিললেই বা কী করা যায়—এই চলছে জল্পনা। বোলপুর-বাজারে ঘরে-ঘরে মাল আমদানি হচ্ছে—লোকের রসদ-কুলানোর ভাবনায়। এসঙ্গে সকলেই একটু ভাবলে ভালো হয় উত্তরায়ণের বাগানগুলির কথা। অনেক-দিনের অনেক যত্নে-গড়া এর প্রতিটি কেয়ারি, দুর্মূল্য এর প্রতিটি চারা—কবির স্নেহদৃষ্টি-মাখা দেশবিদেশের ফলেফুলে সুশোভিত এই মনোরম পরিবেশটির স্নিগ্ধতা বাঁচিয়ে চলাফেরা করাটা আসন্ন উৎসবের আগে বিশেষভাবে সকলের পক্ষে একবার স্মরণীয় বিষয় হবে। সমাবর্তন-ভাষণ দিতে এসেছেন এবার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র

মহলানবীশ মহাশয়। অধ্যাপকের খ্যাতি আজ বিশ্বজোড়া। আগামী কালের বিজ্ঞান-নিয়ন্ত্রিত বৈশ্বিক বিশ্বভাষা হতে চলেছে—সংখ্যা। ভারতে এই ভাষাপরিচয়ের ব্যাপক আয়োজনে প্রথম পথিকৃৎরূপে তাঁর যে কীর্তি স্থাপিত হয়েছে তা অবিনশ্বরই থাকবে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক-পরিকল্পনার উদ্ভাবক হয়েও তিনি প্রথিতযশা হয়েছেন, সন্দেহ নেই। দেশবাসী ও বিশ্ববাসীর সঙ্গে এসব ক্ষেত্রে বিশ্বভারতী স্বভাবতই গৌরবগাথায় মিলিতকণ্ঠ; কিন্তু এসব ছাড়িয়েও তার গৌরব ও আনন্দের কারণ রয়েছে অন্যত্র। সেদিনের লোক প্রত্যক্ষে বেশি না থাকলেও, অনেকেরই মনে পড়বে অনেক জায়গা থেকে, একদিন বিশ্বভারতীয় উদ্ভব হয়েছিল এই অধ্যাপকপ্রবরেরই অবৈতনিক 'সাধারণ-সম্পাদক'ত্বে। রবীন্দ্রনাথের একজন পরম অনুরাগী;—তাঁর সংখ্যাতত্ত্ব-গবেষণাগারের বিপুল প্রতিষ্ঠানের পাশেই নাকি কুক্ষিগত রেখেছেন আরেকটি গবেষণাগারের অমূল্য তথ্য-সম্পদের সংখ্যাতীত সংগ্রহ—এবং সেটি নাকি তাঁর আজীবন অধ্যবসায়জাত রবীন্দ্র-জীবন ও সাহিত্যাদি সম্পর্কিত যখের ধনভাণ্ডার বিশেষ। বিজ্ঞান ও সাহিত্যের এমন মণিকাঞ্চন যোগ ঘটেছে যাঁর মধ্যে, নিঃসন্দেহ তিনি রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর সমাবর্তন-ভাষণের সুযোগ্য মুখপাত্র। সর্বাঙ্গীণ-দৃষ্টিসম্পন্ন আরেক সাহিত্যরসিক বিজ্ঞানাচার্যের ভাষণও এসঙ্গে শুনতে পাওয়া যাবে বর্তমান উপাচার্য শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের উপস্থিতির থেকে। নূতন রাজ্যপাল শ্রীযুক্তা পদ্মজা নাইডুকে দর্শন করবার এবং তাঁর সমাজসেবার অভিজ্ঞতাপুষ্ট মূল্যবান ভাষণ শোনার সুযোগ আশা করে লোকে খুবই। বিশ্বভারতীর রেক্টরের আসনে তাঁকে আসীন দেখে নিশ্চয়ই সকলের চোখে ভাসবে—আর-একদিন এই বেদীতেই শোভমানা তাঁর দেশপূজ্যা জননী স্বর্গীয়া সরোজিনী নাইডুর সমুজ্জ্বল মুখচ্ছবি। শুভ অয়মারম্ভ!—উৎসবকে স্বাগত করতে চারিদিকেই আজ সাজ-সাজ রব। লাগছে ভালো। ৮। ১২৫৭

৩০শে ডিসেম্বর—মেলা ফুরোল—এই পৌষের মেলা; মেলা চলতে শুরু হল ফের,—রবীন্দ্রনাথের সেই 'কাজ-কাজ খেলা'র মেলা। বিভাগে-বিভাগে যত ছেলেমেয়ে এতদিন মেলার জন্য খেটেছে, এবারে তারা একটু বেড়িয়ে-আসার জন্য ছড়িয়ে পড়ল দলে দলে নানাদিকে অধ্যাপকদের তত্ত্বাবধানে থেকে। বরাবরই এমনি হয়ে থাকে। এতবড় একটা মেলা এবং সে সঙ্গে এত সভা-সমিতির অনুষ্ঠান;—এমন শান্তি ও সুশৃঙ্খলায় যে এসব সমাধা হয়ে আসছে,—এর পিছনে কর্মী ও এই ছেলেমেয়েদের সুনিয়ন্ত্রিত পরিশ্রম অনেকটা কার্যকর রয়েছে, সেকথা সাধুবাদের সঙ্গে স্বীকার্য। মেলায় যাঁরা যোগ দিয়ে থাকেন, ছোটবড়ো-নির্বিশেষে, সকলেই

সহজভাবে আনন্দ করে যান—শিক্ষিত-অশিক্ষিত ধনী-দরিদ্র উচ্চ-নীচের রেখায় বড় একটা কোথাও বাধে না। দোকানপসারের আমদানিতে পণ্যের বেচাকেনা এবং শিল্পপরিচয়ও কম হয় না; এবার অনেকের মনে হয়েছে, দোকান কিছু কম এসেছিল; শোনা যায়, জায়গার খাজনার হার-বৃদ্ধি তার অন্যতম কারণ। বেচাকেনা তা ব'লে মন্দ হয়নি। মিষ্টির দোকানগুলি থেকে সে কথা আরো মনে হয়েছে। কাঠের দোকান খুব এসেছিল, তারা মেলার পরেও ৩.৪ দিন মেলার রেশ টেনে গিয়েছে। সার্কাস আর ম্যাজিকের মোহ ছাড়াও যে মেলা জমে এবারে তা আরো দেখা গেছে। 'ডুম্‌দাম্‌' ঢাকপেটা আর ক্লাউনের হৈ-হল্লার অভাবটা অভ্যস্ত কানকে দূরে থেকে সময়-সময় একটু নিরাশ করেছে; মেলার আসরে জম-জমার-ও জোগানে তা ব'লে ছেদ পড়েনি। কিন্তু সত্যিকার ফাঁকা ঠেকছে রাত্রির বাঁধা সুরে। সাঁওতালদের দলবদ্ধ গান আর ডিমিডিমি নাগরা ও বাঁশির সুরের সঙ্গে শিঙাধ্বনি মিশিয়ে একটানা একটি গভীর নাদতরঙ্গ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ত; আধুনিক সভ্যতাভিমানের বাঁধে ঠেকে এই একটি ক্ষেত্রে দেখা গেল আনন্দের ইতি ঘটেছে।

গান ও নাচের উপলক্ষ্যে সাঁওতালদের একসঙ্গে সংঘবদ্ধ থাকার যে সুযোগ ছিল এখন সেটাও ব্যাহত হবে কিনা ভাববার বিষয়। আর, ভাবনা ধরিয়েছে এমনিতরো, বাউলের আসরও। চাহিদা জাগিয়ে 'গৌরপ্রেমের সরভাজা' বাজারে উঠেছে, কেটেছেও মন্দ নয়। কিন্তু সেই প্রেমের টানে ক্রেতার দল যাঁরা এগিয়ে আজ ফরমাশ এবং বিচিত্র-ফলোপহার বর্ষণে হর্ষোচ্ছ্বাস জাগাচ্ছেন, তাঁদের দলই যদি বেড়ে ওঠে, (যেমন দেখা যাচ্ছে) অশোভনভাবে এগিয়ে গিয়ে ওদের বসবার খোঁয়াটাও অবধি দখল ক'রে বসেন, তখন হয় মালজোগানদার বাউলদের কোণঠাসা হতে হবে, নয়তো দাবির কাছে জাত বিকিয়ে, 'ভাজাভুজি'র সঙ্গে চাট্‌নি এবং নিত্যনূতন আরো তাজা-কিছু খাজা-গজা মালের ব্যবসা ফাঁদতে হবে। গাঁজা ধ'রে প্রবীণ একদল গলায় হয়েছেন অচল, মাজাঘষা করে সাজতে গিয়ে নবীন অনেকে ভাবে-ভঙ্গিতে হয়ে চলেছেন চঞ্চল; মেকীর সাজা জাত-উচ্ছেদ ক'রে না ছাড়ে,—তবেই হয়। কলকাতার আসরে নিয়ে যাবার যে টোপ 'বাবু'রা ছড়াচ্ছেন কলকাতার পক্ষে তা আপাতত ব্যর্থ হবে না, এতে পেশাদারী বাউলের দল বাড়লেও বাড়তে পারে, দু'চারদিন শিল্পের নামে বিশেষ ধরনের এই নাচ-গানেরও প্রসার হবে সন্দেহ নেই, কিন্তু বিত্তে একবার আদায় করে নিয়ে শহরের শিক্ষিত শাকরেদরা ছিবড়ের মতো এই গেঁয়ো লোকগুলিকে একদিন পরিত্যাগ করলে, সেদিন এদের কে

বাঁচাবে। এখনই তো দেখা যায়, যা ছিল সাধনা তাকে টেনেছে শিল্পে, শিল্পকে লোভাচ্ছে কলকারখানায়, গ্রামোফোন, সিনেমা, কনফারেন্সে টলিয়ে দিচ্ছে এদের গ্রামের আস্তানা। কথা হচ্ছে, এরাও যদি ব্যস্তসমস্ত হয়ে শহরে ছোটে, তবে গান জোগাবে কে? ধ্যান-নিবিড় নিরিবিলির যে-জীবন থেকে তা উৎসারিত হত, শহরে তা কি সুলভ হবে? বাউলের সঙ্গে বাংলার এক বিশেষ সাধনা ও সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও ইশারা করছে শান্তিনিকেতনের এই মেলার আসর। মেলার অন্যান্য বাঁধাব্যবস্থার বিষয়গুলির মধ্যে বাউলের আসর পড়ে না। নিজেদের স্বভাব-প্রবণতায় ওরা গাছতলায় ব'সে মনের আনন্দে গান গেয়ে চলে যেত। শ্রোতৃসাধারণের ক্রমবর্ধিত অনুরাগে এখন বাঁধা-আসরে দাঁড়িয়ে গেছে সেই গাছতলা। এর চেয়ে আনন্দের বিষয় আর কী হতে পারে। কিন্তু তেমনি আশঙ্কার কারণ বাড়ছে শ্রোতাদের এই ঘনিষ্ঠ-সংস্রবের উৎসাহ থেকে। ওদের তাতে স্বচ্ছন্দ স্ফূর্তি বজায় থাকবে কিনা সন্দেহ। সেটা যাতে অব্যাহত থাকে এজন্য দক্ষিণাদি দেওয়ার রীতি বদল করলে ক্ষতি কী? যার যা দিতে হয়, একটি সাধারণ-ভাণ্ডারে জমা দিলেই চলে; সেখান থেকে কর্তৃপক্ষ যথাযোগ্যভাবে ওদের মধ্যে সে সবই শেষে বিতরণ করে দেবেন। আর, আসরে গানও চলবে ওদেরই নিজেদের ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ স্বাধীন আনন্দে। শ্রোতারা কেবল ইচ্ছামত শুনে যাবেন। কোনো ক্রমেই ওদের প্রলুব্ধ বা প্রভাবিত করতে এগোবেন না। বলা বাহুল্য এইটিই ছিল এখানকার ধারা। আধুনিক প্রতিক্রিয়ার দিকটা রোধ করবার পক্ষে উপরোক্ত দুটি ব্যবস্থা অবলম্বন সমীচীন কিনা, কর্তৃপক্ষ ভেবে দেখতে পারেন। এতে শ্রোতাদেরই লাভ হওয়ার কথা; কারণ, খাঁটি জিনিস এতে মিলবে, নয়তো ভেজালে ঠকতে ঠকতে দুদিন বাদে তাঁরাই হারাবেন আনন্দের সুযোগ। এসঙ্গে বলে রাখা যেতে পারে, ইংরেজী-শিক্ষিত এবং ইংরেজী-অশিক্ষিত, সাধারণ ও বিশেষ শ্রেণীর যোগাযোগের একটি সুদুর্লভ উপলক্ষ্যের বৈশিষ্ট্যে এই মেলা যেমন মূল্যবান, তেমনি তাদের পরস্পরের প্রভাব যাতে পরস্পরকে পরম সমৃদ্ধিতে লাভবান ক'রে উজ্জীবিত করতে পারে—এখান থেকে তার সূত্র গড়ে দিতে পারলে, তাতে আরো এ মেলার উপযোগিতা উপলব্ধ হবে। কবি, কীর্তন, বাউল, লোকসংগীত, যাত্রা, সানাই বিভিন্ন লোকশিল্পের সমাবেশ,—এসবের মধ্য দিয়ে এক উপলক্ষ্যে দেশের ও বিশ্বের লোক যা অনুভব করতে পায়,—আনন্দের সঙ্গেই সংস্কৃতির প্রচার ও বিনিময়সাধনে তার প্রভাব অনেকখানি। মেলার এই দিকটায় গোটা একটা 'বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলনে'র কাজ অনাড়ম্বরে এবং অগোচরে সুদূর এই

মফঃস্বলের এককোণে সমাধা হয়ে চলছে। বিশেষ করে সাধারণের পরিচয় ঘটছে বিদেশেরও কাছে—মধ্যবর্তী উদ্যোক্তা শিক্ষিত-শ্রেণীর সেজন্যই আরো ব্যবস্থাপনায় অবহিত হয়ে চলার দায়িত্ব আছে।

এই জন্যই, অনেকে মনে করেন এবং মেলার মধ্যেও ভ্রাম্যমাণ অনেককে বলতে শোনা গেছে—মেলাটিকে প্রদর্শনীর আকারেও কিছু অংশে বিন্যস্ত রাখলে ভালো হয়। বিশেষত বিশ্বভারতীর সমগ্র পরিচয় মনে যাতে সুনিবিড়ভাবে লোকে বহন করে নিয়ে যেতে পারে, এক জায়গায় ধারাবাহিক তার প্রদর্শনী-ব্যবস্থা এবং সেই সঙ্গে সারসংক্ষেপযুক্ত সুলভ-মূল্যের সচিত্র পুস্তিকা রাখা শ্রেয়। স্টলের বাইরে দাঁড়িয়ে কেনাকাটার ফাঁকে চোখ বুলিয়ে যাওয়ায় পরিচয়-সাধনের কাজ হয় না। এবার সে সুযোগও অবশ্য কম ছিল। সারা বছরে এসময়েই একবার জনসাধারণ যে-প্রকারে হোক, এসে মিলিত হয়। বিশ্বভারতী যদি সকলের মতো তাদেরও নিজস্ব সম্পদ হয়ে থাকে, তবে এখানকার দেশবিখ্যাত আনন্দের খনির রুচিকর নৃত্যগীত-সম্বলিত রবীন্দ্র-সংস্কৃতির সহজ অবদানপূর্ণ রত্নসম্ভারে তাদেরও কিছু অধিকার থাকার কথা। উপযুক্ত ব্যবস্থায় বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে সেরূপ উপভোগ্য একটি আসরেরও আয়োজন না থাকা দিনেদিনে মেলার অঙ্গহানিকর বিষয় হয়ে উঠছে। সাধারণের সঙ্গে সংস্কৃতি বা আনন্দ বিনিময়ে অনাবিল হৃদ্যতা সাধনের এই একটি মহৎ সুযোগ নষ্ট হচ্ছে, অন্যদিকে তেমনি আভিজাত্যের টানে দূরত্ব রক্ষার ছায়াপাত ঘটছে।

মেলায় এবার বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগের স্টল এসেছিল। সাতই পৌষের স্মারণিকীরূপে '৭ই পৌষ' নামক একখানি সুদৃশ্য দুভাঁজকরা পত্র (Folder) অনুরাগীমণ্ডলীতে উপহার বিতরণের যে ব্যবস্থা এঁরা করেছেন, তা খুবই সময়োপযোগী ও হৃদ্য হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরের প্রতিলিপিতে তাতে পাওয়া যায়,—গীতাঞ্জলির একটি সুপরিচিত প্রার্থনা-গীতি এবং বৈদিক মন্ত্র-ব্যাখ্যা। কবির একান্ত শ্রদ্ধার উৎসব এই ৭ই পৌষের দিনে তাঁর হস্তাক্ষরের মধ্য দিয়ে তাঁর জীবিতকালের স্পর্শ অনুভব করবার সুপরিকল্পিত এই আয়োজনটির জন্য গ্রন্থন-বিভাগের উদ্যোক্তারা অবশ্যই সকলের প্রীতি ও ধন্যবাদ আকর্ষণ করবেন। সাধারণের অনুধ্যান ও উপভোগের জন্য, এঁরা যদি বর্ষে-বর্ষে একখানি পকেটবুক-আকারের রবীন্দ্রবাণী সংকলন ক'রে স্বল্পদামে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেন তাতে জনসংযোগের আরো সহায়তা হতে পারে না কি ? এরূপে হয়তো শান্তিনিকেতনের আঁকা ছবি অ্যালবামও একদিন ঘরে-ঘরে শিল্পরুচি-প্রসারের সুযোগ

দেবে—যদি সন্তায় সুন্দর ক'রে তা সাধারণের হাতে দেওয়ার ব্যবস্থা সম্ভব হয়।

মেলা উঠে-যাবার রব যেখানে আকাশে-বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছিল, বিশ্বভারতীর আচার্য দেশের প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং শ্রীনেহরুজী সেখানে বলে গেলেন, মেলা তো চলবেই, বরং এ-কে আরো বাড়াতে হবে, লোকের মনের মধ্যে এ-কে আরো বড়ো করে প্রতিষ্ঠা দিতে হবে। দু'দিন ধ'রে তাঁর বাসগৃহ উদয়নের সামনে দিনরাত অষ্টপহর মেলার হৈ-চৈ চলেছে পুরোমাত্রায়—প্রধানমন্ত্রীর কথা মনে রেখে কেউ যে সমীহ করে সন্তর্পণে চলেছে, এমন নয়; নিজেদেরই প্রিয়-একজন বান্ধবকে কাছে পেয়ে আনন্দের দিনে সকলে বাড়তি একটু আনন্দ ও আগ্রহের তাগিদ মিটিয়ে নিয়েছে। মেলাকে অক্ষুণ্ণ রাখার কথায় নেহেরুজী লোকের মনের মধ্যে মেলার ভেট জুগিয়ে গেলেন। এখন এর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ না হয় ভবিষ্যতে তাই দেখতে হবে জনসাধারণ ও বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ সকলকেই। ১৷১৷১৯৫৮

পৌষপার্বণ

পৌষ-সংক্রান্তি। আশ্রমে পিঠে-পার্বণ হল। শিশু-বিভাগের ছেলে-মেয়েরা আগের দিন বিকেলে পাঠ-ভবনের অধ্যক্ষের বাড়ি ধুম করে পিঠে খেলে। পৌষ-পার্বণের দিন আশ্রমের রান্নাঘরে পিঠে-পায়েস হয়। মনে পড়ে, আশ্রমের আগের দিনের পিঠে-পার্বণের কথা। গুরুদেব ছিলেন। পিঠে তৈরি হবে, ছাত্রীদের কী উৎসাহ! আগের দিন বিকেল থেকেই কাজ শুরু হয়ে যেত। পরাত-ভরতি গুঁড়ি মাখা হয়েছে, রান্নাঘরের পরিদর্শিকা তত্ত্বাবধান করছেন, ছোটোর দল তৈরি করছে চষিপিঠে, বড়োর দল পুলি-পিঠে। রাত্রে গোকুল-পিঠে তৈরি ক'রে রসে-ফেলা হয়েছে। তখন রাত্রি এগারোটা সাড়ে-এগারোটায় আশ্রমের বিজ্‌লী বাতি নিবত। তার আগে অবধি রান্নাঘরে পিঠে-তৈরির ভিড় কমত না। পরদিন সকাল থেকেই আবার রান্নাঘরে ধুম। বাড়ি-বাড়ি থেকে ছাত্রীরা এবং গিন্নিরাও এসে যোগ দিতেন। সমস্ত আশ্রমের ঘরোয়-ভাবটি জমে উঠত। হাসি-গল্পে রাশি রাশি পাটিসাপ্‌টা, ভাজাপুলি—হরেক রকম পিঠে তৈরি হয়ে যেত। রান্নাঘরের ঠাকুর-চাকরদের এদিকে আসা ছিল নিষেধ। তারা ওদিকে প্রতিদিনকার খাবার তৈরির কাজে ব্যস্ত থাকত; ছেলের দল টিফিন খেতে খাবার খেতে এসে লোলুপদৃষ্টিতে তাকাত এদিকে, আর শিশু-বিভাগের ছেলে-

মেয়ের দল উন্মুখ হয়ে থাকত কখন বিকেলের জল-খাবারের ঘণ্টা পড়বে। মেয়েরা গম্ভীরচালে পিঠে তৈরি ক'রেই চলত। পিঠে তৈরি শেষ হত; আগে একটা থালায় বাটিতে কিছু পিঠে সাজানো হত, একদল মেয়ে তাই নিয়ে যেতেন উত্তরায়ণে। সবাই মিলে গিয়ে গুরুদেবকে প্রণাম করে আসতেন। আজ পৌষ-পার্বণ। নিজেরা পিঠে তৈরি করেছে, কত তাদের উৎসাহ! গুরুদেব খুব খুসী হতেন। নানারকম প্রশ্ন করে জেনে নিতেন কোন্ পিঠে কীভাবে তৈরি হচ্ছে। স্নেহ-মধুর তাঁর হাসিতে-কথায় মেয়েদের পিঠে তৈরি-করার আনন্দ সার্থক হত। সবাইকে দেখাতেন,—বাড়ি-বাড়ি থেকে আরো কত-সব পিঠে এসেছে। এদিকে জলখাবারের ঘণ্টা পড়তে থাকত, ছেলেমেয়েরা কলরব জমিয়ে তুলত রান্নাঘরে। অফিসের কর্মিগণ, বাড়ির শিক্ষক এবং ছাত্রছাত্রীগণও নিমন্ত্রিত হয়ে আসতেন। মেয়েরা নিজেরা পরিবেশন করত। পৌষ-পার্বণ পরবে একবেলা ছুটি থাকত।

*　　*　　*　　*

বৃষ্টি অবশেষে নাবল। সপ্তাহখানেক মেঘে-মেঘে এরই মহড়া চলছিল। শীতটা গিয়েছিল কমে, দিনগুলি ছিল—কখনো রোদ, কখনো ছায়া; পয়লা মাঘের রাতে সে-কী ঝম-ঝম বৃষ্টি আর গুরু-গুরু গর্জন—যেন আষাঢ়ের রাত। পরদিন সকালেও বৃষ্টি থামল না। শীতের দিনে বাদলার ছুটি পেয়ে ছাত্র-ছাত্রীদলের খুশির আর অন্ত নেই। শীতটা এবার তেমন জমেইনি, উত্তুরে হাওয়াটা ছিল কেমন শান্তশিষ্ট, হী-হী কাঁপুনি ধরায়নি অন্য বছরের মতো। মনে হচ্ছে এ বৃষ্টির পরে শীতটা জমবে। বোঝা যাচ্ছে মেঘ কাটতে আরো দু'একদিন সময় নেবে; কনকনে আমেজটা এখনই পাওয়া যাচ্ছে। আশ্রমের ছেলেমেয়েদের ভারী দুশ্চিন্তা—সরস্বতী পুজোর আগে যদি এ বৃষ্টিটা না থামে।

আশ্রমে অবশ্য সরস্বতী-পুজো হয় না। কিন্তু ছেলেমেয়েরা ভুবনডাঙা, বাঁধগড়া, বোলপুর, গোয়ালপাড়া প্রভৃতি আশে-পাশের সব জায়গায় পুজো দেখে বেড়ায়। সরস্বতী পুজোর ছুটিতে এখানে হয় বার্ষিক-খেলাধুলো, দু'তিন-দিন ছেলেমেয়েরা তাই নিয়ে মেতে থাকে। পুজোর দিনে সকাল-বেলা আশ্রমে আম্রবাগানে একটি অনুষ্ঠান হয়। সকলে এসে সমবেত হলে, গান ও কাব্য আবৃত্তি দ্বারা সারস্বত উৎসবের ধারা প্রবাহিত হয়ে চলে। সরস্বতীপূজা উপলক্ষ্যে প্রতিবারই বোলপুর-শহরে বিশেষ সমারোহ দেখা যায়। বোলপুর উচ্চ বালিকা-বিদ্যালয় এবার উৎসবের দিন জলসা এবং তৎসহ রবীন্দ্রনাথের 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' নাটিকাখানি অভিনয়ের আয়োজন করেছিলেন। স্কুল, কলেজ, রামকৃষ্ণ-সংগীত-

বিদ্যালয় সর্বত্রই—বিনোদনের বিচিত্র ব্যবস্থা হচ্ছে। 'ইরিগেশন ক্লাবে' খেলা-ধুলার প্রতিযোগিতার বিশেষ অনুষ্ঠানটি সকলের উৎসাহ আকর্ষণ করে থাকে।

*　　　*　　　*　　　*

সাঁওতালদের 'বাধনা' পরবের জের চলছে এখনো। সাঁওতালি ঢাক ও নাগড়া আর তার সঙ্গে করতালের ঝমাঝম চারদিকে। তবে বৃষ্টি হওয়ায় এবার উৎসব তত জোর ধরেনি। শ্রীনিকেতন ও শান্তিনিকেতনের পথের ধারে সাঁওতালদের বসতি আছে। বছরে এই একদিন ওদের পরবে আশ্রমের লোকেরাও গিয়ে মিলত। বিকালে খেলাধুলা, তীরধনুক ছোঁড়া, আর নাচগান হত। একবার রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সে-উৎসবে গিয়ে যোগ দিয়েছিলেন। প্রতিবেশীদের সঙ্গে মেলামেশার এই উপলক্ষ্যগুলি খুবই মূল্যবান। ২৪।১।১৯৫৩

মাঘোৎসব

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্মোৎসবের দিন গৌরপ্রাঙ্গণ আলো দিয়ে সাজানো হয়েছিল। পরের দিন ছিল এগারোই মাঘ—ব্রাহ্মসমাজের মাঘোৎসব। এইদিন উপাসনায় দেশী-বিদেশী হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান সকলেই সাগ্রহে সমবেত হয়। বিজলী-বাতির কোমল আভা মন্দিরকে স্নিগ্ধোজ্জ্বল করে রেখেছিল। মেঝেতে প্রকাণ্ড আলপনার মধ্যে মোমবাতি জ্বলছিল। গোলাপ-স্তবকের রূপে ও গন্ধে চতুর্দিক সুরম্য ও সুরভিত হয়ে উঠেছিল। সন্ধ্যায় সেখানে মাঘোৎসবের উপাসনা হল। শুরু হল 'সংগচ্ছধ্বম' বেদমন্ত্র গান দিয়ে। গানটি ছেলেমেয়েরা সমবেতভাবে গেয়েছিলেন। বিশেষ করে "ভুবনজোড়া আসনখানি" "হৃদয় বাসনা আজি পূর্ণ হল মম, শুন জগত জনে", "গায়ে আমার পুলক লাগে চোখে ঘনায় ঘোর", প্রভৃতি গানগুলি গভীর আনন্দ দান করেছিল। মাঙ্গলিক মন্ত্রোচ্চারণের পরে শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী গুরুদেবের রচনা থেকে পাঠ করেন।—উত্তিষ্ঠত জাগ্রত সকালবেলা সূর্যের আলো এসে যখন আমাদের ঘুম ভাঙায়, আমরা অতি সহজেই জেগে উঠি, কিন্তু সন্ধ্যাবেলার মোহাচ্ছন্নতা থেকে জাগরণ তত সহজ নয়। সারাদিনের জটিল পঙ্কিল সংসারের আবর্জনার পাকে-পাকে মন যখন জড়িয়ে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে তখন জাগ্রত করবে কে? সে জাগরণ যে বড় কঠিন। তাই তো তখন হৃদয়বীণার তারে-তারে ঘা দিয়ে বাজাতে হবে—ওরে উত্তিষ্ঠত জাগ্রত। সংসারের সকল মোহাবরণ ছিন্ন করে জ্ঞানের মধ্যে ধ্যানের মধ্যে—ওরে উত্তিষ্ঠত জাগ্রত। সেই জাগরণই পরিপূর্ণ জাগরণ, আনন্দের জাগরণ।

সেদিন সংস্কৃত-মন্ত্র পাঠ করেন শ্রীমোহনলাল বাজপেয়ী এবং তার বাংলা

অনুবাদ পড়ে শোনান শ্রীযুক্তা লাবণ্যলেখা চক্রবর্তী। তারপরে ভাষণে শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী গুরুদেবেরই আরেকটি লেখা পাঠ করেন।—বর্তমান যুগ একটি অপূর্ব যুগ। এমন যুগ পূর্বে আর কখনো আসে নি। এ যুগে প্রচণ্ড একটা চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে। একখানে একটি সামান্যতম ঢেউ উঠতে না উঠতেই সকল দেশে তা ছড়িয়ে পড়ছে, আলোড়ন তুলছে। উপরিভাগে দেখা যাচ্ছে পলিটিক্যালের ঢেউ, কিন্তু ভিতরে-ভিতরে যদি ধর্মের স্রোত না বইত তবে এ চাঞ্চল্য হতে পারত না। এ যুগের ধর্ম হচ্ছে—বিশ্বাস কর, অনুসন্ধান কর, অনুভব কর। এ যুগই যে-কোনো তাপসের তপস্যার উপযুক্ত যুগ। বিশ্বাস কর, অনুসন্ধান কর। এই যে আহ্বান জেগেছে এ যেন আমাদের আশ্রমবাসীদের তপস্যাক্ষেত্রে ব্যর্থ না হয়। যেদিন প্রথম মহর্ষিদেব এখানে তপস্যার ক্ষেত্র স্থাপন করেছিলেন, সেদিন এ চাঞ্চল্য তেমনভাবে জাগে নি, বিশ্ববাসী এ-কে জানে নি। তখন তিনি আশ্রমবাসীর তপস্যার জন্য যে ক্ষেত্র গড়তে চেয়েছেন, আজ যেন সে তপস্যা হতে কোনক্রমেই আশ্রমবাসী ভ্রষ্ট না হয়।

উৎসবের রাত্রে শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবীর দীর্ঘ অভিভাষণ-পাঠের উদাত্ত কণ্ঠস্বর একটি নিবিড় পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। ৩০।১১ ৫৪

মাঘোৎসব ব্রাহ্মসমাজের, বিশেষ ক'রে ঠাকুর-পরিবারের একটি বিশেষ আনন্দময় বাৎসরিক উৎসব। রবীন্দ্রনাথ জীবিত থাকতে কয়েক বছর এদিনটিতে আশ্রম থেকে একটি গানের দল জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির উৎসবে যেত। রবীন্দ্রনাথ এবং দিনেন্দ্রনাথের সাহচর্যে সে উৎসব কী মধুময় হত, সে সব গল্প এখনো আশ্রমের অনেকেই উৎফুল্ল হয়ে করে থাকেন। দিনেন্দ্রনাথের মৃত্যু হল, রবীন্দ্রনাথও শেষে আর কলকাতা যেতে পারতেন না; তখন থেকে এগারই-মাঘের উৎসব আশ্রমে একটা বিশেষ ব্যবস্থায় অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। জোড়াসাঁকোতে এখনো উৎসব হয়; শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন প্রভৃতি আশ্রমিকগণ এখনো সেখানে গিয়ে যোগ দিয়ে থাকেন। আশ্রমেও ঐ দিন সন্ধ্যায় মন্দিরে উপাসনা হয়। গান ও বৈদিক মন্ত্র পাঠে উৎসবের আনন্দ জমে ওঠে। কয়েক দিন আগে থেকে ইন্দিরা দেবীর কাছে ছোটোবড়ো ছাত্র-ছাত্রীর দল ভিড় জমায়, শেখে মাঘোৎসবের জন্য নতুন নতুন ব্রহ্ম-সংগীত। ইন্দিরা দেবী প্রতি-বছরই উৎসাহভরে এই উৎসবে মন্দিরের উপাসনা করে থাকেন; গান শিখিয়ে থাকেন; এবার প্রিয় ভাইপোর মৃত্যু-সংবাদ তাঁকে সে-উৎসবে যোগদানে বিরত করেছে, তবে আগেই তিনি ছেলেমেয়েদের গান শিখিয়ে দিয়েছিলেন।

স্পোর্টস্‌ ও প্রজাতন্ত্রদিবস

জানুয়ারি মাস শান্তিনিকেতনে প্রায় ছুটিতে-ছুটিতেই কেটে যায়। বিশেষ ক'রে শেষের দিকটা। সরস্বতী-পূজা এবং ৬ই মাঘ মহর্ষির মৃত্যু-দিন এবার একই দিনে হয়ে এক ছুটিতেই কেটে গেছে, কিন্তু তারপরে স্পোর্টস, নেতাজীর জন্মদিন, এগারই মাঘে মাঘোৎসব, ত্রিশে জানুয়ারি মহাত্মাজীর মৃত্যুদিন—সপ্তাহ দেড় দুয়েক ছুটিই চলছে। এরপরে আসছে ৬ই ফেব্রুয়ারি শ্রীনিকেতনের বাৎসরিক উৎসব। নতুন বছরে ক্লাসগুলি ভালোমতো জমতেই পারল না এখনো।

এবার সরস্বতী-পূজার পর থেকে দিন চার-পাঁচ খুব মেঘ-বৃষ্টি চলছিল, ঠাণ্ডা কনকনে হয়ে উঠেছে, তবে মেঘের ছায়ায় স্পোর্টস বেশ আরামদায়ক হয়েছিল। এখানকার স্পোর্টসে পুরস্কার নেই। খেলোয়াড়দের ফটো তুলে নেওয়া হয় এবং প্রতি বছরের খেলার বিবরণ ও ছবিসহ বই দিয়ে কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের আনন্দ দেওয়া হয়। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটি ক্রীড়া-প্রতিনিধি দল মাদ্রাজে আন্তর্জাতিক ভারতীয় শাখার বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়েছে।

নেতাজীর জন্ম-দিবসে ছেলেমেয়েরা ফুলে, পাতায়, আল্‌পনায় ঘরদোর সাজায়। এবারও সাজিয়ে নেতাজীকে তারা স্মরণ করেছে।

ছাব্বিশে-জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র-দিবসে সকালে গৌর-প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হল; বিকেলে ছেলেমেয়েরা রাস্তাঘাট পরিষ্করণ এবং আরো অন্যান্য সব গ্রামের কাজ করতে গিয়েছিল। রাত্রে হল স্বদেশী-গানের জলসা। এখানকার ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এদিনটি কিভাবে উদ্‌যাপন করেছে, তার একটা ছবি ছোটোদেরই একজনের লেখা থেকে এখানে তুলে দেওয়া গেল:—"আজ জাতীয়-উৎসব দিবস। সকালে উঠে যেই পড়তে বসছি, অমনি ঘণ্টা পড়তে লাগল। দৌড়ে গেলাম। দেখি গৌরপ্রাঙ্গণে কত লোক জমা হয়েছে। ঘণ্টা শেষ হয়ে গেলে পর-পর তিনটি গান হল—"বন্দেমাতরম্‌" "তোমার পতাকা যারে দাও" আর "জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে"। এর মধ্যে একটি ছোট ছেলে আর একটি বড় মেয়ে এসে পতাকা ওঠালো। ফুলের মালা দিয়ে পতাকা সাজানো ছিল। উপেনদা বলে দিলেন—বারোটার সময় সবাই এখানে আসবেন। যাঁরা স্বাধীনতার জন্য

প্রাণ দিয়েছেন, তাঁদের স্মরণ করে কিছুক্ষণ মৌনব্রত অবলম্বন করা হবে। বাড়ি এসে জিজ্ঞেস করলাম—কিসের স্বাধীনতা? এই দিনে আমরা প্রতিজ্ঞা করেছিলাম আমরা দেশ স্বাধীন করব। এতে কারা প্রাণ দিয়েছিল,—সে-সব গল্প শুনলাম। দুপুরে ঘণ্টা পড়তে দেখতে গেলাম। পতাকা অর্ধেক নামানো হল, সবাই মাথা নীচু করে একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপরে আবার পতাকা ওঠানো হল। দেশের জন্য যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন, তাঁদের জন্য এমনিভাবে শোকপ্রকাশ করা হল। বিকেলবেলা আবার চারটে-চারটে ঘণ্টা পড়ল। এবার পতাকা নামানো হল। "জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে"—গান হল। রাত্রে জলসা হয়েছিল, তাতে কেবল গান আর পড়া হল।" ৩১।১।১৯৫৩

শ্রীনিকেতনের মেলা

সেদিন ছিল বুধবার। সকালে ঘুম থেকে উঠলাম। মনটা খুঁৎ-খুঁৎ করতে লাগল। কাল শোবার আগে কী-সব ভেবে রেখেছিলাম। মনে পড়ছে না। প্রতিদিনের মতো হাত-মুখ ধুলাম। বেলা হয়েছিল। হঠাৎ নজর পড়ল রাস্তায়। গরুর-গাড়িতে বোঝাই করা হাঁড়ি। সারি বেঁধে চলেছে। মনে পড়ে গেল আজ ৬ই ফেব্রুয়ারি।—শ্রীনিকেতনের উৎসব। আগের দিনের জল্পনা-কল্পনা চোখের সামনে ভেসে উঠল। মাইল-দেড়েক দূর। জলযোগ সেরে বেরিয়ে পড়লাম। শীত ছিল। গায়ে চাদর নিলাম। পা-গাড়ি দিলাম চালিয়ে। ভেবে নিলাম,—পা-দুটি আমার নয়, নেহাৎ-ই ওরা বাহন।

শান্তিনিকেতন ছেড়ে মাঠে নেমেছি। ধানের ক্ষেত। সমস্ত ধান কেটে নিয়েছে। যেদিকেই তাকাই, দেখা যায় কেবল কাটাধানের গোড়া। বড় রাস্তা দিয়ে দলে দলে লোক যাচ্ছে। ঐ তো বোর্ডিংয়ের ছেলে-মেয়েরা। যাক ঠিক সময়েই রওনা দিয়েছিলাম। যে-করে-হোক ওদের ধরতে হবে। গল্প করবার লোক নেই। বড়-বড় পা ফেলে চললাম। পেছনে চেয়ে দেখি কত লোক। পিঁপড়ের সারি! যেদিকে যাচ্ছি, সেদিকটা বেশ খানিকটা উঁচু, এগোতে দেরি হচ্ছিল। তার উপর আলগুলি দিচ্ছে ধাঁধা লাগিয়ে। সোজা গেলে খুবই কাছে। আলে-আলেই ঘুরিয়ে মারে।

কিছুদিন আগেই সাতই-পৌষের উৎসব উপলক্ষে শান্তিনিকেতনে মেলা হয়েছিল। সেটা এই মেলার চেয়ে বড়। সেখানে মেলা একটা বড়ো আকর্ষণ।

নানা দোকান-পসার বসে। দেশ-বিদেশ থেকে লোক আসে। তখন লোকের ছুটিও থাকে। কিন্তু শ্রীনিকেতনের মেলা আলাদা রকমের। অন্য কোনোখানে ছুটিও হয় না। তাই ব'লে লোক যে কম হয়, তা নয়। আশে-পাশের গ্রামের লোক দিল্ খুলে এতে মেলামেশা করে। এটা তাদের ঘরোয়া ব্যাপার বলে মনে হয়।

শ্রীনিকেতনে ঢুকতেই চোখে পড়ে ছোট ফুল-বাগানটি। উৎসব-উপলক্ষে তাদের নতুন রূপ ফুটে উঠেছিল। ফুলের গাছগুলি সারি-সারি করে লাগানো, ছোটো ছোটো করে ছাঁটা। বিভিন্ন জাতের ফুল। বাগানের মাঝে একটি পরিষ্কার জায়গায় সুন্দর করে আলপনা দেওয়া, তার মাঝে পেতলের একটি প্রদীপ, তাতে পাঁচটি সলতে সাজানো। সম্মানিত লোক দ্বারা প্রদীপটি জ্বালানো হবে। প্রদীপ জ্বালিয়ে গান করার অর্থ এই যে, বলা হয়, সারা বছরে মনের মধ্যে যে সমস্ত আবর্জনা—হিংসা, ক্রোধ, কপটতার অশুচি—জমেছে, আগুনে তা পুড়ে যাক্, নূতন বছরে শুচি হয়ে সকলে কাজে নামব, নব-সৃষ্টির আলোকে উজ্জ্বল হয়ে চারিদিক প্রকাশ পাবে।

মেলার প্রবেশ-দ্বারটি সাজানো হয় শুধু খড় দিয়ে। খড়ের আঁটিগুলোকে গুছিয়ে সমানভাবে কেটে যে-রকম কায়দায় রেখে বেঁধে নেওয়া হয়েছে, তাতে শিল্পকলার পরিচয় দেয়। যে ক'জন উপস্থিত ছিলাম, কেউ কোনো কথা বলছিলাম না, স্থানটি পবিত্র লাগছিল।

খানিক-পরে ঘণ্টা পড়ল। সভাস্থলে একে-একে লোক জড়ো হল। রাস্তায় গাড়ির ভীড়। এল্‌ম্‌হার্স্ট সাহেব আসবেন। তাঁর অভ্যর্থনা হবে। সারি বেঁধে ভলান্টিয়াররা দাঁড়িয়েছে। হল্‌দে চাদর-কাঁধে এলেন শ্রীনিকেতনের কর্মীরা। সকলে এসে গেলে এল্‌ম্‌হার্স্ট গাড়ি থেকে নামলেন্। কতদিন পর সহকর্মীরা তাঁকে কাছে পেয়েছেন—সবাই আনন্দিত। শ্রীনিকেতনের উৎপত্তি সম্বন্ধে দু'চার কথা হল। সেদিন শ্রীনিকেতনের ত্রিশ বৎসর সম্পূর্ণ হল। গুরুদেব (রবীন্দ্রনাথ) তখন বিলেতে। সেখানে একদিন সন্ধ্যার সময় সকলকে তাঁর একটি অভিপ্রায় শোনালেন। কথাটি ছিল এই শ্রীনিকেতন সম্বন্ধে। তখনো এর উৎপত্তি হয়নি। কিন্তু বিলাতে থাকতেই এর পরিকল্পনাটি তাঁর মনে হয়েছিল। আমাদের দেশে অনেক গ্রাম আছে। তাদের মধ্যে কোনো যোগাযোগ নেই। গুরুদেব চেয়েছিলেন সেই সমস্ত গ্রামের লোকেরা বেকার হয়ে ব'সে না থাকে। তারা মিলিত হোক। খেটে উপার্জন করুক। তাদের স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা বাড়ুক, ভাববার

শক্তি জন্মাক। মনে-মনে এসব কথা অনেক আগে থেকেই তাঁর জমছিল। উপযুক্ত লোকের অভাবেই গুরুদেব ঠিকমতো সব ক'রে উঠতে পারছিলেন না। দেশে ফিরে এসে এবার তিনি সুরুলের এই কুঠি-বাড়িতে নিজেই কাজ শুরু করলেন। সেই সময় এই বিদেশী বন্ধু এল্‌ম্‌হার্স্ট সাহেব এসে শ্রীনিকেতনের কাজে যোগদান করেন। বলতে গেলে, এক-রকম তাঁরই সাহায্যে আজ শ্রীনিকেতনের কাজ এতদূর এগোতে পেরেছে।

খুবই ভালো লাগল মেলার প্রদর্শনী। মেলায় ঢুকতে প্রথমেই সকলের চোখে পড়ছিল একটি ছোট্ট জিনিস। জিনিসটি ছোট ছিল কিন্তু তার আকর্ষণ কম ছিল না। ছোট্ট একটি খাঁচা। তার ভিতর একটি জ্যান্ত কাঠবিড়ালী। মাথার উপর লোহার একটি আংটা। প্রাণীটি ক্রমাগত ডিগবাজী খেয়ে চলেছিল সেই আংটার ভিতর দিয়ে। শিক্ষায় এবং অভ্যাসে সামান্য একটি প্রাণীও কেমন আশ্চর্য কাজ করতে পারে,—লোকের মনে এই কথাটাই গভীরভাবে রেখাপাত করছিল। কেউ দেখুক না-দেখুক সে তার কাজ করেই চলেছিল। সুরুল গ্রামের একজন লোক তার পোষা কাঠবিড়ালিটিকে এই জিনিসটি শিখিয়েছিল।

বড় বড় মাঠগুলি শুকিয়ে খোয়াই হয়ে যাচ্ছে। মাটি দিয়ে ছোট্ট করে তার নমুনা বানিয়ে দেখানো হয়েছিল। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে আর গোরুর গাড়ির চলাচলে বীরভূমের মাঠের মাঝে মাঝে বড় বড় খাদের সৃষ্টি হয়। ক্রমে খাদগুলি বেড়ে গিয়ে খোয়াই হয়ে দাঁড়ায়। বেশির ভাগ জমি অনুর্বর। লাল কাঁকরের দেশ ব'লেই বীরভূম পরিচিত। এদেশের কৃষির উন্নতির পক্ষে অন্যতম চেষ্টা হবে খোয়াই বন্ধ করা।

ময়ূরাক্ষী-পরিকল্পনার কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। ম্যাপ এঁকে-এঁকে পর-পর তার কাজের ধারাবাহিকতা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই বাঁধ তৈরিতে আশেপাশের সমস্ত জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হল। এর স্রোতোবেগ থেকে উৎপন্ন বিদ্যুৎ-প্রবাহকেও কাজে লাগানো হবে। বাঙলাদেশ এর দ্বারা একটি বড় সম্পত্তির অধিকারী হল। বাঁধ-নির্মাণে কত জিনিসপত্র লেগেছে, তারও একটি হিসাব জানানো হয়েছে। দুটি কথার উল্লেখ করা যাচ্ছে। যত কংক্রিট লেগেছে, তাতে কলকাতা থেকে অমৃতসর পর্যন্ত একটি বারো ফুট রাস্তা তৈরি করা চলে। যত মাটি লেগেছে, তা দিয়ে একতলার সমান উঁচু ক'রে গোটা কলকাতা শহরের জমি ভরাট হয়ে যাবে।

প্রদর্শনীতে শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি কাঠের ছবি ছিল। চারকোণা কাঠের

পাটার উপর পাহাড় আঁকা। পাহাড়ে বন-জঙ্গল, সমতলভূমি, অনুর্বর স্থল সবই থাকে। এগুলির প্রত্যেকটির রং কী রকম হতে পারে, তা ভালো করে দেখা চাই। সেই-সেই রঙের কাঠের জোগাড় করতে হবে। কাঠের রঙীন টুকরোগুলি ঠিক-মতো বসানো দরকার। একটু এদিক-ওদিক হলে হবে না। কতখানি ধৈর্য ও মনোযোগ দিতে হয়, না দেখলে বোঝানো কঠিন। দূর থেকে দেখলে সাধারণ জিনিস, কাছ থেকে দেখলে অবাক লাগে।

গালার কাজের জন্যও শ্রীনিকেতনের খ্যাতি আছে। হাত দিয়ে কালো গালাকে কত রকমই না রূপ দিয়ে চলেছে—পাখি, ফল, কাগজ-চাপা ইত্যাদি। মাজাঘষা করতে হচ্ছে খুবই। ছোট জিনিস, তৈরি করতে সময় লাগে। একবার কারিগর কতকগুলি তৈরি-করা পাখিকে আগুনে দিল, গালিয়ে ফেলল। অন্য একটি জিনিস তখন বানাতে হবে। পাশে দাঁড়িয়ে দেখছিল একটি ছোটো ছেলে, কাঁদ-কাঁদ হয়ে মাকে বলে উঠল,—পাখিটাকে ওরা মেরে ফেললে কেন? বিদ্যাসাগরের চটি জুতো ছোঁড়ার গল্পটা মনে পড়ল। অর্ধেন্দু শেখর মুস্তফির অভিনয় দেখে তিনি এত উত্তেজিত হয়েছিলেন যে, অভিনয়ের কথা ভুলেই গিয়েছিলেন। ছুঁড়ে-ফেলা তার বিদ্যাসাগরী চটি নিয়ে আদর করে মুস্তফি মাথায় ঠেকালেন। সেটিই ছিল তাঁর পক্ষে সবচেয়ে বড় সম্মান। এখানে ছেলেটির কান্নাটুকুই ছিল শিল্পীর বড়ো মূল্য।

শ্রীনিকেতনের তাঁতের কারখানার কথা এখন অনেকেই জানে। মেলাতেও লোকে তার পরিচয় পেয়েছে। এক তাঁতে একবার দু'খানা ক'রে কাপড় বোনা হচ্ছিল। এ ছাড়া হাতের কাজের দোকান আরো অনেক-রকমেরই বসেছিল।

ক্রমে মেলায় লোক বাড়তে লাগল। চার-পাঁচটি স্টল ছিল। তার সা ক'টিই অল্পক্ষণের মধ্যে ভর্তি হয়ে গেল। দুপুর। ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ। মনেই ছিল না বাড়ি ফিরতে হবে। এতক্ষণ দিব্যি ছিলাম। শান্তিনিকেতনের বোর্ডিংয়ের ছেলেমেয়েরা ও অন্যান্য অনেকেই শ্রীনিকেতনে থেকে গেল। বটগাছের তলায় মস্ত এক পিক্‌নিকের আয়োজন হল। এছাড়াও দু'তিনটি দল আলাদা পিক্‌নিক করছিল।

বিকেলে আবার দু'টার সময় খেলাধুলা। তাড়াতাড়ি মেলায় ফিরে আসতে হল। এই দিনটতে আশেপাশের সমস্ত গ্রামের ছেলেরাই যোগ দেয়। এবার খেলাধুলায়ও ততটা জোর ধরেনি। বেশি দল আসেনি। যারা খেলাধুলায় যোগ দেয়, তাদের হলদে গেঞ্জি বা জামা পরা থাকে। বাংলা ভাষায় আদেশ ব'লে ব'লে

ড্রিল করানো হচ্ছিল। শেষে পুরস্কার-বিতরণের পালা। ড্রিলে যারা উৎকৃষ্ট, তারাই পায় প্রথম পুরস্কার। প্রতিযোগীদের সবাইকে শেষে খাওয়ানো হল।

বিকেলের দিকে মেলা আরো জমে। গাঁয়ের লোকই বেশি হয়। সুরুল ও অন্যান্য দিকের রাস্তাগুলি দিয়ে অনবরতই লোক-চলাচল হচ্ছিল, গোরুর গাড়িও ছিল অসংখ্য। ছোটো-ছোটো ছেলের দল মেলা দেখতে চলেছে, দু'তিন আনা ক'রে সকলেরই পুঁজি আছে। প্ল্যান ঠিক করা। চার পয়সার একটি বাঁশি, চার পয়সার একটি লাড্ডু, আর বাকি চার পয়সায় কিছু কিনে খাবে। নাগরদোলার সংখ্যা শান্তিনিকেতনের মতো তত নয়, ভিড়ও সেদিকে কম। মিষ্টির দোকান বসেছিল সারি-সারি। সেখানে গ্রামের লোকদের আনাগোনাই ছিল বেশি।

মেলায় আরেকটি জিনিস এসেছিল—"পশ্চিমবঙ্গের শিল্প-পরিচায়িকা।" সিসা গালিয়ে তাই দিয়ে সুন্দর-সুন্দর মূর্তি গড়ানো রয়েছে, হরিণ, সিংহ, হাতী, ময়ূর কত-কী। সাবধানে কাজ করতে হয়। গলা-সিসা হাতে একটুকু পড়লে সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটে। ভালো শিল্পীরাই এ কাজ পারে। বহু লোক ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই দেখে কাটিয়েছে। ওদের কাছ থেকে অনেকে এই জিনিসটি শিখে নিয়েছে। পাশে বোলপুরের লৌহশিল্পের ও অন্যান্য হাতের কাজের প্রদর্শনী হয়েছিল, দেশে যে এখনো কুটির-শিল্প মরে যায়নি, কোথায় কী অবস্থায় তা আছে, কীভাবে তার উন্নতি করা যায়, এ সব কথা লোকে জানতে পারে এই সব প্রদর্শনী থেকে। গুড় থেকে চিনি করা হচ্ছিল এক জায়গায়। কালো গুড়টাকে ধব্‌ধবে সাদা চিনিতে পরিণত করা দেখে লোকে বিস্মিত হচ্ছিল।

গোধূলি হয়ে এল। কিন্তু যেদিকে তাকানো যায়,—সেদিকেই মানুষের পদধূলি। বাইরে ঠেকা দায় শ্রীনিকেতনের বড়ো বাড়িটির ছাদের উপর উঠলাম। মেলাটাকে গলিভার্স-ট্রাভেলের লিলিপুটদের দেশ ব'লে মনে হচ্ছিল। মানুষগুলিকেও তথৈব চ। এইবার দৃষ্টিশক্তি আরো দূরে চালালাম। আশেপাশে গ্রাম দেখা যায় না। শুধু মাঠ আর মাঠ। মাঝে মাঝে এক-একটি কাঁচা রাস্তা চলে গেছে। —অনেক দূর, দেখে মনে হয় শেষ নেই। আশেপাশের গ্রামগুলির যা-কিছু আনন্দ মেলাতেই এসে যেন সব জমা হয়েছে। তাই দূরে লোকের বেশি কোলাহল নেই। দু'একটা কাক ও চিল উড়ে বেড়াচ্ছে। —এ ছাড়া জনপ্রাণীর চিহ্ন দেখা যায় না। ঐ তো একটি গাড়ি। ঘরে ফিরে যাচ্ছে। লোকে বোঝাই। ওদের কথা স্মরণ করে ভাবনা হল। এই জনহীন মাঠের মধ্য দিয়ে যাবে কী ক'রে। চোখের সামনে ভেসে উঠল তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের "আখড়াইয়ের

দাখি"। অনেকক্ষণ একা-একা কাটিয়েছি। নীচের কোলাহলের দিকে কানই ছিল না। এতক্ষণে একটু ভয়ও হল। তাড়াতাড়ি নেমে লোকের ভিড়ে যোগ দিলাম। বাড়িটিতে এবার প্রদীপ দেওয়া হল। রূপকথার দৈত্যপুরী কোথায় লাগে। দূর থেকে দেখলে মনে হবে আলোর একটি স্তম্ভ। বাতাসে শিখাগুলি কাঁপছিল। কোনোটাই নিভছিল না। সুন্দর দেখাচ্ছিল।

সন্ধ্যা সাতটায় পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের তরফ থেকে সিনেমায় শিক্ষামূলক ফিল্ম দেখানো হল। ছবিগুলি নূতন। পুরানো-ছাঁচে ঢালা নয় একটিও। এডিসনের জীবন। মানুষের টীকা নেবার প্রয়োজন কী। আমাদের দেহ কত জিনিস দিয়ে গড়া। রক্তকণিকা ও জীবাণুর লড়াই। দর্শকদের আগ্রহ বাড়ছিল। গ্রামের লোকেরা বুঝে গেল,—টীকে, ইন্‌জেকশন দিয়ে শুধু-শুধু তাদের ব্যথা দেওয়া হয় না—কত যে তাতে কাজ দেয়। —সকলেরই তা নেওয়া উচিত। সবশেষে লরেল ও হার্ডির একটি মজার ঘটনা দেখিয়ে সকলকে খুব আনন্দ দেওয়া হল।

পরদিনই কিন্তু দুপুরে মেলা জমল আরো খুব বেশি ক'রে। সেদিন গৃহস্থের ভিড়। সকলে ঘরের কাজের জিনিস কিনতে আসে। মাটির হাঁড়ি, কলসী, কুঁজো, কাঠের খাট, কপাট, বাঁশের তৈরি ধামা, কুলো, লোহার হাতা, খুন্তির বেচাকেনাই এদিনটায় বেশি চলে। সাঁওতালরা কিনছিল রুপোর দুল। মণিহারী দোকানগুলিও কম লাভ করবে না। শুনলাম আশেপাশে আরো কয়েক জায়গায় এ সময় মেলা হয়। তাই বেশি দোকানপাট আসতে পায়নি। আজকাল মেলায় বাজারে যেখানে-সেখানে দেখা যায়—সেলুলয়েডের খেলনার স্তূপ। আমেরিকার জিনিস। পয়সা লুটে নিচ্ছে সামান্য একটু রংচং দেখিয়ে। মাথা খেলিয়ে বিদেশীরা আমাদের মাথা কিনে নিল। যুদ্ধ করেও কেউ কাউকে এমন অধীনে আনতে পারে না।

এর পরে মানুষ ভিড়ল গিয়ে আরেক দিকে। সেটাই ছিল মেলার শেষ আকর্ষণ। রায়বেঁশে খেলা। আমাদের দেশে আগে সকলের স্বাস্থ্য ভালো ছিল। কারণ দু'মুঠো যা হোক খেতে পেত। বাঙালীর খ্যাতি ছিল—তারা বীর। আজকাল সেই রামও নেই, সেই অযোধ্যাও উবে গেছে।

স্বর্গীয় গুরুসদয় দত্ত নূতন ক'রে রূপ দিয়েছেন এই জিনিসটিকে। খেলা দেখাবার সময় আগে দলের লোকেরা দেবদেবীর বন্দনা ক'রে নেয়। তারপরে বাজনার তালেতালে ঘুরতে ঘুরতে শরীর নেশায় চাঙা হয়ে ওঠে। কাপড় খুলে ফেলে দেয়। জাঙিয়া-পরা উগ্র মূর্তিগুলিকে তখন ভীষণ লাগে। লোকগুলিকে

আগে মনে হত কী জানি কী, কিন্তু দেখলাম সত্যি তারা ভদ্র। সর্দার সকলকে ঠিক মতো দাঁড় করাচ্ছিল। কাকে কী করতে হবে, তার নির্দেশ দিচ্ছিল। প্রমথ চৌধুরীর 'মন্ত্রশক্তি' গল্পটি চোখের সামনে ভেসে উঠল। লোক হয়েছিল অনেক। সবাই এসে খেলা দেখতে ঝুঁকে পড়ল। আড়াই ঘণ্টা পুরোদমে খেলা দেখানো হল। সর্দার বললে, এত খেলা আছে যে, একদিনে দেখিয়ে সব ফুরানো যায় না। একটি খেলা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাত বছরের একটি ছেলে। সাড়ে তিন ফুট লম্বা। রোগা। পেট-মোটা। সকলকে তাক লাগিয়ে তিনজন বড় বড় লোকের ভার সে সহ্য করল। ওজনে লোকগুলি ছিল প্রত্যেকে দু'মন। বাঁশের ডগায় চেপেও একজন লোক খেলা দেখাল। সর্দারমশাই দশ হাত লম্বা ও দু'ইঞ্চি পুরু একটি বাঁশ কাঁধের ওপর রেখে ঘুরালেন। সবশেষে গুরুসদয় দত্ত মশায়ের রচিত কয়েকটি গান তারা গাইল। তারপরে আরো-একটি খেলা দেখাল, তবে শেষ করল। পল্লীর এই জীর্ণশীর্ণ লোকগুলিকে দেখে মনে হয়, পল্লীজীবন শুকিয়ে গেছে বটে, কিন্তু তার মধ্যে শক্তির ধারা একেবারে লুপ্ত হয়নি।

তৃতীয় দিন বিকেলে ছিল মহিলা-সমিতির সভা। পুরুষদের ঢোকা নিষেধ। মেলায় চেনা-জানা লোক কম ছিল। এমনি ঘুরে দেখছিলাম। এবার ছোটোদের দিকেও একটু দৃষ্টি গেল। তাদের চাই একটা বাঁশি, একটা খেলনা, বা নাগরদোলায় ঘুরপাক্। মেলা দেখে চলাই তাদের প্রধান নেশা। মাঝে মাঝে একে-ওকে ধ'রে খাওয়া আদায় করা। একজনকে কায়দা করতে পারলে একটা যুদ্ধজয়ের হুল্লোড় পড়ে যাচ্ছে। একটি ছেলে তার পরিচিত দাদাকে গিয়ে ধরল। এক আনার চানাচুর চাই। দাদা কিন্তু মাথায় হাত দিয়ে পড়লেন, বললেন,—পাগল নাকি? তেলে-ভাজা মেলার জিনিস। খেলেই পেটের অসুখ হবে। ছেলেটিও তেমনি। হটবার পাত্র সে নয়। বলল, তাহলে মিষ্টি খাওয়ান। এইবার হাত-জোড় ক'রে দাদা বললেন, ভাই, মাফ করো। মিষ্টি খাইয়ে কলেরার ভার আমি নিতে পারব না। ছেলেটি হাঁ করে রইল। পরে অবশ্য দেখা গেল, ঘটনাচক্রে সুদে-আসলে সে ভোজটা দাদার কাছ থেকে উসুল করে ছাড়ল। পরদিন তাদের স্কুল খুলে যাবে। বেশিক্ষণ তারা মেলা জমাতে পারল না। তা ছাড়া ওদিকে শান্তিনিকেতনে সেই সন্ধ্যাতেই আছে আরেক মজা। নাটক হবে,—'তাসের দেশ'। তাড়াতাড়ি সকলের ফেরা চাই। সন্ধ্যা হয়ে এল। আমরাও ফিরলাম। —সুব্রত কর ২৪।২।১৯৫

বসন্তোৎসব

স্থলে-জলে বনে-বনে দোলা লাগল, রঙে-রঙে আকাশ রঙিয়ে উঠল, গন্ধে গন্ধে মৌমাছিদল হল মাতাল। অবগুণ্ঠন খুলে ফেলে জাগ্রত বসন্ত মানুষের প্রাণের দ্বারে এসে নাড়া দিল—জলে-স্থলে ঘরে-বাইরে সবার সঙ্গে এক হয়ে মেলবার এই সময়, কুণ্ঠিতজীবনে তাকে বিড়ম্বিত করে ব্যর্থ হতে দিয়ো না। দোল-উৎসব সমস্ত ভারতের উৎসব। গোবিন্দ দোলায় চ'ড়ে রঙে রঙে রাঙা হবেন, সবাই সেই রঙের উৎসবে মেতে ওঠে। কিন্তু শান্তিনিকেতনে এ উৎসবটির একটি বিশিষ্ট রূপ আছে। এখানে নাচে-গানে আবির ছড়ানোতে দোল-উৎসব সম্পন্ন হয়। আকাশে-বাতাসে বর্ণে-গন্ধে আশ্রমে বসন্তোৎসবের আগমনী জেগে উঠেছে; ছাত্রছাত্রী-মহলে নাচ-গানের মহড়া চলছে, বড়দের মধ্যে মহড়া চলছে উৎসব-আয়োজনের, অতিথি-অভ্যর্থনা প্রভৃতি কর্ম-অনুষ্ঠানের। এবার দোল-উৎসবে পর-পর দু'দিন ছুটি। অতিথি-অভ্যাগতের বিশেষ ভীড় হবে মনে হচ্ছে। এর সঙ্গে আছে পনেরোই ফাল্গুন থেকে সতেরোই ফাল্গুন অবধি সাহিত্য-মেলার অনুষ্ঠান।

এইসব উৎসব-আয়োজনের সঙ্গে আশ্রমের অন্যান্য কাজকর্মও চলছে। পাঠ-ভবন ও শিক্ষা-ভবনের বিদায়ী ছাত্র-ছাত্রী দলকে বিদায়-ভোজ দেওয়া হল। এখানকার সব পরীক্ষাই এপ্রিলের শেষদিকে হবে শোনা যাচ্ছে। ৮।৩।১৯৫৩

আশ্রম-প্রকৃতি আজ শিমুলে-পলাশে কাঞ্চনে-রঙনে আম্রমঞ্জরীতে বর্ণে-গন্ধে অর্ঘ্যের ডালি তুলে ধরেছে, আশ্রমবাসিগণ মেতে উঠেছে বসন্তোৎসবের আয়োজনে। পুরোদমে রিহার্সেল চলছে "অরূপ রতন" নাটকের। বসন্তকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ "ফাল্গুনী", "চিত্রাঙ্গদা", "নবীন", "বসন্ত" প্রভৃতি বহু নাটক লিখেছেন। "অরূপ রতন" নাটকে প্রকাশ পেয়েছে বসন্তের বাহ্য মদির বিহ্বলতার পরে অরূপের অপরূপ-উপলব্ধির আনন্দ। রানী সুদর্শনার মন ও দৃষ্টি আচ্ছন্ন ছিল বাহ্য রূপের মোহে; বসন্তোৎসবের মত্ততায় ভুলে সে ভুয়োরাজা সুবর্ণের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল, প্রকৃত রাজার বিরূপ কায় তাকে ক্ষোভে লজ্জায় ধিকৃত করে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল। দুঃখের দাবদাহে তার মোহ যখন ঘুচল তখন অরূপের রসের সন্ধানে সমস্ত মান-অপমান বিস্মৃত হয়ে ঐশ্বর্য-আড়ম্বর ত্যাগ করে সে নেমে এল পথের ধুলায়, তপস্যা-শেষে উমার মতো মন তার তখন আত্ম-নিবেদনে "ভাবৈকরস" হয়ে গিয়েছে। ১০।৩।১৯৫৫

*　　　*　　　*

আজ স্থলে-জলে, বনে-উপবনে আবির্ভূতা "বাসন্তী ভুবনমোহিনী" ;—তাঁর বীণায় বাজে বসন্তবাহার। বাসন্তী-রঙের মাতন লাগে পাতায়, ফুলে-ফুলে; বসন্তোৎসবে মানুষও রঙিয়ে নেয় আপন বেশভূষা। প্রকৃতির সঙ্গে তার যে মনে-মনে রসস্রোতে ভেদ গেছে ঘুচে, বাইরের ভেদ সে সইবে কেমন করে! শান্তিনিকেতনে এতদিন বসন্তোৎসবে আম্রকুঞ্জে সকালবেলার নৃত্য-সজ্জায় বাসন্তী রঙ ভিন্ন অন্য রঙের প্রচলন ছিল না। এবারই তার ব্যতিক্রম দেখা গেল। সাজে-সজ্জায় বাসন্তী রঙের সঙ্গে লাল, সবুজ হরেকরকম রং এসে মিলেছিল। বসন্তে শুধু যে বাসন্তী রঙই দেখা যায় তা নয়; নবীন কিশলয়ে জাগে মধুর লালিমা: কাচ পাতায় লাগে চিকন সবুজ। তারই মধ্যে প্রধান হয়ে রাঙিয়ে ওঠে বাসন্তী। রবীন্দ্রনাথ চিরদিন এ উৎসবে বাসন্তী আলখাল্লা প'রে আসতেন। মৃত্যুর দু'-এক বছর পূর্বে ভুলক্রমে পরে এসেছিলেন কালো সাজ; তাই নিয়ে নাতনী নন্দিতার কাছে পরিহাস শুনে কবিতায় তার "জবাবদিহি" না করে স্বস্তি পেলেন না। এবার সে কথাটিই মনে পড়ছিল। আম্রকুঞ্জের নৃত্য-পরিকল্পনায়ও এবার বৈচিত্র্য ছিল। নূতনত্বের স্বাদ উপভোগ করা গেল। দোলের দিন রাত্রে "অরূপ রতন" নাটকটি অভিনীত হয়েছে। জনতা-সমাগমে গৌরপ্রাঙ্গণে তিলঠাঁই ছিল না। কিন্তু ব্যবস্থা এমন সুষ্ঠু হয়েছিল যে, এতটুকু গোলমালের সৃষ্টি হয় নি; হাজার দেড়েক লোক তৃপ্তির সঙ্গে অভিনয় দেখেছে। ১৯।৩।১৯৫৫

গান্ধী-পুণ্যাহ

শান্তিনিকেতন-আশ্রমের অন্যান্য অনুষ্ঠান-দিবসের চেয়ে 'গান্ধী-পুণ্যাহ' দিনটির মূল্য কম নয়। আশ্রমবাসী শ্রদ্ধার সঙ্গে এ দিনটিকে স্মরণ করে থাকে। গান্ধীজির জন্ম ও মৃত্যুদিন অনেক জায়গায় পালন করা হয়। বই পড়ি, সভাসমিতি করি, কিন্তু এ সব ক'রে আমরা মহাত্মাজীর সম্বন্ধে কর্তব্য কতটুকুই বা করতে পারি? তাঁকে দেখতে হবে তাঁর কাজের ভিতর দিয়ে।

মহাত্মাজী দেখতে ছিলেন একজন সাধারণ লোক। সাধারণকে নিয়েই তাঁর কাজ চলেছে। কী হলে স্বাধীন হওয়া যায়, সকলের ভিতর তিনি তারই মন্ত্র দিয়ে বেড়াতেন। তিনি শুধু বক্তা ছিলেন না। যা বলতেন, তাই ক'রে দেখাতেন।

গান্ধিজী নিজের কাজ নিজে করার পক্ষপাতী ছিলেন। কাপড়, জামা, বাসন,

বাড়িঘর—এ সমস্ত নিজেই পরিষ্কার করতেন। কাজটা খুব কঠিন নয়, কিন্তু এর জন্যও আমাদের লোকের দরকার হয়। সে-লোক কাজে ফাঁকি দিচ্ছে কিনা,—তার জন্য আবার আরেক-জন লোকের দরকার পড়ে। এর চেয়ে নিজে করে নিলে কাজটি ভালো হয়। মনের জোর বাড়ে। একেই বলে আত্মনির্ভরতা। সহজে ব্যাপারটির মীমাংসা হল। কিন্তু এই আত্মনির্ভরতা বাড়াবার জন্য দেশে চলেছিল কত কাল ধ'রে কত সভা, কত বক্তৃতা। গান্ধিজীর একটি কথাই ছিল,—যদি প্রকৃত স্বাধীনতা পেতে হয় তবে অনেক দিন আমাদের মেথরগিরি করতে হবে। ভারতবর্ষে আমাদের বস্তিগুলির আশ-পাশ থাকে নোংরা। এই নোংরামির জন্যই লোকের ক্ষতি হয়। স্বাস্থ্য ভালো থাকে না, লোক দুর্বল হয়ে যায়। স্বাস্থ্যই জাতির উন্নতির পথ। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা স্বাস্থ্যের একটি বড়ো দিক। এ জন্যই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাকে গান্ধিজী এত প্রয়োজনীয় মনে করতেন।

গান্ধিজী প্রথম কাজে নামেন দক্ষিণ-আফ্রিকায়। সেখানে বর্ণবৈষম্য ছিল প্রধান সমস্যা। কালো আদমিরা ব্যবসাতে সেখানে সুবিধা করেছিল। কিন্তু শ্বেতকায়রা সেটা সহ্য করবে কেন? তারা ভারতীয়দের সমস্ত সুখ-সুবিধা বন্ধ করে দেয়। তাই নিয়ে এক আন্দোলন শুরু হয়। এতেই গান্ধিজী প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রামে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। সেই সময় চার্লস এনড্রুজ এবং পিয়ারসন সাহেব তাঁকে সাহায্য করতে যান কবিগুরুর বাণী নিয়ে। গান্ধিজী সে যুদ্ধে জয়ী হয়েছিলেন।

ছাত্র ও কর্মীদের নিয়ে গান্ধিজীর অনুগামীদের একটি দল দক্ষিণ-আফ্রিকা থেকে শান্তিনিকেতনে আসেন। 'দেহলি' নামক ঘরটিতে তাঁরা থাকতেন। এদিকে গান্ধিজী ছিলেন ইংলণ্ডে। কাজের লোক তিনি। ১৯১৪ সনে প্রথম মহাযুদ্ধ বাধে। আহত সৈন্যদের সেবা-শুশ্রূষার কাজে লেগে গেলেন তিনি ভারতীয়দের একটি দল গ'ড়ে নিয়ে। এর পরে তিনি ভারতে ফিরে এলেন।

আশ্রমে হঠাৎ একদিন শোনা গেল গান্ধিজী আসছেন। শিক্ষক ও ছাত্রমহলে সাড়া পড়ে গেল। গুরুদেব তখন কলকাতায়। এদিকে গান্ধিজী এসে উপস্থিত। আশ্রমের রাস্তায়-রাস্তায় গেট সাজানো হল। সম্পূর্ণ বৈদিক প্রথানুসারে সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করে তাঁকে আশ্রমবাসী অভ্যর্থনা করলেন। আশ্রমে এসেই ঘুরে-ঘুরে তিনি সব জায়গাটা দেখতে লাগলেন। ছাত্রদের সঙ্গে মিলে গেলেন। তিনি যে তাদের অতিথি, এ কথা কারো মনেই হল না। পরদিন সভা বসল। আশ্রমের দলবল গান শোনাল। গান্ধিজী বললেন, আমাদের সব কাজ নিজেদেরই করতে

হবে। যতদূর সম্ভব, বিদেশীর হাত থেকে আমরা রেহাই পাবার চেষ্টা করব। হঠাৎ যুদ্ধ ক'রে তাদের তাড়িয়ে দিয়ে রাতারাতি স্বাধীন হতে পারব না। আগে আমাদের চরিত্র গঠন করতে হবে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে। এ না হলে আজ হয়তো ইংরেজ যাবে কিন্তু কাল আবার আমেরিকা এসে হানা দেবে। তখন দেশে রয়েছে বিদেশী গবর্ণমেণ্ট। বিদেশী পোশাক ও আচার-ব্যবহারে দেশ ছেয়ে ফেলেছে। গান্ধিজীর কাছে তাঁর বোম্বের অভ্যর্থনার চেয়ে শান্তিনিকেতনের অভ্যর্থনা বেশি ভালো লেগেছিল। বোম্বের সাজানো-গোজানো অনেকটা ছিল বিদেশ-ঘেঁষা। এই সমস্ত বিদেশী-অনুকরণের প্রতি তিনি ছিলেন খাপ্পা। আমাদের দেশে ভালো জিনিস থাকতে অন্যের জিনিসের উপর কেন নির্ভর করে থাকব? শান্তিনিকেতনের অভ্যর্থনায় দিশি সাজসজ্জা ও রীতিনীতি দেখে—এ কথাগুলি তাঁর আরো বেশি ক'রে মনে হতে লাগল, কিন্তু শান্তিনিকেতনেরও যাতে আরো স্বাবলম্বন বাড়ে এজন্য তিনি আশ্রমে জল-তোলা, বাসন-মাজা, রান্না করা সমস্ত কিছুই নিজেদের করার প্রস্তাব তুললেন। বললেন, চাকর বা মেথর ব'লে কোনো পদার্থই আশ্রমে থাকবে না।

কিন্তু এই উক্তিতে মাস্টার ও কর্মীদের মধ্যে দুটি ভাগ হল। এক দল বলতে লাগলেন, তবে তো পড়াশুনা কিছুই হবে না। এসব কাজই শুধু চলতে থাকবে। আরেক দল গান্ধিজীর বাণীকেই মানল।

আগের দলের উত্তর গান্ধিজী দিয়েছিলেন। বলেছিলেন,—বই প'ড়ে জেনে কী করবে? তাতেও তো রয়েছে কাজেরই প্রেরণা। এই কাজের জন্য যদি পড়াটা বন্ধ থাকে তাতেই বা ক্ষতি কী? বইয়ের শিক্ষাটাই কি প্রধান? যা হোক, শেষকালে সকলে একমত হল। ছাত্রদের একবার বলাতেই তারা রাজী। তার পরে রীতিমতো কাজ শুরু হয়ে গেল। চাকর-বাকরদের ছুটি দেওয়া হল। কাজে যারা একেবারে অনভিজ্ঞ, তারাও লেগে গেল। একটি দল হল রান্নার, একটি বাসন-মাজার, আরেকটি দল হল আশ্রম পরিষ্কার করার। এ ছাড়াও জোয়ান-জোয়ান লোকেরা লেগে গেল জল-তোলার কাজে।

এ ক্ষেত্রে গান্ধিজী রবীন্দ্রনাথেরও পরামর্শ নিয়েছিলেন। গুরুদেব তাঁর নিজের মন্তব্য হঠাৎ ইচ্ছামতো কোনোখানে দিতেন না। তিনি ব্যাপারটি ভালো করে জানলেন। তার পরে রায় দিলেন, উত্তম, যদি মাস্টার ও ছাত্র সকলে একমত হয় তবে কাজটি চলতে পারে। আরেকটি জিনিস লক্ষ্য করার ছিল যে, রবীন্দ্রনাথের লেখার মধ্যে যা ফুটে উঠত, সে-সব আদর্শ গান্ধিজীর কাজের মধ্যে প্রকাশ পেত।

কিছুদিন পরে গুরুদেব আশ্রমে ফিরে এলেন। তিনি সুরুলে রইলেন। সে সময় সেখানে বসে তিনি তাঁর 'ফাল্গুনী' নাটক রচনা করেন। কেহ কেহ মনে করেন, সে নাটকের 'দাদা'-র মধ্য দিয়ে তিনি গান্ধিজীর ভাবমূর্তি কিছুটা এঁকে থাকতে পারেন।

প্রত্যেক দিন সন্ধ্যার সময়ে গুরুদেবের কাছে সমস্ত দিনের কাজের রিপোর্ট যেত। গান্ধিজী আরেকটি বিষয় ছাত্রদের বলেছিলেন,—কাজ করো। তার পর যা সময় থাকে তাই তুমি তোমার পড়বার কাজে লাগাও। তবে কাজ ও পড়া দুই-ই চলবে।—কিন্তু, কাজটা বেশ কিছুদিন চলার পর সকলেরই কেমন বিরক্তি বোধ হতে লাগল। সকলের ধাতে সইল না। সন্ধ্যার সময় ছাত্রেরা এক-একটি দলে মিলে এই কাজ সম্বন্ধে আলোচনা করত। অনেকে বলতে লাগল,—পারব না। কথাটা গান্ধিজীর কানেও গেল। তিনি বললেন, ঠিক আছে। জিনিসটি যদি এত সহজেই হয়ে যেত, তাহলে তো স্বাধীন হবার জন্য কিছুমাত্র ভাবতে হত না। দুর্গম পথ অতিক্রম করতে হলে অনেকেই হোঁচট খেয়ে পড়বে। তাদেরই বার-বার পথ চিনিয়ে দিতে হবে।

এর পর হঠাৎ একদিন গান্ধিজী হরিদ্বারে যাবেন ব'লে ঠিক করলেন। সেখানে কুম্ভমেলা হচ্ছিল। এর মধ্যে একটি দুঃসংবাদ পৌছল। গান্ধিজীর গুরু গোখলে মারা গেছেন। মধ্যে তিনি একবার বোম্বে গিয়ে ঘুরে এসেছিলেন। ফিরে এসে হরিদ্বারে যাত্রা করলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সারা ভারতবর্ষটা প্রথমে ঘুরে দেখা। কারণ, গোখলে তাঁকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন যে প্রথমেই রাজনীতির ক্ষেত্রে নেমো না। ভারতের লোকের মনোভাব জানবে, তার পরে কাজ করবে। তাই তিনি কোনো জায়গায় একটানা বেশিদিন বসে থাকতে পারতেন না। শান্তিনিকেতনে এই কাজ উপলক্ষে ছিলেন ১৫ দিন। যে-দিনটিতে তিনি সবাইকে এখানে কাজে প্রবৃত্ত করান, সেদিনটি হচ্ছে ১০ই মার্চ। ১০ই মার্চ তিনি শান্তিনিকেতন ছেড়ে যান বাইরের কাজে।

তার পর থেকে প্রতি বছরের মতো এবারেও ঐ ১০ই মার্চ এল। আশ্রমে গান্ধিজীর আদর্শের প্রতি ও তাঁর পুণ্য-সংযোগের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদনের জন্য শান্তিনিকেতন-আশ্রমে সেদিন ছুটি ছিল। কিন্তু ভোর না হতে প্রতিবারের মতোই আশ্রমে লেগে গিয়েছিল এক কাজ-কাজ উৎসব। ছেলে-বুড়ো সকলে মিলে আশ্রমের সকল স্থানের ময়লা ঘুচিয়ে ফিরছিল। রান্না-বান্না, বাসন-মাজা—সব কাজেই সকলের কী উৎসাহ! আগের দিনই কর্মীদের নাম ও কাজের এলাকা

প্রকাশ্য স্থানে বিজ্ঞাপিত করা হয়েছিল। সেদিন বিকেলে আমবাগানে একজন অধ্যাপক ছেলেদের মধ্যে 'গান্ধী-পুণ্যাহে'র সব কথা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। কাজের দিনটিতে সকালে গৌর-প্রাঙ্গণে সকলে জমা হল। শিশুরা গেল প্রাঙ্গণ-পরিষ্করণে। বড় ছেলেমেয়েরা গেল রান্নায়। থালা-বাসন মাজার কাজও তারাই করল। প্রতি দলে একজন ক'রে ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ছিলেন। গাছের তলাগুলি শুকনো পাতায় ছেয়ে ছিল। বকুল ও আমের ডাল ভেঙে ঝাঁটা তৈরি ক'রে নিয়ে চলছিল ঝাঁটের পালা। দু'মিনিটে সব সাফ হয়ে গেল। এক জায়গায় ময়লা জড়ো ক'রে সব পুড়িয়ে দেওয়া হল।

আগে-আগে আশ্রমের সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীর রান্নাঘরে এদিনে খাবার ব্যবস্থা থাকত। কিন্তু আজকাল জিনিসপত্রের অনটনের দিনে তা সম্ভব হয় না। রান্নাঘরের উপরেই কাজের চাপটা পড়ে বেশি। আশেপাশের জায়গা থেকে সে-ঘরের ভিতরের আনাচ-কানাচ অবধি সব সাফ করা চাই। ঠাকুর-চাকরদের সেদিন ছুটি। কাজেই সেখানে প্রায় দক্ষযজ্ঞ লেগে গিয়েছিল। কেউ বলছিল, 'গেলাম গেলাম', 'হাত পুড়ে গেল', কেউ বা বঁটিতে আঙুল কেটে ফেলছিল; আইডিন, ব্যাণ্ডেজ সমস্তই এসে হাজির। মস্ত-মস্ত ড্রামে জল ভর্তি করে রাখা চাই। কারো নাম ধরে কেউ হাঁক পেড়ে চলেছে—একটু সাহায্য করার জন্য। ছেলেদের মনে উৎসাহ জাগাবার জন্য একদল আবার বাজনা বা জয়ে শোনাচ্ছেন। উদ্দেশ্য মহৎ—পরিশ্রমটা একটু হালকা করে দেওয়া। সমস্ত আওয়াজ মিলিয়ে একটি চাপা আওয়াজ দূর থেকে শোনা যা চ্ছল। সব আনন্দ খাবার হল্ ঘরে খেতে-খেতে পায় প্রকাশ। আলুনি. পোড়া বা আধসেদ্ধ—যাই হোক—সবই উৎসাহের মুখে অমৃত হয়ে ওঠে। নিজেদের হাতের রান্না! কত বা তার নাম! খেতে খেতে মহোৎসবের মতো ধ্বনি। কোনোদিকে একটু ক্লান্তি নেই। এইভাবে কাজের ভিতর দিয়েই শান্তিনিকেতনে গান্ধিজীকে প্রতি-বছর আনন্দের সঙ্গে অনুভব করার চেষ্টা হয়ে থাকে। ছুটির সাজ-পরানো এ যেন একটি কাজের-উৎসব।

শান্তিনিকেতনে একের পর এক উৎসব লেগেই আছে। তারই মাঝে চলে ক্লাস, অফিস। হঠাৎ একদিন হয়তো নোটিশ বেরল—কাল ছুটি। অনেকে ভুলে যায়—কেন ছুটি। শোনা গেল,—কাল 'দোল-পূর্ণিমা'। সকলের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। অতিথি-অভ্যাগতেরা দলে-দলে আসতে থাকল। বাড়ির সকলে পথ চেয়ে বসে আছে, হয়তো কারো আসবার কথা আছে। রাস্তায় ট্যাক্সি-রিক্সা চলার বিরাম নেই। নূতন গেস্ট-হাউস হয়েছে আশ্রমের বাইরে। কোলাহলটা একটু

সরে গেছে। সকলে আশ্রমের ভিতরটা দেখতে আসে। চাঁদনি রাত পেয়ে আগের দিন রাতে ছেলেরা খোলা মাঠে খেলতেই শুরু করে দিল। পরদিন পড়ার তাড়া নেই, ছুটি আছে। সেদিন গান্ধী-পুণ্যাহ উপলক্ষে গোটা আশ্রমটা পরিষ্কার করা ছিল—চারদিক ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে।

পরদিন সকালে দোল। দোলে বাসন্তী রঙের একটা-কিছু সকলকেই পরতে হয়, বিশেষ ক'রে ছেলেমেয়েদের। বসন্তে বাসন্তী পোশাক,—প্রকৃতির সঙ্গে বেশ খাপ খেয়ে যায়। প্রকৃতির কোলেই আমরা মানুষ। বাপ-মা'র কারো সঙ্গে যদি সন্তানের কোনো দিকে কিছু মিল না থাকে, সে কেমন খাপছাড়া হয়। গুরুদেব প্রত্যেক ঋতুকে উৎসবের ভিতর দিয়ে বরণ করতেন নৃত্যে-গানে,—নানা রঙেও। বসন্তে বাইরের সাজে রংটি থাকত বাসন্তী, প্রকৃতির নবীনতার সাজ।

নাচের দল কতক্ষণে বেরবে, প্রশেসন দেখতে সকলে উৎসুক হয়ে থাকে। হঠাৎ দূর থেকে খোলের আওয়াজ ভেসে আসে। সার বেঁধে নাচতে-নাচতে নাচের দল বের হয়। এটি উৎসবের একটি বড়ো আকর্ষণ! কারো হাতে শঙ্খ, কারো ডালায় ফুল, কারো হাতে আবিরের থালা। সে সমস্ত গন্ধ-উপহার ছিটোতে ছিটোতে, শঙ্খ বাজিয়ে যেন বসন্তকে অভ্যর্থনা করে আনতে থাকে। ছোটো-বড়ো সমস্ত মেয়েই নাচে যোগ দেয়। আমবাগানের সভাস্থলটা দু'তিন বার ঘুরে ঘুরে নাচ থামায়। যে-যার জায়গা নিয়ে বসে পড়ে। আরম্ভ হয় অনুষ্ঠানের পর্ব। গুরুদেবের কবিতার আবৃত্তি হয়, আর হয় গানের পর গান। সংস্কৃত শ্লোক দ্বারা ঋতুর বর্ণনা ক'রে তার তাৎপর্য বুঝিয়ে দিলেন পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন। শেষ গানটি হবার সময় ছোটো ছেলেমেয়েরা ব্যগ্র হয়ে থাকে আবিরের জন্য। মাঝখানে এক-থালা-ভর্তি আবির রাখা হয়। তাই নেবার জন্য কাড়াকাড়ি প'ড়ে যায়। এ ছাড়া এমনিতেও সকলে যার-যার আবির কেনে। সভা ভাঙলেই আবির খেলার পালা। লাল রঙে মাখা হয়ে যায় চারিদিক। বাতাসে আবিরের ছড়াছড়ি! জামা-কাপড় লাল হয়ে ওঠে। লোকজন চেনাই যায় না। ছেলে-মেয়ের দল যাকে আক্রমণ করে তার আর রক্ষা থাকে না। ছোটোরা গুরুজনদের পায়ে আবির দিয়ে প্রণাম করে, বড়রা তাদের কপালে আবির মাখিয়ে আশীর্বাদ করেন।

আমবাগানের সভার পরে আশ্রমের পুরানো কর্মী ও ছাত্রছাত্রীদের সকলে মিলে একটু ঘরোয়া রকমে আসর জমিয়ে তোলে। নাচ গান আবৃত্তির পালায় আনাড়িদেরও এবার অংশ মেলে। নাচতে-নাচতে কোনো একজন ছেলে হঠাৎ

এমন ভাবে বসে পড়ল যে, সকলে ভাবল নিশ্চয়ই সে পড়ে গেছে। কিন্তু তার সহচরটি যেমন দাঁড়িয়ে নাচছিল. তেমনি তখনো নেচে যাচ্ছে। একজন শিক্ষক ছুটে গেলেন,—আহা হা, বেচারী শেষটায় পা-টা ভাঙল! একটু পরে দেখা গেল, ছেলেটি কাঁদছে কই, সে যে মাটিতে লুটিয়ে হাত তুলিয়ে নাচছে। মাস্টার মশাই হতভম্ব হলেন। হো-হো করে উঠল হাসির ধুম। ফাগের ফোয়ারা উড়ল বাতাসে। দল বেঁধে গানের চলন্ত মজলিস চলল শালবীথি ঘুরতে।

দুপুরের দিকটা খানিকটা শান্ত থাকে। তখন থেকেই আবির দেওয়া বন্ধ। রাত্রে জলসা ছিল। বড়ো ক'রে আসর সাজানো হয়েছিল গৌরপ্রাঙ্গণে। ইলেকট্রিক আলোগুলিকে কানা ক'রে দিয়ে চাঁদের আলো ছড়াচ্ছিল এবার রঙের বাহার। গান ভেসে আসে কোন সুদূর কাল থেকে—

কো তুঁহু বোলবি মোয়।...
হেরি হাসি তব মধুঋতু ধাওল,
শুনয়ি বাঁশি তব পিককুল গাওল,
বিকল ভ্রমর সম ত্রিভুবন আওল,
চরণকমলযুগ ছোঁয়।...

সেদিন গুরুদেবের "ভানুসিংহের পদাবলী" গাওয়া হল। নাচের দ্বারা সেগুলির অর্থ সকলের কাছে আরো সুন্দর ক'রে ফুটিয়ে ধরা হয়েছিল। রাধা ও কৃষ্ণের নাচই ছিল প্রধান। অনেকদিন পর নূতন ধরনের গান শুনে সকলেই সেদিন তৃপ্ত হয়েছিল।

উৎসবের দিনগুলি কেটে গেল। আরেক সকাল এল। ছুটি ফুরিয়ে গেছে। একে-একে অতিথিরা চলে যাচ্ছে সবাই। স্কুল-কলেজ অফিস সমস্ত কিছু খুলে গেল। এত আনন্দের পর মন কি স্থির হয়ে কাজে বসবে? কিন্তু দেখা গেল, মন বসল, আরো যেন ভালো করেই বসল। একঘেয়েমি কেটে গেছে। কাজে স্ফূর্তি লাগছে। শান্তিনিকেতনের উৎসবগুলিও কী-যে কাজের জিনিস,—দু'দিন বাদে কাজে ব'সে তা বোঝা গেল। —সুব্রত কর ১৯৫২

বর্ষশেষ

এবার নববর্ষ পড়েছে সোমবারে। শুক্র, শনি, রবি তিনদিনই ছিল ছুটি। ক'দিন শান্তিনিকেতনে অতিথিদের খুব আনাগোনা চলছে। সূর্য পশ্চিম কোণে রক্ত-রাঙা, খেলা-শেষের ঘণ্টা পড়ল ঢং ঢং ঢং। এত তাড়াতাড়ি

ফুরিয়ে গেল খেলা! দলে দলে সব কোথায় যাবার আয়োজনে ব্যস্ত। চলতে হল নিজেকেও। ঘনিয়ে-আসা অন্ধকারের মৌনবুকে মন্দিরের দোরে এসে শুনতে পেলাম, আচার্য বলছেন:—"বর্ষশেষ, সূর্য অস্ত গেল। প্রতিদিনের মতো আবার সে উঠবে। কিন্তু যাঁদের দিন ফুরিয়ে এসেছে তাঁদের হয়তো মনে হবে সূর্য আজ চিরদিনের জন্যই বিদায় নিল। কাল থেকে শুরু হবে নতুন বছর—নবীনের জীবনযাত্রার পথ হবে নতুন। তাই আজ এই সন্ধ্যায় আমরা জড়ো হয়েছি সমস্ত বছরটিকে হাসিমুখে বিদায় দিতে।

কী পেলাম না পেলাম তাই দিয়েই কি আমরা বছরের দোষ-গুণ বিচার করব? দোষগুণের কথা মনে হওয়াই উচিত নয়। আঘাত, বেদনা, শোক, দুঃখ আনন্দ সব-কিছুই হয়তো এসেছে। তাদের হাসিমুখে বরণ করে নিয়ে এই কথাই বলতে হবে আদিতে-ও তুমি, অন্তেও তুমি। আঘাত পেলাম, দুঃখ হল, কিন্তু সে দুঃখ যেন ব্যর্থ না হয়। আঘাতেই আমাদের চেতনার উদয় হয়, তোমার স্পর্শ পাই। বীণার তারে আঘাত দিলে সে বেজে ওঠে, সকলকে দেয় আনন্দ। সেখানে তো আঘাত ব্যর্থ নয়। আঘাত কখন বেশি লাগে? পাথর আগুনে উত্তপ্তই হয়, আঘাতের মর্ম বোঝে না। উত্তাপ পেয়ে সে শিখার মতো আলোকিত হয় না।

আজ বছরের শেষ হবার মুখে আমরা একযোগে স্বীকার করে নিই—আমাদের দিনগুলি ব্যর্থ যায় নি। সুখের সময় আনন্দরূপে, দুঃখের সময় কল্যাণমঙ্গলরূপে তাঁকে স্মরণ করব। মহাভারতে পাই, ভীষ্ম সকলের পিতামহ ছিলেন। কিন্তু কৌরবদের সভায় তাঁর উঁচু স্থান ছিল না। কেউ তাঁকে মানত না। তিনি যখন শরশয্যায়,—যুধিষ্ঠির চার ভাইকে নিয়ে তাঁর কাছে গেলেন। —সার বস্তু কী,—এই সত্যজ্ঞানটি লাভ করবার জন্য যুধিষ্ঠির একে-একে প্রশ্ন করতে লাগলেন, ভীষ্ম সব উত্তর দিলেন। তখন ভীষ্মের কী আনন্দ। সারাজীবন অবহেলা সহ্য করে এসেছেন, একদিনের আনন্দে সব দুঃখ-বেদনা তাঁর দূর হয়ে গেল। এই দিনটির জন্যেই যেন তিনি সারাজীবন অপেক্ষা ক'রে ছিলেন।

রামায়ণেও অনুরূপ ঘটনা আছে। রাবণের তখন মুমূর্ষু-অবস্থা; রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বললেন—চলো, আমরা ওঁর কাছে যাই, জীবনের সারবস্তু কী, তাই জিজ্ঞাসা করে আসি। লোকটি খুব বিদ্বান। কিন্তু সে নিজে জানে না কত বড় মহত্ত্ব তার ভিতরে লুকিয়ে আছে।

লক্ষ্মণ প্রথমে সংকোচ করছিল কিন্তু রাম বুঝিয়ে বললেন যে, রাবণ আর এখন তাঁদের শত্রু নয়। রাম লক্ষ্মণ গিয়ে যখন তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করল, রাবণ কৃতার্থ

হল। হেসে উত্তর করল—এইটেই বড় দুঃখ ছিল,—যা চেয়েছিলাম তা কাউকে দিয়ে যেতে পারলুম না। তোমরা এসেছ, কী আনন্দ!

রাবণ বললে—যা সংকল্প করবে এবং কল্যাণ বলে মনে করবে কাজেও তাই তখনি পরিণত করবে। কাজে অবহেলা করলেই সবচেয়ে দুঃখের কারণ হবে। পৃথিবীতে ঘরে-ঘরে শোক-দুঃখই সাধারণত বেশি। প্রতিদিন সকল মানুষের উপরেই সে শোক আসে কিন্তু শুধু তা সয়ে গেলেই হবে না। প্রতিদিন তার এক-একটি সিঁড়ি পেরোতে হচ্ছে কাজের দ্বারা। কতদিনে তা পেরোতে পারব, সফলতার নাগাল পাব? রাবণ স্বর্গের সিঁড়ি তৈরি করবেন স্থির করেছিলেন, নিজের আলস্যের জন্য তা সম্পূর্ণ হয় নি।

রাজপুতনায় রজ্জব নামে এক সাধু ছিলেন। তিনি ভগবানকে বলেছিলেন—আমি এত পাপী, তোমার স্পর্শ পাই না, এই আমার দুঃখ। যাঁদের চোখ আছে ভগবান তাঁদের দূর থেকে পথ দেখিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু রজ্জব ছিলেন অন্ধ, তাকে হাতে ধরে পথ দেখিয়ে দিতে হবে। তিনি আমাদের বছরের সমস্ত কয়টি দিনই পথ দেখিয়ে নিয়ে যান। তাঁর স্পর্শ আমরা সেখানেই পাই।

আজ বর্ষশেষে আমরা তাঁর কাছে বারবার এই প্রার্থনাই করি, আমরা অন্ধ, তুমিই বছরের প্রত্যেকটি দিন আমাদের সহায় থাকো। পথ দেখিয়ে তোমার কোলে স্থান দাও। আমরা যেন উত্তপ্ত পাথরের মতোই হয়ে থাকি না, শিখার মতো সকলকে আলোকিত করে তোমার সঙ্গে যেন মিলিত হই। বছরের সব ক'টি দিনই সিঁড়ি। তার আরম্ভ যেখানে শেষও সেখানে।

আচার্যের ভাষণ শেষ হল। আলোকিত মন্দির থেকে বেরিয়ে যে-যার পথ ধরলে। বাইরের আনাচেকানাচে ঘনিয়ে-ওঠা আঁধারে সুরের রেশে ভেসে চলেছিল—

শেষ নাহি যে
শেষ কথা কে বলবে। ১৬।৪।১৯৫২

দুঃখ যদি না পাওয়া যায় দুঃখ ঘোচে না, দুঃখের তিমিরে জ্বলে ওঠে মঙ্গল আলোক। সুখের মধ্যে যাকে ভুলে থাকা যায়, দুঃখের মধ্যে তাকে একান্ত করে পাওয়া যায়। দুঃখের মধ্য দিয়ে মানুষের সচেতনতার উদ্বোধন হয়—আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন এই কথাগুলি এবার বর্ষশেষের মন্দিরের উপাসনায় বললেন। দিনের আলোতেই যে মানুষ জেগে থাকে বা জেগে থাকাই

যে সত্যিকার জেগে থাকা তা নয়। রাত্রির অন্ধকারে সবাই যখন ঘুমায় তখন জেগে থাকেন মুনি-ঋষিগণ। একটি বছর শেষ হল, আমাদের কতজনের কাছে তা ব্যর্থ হয়েছে। বর্ষশেষের দিনে সে কথাটা মনে করে যে দুঃখের মধ্যে জাগরণ হয়, সে বেদনা যেন ব্যর্থ না হয়। বীজ যেমন করে নিজেকে বিদীর্ণ করে জন্ম নেয় অঙ্কুরে, মুকুল যেমন নিজেকে বিদীর্ণ করে ফুটিয়ে তোলে ফুল, তেমনি যেন বর্ষশেষ আপনাকে বিলুপ্ত করে নববর্ষের মধ্যে জন্মলাভ করে। এ পৃথিবীতে এসেছি এও একটা তীর্থ, আবার এখান থেকে যাওয়া সেও আরেক তীর্থে যাওয়া। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে, এক জন্ম থেকে আরেক জন্মে মুক্তিলাভ করতে এমনি বন্ধন-ছিন্ন করবার বেদনা জাগে। এ দুঃখ মহৎ দুঃখ। বর্ষশেষে এ দুঃখ আমাদেরকে নূতন জীবনে উদ্বোধিত করুক।

*　　　　　*　　　　　*

রবীন্দ্রনাথ এ জন্যেই প্রত্যেকটি ঋতুকে উৎসব দিয়ে অভ্যর্থনা করতেন। আমরা ক্ষুদ্র মানুষ, আমাদের সাধ্য কী তাকে খুঁজে বের করতে পারি। প্রতিটি ঋতু আপনি এসে আমাদের দ্বারে দাঁড়ান, তাঁকে গ্রহণ করব না, এত বড় অবমানন হতে পারে না। বর্ষশেষ এবং নববর্ষ রবীন্দ্রনাথের কাছে অত্যন্ত প্রিয় ছিল। পারত-পক্ষে তিনি এ দুটি দিনে অন্য কোথাও যেতে চাইতেন না। বর্ষশেষের বিকেল থেকে আশ্রমের কাজকর্ম সব বন্ধ থাকত। তিনি মন্দিরের উপাসনায় আসবার জন্য প্রস্তুত হতেন। আশ্রমবাসীদেরও প্রস্তুত হতে বলতেন অর্থাৎ মনের প্রস্তুতি চাইতেন। মন্দিরের উপাসনায় হুড়মুড় করে চঞ্চল-চিত্তে আসা, এ তিনি কখনই পছন্দ করতেন না। এ দিনগুলিতে যখন তাঁকে বাইরে যেতে হত, খুব ব্যথা পেতেন। এ রকম একবার ঘটল—১৯২০ সনের নববর্ষোৎসবে মহাত্মাজীর আহ্বানে তাঁকে চলে যেতে হল; তিনি সে সময়ই "প্রভু তোমা লাগি আঁখি জাগে" প্রভৃতি কয়েকটি গান রচনা করলেন। আমাকে বললেন—বর্ষশেষ নববর্ষ সম্বন্ধে আপনার মধ্যযুগের সাধুসন্তদের বাণী থেকে কিছু বলুন। কবীর যাঁকে বলে গেছেন "সন্তদের সন্ত" সেই সাধক রবি দাস সম্বন্ধে আমি একটি ঘটনা বললাম। একবার বর্ষশেষের দিনে সাধক রবি দাস এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাচ্ছিলেন, পথে দেখলেন আখ-মাড়াই হচ্ছে। তিনি এক গ্লাস খেতে চাইলেন। চাষী বলল, আখমাড়াইয়ের কল নষ্ট হয়ে গেছে, যেমন আখ দিচ্ছি তেমনি বেরিয়ে যাচ্ছে, তার থেকে রস বের হচ্ছে না। মিস্ত্রী ডাকতে গেছে, আপনি একটু অপেক্ষা করুন, যন্ত্র ঠিক করে রস বের করে দিচ্ছি।

রবি দাস স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। বললেন—তুমি আখমাড়াই করে রস বের করতে পারছ না বলে তক্ষুনি মিস্ত্রী ডাকতে পাঠিয়েছ আর বছরের পর বছর, দিনের পর দিন যাচ্ছে, আমি তার থেকে কতটুকু রস নিঙড়ে নিতে পারলাম। সে যে অমনি অবহেলায় বেরিয়ে যাচ্ছে, সে কথা আমার খেয়ালও নেই। রবীন্দ্রনাথও কথাটা শুনে চুপ করে রইলেন, মনে খুব লাগল কথাটা। বললেন—তাই তো, কাল (অর্থাৎ সময়) থেকে কতটুকু রস আমরা উপভোগ করি, সার্থক করি, সে অমনি পেরিয়ে যায়। রসময় যে, সে অমৃতরসে মজে গিয়ে প্রতিনিয়ত কত রূপরস বের করছেন। আমরা তা গ্রহণ অবধি করতে পারি না। বর্ষশেষের দিনে সে-কথাটা মনে করে যেন আমরা নববর্ষে নূতনভাবে জেগে উঠি।

*　　　　*　　　　*

পরদিন প্রভাতে নববর্ষকে বরণ করা হল বৈতালিক গানে। আশ্রমে নববর্ষ এবং গুরুদেবের জন্মোৎসব একই দিনে অনুষ্ঠিত হয়। সকালে মন্দিরের উপাসনান্তে নববর্ষের উদ্বোধন হল।

"নব আনন্দে জাগো আজি" প্রভৃতি গানের পরে আচার্য ক্ষিতিমোহন বললেন—এ যেন সমুদ্রযাত্রা—এক জন্ম থেকে আরেক জন্মে যাত্রা—ক্ষুদ্র ভেলায় চড়ে আমরা সেই মহাসমুদ্রের আহ্বান শুনে যাত্রা আরম্ভ করেছি, জন্ম-জন্মান্তরের সমুদ্র নিশ্চিন্ত মনে পাড়ি দিয়ে এলাম। কাণ্ডারী আছেন তিনি, আমাদের ভয় কী। মধ্যযুগের এক কবি বলেছেন—কত মহাসমুদ্র পাড়ি দিয়ে এলে, আর দীঘির জলে তোমার ভয়? তরীকে খণ্ড খণ্ড করলে ডুববার ভয় থাকে; থেমে থাকলেই ভয় থাকে। নয় তো কিছু ভয় নেই। তিনিই আছেন কর্ণধার। আমাদের চলতে ভয় কী। ভাগবতে বলেছে—গময় গময়, চলতে থাকো, চলতে থাকো;—স্রোত বদ্ধ হলেই জল পচে গিয়ে নষ্ট হয়; চলতে থাকলে তার প্রাণবেগ থাকে অফুরন্ত। আমরাও চলব, নূতন থেকে নূতনের মধ্যে চলব, থেমে থাকব না; তরী ভাসিয়ে মহাসমুদ্রে যাত্রা করেছি যে-আহ্বানে সে-আহ্বানে ভয় পাব না, পিছিয়ে থাকব না। সামনের দিকে এগিয়েই চলব। নতুন বছরে এই আমাদের দীক্ষা।

মন্দিরের উপাসনা শেষে বকুলবীথিতে সমস্ত আশ্রমিক ও অতিথিগণ মেলামেশা ও শুভেচ্ছা-বিনিময় করলেন; তারপরে জলযোগের পালা সম্পন্ন হল। আম্রকুঞ্জে তখন আলী হোসেন সানাই বাজাচ্ছিলেন। সানাই বাজনার শেষে আম্রকুঞ্জে রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসবের অনুষ্ঠান হল। "হে নূতন, দেখা দিক আরবার জন্মের প্রথম শুভক্ষণ" —গান এবং পাঠ ও আবৃত্তি দিয়ে মহামানবকে সকলে স্মরণ করলেন। ১৮।৪।১৯৫৩

রবীন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিকী

রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী আসন্ন। দেশে এর আয়োজনে সাড়া জাগছে। বিদেশেও আলাপ-আলোচনা চলছে, সংবাদপত্রে এরকম খবর দেখা গেছে। দেশের লোক তাঁদের কবির জন্য আগ্রহশীল হবেন, তা স্বাভাবিক, কিন্তু বিদেশেও এই উদ্যোগের সূচনা না দেখলে রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্বকবি'র নামৌজ্জ্বল্য ঝাপসা লাগে। তবে আবহাওয়া তো ঠিক নেই, মেঘ, কুয়াশা এমন কি, এখন আবার বোমারু-বিমানের ধাক্কা—কত বাধাই না আছে,—সময়ে সময়ে সূর্যকেও ঢাকা পড়তে হয় তাদের ছায়ার আড়ে। কিন্তু এও ঠিক, একই সময়ে সব-দেশের আকাশ ঢাকা পড়ে না,—এই যা রক্ষে—তাই দিন চলে। যেখানে স্বাভাবিক গতি বন্ধ, সেখানেও আলো ধরে নিয়ে বিজ্ঞানে কাজ চালিয়ে দিচ্ছে—এও দেখা যায় অনেক স্থলে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের আলোর ক্ষেত্রেও সে কথা খাটে। যেখানে সোজাসুজি বাংলার চল বন্ধ, সেখানে অনুবাদের মধ্যে দিয়ে বিকীরিত হচ্ছে রবীন্দ্র-সাহিত্য।—শতবর্ষের উৎসব-পর্যায়ে এই আলোবিকীরণের বিবরণ সংহত করে তার সামগ্রিক একটা ধারণা জোগানো খুব কাজের হতে পারে। তার সাহায্যে কবির 'বিশ্ব'পরিচয়টি পাবে সার্থকতা। দূরে-দূরের এক-একদেশ এতখানি এগিয়ে আসছে যে, তারা আড়াল রাখছেই না;—কামানে কুয়াশানাশের খবর না আসুক, মনীষা দ্বারা বাংলা শিখে নিয়ে মূল রচনা থেকেই আজ কবিকে উপলব্ধির চেষ্টা সার্থক হচ্ছে, সে উপলব্ধি স্বদেশের দশজনের মধ্যে মাতৃভাষায় অনুবাদের সাহায্যে ছড়িয়ে দেবার বিপুল আয়োজন কী রকম বিপুলতর হয়ে দাঁড়াচ্ছে—এর আভাস এদেশে বসে পেতেও বাকি নেই।

বিশেষ করে, রাশিয়া ও চেকোস্লোভেকিয়ার কথা এ-উপলক্ষে উল্লেখযোগ্য। কিছুদিন আগে রাশিয়ায় রবীন্দ্র-সাহিত্য অনুবাদের ভারপ্রাপ্ত মহিলা অধ্যাপিকা শ্রীমতী ভেরা নোভিকভা-এর ভারত-আগমনের সংবাদ সকলে শুনেছেন। তিনি প্রয়োজনমতো বাংলাতেই অনর্গল কথাবার্তা চালান; তাঁর পরিচালনাধীনে রাশিয়ায় বিরাট একটি অনুবাদ ও প্রকাশনার বিভাগ চালিত হচ্ছে বহু কর্মীর সাহচর্যে। রবীন্দ্রসদনে তিনি এসেছিলেন। এখানকার ব্যবস্থাপনা তিনি দেখে গেছেন। রবীন্দ্রসদনের কর্মীদের কিছুদিন, তাঁর দপ্তর থেকে উপহারকল্পে-প্রেরিত, রবীন্দ্র-সাহিত্যের রাশিয়ার অনুবাদ-গ্রন্থগুলির যথাযোগ্য ব্যবস্থা-কাজে তৎপর থাকতে

হয়েছিল। কবির পুত্রবধূ শ্রীযুক্তা প্রতিমা দেবীর সঙ্গেও তাঁর বহু আলাপ হয়। তাঁর রবীন্দ্রানুরাগ ও রবীন্দ্র-সাহিত্যে অভিনিবেশ দেখে 'বৌমা' তাঁকে নাম দিয়েছিলেন 'রবিপ্রভা'। সত্যই রবির প্রভা-বিকীরণের কাজের দ্বারা নামের এই ধ্বনিগত তাৎপর্যই নয়, দায়িত্বটিও সঙ্গে সঙ্গে তিনি রক্ষা করে চলেছেন। ছাপার অক্ষর থেকে এতদিন তাঁদের সাহিত্যানুবাদ চলছিল, কিন্তু আরো প্রত্যক্ষ, আরো গভীর ক'রে জানা চাই—এই নিষ্ঠা নিয়েই এবার এসেছিলেন তাঁরা সাহিত্যকে তার স্বঅঞ্চলের চলন্ত জীবনযাত্রার মধ্যে জানতে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, এখানেই শেষ নয়,—কতবারই বা তাঁরা আর আসবেন-যাবেন, একেবারে নিজেদের ঘরে বসে যাতে এ-অঞ্চলের পরিবেশের সুযোগ কিছুটা পাওয়া চলে,—এজন্য ভারত থেকে জনকয়েক অনুবাদপটু কর্মীকেই তাঁরা স্বদেশ রাশিয়াতে এবার নিয়ে যাচ্ছেন ভারত-সরকারের বৈদেশিক দপ্তরের যোগাযোগ-ব্যবস্থার মাধ্যমে। নির্বাচিত সেই কর্মীদলের মধ্যে আছেন শান্তিনিকেতনেরও একজন কর্মী—শ্রীশুভময় ঘোষ। রবীন্দ্রনাথের অন্যতম ঘনিষ্ঠ-সহচর ছিলেন এঁর পিতা পরলোকগত কালীমোহন ঘোষ মহাশয়। রবীন্দ্র-সংগীতে বিশেষজ্ঞ শ্রীশান্তিদেব ঘোষ এবং 'দেশ' সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষ যথাক্রমে এঁর জ্যেষ্ঠ ও মধ্যমাগ্রজ। শুভময় ঘোষ নিজে তরুণবয়স্ক হলেও বিশ্বভারতীতে উচ্চশিক্ষিত এবং বিশেষ ক'রে সাহিত্যের সঞ্চয় ও রচনা উভয় ক্ষেত্রেই উদ্যোগশীল ও অভিজ্ঞ। স্বগত এবং নানা সূত্রগত বহু ভাবেই তাঁর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও অনুরাগ ও জানাশোনার সমন্বয় ঘটেছে। দলের মধ্যেই থাকাতে সেদেশে-এদেশে সাংস্কৃতিক যোগের সঙ্গে রবীন্দ্রানুশীলনের ব্যাপ্তিরও যে সুযোগ বাড়বে, এরূপ আশা করা অসংগত হবে না। শীঘ্রই এ দলটি রাশিয়ায় রওনা হবে। শতবার্ষিকী উৎসবের যে আয়োজন হচ্ছে, শান্তিনিকেতনে তার একটি কেন্দ্র থাকবে তা খুবই স্বাভাবিক। কবির ভ্রাতুষ্পুত্রী স্বনামধন্যা বয়োজ্যেষ্ঠা শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর পরিচালনাতে তার কাজ এগোচ্ছে। সে-দপ্তরের কাজেই সম্প্রতি নিযুক্ত ছিলেন এই শুভময় ঘোষ। নূতন কর্মক্ষেত্রে তাঁর এই কাজেরও ধারা অন্তঃপ্রবাহী থেকে সর্বদিক দিয়েই যাত্রা শুভ হবে, এই একান্ত আশা নিয়ে উদ্যোগটিকে আমরা অভিনন্দিত করছি।

শতবার্ষিকীতে শত-শত দৃষ্টির কেন্দ্রস্থল হবে বিশ্বভারতীর 'রবীন্দ্রসদন'। সেখানে নূতন অধ্যক্ষ যিনি কর্মভার গ্রহণ করছেন, সেই শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ রায়ের এ বিষয়ে দায়িত্ব রয়েছে বিলক্ষণ, সে তাঁর ব্যস্ততার মধ্য দিয়েও অনেকটা অনুভব করা যায়। টেবিলে-টেবিলে জমা হচ্ছে এসে অনুবাদগুলি। কত দেশের কত হরফের, কত বিচিত্র

মলাটের ও অন্তর্সজ্জার চমকপ্রদ নিদর্শন এই বইগুলি। তাদের ভাষার দুর্গ ভেদ ক'রে বিষয়টি ঠাহর করাই এক কঠিন ব্যাপার। বিশ্বভারতীর নানা বিভাগে নানা দেশের ছাত্রছাত্রী, অধ্যাপক এবং বহিরাগত বৈদেশিক পর্যটক-অতিথিদের ধ'রে ধ'রে ক্ষিতীশবাবু লেগে আছেন এই দুরূহ কাজটি উদ্ধার করবার জন্য। উদ্ধার যা পেয়েছে—তার মধ্যে দু' তিনটি নিদর্শনের কথা একটু বলা যেতে পারে। ফ্রান্সের বিদুষী ও চিত্রশিল্পী মাদাম আঁদ্রে কার্পেলিসের অনূদিত ফরাসী অক্ষরের বইগুলি রাখা আছে সামনের টেবিলেই। পাতায়-পাতায় ছবি,—আগাগোড়াই শিল্পীর নিজের হাতে অলংকৃত। কবির কত বড় ভক্ত ছিলেন তিনি, সে সম্বন্ধে বিস্তারিত কিছু না জেনেও তাঁর ভাষান্তরিত এই বইগুলির বহর ও পারিপাট্য দেখেই এক পলকে অনুমান করা যায় তাঁর শ্রদ্ধা ও অধ্যবসায়ের গভীরতা। সম্প্রতি মহিলা মারা গেছেন, কিন্তু তাঁর আত্মাকে পাচ্ছি আমরা কবির দুয়ারে বাণী-অঞ্জলিরতা। নোবেল-প্রাইজ পাবার খবরে আজকে সাড়া পড়ে গেছে হুয়ান রামন হিমিনেজংএর নামে। কিন্তু বহুদিন থেকে হিমিনেজং-দম্পতি রবীন্দ্রানুরাগের এক অপূর্ব দীপালি সাজিয়ে এসেছেন নিজেদের সাহিত্যে। শ্রীযুক্তা জেনেভিয়া রবীন্দ্রনাথের এক-একটি বই অনুবাদ ক'রে প্রকাশ করতেন আর তাঁর স্বামী হুয়ান রামন লিখে দিতেন তার প্রত্যেকটিতে এক-একটি নূতন-নূতন ভূমিকা, স্বরচিত কবিতায়। এমনি করে তাঁদের প্রচেষ্টায় অধিকাংশ বই-ই অনূদিত ও প্রচারিত হয়ে রবীন্দ্রনাথকে তাঁদের দেশে পরিচিত করবার পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। ভূমিকা-সম্বলিত সেই অনুবাদগুলি শোভা পাচ্ছে রবীন্দ্রসদনের বৈদেশিক সেল্‌ফে। আজ নিশ্চয়ই এ একটি মূল্যবান সংগ্রহরূপে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। আর-একটি নবতম সংযোজনও উল্লেখযোগ্য। শুধু পাশ্চাত্যের অনুবাদ-পরিচয়ই একান্ত হয়ে নেই, প্রাচ্যের সাংস্কৃতিক-আসরেও বাংলা-সাহিত্যের তথা রবীন্দ্র-পরিবেশেরও প্রতি কিরূপ ঔৎসুক্য ও সমাদর বাড়ছে, তার পরিচয়ও রবীন্দ্রসদনে এসে জমা হয়ে ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করছে। সম্প্রতি জাপান থেকে এসেছে একখানি অনুবাদ—'দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী'। 'জাপান বিশ্ব-পরিষদ' হচ্ছে এর প্রকাশক। অনুবাদক হচ্ছেন Professor Kizow nazu. টোকিয়োর Tamagawa Universityতে ইনি সংস্কৃতের অধ্যাপনা করেন। পকেট-বুক-এর আকারে বাঁধানো বইটির ধব্‌ধবে পাতাগুলি কী জলজলে লেখাতেই ভর্তি। গোড়াতেই তার এক পাতায় রয়েছে মূল বাংলা বইখানির প্রথম পাতার খানিকটার একটি উজ্জ্বল ফটো। বিশ্বভারতীর এগ্রো-ইকনমিক্ ডিপার্টমেন্ট থেকে শ্রীযুক্ত জ্যোতিপ্রসাদ ভট্টাচার্য ক'দিন আগে

গিয়েছিলেন জাপানে খাদ্য-পরিষদের অধিবেশনে ভারত-সরকার মনোনীত অন্যতম প্রতিনিধি হয়ে। তাঁরই মারফতে জাপান থেকে প্রেরিত হয়েছে উপহারস্বরূপ এই আত্মজীবনীর অনুবাদখানি শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্দেশে। রবীন্দ্র-শতবার্ষিকীর পুরোভাগে রাখবার মতো এই ডালির সমাবেশ-সংবাদ আশা করি সকলকেই আনন্দিত করবে ১০।১২।১৯৫৬

শতবার্ষিকী উপলক্ষ করে বিদেশ থেকে সাড়া আসছে শুধু অনুরাগের নয়, সংগঠনমূলক স্থায়ী কাজেরও। এই যোগাযোগের মুহূর্তে কোনোদিকের অব্যবস্থা, অস্পষ্টতা বা অপ্রস্তুতি যেন রসপিপাসু অনুসন্ধিৎসুদের আগ্রহকে ক্ষুণ্ণ না করে দেয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে নিতান্তই। কেননা, এ সঙ্গে জাতীয় রাষ্ট্রমানও রয়েছে জড়িত। কবির স্মৃতিপূজা নয়, তাঁর জীবন-প্রতিষ্ঠা করতে চায় তাঁরা নিজেদের দেশে নানা অনুষ্ঠানের স্থায়ী-ব্যবস্থায়। তিনি যে নিখিল-মানবতার জীবন্ত আদর্শ রেখে গেছেন তাঁর বিবিধ সাধনায়, তার সমন্বিত রূপ প্রকাশ পাবে শুধু দেশের রবীন্দ্র-প্রতিষ্ঠানসমূহে নয়, ব্যক্তিজীবনেও তার প্রভাব যাতে সঞ্জীবিত থাকে—এই হবে আজ অনুরাগী উদ্যোক্তাদের একান্ত লক্ষ্য। সুইশ-মনীষী ডঃ পল গেহিভের নিকট থেকে রবীন্দ্র-সদনাধ্যক্ষ সম্প্রতি যে পত্রখানি পেয়েছেন, তার মধ্যে মহৎ এই কর্মোদ্যোগের সহানুভূতির কথাই প্রকাশ পেয়েছে। শান্তিনিকেতনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে গেহিভ স্বদেশে একটি শিক্ষাশ্রম পরিচালনা করে আসছেন। রবীন্দ্রসদন-প্রতিষ্ঠা-ভাণ্ডারে তিনি একশত ফ্রাঁ দান করেছেন।

শতবার্ষিকীর আয়োজন-সংবাদের সম্বর্ধনায় রাশিয়া থেকে যে সাড়া এসেছে আগ্রহের গভীরতায় তাও পরম হৃদয়গ্রাহী। বাংলাভাষায় অভিজ্ঞ হয়ে এদেশে কিছুকাল বাস ক'রে, রবীন্দ্র-সদন ও রবীন্দ্র-পরিমণ্ডল প্রত্যক্ষ ক'রে, স্বদেশ রাশিয়ায় ফিরে গিয়ে চৌদ্দ খণ্ডে রবীন্দ্র-রচনাবলীর অনুবাদ প্রকাশের বিরাট কাজে যিনি রাষ্ট্র থেকে ভারপ্রাপ্ত হয়েছেন, এমন মহীয়সী এক মহিলাও কর্তৃপক্ষকে লিখেছেন আরেকখানি পত্র। তাঁর স্বহস্তলিখিত বাংলাভাষার দীর্ঘ পত্রের অংশবিশেষ হচ্ছে এইরূপ—

'আচার্য শ্রীজবাহরলাল নেহরু রবীন্দ্রসদনকে সর্বজাতীয়-স্মারণিক-প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে স্বীকার করিলেন শুনিয়া আমি খুব খুসি হইলাম। রবীন্দ্রসদন নিশ্চয় বাংলা জাতীয় ভাণ্ডার নহে, ইহা সর্বজাতীয় ভাণ্ডার; কারণ পৃথিবীর সাহিত্যিক মধ্যে গুরুদেব ছিলেন প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থকার এবং তাঁর মানবিকতা এবং সর্বজাতীয় বন্ধুত্বের প্রচার সব শান্তিকামী মনুষ্যত্ব বুকের মধ্যে রাখবেন। এই চিঠি ৮—১০মে'র

মধ্যে আপনি পাবেন। সেইদিনে বাংলাদেশে এবং বিশেষত শান্তিনিকেতনে গুরুদেবের জন্মদিন আপনার অনেক সমারোহের স্মরণীয় কারণ। সেইদিনে আমিও আপনাদের মধ্যে এবং আপনাদের সঙ্গে গুরুদেবের স্মরণ পালন করি। আমরা নিশ্চয় গুরুদেবের শতাব্দী-উৎসব পালন করবার উদ্‌যোগ করব। সর্বপ্রথমে রবীন্দ্রনাথের রচনা চৌদ্দ খণ্ডে প্রকাশ করব। সে খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে। কারণ এইবারে আমরা তাঁর কবিতার অনুবাদ করব। তাছাড়া প্রদর্শনীও প্রস্তুত হবে।...”

এর প্রত্যুত্তর যোগাতে অতঃপর এদেশে যে আমাদের যথাযোগ্যভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে কেবল কবির রচনাবলীর বিশুদ্ধতায় নয়, তাঁর প্রতিষ্ঠানে তাঁর আদর্শের বিশুদ্ধতার দিকেও, এ কথার এবং তদনুরূপ কাজের গুরুত্ব আশা করা যায় আরো ভালোভাবেই উপলব্ধ হবে দিনে-দিনে।

এ সঙ্গে দেশেরও একেবারে ঘরের-কোণের অংশটিতে সাড়া জাগবার দু’ একটি খবর উল্লেখ করা যেতে পাবে। পঁচিশে-বৈশাখে সব জায়গার মতো বোলপুর শহরেও কবির জন্মোৎসবের আয়োজন হয়ে থাকে স্কুল-কলেজ-লাইব্রেরি ও নানা সংঘ-সমিতিতে। এবারও সে ধারা অপ্রতিহতই চলেছে। কিন্তু এরই মধ্যে বোলপুর সর্বার্থসাধক উচ্চ বালিকা-বিদ্যালয়ে যে উৎসব সম্পন্ন হয়েছে, তাব নৃত্যগীত, আবৃত্তি, অভিনয় ছাপিয়ে প্রদর্শনীর উদ্ভাবনাটিতে একটু বৈচিত্র্য ও বিশেষ অনুরাগের পরিচয় দিয়েছিল। ছাত্রী বা শিক্ষিকা-সমাজের যাঁর কাছে রবীন্দ্র-রচনার যে-কোনো নিদর্শন আছে, তাই দিয়ে তাঁরা সাজিয়েছিলেন সেই অর্ঘডালাখানি। কেবল লাইব্রেরির সংগ্রহ দিয়ে অনায়াসে কাজ সারা হয়নি। সকালে যে সম্মেলন হয়েছিল, তাতেও শুধু বাণীপাঠ নয়, কবি-সান্নিধ্যের প্রত্যক্ষ-অভিজ্ঞতার একটি বিবরণ দিয়ে মনোজ্ঞ ভাষণ দিয়েছিলেন স্কুলের বিজ্ঞান-শিক্ষক শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ও প্রবীণ ছাত্র শ্রীযুক্ত সুহৃৎকুমার মুখোপাধ্যায়। প্রদর্শনীতেও তাঁরি প্রদত্ত রবীন্দ্র-রচনার পাণ্ডুলিপির পাতাগুলি সমস্ত আবহাওয়াটিকে জীবন্ত করে তুলেছিল। দিনুবাবুকে আনকোরা সুরটি ধরিয়ে দেবার কালে নূতন লেখা গানের খসড়া কবি যা ব্যবহার করতেন, সেই কাগজগুলি সংগ্রহ করে রাখা ছিল সুহৃৎবাবুর এক বাতিক। এরকম, তাঁর চিঠিপত্রের বহু নকল এবং “আমাদের শান্তিনিকেতন” গানের কবি-হস্তাক্ষরসমৃদ্ধ সাইক্লোস্টাইল-কপি,—সবই সেদিন তাঁর সৌজন্যে দেখা গিয়েছিল এবং সেই সূত্রে ভাষণ থেকে যা দু’চার কথা শোনা গিয়েছিল তা সত্যই ছিল অপূর্ব। সরল জীবনযাত্রা ও উচ্চ চিন্তার সঙ্গে বিবিধ শিল্পানুশীলনে-সমাহিত শান্তিনিকেতনের

সেই কবি-পরিচালিত দিনযাত্রার স্নিগ্ধসরস গল্পগুলি সকলকে স্বল্পকালের মধ্যে এক নিবিড় ধ্যানলোকে নিয়ে গিয়েছিল। প্রথম 'বিসর্জন' নাট্যাভিনয়ের দিনে অকস্মাৎ কলকাতা-আগত বৃহৎ একদল অতিথিকে দুর্লভ-দর্শনের অগ্রাধিকার দেবার জন্য আশ্রমের শিশু-ছাত্রদল অধ্যাপকদের কথায় এক মুহূর্তে প্রেক্ষাগার ছেড়ে কিছুই না দেখে নীরবে বাইরে চলে এল,—কেবল এই কথাটিই সেদিন থেকে হাজার উপদেশের চেয়ে বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের মনে সৌজন্য, সেবা ও শৃঙ্খলারক্ষায় কার্যকরভাবে স্মরণীয় হয়ে চলেছে। কবির 'নোবেল-প্রাইজ' পাবার প্রথম খবরটার বর্ণনাও ছিল অদ্ভুত আগ্রহজনক। সেবারই প্রথম একটা মোটর-যান কেনা হয় আশ্রমে, বিলাত থেকে ফেরবার সময় গুরুদেবের সঙ্গে সে 'যান'টাও এসে গেল। নূতন যানে চড়ে নানাজন তখন সকালে-বিকালে টহল দিত এদিকে-ওদিকে। এমনি এক পরিভ্রমণের মুখে সকালে যানটি সুপুরের রাস্তা ধ'রে বর্তমান হাটখোলার কাছ দিয়ে যখন পেরিয়ে যাচ্ছে, রাস্তার পাশের তৎকালীন বোলপুর পোস্টাফিস থেকে ডেকে দাঁড় করানো হল যানটিকে এবং একখানা টেলিগ্রাম এগিয়ে দিলেন পোস্টমাস্টার যাত্রীদের হাতে। এণ্ড্রুজই খুলে পড়লেন বার্তা। ঘুরল মোটরের মুখ! সেদিন দিনুবাবু, ক্ষিতিবাবু ও রথীবাবুর সঙ্গে কবিও ছিলেন আরোহীদের একজন। আশ্রমে ফিরে এলে, সংবাদ যখন প্রচারিত হল, তখন নোবেল-প্রাইজটার নোবেলত্বটুকুর কোনো হদিসই কাউকে উচ্চকিত করেনি। কেবল এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকার অঙ্কটাই যা সাড়া তুলেছিল। শেষে যখন ওয়াকিবহাল হওয়া গেল তার আভ্যন্তরীণ প্রকৃত তাৎপর্যে, তখন পৃথিবীর সেরা কবির মান-স্বীকৃতিটা এক মুহূর্তে লক্ষ টাকাকে ছাপিয়ে গেল গৌরবের মূল্যে ও আনন্দের উদ্দীপনায়। সুদূরের সেই দিনের আনন্দের স্বাদ আজকের দিনের এই গল্পের পরিবেশন-গুণে কিছুটা যেন সুলভ হয়ে উঠেছিল। সন্ধ্যার বিনোদন-আসরেও, সেদিন সে-স্কুলের বৈশিষ্ট্য ছিল তিনটি নাট্যকাব্যাভিব্যক্তিতে। 'মস্তক বিক্রয়', 'পূজারিণী' ও 'গান্ধারীর আবেদন'-এর সুনিপুণ প্রযোজনায় রসাবেদনের অভাব ছিল না। প্রাথমিক-বর্গের বালিকারা সমবেত কণ্ঠে যখন গাইছিল "জগৎ জুড়ে উদার সুরে আনন্দ গান বাজে" তখন আনন্দের শিহরণের মধ্যে অনুভব করা গিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববাণীর উদার ছন্দমূর্ছনা।

*   *   *

কবিপক্ষের প্রারম্ভ থেকে বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগ শান্তিনিকেতনের স্টাফ-ক্লাবে তাঁদের প্রকাশিত ছেঁড়াখোঁড়া গ্রন্থসমূহের একটি বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন।

সুলভ মূল্যে কর্মীদের মধ্যে অনেকেই বহু রবীন্দ্র-রচনা এ সুযোগে সংগ্রহ করে রেখেছেন। গ্রন্থন-বিভাগের আর-একটি উদ্‌যোগও উল্লেখযোগ্য। শুভ পঁচিশে বৈশাখের স্মরণে তাঁরা একখানি সুমুদ্রিত পত্র প্রকাশ করেছেন উপহাররূপে। মাল্যবিভূষিত কবির মহিমান্বিত আলেখ্যখানি টেবিলে সাজিয়ে রাখবার মতো, আর তারি পাশের পাতার কবি হস্তাক্ষরের "কোথায় ফিরিস পরম অন্বেষণে" গানখানির সুন্দর লেখাগুলি প্রতিদিন মনকে অন্বেষণে নিবিষ্ট করে নিয়ে যাবে একবারো অন্তত মনের গহনে। ১৪।৬।১৯৫৮

খেলাধুলা

খেলাধুলার আসরও ক্রমে-ক্রমে জমছে। এককালে বিশ্বভারতীর ক্রীড়া-বিভাগ উন্নত-মানের ছিল। এখনো তাকে বিশেষভাবে সংগঠিত ক'রে আন্তর্জাতিক মান দেবার উদ্দেশ্য আছে। নতুন শিক্ষকও এসেছেন একজন। ইতিমধ্যে কলকাতার গভর্ণমেণ্ট আর্ট-স্কুলের ছাত্রদল এসেছিলেন, দু'দিন তাঁরা খেললেন শান্তিনিকেতনের সঙ্গে। আর-একদিন শান্তিনিকেতনের খেলা জমেছিল বোলপুর টাউন ক্লাবের সঙ্গে। দু' পক্ষই সমান গিয়েছিল। সুতরাং উৎসাহ নিয়েই সকলে ফিরেছিল ঘরে। ৯।৯।১৯৫১

* * *

বর্ষার পর্বে শান্তিনিকেতনে ফুটবল খেলা চলছে। বাইরে থেকে দুটি দল এসেছিল—একটি খড়্গপুরের I. I. T. অপরটি কলকাতা ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক। আশ্রমের লীগের খেলাও প্রায় শেষ হয়ে এল। বিশ্বভারতীর এক-একটি বিভাগের পরস্পরের সঙ্গে খেলা হয়; যে-দল ফাইন্যালে জেতে তারাই সেবারকার মতো শীল্ড পায়। এককালে শান্তিনিকেতন খেলা-ধুলায় নাম করেছিল। বাইরে সিউড়ি, বর্ধমান, সাঁইথিয়া প্রভৃতি জায়গায় তারা খেলতে যেত। বাইরে নানা-জায়গা থেকে নানা-দল আশ্রমে খেলতে আসত। কিন্তু বর্তমানে খেলার মান অনেকটা নেমে গেছে। এবারই বিশেষ করে এই জিনিসটি লক্ষ্য করা গেল। আশ্রমের কর্তৃপক্ষ এদিকে দৃষ্টি দিতে তৎপর হয়েছেন। ৫।৯।১৯৫৩

* * *

প্রতিবারের মতো এবারও ব্যাড্‌মিণ্টন-প্রতিযোগিতা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ছোটদের অর্থাৎ পাঠভবনের প্রতিযোগিতায় সিঙ্গলস্ ফাইন্যালে শান্তময় মিত্র

সত্যরঞ্জন ঘোষকে পরাজিত করেন। ডাবলস্ ফাইন্যালে শান্তিময় ও সুপ্রতীক বসু পরাজিত করেছেন মদন বণিক ও দীপক চৌধুরীকে। বড়দের সিঙ্গলস্ ফাইন্যালে শিক্ষাভবনের দ্বিতীয় বার্ষিক ছাত্র শ্যামলানন্দ ঘোষ উক্ত ভবনের প্রথম বার্ষিকের ছাত্র সুব্রত করকে পরাজিত করে বিজয়ী হন। ডাবলসে শিক্ষাভবনের রণজিৎ রায় অরুণ রায়—সুজিৎ রায় ও শ্যামলানন্দ ঘোষকে পরাজিত করেন।

প্রতি বছর সরস্বতী পূজার সময় আশ্রমের স্পোর্টস্ হয়। এবারও তা আরম্ভ হয়েছে। পাঠভবনের ছাত্রগণ N. C. C-র শিবিরের কাজে বাইরে যাবে, সেহেতু Cross Country Race প্রভৃতি ছু তারিখের আগেই সম্পন্ন হয়েছে। সরস্বতী-পূজার দিন কয়েকটি খেলা হবে; বাকি স্পোর্টস্ স্কুলের ছেলেরা ফিরে এলে ষোল ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবার কথা আছে। আগে Cross Country Race প্রতিযোগিতার দূরত্ব ছিল তিন মাইল। গত দুই বছর যাবত পাঁচ মাইল দূরত্ব নির্দিষ্ট করা হয়েছে। নূতন আর-একটি বিষয় স্পোর্টসের অন্তর্গত করা হয়েছে—ভ্রমণ-প্রতিযোগিতা। এবার এ দুটি প্রতিযোগিতায় নূতন রেকর্ড স্থাপিত হয়েছে। শিক্ষাভবনের প্রথম-বার্ষিকের ছাত্র সুব্রত কর সাড়ে একত্রিশ মিনিটে পাঁচ মাইল দৌড়ে শীর্ষস্থান অধিকার করেন। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন সংগীতভবনের নবাগত সিংহলী ছাত্র কুলরত্নম্। তৃতীয় স্থান অধিকার করেন শিক্ষাভবনের তৃতীয়-বার্ষিকের ছাত্র অজেয় রায়। তিন মাইল ভ্রমণ-প্রতিযোগিতায় পাঠভবনের প্রথম-বর্গের ছাত্র মনোরঞ্জন সরকার প্রথম হন এবং ৩০ মিনিট ৫৫ সেকেণ্ডে দ্বিতীয় হন নবাগত অহমীয়া ছাত্র বরগোহাইন্। ১৫।২।১৯৫৪

বিশ্বভারতীর নবনিযুক্ত উপাচার্য ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচীকে বিশ্বভারতীর বিভিন্ন বিভাগ থেকে অভ্যর্থনা জানানো হয়েছে। এর মধ্যে শান্তিনিকেতন জাতীয় শিক্ষার্থী-সেনাবাহিনীর সম্বর্ধনার উত্তরে ডঃ বাগচী যে অভিভাষণ দেন সেটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন যে, শান্তিনিকেতনে যখন সামরিক এই শিক্ষা-কেন্দ্রটির প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব হয়, তখন অনেকেই এর বিরোধিতা করেন। তাঁদের মধ্যে তিনিও একজন ছিলেন। তাঁদের বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, এ শিক্ষার ফলে আশ্রমের শিক্ষার বিকৃতি ঘটবার আশঙ্কা আছে। রবীন্দ্রনাথ আশ্রম স্থাপনা করেছিলেন এই উদ্দেশ্য নিয়ে যে, আশ্রমের শিক্ষায় ছেলেরা যেন ধরাবাঁধা নিয়মমাফিক শিক্ষা না পায়। সামরিক-শিক্ষা তো কঠিন নিয়ম-বাঁধা। কিন্তু এই ক'বছর শান্তিনিকেতনে যে-ভাবে সামরিক শিক্ষা ছাত্রগণ গ্রহণ করছে তাতে সে ধারণা তাঁর ঘুচে গেছে। এ শিক্ষার প্রয়োজন নেই একথা আর তিনি বলতে

পারেন না। আশ্রমের শিক্ষার পক্ষে এ শিক্ষা কোনোরূপ হানিকর হয়নি। বরঞ্চ ছাত্রগণের ব্যবহারে শৃঙ্খলা ও সংযম দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন। তিনি আরও বলেন যে, সামরিক-শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধু রাইফেল, স্টেনগান, ল এম জি প্রভৃতি যুদ্ধের হাতিয়ার ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া নয়। ভারতবর্ষ যুদ্ধ-বিরোধী রাষ্ট্র; তবে এ সামরিক শিক্ষার উদ্দেশ্য কী। লোকক্ষয় করাই তার উদ্দেশ্য নয়। আমাদের জীবনে প্রতিদিনই যুদ্ধ করতে হয়। সে আরো বড় যুদ্ধ—জীবনযুদ্ধ। এই জীবনযুদ্ধে জয়ী হওয়াই প্রকৃত যোদ্ধার কাজ। প্রতিদিনের জীবনে কত ঘাত-প্রতিঘাত আসে, আমরা যদি দুর্বল হই, ভীরু হই, সে আমাদের কাবু ক'রে, পঙ্গু করে ফেলবে। সামরিক শিক্ষার কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে শরীর ও মনকে দৃঢ়ভাবে গঠন করে নিতে পারলে আমরা সহজেই জীবনের দুঃখ-কষ্ট বিপদ-আপদ কাটিয়ে উঠতে পারব; বিদ্যালয়ের সাধারণ-শিক্ষায় মানসিক-শক্তির বিকাশ সাধন হয়, তেমনি সামরিক-শিক্ষায় প্রধানত শরীরের শক্তিচর্চাই হয়ে থাকে। একের অভাবে আরেকটি শিক্ষার অঙ্গহানি হয়ে রয়েছে। দুইটির সামঞ্জস্য সাধনে শিক্ষা সম্পূর্ণতা লাভ করবে। দুইটিরই বিকাশ যখন ছাত্রগণের মধ্যে দেখা যাবে তখনই বুঝতে হবে তারা প্রকৃত মানুষ হতে পেরেছে। ১০।৫।১৯৫৪

* * *

শান্তিনিকেতনের ফুটবল-খেলা এবারকার মতো শেষ হল। স্থানীয় লীগ-প্রতিযোগিতায় 'সর্বেশ কাপ' পেয়েছেন আশ্রমের কর্মী ও প্রাক্তন ছাত্রদল। বিশ্বভারতীর 'ছাত্র-একাদশ' দলের সঙ্গে সঙ্গে বহিরাগত যে কয়টি দলের খেলা হয়েছে, তাতে 'ছাত্র-একাদশ' দল হেরেছেন একটিতে এবং জিতেছেন দুইটিতে। বহিরাগত দলের মধ্যে শিবপুর বি ই কলেজ, ভাগলপুরের টি এন জে কলেজ ও মোহনবাগান ভেটারেন্স দলের নাম উল্লেখযোগ্য। দু'চারজন নবীন খেলোয়াড়ও মোহনবাগান ভেটারেন্স দলে এসেছিলেন। আশ্রম দল ১—০ গোলে তাঁদের পরাজিত করেন। গোলটি দেন বিনয়-ভবনের নিগ্রো ছাত্র টমাস্ ওকেলো। আশ্রমের বর্তমান খেলোয়াড়দের মোহনবাগান দল প্রশংসা করেন। ৪।১০।১৯৫৪

কিছুদিন আগে বিশ্বভারতীর বার্ষিক ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা হয়ে গেল। এবারে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়েছিল ১৫ই ফেব্রুয়ারি, আর শেষ হল ১৭ই ফেব্রুয়ারি। ডঃ মেঘনাদ সাহার মৃত্যুর খবর আশ্রমের সকলে জানতে পারলেন খেলার মাঠেই। খবর পেয়ে এবারকার প্রতিযোগিতা যেন একটু ঝিমিয়ে পড়ল। পতাকা অর্ধনমিত রেখে দু'মিনিট নিস্তব্ধতা পালন করা হল। যাহোক শেষ পর্যন্ত দলগত

চ্যাম্পিয়নশীপ লাভ করলেন শিক্ষাভবনের ছাত্র-ছাত্রীরা। তাঁরা মোট সাতান্ন পয়েন্ট পেয়ে শীর্ষস্থান অধিকার করেছেন। আর দ্বিতীয় হয়েছেন কর্মী ও প্রাক্তন ছাত্রের দল। তাঁরা পেয়েছেন ৪৯ পয়েন্ট। ৭।৩।১৯৫৬

* * *

সম্প্রতি শক্তিগড়ে জাতীয় সেনাবাহিনী (N. C. C.)-ক্যাম্প হয়েছিল। তাতে বেঙ্গল ফোর্থ ব্যাটেলিয়ন দলে বিশ্বভারতীর শিক্ষাভবনের গণিত-অধ্যাপক ও স্থানীয় জাতীয় সেনাবাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মী শ্রীপ্রাণকুমার ঘোষের নেতৃত্বে বিশ্ব-ভারতীর একদল ছাত্র-সেনা যোগ দিয়েছিলেন। এই ক্যাম্পে নানা স্থানের কলেজ থেকে প্রায় হাজার-খানেক ছাত্র-ছাত্রী সমবেত হন। তাঁদের মধ্যে শান্তিনিকেতনের দলটি (মোট কুড়িজন) সর্বোৎকৃষ্ট কাজ ক'রে প্রথম-স্থান অধিকার করেছেন এবং একটি ট্রফি পুরস্কার পেয়েছেন। এখানকার শিক্ষাপদ্ধতিতে গুরুদেব প্রথমাবধি সেবা-শুশ্রূষা অতিথিপরায়ণতা ও স্বাবলম্বন শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তন করে গেছেন। পুরোনো দিনের শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে নানাজনের লেখা থেকে জানা যায়, এখানকার ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে অতিথিপরায়ণতা ও স্বাবলম্বন-পদ্ধতি কতখানি কার্যকর ছিল। আজ অবধি সে ধারার লোপ হয়নি। আশ্রমের বাইরে দেশের ও জাতির সেবাকার্যে গিয়েও যে এখানকার ছাত্রগণ সে শিক্ষাপদ্ধতির মান বজায় রাখতে পেরেছেন এটি শ্লাঘার ও আনন্দের কথা। ৬।৩।১৯৫৫

রাতকে দিন করে দিয়ে, দিনরাত আসর জমিয়ে, গত দু'সপ্তাহেরও বেশি, পুরো পনরটি দিন, শ্রীনিকেতনের ও শান্তিনিকেতনের মাঝামাঝি ডাঙার পাশে আমবাগানে আলাদিনের পিদিমের খেলা দেখিয়ে গেলেন পশ্চিম-বাংলার এন সি সি। ছুটির পরে এসে যারা ঐ পথে আসবে-যাবে, তারা হঠাৎ দেখে ভাববে—এ কী হল, সাপের-আড্ডা কাঁটা-বনের ভূতুড়ে-আঁধির রাজ্যটা উবে গেল কোথায়। এ যে ধব্‌ধবে সান্‌বাঁধানো চত্বর;—চাঁচাছোলা সাদামাটির বিস্তীর্ণ অঞ্চলটা অমনি এখন চোখ ধাঁধাচ্ছে। বাংলার ঘরে-ঘরে আলস্যজড়তার আবর্জনা দূর করে দিয়ে নবজীবনের কর্মোদ্দীপনায় এমনি যদি জৌলুষ ধরাতে পারে,—এন সি সি-র প্রবর্তনা তবেই হবে সার্থক। বাইরের চেহারায় এন সি সি-র বার্ষিক এই সমাজ-সেবা-শিবির তার যেটুকু আভাস ফুটিয়েছে, তা আশাপ্রদ।

সারি-সারি তাঁবু পড়েছে,—প্রায় দেড়শ। হয়তো আরো বেশি। "কাঁপাইয়া আম্রবন"—কথাটা স্বতঃই মনে আসে।—কিন্তু ইতিহাস বদলে গেছে, যুদ্ধের পক্ষাপক্ষ এবং ক্ষেত্র ও রণপ্রক্রিয়াও গেছে পাল্টে। যেখানে ছিল বিপক্ষ কেবল বাইরে,

আজ সেখানে ঘরের ভিতরে সমাজের আত্ম-শিথিলতার মধ্যেও তাকে সন্ধান করে জয় করবার তাড়া লেগেছে। সংগ্রামের সঙ্গে আছে সেবা। কামান-বন্দুকও আছে শিবিরে; হাতে-হাতে চলছে এখন মরুভূ খুঁড়ে পুকুর-কাটার খনিত্র। পঙ্কিলতা ও বারিহীনতার আক্রমণ থেকে সংস্কার দ্বারা রক্ষা করতে এন সি সি-রা বেছে নিয়েছে এখানে শান্তিনিকেতনের শ্রীপল্লীস্থিত সুইমিং-পুল ও লালবাঁধ এবং সুরুলের কালি-সায়রের পাশের নূতন বাঁধ।—এই দুটি ক্ষেত্র। পলি-আস্তরণ সরিয়ে পাথরের-মতো মাটি কেটে যাচ্ছে একদল আর বস্তার দোলায় করে হাতে-হাতে সে মাটি তুলে নিয়ে টেলেটুলে পাড় বাঁধানো চলছে সহস্রাধিক হাতে। সে সঙ্গে আবর্জনা দূরীকরণের কাজেও লেগেছে একদল শান্তিনিকেতনের 'দ্বারিক'-এর পোড়োবাড়িতে। দেখতে-দেখতে ক'দিনে ইঁট-পাটকেল সরে গিয়ে সাফা হয়ে গেল সে-অঞ্চল। দ্বিমুখী-অভিযানের অন্য দিকটি হচ্ছে স্বাস্থ্যসংস্কার নিয়ে। গ্রামাঞ্চলে সুরুল ও কেনডাঙায় দুটি কেন্দ্র খোলা হয়েছে। কলকাতার মেডিক্যাল কলেজ, আর জি কর কলেজ ও স্যার নীলরতন সরকার কলেজের ছাত্র ও চিকিৎসকগণ ভার নিয়েছেন এ কাজের। বিশেষ ক'রে মেয়ে এন সি সি-রা ব্যাপৃত রয়েছেন ঘরে-ঘরে গিয়ে স্বাস্থ্যের মূল সূত্রগুলি বুঝিয়ে দেওয়ার কাজে; শিশুপরিচর্যা, শিক্ষা, সেলাই ধোঁয়াবিহীন চুলা তৈরি করে দেখানো ও রোগের তত্ত্বতালাসের দ্বারা চিকিৎসা-বিভাগকে আবশ্যকীয় খবরাখবর সরবরাহ করা ইত্যাদি কাজেও তাঁরা সাহায্য করছেন। অনেক সুফল হচ্ছে এতে, তা বলাই বাহুল্য। মেয়েদের শিবির হচ্ছে শান্তিনিকেতনের 'শ্রীসদনে'।

*　　*　　*　　*

বিভিন্ন কলেজ থেকে প্রায় দু'-হাজারের মতো এন সি সি এসেছেন এবারের ক্যাম্পে। তার মধ্যে ছেলের সংখ্যা হচ্ছে ১৭২৭, মেয়ের সংখ্যা ১৬১। চারটি শাখায় বিভক্ত পশ্চিম-বাংলার সমগ্র এন সি সি-র সংখ্যার এ-হল বাছাই-করা এক-তৃতীয়াংশ। বছরে একবার ক'রে সমাজ-সেবা-শিক্ষণ-কেন্দ্রে এই হারেই এঁদের সমাবেশ হয়ে থাকে। এঁদের সঙ্গে এবার এসেছেন ৪৯ জন অফিসার, তার মধ্যে সাতজন মেয়ে; এবং ২২ জন আছেন খাস-সরকারী সেনাবিভাগীয় কর্মী, বাকিরা হচ্ছেন কলেজের অধ্যাপক। এ ছাড়া এসেছেন আর-একদল ছাত্র, সংখ্যায় তাঁরা ৭২, আর, অধ্যাপক এসেছেন ৪ জন,—যাঁরা এন সি সি-তে নাম লেখাননি, কিন্তু এই বার্ষিক সমাজ-সেবা-শিবিরের জীবনধারার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে মূল্যবান অভিজ্ঞতার অংশ লাভ করতে চান। সাময়িকভাবে এঁরা যোগ দিলেও এদের এই আগ্রহই

যে হচ্ছে এন সি সি-র প্রভাব-পরিমাপের স্বাভাবিক মাপকাঠি তা বললে মিথ্যা হবে না।

*　　*　　*

জনসংযোগ ও সেবা, সংঘ-পরিচালনা, কষ্টসহিষ্ণুতা, সর্বমুখী আগ্রহ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, নিয়মানুবর্তিতা ও সংযত সুনিয়ন্ত্রিত জীবনে অভ্যস্ত করাই এই বার্ষিক শিবির-অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য। 'দারুণ অগ্নিবাণ'-নয়, 'কামান'-এর গোলা পড়ছে চারিদিকে, 'ভয় নাহি' বললেও ভয় নামে না মন থেকে,—এমনি খা-খা করা লেলিহানশিখাময় রৌদ্রভরা দুপুরের মাঠের সর্বগ্রাসী চেহারা,- তারই মধ্যে উড়ে এসে জুড়ে বসল এরা চড়ুইভাতির স্ফূর্তি নিয়ে। গোটা একটা শহর গড়ে উঠল, অফিস, রসদ, হাসপাতাল, বিরাম ও বাসব্যবস্থা নিয়ে। টেলিফোন, ট্রাক, মোটরগাড়ি পথঘাট পাহারা,—কর্মব্যস্ততায় পূর্ণ সব অলিগলি,—কিন্তু মুখর নয় জনকোলাহলে। ছবির মতো মুগ্ধ করে পরিপাটী আনাচ-কানাচ। তাঁবুগুলি ফাঁকা পড়ে থাকে সকালবেলা। সারিবদ্ধ ছোট্ট বেদির মতো, শিয়রে গুছানো ব্যাগ ও কম্বলের পুঁটুলিগুলি ছাড়া তাঁবুতে আর কিছুই নেই কে বলবে যে এখানে টগ্‌বগে রক্তভরা দামাল দু'হাজার তরুণের মেলা চলছে দুবেলা মাটি কাঁপিয়ে। অফিসরদের দেখেও বোঝবার উপায় নেই—যে, রণক্ষেত্রে এঁরাই সাজেন যমের দোসর। এঁদের অমায়িকতা ও সৌজন্যপূর্ণ সমাদর ভুলিয়ে দেয় শিবিরের শুষ্কতা, মনে আনে প্রতিবেশী কোনো ভদ্রলোকের বাড়ির শিষ্টতা। কিন্তু তারি মধ্যে চলছে প্রত্যেকটি কাজে এবং কথায় নম্র নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে তীক্ষ্ণ শৃঙ্খলা রক্ষা। ছোটো থেকে বড়ো—সকলেরই মধ্যে একটি চারিত্রলক্ষণ সুস্পষ্ট—'সদা-প্রস্তুত'-ভাব। যত্ন এবং এই সদাপ্রস্তুতি-র শিক্ষায় অভ্যস্ত হওয়া যে লেখাপড়ার ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে অপরিহার্য, সরকারী শিক্ষা-বিভাগও সেদিকে সচেতন হয়েছেন —এটি সুলক্ষণ বলতে হবে। বিশ্বভারতী য়ুনিভার্সিটি এই ক্যাম্পের জন্যই এবার পাঁচ হাজার টাকার আর্থিক সাহায্য দান করছেন, বিশ্বভারতী আরো জুগিয়েছেন আবাস এবং নানা দ্রব্যসম্ভার, খোঁজখবর দেয়া-নেয়ার মধ্য দিয়ে প্রাণপূর্ণ সহযোগিতা। বিগ্রেডিয়ার দেওয়ান প্রেমচাঁদ এসে একদিন দেখে গেছেন, পশ্চিম-বাংলার শিক্ষাসচিব ডঃ সেন, এবং বিশ্বভারতীয় উপাচার্য ডঃ বসুও মাঝে মাঝে এসে দেখেছেন ঘুরেফিরে এঁদের কাজ ও শিবির-জীবনযাত্রা।

*　　*　　*

এন সি সি-র কর্তৃপক্ষ থেকে সাদর আহ্বান এসেছিল স্থানীয় প্রেস-

রিপোর্টারদেরও। ভারপ্রাপ্ত নায়ক সহৃদয় লেঃ কমেণ্ডার এস সি মজুমদার একদিন সকালে চা-পর্বে নিমন্ত্রিত করে নিয়ে নিজে তাঁদের সঙ্গে থেকে সব দিক দেখান ও নানা বিবরণ জানান। বিশ্বভারতীর এন সি সি অধিনায়ক লেপ্টেনাণ্ট অধ্যাপক প্রাণকুমার ঘোষ এঁদের দলের মধ্যে থাকায় উভয়পক্ষেই বিশেষ সুবিধে হয়েছিল। কেন্দ্রগুলি দেখতে গিয়ে যুবক ছাত্রদের কর্মোদ্যম ও স্ফূর্তি তো লক্ষ্য করা গেছেই, কিন্তু তার মধ্যে ষাট্-পেরোনো আশুতোষ-কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপাল অধ্যাপক ব্যানার্জি প্রভৃতির মতো প্রবীণদেরও যখন বেলা ন'টায় গন্‌গনে আগুনে-রোদের মধ্যে মাটি-কাটার কার্যে হাসিমুখে রুটিতরকারির জলযোগ-মহোৎসবে মাততে দেখা গেল, তখন কিঞ্চিৎ ঈর্ষার সঙ্গে লোভ হচ্ছিল ঐ অভ্যস্ত-প্রাণোচ্ছলতার জন্য। সুরুলে গিয়ে গ্রামের মধ্যে দেখা গেল মেডিক্যাল য়ুনিটের সেবাকার্য। দলের কর্মীসংখ্যা ৫০, ৩ জন ডাক্তার, উৎসাহউজ্জ্বল ক্যাপটেন রায় হচ্ছেন অধিনায়ক। সাধারণ রোগ-চিকিৎসার সঙ্গে বিশেষভাবে রয়েছে দন্ত-চিকিৎসার ব্যবস্থা। একদল ঘুরে ঘুরে পাড়ার অলিগলি থেকে খুঁজে নিয়ে আসেন রোগ ও রোগীর খবর; পেটের অসুখই বেশি, ম্যালেরিয়া প্রায় নেই, আছে ফাইলেরিয়া, যক্ষ্মার রোগীও দু'একটি মিলছে। জলের দোষেই যত পেটের অসুখের সৃষ্টি। দাঁত-মাজার অভ্যাস কম, পায়োরিয়ার ভিত্ পাকা হয়ে আছে সেই স্বাস্থ্যের অবিধির থেকেই;—সর্বক্ষেত্রে সঙ্গে আছে পুষ্টিকর যথোপযুক্ত খাদ্যাভাব, জীবনীশক্তির মূল শুকিয়ে যাচ্ছে, তারপরে তো রোগে-ধরা সহজ কথা। ফোঁড়াফুড়ি বা ঔষধপত্র ব্যবহার—এক-কথায় চিকিৎসার ডাকে সাড়া দিতে বিমুখতা নেই,—এই একটি সু-অভ্যাস নাকি লোকের মধ্যে দেখা যাচ্ছে,—বহুদিন থেকে প্রতিবেশে বিশ্বভারতী স্বাস্থ্যসমবায়-সমিতির যে-কাজ চালু তারই প্রভাবের কথা স্বভাবতই এস্থলে স্মরণে আসে। প্রায় আড়াই হাজার রোগীর চিকিৎসা চলেছে এন সি সি-র তত্ত্বাবধানে। দাঁত দেখিয়ে নিয়েছে ৫।৬শ লোকে। সবই সাময়িক। কিন্তু এই সূত্রেই লোকের সঙ্গে এন সি সি-র ঘনিষ্ঠতার সুযোগ হয়েছে সবচেয়ে বেশি। যারা দেশকে সেবা করবে, দেশের ভিতরকার বাধা ও আবর্জনা দূর করে দেশকে মুক্ত করবে,—তাদের জানা চাই প্রকৃত দেশ কী জিনিস, দেশবাসী কারা, কী কী তাদের পরিচয়, কী অবস্থায় তারা থাকে, কোন্ দুরূহ সমস্যার প্রতিবন্ধকের সঙ্গে সেবাব্রতী সৈনিকদের যুঝতে হবে। সে-কাজে কতখানি পরিশ্রম, কষ্ট-সহিষ্ণুতা, ধৈর্য, প্রীতি ও বুদ্ধিবিবেচনা দরকার হবে,—শিবিরের জীবন ও পারিপার্শ্বিক লোকসমাজ থেকে তারই সঞ্চয় চলেছে প্রতিদিন। এঁরা গ্রামের

লোকদের শেখাতে বা সেবা করতে যাচ্ছেন ভালো কথাই,—তাদের অভাব-অভিযোগ, দোষ-ত্রুটি, অজ্ঞতা-অপরিচ্ছন্নতা, অনেক-কিছুই চোখে পড়ছে, সে-সব সম্বন্ধে দেওয়া, শুধরে দেওয়া বা নূতন অভ্যাস প্রবর্তনের প্রয়াসও এঁদের প্রশংসনীয়ই বলতে হবে,—সে সঙ্গে আর-একটি দিকের ব্যবস্থা করলে আরো ভালো হত কিনা কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করে দেখতে পারেন। এটা কেবল কুচকাওয়াজের ফৌজী ক্যাম্প নয়,—এর প্রধান বিষয় হচ্ছে সমাজসেবা এবং সে ক্যাম্প পড়েছে এবার রবীন্দ্রনাথের আওতার মধ্যে;—এই দুটি কথা মনে রেখেই নূতন প্রস্তাবের কথাটা ভাবতে হবে। রবীন্দ্রনাথ দেশের দারিদ্র্য, রোগ, অশিক্ষা এবং কুসংস্কার দূর করবার কথা যেমন বলেছেন, তেমনি গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন দেশের সংস্কৃতির আলো জ্বালাবার কথা। আজ জাতীয় ভারত-সরকারও সৌভ্রাত্র ও সংস্কৃতির প্রসারকেই স্থাপন করেছেন দেশজয়ের গোলাগুলির পরিবর্ত-রূপে। তারই প্রভাব নির্গলিত হয়ে এসেছে মারমুখী বনেদী ফৌজীবাহিনী থেকে এই সেবামুখী নবপ্রবর্তিত এন সি সি-তে। সুতরাং লোকের চালচুলার খবরদারির সঙ্গে সামাজিক মেলামেশা ও নানা সংস্কার ও আমোদ-আহ্লাদের বর্তমান অবস্থার খবরও কিছু রাখা যেতে পারে। বরং না-রাখাটাই আদর্শের প্রতিকূল হয়ে পড়ে কিনা—তাও দেখতে হবে। এজন্য যে-অঞ্চলে ক্যাম্প বসানো হবে, সে-অঞ্চলের লোকসমাজের রীতিনীতি ও উৎসবআনন্দ ধারার উপায়গুলির সন্ধান জেনে নিয়ে গ্রামের মধ্যে গিয়ে যেমন লোক-উৎসবে এন সি সি-র যোগ দিতে হবে, তেমনি ক্যাম্পের মধ্যেও সাধারণ লোকেদের সাদর আমন্ত্রণে ডেকে নিয়ে এসে এন সি সি-র জীবনযাত্রার রীতিনীতি ও উৎসবের সঙ্গে তাদের পরিচিত করতে হবে বিচিত্র-আনন্দানুষ্ঠানে। যত্ন, শৃঙ্খলা ও সদা-তৎপরতার অভ্যাসের দ্বারা যে কী সুন্দর ও সহজভাবে জীবনযাত্রা চালানো সম্ভব, কেবল এই সুদৃশ্য শিবির-ছবির প্রত্যক্ষ-জ্ঞানই জনসাধারণকে অনেকখানি সে-বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করতে পারে, এতে সন্দেহ নেই। মানুষের কাছে এসে, কেবল উপদেশ বা নিয়ম-মাফিক কাজ দেখিয়েই হঠাৎ একদিন দূরে সরে যাওয়া, কাজের এই ধরনটার মধ্যে একটা অসামাজিকতার রূঢ়তা আছে,—জঙ্গী-জীবনকে সেই রূঢ়তার ছায়াতেই সমাজের চোখে একরূপ আপঙ্‌ক্তেয় করে রাখে; রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, লোক-কল্যাণে কেবল সুশাসন যথেষ্ট নয়, সঙ্গে সহৃদয়তার যোগ চাই। লোকের মধ্যে সেবা করতে গেলে, সেই হৃদয়ের স্পর্শ যাতে উভয়গত হয়, সেদিকেই বেশী দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। না হলে, যতই পুকুর-খোঁড়া, আর রোগ-সারানো আর ধোঁয়াশূন্য চুলার অভ্যাস-ধরানোর চেষ্টা হোক,

সাধারণ-লোকেরাও নীরবে দেখেশুনে নিয়ে শেষটা পঙ্গপালের ছাউনি ব'লে শিবিরগুলিকে যদি মনে-মনে বিদায় দিয়ে বাঁচে, তাও কিছু বিচিত্র নয়। সুখের বিষয়, দলনেতা স্বয়ং শ্রীযুক্ত এস সি মজুমদার মশায় এ প্রস্তাবটির উপযোগিতা অনুমোদন করেছেন। কিভাবে এই সাংস্কৃতিক ও সামাজিক যোগাযোগ আরো প্রকৃষ্টভাবে করা যায়, সে বিষয়ে তিনি ভবিষ্যতে আরো যত্নবান হবেন, আশা করা যায়। এবারে সময়ের ও নানা আয়োজনের অভাবে বিশেষ-কিছু করা সম্ভব না হলেও, শেষ পর্যন্ত একদিন সন্ধ্যায় ক্যাম্প-ফায়ার-উৎসবে এন সি সি-র শিবিরে শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের এবং তৎসহ আশেপাশের বিশেষ-বিশেষ আরো জনকয়েকসহ দেড়শ লোককে আমন্ত্রণ করে সমবেতভাবে একটু আনন্দ করার আয়োজন হয়েছে ব'লে তিনি জানান। প্রেস-রিপোর্টারের ভূমিকায় প্রত্যক্ষ দর্শনের সুযোগে আরো যে-কজন অফিসর এ ছাত্রকর্মীর ক্ষণিক সাহচর্যের সৌভাগ্য মিলেছে, তার থেকে এতটাই যদি আমাদের আশা ও আনন্দের উদ্রেক হয়ে থাকে, তবে এই রকমই কিছু দেখাশুনার সুযোগ জনসাধারণে পেলে, দেশের সরকার, শিক্ষাবিভাগ, ভাবী ছাত্রসমাজ এবং জাতীয় সেনাবাহিনীর আদর্শ সম্বন্ধে তাঁরাও হয়তো এইরূপ আশান্বিত ও শ্রদ্ধাবান হবেন। এন সি সি-র দলবৃদ্ধির পক্ষে সাধারণের মনোগত-সহযোগ খুবই ফলপ্রসূ হবে, বলা যায়। বেরুবার পথে এন সি সি-র রসদবিভাগের থেকে শেষ-বিদায় সম্বর্ধনা জানালেন ক্যাপটেন আয়েঙ্গার নামক যে-অফিসরটি তিনি তাঁর সহজাত স্নিগ্ধ, দীপ্ত ও আন্তরিক ভাষণে যেমন আপন বাহিনীর করিৎকর্মিতার পরিচয় দিচ্ছিলেন, তেমনি ছুঁয়ে দিচ্ছিলেন দর্শকমনে এন সি সি-র ধারণা-চিত্রে তাঁর প্রীতির তুলিকার রেখাটি। —এর পরে 'জঙ্গী' কথাটা দিয়ে এঁদের পরিচয় দেওয়া অসংগতই হয় বৈকি। দিন বদলেছে, লোকের স্বভাবের সঙ্গে ভাষারও সংগতি দিয়ে বলতে হয়,—'জঙ্গী' নয় নূতন 'সঙ্গী'—দলকে দেখে আসা গেল জাতীয়-উদ্যোগ অঙ্গনে। রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগ-ভূমির অদূরে এদের চলাফেরা দেখে তাঁরই প্রবর্তিত 'ব্রতীদল'-আন্দোলনের কথা মনে পড়ছিল। আর পুকুর-কাটার ব্রতী এন সি সি-দের উচ্ছ্বসিত গানের সুরের পাশাপাশি নেপথ্য থেকে কানে ভেসে চলেছিল আরো একটা সুর—

যিনি সকল কাজের কাজী
মোরা তাঁরি কাজের সঙ্গী।
যাঁর নানা রঙের রঙ্গ,
মোরা তাঁরি রসের রঙ্গী॥

ওরে ডাকেন তিনি যবে

তাঁর জলদ-মন্দ্র রবে

ছুটি পথের কাঁটা পায়ে দ'লে

সাগর-গিরি লঙ্ঘি' ॥

*　　　　*　　　　*

এখানে ক্যাম্পে এই 'সঙ্গী' দলের দিনযাত্রা শুরু হয় ভোর ৪টায়। ঘুম থেকে উঠেই বিছানাপত্র পাট করে রেখে হাত-মুখ ধুয়ে, য়ুনিফর্ম পরে ৫টায় লাইনে এসে দাঁড়াতে হয়। ৫টা থেকে ৯-৩০টা অবধি চলে বাইরের কাজ, মাঝখানে আধঘণ্টা বিরামের অবকাশে হয় জলযোগ সারা, ১২-৩০টার মধ্যে স্নান, ২-৩০টার মধ্যে খাওয়া, ৩-৩০টা অবধি বিশ্রাম, বিকালে ৪টা থেকে ৫-৩০টা প্যারেড, পরে ৫-৩০টা থেকে ৬-৩০টা অবধি চলে বেড়ানো; সন্ধ্যা ৬-৩০টায় নাম ডাকা হয়; ৭টায় খাওয়া সেরে ক্যাম্প-ফায়ার বা গল্প-গুজবে কাটিয়ে ৯-৩০টায় ঘুমোতে যেতে হয়। খাওয়া-দাওয়া সাধারণ রকম,—ভাত, ডাল, রুটি, তরকারী, মাংস (পরিবর্তে মাছ), চাটনি; নিরামিষদের জন্য মিষ্টি বরাদ্দ। অসুখ-বিসুখ প্রায় নেই, সর্দিগর্মির সামান্য ত্'চারটা ঘটনা দেখা গেছে; পেটের অসুখও একটু-আধটু আছে এই মাত্র। এন সি সি-র সংগঠন হয় প্রথম প্লেটুন থেকে। কয়েকটি প্লেটুন্ নিয়ে একটি কোম্পানি, কয়েকটি কোম্পানি নিয়ে ব্যাটেলিয়ন, কয়েকটি ব্যাটেলিয়ন নিয়ে এমনি 'গ্রুপ' গঠিত হয়ে থাকে। এবার আমবাগানে এরকম ৬টি গ্রুপের সমাবেশ হয়েছে! প্রত্যেক গ্রুপের ৩০০ লোকের জন্য একটি রসুইখানার ব্যবস্থা আছে। একটি ক্যান্টিন ও তৎসংলগ্ন ক্লাব আছে অবসরে খুশিমতো আরাম, খানাপিনা ও পড়াশুনার জন্য। ক্যান্টিনটি ছাত্রেরাই চালিয়ে থাকে। অফিসারদের মেলামেশার জন্য আছে স্বতন্ত্র তাঁবু।

*　　　　*　　　　*

কলকাতার কলেজগুলির মধ্যে সেণ্টজেভিয়ার্স, সুরেন্দ্রনাথ, বঙ্গবাসী, আশুতোষ, সেণ্ট্রাল-ক্যালকাটা ও য়ুনিভার্সিটি থেকে যাঁরা এসেছেন তাঁরা ফার্স্ট এবং সেকেণ্ড ব্যাটেলিয়ান দলের অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া মফঃস্বলের অনেক কলেজ থেকেও আরো অনেক ছাত্র ও অধ্যাপক এসেছেন। সুদূর জলপাইগুড়ি, বাঁকুড়া, সিউড়ি, বর্ধমান প্রভৃতি প্রায় সর্ব-অঞ্চলের ছাত্রই এতে দেখতে পাওয়া যায়। মেয়েরাও পেছিয়ে নেই। সকালবেলা শ্রীসদন থেকে যখন তাঁরা 'ফল-ইন' ক'রে প্যারেড ক'রে দলে দলে

এগোতে থাকেন তখন তা দেখবার আগ্রহে আশ্রমের ছেলে-মেয়ে এবং প্রবীণাদের মধ্যেও তাড়া পড়ে যায়। পঁচিশে-বৈশাখের ঘরোয়া-উৎসবে এবার শান্তিনিকেতনের গৌরপ্রাঙ্গণ ভরে গিয়েছিল এই এন সি সি-র বিরাট জনতায়। কাজের ফাঁকে-ফাঁকে এবং নিয়মিত প্রোগ্রাম ক'রেও দলে-দলে এই ছাত্র-ছাত্রী ও কর্মীরা শান্তিনিকেতন দেখে বেড়িয়েছেন, বিশ্বভারতীর কর্মীরাও সেই পরিক্রমা ও পরিদর্শনে এঁদের সাহায্য করেছেন সঙ্গে থেকে। প্রতিদিনে রসদ খরচ লেগেছে এঁদের জন্য সাড়ে তিন হাজার টাকা—এই থেকে দলের বহরটা অনুমেয়। বাংলা ছাড়া ভারতের অন্য প্রদেশবাসী কিছু সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী, কর্মী অফিসর এদলের সঙ্গে রয়েছেন নিজ নিজ কলেজের বা কেন্দ্রের সংস্রবযোগে। বিভিন্ন অঞ্চলের এতগুলি ছাত্র-ছাত্রীর পরস্পরের মধ্যে একযোগে কাজ করা ও খাওয়া থাকার যৌথ কর্মধারা থেকে একটি অখণ্ড জাতীয়-জীবনবোধ ও সহযোগিতার অভ্যাস জীবনে-জীবনে যে ছড়িয়ে যাচ্ছে,—এই থেকে উৎসারিত সুনিয়ন্ত্রিত ঐক্যশক্তিই দেশের নবসৃষ্টির পরম উপাদান হয়ে নূতন এক পরমাণু-শক্তির কাজ করবে না কি? ২১।৫।১৯৫৭

সভা-সমিতি

বিশ্বশান্তিবাদী-সম্মেলন

বিশ্বশান্তিবাদী-সম্মেলন-অনুষ্ঠানে কোয়েকার সোসাইটি ছিলেন আদি থেকে প্রধান উদ্যোগী; বিশিষ্ট কোয়েকার মিঃ হোরেস আলেকজাণ্ডার ছিলেন এর সভাপতি। নানা জাতির সমাবেশ এর প্রধান ঘটনা ও শান্তিপথের আলোচনা এর প্রধান বিষয়।

মহাত্মাজীর প্রভাব বা মত-সাদৃশ্য বিশ্বের কোথায় কিভাবে কার্যকর হয়ে চলেছে, একটি জায়গায় তার মিলিত রূপ প্রত্যক্ষ করবার পক্ষে এই সম্মেলন সুযোগ দান করেছে।

এর গুরুত্ব বাইরের লোকের কাছে থাক না থাক, এর ফল অন্যে বুঝুক না বুঝুক, সম্মেলনের সমবেত সভ্যদের মধ্যে ব্যাপারটার সম্বন্ধে কিছুমাত্র শিথিলতা লক্ষ্য করা যায় নি। শ্রদ্ধা বা আগ্রহের তো অভাব ছিলই না, বরং তাঁদের সুশৃঙ্খল ব্যস্ততা থেকে অনুষ্ঠানে তাঁদের সকলেরই আশাবাদ উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

গুরুতর কর্মভার অথচ সাদাসিধে আয়োজনই ছিল সম্মেলনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পরিবেশ, বেশভূষা ও আসবাবপত্র থেকে খাওয়াদাওয়ার 'মেনু'—ঝোল,

রুটি, ফলমূল—অবধি কোনো-কিছুতেই কোনোরূপ আড়ম্বর ছিল না। কথাবার্তায়, চালচলনে বৈদেশিকগণ খুবই হাসিখুশী, মিশুক-প্রকৃতি এবং উৎসাহপূর্ণ ছিলেন; সেদিক দিয়ে দেশীয় সভ্যদের তাঁরা হারিয়ে দিয়েছেন। দিনরাত ছেলেমেয়েরা অটোগ্রাফ নিতে ছেঁকে ধরত, সে দাবীর উপদ্রব সভ্যগণ সকলেই অক্লান্ত-হস্তে মেটাতেন পরম স্নেহে।

শান্ত ক্যাম্প-প্রাঙ্গণ। প্রতি-তাঁবুতে দু'তিনখানা দড়ির খাটুলি, খাওয়ার তাঁবুতে সারিবদ্ধ টেবিলের উপর মাটির ভাঁড়ে এক-একটি ফুলের তোড়া, দু'বেলা বৈঠক—বড়ো বৈঠকের প্রাক্কালে সকালে-বিকালে বিরল অবসরটুকুর মধ্যে এখানে-সেখানে ছোটো-ছোটো মণ্ডলী। গুঞ্জনালাপরত দেশ-বিদেশের বিচিত্র মানুষ। নৈশভোজনের পর যুবকবৃদ্ধ সকলের গলা ছেড়ে স্বর মিলিয়ে সমবেত গান। নিজ-নিজ দেশের কাব্য বা নাটক আবৃত্তি, রঙ্গাভিনয়ও। অতি-প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ, ওদিকে রাত এগারোটায় কাজ মিটিয়ে শোয়া। ভয়ভাবনা নেই, আড়ষ্টতা নেই, স্বাচ্ছন্দ্য-ভরা জীবনের সহজ গতি।

অথচ, এঁদেরই এক-একজনের জীবন কেটেছে অন্তরীণের অন্ধকূপে। অনেকে এঁরা ফাঁসির আসামী; যে দহন বয়ে গেছে এঁদের উপর দিয়ে প্রকারে ও পরিমাণে তা ভয়াবহ। বিশ্ব যাদের পদপাতে প্রকম্পিত, এমন-সব প্রলয়ংকর হিংস্র রাষ্ট্রশক্তি; তার বিরুদ্ধে একক এঁরা এক-একজন স্ব-স্ব দেশে বেঁকে দাঁড়িয়েছেন যুদ্ধের প্রতিবাদে।

কী-জাতীয় নিষ্ঠুরতার বরমাল্য এ পথের পুরস্কার, কত বাধা-বিপত্তি, দুঃখ-দুর্দশার সঙ্গে বোঝাপড়া,—সম্মেলনের দৈনিক বিজ্ঞপ্তি-পত্রের থেকেও তার আঁচ মেলে।

চরণযুগলে জুতা নেই ব'লে যারা ক্ষুণ্ণ, পায়ের বালাই-শূন্যদের পঙ্গুতা দেখে তাদের ক্ষোভ উপশম হবার কথা। সেই কঠোর বাস্তব পারস্পরিক অভিজ্ঞতা-বিনিময়ের সুযোগসৃষ্টির জন্যই না-কি ছিল সম্মেলনে রুদ্ধদ্বারকক্ষ-বৈঠকের এত কঠিন কড়াক্কড়ি। সব কথা প্রকাশ্যে বললে ঘাটে-ঘাটে নানারূপ বে-সামাল প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে, এই আশঙ্কাতেই বোধকরি উদ্যোক্তারা খোলা-অধিবেশনে বিরত থেকেছেন,—এজন্য নিজেদের প্রতি জনমতের প্রতিকূলতা-বরণেও পশ্চাৎপদ হন নি। অথচ, শান্তিবাদীদের নিজেদের পথের পরিচয় জানার পক্ষে এসব আলোচনা ছিল অপরিহার্য।

আর-একটি কারণেও বিনীত নিবেদন ছিল,—সেটি সভ্যদের দিক থেকে। সমস্যাকে এঁরা খেলো ক'রে দেখেন নি কোনোদিকেই। বলেছেন—"কী জানাব?

সমাধানের পথ সম্বন্ধে নিজেদেরই ধারণা তেমন তো পরিষ্কার নয়! কিছু ঠিক না ক'রে উঠতে, বাইরের লোককে ডাকার সার্থকতা কী আছে!"

কিন্তু একদিককার ফাঁসির মেয়াদ পেরিয়েই কি ভোগের শেষ হয়েছে? নিজেদের মধ্যে ঘরোয়াভাবে মিলতে এসেও বিশ্বসুদ্ধ লোকের কাছে জবাবদিহির অন্ত নেই। লোকে বলছে, হাতি-ঘোড়া গেল তল, অশান্তিপাথারের জল মাপ্‌তে এগোল এরা কারা? মাঝের থেকে পরের খরচায় দিব্যি একটা পিক্‌নিক্ জমিয়ে গেল, কাগজের পেট ভরল ক'দিনের মতো—এই তো! উপহাস ও অবিশ্বাসে-মাখা এই ব্যঙ্গ এঁদের বৈদেহিক ফাঁসিতে ঝুলিয়েই রেখেছে। যুদ্ধ বন্ধ না হলে বুঝিবা সে ফাঁসির শেষ নেই!

তবে কি না, মুখে এঁদেরও ছিল প্রথম-প্রথম যুদ্ধ বুলি।—"কিন্তু যুদ্ধের ভাবনা কেন? যুদ্ধ ঘটে, ঘটুক না! আমাদের কাজ আমরা করে যাব! শান্তিবাদ জিনিসটার মুখ্য লক্ষ্য হচ্ছে প্রেম ও সেবা। সৃষ্টিমুখী কাজ করে যেতে হবে। তার ফলেই ক্রমে এমন সমাজ গড়ে উঠবে, যে-সমাজের লোকদের মধ্যে হিংসা বা যুদ্ধ দরকারই হবে না।" সেবাগ্রাম কাজের জায়গা। কিন্তু চরকার কথার আগে গোড়াতেই ঐ কথাটা তুলেছেন বিনোবাজী। শান্তিনিকেতন-থেকেও কথাটা একটু উঠেছিল,—নেতিবাচক নিষ্ক্রিয়-প্রতিরোধের স্থলে ইতিবাচক সৃষ্টিকাজের দিকটায় দৃষ্টি দেবার কথা।

আর-একটা প্রস্তাব তুলেছিলেন ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ।—প্রতিবেশীর সঙ্গে হিংসা মেটানো চাই,—তা না মিটিয়ে বিশ্বশান্তির কথা বলা মিথ্যে। মহাত্মাজী ঘরকে পর ক'রে দিয়ে পরকে আপন করার দিকে ঝোঁকেন নি, ঘরকে আপন রেখেই পরকেও আপন করতে চেয়েছেন। এই বিশিষ্ট সাধনাতেই তাঁর শেষাবধি আত্ম-বিসর্জন। ঘরের এক-কোণার নোয়াখালি ছিল তাঁর বিশ্বতীর্থসার। বিশ্বে সাড়া জাগিয়েছে তাঁর ঘরের ক্ষুদ্রকেন্দ্রনিবদ্ধ সৌভ্রাত্রের সাধনা।

অন্যদিকে আবার রাষ্ট্র-সাধনার ক্ষেত্রে দেখি, ভারতবর্ষের মতো এত বড়ো একটা দেশকে তিনি সংঘবদ্ধ করেছেন, বিরুদ্ধ শক্তির সংঘর্ষমুখে পাইকিরী হত্যার প্রলয়লীলা বাঁচিয়ে এনেছেন শান্তিময় লক্ষ্যের দিকে;—আনলেন কেমন ক'রে? মহাত্মাজীর এই জাদুকরী প্রক্রিয়ার বাস্তব রহস্যটাই ছিল সভ্যগণের প্রধান জিজ্ঞাসার বিষয়! মহাত্মাজী বর্তমান নেই,—না থাকলেও তাঁর সত্তার ছায়া পরিবেশের মধ্যে ফুটে উঠেছিল এঁদের শ্রদ্ধাপ্লুত চিত্তের স্নিগ্ধতায় ও সংযতবাক আচরণে।

মহাত্মাজী চেয়েছিলেন,—শুধু ব্যষ্টিজীবনে নয়, সমষ্টির সংঘবদ্ধ জীবনেও সত্য

এবং অহিংসার সার্থক প্রয়োগ। এঁরা যে-যাঁর দেশে ব্যক্তিগতভাবে সেই সাধনায় ব্রতী। দূরে দূরে আছেন কায়িকভাবে বিচ্ছিন্ন। এখন থেকে আত্মিকজগতে এঁরা নিজেদের একটি বড়ো সংঘসত্তা অনুভব করতে পারবেন; চিন্তার আদান-প্রদানও অতঃপর সে অনুভবকে দৃঢ় করবে, নিজ-নিজ এলাকায় সংঘ গড়ে তুলতে প্রেরণা ও প্রক্রিয়া জোগাবে। কিন্তু কোনো বিশ্বসংস্থা তেমন করে গড়া হয়নি।

মহাত্মাজীর সর্বোদয়-সমাজের গঠনধারার সাদৃশ এতে মিলবে। সর্বোদয়েতেও নিয়মতন্ত্রের বাঁধাবাঁধি নেই। বাইরে সব ছাড়া-ছাড়া, পরনির্ভর-নিরপেক্ষ স্বতঃস্ফূর্তি। কিন্তু মূলগত আত্মবোধে সকলে একটি অদৃশ্য অখণ্ড ইউনিটে দানাবাঁধা।

কোনো রাষ্ট্র এর ফলে অচিরেই যে শান্তিবাদী হয়ে উঠবে, এ আশা আকাশ-কুসুমেরই সামিল। কিন্তু প্রায়-রাষ্ট্রেরই এলাকায় এইসব সভ্যের দ্বারা সংগৃহীত সম্মেলনের অভিজ্ঞতা কিছু-না-কিছু পৌঁছবে; অন্ততঃ তা পৌঁছানো উচিত। তবে, সে সবই দূরের কথা; আপাতত আর-কিছু না হোক, এক-উদ্দেশ্যধারী সারা পৃথিবীর এতগুলি লোকের, নিজেদের মধ্যে সাক্ষাৎ আলাপ-পরিচয়ের মূল্যই বা কি কম! এ বিষয়ে মিঃ হোরেস আলেজাণ্ডারের সাম্প্রতিক বিজ্ঞপ্তি দ্রষ্টব্য।

এ দেশবাসীদের পক্ষে সংগ্রামের ও নির্যাতন ভোগের দিকে অভিজ্ঞতার সঞ্চয় বাড়িয়েছেন বৈদেশিকরা; সেবা এবং সংগঠনের দিকে মহাত্মাজীর তপস্যার তত্ত্ব এবং তথ্যের সঞ্চয় নিয়ে গেছেন তাঁরা এ দেশের কর্মীদের সহযোগে এসে। এ কাজের জন্যই সম্মেলন, এ কাজ ভালোভাবেই সম্পন্ন হয়েছে।

অধিকাংশই এঁরা নৈষ্ঠিক গান্ধীবাদী নন, কিন্তু গান্ধীজীর অভয়মন্ত্র ও আত্মোৎসর্গের আবেশ এঁদেরও প্রাণে রয়েছে। শত্রু কে? ভয় কাকে? বিশিষ্ট রাষ্ট্র-প্রতিনিধিকে ক্যাম্পে ঢুকতে হল রক্ষী-রিভলভার তথ্মা-তাবিজ সরিয়ে। অথচ, বোমার ভয়ের অপবাদ নেপথ্যে এঁদের ভাগ্যকে কি রেহাই দিয়েছে? তাই না, শহর এড়িয়ে গাঁয়ে গা-ঢাকা দেওয়া!

রাশিয়ার সাম্যবাদী-সমাজ এ সম্মেলনের আমন্ত্রণে সাড়া দেননি। কিন্তু তাঁদের সাধনার মধ্যে মানব-মৈত্রী ও সংগঠনের দিকটা এঁরা সশ্রদ্ধ হয়েই আলোচনা করেছেন এবং সংগত ও সম্ভবপর উপায়মাত্র দ্বারাই সাম্যবাদীদের সঙ্গে হৃদ্যতা স্থাপনের চেষ্টা করতে হবে—এই নিয়েছেন বিশেষ সংকল্প। সেই সংকল্প-প্রস্তাবের আলোচনাস্থলে ছিল না দলীয়তার গোঁড়ামি, ছিল একাগ্র আন্তরিকতার জোর। সর্বসমাজ ও সর্বধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা গান্ধীজীর এক বিশিষ্ট সাধনা ছিল। এঁদের

মধ্যেও সে-শ্রদ্ধার প্রয়াস লক্ষিত হয়েছে। নিয়মিতরূপ সমবেত আহার উপাসনা চলেছে প্রতিদিনই।

এঁরা শুধু নিজেদের সভ্যশ্রেণীক-গণ্ডিতেই সংকোচপ্রবণ ছিলেন না। আশে-পাশের আশ্রমবাসীদের সঙ্গেও পারিবারিক-ভাব রক্ষার আগ্রহ এঁদের ছিল। ঘুরে ঘুরে আশ্রমের কাজকারবার দেখেছেন, প্রতি-সন্ধ্যায় আশ্রমের ছাত্র-ছাত্রীদের আহূত সভায় বৈঠকে অনেক বক্তৃতা, আলোচনা করেছেন ও তাতে যোগ দিয়েছেন। এ সম্পর্কে শ্রীমতী ভেরা ব্রিটেনের, কাকা কালেলকারের গান্ধীজী সম্বন্ধে আলোচনাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আশ্রমের আহার-গৃহে প্রতিদিন পালা ক'রে সভ্যদের থেকে ছ'জন ক'রে গিয়ে পংক্তিতে বসে খেয়েছেন, নিজেদের আহারের বৈঠকেও আশ্রমের দশ-বারো জনকে নিয়ে একত্রে অন্ন-গ্রহণের আনন্দ উপভোগ করেছেন প্রতিদিনই। কাজের প্রয়োজনে সম্মেলন-ক্যাম্প এবং আশ্রমের খাওয়ার ব্যবস্থা এক সময়ে নির্দিষ্ট করা সম্ভব হয় নি ; না হয় তো, এঁরা এঁদের দিক থেকে সকলে এক সঙ্গেই খাওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। আহার বা উপাসনার স্থলে, আসন কারো নির্দিষ্ট করা ছিল না। যখন যে-কেহ যে-কেহর পাশে গিয়ে বসেছে। কথা বলেছে, ভাষায় বাধলে আকার-ইঙ্গিতেও চলেছে কথার কাজ, এমন-কি কিছু না ব'লেই প্রীতি-স্পর্শ পেয়েছে মনে। চোখে ঠেকেনি বর্ণবিদ্বেষ বা শিক্ষা-পদ-মানের ব্যবধান। বিশ্ববিত্যালয়ের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, সাধারণ জ্ঞানের সঙ্গে অতুল কর্মনিষ্ঠা, সম্পদ-সমৃদ্ধি ও সর্বরিক্ততা, পাশাপাশি অনেক-কিছুরই এরূপ সমাবেশ হয়েছিল। স্ফূর্তির মূর্তিমান বিগ্রহ ছিলেন নিগ্রো যুবক সভ্যটি। তাঁবুতে-তাঁবুতে তিনি বাজিয়ে ফিরেছেন ঘণ্টা। ছন্দিত হয়েছে তাঁর ধ্বনিতে সভ্যদের সংকল্প ও সাধনার ঐক্যতানিক জীবনধারা। মহাত্মাজীর হরিজনসেবার সাধনাক্ষেত্রে 'হরিজন' কথাটা উঠে গিয়েছিল, সবাই হয়েছিলেন স্ব-জন। এটা কেবল আনুষ্ঠানিক-রীতির তাগিদেই যে ঘটেছিল তা নয়। প্রাণের থেকেই তা ঘটেছিল। সান্ধ্য-উপাসনায় প্রতিদিন নানা ধর্ম-শাস্ত্র পাঠ এবং নানা ধর্মের প্রার্থনা উচ্চারিত হয়েছে। কোনো-কোনো দিকে প্রথম-প্রথম কিছু অসুবিধাজনক হলেও প্রতি-দেশের সামাজিক আচার-নীতি সম্বন্ধে পারস্পরিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পক্ষেও এ ধরনের সম্মেলনের উপযোগিতা স্বীকার্য। বৈদেশিকগণের প্রীতিপূর্ণ সহাস্য সম্ভাষণের সহিত প্রায়শই নমস্কার-বিনিময়ের প্রক্রিয়াটি বিশেষ উপভোগ্য ছিল।

শান্তিনিকেতনে এঁদের ক্যাম্পের আসর বসেছে। সেখানে এঁরা গান শুনেছেন শান্তিনিকেতনের, বোলপুরের এবং ভুবনডাঙা গ্রামের লোকেদেরও ; সেবাগ্রামে

এঁরা গ্রামের মধ্যে গিয়ে গ্রামবাসীদের জমায়েতে মিশেছেন, ফুলফলের ডালি নিয়েছেন, হৃদ্যতা দিয়েছেন। মহাত্মাজীর পল্লীর ডাক এঁরা উপেক্ষা করেন নি, সাদরে স্বীকার করেছেন।

মহাত্মাজী কোন্ সমস্যার স্থলে কী আদেশ রেখে গেছেন কিংবা তাঁর প্রবণতা কী ছিল, সম্মেলনের বৈঠকে প্রায়-বিষয়ের আলোচনাতেই বিশেষ ক'রে সে-সবের উল্লেখ হয়েছে। শিরোদেশিক প্রধান উপ-সমিতি থেকে সম্মেলনের মূল দৃষ্টিভঙ্গী স্থির হয়েছে। তার প্রথম কথাটিই মানুষের প্রতি মহাত্মাজীব দৃষ্টিভঙ্গীব কথা মনে করিয়ে দেয়। বিশ্বের ভালো-মন্দ প্রত্যেকটি মানুষের মৌলিক সৎ-সত্তার প্রতি অক্ষয় বিশ্বাস রাখা চাই। সেই মূলগত সমগুণেব সার্বজনীন মর্যাদায় সকলকে সমান দেখতে হবে। সেবাই সংশোধনের শ্রেষ্ঠ উপায় ব'লে সেই উপ-সমিতির সিদ্ধান্ত।

প্রখর শীতের মধ্যে একেবারে গান্ধীজীর মতো কটিবাস ও খালি-গায়ের এক প্রৌঢ় সাধু সভ্যদের মধ্যে ছিলেন এবং শীর্ণ ঋজু সুদীর্ঘকায় একটি সৌম্যশান্ত যুবক, বোধহয় অস্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধি, সারাক্ষণ তকলি কাট্‌ছিলেন। বুনিয়াদী-শিক্ষা এবং মহাত্মাজীর অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণপদ্ধতি নিয়েও সম্মেলনে বিশেষভাবে আলোচনা হয়েছে।

কোনো প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রমহল থেকে অহিংসার আফিম খাইয়ে নির্যাতিত জাতিদের বীর্যেব ডাক ভুলাতে কেউ এসেছিল কিনা জানা নেই, কিন্তু সম্মেলনের প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি থেকে দেখা যায়, প্রত্যেকের জীবনের কাজের পরিচয় ধরা রয়েছে সাধারণের সামনেই; সেটা মিথ্যা প্রমাণিত হয়নি। সভ্যদেব যাচাইয়ের পক্ষে একবার সেটাতে চো‌খ বুলিয়ে নিতে দোষ কী।

অহিংসা ও শান্তির বাণী কি নেশায় ঘুম-পাড়াবাব মন্ত্র? মহাত্মাজীর কাজগুলি কি দুর্বলের কাজ ছিল? কারো-কারো কাছে এ কাজের মূল্য না থাকতে পারে; কিন্তু মূল্য না দিলে মানব-সাধনার বিশ্বস্বীকৃত এক বিশিষ্ট দানকে অস্বীকার করা হবে কিনা,—এই বিশ্বশান্তিবাদী-সম্মেলনের এই ঘটনা থেকেই সে দ্বিধাও কারো কারো মনে ওঠা বিচিত্র নয়।

সম্মেলনের পরিশেষাঙ্কে সেবাগ্রামে গিয়ে যোগ দিয়েছিলেন ভারতরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিতজী। তাঁর ভাষণের থেকে নির্গলিত এই কথাটি মনে ভাসছে,—আদর্শবাদী হয়ে শান্তিকর্মীরা যেন সমাজ থেকে স্বতন্ত্র ক'রে নিজেদের না ভাবেন। মহাত্মাজীর প্রধান দান অসাম্প্রদায়িকতা। সর্বাগ্রে সে কথাই মনে রাখা দরকার।

তাঁদেরই দ্বারা যাতে আর-একটি সম্প্রদায় বৃদ্ধি না হয়, সমাজ-বিরোধী আর-এক ধরনের সেই সাম্প্রদায়িক বুদ্ধির সংক্রমণতা থেকে তাঁরা সতত সতর্ক থাকবেন—এই তিনি আশা করেন।

মহাত্মাজী সম্বন্ধে তদ্‌গতচিত্ততা তো ছিলই, রবীন্দ্রনাথ-সম্বন্ধেও শ্রদ্ধা ও অনুসন্ধিৎসা এঁরা প্রচুরই বহন করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রথম-প্রথম অনেকের তেমন গভীরভাবে জানার সুযোগ ঘটেনি, কিন্তু এদেশে এসে এঁরা তাঁর বাণী ও কর্মের সাক্ষাৎ পরিচয় লাভ করেছেন। একটি দিনের অধিবেশনে নির্দিষ্টভাবেই করেছেন রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রচিন্তাধারার আলোচনা। "ন্যাশনালিজম্‌" গ্রন্থ থেকে রবীন্দ্রনাথের প্রচুর সার্থক উদ্ধৃতি দ্বারা সদস্য-বিশেষ সম্মেলনে সকলের সশ্রদ্ধ অভিনন্দনের পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। শান্তিনিকেতন ও ওয়ার্ধা থেকে সম্মেলনের সময় রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর আদর্শ ও কাজের সংক্ষিপ্ত পরিচয়পূর্ণ কয়েকখানি পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশিত হয়, সভ্যগণ তা উপহার পেয়ে গিয়েছেন।

সর্বোপরি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বৈদেশিক সভ্যদের বিশ্বাস প্রকাশ পেয়েছে অপরিসীম, তাকে ভক্তি বলা চলে। তাঁরা মনে করেন, ভারতবর্ষ বিশ্বে নব-প্রাণ, নব-সমৃদ্ধির অপেক্ষমান উৎস। শান্তিনিকেতন-অধিবেশনের শেষ-প্রকাশ্যসভায় সভাপতিরূপে শ্রীযুক্ত রামচন্দ্রন্‌ বলেছেন, "এঁদের এই বিশ্বাসের মর্যাদা রাখার আমরা যোগ্য কিনা, তা ভাববার বিষয়; কিন্তু এ দায়িত্ব আমাদেব ভোলবার নয়। রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর আমরা উত্তরাধিকারী, আমাদের তা অস্বীকার করা চলে না।" ৩০।১।১৯৫০

শান্তিনিকেতনে নানা ধরনের উৎসব হয়ে গেল। পনেরোই অগস্ট স্বাধীনতা-উৎসব, তার আগে হয়ে গেল রবীন্দ্রসপ্তাহ-উদ্‌যাপন, আচার্য অবনীন্দ্রনাথ ও শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উৎসবানুষ্ঠান। জন্মাষ্টমী ও আচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন উপলক্ষে বিশ্বভারতীর কাজ-কর্ম বন্ধ ছিল। সকালে মন্দিরে উপাসনা হয়। আচার্যের ভাষণে শ্রীক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় বলেন—অনেক বছর আগে এই দিনটিতে এক মহাপুরুষ জন্মেছিলেন। সমস্ত ভারতবর্ষে আমরা আজ তাঁরই জন্মোৎসব পালন করছি। ঠিক এই দিনটিতেই আরেকজন প্রতিভাশালী ব্যক্তি জন্মেছিলেন আধুনিক যুগে। তিনি শ্রীকৃষ্ণের মতো অত-বড় মহাপুরুষ না হলেও তাঁর দানও কম নয়। শিল্পাচার্য সেই অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আজ আমরা স্মরণ করব সন্ধ্যার অনুষ্ঠানে।

আজ আমাদের একটি কথা ভেবে দেখবার আছে, সত্যিই কি সেই মহাপুরুষকে বোঝবার কিংবা তাঁর কীর্তি ধারণ করে রাখবার মতো শক্তি আমাদের হয়েছে? আমাদের মন কি সেভাবে প্রস্তুত হয়েছে? অনেক বছর আগেকার একটি ঘটনা মনে পড়ে। ফতেপুরসিক্রিতে আকবরের নূতন রাজবাড়ি তৈরি হয়েছে, মহাত্মা দাদু তখনও জীবিত। শুভ-দ্বারোদ্ঘাটনে সাধু-সন্তদের আগমন হবে। আকবর দাদুর কাছে নিমন্ত্রণ পাঠালেন। দাদু যেতে পারলেন না, তাঁর এক শিষ্যকে পাঠালেন। শিষ্য ফিরে এল। দাদু জিজ্ঞেস করলেন—সেখানে কী দেখলে? শিষ্য বললে—"দেখলাম একটি বিরাট দ্বার, সেরূপ দ্বার কল্পনার অতীত।" দ্বারটি কিন্তু একসঙ্গে একবারে তৈরি নয়। স্বয়ং বাদশাহ আকবর হাতী চড়ে ঝাণ্ডা নিয়ে ঢুকবেন—সেইজন্য বারে-বারে ভাঙা-গড়া করে অত বড়টি করা হয়েছিল।

দাদু শিষ্যের কথা শুনলেন, অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন—আকবর মাত্র বাদশাহ। তাঁর প্রবেশদ্বার এরকমভাবে তৈরি হয়েছে যেন কোনও জায়গায় একটুও না ঠেকেন। কিন্তু বাদশাহের বাদশাহ যিনি, তাঁকে আমরা হৃদয়ে প্রবেশের সে পথ দিচ্ছি কই? সারা জীবনের সাধনা দিয়েও আমাদের হৃদয়-দ্বার অমন অবারিত হয় না। তাই তো তিনি আমাদের থেকে দূরে রয়েছেন। সেরকম প্রশস্তভাবে যেদিন তাঁর ঢুকবার পথ তৈরি করে তুলতে পারব, তখনই তাঁকে পাব ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে। আজ আমরাও তেমনি বলতে চাই,—আমাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে জন্ম নিতে বলার আগে আমাদের নিজেদেরই নূতন ক'রে জীবন গড়ে তোলা উচিত। তাঁকে গ্রহণ করবার শক্তি ধারণ করা চাই। শ্রীকৃষ্ণ জন্মেছিলেন এই মর্তলোকে, তাঁকে আমরা মানুষরূপেই যেন দেখতে পারি। তাঁর কীর্তি সাধারণ-মানুষ থেকে আলাদা, তাই তাঁকে দেওয়া হয় দেবতার সম্মান। কিন্তু দেবতা ব'লে অভিহিত করলে তাঁকেই অসম্মান করা হয়। কারণ তিনিই বলে গেছেন—মানুষ সবার উপরে। ভাগবতে তিনি বলেছেন—যে-মানুষ মানুষের মধ্যে ব্রহ্মকে দেখেন তিনিই ধন্য।

আজকাল 'কমিউনিজম' 'কমিউনিজম' বলে দেশ মেতে উঠেছে। অনেকের ধারণা—এটি আধুনিক কালের দান। লেনিন-স্ট্যালিন এর জন্মদাতা। কিন্তু ভারতবর্ষে কত-শত বছর আগে কৃষ্ণের মুখ দিয়ে বের হয়েছিল—যার যত ক্ষুধা তাকে ততটাই দিতে হবে, তার বেশি নয়। বিশেষ ক'রে বুঝে দেখলে দেখা যাবে, এই কথাটির দুটি মানে। এর মধ্যে মনের ক্ষুধা মেটাবার এবং শারীরিক ক্ষুধা পুরাবার কথা প্রকাশ পেয়েছে। একজন লোকের দেহে এবং মনে ঠিক যতটা

ধারণক্ষমতা ততটাই যেন সে ধারণ করে। তার চেয়ে বেশি আকাঙ্ক্ষা করা তার পাপ, অনুচিত, বেশি গ্রহণ করে জমানো আরো অনুচিত। একেই তো বলে কমিউনিজম।

কথিত আছে, কৃষ্ণ জন্মালে পৃথিবী বন্ধনমুক্ত হল, বন্দীরা ছাড়া পেয়ে গেল। একথা কতদূর সত্য তা জানা না গেলেও এটুকু বলা যায়, তিনি মানুষে-মানুষে ভেদ দূর করবার চেষ্টা করেছিলেন। তাই বোধ হয় তিনি জন্মেছিলেন গোয়ালার ঘরে, সুদামা এবং বিদুরের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন সানন্দে। মানুষকে যারা মানুষের মর্যাদা দিতে পারে না, তাদের তিনি অত্যন্ত হীন চোখে দেখতেন। ২১।৮।১৯৫২

বর্ষা-ঋতুতে আশ্রম খুলেছে। ১২ই জুলাই—বিনোদন-পর্বের প্রথম-অনুষ্ঠান হল সিংহসদনে। ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী একটি বক্তৃতা দিলেন। বিষয়টি ছিল তাঁর সদ্য চীন-ভ্রমণ।

চীন এবং ভারত—আধুনিক জগতের দুটি রাষ্ট্র। দুই-ই নতুন পথে চলা শুরু করেছে। সকলেই জানতে চায় কী বদল হল? সমাজে, রাষ্ট্রে, মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে, কী সমাধান মিলেছে? উন্নতি হচ্ছে কোন্ পথে? গত যুদ্ধের সময় তিন বছর (১৯৪৫—১৯৪৮) ডঃ বাগ্‌চী চীনে ছিলেন। তখনকার চীনের বিপর্যয়-দশা তাঁর দেখা। চীন-ভারত সংস্কৃতি-সংঘের (১৯৫২) প্রতিনিধিরূপে সম্প্রতি তিনি চীন ঘুরে এসেছেন। তাঁর চোখে চীনের যে পরিবর্তন প্রতিভাত হয়েছে, সেদিনের বক্তৃতায় তিনি সে-সব অভিজ্ঞতাই ব্যক্ত করলেন।

পাঠভবনের ছাত্র-ছাত্রীগণও উপস্থিত ছিল। ডঃ বাগ্‌চী প্রথমে তাদের জন্য বাংলায় অল্প-কিছু বলে নিলেন—১৯৫০ সনে চীনে চিয়াংকাইশেকের পরিচালনা শেষ হয়ে নতুন ব্যবস্থা চালু হয়। শান্তি আসে। সে দেশের বিরাট পরিবর্তন এখন সাদা চোখেই ধরা পড়ে। উত্তর-চীন থেকে দক্ষিণ-চীনের শেষ-প্রান্ত অবধি দেশ জুড়ে যানবাহনের চমৎকার ব্যবস্থা হয়েছে। এক সীমা থেকে আরেক সীমায় যেতে চোখে পড়ে দুধারে ফসল-ক্ষেত। সবুজে ভরা চারদিক—এতটুকু পতিত জমি নেই। এমন কি, যেগুলো ছিল কবরখানার পোড়ো জমি, সেগুলোও চষা-ভুঁই হয়ে গেছে। নতুন গভর্নমেন্টের দৃষ্টি পড়েছে দেশের লোকের খাওয়া-পরার দিকে। তাই ব'লে আর-সব দিকে যে চোখ নেই, তা নয়; বছরের পর বছর কেটেছে উপবাসে। দেশবাসী জীর্ণ ক্লান্ত। দেহে-মনে তাদের চাঙা ক'রে তুলতে আগে চাই—খাওয়া-পরা। চীনের শতকরা ৯৫ জন কৃষিজীবী। কৃষির দ্রুত উন্নতিতে সকলে মন দিল। এখন এক-একজন কৃষক প্রয়োজনীয় পরিমাণে

জমি ভোগ করছে ; জমিদারী-প্রথা উঠে গেছে। চোরাবাজারি এবং আরো সব দুর্নীতি দমনের দিকে রাষ্ট্রের চোখ পড়েছে। চোরাবাজার নেই। অন্যরকম দুর্নীতিও অনেক কমে গেছে। চোরাকারবারের বিচার আদালতে হয় না। সবার সামনে এনে অভিযুক্তকে দাঁড় করানো হয়। জিজ্ঞাসাবাদ চলে; দোষী প্রমাণ হলে তার দণ্ডবিধান হয়। দোষের পরিমাণে লঘুগুরু দণ্ড মেলে। মৃত্যু-দণ্ডও আছে। উকিল ব্যারিস্টার,—ও সবের বালাই নেই। সমস্ত দেশ এক নতুন-জীবন পেয়েছে এবং সকলে আনন্দে সাড়া দিয়েছে।

সভায় আমেরিকান, চীনা, অবাঙালী ছাত্রছাত্রী ছিলেন: সকলের বোঝবার সুবিধার জন্য বাগ্‌চীমশাই এর পরে ইংরেজিতে বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতাতে তিনি প্রথমে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঞ্চু-রাজবংশের পরিচালনার বিবরণ বলে নেন। তারপরে ক্রমে-ক্রমে বৈদেশিক শক্তিগুলির শোষণ, দেশবাসীর আত্মকলহ ও চোরাবাজারী দুর্নীতির কথা ব'লে বর্তমান শাসকমণ্ডলীর নানা ব্যবস্থার পরিচয় দান করেন। এতে পুরোনো ও নতুন চীনের পার্থক্য বোঝা অনেকটা সহজ হয়।

আধুনিক পরিবর্তনের প্রসঙ্গে ডঃ বাগ্‌চী বলেন,—কম্যুনিস্টদের কাছে প্রাচীনপন্থী চিয়াংকাইশেকের দলের যে পরাজয়, সেটা অস্ত্রের পরাজয় নয়। কম্যুনিস্ট দল চতুর, কৌশলী। চিয়াংকাইশেক তাঁর সৈন্য-সামন্ত বাড়ালেন; কম্যুনিস্টরা ওপথে গেল না। তারা দখল করলে—ফসল-ক্ষেত, বন্ধ করলে যানবাহন। চারদিক দিয়ে ঘেরাও ক'রে তাদের আয়ত্তে আনলে। জনগণের দুর্দশা দেখে চিয়াংকাইশেককে নতি স্বীকার করতে হল। এখন যে-গভর্নমেণ্ট সে পুরোপুরি কম্যুনিস্ট নয় ; সকল দলের সমবায়ে গড়া যৌথ-পরিচালকমণ্ডলী। অবশ্য কম্যুনিস্ট দলই তাদের মধ্যে প্রধান।

এক শ বছরে যে-উন্নতি সম্ভব হয়নি, এখন তা হচ্ছে। সেখানে জনসাধারণ থেকে আরম্ভ করে উচ্চশ্রেণী অবধি সব-রকমের মানুষেরই শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। People's University, Minority University—এ-সব নানা রকমের বিদ্যাকেন্দ্র খোলা হয়েছে। বাঁচবার উপযুক্ত হবার শিক্ষাটাই সেখানে প্রধান। শিক্ষার্থিগণ রাজনীতি এবং শহরের আবহাওয়া থেকে দূরে আছে; নিজেরাই জনশিক্ষার ভার নিচ্ছে। উচ্চ-শিক্ষার দিকে গবেষণা-বিভাগ নেই। অধ্যাপকের অভাব। হয়তো শীগ্‌গীরই সে অভাব পূরণ হবে। কিন্তু উচ্চশিক্ষিতই হোক্ আর সাধারণ শ্রমিক হোক্, সবারই প্রথম কথা হচ্ছে—দেশের কাজে সাহায্য করা।

ওদেশে ইংরেজ এবং আমেরিকানরা গিয়ে যে দুর্দশা ঘটিয়েছিল, তার প্রতিক্রিয়া চলছে,—ইংরেজি ভাষার উপর সেখানে প্রচণ্ড বিদ্বেষ দেখা দিয়েছে। ইংরেজি-জানা লোকও ইংরেজিতে কথা বলতে পারবে না। দোভাষী চাই। দোভাষীকে দেশীয় ভাষায় শুধরে দেওয়া চলে। তার ভুল শুনেও, নিজেদের ইংরেজি বলার উপায় নেই। এককালে ভারতের প্রাচীন ভাষা সংস্কৃতের উপর ওদের অত্যন্ত আগ্রহ ছিল। ওরা ভারতীয় দর্শন চর্চা করত। এখন হিন্দী ভাষার দিকে ঝোঁক বেড়েছে। হিন্দী-ক্লাসে দেখা গেল ষাটটি ছাত্রছাত্রী।

ধর্ম সম্বন্ধে চীন নাস্তিক বললে দোষ হয় না। ব্যক্তিগত ধর্ম নিয়ে তাদের মাথাব্যথা নেই। বৌদ্ধধর্মও হয়তো কালে-কালে লোপ পাবে। ধর্ম সম্বন্ধে চীন উদার মতের রাষ্ট্র। যে-কোনো মতবাদ পোষণ সম্বন্ধে কড়া বাধানিষেধ নেই। বাইরে অন্তত অবহেলা বা বিদ্বেষ নেই কোনোটাকেই, যতক্ষণ না কেউ প্রচারের সুযোগ নিচ্ছে। যে-সব বৌদ্ধমঠ আগে অবহেলায় অসংস্কৃত হয়ে পড়ে ছিল, দেখা গেল এখন তার উন্নতি সাধন করা হচ্ছে। দ্রুত এগিয়ে চলেছে চীন স্বাস্থ্যে, সম্পদে, নৈতিক চরিত্রে। আশা করা যায় প্রাচীন ঐতিহ্যের গৌরব নতুন চীন অম্লান রাখতে পারবে। বক্তব্যশেষে ডঃ বাগ্‌চী চীন-সম্বন্ধে নানারকম প্রশ্নের উত্তর দেন। ১৮।৯।১৯৫২

১১ই জানুয়ারী—সন্ধ্যা-উপাসনার পর চীন-ভবনে আমেরিকার ওবারলিন কলেজের অধ্যক্ষ স্টিভেনসন এক বক্তৃতা দেন। ডঃ প্রবোধ বাগচী প্রথমে তাঁর সঙ্গে সকলের পরিচয় করালেন। ভারত-ভ্রমণের ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে আগমনের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানানো হল। তিনি আমেরিকার বিগত নির্বাচন সম্বন্ধে কিছু বললেন। বিগত নির্বাচনে রিপাব্লিক ও ডেমোক্র্যাটিক দলের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরে রিপাব্লিকের জয় হল। প্রায় ষোল বছর পরে এ দলের জয়লাভে সবাই খুব আনন্দিত হয়েছে। দেশের দ্রুত উন্নতিও দেখা যাচ্ছে। আইসেনহাওয়ার একজন বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ্, গত যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন। বর্তমান যুগের একজন জাতীয় বীর নেতা ব'লে তাঁকে গণ্য করা যায়। যদিও ডেমোক্র্যাটিক আর রিপাব্লিক দলের মধ্যে অন্তরে অন্তরে বিরোধ, কিন্তু বাইরের সৌহার্দ্য বরাবরই অটুট রয়েছে। স্টিভেনসন্ দুর্ভাগ্যবশতঃ হারলেও তিনি কার্যদক্ষ পৃথিবীর বড় বড় নেতাদের সমকক্ষ। এরই মধ্যে আমেরিকায় স্কুল-কলেজে এবং কর্মীদের মধ্যে নানারকম পরিবর্তন হয়েছে। আশা করা যায় দেশের পক্ষে এ পরিবর্তন মঙ্গলজনকই হবে। এরপরে অনেকে তাঁকে

অনেক রকম প্রশ্ন করলেন। কোরিয়া, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের অবস্থা নিয়েও আলোচনা চলে। ১৪।১।১৯৫৩

২৭শে জানুয়ারী গ্রীসের বিশিষ্ট জীবতত্ত্ববিদ্ প্রিন্স পিটার কালিম্পং যাবার পথে শান্তিনিকেতন পরিদর্শন করেন। সকাল দশটাতে চীনা-ভবনে শিক্ষক, কর্মী ও উচ্চতর-বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে তিনি একটি বক্তৃতা দেন। চীনা-ভবনের অধ্যক্ষ তান-ইয়ান-সেন তাঁকে সবার সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেন। বলেন যে, প্রিন্স পিটার সত্যানুসন্ধানী; কয়েক বছর যাবত ভারতবর্ষে জীবতত্ত্বের গবেষণায় রত আছেন। তিনি আজ একটি বক্তৃতায় আমাদের কাছে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশের মানুষের মধ্যে হিংসাত্মক মনোভাবের পার্থক্যটিকে সামাজিক সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক, নানাদিক দিয়ে আলোচনা করবেন। প্রিন্স পিটার এর পরে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—আমার বিষয়টি মতদ্বৈধতাপূর্ণ। আমার বক্তব্য-শেষে আপনাদের মধ্য থেকে যদি এ নিয়ে আলোচনা করতে চান, তবে আমি খুব খুশীই হব। সামাজিক সাংস্কৃতিক ঐতিহাসিক—এমনকি শিশুদের মনোবৃত্তি নিয়ে গবেষণা করেও দেখা যায়—প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের মনোভাবের পার্থক্য ধরা পড়ে। প্রাচ্য দেশ শান্ত-মনোভাবাপন্ন আর পাশ্চাত্য উগ্র হিংসাত্মক মনোভাবাপন্ন। তিনি দু'দেশের সমাজ, ধর্ম, সংস্কৃতি, ইতিহাস প্রভৃতি নানাদিক দিয়ে আলোচনা ক'রে দেখান। তাঁর বক্তব্যের শেষে বিশ্বভারতীর বিনয়ভবনের অধ্যক্ষ, বিদ্যাভবনের ডঃ সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য এবং শিক্ষাভবনের ইংরাজির অধ্যাপক শ্রীজ্যোতি ভট্টাচার্য প্রভৃতি সবাই এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। বক্তা নিজেও আরো নানা বিষয়ে ব'লে তাঁর বক্তব্য স্পষ্টতর করেন। সভার শেষে তান-ইয়ান-সেনও এ বিষয়ে আপনার মত ব্যক্ত করেন। সভাটি বেশ উদ্দীপক হয়েছিল।

এইদিন বিকেলে জাতীয়-সেনাবাহিনী তাঁদের ক্রীড়ানুষ্ঠান দেখান। ৩১।১।১৯৫৩

৩০ শে জানুয়ারী—সকালে মন্দিরে উপাসনা হল। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন বললেন—যীশুকে মেরে আমরা চরম হিংস্র প্রবৃত্তির পরিচয় দিয়েছিলাম। তিনি তবু বলে গিয়েছিলেন—এদের ক্ষমা করো। সে ক্ষমার যোগ্য আমরা নই। মহাত্মাজীকে মেরে আমাদের পরস্পরের প্রতি হিংস্রতা, বিদ্বেষ ও বৈরিতাই প্রকাশ করেছি। যতদিন এসব প্রবৃত্তি আমাদের মধ্যে প্রবল থাকবে ততদিন আমরা যীশু, মহাত্মাজী প্রভৃতিকে নিত্যনিয়ত মারব। তাঁদের দৈহিক মরণ একদিনের কিন্তু তাঁদের আদর্শের মৃত্যু ঘটানো মানে তাঁদের নিয়ত টুকরো-টুকরো

করে মারা। "জীবন যখন শুকায়ে যায়" গানটি গীত হলে আচার্য বললেন এই আশ্রমের সঙ্গে মহাত্মাজীর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথা। মহাত্মাজী প্রথম যখন আফ্রিকায় রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু করেন তখন থেকেই গুরুদেব শান্তিনিকেতনে বসে অত্যন্ত মনোযোগ এবং কৌতূহলের সঙ্গে সে-আন্দোলন লক্ষ্য করতে থাকেন। তিনি মহাত্মাজীকে একবার বলেও ছিলেন যে, আমিও এককালে রাজনীতিতে যোগ দিয়েছিলাম, মনে-প্রাণেই যোগ দিয়েছিলাম কিন্তু রাজনৈতিক জটিলতায় আমার মনে আঘাত পেলাম; পঙ্কিলতায় মন বিরূপ হয়ে গেল; আমি ও-পথে ব্যর্থ হয়েছি, আপনি নতুন পন্থাতে এগোচ্ছেন, আপনার সাফল্য দেখে আমার আনন্দ হবে। গান্ধীজী বলেছিলেন—আমিও তো মাত্র চেষ্টা করছি, কতদূর সফল হব জানিনে। আমার মৃত্যুর পরেও যদি এ আদর্শ টিকে থাকে তবেই আমার সফলতা লাভ হবে।

* * *

গুরুদেব যেমন রাজনীতির ক্ষেত্রে গান্ধীজীকে নানাভাবে সাহায্য করতে উদ্‌গ্রীব ছিলেন, গান্ধীজীও গুরুদেবের কাজকে সাহায্য করতে আনন্দিত বোধ করতেন। দু'জনের মধ্যে হৃদ্যতা ছিল গভীর। শেষ-বয়সে অসুস্থ হয়েও রবীন্দ্রনাথ যখন কাজ থেকে বিশ্রাম নিতেন না, গান্ধীজী সে খবর পেয়ে সস্ত্রীক আশ্রমে চলে আসেন এবং রবীন্দ্রনাথের থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়ে গেলেন বিশ্রাম করবার। আশ্রমের সঙ্গে তাঁর যে যোগ ছিল সে যোগ থেকে তাঁকে আজ স্মরণ করি পিতৃকার্যের অনুষ্ঠান করার মতো।

সেদিন বিকেলে আম্রকুঞ্জে গান্ধীজীর স্মরণ-সভা হয়েছিল।

জানা গেল, শান্তিনিকেতনে বসন্তোৎসবের সময় একটি বড় রকমের 'সাহিত্য মেলা'র অনুষ্ঠান হবে। চার-পাঁচ দিনব্যাপী তার আসর জমবে। বাংলাব বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণ তাতে যোগদান করবার জন্য নিমন্ত্রিত হচ্ছেন। রবীন্দ্রনাথের আশ্রমে এইরকম অনুষ্ঠান খুবই উপযুক্ত। বাংলা-সাহিত্য আশা করা যায় এতে নূতন প্রেরণা পাবে! ৮।২।১৯৫৩

বেলা ন'টার সময় আশ্রমের বকুল-বীথিতে "সেক্সপীয়র-পাঠচক্রে"র অধিবেশন হয়েছিল। বিনয়-ভবন, বিদ্যাভবন, শিক্ষাভবনের ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপকগণ যোগ দিয়েছিলেন। ইংরেজ মহিলা মিস্ ভিক্টোরিয়া কিংস্‌লী বিখ্যাত লোক-সংগীত গায়িকা। সেক্সপীয়রও তিনি খুব ভালো পাঠ করতে পারেন। শান্তিনিকেতনে দু'বছর থেকে তিনি বাংলা গান শিখলেন। এবার তাঁর দেশে ফিরে যাবার সময়

হয়ে এসেছে ; তিনিই প্রধান পাঠিকা ছিলেন ; সেক্সপীয়রের সনেটগুলি থেকে বেছে বেছে পড়ে শোনালেন ; গানও করলেন গীটার বাজিয়ে। টেম্‌পেস্টের শেষের সনেটটি গানের সুরে শুনতে অত্যন্ত ভালো লাগছিল। সেক্সপীয়রের সনেটের তিন চারটির (বিষ্ণু দে কর্তৃক অনূদিত) বাংলা অনুবাদ অধ্যাপক সুনীল সরকার এবং অশোকবিজয় রাহা পড়ে শোনান। সুনীল সরকার বলেন—সেক্সপীয়রের সনেটের মাত্রা ও ছন্দ বাংলায় যথাযথভাবে আনা সম্ভবপর নয়। মাইকেল চেষ্টা করেছেন, 'হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন' প্রভৃতি তার নিদর্শন। রবীন্দ্রনাথও চেষ্টা করেছেন—তার ফলে তৈরী হয়েছে—"এবার হল না গান।" কিন্তু এতে ছন্দ ও ও মাত্রা কম-বেশী হয়ে গেছে। বিষ্ণু দে সনেটগুলোকে অদ্ভুত কৃতিত্বের সঙ্গে অনুবাদ করেছেন। দু'-এক জায়গায় এক-আধটু দোষ-ত্রুটি ধরা পড়লেও সেক্সপীয়রের ভাব ও ছন্দ-মাত্রা ঠিক বজায় আছে। বাংলা-কবিতা হিসাবে কবিতাগুলি দীর্ঘ-মাত্রা লাগলেও কবিতা এবং অনুবাদ ভালো হয়েছে। ১।২।১৯৫৩

পূজাবকাশের পর প্রথম সভা বসল সেদিন সান্ধ্য-বিনোদন পর্বে। চীনভবনের পরিদর্শক অধ্যাপক গুডরিস্ চীনভবনের হলঘরে বক্তৃতা দিলেন। চীনের নৃতত্ত্ব, স্থাপত্য, রাষ্ট্র, সমাজ, শিক্ষা, ঐতিহ্য—সব-কিছুর ইতিহাস-সম্বন্ধে এক বিশদ বক্তৃতা ধারাবাহিকভাবে তিনি দেবেন। এদিনের বক্তৃতাটিতে হল তারই প্রাথমিক উদ্বোধন। বক্তৃতার আগে ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী সকলের কাছে তাঁর পরিচয় দিয়ে বললেন যে,—অধ্যাপক গুডরিসকে অনেক বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় আমন্ত্রণ জানিয়েছিল পরিদর্শক-অধ্যাপকরূপে, কিন্তু তিনি আগে বিশ্বভারতী-বিশ্ববিদ্যালয়ে আসাই পছন্দ করেছেন. এজন্য আমরা খুবই কৃতজ্ঞ। এখানে তিনি এপ্রিল অবধি থাকবেন এবং ধারাবাহিকভাবে চীনের ইতিহাস সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবেন। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার বিকেলে তিনি ক্লাসের মতো করে এ বক্তৃতা দেবেন। যাঁরা এ বিষয়ে শুনতে অভিলাষী, নিশ্চয় আসবেন। এরপরে অধ্যাপক গুডরিস চীনদেশের প্রাচীনতম ঐতিহ্য সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। চীনদেশের লোকদের শারীরিক গঠনপ্রণালী, স্থাপত্যপ্রণালী, অক্ষরমালার উৎপত্তি, রাষ্ট্রের উত্থান প্রভৃতি নানা বিষয় আলোচনা করলেন। পৃথিবীর চার ভাগের এক ভাগ ফুল-ফলের গাছের উৎপত্তি প্রথম চীনদেশে। চীন-অক্ষর চিত্র-প্রতীক (Symbolic)। বাড়ির বর্ণমালা ছিল গৃহচিত্র, আধুনিক গৃহ-সমার্থক অক্ষরের রূপের মধ্যে গৃহের বিবর্তন-চিহ্ন রয়ে গেছে ; দাম শব্দ বোঝানো হত কড়ি এঁকে। এখনও দাম-সমার্থক অক্ষর কড়ির

আকৃতি বহন করছে—ইত্যাদি বহু রকমের তথ্য পরিবেশনে বক্তৃতাটি মনোরম হয়েছিল। ৯।১২।১৯৫৩

৬ই জানুয়ারী—সান্ধ্য-উপাসনার পরে সিংহসদনে একটি ইংরাজি বিতর্কসভার আয়োজন করা হয়। বিষয়টি—ছিল কম্যুনিস্ট চীনকে রাষ্ট্রসংঘে যোগ দিতে দেওয়া উচিত। সমর্থনকারীদের মধ্যে ছিলেন শিক্ষাভবনের দুজন ছাত্র এবং বিপক্ষ দলে ছিলেন আমেরিকাগত দুজন ছাত্র। সভাপতি ছিলেন ইংরাজির অধ্যাপক নর্থ। সমর্থনকারীদের মত ছিল এই যে, কম্যুনিস্ট চীনকে রাষ্ট্রসংঘে অবশ্যই যোগ দিতে দেওয়া উচিত। রাষ্ট্রসংঘের উদ্দেশ্য হচ্ছে এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের শান্তি ও সদ্ভাব স্থাপন করা। প্রত্যেক দেশের সুখ-সুবিধার কথা সেখানে আলোচিত হয়। প্রত্যেক দেশের প্রতিনিধি আছে। চীনকে সেখানে পৃথক রাখা অন্যায়। চীনকে স্থান দিলে রাজনৈতিক বহু রকম সমস্যারও সমাধান হবে। কিন্তু এমন অনেক দেশ আছে যারা প্রকৃত শান্তিকামী নয়। চীনকে রাষ্ট্রসংঘে স্থান দিলে তাদের স্বার্থহানি ঘটবে। কিন্তু একথা ভাবতেও আশ্চর্য লাগে, চীনকে বাদ দিয়ে ফরমোসা, যেখানে মাত্র পনেরো লক্ষ লোকের বাস, তাদের প্রতিনিধিকে রাষ্ট্রসংঘে স্থান দেওয়া হয়েছে।

বিপক্ষ দলীয় ছাত্রগণ বলেন, পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রের মতো চীন রাষ্ট্রসংঘের নির্দেশ মানতে চায় না। তাদের কাজের মধ্যে বিরোধিতার ছাপ সুস্পষ্ট। তার পেছনে সোভিয়েট-শক্তি আছে। রাষ্ট্রসংঘে যোগ দিলেই তারা স্ব-রাজ্য বাড়াবার চেষ্টা করবে, কম্যুনিজম প্রচার করতে থাকবে। ফলে এক বিরাট বিরোধিতার সৃষ্টি হবে—সে আশঙ্কাতেই চীনের রাষ্ট্রসংঘে যোগদান নিষিদ্ধ হয়েছে। কোরিয়ার যুদ্ধে তারা পদে-পদে সোভিয়েটকে অনুসরণ করেছে। প্রায় দেড় ঘণ্টা সময় তর্কটি চলেছিল। শেষ-পর্যন্ত চীনের সমর্থনকারিগণ ৮০—৩০ ভোটে জয়লাভ করেন। ১৬।১।১৯৫৪

বিশ্ব-যুব-সংঘের নেতা মিঃ আর্থার পাইক শান্তিনিকেতন পরিদর্শনকালে চীন-ভবনে একটি বক্তৃতা দেন। সভাটি সাহিত্যিকের তরফ থেকে অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় আশ্রমের ছাত্রগণ তো ছিলেনই, তা ছাড়া বোলপুর কলেজের ছাত্রগণও যোগদান করেন। শিক্ষাভবনের ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সন্তোষ বসু সভাপতির আসন গ্রহণ করবার পরে মিঃ আর্থার পাইক তাঁর ভাষণে বিশ্ব-যুব-সংঘের উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন। সেই সঙ্গে তাঁদের কাজকর্মের একটি বিশদ বিবরণও জানা যায়। ১৯৪৬ সালে এই সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। এর উদ্দেশ্য

—বিশ্বের ছাত্রদের মধ্যে একতা ও বন্ধুত্ব স্থাপন করা। প্রত্যেক দেশের যুব-সম্প্রদায়ের উপর সে দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। তাদের দায়িত্ব অনেক। যুব-সম্প্রদায় স্ব স্ব দেশের উন্নতি করবার চেষ্টায় রত আছেন। বেশ ভালভাবেই তাঁদের কাজ এগিয়ে চলেছে। বর্তমান সময়ে একদেশের ছাত্রদলের সঙ্গে অন্য দেশের ছাত্রদলের মিলন ঘটানো নিতান্ত প্রয়োজন। যুব-সম্মেলনে ছাত্রদের সুখ-সুবিধার কথাও আলোচিত হয়। তিনি আশা করেন আসন্ন কোপেনহেগেনের অধিবেশনে পৃথিবীর সকল দেশের ছাত্রসংঘের প্রতিনিধিগণ যোগ দেবেন। এই যুব-সংঘ অনেক সময় অনেক দেশের ছাত্রদের সাহায্য করেছে। একটা উদাহরণ হচ্ছে এই—ভারতবর্ষে অন্ধ্রদেশে যখন প্রবল বন্যা হয়েছিল, শত শত লোক ঘর-ছাড়া হল, তখন সেই দেশের যুবকগণ I. O. S.-কে সাহায্যদানের জন্য লিখলেন। সে প্রতিষ্ঠান তৎক্ষণাৎ অনেক ওষুধপত্র এবং অর্থ প্রেরণ করেছিল। কলকাতার Health Home-এ তারা ওষুধপত্র দিয়ে যথাযথ সাহায্য করেছে। সকল দেশের যুবক-সম্প্রদায়ের নিকট বক্তার এই একান্ত অনুরোধ যে, তাঁরা যেন এই যুব-সংঘকে বাঁচিয়ে রাখবার ভার নেন, তবেই এর শ্রীবৃদ্ধি আশা করা যায়।
৩০।১১।১৯৫৪

শান্তিনিকেতন, ১০ই নভেম্বর—এক মাস পূজাবকাশের পরে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-বিভাগগুলি ১লা নভেম্বর খুলে গেছে। খুলবার মুখে ক'দিন বৃষ্টি হয়ে শীত জমে উঠেছে। আশ্রম কর্মকোলাহলে পরিপূর্ণ। ৮রা নভেম্বর সান্ধ্য-বিনোদন-পর্বে চীন-ভবনের হলে পরলোকগত কবি জীবনানন্দ দাশের স্মরণে একটি সভা অনুষ্ঠিত হল। শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাটিতে মুখ্যত কবি জীবনানন্দের রচনাবলী পাঠ করলেন ছাত্র-ছাত্রী অধ্যাপক ও কর্মিগণ। শ্রীযুক্তা লীলা রায় কর্তৃক অনূদিত জীবনানন্দের তিন চারটি কবিতার ইংরেজি অনুবাদও পঠিত হল। 'ফুটপাথ' কবিতাটি পাঠের পূর্বে অধ্যাপক অশোকবিজয় রাহা বলেন—একদিন বৃষ্টিঝরা নিশীথে কলকাতার ট্রাম-লাইনের উপর দিয়ে চলতে চলতে ভাববিভোর হয়ে তিনি এ কবিতাটি লিখেছিলেন, সে-ই ট্রাম-লাইনের উপরেই দুর্ঘটনায় পতিত হয়ে তাঁকে ইহলোক ত্যাগ করতে হল। তারপরে কবির প্রতিভা আলোচনা করে শ্রীযুক্ত রাহা বলেন—একজন ইংরেজ বলেছেন—
A great poet is the Master-piece of Nature whom another not only ought to study but must study.

কবিদের সম্বন্ধে এর চেয়ে সুন্দরতর ও সংক্ষিপ্ততর কথা আর হতে পারে না।

শুধু বড় কবি নয়, যে-কোনো সার্থক কবি ও স্রষ্টা সম্বন্ধেই এ কথা বলা যায়। বিশ্বে পাহাড়-পর্বত, ফুল-ফল জল-স্থলে কত Master-piece of Nature অহরহ দেখতে পাওয়া যায়। বিশ্বসৃষ্টির মূল উৎস কোথায় আমরা তা জানিনে; কিন্তু কবির মধ্যে যে সৃষ্টি উৎসারিত হয়ে ওঠে, সমস্ত বিশ্ব-প্রকৃতির রহস্য তার মধ্যে নিহিত থাকে; সে সৃষ্টি যতটুকুই প্রকাশ পাক্ না কেন ততটুকুতেই সে সার্থক। কবি জীবনানন্দ দাশ খুব বেশি-কিছু লেখেন নি, লিখতে চেষ্টাও করেননি। কবিতার মধ্যেই নিজেকে আবদ্ধ রেখেছিলেন, কিন্তু যে টুকু প্রকাশ করেছেন তার মধ্যেই তাঁর সার্থকতা লাভ হয়েছে। তাঁর নিজের একটি দৃষ্টিভঙ্গি ছিল; রবীন্দ্রনাথের 'বসুন্ধরা' কবিতার দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে তার মিল দেখা যায়। মানুষ সেই কবে থেকে সব-কিছুর মধ্য দিয়ে কত-কিছু দেখতে দেখতে অনুভব করতে করতে চলে আসছে, বর্তমানে সে বেঁচে আছে, প্রতিটি পলের সুখ-দুঃখ সে দেখছে, উপলব্ধি করছে এবং ভবিষ্যতেও সে কত কী হবে কত কী দেখবে—এভাবে জন্ম-জন্মান্তরের মধ্যে সে এগিয়ে চলেছে—জীবনানন্দের দৃষ্টিতে চেতনায় সেই অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এক হয়ে মিশে প্রকাশ পেয়েছিল কবিতায়। তিনি ব্যবিলন, আসীরিয়া প্রভৃতি সভ্যতা ও সৌন্দর্যকে যেমন প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করেছেন, তেমনি বর্তমানের ভালোমন্দ দুঃখদ্বন্দ্বকে দেখেছেন, আবার ভবিষ্যতের গভীর আশ্বাস ধ্বনিত হয়েছে তাঁর লেখায়।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর ভাষণে বলেন—জীবনানন্দ দাশ এমন একজন কবি যাঁর জীবন সম্বন্ধে আমরা খুব বেশি কিছু জানিনে। কবির জীবনী পাঠ করে কবিকে জেনে তাঁর বিভিন্ন অবস্থার উপলব্ধিগত কাব্যকে আমরা সম্যক বুঝতে চেষ্টা করি। অনেক সময় সে বোঝাটা খুব সত্য বোঝা হয় না। কবিকে ব্যক্তিগত জীবনে না জেনেও তাঁর কাব্যের যে রসাস্বাদন করা যায় সে আস্বাদনই প্রকৃত। জীবনানন্দ দাশের কবিতা আমরা সে রস পেয়েই পাঠ করি। এক সময় তাঁর কবিতা খুবই উপহসিত হয়েছিল, লোকে তাঁকে ঠিকমতো বুঝতে পারত না। এখন আমাদের কাছে তিনি অনেক সহজবোধ্য। তাঁকে না বুঝতে পারার কারণ এই যে, তিনি চমকপ্রদ কিছু করতে চান নি, না ভাষায়, না ভাবে, না ছন্দে, না চাতুর্যে। মুহূর্তের যে চেতনা যে অনুভূতি তাঁকে গভীরভাবে আলোড়িত করত, সেটিকেই তিনি বহুক্ষণ ধরে ধীরে ধীরে উপলব্ধি করতে যেন ভালবাসতেন। তাই তাঁর অনেক কবিতার মধ্যেই একই শব্দ একই ভাব বারে বারে বেজেছে; একই সুর ও ছন্দ ধীর-মন্থর গতিতে বয়ে চলেছে। কিন্তু তাই বলে তাঁর যে

শব্দচয়ন ছিল না তা নয়; স্বরের গভীরতা ফুটে না উঠত তাও নয়; ওই ছিল তাঁর কবিতার একটা ভঙ্গি। কবি ইয়েট্স্‌-এর সঙ্গে তাঁর অনেকটা তুলনা করা চলে। কেউ বলেন, তিনি যোদ্ধা কবি, কেউ বা বলেন বিষাদের কবি। যোদ্ধা তাঁকে বলা যায় না, বরঞ্চ তাঁকে বলতে হয় প্রেমিক কবি,—অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ—নিকট ও দূর সবকিছুর উপর যাঁর প্রেমের দৃষ্টি বিস্তৃত ছিল, সবকিছুকে তিনি চেতনার মধ্যে পেয়েছিলেন। এদিক থেকে আধুনিক-কবি শব্দটা যে-অর্থে আজকাল ব্যবহৃত হচ্ছে, তিনি তাও নন। সনাতন-কবিদেরই অন্যতম তিনি বললে বোধ-হয় ভুল হয় না। তিনি বিষাদের কবিও নন। তাঁর কবিতায় বিষাদের যে-সুর বেজে উঠেছে, সে-বিষাদ সৌন্দর্যকে প্রগাঢ়ভাবে উপলব্ধির বিষাদ, সৌন্দর্য-উপলব্ধির সঙ্গে সেটা ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। নানাজনে বিভিন্ন দৃষ্টিতে তাঁকে বিচার করবেন, তবে সহৃদয়-চিত্তে তাঁর কবিতা পাঠ করলে তাঁকে বোঝা কঠিন হয় না। ১২।১১।১৯৫৪

১০ই ডিসেম্বর সন্ধ্যা-উপাসনার পরে সিংহসদনে মানবাধিকার-দিবস পালন করা হয়। ঐ উপলক্ষে একটি বিশেষ প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সভাটিতে টমাস-বাটা-অধ্যাপক ডঃ করুণাময় মুখোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন। প্রথমে ইন্দোনেশিয়াবাসী শিক্ষাভবনের ছাত্র এস্‌ জয়শীলন মানবাধিকার-সম্বন্ধে কতকগুলি শর্ত পাঠ করেন। শিক্ষা-ভবনের অর্থনীতির অধ্যাপক শ্রীসুশীলচন্দ্র সাহা মানবাধিকারের উৎপত্তি সময় ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। এর পর শ্রীসুশীল সাহা সেই শর্তগুলি এবং সেগুলি কিভাবে সমাজনীতি, অর্থনীতি ও রাজনীতির উপর ভিত্তি করে রচিত হয় তার বিবরণ দেন।

বিদ্যাভবনের অধ্যাপক ডঃ সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য মানবাধিকারের দার্শনিক ব্যাখ্যা করে মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন।

সেদিনকার সভাপতি ডঃ মুখার্জির বক্তব্যটি গভীরভাবে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করে। তিনি বলেন—আমরা আজ মানবাধিকার-দিবস পালন করছি। ভারতে ও পৃথিবীর অন্যান্য বহু জায়গায় এদিনটি পালিত হচ্ছে, কিন্তু দেখতে হবে, এভাবে শর্ত রচনা করে সভাসমিতি করে আমরা কতটা লাভবান হয়েছি। পৃথিবীর মধ্যে অধিকাংশ দেশেই এ নিয়মগুলি তেমনভাবে পালিত হয়নি,—বললে বোধ হয় ভুল বলা হয় না। এ নিয়ম যেন কতকটা মাথা-নেই মাথা-ব্যথার মতো। শর্তের প্রথমেই আছে—জীবন-ধারণের অধিকার; কিন্তু প্রাণই যদি না থাকে তো শর্ত দিয়ে কী হবে! বাঁচবার সমস্যাই সব দেশে প্রবল হয়ে উঠেছে। নিজেদের দেশেই

নানা বিশৃঙ্খলার বিপত্তিতে বেঁচে থাকতে পারছিনে, তার উপরে অন্য দেশের আক্রমণ-আশঙ্কা সারাক্ষণ সঙীন উঁচিয়ে আছে। যে সব দেশে পদে-পদে প্রাণনাশের সম্ভাবনা, কেমন করে সে-সব দেশে এই মানবাধিকার শর্তগুলি পালিত হবে? ওদিকে উত্তর কোরিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, চীন, ফরমোসা ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশ নিয়ে যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ আসন্ন হয়ে উঠেছে! সেখানে কোথায় পড়ে রইল এই সব শর্ত! অযথা কতকগুলি নিয়ম রচনা করে, বড় বড় বুলি আউড়িয়ে এত আড়ম্বরের প্রয়োজন কী? আজ পৃথিবীতে শান্তি ছাড়া কোনো সমস্যার সমাধানই হতে পারে না। এ বিষয়ে শ্রীজওহরলাল নেহরু সজাগ হয়ে শর্ত পালনের চেষ্টায় ব্রতী আছেন। আমরা এই ক্ষুদ্র জায়গায় থেকে প্রত্যেকে এ উপলক্ষে এই সংকল্পই গ্রহণ করতে পারি যে, শান্তি সকলের কাম্য, নিজেদের জীবনে সেই জিনিসটাই পালন করবার দিকে একান্তভাবে আমরা লক্ষ্য রেখে চলব। ২০।১২।১৯৫৪

গত ১৯শে জানুয়ারি সকাল ন'টার সময় আশ্রমবাসিগণ আম্রকুঞ্জে চীনা-সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদলকে সাদর সম্বর্ধনা জানান। দুটি গান হল—'সবারে করি আহ্বান' এবং 'বিশ্ববিদ্যা-তীর্থপ্রাঙ্গণ করো মহোজ্জ্বল আজ হে'। বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে বিশ্বভারতীর আচার্য জওহরলাল নেহরুর প্রতিনিধি হিসাবে উপাচার্য ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী চীনা-প্রতিনিধিদলের অধিনেতার হাতে দুটি অপূর্ব চিত্র উপহার দেন। চিত্র দুটি শিল্পাচার্য ডঃ নন্দলাল বসুর আঁকা। উপাচার্য তাঁর ভাষণে চীনা-প্রতিনিধিদলকে স্বাগত জানিয়ে বলেন,—ভারতের সঙ্গে চীনের যে প্রাচীন সাংস্কৃতিক যোগ ছিল, তার মূল্য রবীন্দ্রনাথ সবিশেষ উপলব্ধি করেছিলেন। ১৯২৪ সালে তিনি চীন-বন্ধুদের সাদর আমন্ত্রণে সে দেশ পরিভ্রমণ করেন। সেই থেকে চীনের সঙ্গে এই আশ্রমের সৌহার্দ্য আরো ঘনিষ্ঠ হল। ১৯৩৭ সনে ভারতবর্ষের মধ্যে বিশ্ব-ভারতীতেই প্রথম চীন-ভারত সাংস্কৃতিক গবেষণা-বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তখন হতে চীন থেকে বিশ্বভারতীতে অনেক বিদ্যার্থী এসেছেন, এখান থেকেও কয়েকজন ওদেশে গিয়েছেন। কয়েকজন বিশিষ্ট চৈনিক এখানে কাজে লিপ্ত থেকে চীন-ভবনের উন্নতিসাধন করতে চেষ্টিত আছেন।

এরপরে তিনি রবীন্দ্রনাথের আদর্শটির কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করে বলেন,—বিশ্ব-ভারতী আজ বিশ্ববাসীর জ্ঞান ও সংস্কৃতির মিলনস্থল। তেমনি এশিয়াবাসীর পরস্পরের সংস্কৃতির আদান-প্রদানেরও ক্ষেত্র। চীনের সঙ্গে সংযোগ প্রসারের ফলে সে সংস্কৃতি বৃহত্তর রূপ নেবে এই আশা করা যায়।

উপাচার্যের ইংরেজী ভাষণটি সঙ্গে সঙ্গে চীনা-ভাষায় অনুবাদ করে শোনান চী

ভবনের গবেষণারত মহীশূর-অধিবাসী অধ্যাপক মিঃ ভেঙ্কটরমন। চীনা-সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদলের অধিনায়ক নিজেদের ভাষায় প্রীতি-সম্ভাষণ পাঠ করেন এবং দলের একজন চৈনিক তা ইংরেজীতে অনুবাদ করে শোনান। অধিনায়ক আশ্রমবাসীদের ও উপাচার্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন,—রবীন্দ্রনাথকে আমরা শুধু কবি বলেই জানিনে, যদিও তাঁর বহু কবিতা চীন-ভাষায় পড়া হয়ে থাকে। তাঁকে আমরা কবি বলে যত শ্রদ্ধা করি ততটাই সম্মান করি স্বাধীনতার প্রেমিক ও সেই সঙ্গে স্বদেশ এবং সংস্কৃতিরও অনুরাগী ব'লে।

আম্রকুঞ্জের অনুষ্ঠানের পর চীনা-প্রতিনিধিদল আশ্রমের নানা বিভাগ ঘুরে দেখেন। তাঁদের জন্য কলাভবনে বিশেষ একটা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছিল। সন্ধ্যা ৬টার সময় সংগীত-ভবনে তাঁদের দক্ষিণ-ভারতের কথাকলি-নৃত্য ও 'শ্যামা' অভিনয়টি দেখানো হল। কথাকলি নৃত্যে ও তামিল গানের সাহায্যে কালিদাসের কুমারসম্ভবের শেষ-দৃশ্যটি ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল—উমার তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে শিব এলেন বৃদ্ধবেশে এবং উমাকে পরীক্ষা করবার উদ্দেশ্যে শিবের নিন্দা শোনাতে লাগলেন। কিন্তু উমার একনিষ্ঠ প্রেম তাতে একটুও ক্ষুণ্ণ হল না। তখন শিব প্রীত হয়ে নিজের বেশ ধারণ করে উমার বরমাল্য গ্রহণ করলেন। এই নৃত্য ও গান অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। 'শ্যামা' নাটকটিও সেদিন সবার খুবই ভাল লেগেছে।

আশ্রমবাসীদের অনুরোধে চীনা-সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদলের কয়েকজন 'শ্যামা' অভিনয়ের পরে কিছু গান ও বাজনা শোনালেন। তার মধ্যে দু'তিনটি ছিল চীন-দেশীয় গান, একটি ছিল গুরুদেবের 'ধীরে ধীরে বও ওগো উতল হাওয়া', একটি ছিল বাংলাদেশের বিয়ের গান এবং একটি হল 'হিন্দী-চীনী ভাই ভাই'। বাজনার মধ্যে ছিল চীনদেশের বাঁশের বাঁশী ও বীণা-জাতীয় একটি যন্ত্র। নিজেদের নাচের পোশাক-পরিচ্ছদ তাঁরা এখানে নিয়ে আসেন নি, তাই এখান থেকে পোশাক নিয়ে তাঁরা সদ্য-শেখা ভারতীয় দুটি নৃত্য দেখালেন—একটি তার একক কথাকলি ও আরেকটি চারজনের দলবদ্ধভাবে দক্ষিণ ভারতীয় লোকনৃত্য। দুটি নাচই বিস্মিত দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করেছে। বিশেষভাবে লক্ষণীয় ছিল যে, কত সহজ ছন্দে ও আনন্দে তাঁরা সম্পূর্ণ বিদেশী-নৃত্য এত অল্পসময়ের মধ্যে আয়ত্ত করে নিয়ে দেখাতে পেরেছেন, নূতন জিনিস আহরণ করে নেবার তাঁদের কী আগ্রহ! জ্ঞান ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এইরকম শিক্ষার প্রচেষ্টা ও অনুসন্ধিৎসা আমাদের বিশেষভাবে শিক্ষণীয়। ২৭।১।১৯৫৫

২৬শে ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যার পরে প্রসিদ্ধ ভাষাশিক্ষাবিদ্ প্রফেসর গ্যাটেনবি চীন-

ভবনে আশ্রমবাসীদের কাছে বিদেশী ভাষা শিক্ষা দেওয়া সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন। তিনি বিশেষভাবে ইংরেজি শিক্ষাদানের পদ্ধতি সম্বন্ধেই আলোচনা করেন। তিনি বলেন, একটি ভাষা যদি সঠিক প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া যায়, তবে সেই ধারাতেই অন্য যে-কোনো ভাষাও শিক্ষা দেওয়া সম্ভব। শিক্ষা-পদ্ধতিতে স্বাভাবিক প্রণালীর (Natural way of teaching) উপরই প্রফেসর গ্যাটেনবি জোর দেন এবং শিক্ষার্থীদের শব্দসম্ভার চয়নের প্রয়োজনীয়তার কথা বহুবার বলেন। প্রাথমিক শিক্ষাকালেও শিক্ষার্থীকে ছ'সাত বছর বয়স থেকে দশ-বারো বছরের মধ্যে অন্যূন-পক্ষে দু'হাজার-আড়াই হাজার শব্দ ভালোমতে শিখে নিতে হবে। শব্দ শেখা মানে শব্দ মুখস্থ নয়, তার সঠিক সহজ ব্যবহার করতে জানা। শব্দগুলি শিখতে হবে বাক্য-গঠনমূলকভাবে। অর্থাৎ যখনই কোনো শিশু একটা নূতন-কিছুর নাম জানতে চাইবে তাকে কর্তা, ক্রিয়া, কর্ম-যোগে পুরোপুরি বাক্য দিয়ে সে-শব্দটি বলতে হবে। যেমন ছবি দেখে যদি শিশু বলে—এটা কী? উত্তর হবে শুধু "ছবি" এ নয়, বলতে হবে "এটা হচ্ছে একটি ছবি।" কিংবা একটি আপেল ফলের নাম বলার কালে বলতে হবে—"এটি হচ্ছে একটি আপেল ফল।" তাতে শিশু শব্দটি তো জানবেই, শব্দের ব্যবহারও জানবে। শিশু ভাষা-শেখবার কালে একসঙ্গে অনেকগুলি শব্দ শেখে, একটা-একটা করে শেখে না, তাতে আনন্দও পায় না। মাতৃভাষাও সে এমনিভাবেই আয়ত্ত করে। শুনতে-শুনতে বলতে-বলতে সে ভাষা শেখে, ভাষা জানে, ব্যবহার করে এবং ব্যবহার করতে করতেই তার ভাষার ভুল আপনি সংশোধন হয়ে যায়। বিদেশী ভাষাও সে-ভাবেই শ্রুতি দ্বারা শিক্ষা দেওয়া বাঞ্ছনীয়। একসঙ্গে অনেকগুলো ভাষাও শিশু অনায়াসে শিখতে পারে তাতে তার কষ্ট হয় না। শেখানোর জবরদস্তিতেই তার শিখতে অনিচ্ছা জাগে, স্বাভাবিকভাবে শিক্ষা দিলে তার কোনো কষ্ট হয় না। প্রফেসর গ্যাটেনবি এমন কথাও বলেন যে, কিণ্ডারগার্টেন স্কুলে প্রতিদিন ঘণ্টাতিনেক ক'রে যদি ইংরেজি শোনানো এবং শেখানো যায়, তবে এক বছরে পাঁচ-সাত বছরের একটি ভারতীয় ছেলে বা মেয়ে ইংলণ্ডের ওই-বয়সী একটি ছেলে বা মেয়ের মতোই ইংরেজি বলতে ও লিখতে সমর্থ হয়,—এ একেবারে পরীক্ষিত সত্য। ভালো শিক্ষক ও শিক্ষার প্রণালীর প্রতি গ্যাটেনবি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। খুব পাকাভাবে পরদেশী ভাষা না জেনে শিক্ষা দেওয়া উচিত নয়। তাতে ঠিকমতো শব্দোচ্চারণ, সুষ্ঠু শব্দপ্রয়োগ, শুদ্ধ বাক্য-গঠন-রীতি শিক্ষা দেওয়া যায় না, বা শব্দের সঙ্গে তার ঐতিহাসিক তথ্যও পরিবেশন করা সম্ভব হয় না। শিক্ষার্থীদের তিন

ভাগে ভাগ করে গ্যাটেনবি বলেন যে, দশ-বারো বছর বয়সের প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের শ্রুতিপথে শিক্ষা দেওয়া সহজ; তৃতীয়ভাগের শিক্ষার্থী সতেরো বছরের পরে বুদ্ধিপ্রবণ হয়ে ওঠে, তারা তখন নিজের যুক্তি-তর্ক প্রয়োগ করেই ভাষা শিখতে পারে। কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষা (Secondary education) দেওয়াই সব থেকে কঠিন। তখনই প্রকৃতপক্ষে স্কুলে শিক্ষা দেবার সময়। সে জন্যেই ভাল শিক্ষক ও উপযুক্ত শিক্ষা-প্রণালী না হলে শিক্ষাকার্য ব্যর্থ হতে বাধ্য। গ্যাটেনবি ভাল শিক্ষকের শিক্ষাদানের আনন্দের একটি উদাহরণ বলেন এবং শিক্ষকের দায়িত্ব এবং শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করেন।

দেশী ও বিদেশী ভাষা শিক্ষা দেওয়া সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথও বহু জায়গায় বহু আলোচনা করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর 'ইংরেজি সোপান', 'ইংরেজি শ্রুতিশিক্ষা,' 'অনুবাদ চর্চা' প্রভৃতি গ্রন্থের ভূমিকাগুলি বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। প্রফেসর গ্যাটেনবি সাধারণভাবে শিশুদের সহজাত শিক্ষা-প্রবণতার উপর তাঁর একান্ত বিশ্বাসের কথা জানান। তিনি দীর্ঘদিন এ বিষয়ে পরীক্ষাকার্যে নিযুক্ত রয়েছেন। দেখা যায় ভাষা-শিক্ষাদান-কার্যে বেশী দিন নিযুক্ত না থেকেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিন্তা দিয়ে ও হৃদয়ের সহানুভূতি দিয়ে শিশুদের শিক্ষাদানের প্রকৃত তথ্যটি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। 'ভগিনী নিবেদিতা' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন—"যাঁহারা ভাল শিক্ষক তাঁহারা সকলেই জানেন শিশুর স্বভাবের মধ্যেই প্রকৃতি একটি শিক্ষা করিবার সহজ প্রবৃত্তি নিহিত করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন; শিশুদের চঞ্চলতা, অস্থির কৌতূহল, তাহাদের খেলাধুলা সমস্তই শিক্ষা-প্রণালী।"

* * *

১লা মার্চ মঙ্গলবার পাঠ-ভবনের মধ্য-বিভাগের সাহিত্য-সভায় শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতি হন। সভার শেষে তিনি গুরুদেবের শিক্ষাপ্রণালী ও আমাদের দেশের আগেকার শিক্ষাধারার পার্থক্যের কথা বলেন এবং নিজের অভিজ্ঞতার উল্লেখ করেন। ১৯৩০ সনে তিনি গুরুদেবের সঙ্গে মস্কো গিয়েছিলেন। সেখানে ছোট ছেলেমেয়েরা খুব সহজেই গুরুদেবের সঙ্গে মিশেছিল। এক সভায় তারা গুরুদেবকে গান গাইতে বললে। গুরুদেব "জন-গণ-মন" গানটি গাইলেন; বললেন—এবার তোমরা একটি অভিনয় দেখাও। তারা অমনি উঠে দাঁড়াল। নিজেরাই গোল হয়ে দাঁড়িয়ে একটা এঞ্জিন তৈরি করলে, চোঙ করলে, চাকা করলে, মুখে হুস হুস শব্দ করতে লাগল, টর্চ জ্বালিয়ে আগুন দেখাল। ছোট্ট একটি মজার অভিনয় হয়ে গেল। গুরুদেব যে কী খুশীই হলেন সে আর কী বলব। ছোটদের একটি থিয়েটার-হলে

গুরুদেব অভিনয় দেখতে গেলেন; সেখানে চমৎকার একটি নাটক দেখানো হল। ঘটনাটি হচ্ছে এই,—আফ্রিকার এক চাষী-পরিবার। তাদের একটি ছোট ছেলে ও তার পোষা একটি বাঁদর ছিল। এক সময় পরিবারটি অত্যন্ত দুরবস্থায় পড়ল, তাদের খাবারও জোটে না এমনি অবস্থা। দায়ে-প'ড়ে বানরটিকে বিক্রি করতে হল। ছোট ছেলেটির কী কান্না। বানরটিও কি তাকে ছেড়ে যেতে চায়! কয়েক বছর কেটে গেল। চাষী-পরিবারটি অনেক কষ্টে নিজেদের অবস্থার কিছু পরিবর্তন করলে। ছেলেটিও কিছু বড় হয়েছে। একদিন সে তার মা-বাবার সঙ্গে এক সার্কাস দেখতে গিয়েছে। সেখানে সে দেখে, তার সেই পোষা বাঁদরটিই খেলা দেখাচ্ছে। ছেলেটি তো চিৎকার ক'রে লাফিয়ে উঠল। বাঁদরটিও তাকে দেখে চিনতে পারল, ঝাঁপিয়ে এসে পড়ল তার কোলে। দুজনের তখন কী আনন্দ! এই হল ঘটনা, লিখেছে একটি স্কুলের ছোট্ট ছেলে। সে অভিনয়টি ছোটরাই করল কিন্তু এমন প্রশংসা পেল যে, বড় বড় অভিনেতারা অবধি সে নাটকটি অভিনয় করতে লাগল। দেশময় সে নাটকটি ছড়িয়ে পড়ল। গুরুদেব সানন্দে বলেছিলেন—ওরে, এই হচ্ছে শিক্ষার প্রকৃত পথ। এমনিভাবেই তো ছোটরা ছোটদের মনের কথা, প্রাণের আনন্দ প্রকাশ করবে। ছোটদের চোখ দিয়েই তার রস গ্রহণ করতে হবে, বড়দের পাকা নীরস দৃষ্টি দিয়ে তার যাচাই নয়। তাদের মনের ভাবের প্রকাশটাই বড় কথা।

শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সেদিনকার সাহিত্য-সভার গান শুনে খুশী হয়ে বলেন—কলকাতার বহু সভা-সমিতিতে আমি যাই। ছোট ছোট শিশুরাও দেখি মাইকের সামনে গান করতে বসে, যন্ত্র বাদ দিয়ে গলা তাদের আর খোলে না। যন্ত্রের গান শুনে শুনে গানের প্রকৃত রসটি পাওয়া দুর্লভ হয়ে উঠেছে। এখানে এই তো কেমন সুন্দর যন্ত্রহীন পরিষ্কার গলার প্রাণখোলা গান শোনা গেল, প্রাণ ভরে উঠল। এই তো সত্যিকার গান। ১০।৩।১৯৫৫

মহাত্মাজী 'সর্বোদয়-সমাজে'র পরিকল্পনা করে গেছেন। 'ভূদান যজ্ঞ' এই পরিকল্পনারই একটি আনুষঙ্গিক কার্যক্রম। সেই কাজটিকে মহাত্মাজীর উপযুক্ত শিষ্য শ্রীযুক্ত বিনোবা ভাবে বর্তমানে তাঁর জীবনের অন্যতম ব্রতরূপে গ্রহণ করেছেন এবং সেটি সাধন করতে আপ্রাণ চেষ্টায় অনুক্ষণ নিরত আছেন। বিনোবাজী বাংলাদেশে মাত্র মেদিনীপুর জেলায় এসেছিলেন,—বাংলার অন্যান্য জেলায় এ আন্দোলন সফল করবার দায়িত্ব বিশিষ্ট কর্মীদের উপর ন্যস্ত করেছেন। শ্রীমতী আশা আর্যনায়কম্ বিশ্ব-ভারতীর প্রাক্তন কর্মী। রবীন্দ্রনাথের

সমক্ষে 'উত্তরায়ণে' আশ্রমের তৎকালীন কর্মী শ্রীযুক্ত আর্যনায়কমের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। তারপরে বহু বছর যাবত তাঁরা দুজনে সেবাগ্রামে মহাত্মাজীর একনিষ্ঠ সেবক-সেবিকারূপে কাজ করে আসছেন। বিনোবাজী সম্প্রতি শ্রীমতী আশা দেবীর উপরই বীরভূমে 'ভূদান'-আন্দোলন চালাবার ভার দিয়েছেন। ১১ই মার্চ সান্ধ্য-উপাসনার পরে আশা দেবী চীনভবনে আশ্রমবাসীদের কাছে ভূদান-আন্দোলনের তাৎপর্য আলোচনা করেন। মানবসমাজে ধনের অসাম্য, মনের ব্যবধান, সমাজ-ব্যবস্থার তারতম্য দূর ক'রে সাম্য স্থাপনের চেষ্টাই এই আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য। মহাত্মাজী বিশ্বাস করতেন 'সর্বোদয়-সমাজ' একদিন স্থাপিত হবে এবং তাতে শুধু ভারতে নয়, সমস্ত বিশ্বেই মানুষের মধ্যে ঐক্য আনা সম্ভব হবে। 'সম্পত্তিদান', 'সেবাদান', 'শ্রমদান', 'বিদ্যাদান' প্রভৃতি সবই এই ভূদান-আন্দোলনের অন্তর্গত; এ সবই 'সর্বোদয়-সমাজ' গঠনের পূর্ববর্তী কার্যাবলী। যাঁদের ভূ-সম্পত্তি নেই, তাঁরা অর্থ, জিনিসপত্র বা শ্রম দান করবেন,—পারস্পরিক সাহায্যে পরস্পরের অভাব দূর ক'রে যাতে সমাজের সবাই একদিন সমস্তরে উন্নীত হতে পারে। আশা দেবী বলেন—মহর্ষিদেবের ও রবীন্দ্রনাথের সাধনার পুণ্যস্থল থেকেই বীরভূমে বিনোবাজী তাঁর ব্রত আরম্ভ করবার অনুরোধ জানিয়েছেন। আজ সেই ব্রতের উদ্বোধন হল। প্রচারকার্যের কেন্দ্র খুলে অচিরেই পরিক্রমা শুরু হবে।

আশা দেবী আশ্রমের ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপক, কর্মী সকলের কাছে আবেদন জানান,—তাঁরা যেন অবসরসময়ে এক মাসের জন্য হোক, এক সপ্তাহের জন্য হোক তাঁদের সেবা, শ্রম, বিদ্যা প্রভৃতি যথাসম্ভব এ কার্যে দান করেন। ২৪।৩।১৯৫৫

আন্তর্জাতিক মৈত্রী-বন্ধনে বদ্ধ হয়ে মানুষ সহ-অবস্থান করবে, না পরস্পরের ধ্বংসসাধন করে সে প্রলয়ের কাছে নতি স্বীকার করবে—আজকের সমস্ত বিশ্বে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নই নানাভাবে ধ্বনিত হচ্ছে। দ্বিতীয় মহাসমরের পরিশেষে মানুষের মনে শান্তির ধারণা বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে। মনে হচ্ছে শয়তানের হাতে মনুষ্যত্বের পরাভব আজ আর বুঝি কোনো প্রতিরোধই মানবে না। প্রলয়, না, বিরুদ্ধ ও জটিল পরিস্থিতিতেও মানবের সহ-অবস্থান?—গত ১৩ই এপ্রিল বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয়-গ্রন্থাগারের বারান্দায় এই নিয়ে একটি বিতর্ক-সভা অনুষ্ঠিত হল। বিষয়বস্তু ছিল—

The only alternative of co-existence is co-destruction.

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এ সভায় কলকাতা

বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী-সংসদের পক্ষ থেকে পাঁচজন ছাত্র ও একজন ছাত্রী প্রতিনিধিস্বরূপ যোগদান করেন। সভাটি প্রতিযোগিতামূলক ছিল না। দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদল মিলে দুটি পক্ষ গঠিত হয়েছিল। অধ্যাপক ডঃ সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং অধ্যাপক ডঃ করুণাময় মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন বিচারক ধার্য হন।

এক-এক বক্তা তাঁদের নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে সাত মিনিটকাল বলবার সুযোগ পেয়েছেন এবং এই অল্প সময়ের মধ্যে বিষয়টিকে ঐতিহাসিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করেছেন। বিতর্ক একটি শিক্ষণীয় বিজ্ঞান। এর যা বিশেষত্ব, যা কলাকৌশল তা ভালোমতো আয়ত্তে না থাকলে বিতর্ক জমে উঠে না। বিতর্কে প্রতিযোগী-মনোভাব কিংবা উচ্ছ্বাস সম্পূর্ণভাবে বর্জনীয়; কুটতর্কের অবতারণাও এতে নিষিদ্ধ, বাগ্মিতা প্রদর্শনের সুযোগও এতে বিশেষ নেই। নির্বাচিত বিষয়টি নিয়ে পক্ষবিপক্ষ বিচার করে যুক্তিযুক্তভাবে সরস করে বলতে পারার ক্ষমতাই এখানে বিশেষরূপে বিচার্য। বিচারকের রায় দিতে উঠে ডঃ করুণাময় মুখোপাধ্যায় বিতর্কের নিয়ম কিছু বুঝিয়ে দেন এবং সেদিক থেকে যাচাই করে সেদিনকার সভায় বারজন বক্তার মধ্যে চারজন বক্তা পারদর্শী বলে বিবেচিত হন—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন ছাত্র ও একজন ছাত্রী এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন নিগ্রো ছাত্র ওখেলো। সভাপতির ভাষণে সভাপতিমশায় সহ-অবস্থানের পক্ষে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেন এবং দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে এই যে একটি যোগ স্থাপিত হল এজন্য আনন্দ প্রকাশ করেন।

সেদিনকার সভাতেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-সম্মেলনের পক্ষ থেকে বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রীদের অনুরূপ বিতর্ক-সভায় যোগদানের আমন্ত্রণ জানানো হল। ২৩।৪।১৯৫৫

সাংস্কৃতিক-যোগ

আন্তর্জাতিক

"মানবসংসারে জ্ঞানালোকের দিয়ালি-উৎসব চলিতেছে। প্রত্যেক জাতি আপনার আলোটিকে বড়ো করিয়া জ্বালাইলে তবে সকলে মিলিয়া এই উৎসব সমাধা হইবে।"—রবীন্দ্রনাথ।

কিছুদিন আগে চীন থেকে আগত সাংস্কৃতিক অভিযাত্রীদলের সম্বর্ধনা হল আম্রকুঞ্জে। দলে যুবাই ছিলেন বেশী,—নবীন-চীনের উৎসাহদীপ্ত কর্ম-জীবনের প্রতিমূর্তি। এশিয়ার সংঘ-জীবন তাঁরা চান। বিশ্বভারতী শোনালেন তাঁদের "এশিয়ার আলো" বুদ্ধের সংঘ-জীবনের বাণী। তাঁরা শুরু করলেন,—যেখানে এসে বিশ্বভারতীর শেষ হল। একটি নাম শুধু শোনা গেল—'রবীন্দ্রনাথ'। শোনা গেল, এ-দেশে বিজ্ঞানের প্রসার আশাজনক, জানা গেল চেয়ারম্যান মাও-সে-তুং-এর বাণী—ভারতের লোক এবং ভারতীয় জাতি মহান্। ভারত ও চীনের একত্র হয়ে বন্ধুভাবে চলা দরকার। এ বন্ধুত্ব দুয়েরই আত্মোন্নতির সহায়ক। 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী' গান হল, শান্তি বচন শুনে তাঁরা বিদায় নিলেন। তাঁরা শুনিয়ে গেলেন দেশী ভাষা, বিশ্বভারতী শোনালেন ইংরেজী, তাঁরাও ছিলেন ইংরেজের সহযোগী,—পোশাকে, বিশ্বভারতীয়রা দেশীয় ছিলেন অভ্যর্থনায়।

বিশ্বভারতী 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্য দেখিয়ে তাঁদের বরণ করলেন। তাঁরাও প্রীতির বিনিময় করলেন শিল্পীদের এক-একটি লকেট্ দিয়ে, আকর্ষণীয় তার উপরকার ছোট্ট ছবিটি, সেটি সে-দেশের উদিত-সূর্য মাও-সে-তুং-এর প্রতিমূর্তি।

আশ্রমের বিভিন্ন কর্ম-বিভাগ তাঁরা ঘুরে দেখেন; শ্রীনিকেতনেও তাঁরা গিয়েছিলেন। কলা-ভবনের হ্যাভেল-হলে তাঁদের জন্য বিশেষভাবে একটি চিত্র-প্রদর্শনী খোলা হয়েছিল। এ-কথা সত্য, ভারত-সংস্কৃতির জ্ঞান ও শিল্প-সত্তাকে অখণ্ড একটি সামাজিক পরিবেশের মধ্যে দেখতে হলে আজ তার পক্ষে প্রশস্ত স্থল বিশ্বভারতী। সেদিকে 'মিশনে'র লক্ষ্য যতখানি ততখানি পরিমাণে তাঁদের এ-যাত্রা সফল হবারই কথা। ২৩।১২।১৯৫১

*   *   *   *

চীনাভবনে ডঃ ওয়াল্টার লিবেনথাল যোগদান করেছেন। প্রাচ্যবিদ্যায় এঁর আন্তর্জাতিক প্রসিদ্ধি রয়েছে। চীনদেশের বৌদ্ধধর্ম এবং চীন ও সংস্কৃত ভাষার চর্চায়

ইনি সুপণ্ডিত। বিশ বছর ইনি চীনে বাস করেছেন। পিকিং-বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন। বৌদ্ধ-দর্শনের বিভিন্ন শাখায় এঁর গবেষণামূলক বহু রচনাই আদৃত হয়েছে। বৌদ্ধ-ধ্যানবাদ নিয়ে এখন ইনি গবেষণা করছেন। গত ২রা নভেম্বর সন্ধ্যায় বিদ্যাভবনের কক্ষে তিনি "চৈনিক বৌদ্ধধর্ম" সম্বন্ধে তাঁর ধারাবাহিক বক্তৃতামালার উদ্বোধন করলেন। মনোজ্ঞ ভাষণটিতে নানা কথার মধ্যে তিনি বললেন, ভারতের বৌদ্ধমতের প্রভাব চীনদেশের অভ্যন্তরে এখনো খুবই অনুভব করা যায়। চীনাদের সাম্যবাদীদের মধ্যে নানাদিকে বহু পরিবর্তন হয়েছে। তা সত্বেও বৌদ্ধমতকে তারা যে উপেক্ষা করে নি, এ পরিচয়ও পাওয়া যায়। বক্তা আরো বললেন, রবীন্দ্রনাথ জার্মানীতে গিয়ে ১৯২৬ সালে যখন বক্তৃতা দেন, তখন সেই বিশেষ দিনে তিনিও সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। কক্ষের বারান্দা, গবাক্ষ-পথ ছাত্রদের ভীড়ে ভ'রে গিয়েছিল। কবির প্রতি লোকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁর মনে রয়েছে। তখনকার বর্ণনা দিয়ে তিনি বললেন, ভারত ও জার্মানীর সেই উদ্বোধিত সৌহার্দ্যকে স্থায়ী ক'রে যদি তখন থেকে দু'জাতি কাজে অগ্রসর হত, তবে জার্মানীর ইতিহাস হয়তো আজ অন্য রূপ গ্রহণ করত। বক্তা তাঁর বক্তৃতার মধ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রে কবিকে 'গুরুদেব' নামেই প্রতিবার উল্লেখ করেন।

বিদ্যাভবনে আরেকজন বিদেশী অধ্যাপকের আগমন ঘটল। ফরাসী ও জার্মান ভাষা শেখবার জন্য নভেম্বর থেকে নিযুক্ত হলেন ডঃ পল হর্স। জাতিতে ইনি সুইস্। ভারতীয় সভ্যতা ও ঐতিহ্যের প্রতি ইনিও বিশেষ অনুরক্ত। সংস্কৃত ও ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনি অধ্যয়ন করেন; শঙ্করাচার্যের মতের বিশেষ-বিশেষ দিক নিয়ে গবেষণা ক'রে ইনি কৃতবিদ্য হয়েছেন। ইতিপূর্বে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্ব-বিভাগে ইনি গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন। বিশ্বভারতীর নানা বিভাগের ছাত্র ও কর্মীগণের জন্য ফরাসী ভাষায় প্রাথমিক পাঠের ব্যবস্থা এঁর পরিচালনায় শুরু হয়েছে।

চীনা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চার জন্য অধ্যাপনা চলছে চীনাভবনে। তেহারাণ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এসেছেন মিঃ হাউস্মণ্ড ফাথ্ আজম। তিনি বিদ্যাভবনে পারসী-ভাষা শেখাচ্ছেন।

শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় মহাশয়ের বাসায় মাঝে মাঝে সাহিত্য-বাসরের আয়োজন হয়ে থাকে। বিদেশী সাহিত্য-মহারথীদের রচনা সম্পর্কে তাতে যেমন গভীর আলোচনা চলে, তেমনি চলে দেশের লোক-সাহিত্যেরও রসাস্বাদন। গত ২২শে অক্টোবরের অধিবেশনে ইংরেজি ও চৈনিক কাব্য-চর্চার সঙ্গে মধ্য-ভারতের লোক-

সাহিত্যের সংগ্রহ থেকে অনূদিত নানা অংশ পঠিত হয়। রাম মাঝি নামক স্থানীয় একজন সাঁওতাল তাদের নিজেদের শ্রেণীর কতকগুলি গাথা আবৃত্তি করে শোনায়। ৫ই নভেম্বরের অধিবেশনে অধ্যাপক তান-য়ুন-সেন চৈনিক দার্শনিকদের রচনার উদ্ধৃতিযোগে চৈনিক কবিতা সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন; তিনি কতকগুলি স্বরচিত কবিতাও সকলকে পড়ে শোনান। ১২ই নভেম্বর মিঃ রসিস গোভেন তুরস্কের বিদ্রোহ সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধে কামাল .অ' তাতুর্কের কার্যকলাপ ' ।লোচনা করেন।

* * *

বিশ্বভারতী স্টকহলমের নোবেল ইনস্টিটিউট-লাইব্রেরিতে সম্প্রতি এক সেট রবীন্দ্র-রচনাবলী উপহার দিয়েছেন। গত ৩০শে অক্টোবর খিদিরপুর-ডকে সুইডিশ জাহাজ "মিগুোরো"-তে সুইডেনের কন্সাল এই গ্রন্থোপহার গ্রহণ করেন। ৪০ বছর পূর্বে একদা সুইডেন রবীন্দ্রনাথকে সম্মানিত ক'রে যে যোগ স্থাপন করেছিলেন, এই উপলক্ষে বিশ্বভারতী তা স্মরণ করেন। অতঃপর দুই দেশের সম্বন্ধ আরো সৌহার্দ্যময় হবে ব'লেই আশা করা হয়।

* * * *

ইজিপ্ট থেকে মিঃ মউরশ্রী নামক একজন ছাত্র এসেছেন। বিদ্যাভবনে তিনি প্রাচীন-ভারতের ইতিহাস এবং সভ্যতা সম্বন্ধে অধ্যয়ন করবেন। ভারতের সরকারী ব্যবস্থা-অনুসারে কিছুকালের জন্য তাঁকে ছাত্ররূপে বৃত্তি দেওয়া হবে।

* * *

গত ২৪শে অক্টোবর শিক্ষাভবন-সম্মিলনীর উদ্যোগে সম্মিলিত-জাতির দিবসানুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সংস্থায় মিলিত হয়ে পৃথিবীর শান্তি-বিধানের কাজে সকলে রত থাকবেন, সভায় বিভিন্ন বক্তা এই আশাই ব্যক্ত করেন। ২৫।১১।১৯৫২

২০শে মে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিষদ-সভা বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে স্বীকার করেছেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকগণ অতঃপর পরীক্ষা না দিয়েই লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রহণযোগ্য ছাত্র ব'লে বিবেচিত হবে। ভারতীয় যুগোস্লাভ রাজদূতের সাংস্কৃতিক-সহকারী বিশ্বভারতীকে কতকগুলি গ্রন্থ ও পত্রিকা উপহার পাঠিয়েছেন। তার মধ্যে গুরুদেবের 'শিশু' এবং 'ঘরে বাইরে'ও আছে। বর্তমান যুগোস্লাভিয়ার জীবন এবং কারুশিল্পভরা সাময়িক 'যুগোস্লাভিয়া' পত্রিকা পাঠিয়েছেন। গত বছর শীতের সময় যুগোস্লাভ-শুভেচ্ছা

সমিতি ভারতবর্ষ-ভ্রমণে এসে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করে গেছেন। ৪।৭।১৯৫৩

দুজন আমেরিকান ছাত্রী সম্প্রতি বিশ্বভারতীতে অধ্যয়নের জন্য ভর্তি হয়েছেন। একজন যোগ দিয়েছেন সংগীত-ভবনে, শিখবেন ভারতীয় নৃত্য, অন্যজন হয়েছেন কলাভবনের ছাত্রী। তাঁর শিক্ষার বিষয় ভারতীয় শিল্প। আমেরিকার আরগোসি গডার্ড কলেজ থেকে একদল যুবক এসেছিলেন। গত ২৮শে জুলাই সিংহসদনে সন্ধ্যায় তাঁদের সঙ্গে আশ্রমের কর্মী ও ছাত্রছাত্রীগণ মিলে আলাপ-আলোচনা করেন। একজন জার্মান যুবক এসেছেন সংস্কৃতশিক্ষার্থী হয়ে। ৫।৮।১৯৫৩

বিগত ২০শে আগস্ট সন্ধ্যাবেলায় চীনা-ভবনে শিক্ষা-ভবনের তরফ থেকে একটি বাগ্মিতা-প্রতিযোগিতার অধিবেশন হয়। তাতে শিক্ষাভবনের ছাত্রছাত্রিগণ উৎসাহের সঙ্গে যোগদান করেন। সভাপতি কতকগুলি টুকরো কাগজে বিভিন্ন বিষয় লেখেন। প্রতিযোগিতায় যোগদানকারীদের সে-কাগজ তুলে নিতে বলা হল। যার ভাগ্যে যে-বিষয় পড়ল, তাই নিয়েই একটুক্ষণ ভেবে তিন-মিনিটকাল সবাইকে বলতে দেওয়া হল। প্রতিযোগিতাটি বেশ জমে উঠেছিল। চতুর্থ-বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র সিংহল থেকে আগত আর্যবংশ প্রথম স্থান অধিকার করেন। তাঁর বিষয়টি ছিল 'Laugh and smile'.

বিশ্বভারতী-বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিদর্শক ছাত্র-ছাত্রীরূপে তিনটি ছাত্র ও একটি ছাত্রী বিভিন্ন শিক্ষা-বিভাগে এ বৎসর যোগদান করেছেন। সকলেই বিদেশাগত। Dr Sutjipto Wirjosuparto হচ্ছেন ইন্দোনেশিয়ার ভূতত্ত্ব-বিভাগের সহকারী অধ্যক্ষ। তিনি বিদ্যাভবনে গবেষণা-বিভাগে যোগ দিয়েছেন। Mr Kurt Kinde. সুইডেনবাসী, তিনি কলাভবনে ভারতীয় চিত্রকলা শিখতে এসেছেন। ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধিৎসু। গোল্ডকাস্ট থেকে Mr. Edward Sekyere Kufuor এবং বার্মা থেকে Miss Avinash Gulti শিক্ষাভবনে আই-এ ক্লাসে ভর্তি হয়েছেন।

ভারতের মুখ্যমন্ত্রীর আবেদনের উত্তরে দেরাদুনের The Joint Services Wing of the National Defence Academy এগার শ' টাকা বিশ্বভারতীর সাহায্যার্থে দান করেছেন। এই অর্থ বিশ্বভারতীর ক্রীড়া-বিভাগের জন্য ব্যয় করা হবে।

গত এপ্রিল থেকে জুন মাসের মধ্যে বিশ্বভারতীর অতিথিশালায় মোট তিন শ' কুড়ি (৩২০) জন পরিদর্শক বাস করে গেছেন। তার মধ্যে পাকিস্থান, আমেরিকা

যুক্তরাষ্ট্র, পূর্ব-আফ্রিকা, সুইডেন, সিংহল এবং ইন্দোনেশিয়ার অধিবাসী ছিলেন ১২ জন।

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনটি বিদেশী ভাষা শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হয়েছে চীনা, ফরাসী ও পারসিক। চীনা-ভাষা শিক্ষার কোর্স তিন বছরের, তার পরে ডিপ্লোমা দেওয়া হবে। ফরাসী ও পারসিক ভাষা শিক্ষা সমাপ্তির পরে বিশ্বভারতীর সার্টিফিকেট দেওয়া হবে। অনেক ছাত্রছাত্রী ও কর্মী এসব ক্লাসে যোগ দিচ্ছেন। হিন্দী-ভাষার জন্য বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি উচ্চ ডিপ্লোমা কোর্স খোলবার কথা শোনা যাচ্ছে। বিদেশিগণ এসে যাতে সহজে বাংলা শিখতে পারেন তার জন্য বাংলা ক্লাসও আছে। কলাভবনে গত বছর জুলাই থেকে দু'টি বিভাগ করা হয়েছে। একটি চিত্রকলা এবং আরেকটি হস্তশিল্প। চিত্রকলা বিভাগে শিক্ষার প্রধান বিষয় হবে চারু চিত্রকলা; শিক্ষার কোর্স চার বছরের। চিত্রকলার সঙ্গেই ডিজাইন আঁকা, বাতিকের কাজ, চামড়ার কাজ, সেলাই প্রভৃতি শেখানো হবে। পূর্বে এ বিভাগে পরীক্ষা ছিল না। শিক্ষার্থীর কাজের চাতুর্য-দক্ষতা ও প্রাচুর্যের উপরেই প্রশংসাপত্র দেওয়া হত। গত বছর থেকেই পরীক্ষা নেবার প্রথা প্রবর্তিত হয়েছে। এ বিভাগে চিত্র আঁকার দক্ষতার উপরই বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হবে। চিত্রে সকলের স্বাভাবিক নৈপুণ্য থাকে না, কিন্তু অন্যান্য শিল্পকাজে দক্ষতা থাকতে দেখা যায়। এদেরই জন্য হস্তশিল্প-বিভাগ খোলা হয়েছে। সেখানে ডিজাইন আঁকা, আলপনা দেওয়া, বাতিকের কাজ, চামড়ার কাজ, সেলাই প্রভৃতি শেখানো হবে। চারু চিত্রকলা মডেলিং প্রভৃতি শিক্ষা ঐচ্ছিক। চাকুরির ক্ষেত্রে আজকাল হস্ত শিল্পের চাহিদা খুব বেশি। অনেক শিক্ষার্থী বিশেষ করে ছাত্রীরা এ বিভাগে ভর্তি হচ্ছে। ২৯।৯।১৯৫৩

দক্ষিণ আফ্রিকার নাটাল থেকে মোহনলাল বাহাদুর সোমারস্ কলাভবনে চার বছরের কোর্সে ভর্তি হয়েছেন। তিনি ভারতীয় কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকাতেই তাঁর জন্ম এবং ডারবান শাস্ত্রী-কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। তিনি একজন ট্রেইণ্ড টিচার। সর্বভারতীয় সংস্কৃতি-পরিকল্পনার স্কলারশিপ নিয়ে কলাভবনে এসেছেন।

*   *   *   *

তেহরান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস বিষয়ক অনেক পুস্তক সেই বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বভারতীকে দান করেছে। জাকার্তার রিপাবলিক ইন্দোনেশিয়ার জাতীয়-গ্রন্থাগার থেকে প্রকাশিত গ্রন্থও অনুরূপভাবে বিশ্বভারতীতে

এসেছে। বিশ্বভারতী থেকেও বাইশটি খণ্ড গবেষণাগ্রন্থ এই দুই জায়গায় পাঠানো হয়েছে। ৩১।১০।১৯৫৩

* * * *

"বিশ্বভারতী নিউজ" থেকে জানা যায় যে, অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে বত্রিশজন ভারতের বাইরের অতিথি আশ্রম পরিদর্শন করেছেন। এঁদের কেউ এসেছেন দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে, কয়েকজন এসেছেন ডেনমার্ক, জার্মেনী, ফ্রান্স থেকে, কয়েকজন বা এসেছেন পাকিস্থান, আমেরিকা, তুরস্ক, জাঞ্জিবার, ইরান এবং নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ থেকে। জানুয়ারি ফেব্রুয়ারিতেও ভারতের বাইরে থেকে এসে অনেকেই আশ্রম দেখে গেছেন। সমস্ত বিশ্বে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় যে একটি বিশিষ্ট সম্মানের আসন লাভ করছে এর থেকেই সেটা বোঝা যাবে।

ছুটির পরে নতুন কয়েকজন অধ্যাপক বিশ্বভারতীর বিভিন্ন বিভাগে যোগদান করেছেন। পয়লা নভেম্বর থেকে বিদ্যাভবনে আগন্তুক-অধ্যাপকরূপে (Guest Professor) Dr. Edwind A Burth যোগ দিয়েছেন। সাতই নভেম্বর থেকে চীনাভবনে পরিদর্শক-অধ্যাপক হয়ে এসেছেন Dr. L. Carrington Goodrich এবং বিশে অক্টোবর থেকে পাঠভবনে শারীরিক-চর্চার পরিদর্শিকা-শিক্ষয়িত্রীরূপে নিযুক্ত হয়েছেন Miss Lillian Burke, ১৭।১১।১৯৫৩

রেঙ্গুনে (৪৮, ৪৬ স্ট্রীট) রবীন্দ্র-পরিষদ স্থাপিত হয়েছে। রেঙ্গুনে অবশ্য এ ধরনের প্রতিষ্ঠান সামান্যাকারে আগেও ছিল। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য, আদর্শ, চিত্র প্রভৃতি প্রচার করা নূতন এ-প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। দিনে দিনে এর উন্নতি হবে, এই কামনা সকলেই করবেন। ৫।৬।১৯৫৪

* * * *

বিশ্বভারতী আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা বিভাগে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে বহু ছাত্রছাত্রী এসে যোগদান করেন। ভারতীয় গভর্নমেন্টের সাধারণ সংস্কৃতি শিক্ষার যে বৃত্তি আছে সেই বৃত্তি পেয়ে ইরাক থেকে মিস্ সমীরা (Miss Sameera Al-Naib) ১৯৫২ সালে কলাভবনে যোগদান করেছিলেন এবং এক বছরের কোর্সে Artistic Handicrafts শিখে যান। যাবার আগে তিনি শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা লিখে গেছেন। তাতে তিনি বলেছেন—

ভারতবর্ষের বাইরে থেকে আমরা এসেছি বলে আমাদের বিদেশী বলা হয়ে থাকে। কিন্তু শান্তিনিকেতনে এ শব্দটি সম্পূর্ণ অর্থশূন্য; এটি ব্যবহার করাই

সমীচীন নয়। কারণ এখানে এসে আমরা নিজেদের কেউ দূরদেশী বোধ করি নি। বরঞ্চ যেভাবে আমার প্রতি সবাই অনবরত আত্মীয়তা দেখিয়েছেন তাতে আমার অসুবিধা বোধ হয়েছে, অনেক সময়ে সংকোচই লেগেছে। শান্তিনিকেতন-বাসের আনন্দ কখনই ভুলতে পারব না। আমার মনে হয় সারা পৃথিবীর যুদ্ধোন্মত্ততার মধ্যে শান্তিনিকেতন একটি ওয়েসিসের মতো; যেখানে সবাই এসে ভিড় জমিয়ে আনন্দ পায়।

ভারতবর্ষের আতিথেয়তা বিদেশীদের কাছে সুনাম অর্জন করলে সেটা ভারত-বাসীমাত্রেরই আনন্দের কথা। ১৬।৭।১৯৫৪

১ ই মার্চ সন্ধ্যায় ট্রেনে জাপানী বৌদ্ধ-ভিক্ষু ফুগি ও তাঁর দু'জন শিষ্য শান্তিনিকেতনে আসেন। ট্রেন থেকে নেমেই তাঁরা চীনভবনের সভায় যোগ দেন। চীনভবনের হলের দেয়াল-চিত্রে অঙ্কিত ধ্যানরত বুদ্ধদেবকে তাঁরা অত্যন্ত ভক্তিভরে প্রণাম নিবেদন করেন এবং নিজেদের ভাষায় মন্ত্রোচ্চারণ করেন। তাঁরা তিনদিন চীনভবনের অধ্যক্ষ প্রফেসর তান-ইয়ান-সেনের অতিথি হয়ে চীনভবনে বাস করেন এবং শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে বহু তথ্য জেনে যান।

*　　*　　*　　*

ঐদিনই আশ্রমে আরেকজন জাপানী অতিথির আগমন হয়েছিল। তিনি টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক হাজি-মে-নাকামুরা। বয়স মাত্র তাঁর বিয়াল্লিশ বছর কিন্তু অসাধারণ জ্ঞানী ব্যক্তি। তিনি সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত; ভারতীয় ও পাশ্চাত্ত্য দর্শনে ব্যুৎপন্ন; ভারতীয় দর্শনের গ্রন্থাবলী তো পড়েছেনই, এমন কি ভারতীয় মাসিক, বার্ষিক, সাপ্তাহিক পত্রিকায় কোথায় দর্শন সম্বন্ধে করে কোন্ প্রবন্ধ লেখা হচ্ছে সে সবের অবধি সন্ধান রাখেন। তাঁরই কাছ থেকে খবর জানা গেল জাপানী ভাষায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তামূলক রচনাগুলি অনূদিত হচ্ছে; জানা গেল জাপানীগণ এখনও ভারতীয় সাহিত্য ও দর্শন সম্বন্ধে কতটা অনুশীলন করে থাকে। অধ্যাপক হাজি-মে-নাকামুরা শান্তিনিকেতনে-বাসরত পাটনা-বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের প্রাক্তন-অধ্যাপক আন্তর্জাতিক-খ্যাতিসম্পন্ন ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সঙ্গে বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বহুক্ষণ আলাপ করেন। আশ্রমের অন্যান্য কতিপয় অধ্যাপকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেও তিনি আনন্দিত হন। জরুরী কার্যবশত মাত্র একদিন অবস্থান করেই তাঁকে আশ্রম ত্যাগ করতে হয়। আশ্রমিকগণ সকলে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পান নি। কিন্তু যাঁরা তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন তাঁরা তাঁর জ্ঞানের পরিধি ও

অনুসন্ধিৎসা দেখে বিস্মিত হয়েছেন। এঁদের দু'চারজনকে দেখলেই উপলব্ধি হয় জাপানী শিক্ষণ-সংস্কৃতি সমস্ত দেশের জনচিত্তে কী অপরিসীম শক্তি সঞ্চারিত করেছিল।

শুধু দু'চারজন জ্ঞানী-গুণীর মধ্যে নয়, জাপানের সাধারণ লোকের মধ্যেও জ্ঞানস্পৃহা কত প্রবল, শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর জ্যেষ্ঠ পুত্র কলাভবনের অধ্যাপক জাপান-প্রত্যাগত শিল্পী শ্রীবিশ্বরূপ বসুর কাছে একদিন তার এক গল্প শোনা গেছে। ১৯৩৩ কিংবা ১৯৩৫ সালের কাছাকাছি শ্রীবসু জাপানে শিল্পকলা শিখতে যান। তখনও আমাদের দেশে আজকের মতো এমন ব্যাপকভাবে রবীন্দ্র-জন্মোৎসব পালনের প্রথা প্রচলিত হয় নি। বিশ্বরূপ বসু বলেন—সেই সময় বৈশাখ মাসে হঠাৎ একদিন জাপানের এক গলিপথ দিয়ে চলতে চলতে থমকে দাঁড়ালাম। চোখে পড়ল একটা জাপানী দৈনিক-কাগজে রবীন্দ্রনাথের ছবি ; আর দেখা গেল তারই উপর ঝুঁকে পড়েছে কয়েকজন কুলি-মজুর রাজমিস্ত্রীজাতীয় লোক। সবাই আগ্রহে পড়ছে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কী লেখা হয়েছে। তারা সব সামান্যই লেখাপড়া জানে। একজন পড়ছে সবাই শুনছে। ছবি দেখে আকৃষ্ট হয়ে কাছে গেলাম। তাদের ভাষা তো জানিনে, তারাই আমাকে অনেক কষ্টে বুঝিয়ে দিলে এখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মোৎসবের সময়, তাই তাঁর সম্বন্ধে নানা কথা লেখা হয়েছে। দেখলাম এমন সব মূল্যবান তথ্য সে লেখায় সংকলিত হয়েছে, আমাদের দেশের বহু শিক্ষিত লোকও যার খোঁজ রাখেন কি না সন্দেহ। ও দেশের কুলিমজুরগণও সে-সব পড়বার সুযোগ পায়, সে সব জানতে উৎসুক। এ তো গেল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বের অবস্থা। যুদ্ধের পরবর্তী জাপানের অদমনীয় চিৎশক্তির পরিচয় দিলেন সেদিন শিল্পী শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মা মশায়। জাপান থেকে তিনি সম্প্রতি এসেছেন। জাপানের নানারকম ছবি দেখাতে-দেখাতে তিনি একটি বুদ্ধমূর্তি দেখিয়ে বললেন যে, সেই মূর্তিটি ছিল ছিয়ান্ন ফিট উঁচু এবং তার কারুকার্য ছিল বিস্ময়কর। গত যুদ্ধে সেই মূর্তিটি শত্রুর বোমায় ধ্বংস হয়ে যায়। এমন অমূল্য একটি সম্পদ হারিয়ে জাপানীরা অত্যন্ত দুঃখিত হল কিন্তু নিরাশ হল না বা নিশ্চেষ্ট হয়ে বসেও রইল না। যুদ্ধ-বিরতির সঙ্গে সঙ্গে অল্পদিনের মধ্যেই জাপানীগণ সেটি পুনরায় নির্মাণ করে। আগের মূর্তির তুলনায় অবশ্য নবনির্মিত মূর্তিটি অনেকাংশে ন্যূন, তবু এখনকারটিও অত্যাশ্চর্য। সেটি গড়ে তুলতে দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা নিজেদের শ্রম ও বিদ্যাবুদ্ধি দান করেছে। যে যেটুকু অবসর পেয়েছে, এ কাজে লাগিয়েছে। এ-সব ঘটনা ও এ-সব জ্ঞানীগুণী ভক্তদের দেখেই জাপানের যথার্থ অনন্যসাধারণ

শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়; অন্য দেশ তাদের এই অসাধারণ চিত্তশক্তি থেকে প্রেরণা লাভ করতে পারে।

* * * *

বসন্তোৎসবের সময় পৃথিবী-ভ্রমণকারী হল্যাণ্ডপ্রবাসী সুইস মার্শিভ্যান ভর্তস্লিন শান্তিনিকেতন পরিদর্শন করেন। তিনি একজন ফটোগ্রাফার ও লেখক। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর দেশভ্রমণের নেশা। একটি জার্মেন ক্যারাভ্যানে তিনি পৃথিবী ভ্রমণ করছেন। ইউরোপ, আফ্রিকা মধ্য এশিয়া প্রভৃতি দেশের পর দেশ দেখে সম্প্রতি এসেছেন ভারতবর্ষে। তাঁর সঙ্গী একটি পায়রা, নাম 'লতিফ'। বসন্তোৎসবের অনেক ছবি তিনি তোলেন এবং গানগুলির রেকর্ড করে নেন।
২৪।৩।১৯৫৫

প্রতিবারের মতো এবারও "সাহিত্যিকা"-সংস্থার উদ্যোগে বিশ্বভারতীর বিভিন্ন শিক্ষা-বিভাগের নির্গামিক ছাত্র-ছাত্রীদের বিদায়সম্ভাষণ জানানো হয়েছে। এই উপলক্ষে গত ২৩শে মার্চ সান্ধ্য-উপাসনার পরে কেন্দ্রীয়-গ্রন্থাগারের বারান্দায় পাঠ আবৃত্তি, নৃত্যগীতাদির ব্যবস্থা হয়েছিল। অনুষ্ঠান শেষ হবার পূর্বে বিদায়ী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে থেকে তিনজন ছাত্র-ছাত্রী উঠে তাঁদের পক্ষ থেকে উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানান। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিনয়ভবনের আফ্রিকা-নিবাসী নিগ্রো ছাত্র ওখেলোর বক্তব্যটি। ওখেলো বিশ্বভারতীর শিক্ষাভবন থেকে গত বছর বি-এ পাস করেছেন এবং এ-বছর বিনয়ভবনের ডিগ্রি নিতে যাচ্ছেন। তিন বছর বিশ্বভারতীতে থেকে কিছু-কিছু বাংলাও শিখে ফেলেছেন। কিন্তু বক্তব্যটি তিনি ইংরেজিতে বললেন এবং দুঃখ করলেন যে, এ-সভায় ছোটদের কাছে বাংলা বলতে পারলেই তিনি সুখী হতেন, কিন্তু তাঁর বাংলা সুখশ্রাব্য হবে না ভয়ে ইংরেজীতে বলছেন। তিনি সংক্ষেপে বলেন—বিশ্বভারতীতে ছাত্র-হিসাবে আমিই প্রথম নিগ্রো এসেছি। তারপরে অবশ্য অনেকেই এসেছেন এবং বর্তমানেও এখানে রয়েছেন। আমি প্রথম এসেই এখানকার ছোট-বড়ো সবার কাছ থেকে যেরকম সাদর অভ্যর্থনা লাভ করেছি, এরকম আমি আশা করতেই পারি নি। এই ক'বছর ভাবতেই পারি নি যে, আমি অন্য-এক দূরদেশ থেকে এখানে এসেছি। আমাদের দেশের যাঁরা এসেছেন কিংবা অন্যান্য যাঁরা বিদেশাগত তাঁদের কাছ থেকেও এই অভিমতই শুনছি। এখানকার শিক্ষা-পদ্ধতি, এখানকার আদর্শ এবং এমনি সুন্দর আবহাওয়া আমার মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছে। আমার সংকল্প রয়েছে শিক্ষা-সমাপনান্তে দেশে ফিরে গিয়ে আমি এই আদর্শ আমার দেশবাসীকে দেবার চেষ্টা করব, এমনি

সব শিক্ষায়তন গড়ে তুলব। তাতে নিশ্চয় আমার দেশবাসী আনন্দিত ও উপকৃত হবে। বিশ্বভারতীও তাতে বিশেষ লাভবান হবে। প্রাচীনকালে ভারতের তক্ষশীলা, নালন্দা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশ-বিদেশের ছাত্র এসে শিক্ষালাভ করে যেতেন। ছাত্রদের মারফত ভারতের জ্ঞান, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ধর্ম ও শিল্পকলা প্রভৃতি ভারতের বাইরে দেশ-দেশান্তরে বহুদূর বিস্তার লাভ করত। বর্তমান কালে ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে বিশ্বভারতী সেই আন্তর্জাতিক বিদ্যাকেন্দ্রের গুরুত্ব বিশেষভাবে বহন করছে। এখানে এখন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শুধু নয়, ভারতের বাইরের সুদূর প্রাচ্যের চীন, তিব্বত, বর্মা, শ্যাম, জাভা, সুমাত্রা, সিংহল প্রভৃতি দেশের ছাত্র-ছাত্রী, পাশ্চাত্যের বহু দেশের ছাত্রছাত্রী, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়ার ছাত্রছাত্রীগণও শিক্ষাগ্রহণ করছেন। এঁদের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য রকমের। এ-সব ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার মধ্য দিয়ে বিশ্বভারতী তথা রবীন্দ্রনাথ ও ভারতবর্ষের আদর্শ, সাহিত্য, শিল্পকলা প্রভৃতি বিস্তৃত হবার সুযোগ রয়েছে। ওখেলোর বিদায়কালীন উচ্ছ্বাসহীন দৃঢ় সংকল্পটির মধ্যে সে-কথাই ধ্বনিত হয়েছিল। ১৪।৩।১৯৫৫

৪ঠা জুন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের আই-এ, বি-এ ম্যাট্রিক প্রভৃতি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। আই-এ ও আই-এস্ সি-তে ৪০ জন; ম্যাট্রিকে ২৭ জন; বি-এতে ২৪ জন এবং বি-টিতে প্রায় পঁয়তাল্লিশ জন ছাত্রছাত্রী উত্তীর্ণ হয়েছেন। আই-এস্‌সি-তে ইন্দোনেশিয়াবাসী এস্ জয়শীলন উল্লেখযোগ্য নম্বর পেয়ে প্রথম হয়ে সকলের প্রশংসা অর্জন করেছেন। জয়শীলনের পূর্বপুরুষগণ মাদ্রাজী; তিন-পুরুষ থেকে তাঁরা ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপে বাস করছেন। ভারত-সরকার থেকে বৃত্তি পেয়ে তিনি পাঁচ বছরের জন্য ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে এসেছেন। বি-এ-তে বাঙলা অনার্সে দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রথম হয়েছেন চীনভবনের অধ্যক্ষ প্রফেসর তান ইয়ান্ সেনের জ্যেষ্ঠা কন্যা তান-ওয়েন। এখানে তিনি আই-এ পরীক্ষাতেও বাঙলায় সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছিলেন এবং গত ১৯৫৪ সালে ভারত-সরকার থেকে বিভিন্ন প্রদেশের ভাষাপ্রচারের উদ্দেশ্যে বিশ্বভারতী-কেন্দ্রে অবাঙালী ছাত্রছাত্রীদের বাঙলা ভাষা শিক্ষার যে পরীক্ষা গৃহীত হয়েছিল তাতেও আই-এ পরীক্ষা-মানের বাঙলা পরীক্ষায় তিনি প্রথম হন। কিন্তু ভারতীয় নাগরিক নন বলে তিনি ভারত-সরকার-প্রদত্ত পুরস্কার লাভ করেন নি। অতি শৈশব থেকে তান-ওয়েন পিতামাতার সঙ্গে শান্তিনিকেতনে রয়েছেন, এখানকার স্কুলেই তাঁর বাঙলা শেখা। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য এই যে, কয়েক বছর আগে, যখন বিশ্বভারতী স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয় নি, তান-ওয়েনের দাদা তান-লি

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষায় বাঙলায় ভালো নম্বর পেয়ে শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীগণের মধ্যে প্রথম হয়েছিলেন। ১৮।৮।১৯৫৫

*　　*　　*　　*

গত ২৯শে ফেব্রুয়ারি পোলিশ সাংস্কৃতিক-প্রতিনিধিদল শান্তিনিকেতন পরিদর্শনে আসেন। সেদিন সন্ধ্যায় কলাভবনের ছাত্র শ্রীপ্রসন্ন রায় হাতের মুদ্রা-দ্বারা ছায়াচিত্র দেখিয়ে তাঁদের আনন্দ দান করেন। পরদিন তাঁরা বিশ্বভারতীর বিভিন্ন বিভাগ পরিদর্শন করেন। বিকালে একটি প্রীতি-সম্মিলনীতে বিশ্বভারতী-কর্তৃপক্ষ তাঁদের চা-পানে আপ্যায়িত করেন। তারপর সন্ধ্যায় সংগীতভবন-মঞ্চে সম্বর্ধনা জানানোর জন্য একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ডঃ সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য পোলিশদলকে সম্বর্ধনা জানান। তারপর পোলিশদলের নেতা শ্রীযুক্ত আয়ান কেরল ওয়েল্ড তাঁর ভাষণে বলেন যে, বিশ্বভারতী শুধু ভারতবর্ষের নয়, ইহা বিশ্ববিখ্যাত প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ক'রে তাঁরা যথেষ্ট আনন্দ লাভ করেছেন।

বিশ্বভারতীর এই সম্বর্ধনার জন্য তিনি ধন্যবাদ জানান। তাঁর ভাষণের পর ছাত্রছাত্রীরা 'শ্যামা' নৃত্য-নাট্যটি অভিনয় করেন। পোলিশদলের পক্ষ থেকে একজন সদস্য ভায়োলিন বাজিয়ে সকলকে মুগ্ধ করেন। পরদিন সকালে এই দল বিশ্বভারতী ত্যাগ করে কলকাতার পথে রওনা হন। ৩।১৯৫৬

ঢাকার 'বুলবুল অ্যাকাডেমি অফ্ ফাইন আর্টস'এর আমন্ত্রণে শান্তিনিকেতনের 'শ্যামা'-নৃত্য-নাট্যের দল শ্রীশান্তিদেব ঘোষের নেতৃত্বে ঢাকা-পরিভ্রমণ শেষ করে ফিরে এসেছেন। গত জানুয়ারি মাসে এই দলটির ঢাকা যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু উপাচার্য মহাশয়ের হঠাৎ মৃত্যুতে তখন যাওয়া হয় নাই। তারপর আরও অনেক বাধাবিঘ্ন কাটিয়ে ঝড়বৃষ্টির মধ্যে দলটি অতি কষ্টে গত ১০ই মার্চ ঢাকায় পৌছায়। সেখানে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার জন্য তাদের অনুষ্ঠান স্থগিত থাকে কয়েকদিনের জন্য। অবশেষে ১৩ই মার্চ থেকে অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। ঢাকা পিকচার্স-হাউসে পূর্ব-বাংলার রাজ্যপাল জনাব ফজলুল হক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। পাকিস্থানস্থ ভারতীয় হাই-কমিশনার শ্রী সি সি দেশাই ও তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী দেশাই উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। পর-পর তিনদিন যথাক্রমে ১৩ই, ১৪ই ও ১৫ই 'শ্যামা' বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। ঢাকার জনসাধারণ শান্তিনিকেতন-দলকে যেরূপ আদর-অভ্যর্থনা জানিয়েছেন তা প্রশংসনীয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরাও কাজী মোতাহের হোসেনের সভাপতিত্বে একটি সম্বর্ধনা-সভার আয়োজন

করেছিলেন। তা ছাড়া আরও অনেক প্রতিষ্ঠান তাঁদের সম্বর্ধনা জানান। ১৫ই মার্চ রাত্রে ঢাকার বেতার-কেন্দ্র থেকে 'শ্যামা'র গানগুলি পরিবেশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁদের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে বুলবুল-অ্যাকাডেমির সম্পাদক শ্রীনুরুল হুদার ভাষণটি বিশেষভাবে তাঁদের রবীন্দ্র-প্রীতির পরিচায়ক। তিনি বলেন যে "সংঘাত-সংঘর্ষময় এই পৃথিবীতে কবিগুরুর শান্তি ও প্রেমের শাশ্বত বাণী বিভিন্ন জাতি ও দেশের মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপনের একমাত্র অবলম্বন।"

পাকিস্থানের প্রত্যেকটি পত্রিকা একযোগে অভিনয়ের প্রশংসা করেছেন। 'সংবাদ' বলেছেন যে, "শ্যামা নৃত্য-নাটকটিতে নৃত্য ও সংগীতের এক অপূর্ব প্রাণ-মাতানো পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া শিল্পিবৃন্দ দর্শকদের মনে এক প্রশান্তির মায়াজাল বিস্তার করেন। 'শ্যামা' রবীন্দ্রনাথের এক অনবদ্য সৃষ্টি কিন্তু ইহার এত সার্থক রূপায়ণ বোধ হয় শুধু শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের দ্বারাই সম্ভব।·········সব-কিছু মিলিয়া যে-ছবিটি শান্তিনিকেতনের শিল্পিবৃন্দ আমাদের সামনে তুলিয়া ধরিলেন, তাহার ছাপ আমাদের বহুদিন মনে থাকিবে। এই অনুষ্ঠান দেখিবার সময় কেবল এই কথাটিই আমাদের বারবার মনে হইতেছিল, শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ যে ঐশ্বর্যভাণ্ডার সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার কিছু অংশ আমরা এইভাবে মাঝে মাঝে পাই না কেন।"

মোট কথা শান্তিনিকেতন দল যে ঢাকাতে বিদগ্ধ-জনের প্রশংসা অর্জন করেছেন তাতে সন্দেহ নেই।

'Pakisthan Observer' বলেছেন, "A long-awaited dance-drama, Shyama fogged by bad weather, came as a welcome shower for persons thirsting for cultural shows."

সবশেষে আর-একটি প্রগতিশীল পত্রিকা লিখেছেন "কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অমর কীর্তি শান্তিনিকেতনের মহান শিল্পীবৃন্দ পূর্ব-বঙ্গে এসে যে শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে প্রেরণা দিয়ে গেলেন তজ্জন্য আমরা গভীর আন্তরিকতা সহকারে তাঁদের শুভেচ্ছা ও সম্প্রীতি জানাচ্ছি।" ২৫।৩।১৯৫৬

শান্তিনিকেতন-সাহিত্যমেলার বার্ষিক অধিবেশনটি গত ২৮শে মার্চ রাত্রে বিদ্যাভবনের দ্বিতলে অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক শ্রীসুনীলচন্দ্র সরকার আধুনিক বাংলা-সাহিত্য সম্বন্ধে একটি ভাষণ দান করেন। শ্রীযুক্তা লীলা মজুমদার প্রধানা-অতিথি হিসাবে সভায় উপস্থিত থেকে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।

শান্তিনিকেতনে 'নিউ এডুকেশন ফেলোশিপে'র শাখাটি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উদ্বোধন-অনুষ্ঠানটি আহ্বান করেন বিনয়-ভবনের অধ্যক্ষ শ্রীসুনীলচন্দ্র সরকার। কলাভবনে 'হ্যাভেল হলে' শান্তিনিকেতনের কর্মীরা মিলিত হন। এই অনুষ্ঠান-উপলক্ষে ঐ হলে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। কলাভবনের অধ্যক্ষ শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মন, অধ্যাপক শ্রীরামকিঙ্কর বেইজ, শ্রীসুখময় মিত্র, শ্রীপেরুমল, শ্রীরাধাচরণ বাগচি, শ্রীসুরেন দে, ও শ্রীমতী গৌরী ভঞ্জের অঙ্কিত চিত্রগুলি প্রদর্শিত হয়।

আহ্বায়ক শ্রীসুনীলচন্দ্র সরকার মহাশয় বলেন যে, কেন্দ্রীয়-সরকারের শিক্ষা-বিভাগের অনুরোধে এই শাখা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে। পরলোকগত উপাচার্য ডঃ বাগ্‌চি এই শাখা-প্রতিষ্ঠায় আগ্রহশীল ছিলেন এবং তিনি নিজে এর সভাপতি থাকতে রাজী হয়েছিলেন। শ্রীসরকার আরও বলেন যে, গুরুদেব শান্তিনিকেতনে এই শাখা প্রবর্তন করে গিয়েছিলেন এবং তাঁর সময়ে এই শাখা বেশ সাফল্য লাভ করেছিল। গুরুদেব এসম্বন্ধে অনেক ভাষণও দিয়েছেন। তিনি, শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু ও শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন শিক্ষা, কলা, সংগীত ও আশ্রমের জীবন সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখেছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এর কাজ বন্ধ হয়ে যায়। আবার বর্তমানে ধীরে-ধীরে ঐ শাখার কাজ চালু করবার ব্যবস্থা হচ্ছে। আশা করা যায়, শান্তিনিকেতনের কর্মীদের কাছে এই কাজে যথেষ্ট উৎসাহ পাওয়া যাবে।

* * *

শ্রীযুক্ত সরকারের ভাষণের পর অধ্যাপক জে. এম. সেন এবং সেদিনের সভাপতি শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় এন. ই. এফ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সভায় এই শাখার কার্য পরিচালনা করবার জন্য একটি কার্যকরী-সমিতি গঠিত হয়। বিশ্বভারতীর উপাচার্য পদাধিকার-বলে এই সভার সভাপতি থাকবেন। শ্রীযুক্ত সুনীলচন্দ্র সরকার এই শাখার সম্পাদক নির্বাচিত হন।

১৯৩২ খৃষ্টাব্দে নীস শহরে নিউ এডুকেশন ফেলোশিপের কনফারেন্স হয়। সেখানে যে পাঁচ জন স্থায়ী সহ-সভাপতি ছিলেন তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অন্যতম, যদিও তিনি ঐ কনফারেন্সে যোগদান করতে পারেন নি। তবে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই শহরে তাঁর সভাপতিত্বে এবং ডঃ এস. রাধাকৃষ্ণনের সহ-সভাপতিত্বে যে কনফারেন্সটি হয় সেটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১১।৪।১৯৫৬

গত ১৭ই নভেম্বর সিংহসদনে সংগীতভবনের অধ্যাপক শ্রীবীরেন্দ্রনাথ পালিত তাঁর রাশিয়া ও পূর্ব-ইউরোপ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। ভারত-সরকারের

প্রেরিত যে সাংস্কৃতিক-প্রতিনিধিদল উপরোক্ত দেশগুলি ভ্রমণ করে তিনি সেই দলের সভ্য ছিলেন। শ্রীযুক্ত অনিলকুমার চন্দ ঐ দলের নেতৃত্ব করেন। ২৯।১১।১৯৫৬

বিশ্বভারতীতে ইংরেজী ও বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা ব্যতীত চীনা, জাপানী, ফরাসী ও জার্মান প্রভৃতি কয়েকটি বিদেশী ভাষা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রয়েছে। এগুলির মধ্যে একমাত্র চীনভবনই একটি স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক-বিভাগরূপে গড়ে উঠেছে। অন্য ভাষার জন্য বিদেশী অধ্যাপক নিযুক্ত করা হয়ে থাকে। জাপানী অধ্যাপক কাসুগাই প্রায় দু'বছর যাবত সপরিবারে বিশ্বভারতীর নিজাম-হাউসে বাস করছেন। দেশে তাঁর নিজের একটি গ্রন্থাগার ছিল; চার হাজার গ্রন্থ-সম্বলিত সে-গ্রন্থাগারটি অধ্যাপক সম্প্রতি বিশ্বভারতীকে দান করবেন বলে স্থির করেছেন। এবিষয়ে আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা চলছে। তাঁর অন্তরের গভীর অভিলাষ, বিশ্বভারতীতে ভারত-জাপান সাংস্কৃতিক মিলন-কেন্দ্র স্থাপিত হয়। ১৫।৬।১৯৫৭

দেশিক

আশ্রমের প্রতি শুভেচ্ছা বহন করে কয়েকখানি চিঠি এসেছে। তার মধ্যে একখানি হচ্ছে রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের চিঠি। তিনি এবার সাতই পৌষের সময় সমাবর্তন-উৎসবে সভাপতিরূপে যোগ দিয়েছিলেন। ফিরে গিয়ে উপাচার্যমশায়কে চিঠি দিয়ে আশ্রমের প্রতি তাঁর শুভেচ্ছা এবং এখানে এসে তাঁর মনে যে আনন্দ হয়েছিল তা বিশদভাবে লিখে জানিয়েছেন। আরেকখানা চিঠি এসেছে স্টকহলমের নবেল-লাইব্রেরী থেকে, গুরুদেবের সাহিত্যের বাংলা ইংরাজী এবং হিন্দী সংস্কর' উপহার পেয়ে তাঁরা ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

*　　*　　*　　*

শান্তিনিকেতন-কলাভবনের শিল্পী ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামকিঙ্কর বেইজ বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে স্থাপত্য (sculpture) সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা দেন। কিছুদিন আগে হিন্দী-ভবনের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মোহনলাল বাজপেয়ী বিশ্ববিদ্যালয়-অধ্যাপক-সম্মেলনের হিন্দীশাখায় যোগদান করেছিলেন। দিল্লীতে আরো অন্যান্য হিন্দী-সাহিত্য-সভায় এবং দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি হিন্দী-সাহিত্য ও ভাষা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়েছেন।

এখানে হিন্দী এবং ওড়িয়া সাহিত্য ও ভাষার চর্চা আশানুরূপ হচ্ছে। মাঝে মাঝে এসব বিষয়ে সাহিত্যসভার অধিবেশনও হয়ে থাকে। ওড়িয়া আধুনিক সাহিত্যের একজন খ্যাতনামা লেখক ফকিরমোহন সেনাপতি; তাঁর জন্মদিনে এখানে

সভা করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়েছিল। হিন্দী-সাহিত্যের প্রসিদ্ধ লেখক জয়শঙ্কর প্রসাদের জন্মদিনেও এখানকার হিন্দী-সমাজ সাহিত্য-সভার অধিবেশন করেছিলেন। ওড়িয়া লোক-সাহিত্য সম্বন্ধে একখানা গ্রন্থ লিখেছেন এখানকার বিদ্যাভবনের অধ্যাপক এবং গবেষণাকার্যে-রত শ্রীকুঞ্জবিহারী দাস। তিনি ছুটিতে দেশে গিয়ে ওড়িয়া জনসাধারণের মধ্য থেকে প্রায় হাজার গান সংগ্রহ করেছেন। জনসাধারণের গল্পগুচ্ছও সংগ্রহ করছেন। যে-গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে সেখানি এ-বিষয়ের প্রাথমিক গ্রন্থ, আরো অনেক-কিছু লিখবার ভূমিকা একে বলা যায়। এর মধ্যে আছে দেশে-প্রচলিত গল্পগাথা, শিশুদের গান, কৃষকদের গান, প্রবাদ-বচন, ডাক-বচন, গ্রাম্য দেব-দেবী সম্বন্ধে আলোচনা, পালা, যাত্রা প্রভৃতি। এই বই দ্বারা ভারতীয় লোক-সাহিত্য বিশেষ উপকৃত হবে বলে আশা করা যায়। ৪।৩।১৯৫৭

শালবীথি, বকুল-বীথি, আম্রকুঞ্জ—বসন্তের কোকিলের সুউচ্চ কূজনে মুখরিত হচ্ছে দিনরাত; তারই স্বরে স্বর মিলিয়ে আশ্রমবাসীরা বসন্তকে সম্বর্ধনা জানাল নৃত্যে, গীতে, পাঠ-আবৃত্তিতে। যা ছিল কালো-ধলো, আবীরের রঙে রাঙা হয়ে ঘরে ফিরল।

এবার এই বসন্তোৎসবের সঙ্গে সাহিত্য-মেলার আয়োজন ছিল। আগের দিন সন্ধ্যায় সংগীতভবনের নূতন স্টেজে প্রথম অধিবেশন হয়। সভাপতি ছিলেন ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী। লোক-সাহিত্যের আলোচনায় এ আসরে অংশ গ্রহণ করেছিলেন 'হারামণি'-গ্রন্থ-লেখক মুহম্মদ মনসুরুদ্দিন, পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত কবি-গাইয়ে সেখ গোমানি, লোক-সাহিত্যের গবেষক—অধ্যাপক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য; স্থানীয়দের মধ্যে অংশ গ্রহণ করেন বিশ্বভারতীর বাংলা পুঁথি-বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল, উড়িষ্যা লোক-সাহিত্যের গবেষক শ্রীকুঞ্জবিহারী দাস এবং লোক-সংগীতের সুর সম্বন্ধে আলোচনা করেন শ্রীশান্তিদেব ঘোষ। 'হারামণি'-লেখক পূর্ববঙ্গের লোক-সাহিত্য সম্বন্ধে ভাষণ পাঠ করেন এবং এ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে তাঁর ব্যক্তিগত ঋণ স্বীকার ক'রে কৃতজ্ঞতা জানান। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের আলোচনা তথ্যপূর্ণ ছিল। তিনি মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া অঞ্চলের পটুয়া জাতির ঐতিহ্য, মালদহের গম্ভীরা গান, রংপুর অঞ্চলের ছউ নাচ এবং ময়মনসিংহ-অঞ্চলের জারি গান, সারি গান প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করেন। পল্লীর প্রত্যন্ত-বাসীদের এই সব ঐতিহ্যের মধ্যে আর্যেতর সংস্কৃতির প্রভাব নিহিত রয়েছে কি না সে সম্বন্ধে বিশদভাবে গবেষণা হওয়ার প্রয়োজন—এ কথার বিশেষ উল্লেখ করেন। সেখ গোমানির ভাষণটিও বেশ হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন—

কবিগানের মধ্য দিয়েই দেশের জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা, সংস্কৃতি সব-কিছু ছড়িয়ে দেওয়া যায়। কবিগানের ভাষাই জনসাধারণের ভাষা, মাঠের মধ্যে শিমুলতলায় বসে এখনো হাজার-হাজার লোক এ-গান শোনে। কবিগানের অশ্লীলতা দূর করে তাকে মার্জিতাকারে সাধারণের মধ্যে তথ্য ও চিন্তাধারা বিস্তারের সুন্দর উপায় করে তোলা যায়। উচ্চস্তরের সাহিত্য তাদের মধ্যে গিয়ে পৌছবার পথ পায় না। এই উপায়টির মারফতে অসংখ্য পল্লীবাসী জনসাধারণের সঙ্গে শহরবাসী শিক্ষিত-জনমনের যোগ স্থাপন হওয়া সম্ভব। এর দিকে তাই উচ্চস্তরের দৃষ্টি দেওয়া কর্তব্য।

সেদিন রাত দশটা থেকে সংগীত-ভবনে সেখ গোমানি ও শ্রীলম্বোদর ভট্টাচার্য কবি-গানের আসর জমিয়েছিলেন।

বসন্তোৎসবের দিন বেলা তিনটে থেকে সাড়ে-পাঁচটা অবধি সাহিত্য-মেলার দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। আলোচ্য বিষয় ছিল শিশু-সাহিত্য। শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী সভানেত্রী ছিলেন। শ্রীমতী লীলা মজুমদার, শ্রীনরেন্দ্র দেব প্রভৃতি বর্তমান শিশু-সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেন। শিশু-সাহিত্য শাখার আহ্বায়ক শ্রীপ্রভাত মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শিশু-সাহিত্য লেখক স্থানীয় শ্রীচিত্তরঞ্জন দেবও এ-আলোচনায় যোগদান করেন। সেদিন সন্ধ্যায় গৌর-প্রাঙ্গণে প্রায় হাজার-দুয়েক লোকের সমাগমে 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্যের অভিনয় হয়।

পরদিন রবিবার সাহিত্য-মেলার অধিবেশনের জন্যে আশ্রমের কাজ বন্ধ ছিল। সেদিন সকাল, দুপুর ও সন্ধ্যায় তিনবার বৈঠক বসে। সকালবেলা কাব্য ও নাট্য সম্বন্ধে আলোচনা ছিল। প্রথমদিকে কাব্য-শাখায় শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত স্বরচিত একটি কবিতা পাঠ করেন। শ্রীমতী রাধারানী দেবী, পূর্ব-বাঙলার তরুণ কবি সামসুর রহমান, পশ্চিম-বাঙলার শ্রীসুভাষ মুখোপাধ্যায়, শ্রীবুদ্ধদেব বসু, শ্রীনরেশ গুহ, শ্রীদীনেশ দাস প্রভৃতি সাহিত্যিকবৃন্দ কাব্যের বিষয়বস্তু, ভাবধারা, ভাষা ও রূপ প্রভৃতি নিয়ে নানামুখী আলোচনা করেন। সামসুর রহমানের লিখিত পূর্ব-বাঙলার বর্তমান কাব্যধারা সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ ভাষণটি শুনে সবাই খুশী হয়েছেন। নাট্যশাখায় সময়ের স্বল্পতার জন্য শুধু নাট্যকার শ্রীতুলসী লাহিড়ী ও শ্রীশচীন সেনগুপ্ত বর্তমান বাঙলার নাট্য সম্বন্ধে বলেন। শচীন সেনগুপ্ত মশায় বলেন, বাঙলার নাট্য এবং রঙ্গমঞ্চের সূচনা খুব উঁচু গ্রামেই বাঁধা হয়েছিল। প্রথম যুগেই 'নীলদর্পণ', 'সধবার একাদশী' প্রভৃতি নাটক এবং গিরিশচন্দ্র অমৃতলাল প্রভৃতি

ক্ষমতাশালী নাট্যকারগণ আবির্ভূত হয়েছিলেন; এই ধারার জন্যই রবীন্দ্রনাথের ভিতরে অত সূক্ষ্ম ভাবের উচ্চতর নাট্যের প্রকাশ ঘটতে পেরেছিল। কিন্তু নাট্য একার নয়, তা সমস্ত জাতির সম্মিলিত সাধনার জিনিস। সমগ্র জাতির সংঘবদ্ধ প্রেরণায় তার প্রেরণা লাভ হয়, তার মধ্যে পূর্ণতার বিকাশ ঘটে। কিন্তু নানা কারণে আমাদের জাতির জীবনে সে-রকম প্রেরণা আসে নি যে-প্রেরণা নাট্যকে সঞ্জীবিত করে রাখতে পারে। মাঝে মাঝে যে জোয়ার এসেছে, সে স্বল্পস্থায়ী। এখন তো সিনেমা এসে নাট্যকে একেবারেই নস্যাৎ করে দিয়েছে। কলকাতাতে যেখানে ষাট-সত্তরটি সিনেমা জোর চলছে, সেখানে তিনটি নাট্যশালাও ঠিকমতো চলতে পারছে না। কোনোমতে টিকে আছে মাত্র।

অতঃপর বক্তা বিশ্লেষণ করে নাট্য ও রঙ্গমঞ্চের অধঃপতনের কারণ ও তার ভবিষ্যৎ আশার সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সভাপতি শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন মশায় তাঁর ভাষণে বলেন যে, জাতি বর্তমানে বিভ্রম ও বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে চলেছে; বর্তমান কাব্য-নাট্য-সাহিত্যে তার যে কী-রকম ছাপ পড়েছে, এ রকম আলোচনা দ্বারা সে সব তথ্য আমরা জানতে পারি।

ত্বপুরের কথা-সাহিত্যের অধিবেশনে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন শ্রীমতী প্রতিভা বসু, শ্রীমতী আশাপূর্ণা সিংহ, শ্রীমতী বাণী রায়, শ্রীনারায়ণ গাঙুলী, শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য ও পূর্ববঙ্গের সুফী মোতাহার হোসেন প্রভৃতি সাহিত্যিকবৃন্দ। সভাপতি শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় বলেন—গত পাঁচ বছর ধরে বাঙলা ভাগ হয়েছে। আমাদের এই সাহিত্য-মেলার বিশেষ উদ্দেশ্যটি হচ্ছে বিভক্ত-বাঙলার সাহিত্যিক-গণের মেলামেশা এবং এই পাঁচ বছরে দু'বাঙলার সাহিত্য কোন্ কোন্ বিশেষ ধারায় চলছে তা'রই একটা মোটামুটি হিসেবনিকেশ করা। বাঙলা আর-সব বিষয়ে পৃথক হলেও সাহিত্যক্ষেত্রে তাদের মধ্যে ঐক্য রাখবার জন্য এই মেলা করবার বিশেষ প্রয়োজন বোধ করছিলাম। এখানে পূর্ববঙ্গীয় পশ্চিমবঙ্গীয় সাহিত্যিক-বর্গের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে এবং এই অধিবেশনে তাঁদের ভাষণ ও আলোচনা শুনে মোটামুটিভাবে দু'বাঙলার সাহিত্য সম্বন্ধে সবারই কিছু ধারণা হল। সাহিত্যক্ষেত্রে বাঙালী ভেদ-বিভেদ ভুলে এক হয়ে মিলতে পারবে এ আশ্বাস এ সাহিত্য-মেলা থেকে পাওয়া গেল।

সন্ধ্যার অধিবেশনে পূর্ববঙ্গের কাজী আবদুল ওদুদ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং প্রবন্ধ-সাহিত্য নিয়ে ভাষণ পাঠ ও আলোচনা করেন শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীগোপাল হালদার, পূর্ববঙ্গের সুফী মোতাহার হোসেন, "রবীন্দ্র-

জীবনী"কার শ্রীপ্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন এবং শ্রীঅম্লানকুসুম দত্ত। অন্যান্য দেশের তুলনায় যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ-সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমাদের দেশের রচনা যে এখনো অনেক দুর্বল, এ সব নিয়েই বিশেষ আলোচনা হয়।

পরদিন সকাল দশটায় চীনভবনে শ্রীযুক্ত যতীন সেনগুপ্ত কবিতা পাঠ করে শোনান। আশ্রমের উৎসব শেষ হয়ে আবার দৈনন্দিন কাজের ধারা শুরু হয়ে গেল। বসন্তের সম্বর্ধনা ফুরোতে না ফুরোতে গরমের হাওয়া বইতে শুরু করেছে। আকাশের কোণে কোণে দেখা যাচ্ছে কাল-বৈশাখী-মেঘের ঘোরালো সূচনা।

৯।৩।১৯৫৩

*　　　*　　　*

শ্রীনিকেতন কুটীর-শিল্প-শিক্ষালয়ের অধ্যক্ষ এবং অধ্যাপক শ্রীসন্তোষকুমার ভঞ্জ আমেরিকা-যুক্তপ্রদেশের সরকারী বৃত্তি লাভ করে আমেরিকা গিয়েছিলেন, সম্প্রতি সেখান থেকে ফিরে এসেছেন। পঞ্চাশটি দেশের প্রায় তিন শ' শিক্ষক টিচার ট্রেনিং নিতে গিয়েছিলেন। প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং কারিগরী শিক্ষা—এই তিনভাগে বিভক্ত হয়ে শিক্ষকদল বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষালাভ করেছেন। শ্রীযুক্ত ভঞ্জ কারিগরী এবং কুটীরশিল্প সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করেছেন। অল্প কিছুদিন ওয়াশিংটনে প্রাচ্য শিক্ষা লাভ করে তাঁরা পেনসিলভানিয়া স্টেটে শিল্প এবং কারিগরী শিক্ষা নিতে যান। বিদেশী শিক্ষকদের জন্য সরকার বিশ্ববিদ্যালয়েই শিক্ষালাভের ব্যবস্থা করেছিলেন। এই পেনসিলভানিয়া প্রদেশই আজকাল শিল্প এবং কারিগরী শিক্ষায় এবং কাজে আমেরিকার অন্য সমস্ত প্রদেশ থেকে অগ্রণী। শ্রীযুক্ত ভঞ্জ নানা প্রতিষ্ঠানে সভাসমিতিতে যোগ দিয়েছেন; নানা শিল্পাগার, কারখানা ঘুরেছেন, অনেক কৃষি ও শিল্প মেলা, প্রদর্শনী এবং মিউজিয়ামও দেখেছেন। ওয়াশিংটনের শিক্ষা-অফিসে এবং পেনসিলভানিয়া স্টেটের কলেজে শ্রীযুক্ত ভঞ্জের চামড়ার কাজ, ধাতু, কাঠ, তাঁত, মাটি প্রভৃতির শিল্প-কাজ দেখানো হয়েছিল। সে সব উচ্চপ্রশংসিত হয়েছে। বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারের সহ-গ্রন্থাগারিক শ্রীবিমলকুমার দত্ত কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার-বিভাগ থেকে স্নাতক উপাধি লাভ করে সম্প্রতি দেশে ফিরে এসেছেন। কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'লক্ষের অধিক গ্রন্থের কীভাবে শৃঙ্খলা এবং সুবন্দোবস্ত করা হয়েছে সে সব বিষয়ে তিনি জ্ঞানলাভ করেছেন। এর আগে তিনি আন্তর্জাতিক-সরকারী বৃত্তি লাভ করে অস্ট্রেলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার-সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হয়েছিলেন। মে মাসের প্রথমেই তিনি গ্রন্থাগারের কাজে যোগদান করেছেন। বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারিক 'রবীন্দ্রজীবনী'কার

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের কাজের সময় ২৪ জুলাই (১৯৫৩) থেকে আরো এক বছর বাড়ানো হয়েছে। বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ ডঃ ক্ষিতিমোহন সেন এবং ডঃ নন্দলাল বসুকে তাঁদের বিশ্বভারতীতে কাজ করার নিদর্শনস্বরূপ জীবৎকাল অবধি অবসরপ্রাপ্ত-অধ্যাপক নিযুক্ত করেছে।

ছুটির আগে মার্চ থেকে এপ্রিলের মধ্যে কলাভবনে মাসাধিকাল শিল্প-প্রদর্শনী হয়ে গেছে। চতুর্থ বার্ষিক এবং তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের প্রদর্শনী; দুটিই বেশ ভাল হয়েছিল। চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের এটাই ডিপ্লোমাপ্রাপ্তির প্রদর্শনী, এ চার বছরে তারা যত কাজ করেছে সব-কিছু এই প্রদর্শনীতে দেখাতে হয়েছিল।

এ সময়েই 'সাহিত্যিকা' থেকে চীনাভবনে কলাভবনের ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত প্রাক্তন ছাত্র শ্রীগোলকবিহারী দাসের প্রদর্শনী হয়ে গেছে। স্থানীয় চিত্র-শিল্পী-রসজ্ঞদের কাছে চিত্রগুলি আদৃত হয়েছে। ৭।৫।১৯৫৩

* * *

এখানে রাষ্ট্রভাষা-প্রচার-সমিতির পরীক্ষাগুলি বছর চার-পাঁচ হয় হিন্দিভবনের পরিচালনায় গৃহীত হচ্ছে। দু'এক বছর খুব ভালো ফল হতে দেখা গেছে। এবারও এখান থেকে 'কোবিদ্', 'পরিচয়', 'প্রবেশক', প্রভৃতি পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়েছিল। ফল মন্দ হয় নি, প্রায় সবাই ভালো ভাবে পাস করেছেন। কোবিদ্ হয়েছেন ২ জন। তার মধ্যে একজন মহিলা বাংলাদেশে কোবিদের মৌখিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। অ-বাঙালী এবং বিদেশী ছাত্রছাত্রীগণ হিন্দি, বাংলা প্রভৃতি ভারতীয় ভাষা আগ্রহের সহিত শিখছেন। তাঁরা হিন্দির পরীক্ষা দিতে তত উৎসাহী নন,—ভাষা শিখতে ও সাহিত্য পড়তেই তাঁদের আগ্রহ বেশি।

* * *

হিন্দিভবনে দুটি দান পাওয়া গেছে। একটি এসেছে বিহার গভর্নমেণ্টের রাষ্ট্রভাষা পরিষদের তরফ থেকে,—ডক্টর হাজারিপ্রসাদ দ্বিবেদীজীর হিন্দি গ্রন্থ—"কবীর-পন্থী সাহিত্য"—প্রকাশের কাজে; অন্যটি হিন্দিভবনের গ্রন্থাগারের ব্যবস্থার জন্য লুধিয়ানার শ্রীযুক্তা তৃপ্তা রায় দান করেছেন।

"কাশী নাগরী প্রচারিণী সভা"টি সমগ্র ভারতে হিন্দিভাষা প্রচার ও হিন্দি সাহিত্যের উৎকর্ষ বিধান সম্পর্কে একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান। গৌরবের বিষয়, বিশ্বভারতী-হিন্দিভবনের অধ্যক্ষ ডক্টর হাজারিপ্রসাদ দ্বিবেদী মহাশয় সম্প্রতি উক্ত সভার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। হিন্দিভবনের প্রাক্তন অধ্যাপক ডক্টর

রাম সিং তোমর। তিনি বর্তমানে রোম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা এবং গবেষণার কাজে নিযুক্ত আছেন। ইতালীয়ান সাহিত্য সম্বন্ধে ইতালীয় ভাষাতে তিনি তাঁর গবেষণার বিষয় লিপিবদ্ধ ক'রে সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে শীঘ্রই দাখিল করবেন। হিন্দিতে সমগ্র রবীন্দ্র-রচনাবলী অনুবাদ ও প্রকাশের ব্যবস্থাভার গ্রহণ করেছেন হিন্দিভবন। ইতিমধ্যে ছেলেবেলা (মেরা বচ্‌পন্), নটীর পূজা (নটী কী পূজা), মালঞ্চ (ফুলওয়াড়ী), দুই বোন (দো বহ্‌নে) ও চতুরঙ্গ প্রকাশিত হয়েছে। 'গীতাঞ্জলি'র সর্বাঙ্গসুন্দর একটি হিন্দি সংস্করণ অগৌণেই প্রকাশিত হবে। ৪।৮।১৯৫৩

*　　　*　　　*

বৌদ্ধ সাহিত্য ও দর্শন আলোচনার জন্য বিশ্বভারতীতে ভারতীয় তিব্বতী ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার ব্যবস্থা অনেক দিন থেকেই আছে। বৌদ্ধ সাহিত্য ও দর্শনের প্রথম পরিদর্শক অধ্যাপক Sylvain Levi এ-বিষয়ে বিশেষ যত্ন নিয়েছিলেন এবং তাঁরই চেষ্টায় বিশ্বভারতীতে সংস্কৃত আর পালিই শুধু নয়, বৌদ্ধ সাহিত্য ও দর্শনের তিব্বতী ও চীনা অনুবাদও পড়াবার ব্যবস্থা হয়েছে। বিশ্বভারতী থেকে প্রথম যে বৌদ্ধ-সাহিত্যের গবেষণা-পুস্তক প্রকাশিত হয়, সেটি হচ্ছে সংস্কৃতে লেখা নাগার্জুনের 'মহাযানবিংশক' এবং সেটি চীনা ও তিব্বতী ভাষা থেকে পুনর্মুদ্রিত। তিব্বতী লামাগণ এখানে বহুদিন থেকে এসেছেন। শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু গ্রন্থাগারের বারান্দায় তাঁদের Fresco-চিত্র আঁকবারও আগে থেকে তাঁদের এখানে আনাগোনা হয়েছে। বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে এতদিন অবধি একটি ভাল তিব্বতী পুস্তক-বিভাগ ছিল। তাঁর মধ্যে তিব্বতী প্রাচীন ক্ল্যাসিক্যাল সাহিত্য কানজুর ও তাঞ্জুরের সম্পূর্ণ সংগ্রহ রয়েছে পাঁচ'শ গ্রন্থে।

খুবই আনন্দের বিষয় যে, বিশ্ববিদ্যালয় অর্থ-সমিতি (University Grants Commission) বিশ্বভারতীতে একটি স্বতন্ত্র ভারতীয়-তিব্বতী শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করবার প্রস্তাব করেছেন এবং তাঁরাই তার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করবার দায় গ্রহণ করবেন জানা গেছে। গত ১৫ মার্চ থেকে ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচীর কর্তৃত্বাধীনে এবং দু'জন অধ্যাপকের সাহায্যে এ বিভাগের কাজ কিছু-কিছু আরম্ভ হয়েছে। বিশ্বভারতী আইনের দ্বিতীয় ধারা অনুসারে প্রাচ্যের বিভিন্ন সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে ভারতের সাহিত্য ও সংস্কৃতির সাম্য ও পরস্পর মিলনের যে প্রস্তাব রয়েছে শিক্ষার মধ্য দিয়ে সেই ধারা অনুসারে বিশ্বভারতীতে এ শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হল। এ কেন্দ্র থেকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হবে—

১। প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক যুগ অবধি ভারতীয়-তিব্বতী সাংস্কৃতিক

ঐক্যের গবেষণা ও অনুশীলন করা। ২। সাধারণভাবে সমগ্র তিব্বতীয় সাহিত্য সংস্কৃতির অনুশীলন ও বিশেষ ক'রে বৌদ্ধ-সাহিত্য ও দর্শন সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা। ৩। তিব্বতীয় অনুবাদের মধ্যে যে-সব প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ আছে সে-সব রক্ষা করা। ৪। ভারতীয় ও বিদেশী ভাষায় তিব্বতী গ্রন্থসমূহ অনুবাদ ক'রে সহজলভ্য করা। ৫। ভারতের এবং অন্যান্য দেশের ভারতীয়-তিব্বতী শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে এ শাখার গবেষণাকে ব্যাপক ও উন্নততর করা। ৬। এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ও শিক্ষকগণ যে-সব গবেষণা করবেন তা প্রকাশ করা। ৭। তিব্বতী-জ্ঞান-সাধকদের সংস্কৃত ও পালিতে শিক্ষা-ব্যবস্থা এবং সংস্কৃত ও পালি বিশেষজ্ঞদের তিব্বতী ভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা করা। ৮। প্রাচীন ও আধুনিক তিব্বতীয় ভাষায় শিক্ষা ও ডিপ্লোমা দেওয়ার ব্যবস্থা করা। ৯। ভারতীয় ও তিব্বতীয় গবেষণার জন্য গ্রন্থাগার ও মিউজিয়ম স্থাপন করা। ৫।৪।১৯৫৪

* * *

গত ৭ই জুন সোমবার অপরাহ্ণে বিদ্যাভবনে একতলায় সদ্যশিক্ষিত জন-সাধারণের মধ্যে সাহিত্য-অনুশীলনের প্রচারকল্পে পুস্তক রচনা শিক্ষা দেবার জন্য ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় শান্তিনিকেতন-শাখার উদ্বোধন হল। আগামী এক মাস এর কাজ চলবে। প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেনের প্রস্তাবক্রমে বিশ্বভারতীর উপাচার্য ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী সভাপতির পদ গ্রহণ করে ক্ষুদ্র একটি ভাষণ দ্বারা কার্যারম্ভ করেন। আসাম, মণিপুর, উড়িষ্যা, ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গের সর্বসুদ্ধ পঁচিশজন নির্বাচিত শিক্ষার্থীর মধ্যে সভায় সেদিন সতেরো জন উপস্থিত ছিলেন। তা ছাড়া বিশ্বভারতীর কর্মসচিব, সহ-কর্মসচিব, বিশ্বভারতী লোকশিক্ষা-সংসদের সহ-সম্পাদক, কতিপয় বিভাগীয় অধ্যক্ষ ও উপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় ও শ্রীযুক্তা লীলা রায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। প্রতিষ্ঠানের শুভ কামনা করে ডঃ বাগ্‌চী বলেন,—শিক্ষিত-সাধারণের জন্যই এতদিন যা-কিছু সাহিত্য-সৃষ্টির কাজ হয়ে এসেছে, গ্রামের সাধারণের কথা আমরা একপ্রকার ভুলেই ছিলাম। আনন্দের বিষয় যে, তাদের উপযোগী সাহিত্য-রচনার কাজেও এবার থেকে আমরা ব্রতী হচ্ছি। আগে আমাদের দেশে শিক্ষিতদের উপভোগের জন্য সংস্কৃতে রচিত ছিল কালিদাসের কাব্য প্রভৃতি, তেমনি সাধারণের জন্য ছিল পুরাণ ও তন্ত্রাদি। জানা থাকা দরকার যে এদেশের সাধারণ-মানুষ অশিক্ষিত নয় তারা অনেক-কিছু জানে,

কেবল তাদের আক্ষরিক-লেখাপড়া শেখারই যা অভাব। আমাদের চেয়ে তাদের ভাষা স্বতন্ত্র। আমাদের তা আয়ত্ত করে নিতে হবে। নয়তো যাই বলা হোক, তারা কিছুই বুঝবে না। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের কথা স্মরণীয়। তিনি তাদের ভাষা চয়ন ক'রে নিয়ে বললেন 'মনের মানুষ'; বললেন—'খাঁচার পাখী'; শিক্ষিতদের ভাষায় এরূপ ব্যঞ্জনাপূর্ণ শব্দ দুর্লভ। দেশীয় সাধারণ-শ্রেণীর লোকে বলামাত্রই এর মর্ম বুঝবে। তাদের জন্য লেখবার আগে তাদের কাছেই আমাদের কিছু শেখবার আছে;—সে কথাই এ ক্ষেত্রে বিশেষ করে মনে রাখা চাই। ১৬।৬।১৯৫৪

* * *

৭ই অগস্ট দিনটি আরেকজন বিশিষ্ট বাঙালী সাহিত্যিকের জন্মতিথি। —প্রমথ চৌধুরী, যিনি 'বীরবল' নামে একদিন লেখনী ধারণ করেন ও 'সবুজপত্র' প্রকাশ ক'রে বাঙলা-সাহিত্যের দিক পরিবর্তন ক'রেছিলেন, তিনি এ দিনটিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মতিথি স্মরণ করে বিশ্বভারতী কর্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থাবলীর উল্লেখ করা সমীচীন বলে মনে হয়। বিভিন্ন প্রবন্ধ-পুস্তকে ও সাময়িকপত্রে মুদ্রিত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের প্রবন্ধাবলী থেকে নির্বাচিত পঞ্চাশটি রচনার সংকলন নিয়ে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে 'প্রবন্ধ-সংগ্রহ'। এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখযোগ্য যে, বিশ্বভারতী-গ্রন্থবিভাগ থেকে শীঘ্রই প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের 'কাব্য-সংগ্রহ'ও প্রকাশিত হবে। সামনে আসছে লেখকের মৃত্যুতিথি ২রা সেপ্টেম্বর। বাঙালী সাহিত্যিক-সমাজ এবং অনুরাগী পাঠকবৃন্দ তাঁকে স্মরণ করবার সময় তাঁর এই গ্রন্থগুলির প্রকাশ সংবাদে সুখী হবেন, সন্দেহ নাই। শান্তিনিকেতনে প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের জীবনের শেষপর্ব অতিবাহিত হয়েছে। এখনো তদীয় সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী শান্তিনিকেতনে বাস করে এর বিবিধ কার্যে আত্মনিয়োগ করেছেন। শুধু কবিগুরুর নন, আশ্রমেরও এঁরা আত্মীয়। 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'র প্রথম সম্পাদক ছিলেন প্রমথ চৌধুরী মশায়। তাঁর জন্ম ও মৃত্যুতিথিতে সে সব কথা বিশেষ করেই স্মরণীয়। ১৮।৮।১৯৫৪

* * *

বিশ্বভারতী থেকে সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য। বিশ্বভারতীর বিদ্যাভবনে ঐস্লামিক সংস্কৃতির রীডার এফ. এম. আসিরি কর্তৃক লিখিত 'Studies in Urdu Literature' গ্রন্থটিতে তিনটি প্রবন্ধে উর্দু সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি, গালিব ও ইকবালের দর্শন প্রভৃতি আলোচিত হয়েছে। উর্দু কবিদের মধ্যে গালিব ও ইকবালই সর্বশ্রেষ্ঠ। এ প্রবন্ধ দুটি থেকে তাঁদের সম্বন্ধে বহু

বিষয় জানা যায়। বিদ্যাভবনের ওড়িয়া-ভাষার লেকচারার শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী দাস সংকলিত ও সম্পাদিত 'পল্লীগীতি-সঞ্চয়' গ্রন্থে প্রায় কুড়ি হাজার ওড়িয়া পল্লীগীতি মুদ্রিত হয়েছে। শ্রীযুক্ত দাস প্রায় ষাট হাজার ওড়িয়া পল্লীগীতি সংগ্রহ করেছেন; বিভিন্ন খণ্ডে সেগুলি প্রকাশিত হবে। রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্য' গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম সংস্করণ হয়েছিল ১৯০৭ সনে, তাতে মাত্র এগারটি প্রবন্ধ ছিল। বর্তমান সংস্করণে পঁচিশটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে, তার মধ্যে সাহিত্য বিষয়ে এগারটি প্রবন্ধ নূতন। গ্রন্থ-পরিচয়ে সাহিত্য বিষয়ে বহু তথ্য পাওয়া যাবে। আনন্দের বিষয় শ্রীক্ষিতীশ রায় সম্পাদিত 'বিশ্বভারতী কোয়ার্টারলি' উনবিংশতিতম বর্ষ অতিক্রম করল। শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকার এত দীর্ঘদিন স্থায়িত্ব গৌরবের কথা। এই পত্রিকাতে শুধু ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের গুণীজ্ঞানীরাই লেখেন না, ভারতের বাইরের অনেকেও লিখে থাকেন। উল্লিখিত পত্রিকাটি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের রচনাসম্ভারে পরিপূর্ণ। সকলেই এরকম একটি পত্রিকার দীর্ঘায়ু কামনা করবেন। ২৫।৯।১৯৫৪

*　　　*　　　*

'চীন-ভারত-শিক্ষা' (The Sino-Indian Studies) বলে একটি গবেষণা-মূলক ত্রৈমাসিক পত্রিকা ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী সম্পাদক ও প্রকাশক হয়ে বের করতেন। চীন থেকে প্রাপ্ত ভারতীয় ইতিহাস ও সভ্যতার বিষয়বস্তু নিয়ে তার কাজ চলত। সে পত্রিকাটির প্রকাশের দায়িত্ব বিশ্বভারতী চীন-শিক্ষা-বিভাগের অন্তর্গত করে গ্রহণ করেছেন। সম্প্রতি স্থির হয়েছে 'সাহিত্য প্রকাশিকা' নাম দিয়ে প্রাচীন বাংলা-সাহিত্য সম্পর্কে গবেষণামূলক রচনাগুলি ক্রমপর্যায়ে মুদ্রিত করা হবে। ১৬।১০।১৯৫৪

*　　　*　　　*

বিশ্বভারতী থেকে সম্প্রতি যে ক'খানা নতুন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'চিত্রবিচিত্র'। 'সহজপাঠ' রচনাকালে (পৌষ ১৩৩৬) ছোট ছেলেমেয়েদের আনন্দপ্রদ ও পাঠোপযোগী কতকগুলি কবিতা রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন। তার সবগুলি গ্রন্থে মুদ্রিত হয় নি। গ্রন্থে অসংকলিত কতকগুলি কবিতা এবং 'সহজপাঠ', 'ছড়া ও ছবি', 'গল্প-সল্প' প্রভৃতি গ্রন্থের পরিচিত ও স্বল্প-পরিচিত মনোরম কতকগুলি কবিতা নিয়ে 'চিত্রবিচিত্র' গ্রন্থ মুদ্রিত হয়েছে। শিশু ও তরুণদের পড়বার পক্ষে সংগ্রহটি বিশেষ উপযোগী। উপরে শ্রীনন্দলাল বসু অঙ্কিত রঙীন সিংহ-মূর্তিটি অতুলনীয়; শিশু-মন-হরণের জাদু তার রেখায় রেখায়।

ভারত-সরকারের বৈদেশিক দপ্তর থেকে দু'বছরের জন্য ভিয়েন্টিনার লাওসে অবস্থিত আন্তর্জাতিক-কমিশনের কন্‌ফারেন্স-সেক্রেটারী-হিসাবে যোগদানের জন্য বিশ্বভারতী থেকে একজন লোক চাওয়া হয়েছিল। বিশ্বভারতীর উপাচার্য ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী শ্রীক্ষিতীশ রায়কে মনোনীত করেন। ৮ই অক্টোবর তিনি দমদম থেকে বিমানযোগে লাওসে গিয়ে যথাসময়ে কাজে যোগ দিয়েছেন। শ্রীরায় প্রায় কুড়ি বছর যাবত শান্তিনিকেতনে বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত আছেন। প্রথমে তিনি ইংরেজীর অধ্যাপকরূপে এখানে আসেন। তারপরে শ্রীযুক্তরথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রাইভেট-সেক্রেটারী হন। বিনয়ভবনে রেজিস্ট্রার ও বিশ্বভারতীর রেজিস্ট্রার পদেও তিনি কিছুদিন নিযুক্ত ছিলেন। সম্প্রতি রবীন্দ্র-সদনের অধ্যক্ষ-পদে কাজ করছিলেন। উপরন্তু শ্রীরায় দীর্ঘদিন যাবত 'বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি' ও 'বিশ্বভারতী নিউজ' সম্পাদনা করে এসেছেন। এই সব পত্রিকা-পরিচালনা ব্যাপারে ভারত ও ভারতের বাইরে বহু নরনারীর সঙ্গে তাঁর সংযোগ ঘটেছিল। সে-সূত্রে বহির্জগৎ সম্বন্ধে তিনি বিশেষ ওয়াকিবহাল ছিলেন। এদিকে শ্রীরায় রবীন্দ্রনাথকে ব্যক্তিগতরূপে ঘনিষ্ঠভাবেই জানতেন ; নিজে সাহিত্যিক, শিল্পরসিক ও সংগীতজ্ঞ এবং বিশেষরূপে রবীন্দ্রসাহিত্য-বোদ্ধা। রবীন্দ্রনাথকে তিনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যথাযথভাবে প্রচার করতে সক্ষম। —একথা অস্বীকার করা যায় না যে, রবীন্দ্রনাথকে বিশ্ববাসী সব দিক থেকে বুঝবার যথেষ্ট সুযোগ এখনও পায় নি। কিন্তু তাঁকে বিশেষভাবে জানতে উৎসুক। শ্রীরায় এক্ষেত্রেও যে যথার্থই উপযুক্ত কর্মী, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ২৬।১১।১৯৫৪

বিশ্বভারতীর প্রাক্তন ছাত্র শ্রীনিকেতনের কর্মী শ্রীনবকুমার মুখোপাধ্যায় কৃষি ও গোপালনাদি শিক্ষার জন্য ডেনমার্ক গিয়েছেন। প্রথমে তিনি এক বছর ক্ষেতে ও গোশালা প্রভৃতিতে হাতেকলমে কাজ শিখবেন। তার পর ছ'মাস তাঁকে কলেজে শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে। তাঁর শিক্ষাকালীন যাবতীয় খরচ বোরিস ডেনিশ স্মল হোল্ডারস্ ইউনিয়ন (Borris Danish Small Holder's Union) বহন করবেন। ৭।১২।১৯৫৪

* * *

বিশ্বভারতী থেকে কয়েক মাসের মধ্যে কয়েকখানি পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনের "ধর্মপদ-পরিচয়", মণীন্দ্রভূষণ গুপ্তের "সিংহলের শিল্প-সভ্যতা" এবং প্রবাসজীবন চৌধুরীর 'স্টাডিজ ইন কম্পারেটিভ এস্থেটিকস্'।

কলাভবনের বর্তমান-অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর কংগ্রেস-অধিবেশনের মণ্ডপের পরিকল্পনা ও সাজসজ্জার ভারপ্রাপ্ত হয়েছেন। পূজার ছুটির পরেই তিনি কলাভবনের ত্রিশজন ছাত্রছাত্রীসহ কল্যাণীতে চলে গেছেন। আশ্রমবাসিগণ প্রখ্যাত চীনের চিত্রকর জু পিয়নের মৃত্যু-সংবাদে মর্মাহত হয়েছেন। তিনি ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৩ পিকিং হাসপাতালে প্রাণত্যাগ করেন। ১৯৩৯-৪০ সালে তিনি শান্তিনিকেতনে পরিদর্শক-অধ্যাপকরূপে বাস করেছিলেন এবং শান্তিনিকেতন কলকাতা দিল্লী প্রভৃতি স্থানে তাঁর চিত্র-প্রদর্শনী হয়েছিল। এখনও আশ্রমবাসী অনেকের চোখেই সেই লম্বা-আলখাল্লা-পরিহিত সৌম্যমূর্তি ভাসছে, এক হাতে স্কেচ-বুক নিয়ে তিনি এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তাঁর আঁকা গুরুদেব, গান্ধীজী এবং আশ্রমের ছাতিমতলার ছবি 'বিশ্বভারতী-কোয়ার্টালি' পত্রিকা এবং 'বিশ্বভারতী নিউজ'-এ বেরিয়েছিল। তিনি এখান থেকে চলে গিয়েও আশ্রমের সঙ্গে যোগ রেখেছিলেন। আশ্রম একজন বন্ধু হারালো এবং চীনদেশ হারালো একজন প্রকৃত গুণী চিত্রকর।

*　　　*　　　*

আশ্রম-পরিদর্শক ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং আশ্রমের আচার্য জওহরলাল নেহরু বিশ্বভারতীর হিন্দীভবন-গ্রন্থাগারে তাঁদের আত্মকথার হিন্দী-অনুবাদ গ্রন্থ দান করেছেন। ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁর রচনার কিছু ইংরাজি গুজরাটি ও মালয়ালাম অনুবাদও দিয়েছেন।

*　　　*　　　*

শ্রীযুক্ত তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে লেখা রামগোবিন্দ দাসের "শ্রীরাম-কীর্তন" (লঙ্কাকাণ্ড) নামক হাতে লেখা পুঁথি দান করেছেন। পুঁথিখানি খুবই দুর্লভ জিনিস। ডঃ মৈত্রেয়ী বসুও পঞ্চদশ শতাব্দীর বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের রচিত "মনসা বিজয়" পুঁথি শ্রীযুক্ত অনিলকুমার চন্দ মহাশয়কে দিয়েছিলেন বিশ্বভারতীতে দিতে। সে বইও পাওয়া গেছে। ১৪।১২।১৯৫৪

*　　　*　　　*

'বিশ্বভারতী নিউজ' বর্তমান জুলাই মাসে চতুর্বিংশতি বর্ষে উপনীত হল। বছরের এই প্রথম সংখ্যা থেকেই শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য এই পত্রিকা-সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেছেন। শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য বর্তমানে বিশ্বভারতীর স্থানীয় প্রেস ও গ্রন্থন-বিভাগের পরিচালনার কাজে নিযুক্ত আছেন। এ বছরের প্রথম সংখ্যাতে রবীন্দ্রনাথের 'আশ্রমের ছাত্রদের প্রতি' নামক একটি ভাষণ সংগৃহীত হয়েছে।

'বিশ্বভারতী নিউজে'র ১৯৩২ সনে প্রথম সংখ্যার জন্য রবীন্দ্রনাথ একটি আশীর্বাণী দিয়েছিলেন, সেটিও এ সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। নূতন বছরে আশ্রমে নূতন-নূতন ছাত্রছাত্রীর সমাগম হয়। এই উপলক্ষে ছাত্রছাত্রীদের নিজের কাছে আহ্বান করে গুরুদেব আলাপ-পরিচয় করতেন, তাঁর যা বক্তব্য থাকত, তাদের জানাতেন। আর সে স্থযোগ নেই। নানাসময়ের সে সব কথা পুরানো 'নিউজে' সংকলিত রয়েছে। কিন্তু ছাত্রছাত্রীগণ আশ্রমের নূতন পত্রিকাগুলিই সাধারণত পড়ে থাকেন, পুরানো পত্রিকাগুলি থাকে লাইব্রেরীর শেলফে-তোলা, থাকে অগোচরে। রবীন্দ্রনাথের কথা তাঁরই ভাষায় জানবার উপায় এখন তাঁর ভাষণগুলি পুনর্মুদ্রণ করা। এই সদুদ্দেশ্যেই 'বিশ্বভারতী নিউজ'-এ এবার দুটি ভাষণ মুদ্রিত হয়েছে।

আশ্রমে হাতে-লেখা একাধিক মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়; পাঠভবনের ছাত্র-ছাত্রীদের সারা বছরের বাছাই-করা রচনা ও ছবির সংকলন নিয়ে মুদ্রিত পত্রিকা বের হয় মাত্র একটি—"আমাদের লেখা"। কয়েক বছর আগে পাঠভবনেরই একটি ছাত্র আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত নিজেই একটি মুদ্রিত পত্রিকা বের করেছিলেন, তার নাম ছিল "স্ফুলিঙ্গ"। সম্প্রতি আশ্রমেরই তিনজন ছাত্র ও কর্মী শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী, শ্রীবিশ্বজিৎ রায় ও শ্রীশুভময় ঘোষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একটি দ্বৈমাসিক পত্রিকা মুদ্রিত হয়েছে, নাম—'ঋতুপত্র'। তার গ্রীষ্ম ও বর্ষা সংখ্যা দুটি প্রকাশিত হয়েছে। দুটি সংখ্যাতে শ্রীনন্দলাল বসুর আঁকা চিত্র আছে। গ্রীষ্মের বর্ষারম্ভ সংখ্যায় অবনীন্দ্রনাথের একটি কবিতা "এ কার জন্য" এবং 'রাজা' নাটকের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি আলোচনা স্বর্গত কালীমোহন ঘোষের অনুলিখন থেকে সংগৃহীত হয়েছে। বর্ষা-সংখ্যা (আষাঢ়) পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের একটি গল্প রয়েছে—"মুসলমানীর গল্প",—অসুস্থ অবস্থায় তিনি সেটি মুখে মুখে বলেছিলেন—রবীন্দ্রসদনের সৌজন্যে সেটি এখন প্রকাশার্থে পাওয়া গেছে। শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর সৌজন্যে প্রাপ্ত পরলোকগত প্রমথ চৌধুরীর একটি সনেটও এ সংখ্যায় রয়েছে। পত্রিকা প্রকাশের এই নবতম উদ্যমকে সকলেই সম্বর্ধনা জানাচ্ছেন। ২২।৭।১৯৫৫

* * *

জুলাই সংখ্যার 'বিশ্বভারতী নিউজ'-এ রবীন্দ্রসদনে-প্রাপ্ত নূতন-প্রকাশিত কতকগুলি গ্রন্থের তালিকা দেওয়া হয়েছে। এই বইগুলির মধ্যে শ্রীপ্রমথনাথ বিশী রচিত "রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প" সমালোচনা-গ্রন্থটি নানাকারণে উল্লেখযোগ্য।

বৃদ্ধবয়সেও রবীন্দ্রনাথের মনে দুঃখ ছিল—তাঁর ছোট গল্পগুলির সম্যক আলোচনা হয় নি, দেশবাসী এগুলির সমাদর করলে না। অবশ্য মৃত্যুর পূর্বে গল্পগুচ্ছ সম্বন্ধে দু' একটি লেখা পড়ে তিনি খুশী হয়েছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরেই তাঁর ছোট গল্পগুলি নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা চলছে। এতদিন স্বতন্ত্র আকারে রচিত কোনো সমালোচনা-গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নি। রবীন্দ্রনাথের আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র শ্রীপ্রমথনাথ বিশী সে-ত্রুটি ক্ষালন করেছেন,—"রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প" রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প সম্বন্ধে প্রথম সমালোচনা-গ্রন্থ। গ্রন্থটি নানাদিক দিয়ে সমৃদ্ধ। উত্তর ও পূর্ববঙ্গের যে পদ্মা-বিধৌত জনপদ ও প্রাকৃতিক আবেষ্টনে রবীন্দ্রনাথের গল্প-রচনার স্রোত উৎসারিত হয়ে উঠেছিল, সে স্থানের ভৌগোলিক মানচিত্র গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের জীবনের এক বিশেষ অধ্যায় অতিক্রান্ত হয়েছে ঐ অঞ্চলে যাপন করে। সেখানকার কুঠি বা বসবাসের স্মৃতি কোন কিছুই যত্নপূর্বক রক্ষিত হয় নি। গ্রন্থকার এই গ্রন্থের মধ্যে ঐ অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতির মানচিত্র দিয়ে এবং গ্রন্থের প্রারম্ভে স্থানকালের বিশদ আলোচনা করে সে অভাব কিছুটা পূরণ করেছেন। এ ছাড়া গ্রন্থটির ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করেছে "তথ্যপঞ্জী" সমন্বিত পরিশিষ্টটি। আজকের দিনে রবীন্দ্র-সাহিত্যের তত্ত্বালোচনার চেয়ে তথ্য-সংগ্রহের প্রয়োজন অধিক। পরবর্তীকালে বর্তমানের তত্ত্বালোচনার মানের হয়তো ওঠানামা হবে; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সমকালবর্তী, সহযোগী, সহকর্মী ও পার্শ্বচরগণের দ্বারা যথাযথ তথ্য যত বেশী পরিমাণে সংগৃহীত ও সংরক্ষিত হওয়া সম্ভব, দূরকালবর্তীদের দ্বারা সে কাজ তত আশা করা যায় না। আলোচ্য গ্রন্থটির পরিশিষ্টে 'তথ্যপঞ্জী' সংযোগ করে বিশ্বভারতীর গ্রন্থন-বিভাগের সহযোগী অধ্যক্ষ শ্রীপুলিনবিহারী সেন মূল্যবান সম্পদ দান করেছেন। তবে এসব কিছুর উপরে প্রধান কথাটি হচ্ছে উল্লিখিত গ্রন্থটি উচ্চাঙ্গের সমালোচনা-গ্রন্থরূপে সমাদর পাবার উপযুক্ত। রচনাটির মধ্যে লেখকের নিজস্ব একটি দৃষ্টিভঙ্গি আছে; একটি মৌলিক ধারার অনুসরণ করে তিনি রবীন্দ্রনাথের গল্পের বিশ্লেষণ করেছেন। তাদের বিশেষ বিশেষ রূপ, রস ও আঙ্গিকের তাৎপর্য দেখিয়েছেন। গ্রন্থটি স্বল্পপরিসরে রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প সম্বন্ধে সমুজ্জ্বল একটি ধারণা জন্মাতে সক্ষম। ৩।৮।:৯৫৫

*　　*　　*

মাঝে অনেকদিন 'বিশ্বভারতী-পত্রিকাটি'র প্রকাশ বন্ধ ছিল। গত বাইশে শ্রাবণ রবীন্দ্র-স্মরণতিথি উপলক্ষে পুনরায় তা প্রকাশিত হয়েছে। শিক্ষিত,

বিশেষত সংস্কৃতিসম্পন্ন-মহলে এই পত্রিকাটির যথেষ্ট সমাদর আছে। এর পুনঃপ্রকাশে এখানে সকলেই খুশী হয়েছেন। এ সঙ্গে উল্লেখযোগ্য, এবারকার রবীন্দ্র-স্মরণতিথি উপলক্ষ্য করে আরেকটি মূল্যবান গ্রন্থ বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ থেকে প্রকাশিত হয়েছে, সেটি হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক আলোচনাপূর্ণ প্রবন্ধসমূহের একটি সংকলন-গ্রন্থ—'ইতিহাস'। কবি, কর্মী, জ্ঞানী, গুণী, শিল্পী প্রভৃতি বহুপ্রকারে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু তিনি যে ইতিহাসবেত্তা ও ঐতিহাসিকের দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন সে পরিচয় সম্যকভাবে পাওয়া যায় তাঁর ঐতিহাসিক প্রবন্ধগুলির মধ্যে। অধুনা দেশের শিক্ষিত-সমাজে ইতিহাসবিষয়ক গ্রন্থ ও আলোচনার তেমন অসদ্ভাব নেই এবং এই গ্রন্থের রচনাগুলিও ঐতিহাসিক বিবিধ তথ্যসম্ভারবাহী হয়েই সমৃদ্ধ। কিন্তু আপামর সাধারণ-শ্রেণীর লোকের মধ্যে ঐতিহাসিক বোধ বিস্তারের কার্যকরী পন্থার ইঙ্গিত বহন করে, এমন মৌলিক চিন্তাপূর্ণ রচনা বিরল। রবীন্দ্রনাথের রচিত সেরূপ একটি প্রবন্ধ আছে, নাম তার 'ইতিহাস-কথা'; ১৩১২ সালের 'ভাণ্ডার' পত্রিকায় সেটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। বলাবাহুল্য, এ গ্রন্থেও তা সন্নিবেশিত হয়েছে। গ্রন্থের সঙ্গে তার নাম-সাদৃশ্য কিছুটা বিদ্যমান। শিক্ষিত, অশিক্ষিত শ্রেণীনির্বিশেষে সকল মানুষেরই দৃষ্টি ও বিচারবুদ্ধি যাতে ইতিহাস-ভিত্তিক হয়, কবির এ আকাঙ্ক্ষা দূরকালের সে-প্রবন্ধে এবং আধুনিক আরো নানা লেখায় এ গ্রন্থে অনুভব করা যায়। প্রবন্ধগুলির মধ্যে সাহিত্যিকের লেখনীর সরসতা ও ঐতিহাসিকের বিচারশীলতার সমন্বয় ঘটেছে। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যথাযথ তথ্যাদি অবশ্য বেশি জমিয়ে তোলা হয় নি। দু'চারিটি তথ্যের উপরেই হয়তো এক-একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ রচিত হয়েছে। কিন্তু মননশীলতা ও দূরদৃষ্টির দ্বারা কবি যে-সব সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন সেগুলি খুবই অনুধাবনযোগ্য। ঐতিহাসিক প্রবন্ধের এক বিশেষ রূপে এ রচনাগুলিকে আখ্যাত না করে পারা যায় না। এতদিন এগুলি নানা গ্রন্থে ও 'রচনাবলী'তে ছড়িয়ে ছিল। একসঙ্গে পাঠের সুযোগ পাওয়া যায় নি; গ্রন্থাকারে সংকলিত হওয়াতে সে অভাব দূরীভূত হল। ৩।৯।১৯৫৫

১৩৫৭ সনে দোলপূর্ণিমার সময় শান্তিনিকেতনে তিনদিনব্যাপী 'সাহিত্য-মেলা'র অধিবেশন হয়েছিল। তার আয়োজন ছিল বড় আকারের। তাতে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের বহু সাহিত্যিক এবং চিন্তাশীল ব্যক্তির সম্মিলন ঘটেছিল। তারপরে দু বছর ধরে সেটি সূত্রাকারে আপনাকে রক্ষা করে আসছে—ঘরোয়া বৈঠকে। তার অস্তিত্বের খবর মিলেছে এবারও। ৭ই মার্চ দোলপূর্ণিমার আগের

রাত্রে বিদ্যাভবনে অর্থাৎ 'শান্তিনিকেতন'-গৃহের দ্বিতলে সাহিত্য-মেলার স্মৃতিবাসর অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রসিদ্ধ কথা-সাহিত্যিক শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁর ভাষণে গত এক বছরের বাংলা-সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতির একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেবার চেষ্টা করেন। তাঁর বক্তব্য-শেষে এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়। তাতে অংশ গ্রহণ করেন শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী, শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়, শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন, শ্রীঅমিয়কুমার সেন এবং শ্রীশুভময় ঘোষ। সমসাময়িক সাহিত্যের হিসেব-নিকেশ বা মূল্য-নিরূপণ করা সহজ নয়। খানিকটা বিবরণ সামনে থাকলে অবস্থা কিছুটা অনুমান করা যায়। বাংলা-সাহিত্যের একটা বার্ষিক খতিয়ান এদিক দিয়ে বিশেষ মূল্যবান। এই অধিবেশনটির সার্থকতা সেখানেই। এ মেলার অধিবেশন যাতে আরো অধিক পরিমাণে হয়, সে মর্মে একটি প্রস্তাব এবারকার অধিবেশনে উপস্থাপিত ও গৃহীত হয়। সভার শেষে কফি পান ও নৃত্য-গীতের ব্যবস্থা ছিল।

* * *

বিশ্বভারতীর বিভিন্ন বিভাগে সাহিত্য-সংস্থা রয়েছে। পাঠভবনে (স্কুলের) তিনটি বিভাগে (আদ্য, মধ্য ও শিশু) সপ্তাহে সপ্তাহে যথাক্রমে সভা হয়েই থাকে। শিক্ষাভবন, বিদ্যাভবন, কলাভবন, সংগীতভবন প্রভৃতি মিলিয়ে আছে 'সাহিত্যিকা'। এটি একান্তভাবে ছাত্রছাত্রীদেরই সংস্থা; তবে প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী, অধ্যাপক ও কর্মী সবাইকেই এর মধ্যে আহ্বান করা যেতে পারে। 'সাহিত্যিকা'র আগে এরূপ একটি সংস্থা ছিল 'বিশ্বভারতী-সম্মিলনী'। সেটি এখন আর নেই। উল্লিখিত সমস্ত সংস্থাগুলিই ছাত্রছাত্রীদের;—অধ্যাপক ও কর্মিগণ তাতে আহূত হয়ে যোগ দিতেন মাত্র। ২৩/২৪ বৎসর পূর্বে, ছাত্রছাত্রী, অধ্যাপক ও কর্মীদল মিলে বড় একটি সাহিত্যের আসর গড়বার প্রয়োজন একদিন অনুভূত হয়; প্রস্তাব ওঠে;— বাংলাসাহিত্য আলোচনা ও অনুশীলনের জন্য একটি সংস্থা থাকবে। কিন্তু প্রবীণগণ আলাপ-আলোচনা ক'রে বললেন—শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র-সাহিত্যের যথোচিত চর্চার ব্যবস্থা হওয়াটাই আগে বাঞ্ছনীয়। তাতে বাংলাসাহিত্য আলোচনারও যথেষ্ট কাজ হবে, কারণ, ভারতীয় ও বাংলা-সাহিত্যের শাখা-প্রশাখা এক হয়ে মিলেছে এসে রবীন্দ্র-সাহিত্য-মহাসাগরে; শুধু তাই নয়,— সমস্ত বিশ্ব-সাহিত্যের ভাবধারার সংগমস্থল এই রবীন্দ্র-সাহিত্য। ব্যাপকতর সাহিত্যক্ষেত্রের সন্ধানও মিলবে এ সাহিত্যে। সেই যুক্তির ফলে শান্তিনিকেতনে স্থাপিত হল সেদিন 'রবীন্দ্র-পরিচয় সভা'। অনেক বছর এর কাজ চলেছিল।

বিভিন্ন বিভাগে এর কাজ ভাগ করা ছিল—পাঠচক্র, সংগীত ও নাট্য, সাধারণ বক্তৃতা, সাহিত্য-সভা প্রভৃতি। আশ্রমের ছোট-বড় সবাই এ সভায় যোগ দিয়ে রবীন্দ্র-সাহিত্য-শিল্প-সংগীত-নাট্য প্রভৃতির পরিচয় লাভ করতেন। ১৩৩৮ সনে এই সংস্থাটির উদ্যোগেই রবীন্দ্রনাথের সত্তর-বছর-বয়সের জন্মতিথি উপলক্ষে 'জয়ন্তী-উৎসব' সম্পন্ন হয় এবং তদুপলক্ষে 'জয়ন্তী উৎসর্গ' গ্রন্থও এই সভাই প্রকাশিত করেন। স্বর্গত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর এর সাধারণ বক্তৃতা-বিভাগে ধারাবাহিকভাবে রবীন্দ্রনাথের সংগীত সম্বন্ধে তিনটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। 'রবীন্দ্র-পরিচয় পত্রিকা' নামে হাতে-লেখা পত্রিকায় সব লেখা ও বক্তৃতা প্রকাশ করা হত। বাংলা-সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ কীর্তিরও সূত্রপাত হয়েছিল এই 'রবীন্দ্র-পরিচয় সভা' থেকে। বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারিক ও ঐতিহাসিক শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এই সভার খাতাতেই প্রথমে স্বাক্ষর দিয়ে সংকল্প প্রকাশ করেছিলেন যে, তিনি রবীন্দ্রজীবনী লিখবেন। সেই প্রতিশ্রুতির পরেই তিনি 'রবীন্দ্র-জীবনী' রচনায় প্রবৃত্ত হন। আজ তার ফল সকলের কাছে সুগোচর। সভাটি এখন স্তিমিত হয়েছে। সম্প্রতি আবার গড়ে উঠছে এই 'সাহিত্য-মেলা'। আশা করা যায় বিগত দিনের ইতিহাস থেকে নবাগত দল পথ-চলার উৎসাহ ও সংকেত লাভ করবেন। রবীন্দ্র-পরিবেশে বাংলা তথা রবীন্দ্র-সাহিত্যেরও চর্চা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই হওয়ার কথা। আয়োজন সার্থক হলে তার চেয়ে আনন্দের বিষয় আর কিছু হতে পারে না। ১৯।৩।১৯৫৬

১৯৩৭ সালে শান্তিনিকেতনে বাংলা-সাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ চর্চার জন্য 'সাহিত্যিকা'র উদ্ভব হয়েছিল। 'সাহিত্যিকা' নাম দিয়েছিলেন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ নিজেই। তিনি তখন থাকতেন শ্রীনিকেতনে। শান্তিনিকেতনের উচ্চতর বিভাগগুলির ছাত্রছাত্রীরা মিলিত হয়ে বাংলা-সাহিত্য আলোচনার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনে উদ্যোগী হলেন। তাঁরা গেলেন গুরুদেবের কাছে একটা নাম ঠিক করে নেবার জন্য। ঘরে ঢুকতেই গুরুদেব বললেন, "কিরে, আশ্রম ছেড়ে পালিয়ে এসেছি। আবার এখানেও পিছু তাড়া করেছিস। কী করতে হবে বল?" আর্জি পেশ করা হল। একটু ভেবে তিনি বললেন, "আজকাল তো 'ইকা' যোগ করে অনেক শব্দ হচ্ছে, এর নাম দে সাহিত্যিকা"। ছেলেরা খুশি হয়ে ফিরে এল। প্রতিষ্ঠিত হল 'সাহিত্যিকা'। সাহিত্যসভা, পাঠচক্র, আলোচনা-সভা, বিতর্কসভা ও কাব্য পাঠ ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে সাহিত্যিকা গড়ে উঠতে লাগল। তারপর যখন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় হল তখন এই প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রীদের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করেছে। শুধু বাংলা-সাহিত্যের চর্চায় নিযুক্ত না থেকে

আশ্রমের অন্যান্য আনুষ্ঠানিক কাজেও অংশ গ্রহণ করছে। এই প্রতিষ্ঠানটির উদ্ভবের মূলে আশ্রমের তৎকালীন বাংলা-সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টার কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কিছুদিন আগে বিশ্বভারতী 'ছাত্র-সম্মিলনী' বিশেষভাবে সক্রিয় হয়েছে। সেজন্য 'সাহিত্যিকা'র অন্যান্য কাজ কমে যাওয়ায় এখন তা শুধু বাংলা-সাহিত্য চর্চার প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করবে বলে ঠিক হয়েছে। আর বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা-বিভাগের ছাত্রছাত্রীরাই এর পরিচালনা করবেন। অবশ্য অংশ গ্রহণের অধিকার বিশ্বভারতীর সকলেরই আছে। বাংলা-বিভাগের প্রধান অধ্যাপক পদাধিকার বলে 'সাহিত্যিকা'র উপদেষ্টা হিসেবে পরিচালনার কাজে সহায়তা করবেন। গত ১২ই মার্চের অধিবেশনে বর্তমান বৎসরে 'সাহিত্যিকা' পরিচালনা করবার জন্য যে কর্ম-সমিতির নির্বাচন হয়ে গেছে, তাতে উপদেষ্টা হয়েছেন শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন, সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন শ্রীঅমিয়কুমার সেন আর যুগ্ম-সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন শ্রীপূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমতী প্রতিমা মুখার্জী।
২৫।৩।১৯৫৬

শান্তিনিকেতন থেকে প্রকাশিত 'ঋতু-পত্রের' শীত-সংখ্যা বার হয়েছে। এতে 'আধুনিক চীন সাহিত্য' সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন অরুন্ধতী ঠাকুর। তারপর আছে শ্রীজ্যোতি ভট্টাচার্যের 'সংস্কৃতির উত্তরাধিকার' নামে প্রবন্ধ। প্রবন্ধটি ধারাবাহিকভাবে হেমন্ত ও শীত সংখ্যায় বের হয়েছে। প্রবন্ধটি নানা কারণে আলোচনার যোগ্য। বর্তমান ভারতীয় সভ্যতার বিবর্তনে এতদিন পশ্চিম ইউরোপের রেনেশাঁর আদর্শ প্রেরণা জুগিয়েছে। আজ পশ্চিম-ইউরোপ নিজে সেই রেনেশাঁর আদর্শে অবিশ্বাসী। সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক কারণে রেনেশাঁর মানবতাবাদ, যুক্তিবাদে আর তার বিশ্বাস নেই। জীবনে মঙ্গলের চিহ্ন পশ্চিম-ইউরোপের চিন্তাশীল, সাহিত্যিক ও শিল্পীরা কোথাও দেখতে পাচ্ছেন না। তাই তাঁরা মনে করছেন জীবনে পাপ ও অন্যায়ই হচ্ছে সবচেয়ে স্বীকারযোগ্য শক্তি। খৃষ্টীয় দর্শনের 'প্রথম পাপে'র তত্ত্ব এই বিশ্বাসকে দৃঢ় করেছে। আমাদের বর্তমান সংস্কৃতি এখনও যদি ইংরেজী বা ফরাসী সভ্যতার নির্দেশ মেনে চলে তবে এই অশিবের শক্তি স্বীকার ক'রে, তা মানুষের মাহাত্ম্যে বিশ্বাস হারাবে। তখন হয় রেনেশাঁর পূর্ববর্তী মধ্যযুগীয় ধর্মবিশ্বাসে মঠাশ্রয়ী হবে, নয়ত জীবনের আনন্দ, সৌন্দর্য ও মঙ্গলের প্রতি অবিশ্বাসী হয়ে পাপবৃত্তির নগ্নতায় পূর্ণ হবে।

* * *

পশ্চিম-ইউরোপ,—আমাদের কাছে যার প্রতিনিধি ইংল্যাণ্ড,—যদি প্রেরণা না দেয়, তবে হয়ত দিবে পূর্ব-ইউরোপ। কিন্তু সেখানে যদিও মধ্যযুগের ধর্মান্ধতা বা প্রথম-পাপতত্ত্বের হতাশা, তিক্ততা নেই—কিন্তু মানুষের মাহাত্ম্য এবং যুক্তিবাদও নগণ্য হয়ে উঠেছে যান্ত্রিক বাস্তবাদর্শের কাছে। এই আদর্শের অনুসরণে রাশিয়ায় বর্তমান সাহিত্যের নিষ্প্রাণতা কখনও আমাদের প্রেরণা জোগাতে পারবে না। তাই এ পথেও বর্তমান বাঙালী-সংস্কৃতি এগোতে উৎসাহ পাবে না।

বর্তমান বাঙালী সাহিত্যিক, শিল্পী, চিন্তাশীলদের পূর্বোক্ত এই দুই পথ ত্যাগ করে তাকাতে হবে নিজের দিকে। ইউরোপের সাংস্কৃতিক দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে নিজের সমাজের প্রতি আগ্রহশীল হতে হবে এবং সেইখানেই পথ খুঁজে পেতে হবে। এই পথ রবীন্দ্রনাথের মানবতাবোধ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনে ও সৃষ্টিতে নানা দ্বন্দ্ব সংগ্রামের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যে উদার শক্তিশালী মানবতাবাদ প্রচার করেছেন, সেই পথই আমাদের গ্রহণীয়। জীবনে সব অমঙ্গলের উর্ধ্বে শিব-শক্তিকে উপলব্ধি করা, মানুষের আপাত-অনৈক্য ও দুর্বলতার মধ্যেও তার উদার ঐক্য ও শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করাই রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার। বর্তমান বাঙালী যদি এই পথে চলতে পারে তবে সব হতাশা ও অন্ধতা বর্জন করে বলিষ্ঠ জীবন-বেদ গঠনে সক্ষম হবে, এবং বিশ্বের সংস্কৃতির দরবারে নিজের সম্মানের আসন লাভ করবে।

বিষয়টি আমাদের বর্তমান কালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা। আমাদের সমাজ সংস্কৃতি, ব্যক্তিজীবনের মূল সমস্যা এতে আলোচিত হয়েছে এবং আমাদের জীবন গঠনের একটি মূলসূত্র ধরে দেবার চেষ্টা হয়েছে। সে সূত্র আশাবাদের সূত্র। ব'লষ্ঠ জীবনাদর্শের সুর। লেখাটি দীর্ঘ তাই বিষয়টি বিস্তৃতাকারে আলোচিত হতে পেরেছে। ইউরোপের রেনেশাঁস, রিফরমেশন, শিল্পবিপ্লব, সমাজবিপ্লব এবং বর্তমান যুগের মধ্যযুগপ্রিয় আধ্যাত্মিকতা ও হতাশার বিশ্লেষণমূলক পরিচয় লেখক দিয়েছেন এবং তার সঙ্গে ভারতীয় ঐতিহ্যগত চিন্তা ও ভারতীয় রেনেশাঁর আদর্শের তুলনামূলক বিচার ক'রে রবীন্দ্রনাথের মতবাদ ও জীবনে মঙ্গল শক্তির প্রতি বিশ্বাসই যে আমাদের প্রকৃত পথ সে কথা প্রমাণ করেছেন। বর্তমান বাঙালী জীবন, সমাজ ও সংস্কৃতি নিয়ে যাঁরাই এতটুকুও ভাবছেন তাঁদের প্রত্যেকের কাছেই এই লেখাটির অনেক কিছু বলবার আছে। ।৩।১৯৫৬

শস্তিনিকেতনে এখন গ্রীষ্মাবকাশ চলছে। আজকাল যত ভিড় গ্রন্থাগারে। বিশেষ করে তার পাঠকক্ষটিতে লোকের আনাগোনা লেগেই আছে। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে মাসিক ত্রৈমাসিক পাক্ষিক দৈনিক মিলিয়ে তিনশ'র

উপরে পত্রিকা আসে। এগুলি কেবল বাংলা ও ইংরাজি। ইংরাজি বাংলা মিলিয়ে 'দৈনিক' আসে পনরখানা পত্রিকা। হিন্দী-ভবনে হিন্দী-পত্রিকা 'দৈনিক' দু'খানা আসে, আর 'মাসিক' তিনখানা। চীনা-ভবনে ইংরাজি দৈনিক এবং সাপ্তাহিক পত্রিকা বাদে চীনা-পত্রিকাও এসে থাকে। এ ছাড়া বিনয়-ভবন, রবীন্দ্র-ভবন, শ্রীনিকেতনের লাইব্রেরীতেও অনেক পত্রিকা আসে।

বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারের সাধারণের পাঠকক্ষে তিনশ'র উপরে কাগজ সাজানো থাকে। সারাদিনই সে ঘর খোলা থাকে, বিকেল চারটে সাড়ে-চারটেতে বন্ধ হয়। এর মধ্যে সব-সময়েই যে-কোনো লোক গিয়ে যে-কোনো পত্রিকা পড়তে পাবে। ছাপানো পত্রিকা ছাড়াও আশ্রমের ছাত্রছাত্রীদের হাতে-লেখা মাসিক পত্রিকাও এ ঘরে থাকে। আজকাল এই হাতে-লেখা কাগজের সংখ্যা চার। পাঠভবনের থেকে বের হয় তিনটি হাতে-লেখা মাসিক পত্রিকা—শিশু-বিভাগের (দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ শ্রেণী) পত্রিকা 'পঞ্চমী ; মধ্য-বিভাগের (সপ্তম থেকে অষ্টম শ্রেণী) পত্রিকা 'প্রভাত' এবং আদ্য বিভাগের (নবম ও দশম শ্রেণী) পত্রিকা 'শান্তি'। প্রত্যেক মাসে পাঠ-ভবনের প্রত্যেক বিভাগ থেকে অন্তত একটি করে সাহিত্য-সভা হওয়ার কথা, একটি করে পত্রিকাও তেমনি বের হয়ে থাকে। সভায় পঠিত লেখা দিয়েই এই পত্রিকা বের করা হয়, তার সঙ্গে থাকে সেই বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের আঁকা-ছবি—পেন্‌সিল স্কেচ, রঙের ছবি, লিথোগ্রাফ, সংগৃহীত ভালো ফটো।

* * *

পত্রিকা তিনটি পড়লেই যে-কোনো পাঠক প্রত্যেকটি কাগজের বৈশিষ্ট্য ধরতে পারবেন। 'পঞ্চমীর' ছবিগুলি থাকে খুব গাঢ় রঙচঙে। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে-দের চোখে রঙের নেশা ; রঙের ঔজ্জ্বল্যেই তারা অত্যন্ত খুশি। ছবিতে তারা যথেচ্ছ রঙ ব্যবহার করে। তারপর ধরা পড়ে তাদের আঁকা ছবিতে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য। কেউ আঁকছে হনুমান, কেউবা আঁকছে গাধা, গরু,—যা চোখে পড়ছে বা যা তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। পাহাড়, জল, স্টীমার, গাছপাতা, ফুল, হিজিবিজি কত কী,—তার মানে কিছু বোঝা যায়, কিছু বা থাকে অস্পষ্ট। ছবি দিয়ে তারা পত্রিকা সাজাতেই ব্যস্ত। এক-একজন আবার অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসু প্রভৃতির ছবি অনুকরণ করতে চায় ; সে ছবিগুলোও খুব কৌতুকপ্রদ। তাদের আঁকা ছবিতে মাথা পেট, হাত-পা এবং চোখ আর চুলই দেখবার বস্তু। নাক কান ইত্যাদি থাকতেও পারে। 'পঞ্চমী'তে লেখা

গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা প্রভৃতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। তাতে চিন্তার গভীরতা না থাকতে পারে, শিশু-মনের মজা আছে। লেখাগুলি খুব ছোট ছোট, এক-পাতা আধ-পাতা। বিষয়বস্তু ঘরোয়া 'এক যে শেয়াল', 'শ্রীনিকেতনের মেলা', 'ছেলেধরা', 'পিকনিক'—এমনি সব। কবিতাও ছোট ছোট, ছড়ার মতো। এখানে ক্লাশে মুখে-মুখে কবিতা তৈরি করানো হয়। শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী দু-এক পংক্তি বলেন। মিল আর ছন্দ শুনিয়ে দিলেন, ছেলেমেয়েদের পরস্পরকে দু'চার পংক্তি করে বলতে দেন, এমনি করে পুরো একটা কবিতা মুখে-মুখে তৈরি হয়ে যায়। ছেলেমেয়েরা খুব মজা পায়। বাড়িতে এসেও অনেকেই কবিতা মেলাতে বসে। লিখে এনে শোনায় শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীকে, যেগুলো একটু ভালো হয়, সাহিত্য-সভায় পড়ে।

* * *

'প্রভাত' এবং 'শান্তি' পত্রিকার লেখাগুলি কিছু বড়, চিন্তার ছাপ মেলে, বিষয়বস্তুও নানারকম। 'শান্তিতে' একজন নিজেদের ম্যাট্রিকের পাঠ্য শরৎ-চন্দ্রের 'মহেশ' গল্পটি নাটক করে লিখেছে। এ পত্রিকাতে নিজেদের তৈরি ধাঁধাও থাকে। এ দু' পত্রিকার ছবিতে রঙের ছড়াছড়ি নেই, রেখার দৃঢ়তা সুস্পষ্ট। এদের বেশির ভাগ ছবির বিষয়বস্তু—খোয়াই, সাঁওতাল এবং ডিজাইন। আল্‌পনা, সূচের কাজ, তাঁতের কাজ, চামড়ার কাজে এখানে নানারকমের ডিজাইন খুব চোখে পড়ে। সাঁওতাল এবং খোয়াই তাদের নিত্য-দেখা জিনিস। সারা বছরের এ তিনটি কাগজ থেকে বাছাই করা লেখা এবং ছবি দিয়ে প্রত্যেক নববর্ষে 'আমাদের লেখা' পত্রিকা ছেপে বের করা হয়, দাম একটাকা।

* * *

এ ছাড়াও দু' একটি হাতে-লেখা পত্রিকা মাঝে-মাঝে বের হয়। 'খেলাধুলা' পত্রিকায় থাকে ঘরে-বাইরের খেলার খবর। সময়-সময় আবার এক-এক ক্লাসের ছাত্রছাত্রীরা নিজেরাই একটি বিশেষ পত্রিকা বের করে নিজেদের লেখা দিয়ে।

কলেজের ছাত্রছাত্রীদের পত্রিকাও বের হয়—'সাহিত্যিকা'। ইংরাজি বাংলা লেখা দুই-ই তাতে থাকে। ছবি থাকে খুব কম। অধ্যাপকগণও এতে লিখে থাকেন।

বিদ্যাভবন এবং বিনয়-ভবন নূতন খোলা হয়েছে, এখনো এ দুই বিভাগ থেকে নিজস্ব পত্রিকা বের হয়নি। পাঠভবন এবং শিক্ষাভবন (college) থেকেই এ সব হাতে-লেখা কাগজ বেরুচ্ছে। ২০।৫।১৯৫৬

* * *

তিন চার মাসের মধ্যে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহ থেকে যে কয়খানি পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে তিনখানা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রমথ চৌধুরী মশায়ের 'প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান' (৭৩ সংখ্যা, ৩২ পৃষ্ঠা, সন ১৩৬০, মূল্য আট আনা) পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। এর মধ্যে তিনটি মনোরম ও চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ আছে। তার থেকে জানা যায়, বাংলার আধুনিক হিন্দুমুসলমানের মধ্যে যে সংঘর্ষ ঘটেছে এ রকম দ্বন্দ্ব প্রাচীন বাংলায় ঘটেছে বলে ইতিহাসে কোনো নজির নেই। এ সমস্যা একেবারে বর্তমান যুগেই দেখা দিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—'সমবায় নীতি' (বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, ১০০ সংখ্যা, পৃ ৫৫, বাংলা সন ১৩৬০, মূল্য আট আনা)—সমবায়-নীতি সম্বন্ধে গুরুদেবের রচনা ও অভিভাষণগুলি এ গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এগুলি ১৯১৮ সন থেকে ১৯২৭ সনের মধ্যে নানা বাংলা-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। আমাদের দেশে এ নীতির উপযোগিতা যে কত তা এসব প্রবন্ধ ও অভিভাষণে সুস্পষ্টভাবে জোরের সঙ্গে বলা হয়েছে। ভাষার লালিত্য ও সারল্য অপূর্ব এবং যুক্তিও অকাট্য। পুস্তকটিতে গুরুদেবের হস্তাক্ষর মুদ্রিত আছে। গ্রন্থখানি নানাদিক দিয়ে অত্যন্ত মূল্যবান।

বাংলার উচ্চশিক্ষা—(বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, সংখ্যা ১০৪, পৃ ৬০, বাংলা ১৩৬০ সন, মূল্য আট আনা)—এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষায় ইংরেজি কীভাবে ভাষার প্রধান স্থান অধিকার করল তার তথ্যপূর্ণ ইতিহাস আছে। প্রচীন ফরাসী, সংস্কৃত ও বাংলা প্রভৃতি কীভাবে লোপ পেল এবং ইংরেজি ভাষার গুরুত্ব বাড়ল তাই নিয়ে প্রকাণ্ড এক গ্রন্থ রচনা করা যেতে পারে; এ বইটিতে তারই সূচনা রয়েছে। ১৬।৬।১৯৫৬

'বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহ' গ্রন্থমালার প্রকাশ দ্বারা বিশ্বভারতী দেশের একটি বিশেষ উপকার সাধন করেছেন। সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলা প্রভৃতি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত ও সারবান ক্ষুদ্র পুস্তক মুদ্রিত হচ্ছে এবং সুলভ মূল্যে সেগুলি পাঠক-সমাজ কিনতে পারেন। বিদ্যার বহু বিস্তীর্ণ ধারার সঙ্গে দেশের বিদ্বন্মণ্ডলী শিক্ষিত জনসাধারণের মনের যোগ সাধন ক'রে বিশ্বভারতী একটি নূতন পন্থা নির্দেশ করেছেন। এই গ্রন্থমালার ১১৯ সংখ্যায় মহেশচন্দ্র ঘোষের 'বুদ্ধ-প্রসঙ্গ' গ্রন্থ গত বুদ্ধ-পরিনির্বাণ-জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত হয়েছে। মহেশচন্দ্র ঘোষ জ্ঞান-তপস্বী। বাংলাদেশের যে-সকল মনীষী বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের অনুশীলন ও ব্যাখ্যান করেছেন, তাঁদের মধ্যে মহেশচন্দ্রের গৌরবজনক আসন প্রাপ্য। বহু পূর্বে 'প্রবাসীতে' মুদ্রিত তাঁর তিনটি

রচনা আলোচ্য গ্রন্থটিতে সংকলিত হয়েছে। রচনা ক'টি সহজ ভঙ্গীতে সরস ভাষায় রচিত। বুদ্ধের জীবনী, তাঁর সাধনা ও সিদ্ধির স্বরূপ, বৌদ্ধধর্মের মূলতত্ত্ব প্রভৃতি কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে; অবান্তর কিম্বা অতিবক্তব্য কোথাও লক্ষিত হয় না। বুদ্ধ-জয়ন্তী উপলক্ষে পত্রিকায়-পত্রিকায় বহু পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং তথ্যমূলক রচনা প্রকাশিত হয়েছে। তথাপি এই ক্ষুদ্র পুস্তকটি আপন গুণে পাঠক-সমাজে সমাদর পাবার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে, তাতে সন্দেহ নেই।

*   *

বুদ্ধ-পরিনির্বাণ-জয়ন্তী উপলক্ষে বিশ্বভারতী থেকে আরেকখানি গ্রন্থ মুদ্রিত হয়েছে—'বুদ্ধদেব'। নামটির মধ্য দিয়েই গ্রন্থটির একটি বিশেষ তাৎপর্য প্রকাশ পেয়েছে। নামটিতে বোঝায় বুদ্ধদেব সম্বন্ধে এশুধু ঐতিহাসিক তথ্যাদির পরিবেশন নয়, দার্শনিক তত্ত্বালোচনাও নয়, গ্রন্থটি বুদ্ধদেব সম্বন্ধে শ্রদ্ধামণ্ডিত কিছু নিবেদনেব থালি। বস্তুতও তাই,—রবীন্দ্রনাথের কতিপয় গদ্য রচনা, ভাষণ, গান ও কবিতার সংকলন; কিন্তু তারই মধ্য দিয়ে বুদ্ধদেবের মহিমার একটি অপূর্ব রূপ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ভারতের অন্যতম মহাপুরুষের স্বরূপ, তাঁর ধর্ম ও সাধনার তাৎপর্য—তাঁর শিষ্য-পরম্পরার মধ্য দিয়ে যেভাবে প্রকাশিত হয়েছে, আধুনিক যুগের মহাকবি মনস্বী কবি রবীন্দ্রনাথের ধ্যান-দৃষ্টিতে নূতনভাবে তা উদ্ভাসিত হয়েছিল। বহু গদ্য, পদ্য, গান, কবিতা, নাটক প্রভৃতির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজের সেই উপলব্ধিকে বিকশিত করে তুলেছেন। 'বুদ্ধদেব'-গ্রন্থে বিশেষ কয়েকটি গদ্য, রচনা ও বিখ্যাত কয়েকটি গান ও কবিতা সংগৃহীত হয়েছে। বুদ্ধদেব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের লেখাগুলি একসঙ্গে পাঠ করবার সুযোগ লাভ করে পাঠক রবীন্দ্রনাথের সেই দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পেতে পারেন এবং বুদ্ধকেও নূতনরূপে হৃদয়ংগম করতে পারেন। 'বুদ্ধদেব' গ্রন্থটি সেদিক থেকে সার্থক এবং মূল্যবান। একটি কথা উল্লেখযোগ্য। অবশ্য, বুদ্ধদেব ও বুদ্ধ শিষ্যাদি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ অজস্র ও বহুবিধ রচনা সব এক সঙ্গে এভাবে একটি গ্রন্থে সংকলিত থাকলেই সমগ্র পরিমণ্ডলটি বোঝবার পক্ষে আরো সুবিধে হয়,—তা ঠিক; তবে তাতে গ্রন্থের আকারও তেমনি বৃহৎ হবার আশঙ্কা দেখা দেয়; কিন্তু এই গ্রন্থেরই পিছনে যদি একটি সূচীতে সমুদয় গদ্য, পদ্য, গান, নাটক প্রভৃতির একটি তালিকাও অন্তত মুদ্রিত হত, তবে পাঠকগণ অতীব উপকৃত হতেন, একথাটি স্বতঃই মনে হয়। বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগ থেকে সে-কাজ আগামীতে সম্পন্ন করা হবে, এ খুবই আশা করা যায়, কেননা সেখানে এরূপ কাজের লোকের অভাব নেই। অন্যান্য

মহাপুরুষদের সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথের এরূপ শ্রদ্ধার্ঘ সংকলন প্রকাশের ধারা অতঃপর সুসম্বদ্ধভাবে চলতে থাকলে একটি মহৎ কাজ সম্পাদিত হতে পারে।

* *

বিশ্বভারতীর সাংস্কৃতিক কাজগুলির মধ্যে অন্যতম একটি কাজ 'বিশ্বভারতী-পত্রিকা'র প্রকাশ। নব-পর্যায়ের আত্মপ্রকাশের পর মাঝখানে তার অন্তর্ধানে অনেকেই বিশেষ অভাব বোধ করেছেন। এখন আবার কিছুদিন থেকে তার ধারা অব্যাহত দেখে সকলেই আনন্দিত হয়েছেন; নানা সাময়িক-পত্রে তার সম্বর্ধনায় সেইরূপই সূচিত হয়। সম্প্রতি বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যা (১৯৬৩) প্রকাশিত হয়েছে। পত্রিকা না ব'লে একে একখানি উপহারের বই বললেও অত্যুক্তি হয় না; স্বচ্ছ সুপরিচ্ছন্ন মুদ্রণে এবং তার সঙ্গে মূল্যবান ও পরিপাটী চিত্র এবং ফটো ক'খানির সমাবেশে এবারকার সংখ্যাটি এলবাম-স্বরূপে সমাদরে রক্ষা করবার সামগ্রী হয়েছে। 'পত্রাবলী' বিভাগে রবীন্দ্রনাথকে লিখিত ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রের পত্রগুলিতে মনীষীদ্বয়ের স্নিগ্ধ হৃদ্যতা প্রকাশমান, কর্মী রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতার পরিচায়ক অনেক তথ্যও এ থেকে আমরা পেতে পারি। সম্পাদকীয় মন্তব্যযোগে সেদিকটি আরো পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। "বিদেশে রবীন্দ্র সাহিত্য অনুশীলন"— লেখিকাকে ধন্যবাদ যে, তিনি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আশু-প্রয়োজনীয় একটি মহৎ কর্তব্যের দিকে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। অন্যান্য গবেষণামূলক প্রবন্ধগুলি বিশ্বভারতী পত্রিকার ধারা যথাপূর্ব অক্ষুণ্ণ রেখে চলেছে। বিশ্বভারতীর পূর্ব উপাচার্য মৃত মনীষী ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী সম্বন্ধে যে শ্রদ্ধার্ঘ সাজানো হয়েছে, তথ্য-গৌরবে, আন্তরিকতার দীপ্তিতে ও রচনাকুশলতায় তা সমুজ্জ্বল। পরলোকগত মেঘনাথ সাহা ও বিজনকুমার মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ও ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদ্বয়ের লেখা নিবন্ধ দুটিও উল্লেখযোগ্য। ১০।৭।১৯৫৬

সম্প্রতি বিশ্বভারতী-পত্রিকা দ্বাদশ বর্ষ অতিক্রম করে ত্রয়োদশে পড়েছে। শ্রাবণ মাস থেকেই পত্রিকাটির বর্ষারম্ভ হয়। এবারে কয়েকটি প্রবন্ধ ও চিত্রসহ পত্রিকাটি বেশ আকর্ষণীয় হয়েছে। মৈত্রেয়ী দেবীকে লেখা গুরুদেবের কয়েকটি চিঠি পত্রিকার প্রথমেই স্থান পেয়েছে। তারপর সাহিত্যের ভাষা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন শ্রীসুবোধ ঘোষ। 'বঙ্কিমচন্দ্র ও বাংলার ইতিহাস' নামে প্রবন্ধটি শ্রীভবতোষ দত্তের। বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্বন্ধে দু'টি প্রবন্ধ আছে। একটি গুরুদেবের অপরটি শ্রীবিনয় ঘোষের। এর পর টিলক শতবার্ষিকী উপলক্ষে শ্রীঅমল হোমের টিলক সম্বন্ধে প্রবন্ধটিও উল্লেখযোগ্য। টিলক সম্বন্ধে এরকম সুন্দর আলোচনা

বাংলা-ভাষায় খুব কমই আছে। "জিতেন্দ্রিয়, নিস্পৃহ, নিরলস, নিরভিমান কর্মযোগী টিলক, লোকহিতৈষী টিলক, দরিদ্রের সুহৃৎ টিলক, রাজদ্বারে ও শ্মশানে চিরবান্ধব টিলক"কে আমরা এই প্রবন্ধের মধ্যে যেন নতুন করে পেলাম। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কবি গোবিন্দদাস। অথচ আধুনিকতা তাঁকে স্পর্শও করতে পারেনি। তাহলেও তাঁর কাব্যের সরল ভাবাবেগ তাঁর নিকটবর্তী পাঠক-সমাজে তৃপ্তি দিতে পেরেছিল। শ্রীঅজিত দত্ত এই কবি সম্বন্ধে আলোচনা করে যে প্রবন্ধটি লিখেছেন সেটি পড়ে পাঠক-সমাজের জ্ঞানের পরিধি বাড়বে সন্দেহ নেই। এই সব প্রবন্ধ ছাড়া আরও কয়েকটি সুনির্বাচিত ও সুলিখিত প্রবন্ধ এতে আছে। যেমন শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের লিখিত কবি ও, অল্টার ডেলামেয়ার সম্বন্ধে প্রবন্ধটি। আর আছে গ্রন্থ-পরিচয়, গুরুদেবের গানের স্বরলিপি। শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রামকিঙ্করের অঙ্কিত চিত্রগুলিও পাঠকদের আনন্দ দান করবে। সব মিলিয়ে পত্রিকাটি বাংলাদেশের সুধীজনের প্রশংসা অর্জন করতে পারবে বলে মনে হয়। এই প্রশংসার মূলে আছে সম্পাদক শ্রীপুলিনবিহারী সেনের ঐকান্তিক চেষ্টা।

*　　　*　　　*

ঘরোয়াভাবে নানা কথা আলোচনা করবার জন্য শান্তিনিকেতনের 'আলাপিনী' মহিলা সমিতি 'ঘরোয়া' নামে একটি মাসিক পত্রিকা বার করেছেন গত আশ্বিন মাস থেকে। শ্রীইন্দিরা দেবী-চৌধুরাণী আশীর্বাদ করে বলেছেন, "পল্লীগ্রামে যারা ভাল বই বা খবরের কাগজ বা বই পড়ার ঘর হাতের কাছে পায় না, তারা যেন এই সামান্য পত্রিকা থেকে মনের খোরাক ও আনন্দ দুই-ই জোগাড় করতে পারে। আর আমরাও যেন জানতে পাই তারা কী চায়, কী পেলে খুশি হয়।" চিকিৎসা, খাদ্য, স্বাস্থ্য, রাজনীতির শিক্ষা, শিশুপালন, সুগৃহিণীর বিভিন্ন গুণের পরিচয়, কোনো বিখ্যাত ব্যক্তির জীবনী, শারদোৎসব নাটক প্রভৃতি নানা বিষয়ের আলোচনা পত্রিকাটির দু'টি সংখ্যায় স্থান পেয়েছে। পত্রিকাটির সম্পাদিকা হচ্ছেন শ্রীমতী সুধাময়ী মুখোপাধ্যায়। ২৩।১০।১৯৫৬

আধুনিক ভারতীয় শিল্পধারায় শান্তিনিকেতনের দান বিশেষভাবে স্মরণীয়। কলাভবনে শিল্পগুরু নন্দলাল বসুর নেতৃত্বে যে শিল্প-আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, তার মূল্য অসীম। গুরুদেব এবং অবনীন্দ্রনাথের শিল্পসৃষ্টির সঙ্গেও শান্তিনিকেতনের অবিচ্ছেদ্য যোগ। এই শিল্প-গৌরব আমাদের সম্পদ। একথাও স্মরণীয় যে শিল্প-সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে একসময়ে শান্তিনিকেতনের শিল্প-আলোচনার চর্চাও গড়ে

উঠেছিল। শিল্প আলোচনার সভা নেই বললেই চলে। এই প্রয়োজন অনুভব করে কিছুদিন হল 'শিল্প-কথা' নামে একটি প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়েছে। প্রতি মাসে এই সভার অন্তত দুটি অধিবেশন হবে। দেশ-বিদেশের শিল্প-আন্দোলন, শিল্পের ইতিহাস এবং শিল্পী-পরিচয় হবে এই আলোচনা-সভার বিষয়বস্তু। আশ্রমের সকল শিল্প-রসিকই এই সভার সভ্য বলে বিবেচিত হবেন। সভাটির কার্যনির্বাহক সমিতির সভাপতি হচ্ছেন কলাভবনের অধ্যক্ষ শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মণ এবং যুগ্ম-সম্পাদক হচ্ছেন শ্রীশুভময় ঘোষ ও শ্রীসুরেন দে।

*　　*　　*

১৬ই নভেম্বর এখানে 'ইউনেস্কো-দিবস' উদ্‌যাপিত হল। সন্ধ্যায় ছাত্র-সম্মিলনীর উদ্যোগে চীনভবনে ইউনেস্কো সম্বন্ধে একটি আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপাচার্য শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু পৌরোহিত্য করেন। ছাত্র ও শিক্ষকদের পক্ষ থেকে শ্রীজন ম্যামন, ডঃ করুণাময় মুখার্জি ও শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত ইউনেস্কোর উদ্দেশ্য ও ইহার কার্যাবলী সম্বন্ধে বলেন এবং ইহার সাফল্য কামনা করেন।

*　　*　　*

ভারতবর্ষের বাইরে থেকে যে-সব ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক শান্তিনিকেতনে এসেছেন, সম্প্রতি তাঁরা একটি ক্লাব গড়ে তুলেছেন। নাম দিয়েছেন 'ইণ্টার‍্ন্যাশনাল ক্লাব'। শুধু বিদেশীরাই নন, ভারতীয়েরাও এর সদস্য হতে পারেন। অবশ্য বিশ্বভারতীতে এরকম ক্লাব থাকা খুবই স্বাভাবিক বলে মনে হয়। এই ক্লাবে বুধবারের সন্ধ্যায় একটি করে মজলিশ বসে। তাতে হয় নানারকম আলোচনা—যেমন বর্মা কিংবা মিশরের ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁদের নিজেদের দেশ সম্বন্ধে কিছু বলেন। এতে বিভিন্ন দেশ সম্বন্ধে ছাত্র-ছাত্রীদের অভিজ্ঞতাও বাড়ে আর লক্ষ্য করতে হয় এদের মধ্যে সহজ মেলামেশা। ওদিকে যখন সুয়েজ নিয়ে ফ্রান্স ও মিশরের মধ্যে লড়াই চলছে এখানে হয়তো দেখতে পাওয়া যায় মিশরের ছাত্রী শ্রীমতী মনসুরী নাসেক আর ফরাসী-সাহিত্যের অধ্যাপিকা শ্রীমতী মার্তেল হাত-ধরাধরি করে "আমাদের শান্তিনিকেতন" গাইতে গাইতে গোয়ালপাড়া থেকে বনভোজন করে ফিরে আসছেন। এরকম অবাধ মেলামেশার দৃষ্টি হামেশাই দেখতে পাওয়া যায় এখানে।

*　　*　　*

ফিলিপাইন থেকে যে কৃষি-প্রতিনিধি দল ভারত-পর্যটনে এসেছেন তাঁরা গত ১৫ই নভেম্বর শান্তিনিকেতনে আসেন। উপাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পর তাঁরা

১৬ই বিশ্বভারতীর বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করেন। শ্রীনিকেতনের কাজকর্ম দেখাই ছিল তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য। শ্রীনিকেতনের সচিব শ্রীধীরানন্দ রায়ের তত্ত্বাবধানে তাঁরা শ্রীনিকেতন পরিদর্শন করেন ও বিশেষ আনন্দ লাভ করেন। ১৯।১১।১৯৫৬

হিন্দীভবন-পরিচালিত 'হিন্দী বিশ্বভারতী-পত্রিকা' নিয়ে আগে চলত চারখানা, আজকাল বিশ্বভারতী থেকে তিনখানি পত্রিকা বেরয়। এর মধ্যে দু'খানি ত্রৈমাসিক সাহিত্য-পত্রিকা, একখানি মাসিক ও বিশ্বভারতী-সংক্রান্ত সংবাদ সরবরাহই যার প্রধান লক্ষ্য। সাহিত্যপত্র দু'খানির একখানি বাংলা,—'বিশ্বভারতী পত্রিকা' অন্যখানি ইংরেজি—'বিশ্বভারতী কোয়ার্টারলি।' মাসিক-খানাও ইংরেজি,—নানা দিগ্‌দেশের লোক—যাঁরা বিশ্ব-ভারতী প্রতিষ্ঠানের সভ্য-তালিকাভুক্ত, তাঁদের কাছে মাসে-মাসে খবর জুগিয়ে সংযোগ রক্ষার দায়িত্ব বহন করে এই ইংরেজি মাসিক—'বিশ্বভারতী নিউজ'। বাংলা বিশ্বভারতী-পত্রিকার সম্পাদনায় তিনবার হাতবদল হল, নবতম পর্যায়ে বিচিত্র বিন্যাসে শ্রীপুলিনবিহারী সেনের সম্পাদনায় তিনটি সংখ্যা এ পর্যন্ত বেরিয়েছে; ইংরেজি 'কোয়ার্টার্লির' হাতবদল হয়েছে ছ'বার; এবারে হালে ফিরে এসেছেন প্রাক্তন সম্পাদক শ্রীক্ষিতীশ রায়; নব সম্পাদিত তাঁর দুটি সংখ্যার মধ্যে নভেম্বর-জানুয়ারী (১৯৫৬-৫৭) সংখ্যাখানি একটি কারণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অন্য আকর্ষণের মধ্যে এর সার্ধদ্বিসাহস্রিক বর্ষের 'বুদ্ধপ্রণাম'-এর আয়োজন সকলের কাছে আদরণীয় হবে আশা করা যায়। স্বতন্ত্র পুস্তিকারূপেও তার প্রকাশের ব্যবস্থা হয়েছে। শান্তিনিকেতনের সরকারী পত্রিকার মধ্যে সবচেয়ে পুরাতন নজীর রয়েছে 'শান্তিনিকেতন পত্রিকা'রই।

* * *

তারপর এই 'কোয়ার্টারলির উদ্ভব হয় 'বিশ্বভারতী'র শুরু থেকে। সম্পাদকরূপে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের নাম ধারণের গৌরবের অধিকার বহন ক'রে এই পত্রিকাখানি। মাঝখানে এরও একদিন ছেদ পড়েছিল। অবিচ্ছেদে দীর্ঘায়ু হয়ে আছে একমাত্র 'নিউজ'-ই। তার বয়স হল পঁচিশ বর্ষ। বহু সম্পাদকের হাত ঘুরে এসে এখন এটি সম্পাদিত হচ্ছে পাবলিকেশন বিভাগের পরিচালক শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্যের হাতে। সময়োপযোগী দু'একটি প্রবন্ধও এতে থাকে, তা ছাড়া, কলাভবনের শিল্পীমহল কর্তৃক সুনির্বাচিত কাঠ-খোদাই ছবিগুলি মাসে মাসে জোগায় একে বিচিত্র অঙ্গভূষণ। প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী ও কর্মীদের দূরদূরান্তের চিঠির কাজ করে এর বিশিষ্ট একটি বিভাগ। বাইরে ঘুরে ঘরের আবহাওয়ায় মন ভরিয়ে নিতে প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী ও আশ্রমবাসীদের মধ্যে এই 'নিউজে'র যত আদর। শান্তি-

নিকেতনের অনুরাগী এবং অনুসন্ধিৎসুমাত্রেই এর উপযোগিতা অনুভব করবেন। বর্তমানে এর মধ্যে শান্তিনিকেতন-অঞ্চলের পাখিদের সম্বন্ধে নানা তথ্যসমৃদ্ধ একটি চিত্তাকর্ষক ধারাবাহিক প্রবন্ধ বেরচ্ছে। লেখক আশ্রমেরই প্রবীণ প্রাক্তন ছাত্র ও সক্রিয় সভ্যদের অন্যতম শ্রীযুক্ত প্রদ্যোৎকুমার সেনগুপ্ত। এখনও তিনি এখানে প্রায়ই আসাযাওয়া করে থাকেন। তাঁর বহুদিনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার জারিত ফল এই রচনাটি শান্তিনিকেতনের পুরোনো ধারাগত—প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণের বিশিষ্ট শিক্ষাপদ্ধতির কথাই স্মরণ করায়। এ সঙ্গে বলে রাখা ভালো, 'বিশ্বভারতী পত্রিকা' বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, রবীন্দ্র-রচনাবলী এবং রবীন্দ্রনাথের খুচরা বই ও বিশেষ-বিশেষ অন্যান্য গ্রন্থাদির সম্পাদনা ও প্রকাশনার কাজ চলে থাকে বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগ থেকে,—কলকাতার ৬।৩, দ্বারকানাথ লেনস্থ সে-বিভাগের চেয়ে শান্তিনিকেতনের এই পাব্‌লিকেশনস্‌ বিভাগটি আলাদা ধরনের।

পঁচিশ বছর পূর্ণ হওয়ায়, আগামী জুলাই মাসে "বিশ্বভারতী নিউজ"-এর একটি বিশেষ-সংখ্যা প্রকাশের আয়োজন চলছে। এ গেল 'সংবাদের' কথা।

* * *

এবার সাহিত্যের খবরও কিছু নিতে হয়। বিশ্বভারতীর হাত দিয়ে যে-সংস্কৃতির পরিবেশন হয়ে থাকে তার বাংলা মুখপত্র হচ্ছে—'বিশ্বভারতী পত্রিকা'। কিছুকাল আগে এর কার্তিক-পৌষ সংখ্যাটি বেরিয়েছে। মালিন্যহীন মলাট—ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে। পত্রিকার নামাক্ষরগুলির লেখার ছাঁদটি দৃষ্টি আকর্ষণ করে সবার আগে। শান্তিনিকেতনের খোয়াইর বুকে খাড়া গাছে মৃদু-আন্দোলিত শ্যামল তালপাতার ছন্দের মতোই সে ছাঁদটি মনকে দিয়ে যায় দোলা, সঙ্গে-সঙ্গে হাতে নিতে হয় এবং বইটি খুলে না পড়েও নেই উদ্ধার। তাকিয়ে দেখতে হয় মুখপাতের পট-চিত্রখানি—চমৎকার তার রং-এর বাহার। তার রেখার জাদুতে গোষ্ঠের কী মধুর সমারোহই না সৃষ্টি করেছে। ছাপার এরূপ পরিচ্ছন্নতাও দুর্লভ। তারপরে রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী। নৈবেদ্যের মধ্যে মধুপর্ক। বিশেষ ক'রে তাঁর ৯৪ পাতার চিঠিখানি,—লোকসংস্কৃতির এই মহোৎসবের দিনে মনে পড়িয়ে দেবে কত আগে কবি ডাক দিয়েছিলেন দেশের লোককে এই প্রদর্শনী-উৎসবের সুষ্ঠু আয়োজনে। —এর পরেই নবীন-প্রবীণেরা মেলা জমিয়েছেন বিচিত্র রচনাসম্ভারে; তার মধ্যে যেমন আছে 'বিশ্বে'র কথা, তেমনি মিলে 'ভারতী'-র বরেণ্য-কাহিনী;—সাহিত্যের কারুকলা ও রূপরাগে সুবিন্যস্ত। এক-একটি লেখার এক-এক রকমের ভঙ্গি। সাহিত্য, শিল্প, সংগীত, ইতিহাস ও ভ্রমণকাহিনী—নানা বিষয়েরই রচনা

রয়েছে থরে-থরে সাজানো—এবং তার সবই গন্থ-জাতীয়। দুঃসাহসের কথা পত্রিকাখানি গল্পবর্জিত। এক-কথায় বলা চলে, বঙ্গ-সংস্কৃতির আধুনিক সংস্করণ এই পত্রিকার রচনাবলী। বুদ্ধি ও অধ্যয়নসিদ্ধ কৃতবিদ্যতা এসব লেখার পংক্তিতে-পংক্তিতে নিহিত,—ওয়াকিবহাল না হলে সব-কথার মর্ম গ্রহণ হয় শক্ত ; এবং সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলতে হয়,—বাক্-বিন্যাসে বাংলাদেশের নাড়ির যোগ অনুভব করা সহজ হয় না সর্বত্র। তবে, সে-বাংলাকে পাওয়ার উপায় নেই বুঝিবা আর কোথাও—যে-বাংলা শিক্ষিত অশিক্ষিত আপামর সর্বসাধারণের বাংলা। এ প্রসঙ্গেই এসে পড়ে একটি সাধারণ কথা। —শ্রেণীতে শ্রেণীতে মানুষ যেমন আজ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে,—সাহিত্যও হতে চলেছে সেই শ্রেণীগত মনোদর্পণ-বিশেষই। একদিকে ঐক্যের আয়োজন বাড়ছে—তেমনি মিলনের বাধাও প্রবল হয়ে উঠ্ছে হালচালে এবং বোল্চালেও। এদিক দিয়ে কিন্তু আভিজাত্যরক্ষণে বাম-দক্ষিণের যোগাযোগ ঘটেছে অদ্ভুতভাবে। চিন্তায়, চরিত্রে, আশায়, ভাষায়—সর্বক্ষেত্রেই—মানুষের থেকে মানুষ পৃথক হয়ে যাচ্ছে—সাহিত্যে কোনো কমন্ প্ল্যাটফরম নেই। —দেশ ভাগ ঘটেছে বাংলার ডাইনে বাঁয়ে,—কিন্তু সে আর কতটুকু ভাগ,—মনের মধ্যে ভাগ হয়ে যাচ্ছে মানুষের ঘরে-ঘরে—সেই ভেদের ছাপ পড়্ছে সাহিত্যেও। ভাষায়-ভঙ্গিতে এই অভিমানভিত্তিক ভেদের অভিযানে কারা যে একদিন পথ ধরিয়েছিলেন! নজির এই যে,—বাংলা-ভাষার মায়ায় 'চল্তি বাংলা'র নাম ক'রে গোড়ায় একটা আন্দোলন শুরু হয়েছিল। কিন্তু তার গতি হল প্রধানত ইঙ্গ-ফরাসী ভঙ্গিতে। আর তার সঙ্গেই উৎসাহ বাড়ল সংস্কৃত-উর্দু-পারসি থেকে শব্দ-বহর আমদানিতে। নানাদিক থেকে পরিমিত সংগ্রহ ও সংযোজনের আবশ্যকতা নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু পূর্বোক্ত সেই ধারা বাংলাকে 'চল্তি'র ছাঁচে ঢালতে গিয়ে তাকে সাধারণ বাঙালীর বড়ো-একটা অংশের কাছে কার্যত 'অচল' করেই তুলল। এতে শিক্ষিত এক-শ্রেণীর আনন্দ হল বটে,—কিন্তু ভিতর থেকে প্রাণশক্তিতে স্বাস্থ্য-সমুজ্জ্বল ক'রে শিক্ষিত ও সাধারণ নির্বিশেষে সমগ্র জাতীয়-জীবনকে সে ধারা কতখানি সমৃদ্ধ করল সে খতিয়ানের কথা তুলে আর লাভ আছে কিনা সন্দেহ। সুতরাং, সব কথা সকলের জন্য নয়,—কারণ, সকলে সব কথা বোঝবার উপযুক্ত নয়—এ সিদ্ধান্ত নিয়েই সুখের চেয়ে সোয়াস্তিতে থাকা ভালো।—বাংলার নিজস্ব ঐতিহ্য আজকের পাঁচমিশেলি সাহিত্যে খুঁজতে যাওয়াই হয়তো বোকামির নামান্তর; —যেহেতু সেটা পেঁয়াজের খোসা-ছাড়ানোর মতো পণ্ডশ্রমেই মাত্র পর্যবসিত হবে, ভিতরের গুটিকাটি আর পাওয়ার

নয়,—বরং, না খুঁজেও যা হাতে মিলবে সেটাই এখন 'চলতি-বাংলা'র নিখিল জাতীয় রূপ ব'লে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। সর্বদেশের বোলচাল-ভাঙা এ এক অভিনব সম্ভাবনার আধার;—'বাংলা' ছেড়ে ক্রমে 'আন্তর্জাতিক বাংলা' নাম নিতেই সে-সাহিত্য এখন উন্মুখ হয়ে আছে। ক্রিয়াপদেই সে যেটুকু 'চল্‌তি',—নয়তো, খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে শব্দ-ব্যবহারে সে যে সংস্কৃতেরও দাদা এবং ভঙ্গীতে সে আরো ভয়ানক জটিল। তাতে দন্তস্ফুট করতে পারে সাধারণ বাঙালীর সে সাধ্যই নেই। এ অবস্থায়, শিক্ষিত ও সাধারণ, এ দুই শ্রেণীর জন্য পরিমার্জিত এক সমন্বয়ী আদর্শের স্থাপন দরকার। জরুরি এই ধরনেরই এক প্রশ্ন জাগিয়ে তুলেছে বিশ্বভারতী-পত্রিকার আলোচ্য কার্তিক-পৌষ সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধ—"বঙ্গ-সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ"।

আজ বঙ্গ-সংস্কৃতির বড় খবরই যে এইটি,—সে গুরুত্ব সুধী-লেখকের বিস্তারিত আলোচনায় প্রকাশমান। রচনাটি যে এরূপ আরো চিন্তার খোরাক যোগাবে অনেককে,—এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। আর-একটি সরস প্রবন্ধে পরিবেশিত হয়েছে "প্রাচীন মানুষের নূতন বিপদের" কথা। নূতন মানুষের প্রাচীন বিপদও কিছু আছে কিনা, এ বিষয়ে স্বতঃই ঔৎসুক্য জাগায় লেখার ধরনটি। প্রাচীনদের গবেষণার গাম্ভীর্য অনেকটা জায়গা ছেড়ে দিয়েছে আধুনিকদের আলাপী মেজাজটাকে জেঁকে বসতে। পত্র এসে স্থান নিয়েছে প্রবন্ধের। আগে যেখানে অনেক পাতা উল্টে যেতে হত পরে অবসর ক'রে পড়া যাবে ব'লে,—এখন সেখানে 'দেখি-দেখি'-ক'রে প্রায় সবটাই একবার চেখে চেখে দেখতে হয় হাতে নিয়েই। বিষয়-বৈচিত্র্য বাড়িয়ে দিয়ে পত্রিকাখানিকে উপভোগ্যতর করা হয়েছে। এরূপ তথ্য ও চিন্তাসমৃদ্ধ রচনাধারা প্রাঞ্জলতর বাংলায় প্রকাশিত হলে সোনায় সোহাগা হবে। ৬।২।১৯৫৭

রাজা স্বদেশে পূজিত হন, বিদ্বান পূজিত হন সর্বত্র। চীন-সংস্কৃতি বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত-প্রবর ডঃ লিবেনথ্যাল (Dr. Walter Libenthal) দেশ-বিদেশে সম্মানিত। চীন-ভারত-সংস্কৃতি সাধনার একনিষ্ঠ কর্মী বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্গত উপাচার্য ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী ডঃ লিবেনথ্যালকে চীন-ভারত-সংস্কৃতি স্থাপনের কাজে যোগ্য সহযোগীরূপে বরণ করে এনেছিলেন। কয়েক বছর যাবত তিনি সস্ত্রীক শান্তিনিকেতনে বাস করছেন। ডঃ বাগচী নিজে একটি চীন-ভারত সংস্কৃতিমূলক পত্রিকা 'Sino-Indian Studies' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি স্বয়ং ছিলেন এর সম্পাদক। ডঃ বাগচীর অভিপ্রায় ছিল পত্রিকাটির পঞ্চম ভাগের শেষ দুই খণ্ড ডঃ লিবেনথ্যালের সত্তর-বছর-পূর্তি-উপলক্ষে অভিনন্দন-গ্রন্থরূপে বিশেষ সংখ্যাকারে প্রকাশিত হবে এবং এই মহৎ উদ্দেশ্যে দেশ-বিদেশের

সারস্বতবর্গের বিভিন্ন সংস্কৃতিমূলক রচনার সমাবেশে সমৃদ্ধিশালী করবেন সে সংখ্যাটিকে। কিন্তু তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে সে ইচ্ছা অপূর্ণ রয়ে গিয়েছিল। বিশ্বভারতীর বর্তমান উপাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিশ্বভারতীর অন্যান্য দায়িত্বের সঙ্গে ডঃ বাগচীর অসমাপ্ত কাজগুলি সম্পন্ন করবার দায়িত্বও গ্রহণ করেছেন। তাঁর যে-সকল অভিপ্রায় তিনি প্রধান ও প্রথম সম্পন্ন করা প্রয়োজন বলে বিবেচনা করেছেন, তার মধ্যে একটি হচ্ছে পত্রিকাটির এই বিশেষ-সংখ্যা (Libenthal Fristschrift) প্রকাশ। সম্প্রতি বর্তমান উপাচার্যের তত্ত্বাবধানে এবং রবীন্দ্র-সদনের কিউরেটর শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ রায়ের সম্পাদনায় অভিনন্দন-গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে। ভূমিকায় উপাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় পূর্বতন উপাচার্যের অভিপ্রায় ও পরিকল্পনা পূর্ণ করতে সমর্থ হয়েছেন বলে আনন্দ জ্ঞাপন করেছেন এবং সে আনন্দ যথার্থ। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের বিবুধজনের প্রবন্ধসম্ভারে গ্রন্থটি অত্যন্ত মূল্যবান হয়েছে। উল্লেখযোগ্য লেখকবর্গের মধ্যে রয়েছেন—ফ্রান্সের বিখ্যাত গবেষক ও প্রত্নতাত্ত্বিক Stein ; ইতালীয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত তুচ্চী (Tuchhi) ; Fitzerald-এর পরেই অনুবাদক হিসেবে পৃথিবী-খ্যাত Arther Waley ; জার্মাণ Tubingen বিশ্ববিদ্যালয়ের Von Glasenapp ; জাপানের কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় দর্শন-শাস্ত্রের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক নাগাও ; ফ্রান্সের জাতীয় গবেষণাকেন্দ্রের অধিকর্তা Andre Barean ; ইংলণ্ডের কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের Queen's College-এর অধ্যাপক Bailey প্রভৃতি ; ভারতীয় বিদ্বজ্জনদের মধ্যে আছেন—পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী ; পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন শাস্ত্রের ভূতপুর্ব অধ্যাপক ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ; দিল্লী-বিশ্ববিদ্যালয়ের বৌদ্ধশাস্ত্রের অধ্যাপক বাপট। এঁদের ছাড়াও আমেরিকা হনলুলু প্রভৃতি বহু দেশের খ্যাতনামা জ্ঞানসাধকদের রচনা এবং চীন দেশীয় বহু প্রাচীন ও দুর্লভ একটি চিত্র (A. D. 880) এ গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এমন একখানি গ্রন্থ সকল দেশের সুধী সমাজেই সমাদৃত হবে সন্দেহ নেই।

* * *

সম্পাদনার কাজে পুলিনবাবুর (শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেন) প্রতিভা ও সযত্ন পরিশ্রম তাঁকে ইতিমধ্যেই সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট গৌরবের অধিকারী করেছে—তারি পরিচয় বহন ক'রে প্রকাশিত হয়ে চলেছে "বিশ্বভারতী পত্রিকা"। সদ্য-প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের "চিঠিপত্র" ধারার ষষ্ঠ খণ্ড আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুকে লিখিত পত্রসমূহের সংকলনখানিতে পুলিনবাবু সুসম্পাদনার আর-একটি নিদর্শন

স্থাপন করলেন। আলোচ্য 'চিঠিপত্র' ষষ্ঠ খণ্ডটি বিশ্বের দুই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির—একজন কবির ও একজন বৈজ্ঞানিকের সৌহার্দ্যের সুগভীর পরিচয়-সম্ভারে সমৃদ্ধ। মধ্যে বহুদিন বন্ধ থাকার পরে রবীন্দ্র-পত্রধারা প্রকাশের কাজ আবার যে এতদিনে শুরু হল—এতে সকলেই সুখী হবেন। কবিকে প্রত্যক্ষভাবে জানবার সুযোগ "চিঠিপত্র" ধারার সাহায্যে সাধারণের পক্ষে যাতে অতঃপর অব্যাহত থাকে, আশা করা যায় গ্রন্থন-বিভাগ সে বিষয়ে তৎপর থাকবেন। ১৩।৭।১৯৫৭

প্রদর্শনী

সম্প্রতি এক সপ্তাহ ধরে কলাভবনের হ্যাভেল-হলে প্রদর্শনী হল,—জাপানী শিশুদের কাছ থেকে উপহার-পাওয়া চিত্রের। গ্রীষ্মের ছুটির আগেই ছবিগুলি আশ্রমে এসেছিল, কিন্তু ছুটি হয়ে যাওয়াতে তখন প্রদর্শনী হতে পারে নি। ছুটির পরে এই প্রথম প্রদর্শনী হল। শিশুদেরই আগ্রহ ছিল সবচাইতে বেশি—তাদেরই মতো শিশুরা ছবি এঁকে পাঠিয়েছে তাদের জন্যে।

২৮শে জুলাই—বুধবার, ছুটির দিন। সকালবেলা মন্দিরের উপাসনার পরে হ্যাভেল হলেই আরেকটি চিত্র-প্রদর্শনীর উদ্বোধন করলেন উপাচার্য-মশায় ডঃ প্রবোধ চন্দ্র বাগচী। চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত প্রশান্ত রায় কলাভবনের কিউরেটর এবং অবনীন্দ্রনাথের ছাত্র। ত্রিশ বছর আচার্যের সান্নিধ্যে তিনি ছিলেন। তাঁরই উনপঞ্চাশটি চিত্র নিয়ে হল এই প্রদর্শনীটি। চিত্রগুলি প্রধানত ভাবমূলক। কয়েকটি চিত্র ভাবে, রেখায়, রঙে বিশেষভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কোনো আর্ট-স্কুলের নিয়মিত পাঠ না নিয়ে ব্যক্তিগত অনুরাগে নিরিবিলিতে সাধনা করে যে কৃতিত্ব শিল্পী দেখিয়েছেন,—তার বৈশিষ্ট্য সম্বর্ধনাযোগ্য—উপাচার্য মহাশয়ের এই কথাগুলি খুবই সত্য। ৬।৮।১৯৫৪

বিকেলে পাতিয়ালার মহারাজ ও মহারানী আশ্রম পরিদর্শনে আসেন। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের শিক্ষা-বিভাগের সেক্রেটারী ডঃ ধীরেন্দ্রমোহন সেন। বিকেলবেলা তাঁরা শান্তিনিকেতনে ও শ্রীনিকেতনে বিভিন্ন বিভাগ দর্শন ক'রে সেদিনই আশ্রম ত্যাগ করেন।

* * * *

গত ৭ই নভেম্বর শান্তিনিকেতনে কলাভবনের হ্যাভেল-হলে বিশেষ করে সেদিনকার সমাগত মান্য-অতিথিদের জন্য চিত্র ও কারু-শিল্পের একটি প্রদর্শনী হয়। স্বল্প-আয়োজনের মধ্যেও প্রদর্শনীটি অতি উচ্চাঙ্গের হয়েছিল। কয়েক বছর থেকে জাভা ও জাপান প্রভৃতি দেশ থেকে আমদানী-করা বাতিক-শিল্প শান্তিনিকেতনে

খুব প্রচলিত হয়েছে। শান্তিনিকেতনের বাইরেও এটি আজ বিশেষ পরিচিত হয়ে উঠেছে। এই প্রদর্শনীতে একটি উৎকৃষ্ট বাতিক-শিল্পের নমুনা ছিল, তার একটি রঙ আবার রঙ-সাবানের দ্বারা তৈরী করা। এ ছাড়া সম্প্রতি কলাভবনে বাতিকের ধরনের আরেকটি জিনিস আমদানী হয়েছে, তাকে বলা হয় 'বাঁধনি' (সুতো দিয়ে বেঁধে বেঁধে করা হয়)। মণিপুরী তাঁত ও চামড়ার বহু রকমের জিনিস কলাভবনে চলছে; শিল্পগুলি বাইরে থেকে আমদানী করা,—তার সঙ্গে শান্তিনিকেতনী শিল্পের মিশ্রণ ঘ'টে প্রত্যেকটি শিল্পই অতি মনোরম হয়ে রূপ নিচ্ছে। এই প্রদর্শনীতে নানা রকম তাঁত ও বাঁধনির কাজ দেওয়া হয়েছিল। হ্যাভেল-হলে ঢুকবার পথের হলটিতে রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসু প্রমুখ শিল্পীদের প্রসিদ্ধ কয়েকটি চিত্র সাজানো হয়েছিল। সেই থেকে নভেম্বর মাসব্যাপী হ্যাভেল-হলে শিল্প-প্রদর্শনী চল্‌ছে। সম্প্রতি হস্তশিল্প-বিভাগের প্রদর্শনী দেখতে দু'বেলা লোকের আনাগোনার অন্ত নেই। প্রচুর ও রকমারী বাঁধনি সূচিকাজ, তাঁত ও চামড়ার কাজ এতে দেওয়া হয়েছে। ২৬।১১।১৯৫৪

গত ৩রা ও ৪ঠা ডিসেম্বর সিংহসদনে ইংরেজী-পুস্তকের একটি প্রদর্শনী হয়। পুস্তকগুলি বৃটিশ-কাউন্সিল থেকে পাঠানো হয়েছিল। ৩রা ডিসেম্বর সান্ধ্য-উপাসনার পরে উপাচার্য ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী প্রদর্শনীটির উদ্বোধন করেন। তিনি বলেন,—বৃটিশ-কাউন্সিল থেকে এখানে একটি পুস্তক-প্রদর্শনীর কথা বহুদিন থেকে প্রস্তাবিত হয়ে আসছে। নানা অসুবিধায় আমরা এতদিন কোনো ব্যবস্থা করতে পারিনি। আজ সেটি করতে পেরে খুবই আনন্দিত হয়েছি এবং আমাদের পক্ষ থেকে বৃটিশ-কাউন্সিল-প্রতিনিধিকে এজন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বৃটিশ-কাউন্সিল-প্রতিনিধি বলেন,—আমাদের পুস্তক-প্রদর্শনীর পিছনে কোনো রাজনৈতিক ও প্রচারমূলক উদ্দেশ্য নেই। ইংরেজী সাহিত্য, সংস্কৃতি ও চিন্তাধারার সঙ্গে সমস্ত দেশের যোগ স্থাপনই এ প্রচেষ্টার মূলে নিহিত রয়েছে। বেশির ভাগ পুস্তকই সাহিত্য-সম্বন্ধীয়; অল্পসংখ্যক মাত্র আছে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ক। এগুলি এমন ধরনের বই যা আমাদের দেশের সাধারণ ছাত্রছাত্রীগণ সচরাচর ব্যবহার করে থাকেন। এ দেশের ছাত্রছাত্রীগণ ও জনসাধারণ যাতে এগুলির সঙ্গে পরিচিত হতে পারেন সেই উদ্দেশ্যেই এ প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান। বইগুলি সবই খুব অল্পদিনের প্রকাশিত নতুন বই। ২০।১২।১৯৫৪

গ্রীষ্মাবকাশ আগতপ্রায়। তার পূর্বেই বিশ্বভারতীর শিক্ষাবিভাগগুলিতে পরীক্ষা-সমাপনান্তে পুরাতন বর্ষের অবসান হবে; জুলাই মাস থেকে নূতন বর্ষারম্ভ।

মাসখানেক যাবত কলাভবনে প্রত্যেক বর্ষের শিল্পকলা-প্রদর্শনী চলছে; গ্রীষ্মের ছুটির আগে অবধি চলবে। এই প্রদর্শনীর কাজের উপরেই ছাত্রছাত্রীদের নম্বর দেওয়া হয়ে থাকে। এবারকার ক্র্যাফ্‌ট্‌স্‌ বিভাগের প্রদর্শনীটি দর্শকদের কাছ থেকে উচ্চ প্রশংসা অর্জন করেছে। ১৫ই মার্চ থেকে ১৭ই মার্চ তিনদিন এই প্রদর্শনী হয়েছিল। বুধবার ছুটির দিনেও এটি খোলা ছিল এবং সেদিন সকালে বিশ্বভারতীর প্রাক্তন ছাত্র ও বর্তমানে কলকাতা গভর্ণমেণ্ট আর্টস কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সে প্রদর্শনীটি দেখতে এসেছিলেন। ক্র্যাফ্‌ট্‌স্‌-বিভাগে কেবলমাত্র মহিলাদের জন্য দু'বছরের কোর্স প্রবর্তিত হয়েছে। এবারই প্রথম দল শিক্ষা সমাপ্ত করলেন। বহুরকম হাতের কাজ তাঁরা এই দুই বছরে শিখেছেন: বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—জয়পুরী বাঁধ্‌নি; জাভা, জাপান প্রভৃতি দেশের বাতিক, তাঁত, ছাঁচ, চামড়া, সূচীকার্য, আল্‌পনা ডিজাইন, কাঠের উপর চমুর কাজ প্রভৃতি। দু-বছরে এত সব হস্তশিল্প শিখবার সুযোগ অন্যত্র দুর্লভ এবং এ সব কাজের পরীক্ষায় নম্বরের তারতম্য নির্ভর করে হস্তশিল্পে ছাত্রীদের স্বকীয় রঙ-মিশ্রণক্ষমতার বৈশিষ্ট্যে, সূক্ষ্ম কারুকলা পরিবেশনের নৈপুণ্যে এবং কাজের পরিমাণের উপর। এবারকার ক্র্যাফ্‌ট্‌স্‌-বিভাগের কয়েকজন শিল্পী এ সব বিষয়ে পারদর্শী বলে গণ্য হবার যোগ্য।

প্রদর্শনীর সময় হ্যাভেল-হলের প্রথম অংশেই তিনচারটি ঢাকাই তাঁতের শিল্প-নিদর্শন রাখা হয়েছিল—কলাভবন মিউজিয়মের জন্য সেগুলি সংগৃহীত হয়েছে। এই অপূর্ব শিল্প-নিদর্শনগুলি সবাই মুগ্ধ হয়ে দেখেছেন। যে যুগে ঢাকাই মসলিন-শিল্প দেশে-বিদেশে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল, সে যুগ আজ আমাদের কাছে গল্পের যুগ হয়ে গেছে—একটা সুপুরির খোলার ভিতর একখানা কাপড় ঢোকানো যেত—এত সূক্ষ্ম কাপড় তৈরী দেখলে মনে হয়—কিছুই অসম্ভব ছিল না; এখনও এত সূক্ষ্ম কারুকার্যময় এমন অপূর্ব বস্ত্র তৈরী তো হচ্ছে! সেদিন একজন বিদেশী অতিথি ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে নানাভাবে এগুলিকে পর্যবেক্ষণ করলেন। তাঁর চোখেমুখে বিস্ময়ের চিহ্ন সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছিল। ২।৪।১৯৫৫

১৩ই এপ্রিল কলাভবন-সম্মিলনীর পক্ষ থেকে চীন-ভবনে চীনদেশীয় প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী জুপিয়োর স্মরণে একটি চিত্র ও শিল্প-প্রদর্শনী হয়েছে। তাতে কলাভবন ব্যতীত পাঠভবন শিক্ষাভবন বিদ্যাভবন সংগীতভবন প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগ থেকে চিত্র ও শিল্প চয়ন করা গিয়েছিল। ১৩ই থেকে ১৬ই অবধি এ প্রদর্শনী চলেছিল; চিত্র ও শিল্পগুলিকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে তাদের শিল্পীদের মধ্যে প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। প্রদর্শনীর মধ্যেই চিত্র ও

শিল্পের নীচে নীচে মান নির্দিষ্ট করে লিখে দেওয়া হয়। বিশ্বভারতীর যে-কোনো একটি বিভাগে ভরতি হয়ে অন্যান্য বিভাগের বহুবিধ বিদ্যা শিখবার সুযোগ লাভ করা যায়। অতি অল্প বয়েস থেকেই পাঠভবনের ছাত্র-ছাত্রিগণ কলাভবনের মতো ছবি-আঁকা সেলাই চামড়া বাতিক বাঁধনি প্রভৃতি কাজ কিছু-পরিমাণে শেখে। অন্যান্য বিভাগেও দুচার বছরের জন্য ছাত্র-ছাত্রিগণ কোনো বিষয় শিখতে এসে এসব জিনিসও যে যথেষ্ট পরিমাণে শিখে যায় এ প্রদর্শনীতে তার প্রমাণ পাওয়া গেল। গত ২৩শে এপ্রিল সংগীতভবনের স্টেজে এ প্রদর্শনীর ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কার দেওয়া হয়। কলাভবনের বর্তমান অধ্যক্ষ শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মা সভা-পতিরূপে পুরস্কার দেবার আগে চীনশিল্পী জুপিয়ো সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেন। জুপিয়ো কিছুদিন শান্তিনিকেতনে ছিলেন; নিজের দেশে তাঁর খুব খ্যাতি হয়েছিল। তিনি মারা গেলে তাঁর স্মৃতি-হিসাবে তরুণ শিল্পীদের পুরস্কৃত করবার জন্য চীন থেকে বিশ্বভারতীতে কিছু উপহার আসে। কলাভবনের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ করও কিছু পুরস্কার দেন এবং শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মা এ প্রদর্শনীতে শিশু-বিভাগের যোগদানকারীদের মধ্যে টফি উপহার দিয়ে তাদের খুসী করেন। শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মা এ আশ্রমে তাঁরা প্রথম যখন চিত্রকলার ছাত্র হিসাবে যোগ দেন তখনকার অবস্থা ও বর্তমান শিশু ও কিশোর শিল্পীদের চিত্র শিখবার অবস্থা সম্বন্ধে তুলনামূলক একটি বিবরণ দেন এবং বলেন—দেশের প্রত্যেকের মধ্যে শিল্প ও সৌন্দর্যের জ্ঞান না থাকলে জাতি বড় হতে পারে না, জাপান দেশ দেখে এই সত্যটি সুস্পষ্ট উপলব্ধি হয়। শিশু-বয়েস থেকে এই-যে এখানে একটি সৌন্দর্যরুচির সহজ আবহাওয়া পাওয়া যায় এটি শুধু আনন্দদায়ক নয় এটি জাতির একটি সম্পদ বলে গণ্য হবার যোগ্য। শিশু-মনের রীতিনীতি গড়ে তুলবার পক্ষে এটি খুবই অনুকূল।

* * *

এপ্রিল মাসেই আশ্রমে বাইরে থেকে তিন দল শিল্পী এসে তাঁদের শিল্পকলা প্রদর্শন করে গেছেন। প্রথমে আসেন কথক-নৃত্যপটু শ্রীনলিন গাঙুলি, দু'দিন তিনি কথক-নৃত্য দেখান। নৃত্যের আগে তিনি কথক-নৃত্যের উৎপত্তি ও তার ক্রমপরিণতির ইতিহাস বলে নেন। কথক-নৃত্য অদ্বৈতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, তার মধ্যে বৌদ্ধ তান্ত্রিক ও শাক্ত ধারা এসে কেমনভাবে মিশেছে, নাচের তাল ও বোলের অর্থ কী—সে সবও শ্রীগাঙুলি বিশদভাবে বোঝাতে চেষ্টা করেন। সাধারণ লোকে কেবল নাচই দেখে থাকে, তার শিক্ষার দিকটা সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও

উদাসীনতায় তারা লজ্জিত হয় না। সেটা যেন একমাত্র নৃত্য-পরিশীলন-কারীদের জন্যেই নির্দিষ্ট রয়েছে। কিন্তু নিছক আনন্দলাভের থেকে উন্নত রুচি গড়ে ওঠে না, জ্ঞানের সংযোগ ঘটলে তাতে বিকারের আশঙ্কা থাকে কম। মাঝে মাঝে দর্শকসাধারণের কাছে এরকম ভাবে নৃত্যগীতাদির ইতিহাস ও তথ্যের বর্ণমালাগুলি পরিবেশিত হলে দর্শকগণ লাভবান হবেন, শিল্প-অনুশীলনও উৎকর্ষ লাভ করবে। কথক-নৃত্যের পরে আসেন একদল পল্লী-নৃত্যগীতিশিল্পী। তাঁরাও পল্লী-নৃত্যগীতের বিবরণ দান করেন এবং কতগুলি সুন্দর সুন্দর নাচ-গান দেখিয়ে-শুনিয়ে দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করেন। এই দুটি অনুষ্ঠান থেকে আমাদের দেশের প্রাচীন আনন্দানুষ্ঠানের প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া গেল। কিন্তু তৃতীয় অনুষ্ঠান পুতুল-নাচটি তেমন উৎরাতে পারেনি। এটিও দেশের প্রাচীন একটি আনন্দানুষ্ঠান; রুচি ও পরিকল্পনাহীন গতানুগতিক পরিচালনায় শিল্পটি বিলুপ্তির পথে চলেছে। বছর দুয়েক আগেও এখানে রাজপুতানার জয়পুর অঞ্চল থেকে একদল পুতুল-নাচিয়ে এসে পুতুল-নাচ দেখিয়ে যায়। এবারও যোধপুর থেকে একদল ভ্রাম্যমাণ পুতুল-নাচিয়ে আশ্রমে আসে এবং গত ১৯শে এপ্রিল লাইব্রেরীর বারান্দায় পুতুল-নাচ দেখায়। দর্শকদের ভিড়ে স্থান অকুলান হয়ে উঠেছিল, কারণ এ শিল্পটি প্রায় লোপ পেয়ে গেছে, ক্বচিৎ দেখা মেলে। কিন্তু শিক্ষিত, রুচিসম্পন্ন বা নিরক্ষর অনুন্নত-রুচি দর্শকশ্রেণীর কেউই বিশেষ তৃপ্তি পাননি। তার মধ্যে গতবারের মতোই এবারেও না-ছিল বিশেষ পরিকল্পনা না-ছিল উচ্চাঙ্গের আনন্দদায়ক কলা-কৌশল। একথা স্বীকার করতেই হবে বর্তমানে, আধুনিক শহরবাসী ও শিক্ষিতদের কথা বাদ দিলেও, গ্রামবাসী ও জনসাধারণের রুচিও যথেষ্ট উন্নত হয়েছে, তারাও আর যা-কিছু পরিবেশিত হলেই তাতেই আনন্দ পায় না। ৬।৫।১৯৫৫

শিল্পী কিরণ সিংহ। এর নাম বাংলাদেশের চেয়ে দিল্লী-অঞ্চলে বিশেষভাবে পরিচিত। এমনকি ভারতের বাইরেও কোনো-কোনো অঞ্চলে তাঁর ছবির প্রদর্শনী হয়ে গেছে। কিরণ সিংহ দীর্ঘকাল আশ্রমে বাস করছেন। কলাভবনের প্রাক্তন ছাত্র তিনি। শ্রীমতী গার্টরুড নাম্নী বিদেশিনী মহিলাকে বিবাহ করে রতন-পল্লীর এক প্রান্তে বাড়ি তৈরি করে তিনি শিল্পকার্যে রত রয়েছেন। তাঁর অঙ্কিত চিত্রগুলিতে সাঁওতাল-জীবনের প্রভাব পরিস্ফুট। আর সেই সঙ্গে বীরভূমের সাধারণ লোকের জীবনের বিভিন্ন চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। "ক্যানেল-কাটার শ্রমিক", "তৃতীয়-শ্রেণীর যাত্রী", "দুরমুশ" ইত্যাদি চিত্রগুলি দেশ-বিদেশে বিশেষ-ভাবে প্রশংসা পেয়েছে। এমনকি প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু দিল্লীতে তাঁর কয়েকটি

ছবি কিনেছিলেন। রাষ্ট্রপতি-ভবনেও তাঁর ছবি দেখতে পাওয়া যাবে। ইণ্টার ন্যাশনাল ক্লাবের উদ্যোগে গত ১৬ই নভেম্বর থেকে ১৮ই নভেম্বর পর্যন্ত বুলবুল-স্টুডিওতে শ্রীকিরণ সিংহের ছবির একটি প্রদর্শনী হল। প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন উপাচার্য শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু। শান্তিনিকেতনবাসী অনেকে এই কৃতী শিল্পীর ছবি দেখে বিশেষ আনন্দ লাভ করেছেন।

* * *

শ্রীকিরণ সিংহের ছবিতে দুটি জিনিস বিশেষভাবে উপভোগ্য—এক উদার মানবপ্রেম, দুই রূপের গঠন। তাঁর হাওড়া-ব্রিজের নিচে মুমূর্ষুর দল, সাঁওতাল-জীবন, বৃদ্ধ কৃষক প্রভৃতি ছবিতে এই মানবপ্রেমের বিকাশ ঘটেছে। আর রূপের গঠন তাঁর প্রতিটি ছবিতেই আনন্দদায়ক। বুলবুল-স্টুডিওর সামনে কংক্রীট-নির্মিত সাঁওতাল-দম্পতীর বিরাট মূর্তিতে তার প্রকাশ। তাঁর ছবির আঙ্গিক-মনোভাব আধুনিক, কিন্তু রূপ-গঠনে অনেক সময় প্রাচীন ক্লাসিকাল ছবির সমৃদ্ধির স্পর্শ পাওয়া যায়। এই কিরণ সিংহ ও তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী গার্টরুড সিংহের রচিত নক্সা-কাপড়ের প্রদর্শনীটিও উল্লেখযোগ্য। কাঠের ব্লক করে তা'তে নানা রং লাগিয়ে কাপড়গুলি ছাপানো হয়েছে। ২৯।১১।১৯৫৬

লাইব্রেরী

"এই প্রসঙ্গে আপনাদের এই সংবাদ জানা দরকার যে, ফ্রান্স, জার্মান, স্থইজারল্যাণ্ড, অস্ট্রিয়া, বোহেমিয়া প্রভৃতি য়ুরোপীয় দেশ থেকে অজস্র-পরিমাণ বই দানরূপে শান্তিনিকেতন লাভ করেছে।"—রবীন্দ্রনাথ

লাইব্রেরী শান্তিনিকেতনের একটি মহাসম্পদ। বিদ্যাভবন, কলাভবন, চীনাভবন, রবীন্দ্রভবন, সখাসংঘ—নানা শাখায় সেটি বিভক্ত। বিভিন্ন বিষয়ের বই বিভিন্ন সে-সব শাখায় চালান হয়ে যায়। এ ছাড়া, মূল কেন্দ্র তো রয়েইছে। সব পুঁথিপত্র একটি গৃহে ধরবার মতো বাড়ি শান্তিনিকেতনে নাই। মূল কেন্দ্রের পুরোনো গৃহেও এখন বইএর জায়গা হচ্ছে না। আনাচে-কানাচে স্তূপাকার সব পড়ে আছে। বিদ্যাভবনের কাজে লেগে আছে আবার তার উপরতলাটা গোটাই। এই অবস্থায়, নূতন বাড়ি না হলে অচল। সেই পরিকল্পনাই চলছে। বহু টাকার ব্যাপার। নূতন বাড়িতে লাইব্রেরী স্থানান্তরিত ক'রে পুরোনো বাড়িটি সম্পূর্ণভাবে বিদ্যাভবনের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। আমেরিকা থেকে অনেক বই এসেছে।

সাহিত্যের বাছাই-করা জিনিস। এবারে সেগুলি সেলফে তোলা হচ্ছে। প্রস্তাবিত নূতন গৃহের পরিকল্পনা সম্পর্কে সম্প্রতি কলকাতা থেকে "ন্যাশনাল লাইব্রেরির" শ্রীযুক্ত কেশবন এখানে এসেছিলেন। ২৩।৬।১৯৫২

* * *

বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য—শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রীমতী প্রতিমা ঠাকুর বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে অনেক গ্রন্থ দান করেছেন। নিরানব্বই খণ্ড মূল্যবান চিত্রসংকলন প্রায় একটা স্বতন্ত্র গ্রন্থালয়ের মতো। এর মধ্যে চিত্র ও কারুকলা সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ রচয়িতাদের দুর্লভ পুস্তকসকলও রয়েছে। কলাভবনের গ্রন্থাগারে এসব পুস্তক রাখা হয়েছে। ৫।১।১৯৫৩

আমেরিকার হুইট্‌লোন ফাণ্ডের সুদ থেকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে পুস্তক ক্রয়ের জন্য অর্থদান করা হচ্ছে। বিশ্বভারতীর জন্য (নব্বই হাজার টাকার মতো) ২০ হাজার ডলার বরাদ্দ হয়েছে। ঐ মূল্যের বই আমেরিকা থেকে আনানো হবে। তার তালিকা তৈরি হচ্ছে। বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারসমূহে সব মিলিয়ে মোট আড়াই লক্ষ গ্রন্থ আছে এবং কেন্দ্রীয়-গ্রন্থাগারে গ্রন্থ আছে প্রায় আশি হাজার, বাংলা পুঁথি চার হাজার। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজ গ্রন্থাগারের বহু মূল্যবান গ্রন্থ কেন্দ্রীয়-গ্রন্থাগারে দান করে গেছেন। S. R. Runner নামে একজন জার্মান ভদ্রলোকের কাছ থেকেও ভাল ভাল কিছু ক্লাসিকাল জার্মান ও ফরাসী ভাষার পুস্তক পাওয়া গেছে। কেন্দ্রীয়-গ্রন্থাগারের চেষ্টা চলছে—গ্রন্থাগারের সমগ্র পুস্তকের বৈজ্ঞানিক-প্রণালী অনুসারে একটি সুবিধাজনক তালিকা প্রস্তুত করার। দর্শন বিষয়ক গ্রন্থগুলির এমন একটি তালিকা প্রস্তুত হয়েছে যাকে বলা যায় Dictionary Catalogue অর্থাৎ শুধু দর্শন-সম্বন্ধীয় পুস্তকের নাম বা গ্রন্থকারের নাম নয়, প্রত্যেকটি বিষয়বস্তুর নাম এবং কোন্ পুস্তকের কোন্ পাতায় তা পাওয়া যাবে তার খবর—সবকিছু দিয়ে বিশেষভাবে তালিকা করা হয়েছে। এতে অনুসন্ধানকারী পাঠক অতি সহজে তার ইপ্সিত জিনিসটি পেয়ে যেতে পারেন।

সাধারণের মধ্যে গ্রন্থাগারের পুস্তকসমূহের প্রচার বাড়াবার চেষ্টা নানাভাবে করা হচ্ছে। নূতন কোনো বই এলেই তার বিজ্ঞাপন গ্রন্থাগারের বারান্দায় সাধারণ নোটিশ-বোর্ডে টাঙিয়ে দেওয়া হয় এবং 'বিশ্বভারতী নিউজ'-এ তার কথা উল্লিখিত হয়ে থাকে। স্থানাভাবে সব রকম পরিকল্পনা এখনও কার্যকরী হয়ে ওঠে নি। গ্রন্থাগারটিকে শীঘ্রই বড় করবার সংকল্প রয়েছে; সেজন্য তিন লক্ষ টাকা মজুত আছে। কেউ কেউ বলছেন—বর্তমান গ্রন্থাগারের আয়তনই পরিবর্ধিত

করা হোক্ ; কারো কারো কাছে—বৈজ্ঞানিক প্রথায় গ্রন্থাগারের জন্ম নূতন বাড়ী তৈরি হওয়াই বাঞ্ছনীয়। পরিকল্পনা চলছে, নূতন সদন হলে বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয়-গ্রন্থাগার সম্পূর্ণ রূপ পাবে। গ্রন্থাগারের উপরিতলে বিদ্যাভবনের গবেষণাগার। তার একটি নির্দিষ্ট কক্ষে উপাচার্য শ্রীক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় এসে তাঁর প্রতিদিনের কাজে বসছেন। চারিদিকে পুঁথিপত্রের স্তূপ, মাঝখানটিতে চাদর-গায়ে সৌম্য-মূর্তি তিনি তাঁর নিয়মিত অভ্যাসে শাস্ত্রচর্চাদিতে মগ্ন থাকেন। সুপরিচিত স্নিগ্ধ হাসি ও সেই সরস বাক্যালাপেরও অভাব নেই। সবার মন খুসীতে ভরে দিয়ে তিনি আপন কাজ করে যাচ্ছেন। নূতন পদের গুরুভার তাঁকে ভারাক্রান্ত করেছে বলে মনে হয় না। অফিসমহল কাজের ব্যস্ততায় আবার গমগম করে উঠছে। ১৭।১১।১৯৫৩

বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয়-গ্রন্থাগারের সামনের বারান্দাটি আশ্রমের প্রতিদিনের কৌতূহলের স্থান। এ-জায়গাটা হল বার্তা-সরবরাহ-বিভাগ। বারান্দার দুপাশে দুটি কাঁচ-ঢাকা নোটিশ-বোর্ড আছে আর বাইরের দিকের দেয়ালে সাঁটা দুটি বড় কালো পাথরের বোর্ড। প্রতিদিন এ চারটি বোর্ডে হরেক রকমের নোটিশ পড়ে। ডানদিকের কাঁচ-ঢাকা বোর্ডে থাকে যত বইয়ের খবর—লাইব্রেরীতে নূতন কী কী বই এল ; কোন্ বিশেষ বিষয় কোন্ বইয়ের কোন্ অধ্যায়ে পাওয়া সম্ভব ইত্যাদি নানা তথ্য। আর পরীক্ষার ফল বেরুবার সময় এখানেই বের হয় পাশের তালিকা। বাঁ পাশের কাঁচ-ঢাকা বোর্ডে থাকে সবরকমই। আচার্য জওহরলাল নেহরু তাঁর জন্মদিনে বিশ্বভারতীর শ্রদ্ধাভিনন্দন পেয়ে আশ্রম-বাসীদের শ্রদ্ধাপ্রীতি জানিয়েছেন সে খবর এ-বোর্ডে টাঙানো হয় ; বাইরের কোনো বিশেষ ঘটনা বিশেষ খবর আশ্রমবাসী সবাইকে জানানো দরকার—নোটিশ ঝোলে এ-বোর্ডে ; আশ্রমের দৈনন্দিন কার্যসূচির নির্ধারিত সময় এখানে টাঙানো। এর সঙ্গে সঙ্গে মাঝে মাঝে থাকে কেউ কোনো জিনিস হারিয়েছে বা পেয়েছে তার খবর। বাইরের দেয়াল-বোর্ডে বেশির ভাগ থাকে খেলার খবর, নয় তো পাঠভবন-শিক্ষাভবনের ছাত্র-ছাত্রীদের সভার খবর। এ জায়গাটি তাই প্রতিদিন আশ্রমের ছেলেবুড়ো সবাইকে ভিতরে ভিতরে আকর্ষণ করে। প্রত্যেকেই দিনে দুবার তিনবার হেঁটে যায় বোর্ডগুলির দিকে তাকিয়ে। ৯।১২।১৯৫৩

* * *

বড়দিনের অবকাশে বহু দর্শক আশ্রম পরিদর্শন করে গেছেন। তাঁদের মধ্যে দু'দল ছিলেন বিশিষ্ট অতিথি। হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান-শিক্ষাপ্রাপ্ত

ছাত্রদল (Library Science Training Students) হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের সহকারী গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত সি ভি বিশ্বনাথম্ বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয়-গ্রন্থাগার পরিদর্শন করে গেছেন। বিশ্বভারতী-গ্রন্থাগার কীভাবে চলছে, তার আয়-ব্যয় কত, গ্রন্থসংখ্যা কত—সব তাঁরা খোঁজ নিয়েছেন। দ্বিতীয় দলে ছিলেন কলকাতা শিক্ষা-সম্মেলনে-আগত অতিথিবৃন্দ। প্রায় তিন শ' অভ্যাগত একদিন এগারটার গাড়িতে শান্তিনিকেতন আসেন। আশ্রম ঘুরে দেখে চারটার গাড়িতে তাঁরা কলকাতায় ফিরে যান। ১৬।১।১৯৫৪

বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয়-গ্রন্থাগার তার পুস্তকাবলী, পুঁথিসংগ্রহ এবং দৈনিক মাসিক পাক্ষিক প্রভৃতি পত্রিকার পরিমাণ নিয়ে ভারতের অন্যান্য গ্রন্থাগারের মধ্যে বিশিষ্ট একটি স্থান অধিকার করে আছে। এই কেন্দ্রীয়-গ্রন্থাগারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে চীনভবন, হিন্দীভবন, কলাভবন, বিদ্যাভবন, বিনয়ভবন, শ্রীনিকেতন প্রভৃতি শিক্ষা-বিভাগে আরও পাঁচ-সাতটি বিভাগীয় গ্রন্থাগার রয়েছে। তাদের স্বকীয় পুস্তকসংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। আন্তর্জাতিক জ্ঞান ও শিল্পকলাচর্চা-কেন্দ্র বিশ্বভারতী-গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাবলীর দিক দিয়ে বিশেষভাবেই সমৃদ্ধ। শুধু তাই নয়, এ সমস্ত গ্রন্থাগারে Open access System প্রচলিত রয়েছে। অর্থাৎ পাঠকবর্গের কাছে গ্রন্থসমূহ অত্যন্ত সহজলভ্য; তাঁরা নিজেরা গিয়ে বই বেছে নিয়ে ওখানে বসে পড়তে পারেন এবং কার্ডে নাম লিখে বই বাড়ি নিয়ে যেতে পারেন। কেন্দ্রীয়-গ্রন্থাগারের সাধারণ-পাঠকক্ষটি তো সকাল থেকে বিকেল অবধি খোলাই থাকে; সেখানে বর্তমান পৃথিবীর শত-শত কল্লোল দেশ-বিদেশের দৈনিক মাসিক, বার্ষিক প্রভৃতি পত্রিকায় নীরবে উত্থিত হচ্ছে। কিন্তু ঘরটি ছোট বলে স্থান-সংকুলান হয় না, পত্রিকাগুলি বিষয়ানুযায়ী সুশৃঙ্খলভাবে সব সময় সাজানো থাকে না। ছাত্র-ছাত্রিগণ বহু পত্রিকা পড়ে যান কিন্তু কত বিষয়ের কোন্ কোন্ দেশের কী-কী পত্রিকা আসছে তার একটা সুস্পষ্ট ধারণা করতে পারেন না। গত ১৫ই মার্চ থেকে ২২শে মার্চ অবধি সপ্তাহব্যাপী সাধারণের জন্য কেন্দ্রীয়-গ্রন্থাগারের দ্বিতলের পাঠকক্ষে মাসিক ও পাক্ষিক ইত্যাদি সাময়িক পত্রিকার একটি সুপরিকল্পিত প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছিল। বিষয় অনুযায়ী সেগুলি সাজানো ছিল; তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—পাঠকদের এ পত্রিকাগুলির সঙ্গে পরিচয় ঘটানো। একই বিষয়ে দেশে-বিদেশে বিভিন্ন রকম চিন্তা চলছে, গবেষণা করা হচ্ছে, তাই নিয়ে কত আলোচনা পত্রিকায় বেরুচ্ছে। সাধারণভাবে দেখে গেলেও পাঠকগণ এ প্রদর্শনী থেকে বিভিন্ন পত্রিকার বিষয়গুলি হৃদয়ংগম করতে পারবেন এবং পরে পাঠকক্ষে

বসে এগুলি মনোযোগ সহকারে পড়তে পারবেন। এই ঔৎসুক্য জাগানোই ছিল এ প্রদর্শনীর বিশেষ প্রচেষ্টা। আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল পাঠকগণ যাতে পত্রিকাগুলি দেখে তাঁদের অভিমত জানাতে পারেন—কোন্ পত্রিকাগুলি তাঁদের বিশেষ প্রয়োজনীয়, কোন্‌গুলি না হলেও বিশেষ ক্ষতি নেই; কিংবা নূতন কোন্ কোন্ পত্রিকা আনালে তাঁদের আরও সুবিধা হবে। পাঠকদের জন্যই গ্রন্থাগারের উপযোগিতা। তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা রেখে গ্রন্থাগার পরিচালনার উপর গ্রন্থাগারের পরিচালকদের কৃতিত্ব নির্ভর করে। পাঠকবর্গের সঙ্গে এরকম সুষ্ঠু সংযোগ সাধন প্রত্যেক গ্রন্থাগারের শ্রীবৃদ্ধির অন্যতম উপায়, একথা নিঃসন্দেহেই বলা যেতে পারে। ১৪।৪।১৯৫৪

গত মার্চ মাসে গণতান্ত্রিক চীনের রাষ্ট্রদূত ইউয়ান-চ্যাং-সেইন শান্তিনিকেতন পরিদর্শনে এসেছিলেন। সম্প্রতি তিনি বর্তমান চীনের নানা শিল্পকলা ও সাংস্কৃতি সম্বন্ধে পঁচিশ কপি পুস্তক ও মাসিক পত্রিকা বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারে দান করেছেন।

*　　　*　　　*　　　*

স্বর্গত সুবীরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী শ্রীমতী পূর্ণিমা ঠাকুর তাঁর স্বামীর সংগৃহীত পুস্তকাবলী বিশ্বভারতী-গ্রন্থাগারকে উপহার দিয়েছেন। দুশো তেতাল্লিশখানা গ্রন্থ এ সংগ্রহে ছিল।

*　　　*　　　*　　　*

'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীপরশমণি প্রধান শিক্ষাভবনের ছাত্র শ্রীকেদার কৈরালার মারফৎ কতকগুলি নেপালী গ্রন্থ বিশ্বভারতীকে দান করেছেন। এই গ্রন্থগুলি দিয়ে বিশ্বভারতী-গ্রন্থাগারে একটি আলাদা নেপালী গ্রন্থ-বিভাগ স্থাপন করবার কথা চলছে।

*　　　*　　　*

লুধিয়ানার শ্রীমতী তৃপ্তি রাওয়ের অর্থসাহায্যে শান্তিনিকেতনের হিন্দীভবন-গ্রন্থাগারে সম্প্রতি মূল্যবান গ্রন্থসমূহ কেনা হয়েছে। প্রাচীন ক্লাসিকাল সাহিত্য, বর্তমান গল্প-উপন্যাস, কবিতা, নাটক, সাহিত্যিক চিঠিপত্র, ভারতীয় শিল্পকলা, ভাস্কর্য অভিধান প্রভৃতি বহু বিষয়ের বিশেষ প্রয়োজনীয় হিন্দী-গ্রন্থ তার মধ্যে আছে। এতগুলি মূল্যবান গ্রন্থ কেনবার মতো অর্থ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে সমূহ সংগ্রহ করে উঠবার সম্ভাবনা ছিল না। শ্রীমতী রাওয়ের অর্থানুকূল্য তাই খুবই কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বিশ্বভারতী গ্রহণ করেছেন। ২।৬।১৯৫৪

বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয়-গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় গত মে মাস থেকে (১৯৫৪-৫৫) বর্তমান বর্ষের জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার-পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁরই সহকারী গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত বিমলকুমার দত্তের (গত বছর তিনি কমনওয়েলথ ফেলোশিপ ও ফুলব্রাইট বৃত্তি নিয়ে অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকা ঘুরে এসেছেন) তত্ত্বাবধানে সম্প্রতি গ্রন্থাগারের পুরাতন সব সংগৃহীত গ্রন্থ ও জিনিসপত্রাদির বর্গীকরণের এবং সূচীকরণের কাজ চলছে। আর একটি কাজও তিনি প্রবর্তন করেছেন। বিশ্বভারতীর প্রত্যেক বিভাগে নূতন যে-সব কর্মী আসেন, মাঝে মাঝে তাঁদের নিয়ে ক্লাস ক'রে গ্রন্থাগারের বিভাগগুলির কার্যপদ্ধতি সবিস্তারে ব্যাখ্যা করা হয়। এতে নবাগতদের মধ্যে অধ্যয়নের স্পৃহা, নানা বিষয়ের প্রতি ঔৎসুক্য এবং গ্রন্থাগারের সুব্যবহারে অভিজ্ঞতা বাড়ে। শ্রীযুক্ত দত্ত তাঁর বিদেশে-অর্জিত অভিজ্ঞতার কথা স্থানীয় মহিলা-সমিতির এক অধিবেশনে কিছুটা বিবৃত করেছিলেন। সম্প্রতি গ্রন্থাগার-পরিচালনা সম্বন্ধে তাঁর রচিত 'গ্রন্থাগার' নামে একখানি পুস্তিকা 'বিশ্ববিদ্যা'-গ্রন্থমালার অন্তর্গত হয়ে বিশ্বভারতী-গ্রন্থন-বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থাগার সম্বন্ধে এখনও অনেক বিষয়েই আমাদের দেশের অধিকাংশ সাধারণ লোক প্রায় কিছুই জানেন না এবং জানবার ঔৎসুক্যও বোধ করেন না। সংক্ষেপের মধ্যে এ গ্রন্থটিতে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। শ্রীযুক্ত দত্ত কিছুদিন হল বঙ্গীয় গ্রন্থাগারিক-শিক্ষণ-পরিষদের একজন সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। ২৬।৬।১৯৫৪

* * *

রবীন্দ্র-সপ্তাহে, বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয়-গ্রন্থাগারের বারান্দায় নোটিশ-বোর্ডে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লিখিত গ্রন্থসমূহের ও রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থসমূহের তালিকা প্রত্যহ টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এ ছাড়া, স্বতন্ত্রভাবে একটি সুন্দর প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও গ্রন্থাগার থেকে করা হয়। ভারতীয় এবং বৈদেশিক বিভিন্ন ভাষায় রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থের অনুবাদ এবং আলোচনামূলক বহু গ্রন্থের ও তাঁর অঙ্কিত চিত্র ও হাতের লেখার বিচিত্র সমাবেশ সেখানে ছিল। আশ্রমের শিশুরা রবীন্দ্রনাথকে 'আমাদের গুরুদেব' বলেই সাধারণত বলে থাকে; তিনি যে বিশ্বেরও কতখানি শ্রদ্ধেয়, তাঁর সম্বন্ধে নানা দেশেই যে কত আগ্রহ,—তাঁর সাহিত্য পঠন-পাঠন এবং তাঁর বিষয়ে আলোচনা যে কত ব্যাপক ও বিচিত্র রকমে চলেছে,—এই প্রদর্শনী থেকে তা কতকটা আঁচ করতে পেরে তারা বিস্মিত এবং আনন্দিত হয়েছে। আর, এ প্রদর্শনিটি ভালো লেগেছে বৈদেশিক অধ্যাপক এবং ছাত্রদের। তাঁরা এখানে

রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ করেই একটু যেন কাছে পেয়েছিলেন। ১৫ই আগষ্ট কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের দ্বিতলের এক কক্ষে প্রদর্শনীটির দ্বার উন্মোচন করেন উপাচার্য ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয়। সমাগত ছাত্রছাত্রী ও জনমণ্ডলীকে স্বাগত সম্ভাষণ করে প্রধান-গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত বিমলকুমার দত্ত বলেন, পাঠকদের সঙ্গে গ্রন্থাগারের যোগ ঘনিষ্ঠতর ও আরো সক্রিয় করে তোলবার জন্যই এ রকম অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে এবং আরো করা হবে। পাঠকদের মধ্যে সৌহার্দ্য ও জ্ঞান বিস্তারের পক্ষে এরূপ অনুষ্ঠান যে খুবই উপযোগী, উপাচার্য মহাশয়ও তাঁর ভাষণে সে কথা বলে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। ২।৯।১৯৫৪

জানা গেল বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয়-গ্রন্থাগারে আমেরিকার হুইটলোন ফাণ্ডের অর্থ থেকে প্রেরিত পুস্তকসমূহের প্রথম কিস্তি আগামী জুলাই মাস নাগাদ এসে পৌঁছবে। গ্রন্থ-সকল নির্বাচন করেছেন এখানকার গ্রন্থাগারের কর্মিবৃন্দ। দু কিস্তিতে সমস্ত বই পাওয়া যাবে। বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয়-গ্রন্থাগারটি ক্রম-বর্ধমান অবস্থায় রয়েছে। নানা দিক থেকে গ্রন্থ, পুঁথি প্রভৃতি সংগৃহীত হচ্ছে। বর্তমান গৃহটি স্থানাভাবের জন্য যথোপযুক্ত বিবেচিত নয়। শৃঙ্খলার সঙ্গে গ্রন্থ সাজানো, পাঠ-পদ্ধতির ব্যবস্থা—নানাদিক থেকে অসুবিধা অনুভব করা যাচ্ছে। নূতন একটি অট্টালিকার আশু প্রয়োজন। অর্থ জমা রয়েছে; সুবিধাজনক একটি গৃহ নির্মাণের পরিকল্পনা চলছে। কিছুদিন আগেই ভারত-সরকারের শহর নির্মাণ-পরিকল্পক মিঃ প্রসাদ তাঁর দলবলসহ আশ্রম-পরিদর্শনে এসেছিলেন, গ্রন্থাগার-গৃহ সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলাপ-আলোচনা করে গেছেন। তাঁর পরিকল্পনাটি জানা গেলে পরে গ্রন্থাগার-অট্টালিকা-নির্মাণ-পরিকল্পনা স্থির হবে। অনতিবিলম্বে কাজ আরম্ভ হবার কথা আছে।

আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র ও বর্তমান আশ্রমিক সংঘের কর্মসচিব শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায় সম্প্রতি বিশ্বভারতী বিদ্যাভবনের পুস্তক বিভাগে দুখানা পুরানো হাতে-লেখা ওড়িয়া পুঁথি দান করেছেন, তার মধ্যে একখানা হচ্ছে বলরাম দাসের 'দণ্ডী রামায়ণে'র আদ্যকাণ্ড এবং আরেকখানা জগন্নাথ দাসের 'গুপ্ত ভাগবৎ'। দু'বছর আগে শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে বিশ্বভারতী পুঁথি-বিভাগে অনেক পুঁথি পাওয়া গিয়েছিল। বিশ্বভারতীর পুঁথি-সংগ্রহ-বিভাগটি বর্তমানে সংগ্রহের দিক থেকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করেছে। ১১।৯।১৯৫৪

* * *

চীন-সরকার বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয়-গ্রন্থাগার নির্মাণের জন্য ৫,০০,০০০ টাকা দান

করেছিলেন। সে অর্থ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে গচ্ছিত রয়েছে। সম্প্রতি স্থির হয়েছে, সে অর্থে সন্তোষালয়ের (শিশু বিভাগ) কাছে নতুন কেন্দ্রীয়-গ্রন্থাগার নির্মিত হবে।

*　　　　*　　　　*

শান্তিনিকেতন আশ্রমিক-সংঘের সেক্রেটারীর অনুরোধে ব্যবস্থা করা হয়েছে যাঁরা আশ্রমিক-সংঘের সভ্য হবেন তাঁরা পাঁচ টাকা জমা দিয়ে বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয়-গ্রন্থাগারের সভ্য হতে পারবেন।

পশ্চিমবঙ্গের গভর্ণর এবং বিশ্বভারতীর প্রধান ডঃ এইচ সি মুখার্জির অনুরোধে বিশ্বভারতী রবীন্দ্রনাথের ১৫৩ খানা বাংলা, হিন্দী এবং ইংরাজী গ্রন্থ দার্জিলিংয়ের 'Step Aside'-এর দেশবন্ধু স্মৃতি-গ্রন্থাগারে উপহার দিয়েছেন। ১৬.১০।১৯৫৪

শান্তিনিকেতনে পাঠভবনের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে মাঝে মাঝে লাইব্রেরী-ক্লাস হয়ে থাকে। সে ক্লাসে লাইব্রেরীর বই দেওয়া-নেওয়ার সম্বন্ধে সবিশেষ বুঝিয়ে বলা হয়। কী কী বই কোন্ কোন্ বয়সে পড়া উচিত; বই কীভাবে ব্যবহার করতে হয় এসব বিষয়ে যথেষ্ট শিক্ষা দেবার আছে। ছাত্রছাত্রিগণ অনেক সময় বইয়ের মলাটে পাতায় যথেচ্ছভাবে আঁকজোখ কাটে, নানারকম মন্তব্য লিখে রাখে, নতুন বই আসতে না আসতে অযত্নে অবহেলায় বইগুলিকে ছিঁড়ে-খুঁড়ে অপাঠ্য করে ফেলে। এ সব বিষয়ে শৈশব থেকে তাদের শিক্ষা দেওয়া হলে তাদেরও লাভ, লাইব্রেরীরও লাভ। শান্তিনিকেতনের মতো এমন বিরাট লাইব্রেরী নিজেদের মতো করে ব্যবহার করার সুযোগ আমাদের দেশের ছাত্রছাত্রিগণ খুব কমই পেয়ে থাকেন। তবু প্রত্যেক স্কুল-কলেজের সঙ্গেই ছোটখাট একটি লাইব্রেরী যুক্ত থাকে। সেগুলিকেও এমনি ভাবে যত্ন করে ব্যবহার করতে শিক্ষা পাওয়া ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে যে বিশেষ প্রয়োজন এ কথা বলাই বাহুল্য। ৭।১২।১৯৫৪

*　　　　*　　　　*　　　　*

ইতিমধ্যে বর্তমান গ্রন্থাগারেই নানারকম ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য—Reader's Guide Card ব্যবস্থার প্রবর্তন। এখানকার গ্রন্থাগারে open access system বর্তমান; অর্থাৎ পাঠকবর্গ গ্রন্থাগারের ভিতরে ঢুকে তাকের কাছে গিয়ে নিজেরাই বই খুঁজে নিতে পারেন। তাঁদেরই সুবিধার জন্য এই কার্ড প্রথাটি প্রবর্তিত হয়েছে। তাকে-তাকে বিষয়-অনুযায়ী বই সাজানো আছে। প্রত্যেক তাকের গায়ে এবার বড়ো বড়ো কার্ডে টাইপ করে বইয়ের বিষয়সূচী লিখে দেওয়া হল। প্রত্যেকটি বিষয়সূচীকে আবার বিভিন্ন

ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন, সাহিত্যের মধ্যে আছে—প্রবন্ধ, কাব্য, উপন্যাস, ছোট গল্প প্রভৃতি; দর্শনে যেমন আছে—সাইকোলজি, মেটাফিজিক্স প্রভৃতি। প্রত্যেকটি ভাগ ও কোন্ নম্বরে কোন্ ধরনের বই পাওয়া সম্ভব, সে সব লিখে দেওয়া হয়েছে। পাঠকগণ কার্ড দেখেই অনায়াসে অল্প সময়ের মধ্যে আকাঙ্ক্ষিত বইটি খুঁজে পাবেন। এদিক-ওদিক ঘুরতে হবে না বা অন্যের অপেক্ষায় থাকতে হবে না। ৬।৬।১৯৫৬

সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তথাকার ভারতীয় ডেপুটি হাই-কমিশনার শ্রী বি. কে. আচার্য মারফত ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লা লিথুনিয়া ভাষায় অনূদিত এক কপি গীতাঞ্জলি রবীন্দ্র-সদনে দান করেছেন।

ভারতস্থিত মার্কিন শিক্ষা-সংস্থা বিভিন্ন বিষয়ে আটাশখানা গ্রন্থ বিশ্বভারতীতে দিয়েছেন। পাটনাস্থিত বিহার রাষ্ট্রভাষা-পরিষদ হিন্দীভবন-গ্রন্থাগারে তাঁদের প্রকাশিত সমুদয় হিন্দী পুস্তক পাঠিয়েছেন, তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে—ডঃ মোতিচাঁদ কৃত 'সার্থবাহ' (প্রাচীন ভারতের পথঘাট); ডঃ বাসুদেবশরণ আগরওয়ালা কৃত 'হর্ষচরিত' এবং ডঃ হাজারিপ্রসাদ দ্বিবেদী কৃত হিন্দী-সাহিত্যের আদি-ইতিহাস। বিশ্বভারতী থেকে দাতাদের সবাইকেই কৃতজ্ঞতা জানানো হয়েছে। ২০।১২।১৯৫৭

রবীন্দ্র-সদন

বিশ্বভারতীর রবীন্দ্র-সদনের নানাবিধ কাজের মধ্যে সংগ্রহ ও সংরক্ষণের কাজ অন্যতম। রবীন্দ্রনাথের আঁকা চিত্রসমূহ, রচনার পাণ্ডুলিপি, চিঠিপত্র, ভাষণ, কবি-সংশ্লিষ্ট দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থরাজি, কবির বিভিন্ন রকমের ফটোগ্রাফ প্রভৃতি বহু জিনিস সংগৃহীত হচ্ছে এবং সে-সব দীর্ঘকাল স্থায়ী করে রাখার যথাসম্ভব ব্যবস্থা চলছে।

বোম্বেস্থিত ইস্রায়েল-দূত Mr. Gabriel Doron-এর কাছ থেকে সম্প্রতি রবীন্দ্র-সদনে তিনখানা গ্রন্থ পাওয়া গেছে—গ্রন্থগুলি হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের Fireflies, Stray Birds এবং The Gardener-এর হিব্রু অনুবাদ।

'The Taman Siswa Educational Institutions of Indonesia'-র পক্ষ থেকে জাকার্তার মিঃ মহম্মদ বিশ্বভারতীকে গুরুদেবের ফটো (Portrait) উপহার দিয়েছেন। জাকার্তার ভারতীয় রাজদূতকে গত বছর (৭ই আগষ্ট ১৯৫৩)

রবীন্দ্র-স্মরণ তিথির দিনে ফটোটি দেওয়া হয়েছিল এবং সম্প্রতি সেটি বিশ্বভারতীতে এসেছে এবং রবীন্দ্র-সদনে সটি রাখা হয়েছে। ৮।৭।১৯৫৪

* * *

শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর তিনখানা বাংলা গ্রন্থ কেন্দ্রীয়-গ্রন্থাগারে দান করেছিলেন; সে তিনখানিই রবীন্দ্র-সদনে দেওয়া হয়েছে। তাদের মলাটে এবং প্রথম ও শেষের সাদা পাতায় কালি ও কলম দিয়ে রবীন্দ্রনাথের হাতে আঁকা ছবি এবং কিছু কিছু লেখা রয়েছে। ১৬।১০।১৯৫৪

মিসেস এ, রায় সেমুর সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথের লিখিত আটখানি চিঠি রবীন্দ্র-সদনে দিয়েছেন। আর তিনখানার দিয়েছেন ফটোগ্রাফি-কপি। ১৯১৩ এবং ১৯১৬ সালে আমেরিকার উর্বানায় বাসকালে গুরুদেব মিসেস সেমুরের বাড়ি কিছুদিন ছিলেন। এঁদের সঙ্গে গুরুদেবের সারাজীবন আন্তরিক সৌহার্দ্য ছিল। গুরুদেব এঁদের অনেক চিঠিপত্র লিখেছেন। ১৯১৪-১৮ সালে লেখা চিঠিগুলিতে রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মধ্যে সম্পর্ক এবং যুদ্ধের সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। চিঠিগুলি তাই মূল্যবান। এ ছাড়াও মিসেস সেমুর আমেরিকার নানারকম খবরের কাগজ ও মাসিক পত্রিকা থেকে গুরুদেব-সংক্রান্ত বহু রকম খবর দুটি পার্শেল করে পাঠিয়েছেন। গত কুড়ি বছর যাবত তিনি এ সব সংগ্রহ করছিলেন। রবীন্দ্র-সদনের বহু মূল্যবান দ্রব্যের মধ্যে এগুলিও দুষ্প্রাপ্য বলে গৃহীত হয়েছে। ১৪।১২।১৯৫৪

রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' গ্রন্থের দেড়শতাধিক কবিতার পাণ্ডুলিপি এতদিন সংগৃহীত হয় নি। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন এবং অবনীন্দ্রনাথের দৌহিত্র শ্রীযুক্ত মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছ থেকে রবীন্দ্র-সদনে প্রায় সকল কবিতারই মূল পাণ্ডুলিপির ফটোগ্রাফ পাওয়া গেছে। যে-কয়টি কবিতার পাণ্ডুলিপি এখনও বাকি রইল তার সংখ্যা হবে কম বেশী সতেরোটি। এই সতেরোটি কবিতার মধ্যে বিখ্যাত কয়েকটি গানও রয়েছে—(১) অন্তর মম বিকশিত করো, (২) আজি শ্রাবণ ঘন গহন মোহে, (৩) আনন্দেরি সাগর হতে এসেছে আজ বান, (৪) কত অজানারে জানাইলে তুমি, (৫) কোথায় আলো কোথায় ওরে আলো, (৬) জগৎ জুড়ে উদার সুরে, (৭) বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা, (৮) মেঘের পরে মেঘ জমেছে, (৯) জননী, তোমার করুণ চরণখানি ও (১০) তোমার সোনার থালায় সাজাব আজ··।

* * *

গীতাঞ্জলি গ্রন্থ দিয়েই দেশ-বিদেশে রবীন্দ্রনাথের প্রসিদ্ধি। উনিশ শ তেরো সনে রবীন্দ্রনাথের নোবেল-পুরস্কার প্রাপ্তির পরেই রুশীয় মাসিক পত্রিকা Slovo-1913 'গীতাঞ্জলি' থেকে কিছু কবিতা অনুবাদ করে প্রকাশ করে। হয়তো ঐ সনের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত ভারতীয় কবিকে দেশবাসীর কাছে পরিচয় করিয়ে দেওয়াই ছিল এর মূল উদ্দেশ্য। এই পুরোনো পত্রিকাটির খবর এতদিন জানা যায় নি। কয়েক মাস পূর্বে রুশ-অধ্যাপিকা শ্রীযুক্তা ভেরানভিকোভা (Vera Novikova) শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। তিনি রুশীয় ভাষায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ-সংক্রান্ত অনেক-কিছু লেখার সন্ধান দিয়ে যান; সেই সঙ্গেই এ তথ্যও তখন প্রকাশ পেয়েছিল। সম্প্রতি সেই পত্রিকাখানি রুশ-সরকারের সাংস্কৃতিক বিভাগ থেকে রবীন্দ্র-সদনে উপহার পাওয়া গিয়েছে। ভারতবর্ষ তথা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে রাশিয়ার অনুসন্ধিৎসা যে কতখানি জাগরূক এটি তার একটি দৃষ্টান্ত। সম্প্রতি সে দেশে রবীন্দ্র-রচনার ব্যাপক অনুবাদ শুরু হয়েছে। রবীন্দ্র-সদনে কয়েকটি গ্রন্থ এসেছে—রাশিয়ার চিঠি, চিত্রা, ঘরে-বাইরে, বউ ঠাকুরাণীর হাট, গোরা, এবং ৮ খণ্ডে রুশ ভাষায় রবীন্দ্র-রচনা-সংগ্রহ প্রকাশে যে আয়োজন করা হয়েছে, তার (Tagore's Series of Works) পঞ্চম খণ্ড—(গল্প) এবং ষষ্ঠ খণ্ড—(নাটক)। ১৫।৬।১৯৫৭

আমেরিকাবাসিনী Mrs. A. R. Seymour রবীন্দ্র-ভক্তবৃন্দের অন্যতম। প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর যোগ স্থাপিত হয়েছিল; এখনও তাঁর বিশ্বভারতীর সঙ্গে সে যোগ ছিন্ন হয় নি। তিনি বিদেশে থেকেও এখনও নানাভাবে তাঁর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছেন। রবীন্দ্রনাথ-সংক্রান্ত চিঠিপত্র, ফটোগ্রাফ, পত্রিকার অংশবিশেষ, রচনার দুর্লভ ইংরেজি অনুবাদ প্রভৃতি বহু মূল্যবান দ্রব্য ও তথ্যসমূহ রবীন্দ্রভবনে পাঠাচ্ছেন।

সম্প্রতি অন্যান্য গ্রন্থের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ভগ্নী এবং বাংলার প্রথম উপন্যাস রচয়িত্রী স্বর্ণকুমারী দেবীর একখানা উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদ এসেছে। গ্রন্থটির নাম—"An Unfinished Song."

*　　　　*

শিল্পাচার্য স্বর্গত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র শ্রীঅলোকেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে রবীন্দ্র-সদনে একগুচ্ছ চিঠিপত্র উপহার পাওয়া গেছে। সেগুলি ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যযুগ থেকে সে শতাব্দীর শেষের দিকে লেখা। লেখকদের মধ্যে নাম পাওয়া যায়—দ্বারকানাথ, দেবেন্দ্রনাথ, গিরীন্দ্রনাথ, নগেন্দ্রনাথ, গুণেন্দ্রনাথ,

গগনেন্দ্রনাথ প্রভৃতির। ঠাকুর-পরিবারের জীবননাট্যের যে অংশ এখনও যবনিকান্তরালে রয়ে গেছে এই সকল চিঠিপত্রের দ্বারা সে অংশ ভবিষ্যতে আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

*　　　*　　　*　　　*

এককালে বিশ্বভারতী-গ্রন্থাগার ও রবীন্দ্রনাথের স্বকীয়-গ্রন্থাগার স্বতন্ত্র ছিল না। রবীন্দ্রনাথকে উপহার দেওয়া এবং রবীন্দ্রনাথের পঠিত ও স্বহস্ত-চিহ্নিত গ্রন্থসকল এখনো বর্তমান বৃহৎ বিশ্বভারতী-গ্রন্থাগারে খুঁজে পাওয়া যায়। সে সকল গ্রন্থও রবীন্দ্র-সদনে প্রেরিত হচ্ছে। একখানা গ্রন্থের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের হাতে-লেখা একাধিক কবিতার অনুবাদ চোখে পড়ে। স্বর্গত দেশবরেণ্যা মহিয়সী নারী সরোজিনী নাইডু এবং বিশ্ববিশ্রুত অন্ধ লেখিকা হেলেন কেলারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গভীর স্নেহের সম্পর্ক ছিল। বিশ্বভারতী-গ্রন্থাগার থেকে দুখানা বই পাওয়া গেছে। তার মধ্যে এই সম্পর্কের নিদর্শন বিশেষ করে মিলে। একখানা সরোজিনী নাইডু কবিকে উপহার দিয়েছেন, গ্রন্থখানির নাম "The Bird of Time, Songs of Life, Death and the Spring."

প্রথম পাতায় তাঁর নিজের হাতে লেখা আছে:—

To Rabindranath Tagore

With the reverent homage of Sorojini Naidu,

Hyderabad, Deccan, 1912.

অন্য যে আরেকখানা গ্রন্থ সেখানি হেলেন কেলার প্রেরিত। গ্রন্থখানি হেলেন কেলারের উদ্দেশ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন কবির শ্রদ্ধাঞ্জলিপূর্ণ কবিতাগুচ্ছের সংকলন। তার নাম "Double Blossoms"। তাতে রবীন্দ্রনাথেরও একটি বাণী আছে। গ্রন্থের উপরে হেলেন কেলার নিজের হাতে লিখে দিয়েছেন—

Please look for me in the nurseries of heaven.

With sincere wishes for the New Year.

Helen Keller, 1932.

*　　　*　　　*　　　*

রবীন্দ্র-সদনে এতদিন বহু ভাষায় রবীন্দ্রনাথের রচনার অনুবাদ এসেছে। এর মধ্যে গ্রীক-অনুবাদ গ্রন্থ একখানাও ছিল না। অল্প কিছুদিন আগে দুখানা গ্রীক অনুবাদ গ্রন্থ পাওয়া গিয়েছে। একখানার নাম অনুমানে উদ্ধার করা হয়েছে—ঘরে বাইরে—

(To Spity Ke O Kosmos) আরেকখানার পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয় নি—

Doron Eraston. ৪।৭।১৯৫৭

* * * *

পঁচিশে বৈশাখ এসে চলে গেল। বাংলাদেশ ভ'রে এবং ভারতেরও বহু জায়গায় রবীন্দ্র-উৎসবের অনুষ্ঠানে বহু আলোচনা ও আনন্দ করা হল। ভারত-রাষ্ট্র ও বিশ্বভারতীর প্রধান পরিচালক নেতা জওহরলাল ও সে সঙ্গে উপাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের প্রচারিত আবেদনপত্রে আগামী রবীন্দ্র-শতবার্ষিকীর পূর্বে শান্তিনিকেতনে 'রবীন্দ্র-সদন' প্রতিষ্ঠার অর্থভাণ্ডারের কথাটাও নিশ্চয়ই অনেকের মনে পড়ে থাকবে। সাড়াও মিলবে। কিন্তু 'সময় চলিয়া যায়' সে-কথাটা সময় থাকতে মনে পড়লে কাজ এগোতে পারত।

এ-প্রসঙ্গে আর-একটি প্রস্তাব বিচার্য। বিশ্বভারতী এখন একটি রীতিমতো আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারী আইনের এলাকাবদ্ধ। কোনোদিনই শাখাকেন্দ্র বিস্তার করে সমগ্র দেশে আত্মপ্রসারের সক্রিয়তা এর তেমন দেখা যায়নি। সুতরাং স্বভাবতই দেশের সাধারণ এর আদর্শ বা বিচিত্র কার্যাবলীর সঙ্গে নিত্যনিয়মিত সচল পরিচয়ে জীবন্ত যোগ রক্ষা করার সুযোগও পায়নি। নিজ নিজ অঞ্চলে থেকে প্রধানত শোনা কথা ও আন্দাজের উপর নির্ভর করেই রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতী সম্বন্ধে তাঁদের অনেকের শ্রদ্ধা-অশ্রদ্ধা নানা সময়ে অনেকটা পাক খেয়েছে। অথচ, জানা কথা, পারিপার্শ্বিকের থেকে নানা ধারায় সঞ্চিত রসসম্ভারের পরিপুষ্টি পেয়েই গাছ বেঁচে থাকে, ফল-ফুল-ছায়া ও আশ্রয় বিস্তারে হয় অকৃপণা ঐশ্বর্যবতী প্রাণ-প্রবাহিনী। এই রসাধান ও প্রাণ-প্রবাহনের জন্যই প্রয়োজন চারিধারে প্রতিষ্ঠানের আদান-প্রদানের যোগাযোগ-ব্যবস্থা। বিশ্ববিদ্যালয় এক জায়গাতেই মহীরুহের মতো দাঁড়িয়ে থাকবে,—এই যদিও তার সরকারী-বিধান, কিন্তু তার ধারা প্রসারণের জন্য আর-একটি বে-সরকারী দিকে কাজ করা চলে। সে-কাজ হচ্ছে—'রবীন্দ্র-সদনের' শাখা-কেন্দ্র গড়ে তোলা সারা দেশে। প্রত্যেক শহরে একটি করে সে-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হবে। তার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতীর আদর্শ, রবীন্দ্র-রচনা ও নানা কর্ম-বিভাগের সমাবেশ হবে, কেন্দ্রীয় মূল প্রতিষ্ঠানরূপে সংযোগ রক্ষা ও যথাসম্ভব পরিচালনায়ও সাহায্য করে চলবেন শান্তিনিকেতনের 'রবীন্দ্র-সদন'। এ-কথা একেবারে অভাবিত নয়। কারণ, গত উৎসবপর্বেই দেখা গেছে, কোনো কোনো উৎসবস্থলে এরূপ স্থানীয় 'রবীন্দ্র-সদন' স্থাপনের আলোচনার উদ্ভব। তাছাড়া পূর্ব থেকে শান্তিনিকেতন আশ্রমিক-সংঘের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত পাটনার

'রবীন্দ্র-ভবন'। অনুরূপ বোম্বেরও শাখা-সংঘ এবং স্বতন্ত্রভাবে স্বাধীন প্রচেষ্টায় উদ্ভূত কলকাতার 'রবীন্দ্রভারতী' এবং প্রেসিডেন্সী কলেজের 'রবীন্দ্র-সংসদ' 'রবীন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার' ইত্যাদি বহু সংস্থা, আর বিশ্বভারতী লোকশিক্ষা সংসদের নানা আঞ্চলিক শাখাকেন্দ্রগুলির কাজ এ-ক্ষেত্রে স্মর্তব্য। ভূমিকা তৈরি,—এখন থেকে একটি সূত্রে গাঁথা মণির মতো এগুলিকে সংবদ্ধ করে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে এগিয়ে চলা চাই। সেই সমগ্র প্রাণের সম্মিলিত সুগ্রথিত সংস্থাটিই হবে আগামী শতবার্ষিকীর দিনে রবীন্দ্র-জন্মতিথি-সংবর্ধনার বেদীতে অর্পণের শতদলমাল্য। মূল এই সংগঠন কাঠামোটির কথা মনে রেখেই যা-কিছু করতে হবে। অর্থভাণ্ডার মুখ্য নয়, মুখ্য হচ্ছে এই দেশ-বিদেশে বিস্তৃত ও জনমনের ভিত্তিতে বিধৃত প্রাণবন্ত প্রতিষ্ঠান। কিন্তু গোড়াঘর শান্তিনিকেতনের সংস্থাটিই যদি নানাদিকে ভাঙাচোরা, এলোমেলো, অপরিপুষ্ট, অগঠিত থাকে, তবে শাখা-প্রশাখা নির্ভর পাবে কোথায়। সুতরাং কাণ্ডটির দৃঢ় প্রতিষ্ঠাই সমূহ কাম্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। আশ্রমেও কর্মীমণ্ডলীতে আচার্যের অর্থ-ভাণ্ডারে সেই উদ্দেশ্যে সাধ্যমতো সকলের সানন্দ দান সংগ্রহের প্রস্তাব গৃহীত হয়ে ঘরোয়া-আবেদন প্রচারিত হয়েছে। এ-সবই ভালো, কেবল এর সঙ্গে আশ্রমবাসীদের মধ্যে কাজের দিকটায়ও কে কিভাবে অর্ঘ্য নিবেদন করতে পারেন, রবীন্দ্রানুশীলনের সেই প্রচেষ্টাও সুবিহিতভাবে হওয়া দরকার; এই উপলক্ষে কবির সত্তর-বার্ষিক জয়ন্তী-উৎসবের বিরাট অনুষ্ঠানের সূচনাটি উল্লেখ করা যেতে পারে। শান্তি-নিকেতনে তৎকালীন নব-সংগঠিত 'রবীন্দ্র-পরিচয়সভার' উদ্যোগেই প্রথম আশ্রমে সে উৎসব-আয়োজনের সূত্রপাত হয়। ক্রমে তার উদ্‌যাপন সম্বন্ধে দেশের জনসংঘ অগ্রবর্তী হয়ে কলকাতার কেন্দ্রীয় বড় উৎসবসমারোহে সম্মিলিত হন। অল্প কিছুদিন আগে 'পরিচয়সভার' প্রতিষ্ঠার পর্বে শান্তিনিকেতন-অধিবাসীদের নিকট অর্থের পরিবর্তে প্রস্তাব করা হয় 'সভা'র কাজে কে কোন্ রকমে নিজের রচনার দ্বারা অনুরাগের সম্ভার যোগাতে পারেন। বহু রকমের সাড়ার মধ্যে আজ দেখা যায়, স্থায়ী একটি অমূল্য সম্পদ মিলেছে—চারখণ্ডের সুবৃহৎ 'রবীন্দ্রজীবনী' নামক আকর গ্রন্থখানি। আসন্ন শতবার্ষিকীতেও এ-পর্যায়ের কোনো মহারচনার আহ্বান থাকলে তাও নিশ্চয়ই কালের দরবারে আদৃত হবার উপযোগী অক্ষয়কীর্তির উপহার সম্ভব করে তুলবে। অর্থ খুবই দরকার, কিন্তু তার চেয়েও বেশি দরকার সেই অনুরাগের বিকাশসমৃদ্ধ রচনা-কাজের। ২৭।৫।১৯৫৮

*　　*　　*　　*

বিনোদন

শান্তিনিকেতনের দিনরাতকে সরস ও প্রাণবন্ত করে রেখেছে এখানকার বিচিত্র বিনোদন-ব্যবস্থা। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং কিভাবে ছাত্রদের চিত্তবিনোদনের কাজ করেছেন,—তাঁর কথা থেকেই সেকালের একটি চিত্র এখানে তুলে দেওয়া যাচ্ছে : "প্রকৃতির অবাধ সঙ্গ লাভ করবার উপযুক্ত ক্ষেত্র এখানেই ছিল ; শিক্ষায় যাতে তারা আনন্দ পায়, উৎসাহ বোধ করে, সেজন্য সর্বদা চেষ্টা করেছি, ছেলেদের রামায়ণ মহাভারত পড়ে শুনিয়েছি ; অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় তখন এখানে আসতেন, তিনি তা শুনতে ছাত্র হয়ে আসতে পারবেন না ব'লে আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন। ছেলেদের জন্য নানারকম খেলা মনে মনে আবিষ্কার করেছি, একত্র হয়ে তাদের সঙ্গে অভিনয় করেছি, তাদের জন্য নাটক রচনা করেছি। সন্ধ্যার অন্ধকারে যাতে তারা দুঃখ না পায় এজন্য তাদের চিত্তবিনোদনের নূতন নূতন উপায় সৃষ্টি করেছি—তাদের সমস্ত সময়ই পূর্ণ করে রাখবার চেষ্টা করেছি। আমার নাটক গান তাদের জন্যই আমার রচনা। তাদের খেলাধুলোয়ও তখন আমি যোগ দিয়েছি।·· তার পরে ক্রমশ নানা ঋতু-উৎসবের প্রচলন হয়েছে। আপনার অজ্ঞাতসারে প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের আনন্দের যোগ এই উৎসবের সহযোগে গড়ে উঠবে এই আমার লক্ষ্য ছিল।"

গত ২৭শে জানুয়ারী সন্ধ্যার বিনোদন-পর্বে শান্তিনিকেতন হিন্দিভবনের উদ্যোগে চীনাভবনে একটি লোক-সংগীতের অনুষ্ঠান হয়ে গেল। বাঙলা, আসাম, উড়িষ্যা, বিহার, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, সিংহল প্রভৃতি ভারতের নানা প্রদেশের এবং ভারতের আশেপাশের দেশসমূহের ছাত্রছাত্রী ও কর্মিবৃন্দ মিলে গান শুনিয়েছেন। ঘুম-পাড়ানী গান, বিয়ের গান, রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক প্রেমের গান, গ্রাম্য-উৎসবের গান, কাজ করতে করতে সাধারণ লোকের গাওয়া সুখদুঃখের গান,—কত রকমের লোকসংগীত শোনা গেল। ছোট ছোট গানগুলি, নতুন নতুন সুর ; ভারী উপাদেয় লাগছিল। প্রত্যেক গানের আগে নাচটির অর্থ, ভাব এবং পরিচয় ব'লে দেওয়া হচ্ছিল ; তাই গানের ভাষা না বোঝা গেলেও গানগুলি উপভোগে বাধা ঠেকে নি। তারপরে গানের মধ্যে গায়কগণ তার হাবভাব তার আনুষঙ্গিক উপকরণ বজায় রাখতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। আসামের বিহু-উৎসবে

যাবার আগে একটি গানে প্রেমিক প্রেমিকাকে বলছে—তুমি আমাকে সুন্দর ক'রে সাজিয়ে দাও, ফুল দিয়ে, পাতা দিয়ে, যেমনভাবে আজ সেজেছে বসন্তের গাছপালা, রঙীন কাপড়ে সাজিয়ে দাও, আমি বিহু-উৎসবে বসন্তকে বরণ করতে যাব।

পাঞ্জাবী এবং হিন্দুস্থানী মেয়েরা তাঁদের দেশের 'মেয়েলি গান' গেয়ে শোনালেন। তিনচারজনে মিলে বসে ঘোমটা দিয়ে ঢোল বাজিয়ে হুবহু বিয়ের গান জমিয়ে তুলেছিলেন, সঙ্গে ছিল ঠক্‌ঠক্ ক'রে একটা অদ্ভুত বাজনার শব্দ। সংগীতভবনের শিক্ষক চিনচুরাজি হিন্দুস্থানী জনসাধারণের অতি-পরিচিত গান "রামা হৈ" গানটির সুরে "পরদেশী ভাইয়া" গান গেয়ে শোনান, সঙ্গে করতালের খচ্‌খচ্ শব্দ থাকলেই একেবারে নিখুঁত হত। গানের আগে তিনি বলে নিলেন যে, এ-গানের তাল আশা করা বৃথা; সুরও কখন কোথায় হঠাৎ কতটা চড়ে যাবে, আর কোথায়ই বা হঠাৎ নেবে যাবে; কখন যে লয় দ্রুত হবে, আর কখন যে হবে ঢিলে, এ-সব অতি ওস্তাদের পক্ষেও বোঝা কঠিন; জনসাধারণ নিজেদের খেয়ালমতো এ গান গেয়ে থাকে।

* * *

সভাপতিরূপে সংগীতভবনের মার্গ-সংগীতের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ওয়াজেলওয়ার বলেন যে, এ সব গানকে গ্রাম্য-সংগীত বলা হয় কিন্তু লোক-সংগীত নামটিই উপযুক্ত। কারণ শুধু গ্রামের লোকেরাই তো এ-গান গায় না, ঘুরে ঘুরে বেড়ায় যে জনসাধারণ, শহরে এবং শহরের আশেপাশেও যাদের বাস, তারাও সবাই এ-সব গান করে থাকে। তাদের নিজস্ব সুরে নিজস্ব সংগীতধারা বয়ে চলেছে। নাচগান আমাদের জীবনে ততটা প্রয়োজনীয় নয়, যতটা গ্রামের এবং জনসাধারণের জীবনে তা প্রয়োজনীয়। আমাদের জীবনে আরো-দশটা আনন্দের জিনিস আছে, কিন্তু দিনের শেষে বা— দু-এক-মাস পরেই নাচগান-উৎসব-আনন্দ করতে না পারলে জনসাধারণের জীবন একেবারেই পঙ্গু হয়ে যাবে। জীবনধারণের জন্য আনন্দের উপকরণ বিশেষ-কিছু নেই। এইসব লোক-সংগীত তাদের একমাত্র অবলম্বন। শিক্ষিতগণ এসব গান ও ছড়া কিছু পরিমাণে সংগ্রহ করেছেন, সাহিত্যের দিক থেকে এর আলোচনাও হয়েছে—কিন্তু প্রকৃত সুর ছন্দ বজায় রেখে এসব জিনিস এখনো রক্ষিত হয় নি। সেদিকে যত্নবান হওয়া দরকার। এরপরে তিনি গুরুদেবের লোক-সংগীত প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃতি-সহ লোক-সংগীতের সৌন্দর্য ও মূল্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং নিজে তিন-চারটে ছোট ছোট মারাঠী ও সিংহলী গান গেয়ে শোনালেন। ৮।২।১৯৩৩

* * *

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকজন সিংহলী ছাত্র আছেন। গত ১১ই সেপ্টেম্বর তাঁরা বিশ্বভারতীর 'সাহিত্যিকা'-র (সাহিত্য-সভার) তরফ থেকে একটি নৃত্যগীতসভার ব্যবস্থা করেন। মাত্র আট-দশটি ছাত্র, কিন্তু—দেড় ঘণ্টাকাল মণিপুরী নৃত্য, ক্যাণ্ডি নৃত্য, সিংহলী লোকনৃত্য, সিংহলী লোক-সংগীত ও আধুনিক সংগীত এবং যন্ত্র-বাদনের দ্বারা ঐ ক'জনেই দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দান করেন। জলসা শেষে তাঁরা সিংহলী জাতীয়-সংগীত শোনান এবং 'আমাদের শান্তিনিকেতন' গান শুরু করেন। তাঁদের সঙ্গে অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রিগণ যোগ দেন। ১৮ই সেপ্টেম্বর সংগীতভবনের ছাত্র-ছাত্রিগণ অভিনয় করেন রবীন্দ্রনাথের 'স্বর্গের প্রহসন' নাটিকাটি। ছোটখাটোর মধ্যে নাটিকাটি বেশ উপভোগ্য হয়েছিল। পূজার ছুটির আগে 'শারদোৎসব' নাটক, ফ্যান্সি-ড্রেস, আনন্দ-মেলা প্রভৃতির অনুষ্ঠান হবেই। ১১ই অক্টোবর বিশ্বভারতীর সমস্ত বিভাগ বন্ধ হবে এবং ১২ই নভেম্বর শিক্ষা-বিভাগগুলি খুলবে। অফিস লাইব্রেরী প্রভৃতিতে ছুটি মাত্র দিন পনেরো। ২৯।৯।১৯৫৩

* * *

৯ই জানুয়ারী—সেকস্‌পীয়র-নাটক-অভিনয়কারী আন্তর্জাতিক ভ্রাম্যমাণ বিদেশী-দল পরিচালক Geoffrey Kendell-এর নেতৃত্বে শান্তিনিকেতনে ৯ ও ১০ জানুয়ারী ম্যাকবেথ ও মার্চেণ্ট অব্‌ ভেনিস্‌ নাটক অভিনয় করেন। স্থান ছিল সংগীতভবনের নূতন স্টেজ। দুদিনই অগণিত দর্শক অতীব আনন্দে মনোরম অভিনয়-দুটি উপভোগ করেছেন। প্রথম দিন অভিনয় আরম্ভের পূর্বে বিলাতে আগেরকালে সেকস্‌পীয়রের নাটক অভিনয় কীভাবে হত, সে অভিনয়ের উদ্দেশ্য কী ছিল এবং এঁরা যে যথাযথভাবে সে ধারাই অনুসরণ করবার চেষ্টা করছেন, ভূমিকাতে দলের নেতা সে কথা বলে নেন। সেকস্‌পীয়র কোনো তত্ত্বকথা বোঝাতে নাটক লেখেননি। তিনি নিজে অভিনেতা ছিলেন, দর্শকদের আনন্দ দানের জন্যই তিনি নাটক লিখতেন। তখন নাটকের জন্য স্টেজ ছিল না, আলো ছিল না, এত সব সাজ-সজ্জাও ছিল না। অভিনয় হত দিনের আলোতে—বিকেলের পড়ন্ত বেলায়। সেই আলোতেই সকলে অভিনয় দেখত। দর্শকগণের মাঝখানে থাকত মঞ্চ, অভিনয়কারিগণ সেজে এসে সেখানে দাঁড়াতেন; তাদের সকলকে ও মঞ্চকে ঘিরে চারদিকে বসত দর্শকবৃন্দ। তারা দিনরাত্রি ঝড়বৃষ্টি প্রভৃতি সব কল্পনা করে নিত। দুজন সৈন্যই হত সৈন্যদল, একটা কাঠের আসনই হত রাজপ্রাসাদের বা দুর্গের রাজসিংহাসন। অভিনয়কারী দলে এবং দর্শকবৃন্দে বিশেষ তফাৎ থাকত না। দর্শকদল সোৎসাহে চিৎকার করে অভিনয়ের

সোরগোল জমিয়ে তুলত। অভিনয়কারীর দুঃখ দেখে কাঁদত, হাসি দেখে হাসত। আমরাও তেমনি সামান্য জিনিসপত্রে সেদিনের মতো অভিনয় করতে চাইছি, দর্শকগণ তাদের কল্পনা দিয়ে অভিনয় পূরণ করে নেবেন এবং আনন্দে চিৎকারও করতে পারেন, হাসতে পারেন, কাঁদতে পাবেন, তাতে অভিনয়ের সাফল্যই সূচিত হবে।

কিন্তু প্রথম দিন ম্যাকবেথ দেখে শান্তিনিকেতনের দর্শকগণ এত অভিভূত হয়েছিলেন যে, তিন ঘণ্টার অভিনয়ে একটি শব্দও উত্থিত হয়নি। ম্যাকবেথের অপূর্ব অভিনয়, ডাইনীদের দৃশ্য, ম্যাকডাফ প্রভৃতির সু-অভিনয় দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করেছে। দ্বিতীয় দিন মার্চেন্ট অব ভেনিস-এ সাইলকের অভিনয় অতি নিখুঁত ও জীবন্ত হয়েছিল। ড্রপসিন না ফেলে কয়েকটি কাটা সিন দিয়ে এমন উচ্চাঙ্গের অভিনয় খুবই অভিনব লাগছিল। দ্বিতীয় নাটকের শেষে শান্তিনিকেতন থেকে অভিনয়কারী দলকে ফুলের তোড়া উপহার দিয়ে ও 'শান্তিনিকেতন' গানটি সমবেত কণ্ঠে গেয়ে অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়। ১৬।১।১৯৫৪

* * *

এই দিনই বেলা ন'টার সময় সংগীতভবনের স্টেজে একটি আবৃত্তি-সভার আয়োজন হয়েছিল 'সাহিত্যিকা'র উদ্যোগে। সভার আরম্ভে শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ গুপ্ত (আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র এবং বর্তমানে অধ্যাপক) বলেন,—এটি আবৃত্তি-প্রতিযোগিতার সভা নয়, এটি হচ্ছে সবাই মিলে কবিতা পাঠ ও আবৃত্তি করে কাব্য উপভোগ করার সভা। আমরা ছাত্রাবস্থায় হরদম এ-রকম সভা করতাম। হঠাৎ এক-একদিন মুখে মুখে রটে যেত—আজ সন্ধ্যায় গানের আসর বসবে কিম্বা আবৃত্তি ও কবিতা পাঠ হবে। বৃষ্টির দিনে তো কথাই নেই, ছুটি হলেই সভা জমত। দোলের দিনে আম্রকুঞ্জের উৎসব-শেষে ক'জনে মিলে কতবার এমনি আবৃত্তি-সভা করেছি। আমি আর প্রমথ বিশীই ছিলাম এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী। আশ্রম ছিল ছোট, দেখতে-দেখতে সবাই এসে জমে যেতেন, কবিতার পর কবিতা পাঠ ও আবৃত্তি চলত, গানের সভা জমলে গানের পর গান হত। সবাই যে ভাল পাঠ বা আবৃত্তি করতে পারতেন তা নয়, গানের গলাও সবার ছিল না; কিন্তু তাতে ব্যাঘাত হত না এবং তার জন্য আগের থেকে প্রস্তুতিরও কিছু দরকার ছিল না। গান ও কাব্যপাঠের একটা সহজ রুচি জন্মানোই ছিল সভার প্রধান উদ্দেশ্য। আজকার গানের রুচিটি আশ্রমে স্বাভাবিকভাবেই হয়, কিন্তু পাঠ বা আবৃত্তির রুচিবোধ জন্মাবার সেরকম সভা আর হয় না। তাই আমরা এই আবৃত্তি-সভার

আয়োজন করেছি যেখানে সবাই এসে জমায়েত হবেন এবং কাব্যের স্বাদ উপভোগ করবেন ;

এর পরে দশ-বারোটি ছাত্রছাত্রী পাঠ ও আবৃত্তি করেন—রবীন্দ্রনাথ, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও ডনের কবিতা এবং সেক্সপীয়রের হ্যামলেট নাটকের অংশবিশেষ। পাঠ ও আবৃত্তি-শেষে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীলচন্দ্র সরকার বলেন—গান সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে সাধারণভাবে একটা রুচিবোধ জন্মেছে এ কথা আজ জোর করেই আমরা বলতে পারি। একজন ভাল গলায় গান গেয়ে গেলেই সেটা সব সময় আমরা ভাল বলে গ্রহণ করতে পারিনে। কোথায় যে ক্রুটি তা হয়তো সবাই ধরতে পারিনে, কিন্তু কানে খট করে বাজে। আবৃত্তি সম্বন্ধে আমাদের কান তেমন trained হয়নি। কবিতা পাঠ বা আবৃত্তি সম্বন্ধে কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম বেঁধেও দেওয়া যায় না, তাই কার আবৃত্তি ভাল এবং কারটা ভাল নয় বলা শক্ত। একই কবিতা আবার সময়-বিশেষে বিভিন্ন ভঙ্গিতে ও বিভিন্ন ভাবে পড়া যায়। রবীন্দ্রনাথের পাঠ শুনবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। দু জায়গায় তিনি একই কবিতা পাঠ করলেন, একেবারে আলাদা রকমে। তাই কাউকে জোর করে শেখানো উচিত নয় বা বলা উচিত নয়—এ কবিতা ঠিক এই সুরে ও ভঙ্গিতেই পাঠ করতে হবে। রবীন্দ্রনাথ বারবার আবৃত্তি ও পাঠ সম্বন্ধে একটা কথা বলতেন এবং এ বিষয়ে সেটিকে একটি মূল সূত্র হিসাবে ধরে নেওয়া যেতে পারে। তিনি বলতেন যে, আবৃত্তি বা পাঠের সময় ব্যক্তিকে প্রাধান্য না দিয়ে কাব্যকে অর্থাৎ কবিতার ভাব ভঙ্গি, সুর ও শব্দের উচ্চারণ প্রভৃতিকে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করলেই কাব্যের রসটি যথার্থভাবে ফুটে ওঠে। যিনি কবিতা বলছেন তাঁর হাত, পা, মুখের ভঙ্গিমা এবং সুর-খেলানোর কলাকৌশলই যদি লোকের মনকে দখল করে থাকে, তবে কবিতার রস সে পাবে কী করে? ব্যক্তিকে ভুলতে পারলেই বক্তা বা অভিনেতা বা আবৃত্তিকারের আপন বৈশিষ্ট্যটি কবিতার রসমাধুর্যে শ্রোতার মনে নিগূঢ়ভাবে ধরা পড়ে। কবিতা দশজনে মিলে লেখা যায় না, কিন্তু কাব্যপাঠের আনন্দ দশজনে মিলে অনায়াসেই উপভোগ করা যায়। এরকম আসর তৈরি করে সে জিনিস আমরা আস্বাদন করব এবং এমনি করে আবৃত্তি ও পাঠের রুচিটিও সবার মনে জেগে উঠবে। তারপরে যার মধ্যে স্বাভাবিক শক্তি আছে তার পাঠ ও আবৃত্তি দশজনকে আনন্দ দেবে। ৬।৮।১৯৫৪

*　　　*　　　*

১৬ই আগষ্ট—বিশ্বভারতীর সংগীতভবনে শ্রীবুদ্ধ বসু কর্তৃক 'শ্রীকৈলাস ও মানস-

সরোবর' নামক নির্বাক ছবিটি প্রদর্শিত হয়। ১৩ তারিখ থেকে তিনদিন ছবিটি বোলপুরে 'বিচিত্রা' সিনেমা-গৃহে চলেছিল। ব্যবস্থা খুব ভাল ছিল বলে দর্শকগণ শৃঙ্খলার সঙ্গে ছবিটি দেখতে পান; আমাদের দেশে সিনেমার জন্য প্রচুর অর্থ যে ব্যয় না হচ্ছে তা নয়। কিন্তু খুব কম সিনেমা'ই জাতিকে শিক্ষায় ও রুচিতে উন্নত করে তুলেছে! নির্বাক ছবিটি মফঃস্বলেই শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে যে রকম দর্শকের ভিড় জমিয়েছিল তাতে দেশের লোকের সৌন্দর্যপ্রিয়তা ও উচ্চ-রুচির প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে।

২০শে আগষ্ট—শিক্ষাভবনের তরফ থেকে শিক্ষাভবন ও বিদ্যাভবনে নতুন আগত ছাত্রছাত্রিগণকে সম্বর্ধনার জন্য একটি প্রীতি-সম্মিলনীর আয়োজন করা হয়। বাঙালী অবাঙালী, নতুন পুরোনো ও অধ্যাপকগণ এখানে সবাই ঘরোয়াভাবে মিলে সবার সঙ্গে সবাই পরিচিত হলেন। কিছুদিন আগে সংগীতভবনের নবাগত ছাত্রছাত্রিগণও একটি জলসার আয়োজন করে সবাইকে আনন্দ দান করেন। ২।৯।১৯৫৪

বিগত ১৩ই সেপ্টেম্বর বিখ্যাত খেয়াল-গায়ক শ্রীযুক্ত শচীনদাস (মতিলাল) শান্তিনিকেতনে বেড়াতে আসেন। সন্ধ্যায় সিংহসদনে তাঁর গান হয়। নির্দিষ্ট সময়ের পরেও সকলের অনুরোধে তিনি আরো দুটি গান শোনান। মাঝে মাঝে গান থামিয়ে তিনি গাইয়ের কৃতিত্ব কোথায় এবং কীভাবে তা প্রকাশ পায়, সে-সব বিশ্লেষণ করছিলেন। পরদিন সকালে সংগীতভবনের ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্যোগে সংগীতভবনে একটি ঘরোয়া বৈঠকে শ্রীযুক্ত দাস গান করেন। গান গাইবার আগে তিনি বলেন,—সমস্ত বিশ্ব জুড়ে যে ওঙ্কার ধ্বনিত হচ্ছে, তারই থেকে সংগীতের উৎপত্তি। আমাদের পূর্বপুরুষ আর্যগণ তারই থেকে সংগীত সৃষ্টি করেছিলেন এবং সমস্ত রাগ-রাগিণীর উৎস সেই সংগীত। এরই রূপান্তরে পাই ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরী ও আধুনিক যত গান। সাধারণের ধারণা, মার্গসংগীত (Classical Music) বিরক্তিজনক। আধুনিকগণ তাই সে গানের থেকে আধুনিক গান বেশী পছন্দ করেন। প্রকৃতপক্ষে মার্গসংগীত অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। এক রকমের গান আছে যা সুমিষ্ট, মাধুর্যে আবিষ্ট করে। সে গান ভাল, কিন্তু আরেক রকম গান আছে যা সহজ মাধুর্যে মন-প্রাণ অভিভূত করে না; কঠিনে কোমলে, সূক্ষ্মে, গম্ভীরে আমাদের সমস্ত সত্তাকে জাগিয়ে তোলে। মার্গসংগীত সেই গান। এর পরে শ্রীযুক্ত দাস দু' ঘণ্টা গান শোনালেন, একটি বিখ্যাত ঠুংরী গেয়ে সবাইকে আনন্দ দেন। ৪।১০।১৯৫৪

*　　*　　*

প্রত্যেকবার পূজার ছুটির আগে শান্তিনিকেতনে গুজরাটি নৃত্য ও ফ্যান্সি ড্রেস হয়ে থাকে। এবার নানা কারণে এ দুটির অনুষ্ঠান তখন বাদ পড়ে গিয়েছিল। বিগত ২রা ডিসেম্বর ফ্যান্সি-ড্রেসটি অনুষ্ঠিত হল 'সাহিত্যিকা'-র (সাহিত্য সম্মিলনীর) তরফ থেকে। বিভিন্ন বিভাগের ছাত্রছাত্রিগণ এতে যোগ দিয়েছিলেন। প্রত্যেকটি ড্রেসই বেশ উপভোগ্য হয়েছিল—পাহাড়ী মেয়ে, রিক্সওয়ালা, পাগল, পঙ্গু, ফেরিওয়ালা, রাজা, জাপানী, ইরাণী, বর্মী—নানা দেশের মেয়ে এবং আরো কত কী এল গেল; প্রশংসা ও হাসির ঢেউ উঠল দর্শকদের মধ্যে। প্রতিযোগীদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকারী হিসাবে ঘোষণা করা হয় 'পাহাড়ী মেয়ে'র ভূমিকাটিকে। দ্বিতীয় হন 'রিক্সওয়ালা'—কলেজের একটি ছেলে। বোলপুর-শান্তিনিকেতনের পথে তাঁকে যে-কোনো একজন রিক্সওয়ালা বলে চালিয়ে দেওয়া যেত অনায়াসে। আর ডাকাত দেখবার জন্য বাচ্চার দল মহাউৎসুক হয়েই রইল—এই বুঝি লাফিয়ে পড়ল এসে ঘাড়ে; চমকে উঠবে সবাই, তা ডাকাত আর এলই না। তবু যা যা দেখা গেল তাই নিয়ে সব কলরব করতে করতে বাড়ী ফিরল খুসী মনে।

গুজরাটি নৃত্যানুষ্ঠানটি ১০ই ডিসেম্বর হবার কথা।

৭ই নভেম্বর আশ্রমে 'ডাকঘর' নাটক অভিনীত হয়। দিল্লীতে শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষের নেতৃত্বে যে দল এ অভিনয়টি করেছেন, এখানেও তাঁরাই অভিনয় করলেন। ১৩১৮ সালে পূজার ছুটির পর কবি শিলাইদহ থেকে শান্তিনিকেতনে ফিরে 'ডাকঘর' লিখেছিলেন। মনের যে ভাব বা মুড্ থেকে এটি রচিত, সে সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্র-জীবনী' ও শ্রীশান্তিদেব ঘোষের 'রবীন্দ্র-সংগীত' প্রভৃতি গ্রন্থে। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ নাটকেই নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাত খুব স্থূল নয়, সেগুলির রস-উপলব্ধি সূক্ষ্ম বুদ্ধি এবং কল্পনার উপর নির্ভর করে। তাই সাধারণের কাছে তাঁর নাটক খুব সমাদৃত নয়। 'ডাকঘর' তো প্রায় সম্পূর্ণতই সে-রকম আড়ম্বরপূর্ণ গল্প ও নাটকীয় ঘটনা বর্জিত। সাধারণের কাছে এটি দুর্বোধ্য। 'রবীন্দ্র-জীবনী'কার লিখেছেন,—"অথচ রসজ্ঞ পাঠক ইহার মধ্যে গভীর অধ্যাত্মরস পাইয়া তৃপ্ত হন। এক সময়ে ইহার অনুবাদ য়ুরোপের নানা দেশে অভিনীত ও সমাদৃত হয়।" এমন একটি নাটককে সার্থক রূপদান করা কঠিন। আশ্রমেও এ নাটক কমই অভিনীত হয়েছে। একেবারে শেষ-বয়সে রবীন্দ্রনাথ এ নাটকটির মহড়া দিয়েছিলেন, খেটেছিলেন খুব, অভিনয় নানা কারণে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এবার অমলের ভূমিকাটি প্রশংসনীয় হয়েছে। বালক বুবু (শ্রীদিলীপ ঘোষ) তাঁর অভিনয় দ্বারা এই নাটকের রস জমিয়ে তুলেছিলেন   ১২।১১।১৯৫৪

দাক্ষিণাত্যের প্রসন্ন রাও বিশ্বভারতী কলাভবনের প্রাক্তন ছাত্র। এখানে ছাত্রাবস্থাতেই তিনি হস্তকৌশল দ্বারা নানারকম ছায়াবাজি (Shadow Show) দেখাতে আরম্ভ করেছিলেন। পরে এ বিষয়টি নিয়ে তিনি বিশেষভাবে চর্চা করতে থাকেন। এ বিষয়ে তাঁর দক্ষতার পরিচয় পেয়ে ভারত-সরকার তাঁকে দু বছরের জন্য একটা বৃত্তি দান করেছেন। প্রসন্ন রাও সম্প্রতি শান্তিনিকেতনে বাস করছেন। ২২শে জানুয়ারী সান্ধ্য উপাসনার পরে বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয়-গ্রন্থাগারের বারান্দায় তিনি ছায়াবাজি দেখালেন। ডঃ হিজিবিজবিজের ছোট কাহিনী নিয়ে ছায়ালোকের ছায়াবাজির খেলা জমে উঠল। কাহিনীর মধ্যে বাঁধুনি খুব নেই, কিন্তু ছায়ালোকে ভেসে ভেসে উঠতে লাগল—পাহাড় মেঘ সমুদ্র, খরগোস কুকুর শেয়াল কচ্ছপ কুমীর; ফুটে উঠল বাড়িঘর গাছপালা; চার্চিল, জওহরলাল, স্ট্যালিন, গান্ধীজী, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, মোটর গাড়ি ছুটল, কুকুরের ঝগড়া হল, টিয়াপাখি টুপি আর চশমা নিয়ে কাড়াকাড়ি করলে—এমনি কত কী। তারপরে যেমন গাধা আর মুরগীর ডাকে ডঃ হিজিবিজবিজের ঘুম ভেঙে গেল অমনি ছায়ালোক গেল মিলিয়ে। কেবলমাত্র দুটো হাত, হাতের আঙুল আর সার্টের হাতা দুটি ও নিজের চুলগুলি নিয়ে প্রসন্ন রাও এত সব ছায়ালোক রচনা করেছিলেন। হরবোলা ডাকেও তিনি পারদর্শী; তাতে খেলাটা আরো জমে উঠেছিল। ডঃ হিজিবিজবিজের কাহিনী আরম্ভের আগে প্রসন্ন রাও ছায়াতে গণেশ মূর্তি ও তার কাছে কথক নৃত্য দেখিয়ে নিয়েছিলেন। জানা গেল এ রকম ছায়াবাজির খেলা প্রদর্শনের নিয়ম নাকি এককালে দক্ষিণ-ভারতে প্রচলিত ছিল। দাক্ষিণাত্যের নম্বুদ্রি ব্রাহ্মণগণ তাঁদের বিভিন্ন পূজার সময় এ রকম ছায়াবাজির নৃত্যগীত দেখাতেন। এখন সে ধারা বিলুপ্তপ্রায়। প্রসন্ন রাও সে ধারার ইতিহাস সংগ্রহে ও ছায়াবাজি বিষয়ে গবেষণায় নিযুক্ত আছেন। ৬।২।১৯৫৫

"অভিজ্ঞান শকুন্তলম্" নাটকে তপোবনে বল্কলপরিহিতা শকুন্তলাকে দেখে দুষ্মন্ত বলেছিলেন যে, প্রকৃত যে সুন্দরী তার ভূষণের কোনোই প্রয়োজন হয় না। তার স্বাভাবিক সৌন্দর্যই নয়নাভিরাম। এরই বিপরীত একটি উক্তি সংস্কৃত কাব্যেই পাওয়া যায়, যেখানে কবি বলেছেন যে, ভূষণ অসুন্দর নারীকেও সুষমামণ্ডিত করে তোলে। পথেঘাটে প্রকৃত সুন্দরীর দেখা মেলে কম। সচরাচর নারী কেশ-বেশ-বিন্যাস ও অলংকারভূষিতা হয়েই সৌন্দর্যশোভিতা হন এবং দর্শকদের তৃপ্তিসাধন করে থাকেন। রবীন্দ্রনাথ 'বিনা সাজে সাজি'র গানও গেয়েছেন; আবার 'কুসুমে রতনে কেয়ূরে কঙ্কণে কুঙ্কুমে চন্দনে' সযতন-সজ্জায় সজ্জিত রূপের চিত্রও এঁকেছেন।

মনে আছে একবার গুরুদেব শ্রীভবনের মেয়েদের 'শ্রীভবন' সাজিয়ে-গুজিয়ে-রাখা-প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, নিজেকে যথার্থ সুন্দরভাবে সজ্জিত করে লোকের কাছে ধরার মধ্যে লজ্জার কিছু নেই। কুশ্রীতার দ্বারা লোকের চোখের পীড়া উৎপাদনেই প্রকৃত লজ্জা। শ্রী দ্বারা লোককে তৃপ্তিদান করা হয়, তাতে মানুষ সত্যিকার আনন্দ লাভ করে।

যুগে যুগে নারীর কেশবিন্যাস ও বেশভূষার পরিবর্তন কীভাবে ঘটেছে তার আলোচনা মূল্যবান গবেষণার বিষয়। গত ২০শে মার্চ শান্তিনিকেতন-মহিলা-সমিতি "আলাপিনী" থেকে বিগত আশি বছরের (১৮৭০—১৯৫০) বঙ্গনারীর কেশবিন্যাস বিকাশের ধারাবাহিক একটি রূপসজ্জা (ফ্রেন্সি ড্রেস) অনুষ্ঠিত হয়েছিল। 'আলাপিনী'র সভানেত্রী শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী এ বিষয়ে একটি বিবরণী লিখে দেন এবং দর্শনের অধ্যাপক শ্রীবিনয় রায়ের স্ত্রী অধ্যাপিকা শ্রীমতী মলিনা রায় রূপসজ্জার সময় সেটি পাঠ করেন। তাঁর পাঠের সঙ্গে সঙ্গে এক-এক ক'রে মহিলাগণ বিভিন্ন সজ্জায় সজ্জিত হয়ে স্টেজে আসেন। একশ বছরেরও উপরে বঙ্গনারীর সাধারণ পোশাক ছিল আটপৌরে ধরনে পরা শাড়ি। পরবর্তীকালে তারই সঙ্গে সেমিজের ব্যবহার হতে থাকে। উচ্চ-নীচ ধনী-নির্ধন শিক্ষিত-অশিক্ষিত নারীর বেশবাসে সমভাবে এ পোশাক আজ অবধি চলে আসছে। পোশাকের প্রথম পরিবর্তন ঘটে জোড়াসাঁকো-ঠাকুরপরিবারে। স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী ও শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণীর মা জ্ঞানদানন্দিনী দেবীই প্রথম বঙ্গমহিলা, যিনি বিদেশে বের হন। তিনি বোম্বেতে গিয়ে সম্ভ্রান্ত পার্শী মহিলাদের শাড়ি-পরার ধরনটি পছন্দ করলেন। নিজের মতো একটু অদলবদল করে ডান কাঁধে আঁচল না দিয়ে বাঙালীদের মতো বাঁ-কাঁধে আঁচল ফেলে শাড়ি পরলেন। জামারও প্রচলন করলেন। ইন্দিরা দেবী লিখেছেন যে, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী কলকাতা এসে এ ধরনের শাড়ি পরা শেখবার জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। সম্ভ্রান্ত কয়েকজন মহিলা এসে তাঁর কাছ থেকে শাড়ি পরা শিখে গিয়েছিলেন। ক্রমে ক্রমে এ নব্যবেশ কলকাতার শিক্ষিত নারী-সমাজে প্রবর্তিত হয়। একে নাকি বলা হত—"বোম্বাই দস্তুর।"

এর পরে বেশবিন্যাসের হেরফের ব্রাহ্ম-সমাজেই ঘটতে থাকে। তৎকালীন প্রগতিশীলা ব্রাহ্ম মহিলারা "বোম্বাই-দস্তুর" শাড়ি পরে মাথায় ঘোমটা দিতেন না,—একটি টুপিজাতীয় জিনিস পরতেন তার সামনেটা মুকুটাকার এবং পিছনে একটু চাদরের মতো ঝুলিয়ে দেওয়া হত।

'বোম্বাই দস্তুর' শাড়ি পরার ধরনের একটা অসুবিধা ছিল—বাঁ-কাঁধে শাড়ির পাড়টি মাত্র রেখে বাকি-অংশটা বাঁ-হাতের উপর ঝুলিয়ে রাখা হত; পরবর্তী পরিবর্তন ঘটল—শাড়ির ঝোলানো-অংশ কুঁচিয়ে বাঁ-কাঁধে তুলে ব্রোচ দিয়ে আটকে দেওয়া হল। এরই সঙ্গে বাইরে বেরুবার সময় স্পেনদেশের লেস্ Mantilla-র নকলে একটি ছোট ত্রিকোণ চাদর মাথায় পরা হত। কুচবিহারের মহারানী স্বর্গীয়া সুনীতি দেবী এটি প্রবর্তন করেন। এটা খুব বেশী প্রচলিত হয়নি।

১৯০০ শতক থেকে দেশে স্বদেশী হাওয়া বইতে থাকে। তখন থেকে সুতী ও রেশমী কাপড়ের চল হল। ইন্দিরা দেবী এর পরে শান্তিপুরী শাড়ি, বাহারে সুতীর জামা পরা এবং মাথায় ঘোমটা দিয়ে বাইরে যাওয়া প্রবর্তন করেন।

১৯১০ সাল থেকে ময়ূরভঞ্জের মহারানী সুচারু দেবী নূতন কায়দায় (অর্থাৎ এখন যেমন সামনে কুঁচি দিয়ে বাঁ-কাঁধে আঁচল ফেলে পরা হয় তেমনিভাবে) শাড়ি পরতে থাকেন। তারই নানা রকম হেরফের হয়ে আজ অবধি বাঙালী মেয়েদের বেশবিন্যাস চলে আসছে। এ সময় মেমদের hobble skirt-এর ধরনে hobble করে শাড়ি পরাও দেখা দেয়; আজও বয়স্কা শিক্ষিকাগণের মধ্যে এ ধরনটি দেখা যায়।

এরই সঙ্গে সঙ্গে ফুলহাতার ব্লাউজ, কনুই অবধি জ্যাকেট, হাতাহীন ব্লাউজ প্রভৃতি জামার প্রচলন হয়ে এখন বড় হাতার জামায় এসে দাঁড়িয়েছে। অতি আধুনিককালে এসেছে পাঞ্জাব ও কাবুলদেশের শালোয়ার ও পাঞ্জাবী।

গয়নার পরিবর্তনও কিছুটা দেখানো হয়েছিল। মোটা মোটা অলংকারের স্থানে সূক্ষ্ম অলংকার এল, আজকাল তো গয়না-পরা এক রকম উঠেই গেছে। কেশ-বিন্যাস ও জুতার প্রচলন ধারাও কিছু কিছু সেদিন দেখানো হয়েছে।

ছাত্র-ছাত্রী মহলে রূপসজ্জা হরদমই হয়ে থাকে, তার মধ্যে কৌতুকের বিষয়ই থাকে বেশী, কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসার বিষয় সে-অনুপাতে কমই থাকে। "আলাপিনী" এমন একটি চমৎকার পরিকল্পনাপ্রসূত জিনিস সেদিন দেখিয়েছেন,—সামাজিক ও ঐতিহাসিক দিক থেকে যা মূল্যবান। সেটি ছোটবড় সকলেরই মনোরঞ্জন করেছে। শোনা যাচ্ছে, রূপসজ্জার ছবিগুলি দিয়ে বঙ্গ-নারীর বেশ-বিকাশের একটি পুস্তক-প্রকাশের ব্যবস্থা হবে।

সেদিন রূপসজ্জার পরে পরশুরামের "বিরিঞ্চি বাবা" নাটকটি অভিনীত হয়। সেটিও খুব জমেছিল। ২।৪।১৯৫৫

১৮ই মার্চ—কিছুদিন আগে শান্তিনিকেতন-কলাভবন-প্রাঙ্গণে এক সন্ধ্যায় রুশদেশের একখানি চলচ্চিত্র দেখানো হয়েছিল,—রুশীয় বৈজ্ঞানিক প্যাভলভের

জীবনচিত্র। কে তিনি, আমাদের অনেকেরই তা ভালো জানা নেই। ফিল্মটি ছিল নূতন। স্নায়ুজালের উপর প্রতিবেশের প্রভাব-রহস্য—প্যাভলভের গবেষণার বিষয় ছিল। কম্যুনিষ্ট রুশিয়ার বাস্তববাদকে এই মত বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সবলতর করেছে। রুশদেশে প্যাভলভের প্রভাব আজ অসাধারণ। বিজ্ঞানাচার্যের বিচিত্র জীবন-ইতিহাস যেমন শিক্ষাপ্রদ হয়ে রূপায়িত হয়েছে, তেমনি হয়েছে তা কৌতূহলোদ্দীপক। এর কিছুদিন পূর্বেই আশ্রমে এসেছিলেন রুশীয় একদল বৈজ্ঞানিক। তাঁরা ছিলেন কলকাতায় অনুষ্ঠিত বিজ্ঞান-কংগ্রেসের প্রতিনিধি। আশ্রমের কাজ দেখে তাঁরা সন্তোষ প্রকাশ করেন।

* * *

তাঁরা চলে যাবার পর আসেন ইংলণ্ডের বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হলডেন। সিংহসদনে তাঁর বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়। তিনি শুনিয়ে গেলেন বিজ্ঞানের আরেক-মহলের আরেক অদ্ভুত তত্ত্ব। কীটপতঙ্গের জীবনযাত্রা অনুশীলন ক'রে তাঁরা পাচ্ছেন প্রাণীসমাজের চলাফেরার নিগূঢ় অর্থ। আদিম জাতির মানুষকে বুঝবার অনেক ইঙ্গিত এর থেকে বৈজ্ঞানিকের কাছে সুলভ হচ্ছে। ব্যক্ত ও অব্যক্তের মধ্যে অপরিচয়ের ব্যবধান দূর হয়ে গিয়ে নূতন প্রতিবেশ একদিন জগতে সৃষ্টি হবে। সমাজের সমস্যাগুলি তখন কী ধরনের হবে, মানুষের মন কোন্‌দিকে মোড় ফেরাবে ঠিক কী।

* * *

আশ্রমগুরু রবীন্দ্রনাথ শেষজীবনে ব্যাকুল হয়েছিলেন পতঙ্গজগতের অনুভূতি পাবার জন্য। প্রাণীদের প্রতিবেশ আর মানুষের প্রতিবেশের দুস্তর বাধা তাঁকে ব্যথিত করেছিল। 'নবজাতক' কাব্যে 'প্রজাপতি' কবিতাটিতে তিনি লিখেছেন :

> বিচিত্র বোধের এ ভুবন,
> লক্ষ কোটি মন,
> একই বিশ্ব লক্ষ কোটি ক'রে জানে
> রূপে রসে নানা অনুমানে।

আজ কবি বেঁচে থাকলে প্যাভলভ ও হলডেনের বাণীগুলি তাঁর বোধকে যে কী গভীরভাবে স্পর্শ করত তাই ভাবি। হয়তো তিনি সমাজের নূতন বাঁকের আভাস এঁকে রেখে যেতেন তাঁর কোনো সমৃদ্ধ রচনায়। এ যুগের আরেক মনীষী হলডেন সম্বন্ধে বলছেন—

"To pass from Lister and Weismann to Scott Haldane and his better known Post-Marxian son J. B. S. Haldane is like passing from the dead and hopeless past to the living and pregnant future." (The medical man: Barnard Shaw).
২০।৩।১৯৫২

*　　*　　*

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের চীনাভবনে তিনজন বিদেশী চীন-তত্ত্ব-বিশারদ পর্যটক-অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করবেন বলে জানা গেছে। ডঃ ওয়াল্টার লিবেনথ্যাল ইতিমধ্যে এসে যোগ দিয়েছেন। বাকি দু'জন পুজোর পরে আসবেন। ডব্লিউ, লিবেনথ্যাল জার্মাণী থেকে দর্শনশাস্ত্রে ডক্টরেট্ পেয়েছেন। তিনি ভারত-চীন মৈত্রী-সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠানের একজন কর্মী। এই প্রতিষ্ঠানটি হার্বার্ড হয়েনচিং প্রতিষ্ঠানের শাখা। পেকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপকরূপেও তিনি যোগ দিয়েছিলেন। চীন-বৌদ্ধধর্ম-বিশেষজ্ঞ ডঃ লিবেনথ্যাল বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে দু'খানা গ্রন্থ এবং অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন। এল ক্যারিংটন গুড্রিচ, পি, এইচ, ডি নিউইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের চৈনিক ইতিহাস এবং সংস্কৃতির অধ্যাপক। তিনি তাংচু প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেছেন, খুব ভাল চীনাভাষা বলতে পারেন, পেকিংয়ের বিদেশী মহলে অত্যন্ত সুপরিচিত। তিনি চীনদেশে প্রতিষ্ঠিত খৃষ্টান কলেজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, চীন ভাষা শিক্ষানিকেতন, রকফেলার প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য নানাপ্রকার চীন-সাংস্কৃতিক সভা-সমিতির সঙ্গেও যুক্ত আছেন। তাঁর রচিত অগণিত গ্রন্থের মধ্যে "চীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাস" এবং "চীনজাতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস" খুব প্রসিদ্ধ। তিনি দেশ-বিদেশে পর্যটন করবার জন্য সরকারী বৃত্তি লাভ করে বিশ্বভারতীতে পর্যটক-অধ্যাপকরূপে যোগ দেবেন। এ রিগাল্ফ সম্প্রতি পেকিংয়ের "ফ্রাঙ্কো-চীন সংস্কৃতি কেন্দ্র" প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হয়েছেন। এই প্রতিষ্ঠানের সাংস্কৃতিক বিভাগটিকে তিনিই গড়ে তুলেছেন এবং সেটিকে প্রসারিত করে সুদূর প্রাচ্যে তিনিই প্রথম পরিদর্শকরূপে আসছেন। চীনভাষার বৈয়াকরণ এবং ধ্বনিতত্ত্ববিদ্ বলে তাঁর আন্তর্জাতিক খ্যাতি আছে। ৭।৫।১৯৫৩

বৈদেশিক

গত এপ্রিল মাসে চেকোশ্লোভাকিয়াতে প্রতিষ্ঠিত প্রাচ্য-সমিতি চেকদেশবাসী বিখ্যাত অধ্যাপক ডঃ ভি লেস্‌নির একসপ্ততিতম জন্মদিনের উৎসব করেন। দুর্ভাগ্যবশত ছয়দিন পরেই ৯ই এপ্রিল ডঃ লেস্‌নি প্রাণত্যাগ করেন। ডঃ ভি লেস্‌নি প্রাগের চার্লস বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় এবং ইরাণীয় ভাষার বিখ্যাত অধ্যাপক ছিলেন। সংস্কৃত আবেস্তীয় এবং ভারতীয় মধ্য আর্যভাষা পালি ও প্রাকৃত প্রভৃতিতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। বাংলা ভাষায়ও, তাঁর দক্ষতা জন্মেছিল। ১৯২৩ সালে ডঃ লেস্‌নি শান্তিনিকেতনে প্রথমবার আসেন। ডঃ উইনটারনিজ এর কিছুদিন আগেই এখানে এসে কাজে যোগ দিয়েছিলেন। ডঃ লেস্‌নি ছিলেন তাঁর জুনিয়র এবং বাংলাদেশে আসবার আগেই তাঁর সাহচর্যে সংস্কৃতে পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন। এজন্য বাংলাদেশে এসে বাংলা শিখতে তাঁর কষ্ট হয়নি এবং সহজেই গুরুদেবের ভাবধারার অধিকারী হতে পেরেছিলেন। গুরুদেবের সঙ্গে বাংলাতেই কথাবার্তা বলতে পারতেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর একত্র ফটোগ্রাফ দেশবিদেশে সুপরিচিত। রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমস্ত কাব্যগ্রন্থই তিনি নিজের ভাষায় অনুবাদ করেছেন। সে অনুবাদ চিত্তাকর্ষক। তাঁরই জন্য চেক-দেশবাসী রবীন্দ্রনাথকে এমন একান্তভাবে জানতে পেরেছিল। রবীন্দ্রনাথ প্রাগ্‌ নগরীতে দু'বার আমন্ত্রিত হয়ে যান। দু'বারই বিপুল সম্বর্ধনা লাভ করেন। একবার সেখানকার সভায় কবি ইংরাজি ও বাংলাতে নিজের কবিতা আবৃত্তি করে শোনান। শ্রোতৃবর্গ মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনেছিল।

শুধু শান্তিনিকেতন এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেই যে তাঁর একমাত্র যোগ ছিল তা নয়। তিনি চিরদিন ভারতবর্ষ এবং চেকদেশের মধ্যে বন্ধুত্বের সূত্রস্বরূপ ছিলেন। রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে দু' দেশের মধ্যে যোগ স্থাপনে ডঃ লেস্‌নির ব্যক্তিত্বের বিশেষ প্রভাব ছিল। চেকভাষায় তিনি 'India and the Indians', 'A Journey through the Centuries'. 'The spirit of India' নামক গ্রন্থাবলীতে বৌদ্ধধর্মের মহৎ তাৎপর্যপূর্ণ উপদেশগুলিকে অনুবাদ করেছেন। এ সব গ্রন্থে ভারতবর্ষের প্রতি তাঁর গভীর ভালবাসা এবং অন্তর্দৃষ্টি প্রকাশ পেয়েছে।

তিনি বলেছেন, কীভাবে ভারতীয় সংস্কৃতিকে জানতে এবং বুঝতে হবে এবং কীভাবে ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন সমস্ত বিশ্বের ধর্ম এবং দার্শনিক চিন্তাকে প্রভাবিত করেছে। এ সব কারণেই যে-দু'বার ডঃ লেস্‌নি ভারতবর্ষে এসেছেন, সেই দু'বারই ভারতীয় রীতিতে ভারতবাসীদের দ্বারা তিনি অভ্যর্থিত হয়েছেন। প্রাগের প্রাচ্য-সমিতি তাঁরই স্থাপনা এবং অনেক বছর পর্যন্ত তিনি এর সভাপতি ছিলেন। নিজের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দ্বারা তিনি কয়েকজন চেকবাসীকে ভারতীয় ভাষা এবং সাহিত্যে সুদক্ষ করেছিলেন। তাঁর তিরোধানে ভারতবাসী একজন বিদেশী হিতৈষী বন্ধুকে হারালো। ভারতবাসী এবং শান্তিনিকেতনবাসী মাত্রেই তাঁর শোকে মর্মাহত হয়েছেন। ৬।৭।১৯৫৩

রবীন্দ্রনাথ বর্তমান না থাকলেও আজ এটুকু লক্ষ্য করবার বিষয় যে তাঁর আশ্রমে বস্তুপ্রধান-বিজ্ঞানের যোগাযোগ ক্রমেই প্রসার পাচ্ছে। সত্যের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ দিনে-দিনে সম্ভব হচ্ছে এখানকার বিচিত্রমুখী সাধনায়।

সেদিন আশ্রমের আচার্য শ্রীজওহরলাল এসেছিলেন। তিনিও বিজ্ঞান এবং ভাববাদের সমন্বয়সাধনের দিকেই সকলকে মনোনিবেশ করতে বললেন। বিজ্ঞানের সাহায্যে উৎপাদিত বস্তুসম্ভারকে আত্মিক শক্তির দ্বারা জনকল্যাণে নিয়ন্ত্রিত করে চলতে হবে,—এই ছিল তাঁর ভাষণের মর্ম।

১লা সেপ্টেম্বর সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক হ্যালডেন সাহেব সস্ত্রীক শান্তিনিকেতন পরিদর্শনে আসেন। সেদিন সান্ধ্য-উপাসনার পরে তাঁদের উত্তরায়ণে অভ্যর্থনা করা হয়। পরদিন তিনি সিংহসদনে আশ্রমের অধ্যাপক, কর্মী ও বয়স্ক ছাত্রছাত্রীদের নিকট একটি বক্তৃতা দেন; বিষয়টি ছিল—'প্রাণিতত্ত্ব ও মানবিকতা'। বক্তৃতার আগে বিশ্বভারতীর উপাচার্য ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী প্রফেসর হ্যালডেনের পরিচয় দান প্রসঙ্গে বলেন, কয়েক বছর হল, প্রফেসর হ্যালডেন আরেকবার আমাদের আশ্রমে এসেছিলেন; তাঁর দ্বিতীয়বার আসাতে আমরা বিশেষ আনন্দিত হয়েছি। প্রফেসর হ্যালডেন কয়েক বছর যাবত কলকাতায় বাস করে প্রাণিতত্ত্ব ও শারীরতত্ত্ব গবেষণায় নিযুক্ত আছেন। তাঁর গবেষণা শুধু প্রাণী ও শারীরবিজ্ঞানেই সীমাবদ্ধ নয়, মানুষের সঙ্গে অন্যান্য জীবজন্তুর শারীরিক যোগ ও মানবিকতার প্রসার প্রভৃতি বিষয় নিয়েও তিনি পরীক্ষা করছেন। এর পরে প্রফেসর হ্যালডেন বলেন যে, শান্তিনিকেতনে যে প্রাণিবিজ্ঞান-বিভাগ রয়েছে তা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও উন্নত করার বিষয়ে আমার পরামর্শ চাওয়া হয়েছে। এখানকার 'পাঠভবনে'র অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তেজেশচন্দ্র সেনের সহায়তায় প্রাকৃতিক-বিজ্ঞান যেভাবে শিশুদের শিক্ষা

দেওয়া হয় তা দেখে আমি আনন্দ পেয়েছি—প্রজাপতি, গুটিপোকা, ফুলফল, গাছপালা প্রভৃতি শিশুরা নিজেরাই পর্যবেক্ষণ ক'রে অনেক বিষয় জানতে পারে। প্রাণিতত্ত্ব ও শারীরবিজ্ঞানে এ ধরনের পর্যবেক্ষণের খুবই প্রয়োজন আছে। মাছ মৌমাছি প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীদের তিনি কীভাবে পরীক্ষা করেছেন তার একটি মনোজ্ঞ বর্ণনা দেন এবং বলেন—ভারতবর্ষে এত সব রকমারী জীবজন্তু আছে যে, এসম্বন্ধে গবেষণার বৃহৎ ক্ষেত্র পড়ে রয়েছে। আশা করি, বিশ্বভারতীতে এবিষয়ে উন্নততর কাজ হবে। ১৯।১।১৯৫৪

* * *

এখানকারই এক আধুনিক কবি একদিন গেয়েছিলেন তাঁর কাব্যে—"মেলাবেন তিনি মেলাবেন।" বিশ্বভারতীর বাণী কেবল 'শান্তি' নয়—'মৈত্রী'ও। এই মিত্রতার সূত্র খুঁজে শান্তিনিকেতনের সেই কবি ভ্রাম্যমাণ এখন বহির্ভারতের দেশে-দেশে; বিদেশ থেকেও এমনি ভাবুক ভ্রাম্যমাণের দল আসছেন আজো শান্তিনিকেতনে। আজ সাড়া জেগেছে তাঁদের মধ্যে দেশে-দেশের দর্শনশাস্ত্র মিলিয়ে শাশ্বত এক 'বিশ্ব-দর্শন'-শাস্ত্র রচনা নিয়ে। মানুষের বাইরের মেলা মেলবার মুখে, মানুষের গভীর মেলার এই বাণী জাগিয়ে দিলেন এসে পাশ্চাত্যের এক মহামনীষী ডঃ বার্ট। আমাদের দেশের ডঃ রাধাকৃষ্ণণের মতোই বিশ্ববিশ্রুত পাণ্ডিত্যের খ্যাতি বহন করে থাকেন আমেরিকার কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দর্শনাচার্য এই অসামান্য প্রতিভাবান ব্যক্তিটি। সার্ধসাহস্রিক বুদ্ধজয়ন্তী উপলক্ষে শ্রদ্ধানিবেদনের জন্য ইনি এসেছেন ভারতবর্ষে; বুদ্ধগয়ার কৃত্য সেরে শান্তিনিকেতনে তাঁর আগমন ঘটেছে সম্প্রতি। গত ১৪ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় চীনাভবনে আশ্রমবাসীদের নিকট তিনি তাঁর ভাষণে বলেন,—"জগতে এখন নূতন এক দর্শনধারার অনুসন্ধান জেগেছে। এমন কোন্ ক্ষেত্র আছে যেখানে সব দেশের সব জাতির সুচির-সাধনায় আহূত জ্ঞানসম্পদের সার এসে মিলেছে;—এই একটি সমন্বয়ী সূত্রধারা গড়ে তোলা চাই সকল আধার খুঁজে। এখানে এসে মনে হচ্ছে—এই তো সে ক্ষেত্র, ভবনে-ভবনে আহ্বান উঠছে সমস্ত দেশের সমস্ত কালের সমস্ত মানব-সমৃদ্ধির। এখানকার আবহাওয়া সৃষ্টি করে তুলতে সাহায্য করবে নূতন মৈত্রীর দর্শন।"—এই ব'লে আচার্য বিশ্বভারতী ও তার স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের বাণী ও কাজের মধ্যে যে অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন, তার এক বিশেষ তাৎপর্যের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ভাষণের মধ্যে এই আশার কথাটিও তিনি বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে বলেন যে, এই উপযুক্ত ক্ষেত্র থেকেই সকল দেশের যোগাযোগে বিশ্বভারতীর দায়িত্বে বিশ্ব-দর্শন

প্রণয়নের সুমহৎ কাজটি আরম্ভ হ'য়েছে এরূপই তিনি দেখবেন তাঁর আগামীবারের আগমনে। ২৬।১২।১৯৫৬

দেশিক

ভারত-সংস্কৃতির একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ছিলেন শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্র-ঐতিহ্য এবং রবীন্দ্র-বংশধারার তিনি সে-যুগের শেষ প্রতিনিধি। বিশ্বভারতীর তিনি প্রাক্তন সভাপতি; শুধু তাই নন, বিশ্বভারতীর একটি প্রেরণাই ছিলেন তিনি। তাঁর শিষ্যগোষ্ঠী দিয়ে কলাভবনের পত্তন ও পরিচালনা। আজো সে-ধারার ব্যত্যয় ঘটেনি। ৬ই ডিসেম্বর সকালে উঠে আশ্রমবাসী শুনতে পেল তাঁর নিদারুণ সংবাদ। ছেলেমেয়েরা বেরিয়ে পড়ল। ধীর নম্রপদে চলল একটি ব্যথিত দল পথ বেয়ে-বেয়ে। গানও সঙ্গে ভেসে চলল শূন্য ছেয়ে—"তোমার অসীমে প্রাণ-মন লয়ে"। কবির বিয়োগে সান্ত্বনা খুঁজেছিল আশ্রম অবনীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে। অবনীন্দ্রনাথ এসে ধরেছিলেন সে-দিন বিশ্বভারতীর হাল, তাঁর ছবিতে, তাঁর গল্পে, তাঁর ভাষণে, তাঁর মন-মাতানো সঙ্গ দ্বারা এবং অমূল্য প্রেরণায় ও উপদেশে, আত্মীয়তার অমৃত গান গেয়ে আশ্রমকে বাঁচিয়েছিলেন নির্জীবতা থেকে। সন্ধ্যায় মন্দিরে উপাসনা হয়। সেদিন রাত্রে ও শ্রাদ্ধতিথি শনিবারে "সাহিত্যিকা" প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বৈতালিকরা আশ্রম-পরিক্রমা করেন। ইতিপূর্বে ২৮শে ডিসেম্বর রাত্রে সিংহসদনে অবনীন্দ্রনাথের বিভিন্নমুখী প্রতিভা ও চরিত্র সম্বন্ধে একটি আলোচনা-সভার আয়োজন হয়েছিল। এখানকার অনেক অধ্যাপক তাতে অংশ গ্রহণ করেন। তাঁরা এক-একজন এক-একদিক নিয়ে সুনিপুণ ভাষণে আচার্যের ভিতরকার সাহিত্যিক, শিল্পী ও সামাজিক ব্যক্তিটিকে উজ্জ্বল করে ধরে নিজ নিজ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় ও গ্রন্থন-বিভাগের শান্তিনিকেতন শাখায় অবনীন্দ্রনাথের প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

'তাসের দেশে'র মহড়া হচ্ছে উত্তরায়ণে। কবি-প্রয়াণের পর সেবার দল যাবে কলকাতায়। অভিনয়ের আড়ষ্টতা কাটছে না। কী করা যায়, তারও হদিশ পাওয়া কঠিন। এমন সময় দু'দিন আগে আশ্রমে এলেন অবনীন্দ্রনাথ। সোজা আসরে এসে বসলেন, আর, বেশী নয় দু'-একটি জায়গায় মাত্র নিজেই চোখমুখ তুলে আঙুল নেড়েচেড়ে অভিনয়ে এমন একটা সাড়া জাগিয়ে দিলেন যে, সবাই

মেতে গেল। তাঁর এক-একটা কথায়, ভুরুর একটু কুঞ্চনে সকলের অভিনয়কে ভিতর থেকে টেনে আনলেন সহজ প্রকাশে। এমনি করে তিনি প্রাণ জাগাতেন।

* * *

কবি-প্রয়াণের পর আমবাগানে তিনি এসে সকলের সামনে বসলেন, দু'দিকে তাঁর দু'জন, দক্ষিণে রথীন্দ্রনাথ, বামে আচার্য ক্ষিতিমোহন। দু'জনের কাঁধে দু'হাত রেখে বললেন—এই দু'টি আমার দু'হাত, এঁদের সাহায্যেই আমি কাজ চালিয়ে যাব। তিনি (রবীন্দ্রনাথ) আমাকে বলে গিয়েছিলেন ভার নিতে। আমি না এসে কি থাকতে পারি! কলাভবন এবং শিশু-বিভাগেই বসত তাঁর আসর। উত্তরায়ণে গেলে দেখা যেত, নীচেরতলার সামনে পুব-দক্ষিণ কোণের কক্ষটিতে বসে ছবি এঁকে চলেছেন একমনে। শাল মুড়ি-দেওয়া সুদীর্ঘ দেহ, কৌতূহলভরা সেই বড় বড় চোখ,—আশ্রমের আকর্ষণ ও পরম ভরসাস্থল ছিল বহুদিন। রবীন্দ্রনাথ মহাত্মাজীকে বলেন, বিশ্বভারতীর আচার্য হবেন কারা তাঁদের একটি ক্রমিক-তালিকা স্থির করে দিতে। মহাত্মাজী সেদিন প্রথমেই নাম করেছিলেন অবনীন্দ্রনাথের। তালিকায় দ্বিতীয় নাম ছিল সরোজিনী নাইডুর। তারপরে ছিলেন রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও জওহরলাল। সে অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথের পর অবনীন্দ্রনাথই হন আচার্য।
২৩।১২।১৯৫১

১২ই আগষ্ট সন্ধ্যায় অবনীন্দ্রনাথের জন্মতিথি উপলক্ষে সিংহসদনে সভা হল। জন্মাষ্টমী তিথি। আকাশে ঘন-ঘোর মেঘের ঘটা। ক্ষান্ত-বর্ষণ সন্ধ্যায় সকলে সমবেত হলেন আজকের যুগের আরেক মহাশিল্পীর জন্মোৎসব-পালনে। প্রথমে সভাপতি ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী তাঁর ভাষণে বলেন—আশ্রমের আচার্য হিসেবেই যে আজ আমরা অবনীন্দ্রনাথের জন্মতিথি পালন করছি তা নয়, তাকে স্মরণ করতে এসেছি জাতীয় সংস্কৃতির পথ-প্রদর্শকরূপে।

দেখা গেছে জাতির জীবন জাতীয় সংস্কৃতি যখনই বিপন্ন হয়েছে তখনই এক-একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে। উনবিংশ শতকে ভারতের জাতীয় জীবন এবং সংস্কৃতির খুবই অবনতি ঘটেছিল। এই সময়েই প্রধান পথ-প্রদর্শকরূপে বাংলাদেশে জন্ম নিলেন রামমোহন, তারপরে বাংলায় নানাদিকে এক-একটি প্রতিভা দীপ্ত হয়ে উঠল। সমস্ত ভারতের ঐতিহ্যে এ সময়ে বাংলার দান সবচেয়ে বেশি। ভারতের জীবন ও সংস্কৃতির আলো জেলে ধরেছিলেন তাঁরা। অবনীন্দ্রনাথ তখনকারই একটি প্রতিভা। তিনি বুঝেছিলেন—রাজনৈতিক

স্বাধীনতা কবে পাব তার ঠিক নেই; কিন্তু জাতীয় সংস্কৃতি এবং শিল্পকলাকে বাঁচিয়ে নতুনভাবে পৃথিবীর সামনে তাকে তুলে ধরতে পারলে জাতির অনেকখানি অগ্রগতি হবে, জাতীয় জীবনে উৎসাহ-উদ্দীপনা আসবে, জাতি নিজেকে চিনতে এবং ভালোবাসতে শিখবে। এই ভাবের থেকেই অবনীন্দ্রনাথ জাতীয় শিল্পের প্রতি দৃষ্টি দিয়েছিলেন।

বাগ্‌চী মহাশয়ের ভাষণের পর উপাচার্য রথীন্দ্রনাথ গুরুদেবের একটি বাণী পাঠ করেন—রবীন্দ্রনাথ তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে অবনীন্দ্রনাথকে অভিনন্দিত করে এই বাণী পাঠিয়েছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ নববর্ষ উপলক্ষে ১৯৫০ সনে আশ্রমবাসীকে যে আশীর্বাণী পাঠিয়েছিলেন, সভায় তাও পঠিত হয়। উপাচার্য মহাশয় এর পরে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ পড়েন—অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁর নিজের স্মৃতিকথা।

সেদিন সভায় অবনীন্দ্রনাথের "জোড়াসাঁকোর ধারে", "ক্ষীরের পুতুল", "খেলা ঘর" প্রভৃতি পুস্তকগুলি থেকে অংশবিশেষ পাঠ করা হয়। অবনীন্দ্রনাথের প্রতি নন্দলাল বসু মহাশয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলির বাণীও পঠিত হতে শোনা গেল। একটি প্রকাশিত প্রবন্ধ থেকে তা সংকলিত হয়েছিল।

অধ্যাপক শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এর পরে অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিছু বলেন। তিনি "খেলার সাথী অবনীন্দ্রনাথের" পরিচয় দেন—

"মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পরে অবনীন্দ্রনাথ কিছুদিন বিশ্বভারতীর আচার্যরূপে আশ্রমে বসবাস করেছিলেন। সে ক'দিন শিশুদের মধ্যে এসে গল্পে, কথায়, খেলনা বানিয়ে একটা আনন্দের জোয়ার বইয়ে দিয়েছিলেন; বড়োদের মধ্যে সভা-সমিতিতে এসে মধুর হৃদ্যতার সৃষ্টি করেছিলেন। একদিন পাঠভবনের ক্লাসে 'রাজকাহিনী' পড়ে শোনাচ্ছি, আচমকা তিনি এসে উপস্থিত হয়েছেন। মনে পড়ল রবীন্দ্রনাথও এক-এক সময় ঠিক এমনিভাবে ঘুরে বেড়াতেন, দেখতেন সব কাজ। অবনীন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করলেন—কী পড়াচ্ছিস, বেশি ব্যাখ্যা-ট্যাখ্যা করে ফেলছিস না তো? সামান্য কথাতেই তিনি শিক্ষার পদ্ধতি বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন। শুষ্ক জ্ঞানের মধ্য দিয়ে নয়, রসবোধ এবং অনুভূতিকে জাগ্রত করে শিক্ষা দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন তিনি।

আমরা আশ্রমে হয়তো অনেক জ্ঞানী-গুণী, পণ্ডিত পাব, কিন্তু কবি এবং শিল্পী যে দু'জনকে পেয়েছিলাম, তেমনি কি আর পাব? তাঁদের আসন কখনই পূর্ণ হবে না। আশ্রমের যদি কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে, তা রয়েছে তাদের শিক্ষাধারার মধ্যে, তাঁদের শিল্প-সংস্কৃতি ও সাহিত্যের মধ্যে। এই বৈশিষ্ট্যকে ধরে রাখবার জন্যেই

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপনা হয়েছে, সে কথা যেন আমরা কখনই না ভুলি।" ২১।৮।১৯৫২

৩১শে আগষ্ট—জন্মাষ্টমী এবং অবনীন্দ্রনাথের ৮৩তম জন্মদিন উপলক্ষে বিশ্বভারতীর সকল বিভাগ বন্ধ ছিল। সকালে বৈতালিকদল গান গেয়ে আশ্রম-প্রদক্ষিণ করল। কলাভবনের "নন্দন"-গৃহে অবনীন্দ্রনাথের ছবির একটি প্রদর্শনী হয়েছিল; দলে দলে লোক সেখানে ভিড় করে। ধূপ-ধুনার গন্ধে ঘরটি ভরপুর ছিল। দুপাশে কাঁচের-ফ্রেমে বাঁধানো চিত্রাবলী। এক-একটিতে কত রঙের ছটা। কলাভবনের একজন শিক্ষক ছাত্রদের বললেন যে, রঙের উজ্জ্বলতায় বুঝতে হবে শিল্পীমন রোমান্টিসিজমের অনুরাগী। অবনীন্দ্রনাথের ছবিতে রোমান্টিক ভাবটি বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে। সাজাদপুরের ছবি ও আরব্যোপন্যাসের ছবিগুলি যেন একেবারে জীবন্ত। আরব্যোপন্যাসের একটি চিত্রে দু-বোন সাহারজাদী আর দীনারজাদী করুণনেত্রে তাকিয়ে আছে; একজন গল্প বলছে, একজন বাদশার পদসেবায় নিযুক্ত, বাদশা শায়িত-অবস্থায় আলবোলা টানছেন। তীর্থক্ষেত্রের চিত্রটিও অপূর্ব। গঙ্গার ঘোলাটে জল বেয়ে চলেছে, কতলোক স্নানের ঘাটে ভিড করেছে, ঠেলাঠেলি, ওঠা-নামা—কে আগে স্নান করে পবিত্র হবে, যারা স্নান করে উঠছে তাদের চোখেমুখে কী আনন্দ। এরই সঙ্গে রয়েছে একটি শয়তানের চিত্র—'দুর্মুখ', সেদিকে তাকাবামাত্র ঘৃণায় শরীর সংকুচিত হয়ে ওঠে, ভয়ে আতঙ্ক জাগে। একটি ছবিতে আঁকা রয়েছে একদল পাখী। তারা এমনভাবে রয়েছে যে, দেখে শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী বলে উঠলেন—শিশুদের কথা কি, আমারই যে পাখীগুলিকে ধরতে ইচ্ছে করছে। সব শেষে রয়েছে সুবিখ্যাত ছবি দুটি—'শাজাহান' ও 'ভারতমাতা'। সমস্ত প্রদর্শনীটি দেখে বিস্মিত হয়ে ভাবতে হয়—কত বিচিত্র বিষয় নিয়ে শিল্পী সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছেন, আর কী তাদের অপূর্ব-প্রকাশ।

রাত্রে অবনীন্দ্রনাথের স্মরণে কলাভবন-গৃহে একটি জলসা হল। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিভিন্ন লেখা থেকে কিছু কিছু পাঠ করা হল; কেউ মহাশিল্পীর উদ্দেশ্যে স্বরচিত কবিতা পাঠ করলেন, তিন-চারটি বাংলা ও হিন্দী গান গীত হল। কলাভবনের মিউজিয়মের তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত প্রশান্ত রায় অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিছু বললেন। দীর্ঘকাল তিনি অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে ছিলেন। অবনীন্দ্রনাথের শিক্ষার মূল কথা ছিল—যাকিছু করবে, আনন্দের মধ্য দিয়ে করবে। তাঁকে ছবি এঁকে দেখালে তিনি কখনো কাউকে নিরাশ করতেন না। বলতেন—বাঃ, বেশ হয়েছে।

এঁকে যাও, আরও আঁকো, তবেই হাত ঠিক হয়ে যাবে। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর শিষ্যদের সবসময় বলতেন—ছবি এঁকে যদি পয়সা রোজগার করতে চাও তবে শিল্পকে আয়ত্ত করতে পারবে না। অবসর সময়ে আনন্দের সঙ্গে ছবি আঁকো, দেখবে ছবিতে প্রাণ এসেছে। তিনি যে কী-রকম অমায়িক ছিলেন সে যাঁরা তাঁর কাছে এসেছেন তাঁরাই জানেন। অপরিচিত ব্যক্তিকেও তিনি এমনভাবে সম্বর্ধনা জানাতেন যেন কতকালের চেনাজানা। ৫।৯।১৯৫৩

জনাব আলাউদ্দিন খাঁর শান্তিনিকেতন-বাসের সময় ফুরিয়ে গেল। সাত তারিখে রাত্রে উত্তরায়ণের ভিতরের বারান্দায় তিনি শেষ-বাজনা শোনালেন। রথীন্দ্রনাথ, ইন্দিরা দেবী, প্রতিমা দেবী, অন্যান্য আশ্রমিক-আশ্রমিকা ও ছাত্রছাত্রীরা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকটি জমেছিল—স্বরোদে দরবারী কানাড়া, সুরশৃঙ্গারে বেহাগ এবং বেহালার করুণ রাগিণীতে। সুরশৃঙ্গার বাজাবার আগে আলাউদ্দিন বললেন—ভারতবর্ষের বহু প্রাচীন যন্ত্র এটি, এখন কাবুলিরা দখল করে নিয়েছে। বেহালা বাজাবার আগে বলে নিলেন—ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগে এ বাজনা ছেড়ে দিয়েছি। গুরু বলেছিলেন সব যন্ত্র শিখতে যেয়ো না, একটি বাজনা শেখো। একটি বাজনাই যদি তেমনভাবে শিখতে পারো, তবে সব বাজনা আপনি শেখা হয়ে যাবে। আর, সব বাজনা শিখতে চাইলে কোনো বাজনাই শেখা হবে না। সেই থেকে একটি যন্ত্র সেধে চলেছি। সন্ধ্যায় বসেছি, ভোর হলে উঠেছি, এমনি করে পঁয়ত্রিশ বছর সেধে এসেছি, এখন আর ততটা পারিনে। আরো নানা কাজ জমেছে।

নানা কথা বলতে বলতে তিনি বেহালাটি এনে ইন্দিরা দেবীর হাতে দিলেন, বললেন, ইউরোপে যখন গিয়েছিলুম, ফ্রান্স থেকে পেয়েছি এ বেহালাটি; তিনশ' বছর আগেকার এক নামজাদা যন্ত্রীর তৈরি, ওর পিছনে আঁকা তাঁর বাড়িটি, এর মাথায় খোদাই করা তাঁর মুখ। সবাই দেখলেন চমৎকার একটি বাড়ি আর মাথায় দাড়ি-গোঁফ সমেত সুস্পষ্ট একটি ছোট মুখ। বললেন আমার হাতে আছে এটি পঞ্চাশ-ষাট বছর।

* * *

খাঁ সাহেবের বাজনা শেষ হলে শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী বললেন,—আপনার বাঁ-হাতে যন্ত্র শেখা সম্বন্ধে কী-একটা গল্প না কি বলেছিলেন, শুনতে চাইছেন সবাই। স্বভাবরসিক আলাউদ্দিন খাঁ রসিয়ে রসিয়ে বললেন তাঁর বাঁ-হাতে যন্ত্র বাজাবার গল্প। গুরুর কাছে যন্ত্র শিখতে গেছেন, সতীর্থেরা কেবল ক্ষেপায়—তোমরা বাজাবে এসব

বাজনা, বাঙালী খায় মাছের জল, সে-হাতে বাজনা বেরোয় না। শুনে-শুনে একদিন গেলেন রেগে, বললেন—মাছের জল নয়, বাঙালী খায় মাছের ঝোল, তোমাদের সুরুয়ার মতো। এই বাঙালীই পায়ে বাজনা বাজায়, তা জানো? কিন্তু, যন্ত্র সরস্বতী। সে যে প্রণম্য। পায়ে তো নয়, বাঁ-হাতে বাজনা সেধে বাজিয়ে দেখিয়ে দিলাম, কেমন বাঙালী বাজনা বাজাতে পারে। খাঁ সাহেব তাঁর শান্তিনিকেতনে প্রথম আসার গল্পও বললেন। আলাউদ্দিন খাঁর ছোট ভাই আয়েতালি খাঁ ছিলেন শান্তিনিকেতনের যন্ত্র-শিক্ষক। সে সময়ে গুরুদেব তাঁর বাজনা শুনতে চান, আয়েতালি খাঁ সেকথা লিখে জানাতে তিনি এসেছিলেন এখানে। তখন গুরুদেব তাঁকে এখানে এসে থাকতে বলেন। কিন্তু খাঁ সাহেব ইউরোপে চলে যান; ইচ্ছে থাকলেও আসা হয়ে উঠেনি। খাঁ সাহেবের বাজনায়-গানে গল্পে-হাসিতে বৈঠকটি সেদিন ভ'রে উঠেছিল। শ্রীযুক্তা প্রতিমা দেবী উঠে আলাউদ্দিন খাঁকে মীনা-করা দুটি শ্বেত-পাথরের থালা এবং একটি রুপোর গ্লাস উপহার দিলেন। খাঁ সাহেব খুব খুসী হলেন। পরদিন সংগীতভবন থেকে তাঁকে নাচে-গানে বিদায়-সম্বর্ধনা জানানো হল। নয় তারিখে তিনি কলকাতা চলে গেলেন আশ্রম থেকে বিদায় নিয়ে। ১৬।১।১৯৫৩

* * *

১৩ই পৌষ কলকাতা রবীন্দ্র-সংগীতের প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান "গীতবিতান" থেকে শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবীর জন্মোৎসবের অনুষ্ঠান শান্তিনিকেতনে সম্পন্ন হয়। রবীন্দ্র-সংগীত দেশের প্রত্যেকটি লোকের আপনার ধন। এ সংগীত উপভোগের অধিকারী সকলেই। এ একটি জাতীয় সম্পদ। এককালে শান্তিনিকেতনই ছিল এ সংগীত-চর্চার একমাত্র প্রতিষ্ঠান। রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পরে তাঁর সংগীতের সুসংবদ্ধ অনুশীলন ও প্রচার সম্বন্ধে দেশে বিশেষভাবে সচেতনতা জাগে। কলকাতায় কতিপয় অনুরাগী-ব্যক্তি রবীন্দ্র-সংগীতের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে ব্রতী হলেন। তার ফলে ১৯৪১ সালে ৮ই ডিসেম্বর "গীতাবিতান" প্রতিষ্ঠিত হয়। তার পুরোধা ছিলেন শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী। তিনি রবীন্দ্র-সংগীত ও ব্রহ্ম-সংগীতের অন্যতম ভাণ্ডারী; সকলের মধ্যে সংগীত প্রচারের উৎসাহ তাঁর অদম্য। তিনি সেদিন "গীতবিতান"-এর উদ্বোধন করে আশীর্বাদ দান করেন এবং দীর্ঘদিন এ প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেণ্ট থাকেন। শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী সম্প্রতি অশীতিবর্ষ অতিক্রম করেন। "গীতবিতান" প্রতিষ্ঠান এই উপলক্ষে তাঁকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করল। শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী এ-সব শ্রদ্ধা নিবেদনের অনুষ্ঠানে কুণ্ঠিত হয়ে বলেছেন

যে, জীবনে তিনি এমন কী সকল কাজ করেছেন যাতে বিভিন্ন জায়গা থেকে তাঁকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়ে থাকে। অন্যান্য বিষয় উল্লেখ না করলেও বলা যায়, তাঁর জীবনের আদর্শই তাঁকে সবার শ্রদ্ধার পাত্র করে তুলেছে। রবীন্দ্রনাথ যে-আদর্শের কথা বারবার বলেছেন, শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী তা নিজের জীবনে সার্থক করে তুলেছেন। মনস্বীতায় উজ্জ্বল, সরল সুন্দর সুরুচিপূর্ণ জীবন সবার সঙ্গে প্রীতি ও ভালোবাসার সম্পর্কে ঘনিষ্ঠ।—এ রকম জীবনকে যদি শ্রদ্ধা করতে আমরা না পারি তবে আমাদের শিক্ষাদীক্ষা ব্যর্থ; এখানে আমাদের অনেক-কিছুই শিখবার আছে।
৬।১।১৯৫৪

৩০শে জানুয়ারী—মহাত্মাজীর তিরোধান-দিবসে বিশ্বভারতীর সকল বিভাগ বন্ধ ছিল। সকাল আটটায় মন্দিরে উপাসনা হল। শাস্ত্রী ক্ষিতিমোহন সেন তাঁর ভাষণে বললেন—আজ ৩০শে জানুয়ারী। এইদিন এক মহাপুরুষকে আমরা এ পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছি মৃত্যু-উপহার দিয়ে। কিন্তু এ কথা ভুললে চলবে না যে, মহাপুরুষদের মৃত্যু নেই। ক্ষুদ্র যারা তারাই মৃত্যুকে ভয় করে। মহতের মৃত্যু-ভয় নেই। বেদে একটি মন্ত্র আছে, তাতে বলা হয়েছে—যে পুরুষ একবার অমৃত পান করেছেন, তাঁর আর মৃত্যু থাকে না। মহাত্মাজী ছিলেন সেই অমৃতের অধিকারী। তিনি বেঁচে থাকতে আমরা তাঁর মূল্য বুঝিনি, আমাদের মধ্যে থেকে তাঁকে সরিয়ে ফেলেছি। কিন্তু যে ফুঁয়ে আগুন নেবে সেই ফুঁয়েতেই অনেক সময় আগুনকে বাড়িয়ে তোলে। ক্ষুদ্র যারা তারা ভাবল মহাত্মাজীকে সরালে সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর কাজ ফুরিয়ে যাবে। তা নয়, মৃত্যুই তাঁকে আরও বড় করে দিয়ে গেছে। এখন তাঁর বাণী অনুসরণ ক'রে তাঁর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার দায়িত্ব রয়েছে আমাদেরই। আজ ছুটি বলে একথা যেন না ভাবি যে, কাজ নেই, দায়িত্ব নেই, কেবল খেলা আর গল্প করে সময় কাটাতে পারি। আজকের দিনে কত বড় গুরুতর বোঝা আমাদের কাঁধে এসে চেপেছে—সে কথা যেন আমরা কখনও না ভুলি। তিনি নেই বলেই এ গুরুভার সমস্ত দেশের উপর এসে চেপেছে। সে কাজ আমাদের ভালভাবে সম্পন্ন করতেই হবে, তিনি ইহলোকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন; পরলোকে চলে গেলেও তাঁর সঙ্গে আমাদের যোগ কোনোকালে ছিন্ন হবে না। ১৫।২।১৯৫৪

*　　*　　*

ভারত-রাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট চলতি ১৯৫৪ সনের মার্চ মাস থেকে এক বছরের জন্য বিশ্বভারতীর প্রাচীন পণ্ডিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে মাসিক পঁচাত্তর

টাকার একটি বৃত্তি অনুমোদন করেছেন। এই বৃত্তিটি ভারত-রাষ্ট্রের শিক্ষা-বিভাগের মন্ত্রিমণ্ডলীর অনুমোদিত বৃত্তি ;—সাহিত্য, শিল্প, জ্ঞান-বিজ্ঞানের যাঁরা সাধক কিন্তু যাঁরা অর্থাভাবে বিপন্ন অবস্থায় রয়েছেন এ বৃত্তি তাঁদেরই দেওয়া হয়ে থাকে। পণ্ডিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সুযোগ্য ব্যক্তি এবং বৃত্তিটি যথাযোগ্যভাবে তাঁকে দেওয়া হয়েছে,—এটা আনন্দের বিষয়। পণ্ডিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বয়স বর্তমানে সাতাশী বৎসর। আজীবন সাধনা দ্বারা তিনি 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' নামক বাংলা অভিধান রচনা ক'রে অবিস্মরণীয় কীর্তি স্থাপন করেছেন। ২৫।৬।১৯৫৪

*　　*　　*

এইদিন সান্ধ্যোপসনার পরে সিংহসদনে বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয়-গ্রন্থাগারিক (ও 'রবীন্দ্র-জীবনীকা'র) শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কর্ম-অবসর উপলক্ষে বিদায়-সম্বর্ধনা-জ্ঞাপক সভার অনুষ্ঠান হয়। শান্তিনিকেতন, শ্রীনিকেতন ও বিনয়ভবনের বহু কর্মী, অধ্যাপক এবং আশ্রমের ছাত্র-ছাত্রীমণ্ডলীর যোগদানে সেদিনকার অনুষ্ঠানে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। বিশ্বভারতীর উপাচার্য ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগ্চী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কর্মীমণ্ডলীর পক্ষ থেকে মানপত্র পঠিত হলে পর ডঃ বাগ্চী প্রভাতবাবুর সঙ্গে তাঁর জ্ঞানসাধনার ঘনিষ্ঠতা এবং বিশ্বভারতীর কর্মক্ষেত্রে প্রভাতবাবুর বহুমুখী যোগের কথা উল্লেখ করে বলেন,—বিদায়ের কথার চেয়ে বেশি করে মনে আসছে নূতনতর সম্ভাবনার কথা। জ্ঞান ও কর্মের ক্ষেত্রে শক্তি-প্রয়োগের উপযোগী এই নিরাবিল অবসরের প্রাক্কালে প্রভাতবাবুর দীর্ঘজীবন এবং সাধনার সাফল্য কামনা করে উপাচার্য তাঁকে অভিনন্দিত করেন। প্রভাতবাবু এর উত্তরে বলেন, সতেরো বৎসর বয়সে শান্তিনিকেতনে কাজ শুরু করে বাষট্টি বৎসর বয়সে সুদীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর অন্তে তিনি এই অবসর গ্রহণ করছেন ; বিশ্বভারতীর সঙ্গে তাঁর আত্মযোগের বিচ্ছিন্নতা কোনোকালেই ঘটবার নয়। রবীন্দ্রনাথের জীবন এবং তাঁর সাক্ষাৎ স্পর্শ থেকে তিনি এ আশ্রমে যা সঞ্চয় করেছেন এবং সে-সঙ্গে আশ্রমের সহকর্মী ও ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে যে স্নেহপ্রীতি ও শুভেচ্ছা লাভ করেছেন, তাঁর জীবনের সে-সব পরম সম্পদ। জীবনে এত কিছুই মানুষের মেলে যে, তারই সদ্ব্যবহার করতে পেরে ওঠা যায় না ; সেস্থলে না-পাওয়ার ক্ষতির হিসাবটা বড় করে দেখা কোনো কাজের কথা নয়। শেষাবধিই গুরুদেবের মতো যেন বলে যাওয়া যায়—যা পেয়েছি তুলনা তার নাই,—এইটুকুই একমাত্র কাম্য। ২।৭।১৯৫৪

১৯৩৪ সনে ১০ই জানুয়ারী জওহরলাল নেহেরু সস্ত্রীক শান্তিনিকেতনে

আসেন। সেই তাঁর এখানে প্রথম আসা। উত্তরায়ণের টেনিস-লনে রবীন্দ্রনাথ ও আশ্রমবাসিগণ সাদরে দম্পতিকে অভ্যর্থনা জানান। ১৯৩৭ সনে দ্বিতীয়বার জওহরলাল শান্তিনিকেতনে এসে চীন-ভবনের ভিত্তি স্থাপন করেন। রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পরেও তিন-চারবার আশ্রমবাসী তাঁকে নিজেদের মধ্যে পেলেন। কিন্তু এবার বিশ্বভারতীর আচার্যরূপে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী তাঁকে যত কাছে পেয়েছে, অন্য কোনোবারই ততটা পায়নি। এবারকার জওহরলালের স্মৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের মনে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। বিদেশী ছাত্রছাত্রিগণ সোৎসাহে গল্প করেন,—জওহরলাল ঘরোয়া-বৈঠকে তাদের কী বলেছিলেন। আটই পৌষ বিকেল তিনটে সাড়ে-তিনটের সময় প্রায় পঞ্চাশজন অভারতীয় ও অবাঙালী ছাত্রছাত্রী উত্তরায়ণের পিছনের বারান্দায় এসে জড়ো হলেন। উপাচার্যের সঙ্গে এলেন জওহরলাল। বললেন—আমি কিছু বলব না। তোমাদের যা বলবার আছে বল। সুবিধে-অসুবিধে যে কোনো বিষয়ে বলতে পার,—কিছুমাত্র সংকোচ কোরো না।

উপাচার্য-মশাই বলে উঠলেন—আমার সামনে হয়তো মুখ খুলতে ওরা সংকোচ বোধ করবে। আমি চলে যাই, ওরা কথা বলুক।

জওহরলাল হেসে বাধা দিয়ে বললেন,—উঁহু সে হচ্ছে না। উপাচার্যের সামনেই ছাত্রছাত্রীরা তাদের সুবিধা-অসুবিধার কথা আমাকে বলুক, সেটাই ঠিক হবে, নয় কি?

*　　　*　　　*

সবাই খুব হাসতে লাগল। আমেরিকা-আগত জনৈক ছাত্রী বললেন—নানাস্থানে জনতার যে রকম ভিড় হয়, আর সভা-সমিতিতে মাঝে মাঝে যে রকম গোলমাল বেধে ওঠে, আপনি তো দেখি বেশ তাদের সামলে নেন, নিশ্চয়ই এতে বেগ পেতে হয়—কিন্তু ভাবি, আপনার মনের অবস্থা তখন কেমন থাকে? স্মিত হেসে জওহরলাল বললেন—তখনকার মনের অবস্থা কি আর আমিই ঠিকমতো উপলব্ধি করতে পারি, না, আমার সেই মনটাকে ধরে তোমাদের দেখাতে পারি?

সকলে মিলে হেসে উঠল।

*　　　*　　　*

এমনি দু'একটা হাসি-পরিহাসের পর তিনি বলতে শুরু করলেন—আমার 'আত্মচরিতে' আমি অনেক কথা বলেছি; ভারতের মর্মকথা অনেকটা তাতে জানা যাবে। কিন্তু আবার অনেক কথা তাতে বলাও হয়নি। আচ্ছা, তোমাদের মধ্যে হিন্দী

জানা আছে কাদের ?—(কয়েকজন ছাত্র হাত তুলল) বেশ,—বাংলা শিখে নিয়েছ ক'জনা ? (দু'চারজন হাত তুলল)—ভারতের নানা অঞ্চল তোমরা ঘুরে দেখেছ ? তার শিল্পকলা, তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ? যারা সে সব না দেখেছ, দেখে নিয়ো।—তাতে নিবিড় করে ভারতকে বুঝতে পারবে।—এ এক বিচিত্র দেশ। দেখবে, কত ভিন্ন-ভিন্ন প্রদেশে সে বিভক্ত। কত রকম তার ভাষা তার জীবনযাত্রার পদ্ধতিই বা কত বিচিত্র। ভৌগোলিক অবস্থানও তার জাতির মিলন ঘটাবার অনুকূল নয়। এত বাধা সত্ত্বেও কিন্তু ভারত তার লক্ষ্য হারায়নি। সে চেয়েছে এই বহুর বৈচিত্র্য রক্ষা করেই সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি ঐক্য। আজও ভারত-গভর্নমেণ্ট সেই আদর্শ অনুসরণেই রয়েছেন সচেষ্ট। কিন্তু পদে-পদে কত যে এতে অসুবিধা, তা বলার নয়। তবু কেবল স্বদেশেই নয়, দেশবিদেশে সর্বত্রই আমরা এই আদর্শে যোগ রক্ষা করে চলতে চাই। কেন যে চাই, সেটাই আজ তোমাদের কাছে বিশদ করে বলবার চেষ্টা করব।

*　　　*　　　*

প্রাচীনকালেও ভারতবর্ষ যেদিন জ্ঞানে-গরিমায় শিল্পে-সাধনায় উৎকর্ষ লাভ করেছিল সেদিন সে তার প্রতিবেশী দেশগুলিকে ভুলে থাকেনি। অবজ্ঞা করে তাদের দূরে রাখেনি। হাঁটাপথে, উটের পিঠে, নৌকায় সে পাহাড়-পর্বত মরুপ্রান্তর নদ-নদীসমূহ অতিক্রম করে গিয়েছে চীনে, তিব্বতে, জাভায়, জাপানে, গিয়েছে আনামে, ইন্দোনেশিয়ায়, আফ্রিকায়, আফগানিস্থানে, আরবে, মিশরে—কত দেশ-দেশান্তরে; ব্যবসাবাণিজ্য, শিল্প-সাহিত্য ধর্ম-সাধনার লেনদেন করেছে; প্রতিবেশীকে পেয়েছে ঘনিষ্ঠ করে। কিন্তু বৈদেশিক আক্রমণ যখন থেকে শুরু হল, তারপর থেকেই সে ধারা ক্রমে হয়ে গেল শিথিল। নিজেকে ভারত গুটিয়ে নিচ্ছিল নিজের মধ্যে। প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে তার যোগের ধারা ক্ষীণ হয়ে এল। এরপরে এল ইংরেজ। তার আমলে সীমবদ্ধতা আরো বেড়ে গেল। ইংরেজি-সভ্যতা যতই সমৃদ্ধ হোক, ইংরেজের দৃষ্টি নিজের কৌলীন্যের প্রতি একান্ত সীমাবদ্ধ। তার আভিজাতিক হালচাল নিয়ে সে এদেশে সন্তর্পণে সুদূরে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলল। একদিকে তার জ্ঞান-বিজ্ঞানের জৌলুষ ভারতের চোখ ধাঁধিয়ে দিলে। অন্যদিকে ইংরেজের সুদৃঢ় শাসনপদ্ধতিও এমন নাগপাশেই দেশকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধল যে, দেশান্তরের দিকে দৃষ্টি দেবার সাধ্য রইল না। এসব নানা কারণে ইংরেজই হয়ে উঠল ভারতের চোখে আদর্শস্থানীয়। পরাধীনতার আমদানী এই কূপমণ্ডুকতার অবস্থায় আমাদের অনেক দিনই কাটল। এরি মধ্যে সকল দেশের মতো

আমাদেরও একটা গর্বের বিষয় ছিল। আর কিছু না পেয়ে আমরা আধ্যাত্মিকতাকেই এ সময়ে সগর্বে আঁকড়ে বসেছিলাম। কিন্তু দিনের বদলে আমাদের সে দৃষ্টির আবিলতা দূর হল। স্বাধীন হওয়ার পর বিশ্বের আধুনিক দেশগুলির মতো বিষয়-ঐশ্বর্যের সম্ভারে আমরাও অবশ্য বড় হতে ঝুঁকেছিলাম। কারণ, সেদিকে বড় হওয়াটাই ভেবেছি বড়ো লাভের বিষয়। অবশেষে সে ঘোরও কেটে গিয়ে আজ আমাদের নূতন উপলব্ধি ঘটেছে। আমরা বিষয়ে বড়ো হওয়ার প্রতিযোগিতার মধ্যে—হিংসা এবং হিংসার পরিণতি, পরস্পরকে ধ্বংস—আধুনিক বিশ্বের এই ভয়াবহ নীতির ভাবী পর্যাবসান-রূপ আগে থেকে দেখতে পেয়েছি। তাই গভর্নমেন্টের নীতিও আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে বদলানো হল। এখন বৈষয়িক যোগের চেয়ে বড় লাভের বিষয় বলে গণ্য করি আমরা প্রতিবেশীর শুভেচ্ছা ও আন্তরিক সহযোগকে। এতেই সকলকে বাঁচাবে এবং সমৃদ্ধ করবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। আমাদের উত্তর-প্রান্ত-সীমায় সুদীর্ঘ দু'হাজার মাইলব্যাপী প্রতিবেশী দেশ রয়েছে তিব্বত ও মহাচীন। তাদের বন্ধুত্ব আমাদের মহৎ সম্পদ; তেমনি আরো নিকটের প্রতিবেশী রয়েছে পাকিস্তান, এরা আমাদের সহোদরেরই মতো। এদের সঙ্গে ভেদবিবাদ সময়-সময় ঘটে উঠলেও প্রতিবেশীর মনোভাব নিয়েই ধীরে-সুস্থে সে-সব মিটিয়ে ফেলা আবশ্যক। আখেরে দুয়ের পক্ষেই তাতে লাভের কারণ ঘটবে। এ আমরা ভেবে দেখেছি ভালো করে। পারস্পরিক সহযোগ তাই এত আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। এরপরে আছে সিংহল, মালয়, ব্রহ্মদেশ;—আছে জাভা, ইন্দোনেশিয়া, শ্যাম, জাপান, আরো আছে আরব, আফগানিস্থান—কাউকেই আমরা দূরে ফেলে রাখতে পারিনে। এ যুগের মতো আমাদের না থাক্ শিল্প-বাণিজ্য, না থাক্ এটমব্যোম্—জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঐশ্বর্যও তেমন না-ই যদি বা থাকে,—তাই নিয়ে দুঃখ করবার বা নিজেদেরকে নিঃস্ব ভেবে লজ্জিত হবার কিছু নেই। এ যা আমরা পেয়েছি, এ মহাবস্তু সৃষ্টির সহায়ক; ধার-করা মারণ-উপকরণ এ নয়;—এ আমাদের ঐতিহ্যগত চিরাচরিত চিত্ত-ঐশ্বর্য। ভিত্তিমূলে এই প্রতিবেশিত্ববোধ থাকলে তবেই মাত্র বৈষয়িক যোগ সুচির ও শুভদায়ক হতে পারে। প্রতিবেশিত্বভাব বৃদ্ধি পেলে, অর্থাৎ আশেপাশের দেশগুলির সঙ্গে ভালোবাসার সম্বন্ধ নিবিড়তর হতে থাকলে, তার প্রভাবে ভারতের যে শক্তি বাড়বে, এমন কি আপদ-বিপদে প্রতিরোধ-শক্তি হিসাবেও তা এ্যাটম-ব্যোম্, হাইড্রোজেন ব্যোমের চেয়ে কম কার্যকরী হবে না। আজ ভারতের প্রধান একটি লক্ষ্য তাই প্রতিবেশী-রাষ্ট্রের সঙ্গে সৌহার্দ্য স্থাপন করা। প্রাচীন যুগ

থেকে এটাই তো চলে আসছিল। আমরা আমাদের সনাতন-পথ ফিরে পেয়েছি এবং সেই পথেই আজ চলেছি।

*　　　　*　　　　*

প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে, বর্তমানে ভারতীয় সরকার কতকগুলি বৃত্তির ব্যবস্থা করেছেন যাতে প্রতিবেশী ও পাশ্চাত্য দেশ থেকে এদেশে এসে এবং এ দেশ থেকে প্রতিবেশী দেশগুলিতে ও পাশ্চাত্যে গিয়ে সকল দেশের লোকের পক্ষেই পারস্পরিক শিক্ষা-বিনিময়ের কাজ সহজতর হয়। এইভাবে যাতায়াত ও জ্ঞানবিজ্ঞানের বিনিময় দ্বারা পরিচয় ও প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠুক—এটাই আমাদের একান্ত কাম্য। আজকের যুগে কোনো দেশই যেন না ভাবে যে, তাঁদের দেশই হচ্ছে বিধাতৃ-মনোনীত একমাত্র শ্রেষ্ঠ দেশ (Chosen Country)। প্রত্যেক দেশেরই নিজস্ব এমন কিছু সম্পদ আছে যা অন্য দেশের নেই। সেখানেই তার শ্রেষ্ঠত্ব,—এটাই হচ্ছে প্রকৃত কথা। সেই সম্পদের পারস্পরিক আদান-প্রদানই গুরুদেবের এই বিশ্বভারতী স্থাপনারও অন্যতম উদ্দেশ্য। তাই এখানে এসে আমরা সকলে আজ মিলেছি।

*　　　　*　　　　*

এরপরে শান্তিনিকেতনের প্রসঙ্গে জওহরলাল বলেন—তোমরা নানা দেশ থেকে গুরুদেবের শিক্ষায়তনে বিভিন্ন বিষয় শিখতে এসেছ। তাঁর আদর্শকে তোমরা ভালভাবে বুঝতে চেষ্টা কোরো। এখানে অনেক সমস্যা রয়েছে,—তার মধ্যে জলের সমস্যা একটি। ময়ূরাক্ষী নদীর জল এখানে সরবরাহের চেষ্টা করা হবে। হয় তো একদিন জলের অসুবিধা আর থাকবে না। তোমরা সে-সুবিধা ভোগ করতে না পারলেও পরবর্তীগণ সে সুবিধা লাভ করবে আশা করা যায়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতিসাধনের চেষ্টা হচ্ছে। তোমরা আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করঁলে সে প্রয়াস সহজে সাফল্য লাভ করবে। আগেকার দিনে রাজারা ছিলেন দেশের হর্তাকর্তাবিধাতা। জনসাধারণকে তাঁদের কাছে নিজেদের দুঃখ-দুর্গতি দূর করা ও সুখসুবিধা বিধানের জন্য আবেদন জানাতে হত। কিন্তু এমনি ছিল তাঁদের মেজাজ আর দাপট যে ভয়েই লোকে কাছে এগোতে সাহস পেত না। তোমাদের সঙ্গে যেন আমাদের সে রকম সম্বন্ধ না হয়। আমাদের সম্বন্ধ হোক প্রীতির সম্বন্ধ, নিঃসংকোচ আলাপ-আলোচনা ও ভাববিনিময়ে সম্পর্ক হোক প্রগাঢ়—এই আমি চাই।

*　　　　*　　　　*

বক্তব্যের মধ্যে হাসিখুসীর আবহাওয়াটি জমিয়ে জওহরলাল তাঁর বক্তব্যকে মনোরম করে তুলেছিলেন। এদিকে এই সুযোগে কলাভবনের একজন প্রাক্তন ছাত্রী তুলি দিয়ে জওহরলালকে এঁকে নিলেন। সেই প্রায়ান্ধকার ঢাকা বারান্দায় নীচু স্বরে ধীরে ধীরে জওহরলাল কথা বলে চলেছেন, সবাই উৎকর্ণ হয়ে শুনছে, মাঝে মাঝে উছলে উঠেছে এক-একটি হাসির তরঙ্গ। না আছে সেখানে গুরুগম্ভীর মন্ত্রিত্বের আড়ম্বর, না আছে তার মধ্যে রাজনীতিজ্ঞের সচেনতা—এত বড় একটা দেশের প্রধানমন্ত্রীকে এমনভাবে একান্ত করে পাওয়া কম সৌভাগ্যের কথা নয়। মনে পড়ে প্রথমবার যখন জনপ্রিয় দেশসেবক জওহরলাল এসেছিলেন, আশ্রম ত্যাগের প্রাক্কালে এই বারান্দায় বসেই তিনি আশ্রমবাসীদের এমনি স্মিতহাস্যে কিছু বলেছিলেন। তাঁর পাশে বসেছিলেন নিরাভরণা খদ্দর-পরিহিতা শুচিস্মিতা কমলা নেহরু; আর সামনে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। দীর্ঘ কুড়ি বছর পরে আজ দেশ-বিদেশ-খ্যাত শ্রেষ্ঠ রাজনীতিজ্ঞ ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী হয়েও জওহরলাল তেমনি সাদাসিধে ভাবেই বারান্দায় বসে বিদেশী ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করলেন; আজকের দিনের কঠিন সমস্যা ও ভারতের ঐতিহ্যকে রক্ষার কথা প্রতিবেশীদেশ ব্রহ্ম, সিংহল, জাভা, ইন্দোনেশিয়া, আফ্রিকা এবং পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশ থেকে সমাগত ছাত্রছাত্রীদের কাছে অতি সহজ আলোচনায় বর্ণনা করে গেলেন। বিদেশী ছাত্রছাত্রীগণ অত্যন্ত প্রীতি লাভ করেছেন তাঁর সান্নিধ্যে এসে ও এই আলোচনা শুনে। ছাত্রছাত্রীদের একজন ছিলেন ইন্দোনেশিয়া-আগত ছাত্র শিক্ষাভবনের শ্রীজয়শীলন। জওহরলালের ভাষণটি উদ্দীপ্ত মুখে বলতে গিয়ে তিনি বললেন যে,—"গোটা বৈঠকের মধ্যে শ্রীনেহেরু একবারও 'ট্যাগোর' শব্দটি ব্যবহার করেন নি,—তিনি বরাবর প্রসঙ্গচ্ছলে শ্রদ্ধাভরে বলছিলেন 'গুরুদেব'। কথাটি বিদেশী ছাত্রটির কাছে বড়ো ভালো লেগেছিল বোঝা গেল।

* * *

এদিকে সমাবর্তনে ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত স্নাতকগণ বলছেন জওহরলালের সঙ্গে তাঁদের ছবি তোলার গল্প। শিল্পাচার্য ডঃ নন্দলাল বসু অসুস্থ ছিলেন। জওহরলাল তাঁর বাড়ী গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, এবং কলাভবনের স্নাতকগণ সেখানে জওহরলাল ও 'মাস্টারমশাই'র নন্দলাল (বসুর) সঙ্গে ছবি তোলেন। এদিকে বিদ্যাভবন ও সংগীতভবনের স্নাতকগণ আবেদন নিয়ে গেলেন যে তাঁরাও আচার্য ও বিভাগীয় অধ্যক্ষের সঙ্গে ছবি তুলবেন। জওহরলাল তৎক্ষণাৎ রাজি হলেন। বিদেশী ছাত্রছাত্রীদের সভা শেষ হতেই চলে এলেন বাইরে। উত্তরায়ণের সামনের রাস্তায়

স্নাতকগণ প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। জওহরলাল দ্রুতপায়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন—তোমরা কি অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছ?

*　　　*　　　*

সকলে বলে উঠল—না, না, বেশিক্ষণ নয়। উত্তর শুনে তিনি হেসে ছবি তুলতে বসে গেলেন। বিদ্যাভবন, সংগীতভবন ও বিদেশী ছাত্রছাত্রী সবার সঙ্গে তিনি ছবি তুলেছেন। একজন বিদেশী স্নাতকের ডিপ্লোমাতে নিজের নাম লিখে দিলেন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ মেননকে বিদেশী ছাত্রছাত্রীগণ ঘিরে ধরল, তিনি একজন নিগ্রো ছাত্রের প্রশ্নের উত্তরে আফ্রিকা সম্বন্ধে কিছু বললেন। আরেকটি নিগ্রো ছাত্র নিজের জাতীয় পোশাকে এসে খুব গম্ভীরভাবে শ্রীকৃষ্ণ মেননের ছবি তুলতে লাগল। মহাকৌতূহলী হয়ে হেসে কৃষ্ণ মেনন তাঁর কাছে এগিয়ে গেলেন, প্রীতিভরে তাঁর হাত ধরে নানারকম জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। ওদিকে উত্তরায়ণের গেটের সামনে তখন অগণিত জনতা ভেঙে পড়ে এ সব দৃশ্য দেখছে।

সন্ধ্যার পরে বাজি-পোড়ানো আরম্ভ হলে উত্তরায়ণের স্বেচ্ছাসেবী ছাত্রছাত্রী-দল মজা করে গিয়ে জওহরলালকে ধরলে—চলুন, বাজির মাঠে গিয়ে বাজি দেখবেন।

জওহরলাল বললেন—তবে আর লোকে বাজি দেখবে না, আমার দিকেই ঝুঁকে পড়বে।

একটি মেয়ে ভলাণ্টিয়ার বললে—ছদ্মবেশে চলুন।

জওহরলাল ঠাট্টা করে বললেন—কী বেশে, মেয়েদের পোশাক প'রে?

—না, বোরখা ঢাকা দিয়ে।

জওহরলাল হেসে বললেন—তবু আমাকে চিনতে পারবে। সকালে আজ আমার জন্য যে কষ্ট করে তোমরা জনতাকে নিয়ন্ত্রিত করেছ, আর সে ঝঞ্ঝাটের দরকার নেই। তার চেয়ে চলো সবাই গিয়ে ছাদে বসে বাজি দেখি আর গল্প করি।

*　　　*　　　*

ভলাণ্টিয়ার-দল প্রায় ঘণ্টা দু-আড়াই উত্তরায়ণের ছাদে বসে তাঁর সঙ্গে গল্পগুজব করল। ছোটো ছোটো মেয়ের একটি দল তো জওহরলালের সঙ্গে খেলাতেই মেতে উঠল।- মেলার থেকে কেনা একটি বাঁশের লাঠি নিয়ে একটি মেয়ে জওহরলালের আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। জওহরলাল হঠাৎ লাঠিটা কেড়ে নিয়ে তার মাথায় একটা ঠোকা দিয়ে দিলেন। শিশুটির হাতে ছিল মেলায়-কেনা একছড়া মালা; তা কেড়ে নিয়ে ওরই মাথায় পরিয়ে দিলেন। মেয়েটি আনন্দে

উৎফুল্ল হয়ে ছুটে পালিয়ে গেল। খানিকক্ষণ আর তাকে দেখা গেল না। কোত্থেকে আরেকটা লাঠি ও মালা যোগাড় করে সে এসে হাজির। লাঠি দিয়ে জওহরলালের হাতে তার যে লাঠিটা ছিল তাতে মারলে এক ঘা; জওহরলাল হেসে উঠলেন। মেয়েটি তখন তার হাতের মালা জওহরলালকে পরিয়ে দিল। তার পরে ছুটোছুটি লুকোচুরি খেলা শুরু করলে। জওহরলাল ভারী খুসী হয়ে উঠলেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন মাথার সমস্ত ভার নামিয়ে ফেলে তিনি এখানে অবসর যাপন করতেই এসেছেন। ১৯।১।১৯৫৫

৩০এ জানুয়ারী বিশ্বভারতীতে শহীদ-দিবস পালন করা হল। ভারত-সরকারের নির্দেশানুযায়ী ১১টা থেকে দু মিনিট সবাই নীরবতা পালন করেন। সান্ধ্য উপাসনার পরে চীন-ভবনে "ভারতে স্বাধীনতা-সংগ্রাম" নামে একটি আলোচনা-সভা আহূত হয়। শ্রীযুক্তপ্রবোধচন্দ্র সেন মশায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রথমে বিশ্বভারতীর প্রাক্তন কর্মী ও বর্তমানে ওয়ার্ধা-সেবাগ্রামের কর্মী আশা দেবী ও আর্যনায়কমের কন্যা সংগীতভবনের ছাত্রী মিতা আর্যনায়কম মহাত্মাজীর আশ্রম-গীত 'বৈষ্ণবজনো' সংগীতটি শোনালেন। তার পরে বিশ্বভারতীর বিভিন্ন বিভাগের ছাত্রছাত্রীগণ জওহরলাল, রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মাজীর লেখা থেকে ইংরেজী ও বাংলা গদ্যপদ্য রচনাংশ পাঠ করেন। সেই পাঠক্রম ১৮৫৭ সালের সংগ্রামকাল থেকে আরম্ভ ও ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা-লাভ অবধি ভারতের জাতীয় আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি সুস্পষ্ট চিত্র ফুটিয়ে তুলেছিল। শুধু তাই নয়, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্তর্নিহিত আদর্শটিও তা থেকে প্রকাশ পায়। সেই আদর্শের বিকাশ কীভাবে ঘটেছে এবং ভবিষ্যতে কোন্ পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে—সভাপতি ও প্রধান বক্তার বক্তব্যের মূল আলোচ্য বিষয় ছিল তাই।

'রবীন্দ্র-জীবনী'কার ও ঐতিহাসিক শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রধান বক্তারূপে তাঁর ভাষণে বলেন, মহাত্মাজীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তথা এই আশ্রমের যোগের কথা এবং সংক্ষেপে ভারতবর্ষের ধারাবাহিক স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসটি। তিনি বলেন—গান্ধীজী প্রথম শান্তিনিকেতনে আসেন ১৯১৫ সালে, সেই থেকেই আমাদের আশ্রমের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগ। প্রথম যখন আসেন তখন পর্যন্ত তিনি মহাত্মাজী হননি, মিঃ গান্ধী নামেই পরিচিত ছিলেন। সবে তখন দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে সত্যাগ্রহ চালিয়ে এসেছেন। ভারতবর্ষে কিছুমাত্র পরিচিত নন, একমাত্র গোখলে তাঁকে জানতেন। আর জেনেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। দক্ষিণ-আফ্রিকার সত্যাগ্রহের কথা শুনে আমাদের এই আশ্রম থেকে দুইজন সাহেব

এণ্ডরুজ এবং পিয়ার্সন ১৯১৩ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা যান সত্যাগ্রহ কী ব্যাপার তাই জানতে ও দেখতে। রবীন্দ্রনাথ তাঁদের মারফত প্রথম মহাত্মাজীকে আশীর্বাণী পাঠান। তার দু' বছর পরে গান্ধীজী তাঁর ফিনিক্স-স্কুলের ছাত্র ও কর্মীদলসহ ভারতে ফিরে আসেন। রবীন্দ্রনাথ সাদরে তাঁদের এ আশ্রমে স্থান দেন। প্রথমবার এখানে আসার দুদিন পরেই গোখলের মৃত্যু-সংবাদ শুনে মহাত্মাজী এখান থেকে চলে যান। পরে এসে কিছুদিন এখানে বাস করেন। সেই যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা হল, সে আর কোনোদিন বিচ্ছিন্ন হয়নি। রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সে যখন গান্ধীজী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন, তখন রবীন্দ্রনাথ একান্ত আশ্বাসে তাঁকে অনুরোধ করলেন এই বিদ্যালয়ের ভার গ্রহণ করতে। তিনি সে ভার গ্রহণ করেছিলেন এবং সে ভারই তিনি তাঁর উত্তরাধিকারীদের উপর চাপিয়ে দিয়ে গেছেন। আজকের দিনে মহাত্মাজীর সঙ্গে আমাদের এমন ঘনিষ্ঠতার কথা বিশেষভাবেই স্মরণীয়।

আজকে থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে ১৯০৫ সালে প্রথম স্বদেশী-আন্দোলন শুরু হয়। তার তারিখ হচ্ছে ৭ই আগস্ট। তার মূলে ছিল বিদেশী শাসকদের রোষাগ্নি ও কূট রাজনৈতিক কৌশল। বাঙলার ক্রমবর্ধমান শক্তিতে বিদেশী শাসক উদ্‌বিগ্ন হয়ে উঠল। বিদ্যায়-বুদ্ধিতে জ্ঞানে-কর্মে চিন্তাশীলতায় ও দেশপ্রেমে বাঙালী তখন উদ্‌বুদ্ধ হয়ে উঠেছে। তৎকালীন ভারতবর্ষের গভর্নর-জেনারেল লর্ড কার্জন ছিলেন ধুরন্ধর রাজনীতিজ্ঞ। তিনি বাঙলার শক্তি নষ্ট করবার অভিপ্রায়ে খড়্গ তুললেন। প্রথমে দৃষ্টি পড়ল বাঙলা ভাষার উপর। বাঙলার সীমানা তখন বহুদূরে বিস্তৃত ছিল—বিহার-উড়িষ্যাও তখন বাঙলার অন্তর্গত। প্রত্যেকের প্রাদেশিক ভাষায় সবাই সাহিত্য ও বিদ্যা চর্চা করবেন, এমনি একটা প্রস্তাব হল। দেশবাসীর তীব্র প্রতিবাদে সে সরকারী প্রস্তাব কার্যকরী হল না। তখন শ্যেন দৃষ্টি পড়ল দেশভাগের দিকে। পূর্ব বাঙলার ঢাকা, রাজসাহী ও চট্টগ্রাম বিভাগ আসামের সঙ্গে যুক্ত হবে, আর, প্রেসিডেন্সী ও বর্ধমান বিভাগ এবং বিহার-উড়িষ্যা নিয়ে হবে একটি নূতন প্রদেশ। এই বঙ্গ-বিভাগের প্রতিবাদেই ১৯০৫ সনে স্বদেশী-আন্দোলন শুরু হল। আমরা বলে বসলাম, "এ বিভাগ মানব না"। আরম্ভ হল বয়কট-আন্দোলন—বিলেতী-দ্রব্য বর্জন; গান হল—"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই।" বোম্বে মিল থেকে যে কাপড় তৈরি হয়ে এল সে চট-বিশেষ, তার পাড়ের রঙে কাপড় ছোপানো। তা-ই আমরা সাদরে গ্রহণ করলাম। তখনও খদ্দর প্রচলন হয়নি, কংগ্রেসেরও অস্তিত্ব ছিল নামমাত্র।

এই শুরু হল আমাদের স্বদেশী-আন্দোলন। সেই আন্দোলনের তীব্রতায় সেদিন ইংরেজ বাঙলা-ভাগ সম্পূর্ণ করে উঠতে পারেনি; সেটা করে গেল তারা ১৯৪৭ সালের ৭ই আগষ্ট। শুধু দেশ ভাগ নয়, হিন্দু-মুসলমানে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে বিভাগ করে গেল। কিন্তু সেদিন বিদেশী শাসকদের সঙ্গে আমাদের এই নিয়েই প্রত্যক্ষ-সংগ্রাম বেধে উঠেছিল।

পরিশেষে বক্তা ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ করে বিশেষভাবে বলেন—ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস সংক্ষেপে বলবার নয়, এক-দিনেও সে আলোচনা সারা হয় না। তোমরা যারা নূতন ভারত-রাষ্ট্র গঠনের দায়িত্ব নিয়ে এসেছ, যারা নূতন প্রেরণায় নূতন সংগ্রামে দেশকে গড়ে তুলবে, তারা আগে ভালভাবে জেনে নেবে অতীতের এই স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস; নয়তো তোমরা অগ্রসর হবে কোন্ পথে? জানতে হবে অতীতে দেশনেতারা কোন্ আদর্শ নিয়ে এগিয়ে ছিলেন, কী ভুল-ভ্রান্তির জন্য এক-একটি আন্দোলন সফল হয়নি, কেমন করেই বা ভারতের এতদিনের সংগ্রাম জয়যুক্ত হল, বিদেশী দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হল।

এর পরে সভাপতি মশায় তাঁর ভাষণে বলেন—আজ ত্রিশে জানুয়ারী, মহাত্মাজীর মৃত্যুদিন। এইদিন ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের আলোচনা-সভা ডাকা হয়েছে। কিন্তু তাঁর স্বাধীনতা-সংগ্রামের আদর্শ বৃহত্তর; মহাত্মাজীর স্বাধীনতা-সংগ্রামও তাঁর জীবনের একমাত্র আদর্শ নয়। স্বাধীনতা-সংগ্রাম তাঁর জীবনে গৌণ। মহাত্মাজীর জীবনব্রত হচ্ছে বিশ্বজনীন-মানবতার সাধনা। তাই আজকেই ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের আলোচনা করার যে বিশেষ কোনো সার্থকতা আছে তা নয়।

ভারত-সরকারের নির্দেশটিও আমার ভালো লাগেনি। আজ ভারতবর্ষব্যাপী ১১টা থেকে দু'মিনিট নীরবতা পালন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ যেন জোর করে চাপানো। ভারতের নমস্তগণ প্রাতঃস্মরণীয়। ঘুম ভেঙেই মনে হওয়া উচিত আজ ত্রিশে জানুয়ারী, শহীদদের স্মরণ-দিবস। তখনই শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা উচিত। ১১টার সময় মৌন অবলম্বন করার কী কারণ জানিনে। তা ছাড়া শ্রদ্ধা করবার উপায়—মহাপুরুষদের জীবনের আদর্শকে আমাদের জীবনে গ্রহণ করা। তাতেই তাঁদের আত্মার পরিতৃপ্তি ঘটে। তর্পণ মানে তৃপ্তি-দান। একদিন মাত্র মালা-চন্দন দিয়ে ফটো বা মূর্তিকে শ্রদ্ধা করলেই কি তাঁরা সে তৃপ্তি পাবেন?

সভাপতি মশায় ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্য করে বলেন—প্রভাতবাবু তোমাদের যে কথা বললেন তা অত্যন্ত মূল্যবান। একদিনের আলোচনায় ভারতের

স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস আলোচনা শেষ হতে পারে না। তোমরা নিজেরা যত্ন করে সে-ইতিহাস নিশ্চয় জানবে, তাতে তোমাদের অগ্রগতির পথ সহজ হবে, নূতন পথ খুলে যাবে। তোমরা এ ইতিহাস আলোচনা করলেই বুঝতে পারবে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সঙ্গে অন্যান্য দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের পার্থক্য কোথায়? ইউরোপ আমেরিকায় বহু দেশ স্বাধীন হয়েছে, তার জন্যে তাদের কম সংগ্রাম করতে হয়নি। কিন্তু ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের আদর্শ শুধু পরাধীনতা থেকে মুক্তি পাওয়া নয়, সমগ্র দুর্গত লাঞ্ছিত মানব-জাতির মুক্তির বাণী বেজে উঠেছে তার মধ্যে; মানব-জাতিকে নিজের হিংসা-বিদ্বেষের গ্লানি থেকে মুক্ত করাই তার আদর্শ। আমাদের দেশে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করা হয়েছে, সম্পূর্ণ নূতন এক টেকনিকে। চির-পুরাতন অহিংসা ও বিশ্বমানবতার বাণী বহু আগেই আমাদের দেশে উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু মহাত্মাজী এসে তাকে ব্যাপক রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলেন। তবে রাম না জন্মাতেই রামায়ণ-গান রচিত হয়েছে। মহাত্মাজী এদেশের রাজনীতিতে যোগদানের আগেই এই নূতন টেকনিকের বাণী ভারতের মহাকবি রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। শুধু রবীন্দ্রনাথ নয়, বাঙলার কবি সত্যেন্দ্রনাথও তাঁর দূরদৃষ্টিতে নূতন নাট্য শুরু হবার আভাস পেয়ে লিখলেন—'সাগরপারে গান্ধী করে জাতীয়তার নান্দী পাঠ'। তিনি বুঝেছিলেন সাগরপারে যে নাট্য শুরু হল, অচিরে তা ভারতময় ছড়িয়ে পড়বে। রবীন্দ্রনাথের 'ধনঞ্জয় বৈরাগী'র জীবন্ত রূপ নিয়ে আবির্ভূত হলেন মহাত্মাজী। সেই মহাত্মার মহৎ ব্রতকে আমরা আমাদের চিত্তের কলুষ দ্বারা সংশয় ও বিদ্বেষের বিষ দ্বারা বিনষ্ট করেছি। এরও আভাস রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শিশুতীর্থ' কবিতায় বহু আগেই দিয়ে গেছেন। 'শিশুতীর্থে' নেতাকে যেমন ভাবে মারা হয়েছে, ঠিক সেইভাবেই যে মহাত্মাজীর জীবনহানি ঘটবে, একি আমরা কখনোই জানতাম! কিন্তু তাই ঘটল। আমরা এখন অন্ধকারের মধ্য দিয়ে চলেছি, চেয়ে আছি নূতন সাধকের আবির্ভাবের দিকে। সে-নেতা আসবেন তাও মহাকবি লিখে গেছেন 'শিশুতীর্থে',—তিনি মৃত্যুঞ্জয়। ধনঞ্জয়ের পরে সেই মৃত্যুঞ্জয়ের প্রতীক্ষাতেই আমরা এই সংশয়াকুল অন্ধকার পার হব। ৬।২।১৯৫৫

দু'মাস কাল বিশ্বভারতীর সংগীত-ভবনের হিন্দুস্থানী-সংগীতের অভ্যাগত অধ্যাপকরূপে (ভিজিটিং প্রফেসর) শান্তিনিকেতনবাস সমাপ্ত ক'রে সংগীতাচার্য শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ক'দিন আগে সশ্রদ্ধ সম্বর্ধনা নিয়ে চলে গেলেন। এখানে থাকাকালীন সংগীত-ভবনে কয়েকটি আসরেই তিনি তাঁর স্ত্রী ও

শিশুকন্যাটিকে নিয়ে নানা রাগরাগিণী ও তাদের ব্যাখ্যাযোগে ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরি ও টপ্পার বিচিত্র রূপ বিস্তার করে সমবেত শ্রোতাদের শুনিয়েছেন। এমন কি, বিনয়-ভবনে, শ্রীনিকেতনে এবং উত্তরায়ণেও তিনি আসর জমিয়েছিলেন কয়েকদিন। মূল রাগটি শুনিয়ে পাশে-পাশে রাগভাঙা রবীন্দ্র-সংগীতের রূপটিও তিনি মাঝে মাঝে গেয়ে কবির অপূর্ব সৃজনবৈচিত্র্য বুঝবার সুযোগ দিয়েছেন। অশীতিপ্রায় বৃদ্ধের শ্রান্তিহীন কণ্ঠলীলা আশ্চর্যজনক, তাঁর সাম্প্রতিক মাধুর্যও অনুভবযোগ্য। তিনি সারাদিন গানের সাধনায় আত্মনিমগ্ন থাকতেন। শিশু, যুবা, ছাত্রছাত্রী, অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা যে-কেহ যখনই তাঁর কাছে গেছেন, সকলকেই তিনি সাদরে তাঁর শিক্ষাদানের সদাব্রতে টেনে নিয়েছেন, আর সুরের ঐশ্বর্য অকাতরে দান করে গেছেন। এই ঔদার্য ও আন্তরিকতার গুণেই বিশেষভাবে তিনি আশ্রমে স্মরণীয় থাকবেন। ২৫।৩।১৯৫৬

গত ৩রা জুন থেকে অস্থায়ী উপাচার্য শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর কার্যকাল শেষ হয়েছে এবং বিশ্বভারতী-সংসদ থেকে স্থায়ী উপাচার্য মনোনীত হয়েছেন অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু। ১৯৫১ সালে বিশ্বভারতী স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় রূপে গণ্য হবার পরে বছর-দুই শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর উপাচার্যপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তিনি পদত্যাগ করলে ন' মাসের জন্য শ্রীক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী এই দায়িত্ব বহন করেন। ১৯৫৪ সালে স্বর্গত ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী ছয় বৎসরের জন্য স্থায়ী উপাচার্যের পদে নিযুক্ত হন। তারপরে বছর দেড়েক অবধি একনিষ্ঠভাবে তিনি নিজ কর্তব্য পালন করেন। যাঁরা বিশ্বভারতীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন বা এর সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু তাঁরাই জানেন যে, ডঃ বাগচী কতখানি সহৃদয়তা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে বিশ্বভারতীর উন্নতিসাধনে তৎপর হয়ে উঠেছিলেন। আকস্মিক মৃত্যুতে তাঁর কাজ অসমাপ্ত রয়ে গেল। কিঞ্চিদধিক দুই মাসের জন্য শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী এ দায়িত্ব পালন করলেন। এ ক' বছর যাঁরা বিশ্বভারতীর উপাচার্য নিযুক্ত হয়েছেন তাঁরা প্রত্যেকেই এর সঙ্গে শান্তিনিকেতনবাসী হয়ে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। এই প্রথম একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এ পদে মনোনীত হলেন যিনি এর আগে শান্তিনিকেতনে বাস করেন নি,—বিশ্বভারতীর সঙ্গে কার্যত তেমনভাবে ঘনিষ্ঠ হবারও যাঁর সুযোগ হয়নি এবং সাধনাও যাঁর বিশ্বভারতীর ভাবপ্রধান সাধনধারার সম্পর্কে পূর্ববর্তী অন্যদের চেয়ে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র রকমের। সাহিত্য দর্শন শিল্পকলা চর্চাদি এবং বিজ্ঞানচর্চা বাইরের দিক থেকে পরস্পর দুটি বিভাগ সমপন্থী না হলেও একটি আরেকটির পরিপন্থী নয়। বরঞ্চ আজকের যুগে দুয়ের সমন্বয়ে শিক্ষার সর্বাঙ্গীণতাই আকাঙ্ক্ষিত। রবীন্দ্রনাথ

তথাকথিত বৈজ্ঞানিক না হয়েও বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন ছিলেন, বিজ্ঞানে তাঁর প্রগাঢ় অনুরক্তি ছিল—তা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর বিশ্লেষণভঙ্গি, বাস্তব তথ্যের প্রতি নিষ্ঠা, এমন কি শেষ-বয়সে মনোরম বিজ্ঞানগ্রন্থ 'বিশ্বপরিচয়' রচনা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে। বিশ্বভারতীতে বহুদিন পূর্বে 'রাজশেখর বিজ্ঞান সদন' স্থাপিত হয়েছে, কলেজের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের বিজ্ঞান সেখানে পঠিত হয়ে থাকে। এককালে রবীন্দ্রনাথের পরম বন্ধু ছিলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু এবং তাঁরই নামে 'কথা ও কাহিনী' তিনি উৎসর্গ করেন। ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসুও রবীন্দ্রনাথের বিশেষ অনুরক্ত ও প্রিয়পাত্র ছিলেন। 'বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থখানি তাঁরই নামে কবি উৎসর্গ করে যান। রবীন্দ্রনাথ বর্তমান থাকতে, এবং তাঁর মৃত্যুর পরেও সত্যেন্দ্রনাথ বসু আশ্রমে যাতায়াত করেছেন এবং এই প্রতিষ্ঠানটির প্রতি আন্তরিকতা তাঁর সর্বদা জাগরূক রয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে স্থানিকভাবে সংশ্লিষ্ট না থাকলেও, পূর্ব থেকে কর্ম-সমিতি, শিক্ষা-সমিতি, সংসদের পরিচালক-সমিতির সদস্যরূপে তিনি এর অন্যতম হিতৈষী আছেন। বৃত্তিগতভাবে না হোক, স্বভাবগত অনুরাগে সাহিত্য, বিশেষত রবীন্দ্র-সাহিত্য-চর্চায় এবং বেহালাবাদনেও আচার্য বসু মহাশয়ের অভিনিবেশের কথা সুবিদিত। সুতরাং শান্তিনিকেতনের লোক তিনি অন্তর থেকেই। উপাচার্যপদের জন্য যোগ্য ব্যক্তির নামই নির্বাচিত করে গিয়েছেন ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী এবং বিশ্বভারতী-সংসদ তাঁর অভিলাষ পূর্ণ ক'রে তাঁর সম্মান অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। সকলেই আশা করছেন দীর্ঘদিন এই পদে প্রতিষ্ঠিত থেকে অধ্যাপক বসু নানা বিষয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি করতে সক্ষম হবেন! এই কামনা মনে নিয়ে সানন্দে আমরাও শ্রদ্ধেয় উপাচার্যকে তাঁর নূতন কর্মক্ষেত্রে স্বাগত জানাচ্ছি। ১১।৬।১৯৫৬

ইংরেজী বছরের প্রারম্ভেই বিশ্বভারতীর একটি আনন্দের উপলক্ষ বিশেষভাবে এবার থেকে বেড়েছে—নূতন উপাচার্য শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের শুভ জন্মতিথি পয়লা জানুয়ারী হওয়াতে। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ঐ তারিখেই তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বিজ্ঞানানুগত ব্যবস্থায় জীবনকে সুবিন্যস্ত করে মহৎ ভাবের উত্তুঙ্গ শিখরে উন্নীত করবার সাধনায় শিক্ষার্থী-সমাজকে পরিচালিত করতে আচার্য নিয়ত সাহায্য-তৎপর রয়েছেন বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় আসনে উপবিষ্ট থেকে। প্রতিষ্ঠাতা রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য, দর্শন, শিল্প-কলা সংগীত ইত্যাদির সঙ্গে বিজ্ঞানেরও সুষ্ঠু সমাবেশে বিশ্বভারতীতে সর্বাঙ্গীণ সাংস্কৃতিক ঐক্যের একটি আন্তর্জাতিক নীড় গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, সাধ্যমতো সেদিকে কিছু-কিছু কাজের তিনি সূচনাও করে

গিয়েছেন। তাঁর পরম প্রীতিভাজন এই জ্ঞানতপস্বীর ঐকান্তিক আয়াসে এতকাল পরে সেই বিজ্ঞানের দিকটির অনুশীলনও পরিপুষ্টি লাভ ক'রে প্রতিষ্ঠানটিকে আধুনিক কালের প্রয়োজনীয় পরিণতিতে পূর্ণাঙ্গতর করে তুলবে আশা করা যায়। একাধারে ভাবুক ও বৈজ্ঞানিক হওয়ায় কবির উদার ভাবধারাকে বিচিত্র কর্মের মধ্যে বহু দেশ ও জাতির সমবায়ে রূপায়িত করবার দৃষ্টি ও প্রবণতা তিনি লাভ করেছেন একরূপ সহজভাবেই। শুধু ভারত বা এশিয়ার বিশেষ সীমার ঐক্য সাধন নয়; বিশ্বের যে-কোনো অঞ্চলের যে-কোনো মানুষই তার আপন ঘর ও আপনার লোক বলে পরস্পরের মনে যাতে পরস্পরকে গ্রহণ করতে পারে;—তারই অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষেত্র বলে তিনি বিশ্বভারতীকে জেনে এসেছেন,—এবং সে রকম করেই একে তিনি প্রসারিত করবার পরিকল্পনায় আত্মনিয়োগ করেছেন;—এই স্বচ্ছ ভাবগ্রাহিতা-শক্তিই তাঁকে রবীন্দ্র-অনুভবের যথার্থ উত্তরাধিকার দান করেছে এ কথা নিঃসংশয়েই বলা যেতে পারে। কর্মীদের তিনি বলেন,—আপনারাই কাজ চালাবেন, আমাকে জানবেন বন্ধু বলে, আবশ্যক-বিষয়ে পরামর্শ করা যাবে, অভাব-অভিযোগ থাকে,—নিশ্চয় জান্‌বেন দুয়ার খোলা। আসার মুখেও আমাকে অনেকে বলেছিলেন, এখানে এসে কী করব! অবসর-জীবনের সঙ্গী আপনারা। সকলকে নিয়ে দেখা যাক ক'টা দিন কী করতে পার যায়। এতদিন বিজ্ঞান-সেবার ফাঁকে ফাঁকে যে অভাবটা বোধ করা গেছে,—এখানে এসে পুষিয়ে নেবার চেষ্টা করব সেই সাংস্কৃতিক-অনুশীলনের অপেক্ষাকৃত অপরিণত দিকটা। মানুষের উদ্ভব, তার সভ্যতার অভিযান,—মহেঞ্জোদাড়ো, হরপ্পার পথে পথে পড়ে-থাকা নব রূপকথার উপকরণগুলি,—যুদ্ধ, রাজ্যাধিকার, ধর্মপ্রচারের পাশাপাশি সাহিত্যে-শিল্পে-দর্শনে নানা দেশের মানুষে-মানুষে ভাব-বিনিময়ের বিচিত্র রহস্যাবলী—এ সবই এক অপূর্ব আকর্ষণে মুগ্ধ করে, সবই আমার জানতে ইচ্ছা হয়,—দেখি,এখানকার কাজের যোগে যদি সে ক্ষুধা কিছুটা মেটে,—তবে,—সেও তো একটা মস্ত লাভ। সুতরাং এখানে আসাটা কেবল নিঃস্বার্থ নিরাসক্ত পরার্থেই ঘটেছে এমন নয়,—বস্তুত সকলের যোগেই আমরা সকলে সার্থক হব; বস্তু-প্রকৃতি ও মানব-প্রকৃতি—দুয়ের যোগেই সংসারকে সম্পূর্ণ করে পাওয়াতে হল বিশ্বভারতীর সাধনার পরিপূর্ণতা। এখানে চীনা-ভবনের মতো নানা দেশেরই সংস্কৃতি-কেন্দ্র হয়ে নানা ভবনের প্রতিষ্ঠা হলে "বোলপুরের মাঠে" বিশ্ব এসে মেশবার সুযোগ পাবে। —এ শুধু কবির স্বপ্ন নয়, কবি যে বাস্তবেও তার সূচনা করে গেছেন; আয়োজন সম্পূর্ণ করে তোলাই আমাদের প্রধান কাজ। অতীতের জাতিসংঘ বা আজকের

বিশ্বরাষ্ট্র সংস্থার তুলনায় সাংস্কৃতিক এর কর্মপন্থায়ও শান্তি ও সৌভ্রাত্র প্রসারের সম্ভাবনা রয়েছে নেহাত কম নয়। গুরুদেবের ন্যস্ত সেই মহান দায়িত্বের কথা যেন আমরা সর্বদাই মনে রাখি। এ কাজে বাইরের সঙ্গে মিলতে গিয়ে আমরা ঘরের কথা আবার ভুলে না যাই! বিদেশে বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক-পণ্ডিতদের সম্মেলনে গিয়ে শুনে আসা গেল সেদিন এক অদ্ভুত তথ্য। কথাপ্রসঙ্গে এক প্রবীণ সভ্য বললেন,—এদেশের একটি বৈশিষ্ট্যের কথা। আধুনিক সভ্যতায় অভ্যস্ত আমরা উঠতে-বসতে স্মরণ ক'রে থাকি পাশ্চাত্যের উত্তমর্ণতা; কত-কিছু শিক্ষার জিনিস তাঁদের কাছ থেকে পাওয়া গেছে তাই কিনা রক্ষা! কিন্তু তাঁরাও যে আবার আমাদের ঋণ-স্বীকারে শ্রদ্ধানত হবেন, এ দৃশ্য চোখে না দেখলে, কানে না শুনলে সহসা বিশ্বাস করতে একটু বাধে বৈকি! যে-জিনিসকে সাধারণত আমরা কুসংস্কারের কোঠায় ঠেলে রাখি, বৈজ্ঞানিক সাহেব একজন আমাদের সেই নিত্যনিয়মিত অবগাহন-স্নান ও ধোয়া-মোছার অভ্যাসটিরই উল্লেখ করলেন বিশেষভাবে। শুদ্ধাচারের শিক্ষা নাকি তাঁরা আমাদের কাছ থেকেই পেয়েছেন। জাহাজে ক'রে লোনা-সমুদ্রজলে-ঘেরা স্নানবিরহিত আদি পাশ্চাত্য বণিক দল প্রথম যখন ভারত-উপকূলে নেমে মানুষের স্নান-আচমন-প্রক্ষালনের পবিত্র প্রক্রিয়াটি নিরীক্ষণ করলেন, তখন থেকেই তাঁরা ক্রমে অনুসরণ করে চলেছেন এদেশীয় অঙ্গধৌতির। সাহেবের কথা শুনে নূতন ক'রে চোখ ফিরিয়ে আমাদের দেখতে হল। কোথায় আমরা সত্যি বড়,—সে আত্ম-পরিচয়েরও দরকার আছে বিলক্ষণই। অবশ্য, সে সঙ্গে এও জানা চাই, রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত এই বিশ্বভারতীর সাধনা সীমাবদ্ধ নয়, কোনো বিশেষ কালের বিশেষ দাবিতেই। কালে-কালের নানা প্রবর্তনার সংগতি-সাধনই এর শাশ্বত লক্ষ্য।—আচার্যের (৬৩) তেষট্টিতম জন্মতিথিতে স্বাস্থ্য ও স্বস্তিসমৃদ্ধ শতায়ু কামনা ক'রে, তাঁর ভাষণসমূহের মধ্য থেকে সারমর্মস্বরূপ উপরোক্ত কথাগুলি যথাসম্ভব স্মরণে এনে শ্রদ্ধা নিবেদন করা গেল। ১৮।১।১৯৫৭

এসঙ্গে একটি বেদনার কথাও এসময়ে মনে জাগে। বছর ঘুরে এল, এই জানুয়ারি মাসেই (১৯ তারিখে) ঘটেছিল পূর্বতন শ্রদ্ধেয় উপাচার্য 'বাগচী মশায়' (প্রবোধচন্দ্র বাগচী)-এর পরলোকপ্রয়াণ। তিনি যে জনপ্রিয়তা, আদর্শনিষ্ঠা এবং কর্মানুরক্তির মান স্থাপন করে গেছেন, বিশ্বভারতীর মণি-ভাণ্ডারে পরবর্তীদের জন্য তার ইতিহাস এক অমূল্য সম্পদরূপে বিরাজিত থাকবে। তাঁর পরিকল্পিত ও প্রারম্ভিক কাজের মধ্যে অসমাপ্ত রয়েছে প্রায় সবগুলিই, যথাসম্ভব একে-একে সেগুলির পূর্ণতা সাধনের দিকেও সশ্রদ্ধ দৃষ্টি নিয়ে কর্তৃপক্ষ সক্রিয় রয়েছেন।

এরূপ দু'একটি কাজের উল্লেখ এসময়ে করবার সুযোগ ঘটায় তাঁর স্মৃতি-তর্পণের বেলায় কিছু সান্ত্বনার কারণ হল। বিশেষ করে তিনিই প্রবর্তন করেছিলেন বিশ্বভারতী-বিদ্যাভবন থেকে বাংলায় "সাহিত্য-প্রকাশিকা"—গ্রন্থমালা, ইংরেজীতে "বিশ্বভারতী অ্যানাল্‌স্" এবং চীনভবন থেকে "সাইনো ইণ্ডিয়ান স্ট্যাডিজ"-এর প্রকাশনা। "সাহিত্য-প্রকাশিকা-গ্রন্থমালায় বিশ্বভারতীর সংগৃহীত অপ্রকাশিত বাংলা প্রাচীন-পুঁথি সম্পাদিত হইয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশিত" হওয়ার কথা। 'বাগচী-মশায়'-এর সম্পাদনায় তার প্রথম খণ্ডটি বেরিয়েছিল, তারপরে বৎসরান্তে সম্প্রতি বেরল,—'দ্বিতীয় খণ্ড—' (শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লী)। বিদ্যাভবনের কৃতবিদ্য উপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মণ্ডল নূতন ক'রে সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছেন। তাঁর পরিচালনায় সম্পাদিত "বিশ্বভারতী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বাংলা বিভাগের প্রথম ছাত্রদের অন্যতম" শ্রীযুক্ত দুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ-এর গবেষণালব্ধ ফল আহৃত হয়েছে "শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লী"—নামক প্রাচীন পুঁথির এই সুমুদ্রিত সংস্করণের অর্ঘপুটে। আদি গ্রন্থখানি হচ্ছে শ্রীরূপ গোস্বামী কৃত সংস্কৃত "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু"—যার রচনাকাল ১৫৪১ খৃষ্টাব্দ। 'বৈষ্ণব পদকর্তা রসময় দাস সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে এই গ্রন্থের ভাবানুবাদ' করেছিলেন। বর্তমানে মুদ্রিত এই "শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লী" বিভিন্ন নামে অনূদিত উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গে প্রাপ্ত সেই ভাবানুবাদের 'সকল পুঁথিরই সম্পাদিত রূপ'। ভূমিকা, পুঁথির পাঠ এবং নির্ঘণ্টাদি সহ (৬৪+৮৩=১৪৭) প্রায় দেড়শ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত গ্রন্থখানি সমাপ্ত হয়েছে। এই সঙ্গে উল্লেখিতব্য, "বিশ্বভারতী অ্যানাল্‌স"-এর প্রকাশনাও চলবে এবং শীঘ্রই 'সাইনো ইণ্ডিয়ান্ স্টাডিজ'-এরও পরবর্তী সংখ্যা বেরবার ব্যবস্থা হয়েছে। নবনির্বাচিত উপযুক্ত সম্পাদক-সংঘ কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে সেটি আত্মপ্রকাশ করবে, চীনাভবনের ভিজিটিং প্রফেসর প্রাচ্য-সংস্কৃতিতে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ প্রামাণ্যপণ্ডিত ডঃ ওয়াল্টার লিবেন্থালের সপ্ততিবার্ষিক জন্মতিথি-উদ্‌যাপনের উপলক্ষে শ্রদ্ধার্ঘ-সংখ্যারূপে। 'বাগচী মশায়ে'র লিখিত, প্রকাশিত এবং বহু অপ্রকাশিত ও অসমাপ্ত মূল্যবান রচনাদিও সংগৃহীত ও সম্পাদিতরূপে যাতে খণ্ডে খণ্ডে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশ পায়, এজন্যও একটি আন্তর্জাতিক ধরনের পণ্ডিত-মণ্ডলীর উপর ভার অর্পণ করা হয়েছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যে-কয়টি কাজে বিশ্বভারতীর বৈশিষ্ট্য বিশেষ ক'রে নির্দেশ করেছেন, 'বিদ্যাভবনে'র থেকে প্রাচ্য-প্রতীচ্য সংস্কৃতির গবেষণা দ্বারা বিবিধ রত্নোদ্ধারের কাজটি তার মধ্যে অন্যতম। 'সাহিত্য-প্রকাশিকা' অ্যানাল্‌স বা 'সাইনো ইণ্ডিয়ান স্টাডিজে'র প্রবর্তনা-মূল্য সেদিক দিয়ে

খুবই প্রণিধানযোগ্য। এই কয়টি গ্রন্থমালারই মূল প্রাপ্তিস্থান হচ্ছে বিশ্বভারতী পাব্‌লিকেশন্‌স্ ডিপার্টমেণ্ট। পূর্বতন উপাচার্য ডঃ বাগচীর প্রবর্তিত আরেকটি সংস্থা, উপরোক্ত পাব্‌লিকেশন্‌স্ বিভাগটি। শান্তিনিকেতনে সেটি অবস্থিত। তার পরিচালনায় প্রথম থেকে ব্রতী রয়েছেন 'বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস'-গ্রন্থের লেখক শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য। বিভাগটিতে তাঁর তত্ত্বাবধানে নিয়মিত নানা পুঁথিপত্র বেরবার ব্যবস্থা হয়ে থাকে,—বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা-গ্রন্থগুলি এবং সাময়িক বিজ্ঞপ্তি, নিয়মাবলী, কার্যবিবরণী ইত্যাদির প্রকাশ ও বিলি-ব্যবস্থা সবই তার অন্তর্গত। ইংরেজি ভাষায় মুদ্রিত বিশ্বভারতীর পত্রিকাগুলিরও যাবতীয় কাজ চলছে এ বিভাগ থেকেই। ২৮।১।১৯৫৭

শ্রীযুক্ত নিতাইবিনোদ গোস্বামী—সচরাচর যিনি আশ্রমে 'গোঁসাইজি' নামেই সমধিক খ্যাত—১৯২০ সনে বিশ্বভারতীর স্থাপনকাল থেকেই এখানে এসে শান্তিনিকেতনের লোক হয়ে আছেন। বাংলা, সংস্কৃত এবং বিশেষ ক'রে পালিভাষা ও বৌদ্ধ-সাহিত্যে তাঁর অধিকারের কথা শান্তিনিকেতনে শ্রদ্ধার সঙ্গে আলোচিত হয়ে থাকে কবির কাল থেকেই। সিংহলে গিয়ে ইনি বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। কবির কাছে তাঁর বিশেষ সম্মান ও সমাদর ছিল বরাবর। শ্রীমৎ অদ্বৈতাচার্যের বংশধর হয়ে, শুধু বৈষ্ণবশাস্ত্র নয়, সকল ধর্ম, এবং শুধু সাহিত্য নয়, বিজ্ঞানাদি নানা বিষয়ে তাঁর অপূর্ব অভিনিবেশ এই পরিণত-বয়সেও সমান অক্ষুণ্ণ রয়েছে। সংগীত, চিত্রকলা এবং অভিনয়েও তিনি একজন গুণী ও সমঝদার ব্যক্তি। আশ্রমের সাধারণ জনসেবার আহ্বানে তিনি যুবজনোচিত উৎসাহে আজো নানাসময়ে অগ্রসর হয়ে যোগদান করে থাকেন। সর্বাঙ্গীণ এই অনুরাগটিই শান্তিনিকেতনের বিশিষ্ট দান। সেই মহৎ চিত্ত-ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়ে মেলামেশার সহজ আনন্দে ছেলে-বুড়ো সকলেরই তিনি আপন-জন;—শান্তিনিকেতনের পুরোনোদিনের লোকদের মধ্যে তিনি অন্যতম বটে বয়সে,—কিন্তু রম্যরুচির সরসতায় আধুনিকদেরও যে তিনি হার মানান,—তা মিথ্যে নয়,—অধ্যাপকমহলে তিনি প্রবীণতম। এই পক্ককেশ জ্ঞানসাধক অধ্যাপকের একখানি সুন্দর প্রতিকৃতি এঁকেছিলেন কলাভবনের পাঠসমাপনকারী ছাত্র শ্রীহরিপদ মাইতি। গোঁসাইজির সেই ছবিখানি পাঠভবনে সংরক্ষণ করবার উপলক্ষে ইতিমধ্যে গত ৮ই জুলাই অপরাহ্নে পাঠকক্ষে একটি সভা হয়। সে-সভায় উপাচার্য শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু পাঠভবনের ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট গোঁসাইজির প্রাজ্ঞতা ও আশ্রমসেবার বিষয় আলোচনা করে পাঠভবনে এখন থেকে বিশিষ্ট-এরূপ-আশ্রমসেবকদের চিত্ররক্ষার এক পরিকল্পনার কথা ব্যক্ত করেন। পরে, সংস্কৃতের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত

নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীও গোঁসাইজির আশ্রম-জীবন ও গুণাবলী সম্বন্ধে একটি স্বরচিত রচনা পড়ে শোনান। গোঁসাইজির মতো পণ্ডিত, রসিক ও আশ্রমাদর্শনিষ্ঠ উদার ধর্মানুরাগী হয়ে ছাত্রছাত্রীগণ যাতে আজীবন শান্তিনিকেতনের শিক্ষা সার্থক করে চলে এবং অনুরূপভাবে অন্যান্য আদর্শ শিক্ষকদের কথাও যাতে তারা স্মরণে রেখে অনুপ্রাণিত হয়—উপাচার্য মহাশয়ের আন্তরিক এই সদিচ্ছাটির প্রকাশ থেকে স্বতঃই মনে পড়ে শিক্ষক-সম্বন্ধে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের সেই বাণী:—"যিনি জাত-শিক্ষক ছেলেদের ডাক পেলেই তাঁর আপনার ভিতরকার আদিম ছেলেটা আপনি ছুটে আসে। মোটা গলার ভিতর থেকে উচ্ছুসিত হয় প্রাণে-ভরা কাঁচা হাসি।"

"শ্রদ্ধা না পাইলে শিক্ষক মানুষ না হইয়া মাষ্টার-মশায় হইতে চায়; তখনি সে আর প্রাণ দিতে পারে না কেবল পাঠ দিয়া যায়।"

"বর্তমান কালে আমাদের দেশের শিক্ষায় সেই গুরুর জীবনই সকলের চেয়ে অত্যাবশ্যক হইয়াছে।......আমাদের সমাজ-ব্যবস্থায় আমরা সেই গুরুকে খুঁজিতেছি যিনি আমাদের জীবনকে গতিদান করিবেন; আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় আমরা সেই গুরুকে খুঁজিতেছি যিনি আমাদের চিত্তের গতিপথকে বাধামুক্ত করিবেন।" ১৮।৭।১৯৫৭

মহিলা-সমিতি

১০ই জানুয়ারী একটি ঘরোয়া-বৈঠক জমল উত্তরায়ণের সামনের হল-ঘরে। "শান্তিনিকেতন মহিলা সমিতি"র বিশেষ অধিবেশন।—বক্তা ছিলেন শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায়। তিনি বললেন,—সাধারণত আমি সাহিত্যের বিষয় ছাড়া অন্য বিষয়ে বলি না, সেটা আমার পক্ষে অনধিকার-চর্চা মনে করি। কিন্তু মহিলারা বলেছেন, সামাজিক বিষয় নিয়ে কিছু বলতে। সমাজে মহিলাদের স্থান ও মূল্য সম্বন্ধেই কিছু বলব স্থির করেছি। আমার পঞ্চাশ বছরের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাতেই কত পরিবর্তন দেখলাম আমাদের দেশের মহিলা-সমাজের। এই পঞ্চাশ বছরে আমাদের সমাজের, বিশেষ করে মহিলাদের যতটা রূপান্তর ঘটেছে এমন এর আগে কখনোই ঘটেনি। পঞ্চাশ বছর আগে সমাজে নারীর মূল্য ছিল একমাত্র মা হওয়াতে, সম্মান পেত সে মেয়ের মা ব'লে নয়, ছেলের মা ব'লে। যত বেশী ছেলে হত তার তত আদর বাড়ত শ্বশুর-শাশুড়ীর কাছে। কারণ ছেলেদের উপার্জনের উপর নির্ভর করত সংসার, মা বাবা ভাইবোন বিধবা অনাথা পিসিমাসীদের ভরণপোষণ। এদিকে অল্প বয়সে মেয়েদের বিয়ে না দিলে চলত না।

সমাজে নানা বিষয়ে ছিল আঁটাআঁটি বাঁধন। মেয়ে কম হওয়াটাই কামনা করা হত। তখন সমাজে রাষ্ট্রে, সাহিত্যে সর্বত্র নারীর মাতৃত্বেরই জয়জয়কার। মাতৃপূজা, মাতৃজাতি এসব কথা খুব চলত। এর বাইরে যে নারীর কোনো অস্তিত্ব আছে তা যেন কারুর জানা ছিল না। এর পরেই দেখলাম সমাজ গেল বদলে। ছেলেরা ঘর ছেড়ে বাইরে বেরুলো, তারা যেতে লাগল বিলাত, যেতে লাগল দিল্লী বোম্বে লাহোর মাদ্রাজ—চাকরী তো শুধু ঘরে বসে হয় না, অত দূর দেশ থেকে কত বছর পরে ছুটি মেলে, খাওয়া-দাওয়ার অসুবিধা, স্বয়ং শাশুড়ীই বউকে সাজিয়ে ছেলের সঙ্গে পাঠাতে লাগলেন। প্রথম-প্রথম স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে চলে যাচ্ছে ব'লে কী নিন্দে, কী আলোড়ন। দিনে-দিনে কিন্তু সেটাই হয়ে এল স্বাভাবিক। নারীর পরিচয় হতে লাগল, মা রূপে নয়, পত্নীরূপে, ঘরণী গৃহিণী সঙ্গিনীরূপে। বলা হতে লাগল—অমুক বাবুর স্ত্রী, মিসেস ব্যানার্জি, মুখার্জি, বসু ইত্যাদি। স্ত্রী স্বামীকে নিয়ে একা ঘর-সংসার করতে অভ্যস্ত হল। শ্বশুর-পরিবারের কুলমানের পরিচয়েই নারীর পরিচয় আবদ্ধ রইল না। স্বামীর পরিচয়ে হল তার পরিচয়। আধুনিক আমলে এসে দেখা গেল সে-পরিচয়ও তার লোপ পেয়ে যাচ্ছে। সমাজের এমন অবস্থান্তর ঘটল, মহিলারা বেরিয়ে পড়লেন বাইরে, ছেলেদের মতো শিক্ষায়-দীক্ষায় স্বাধীন হয়ে উঠলেন ; এখন তো সব ক্ষেত্রে তাঁদের পুরুষের সঙ্গে সমান দাবী। অনেক-বয়সের আগে মেয়েরা বিয়েই করছেন না ; অনেকে থাকছেন অবিবাহিত। এখন একমাত্র নারীর আপন স্বকীয়তায়ই তাদের মান-সম্মান। অন্যের পরিচয়ে তাদের পরিচয় ঢাকা পড়ে না। বিবাহিত হয়েও নারী শুধু মিসেস অমুক ব'লেই সম্মানার্হ বা আদরণীয় নয়, তার নিজের বৈশিষ্ট্যে তাকে সবাই চিনতে চাইছে, জানতে চাইছে। নারীর জীবন পুরুষেরই মতো পূর্ণতা লাভ করছে আপন শক্তির বিকাশে। তাই বিয়ে হওয়া না হওয়াতে মেয়েদের জীবন ব্যর্থ হচ্ছে না ; মা হওয়াও একান্তই প্রয়োজনীয় বলে মনে করা হচ্ছে না। নারী-পুরুষের ঘর বাঁধবার প্রয়োজন আছে সব সময়ই। ঘর করলে নারী সেটিকে যেমন গড়ে তুলবে, ছেলেমেয়ে মানুষ করে সমাজের সেবা করবে, তেমনি তার নিজের জীবনের সেবা দিয়েও সমাজ ও রাষ্ট্রের সেবা করতে পারবে। ঘরে-বাইরে কত ক্ষেত্র পড়ে আছে মেয়েদের কাজের জন্যে। বিশেষ করে আমাদের সমাজ-গঠন তো এখনও অসম্পূর্ণ রয়েছে, মেয়েরা এগিয়ে আসছেন ক্রমে-ক্রমে। এইসব পরিবর্তন দেখলুম এই পঞ্চাশ বছরেই, আরো কত পরিবর্তন রয়েছে সামনে।

* * *

শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্করের বক্তব্যের পরে মহিলাগণ এ নিয়ে নানা আলাপ-আলোচনা করেন। শোনা গেল, জানুয়ারীর বিশ তারিখে আরেকজন বিশিষ্ট মহিলা এসে মহিলা-সমিতিতে কিছু বলবেন। ১৬।১।১৯৫৩

* * *

শান্তিনিকেতনের মহিলা-সমিতির নূতন সম্পাদিকা নির্বাচিতা হয়েছেন শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় মহাশয়ের সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা লীলা রায়। ইতিমধ্যে এক অধিবেশনে আশ্রমের প্রাক্তন অধ্যাপিকা এবং বর্তমানে বোলপুর উচ্চ-বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী শ্রীযুক্তা সুধাময়ী মুখোপাধ্যায় তাঁর আশ্রমজীবন ও বোলপুরের নারীসমাজ-সংগঠনের নানা কথা আলোচনা করেন। সংগীত ও সাহিত্য-সভা, শিল্প ও সেবার নানা উপলক্ষে, আনুষ্ঠানিকতা এড়িয়ে ঘরোয়াভাবে মেলামেশায় প্রতিবেশী-সমাজের মেয়েদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বাড়তে পারে—এইরূপ অভিমত তিনি ব্যক্ত করেন। ভুবনডাঙায়, গোয়ালপাড়ায় শান্তিনিকেতন মহিলা-সমিতির শাখা-প্রতিষ্ঠান আছে। সেখানে স্থায়ীভাবের ব্যবস্থায় শান্তিনিকেতন থেকে মহিলারা গিয়ে পল্লীবাসিনীদের শিল্পাদি শিক্ষা দিয়ে থাকেন; বোলপুরে এখনো সেরূপ কোনও যোগাযোগ হয়ে ওঠেনি। সেটা হলে, সকলের পক্ষেই যে কল্যাণের বিষয় হবে, তাতে সন্দেহ নেই। ৪।৮।১৯৫৩

গত ২০শে নভেম্বর সান্ধ্য-বিনোদন-পর্বে ঘরোয়াভাবে সেদিন শান্তিনিকেতন মহিলা-সমিতি 'আলাপনী' থেকে শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবীর আশী বছর পূর্ণ হবার জন্মোৎসব পালন ও তাঁকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হল। ইন্দিরা দেবীর জন্মদিন ডিসেম্বরের শেষের দিকে; ২৯শে তারিখ। কিন্তু সে সময় সাতই-পৌষের ধুমে সবাই অন্যান্য কাজে ব্যস্ত থাকবেন, তাই রাস-পূর্ণিমার দিনটিতে সভা হল। উত্তরায়ণের পিছনের বারান্দায় সভার জায়গা হয়েছিল। এ বারান্দাটি গুরুদেবের স্মৃতি-ভরা। এখানে বসে তিনি নানা লোকের সঙ্গে গল্প করতেন; গীত-অভিনয়াদির রিহার্সাল পরিদর্শন করতেন; নিজের কত কবিতা, গল্প পড়ে শুনিয়েছেন এ-বারান্দায় আশ্রমিকদের। এখন এখানে সভাসমিতি হয় বিরল। অনেকদিন পরে এমন একটি সভার আয়োজন খুবই উপযুক্ত হয়েছিল। বারান্দাটি সাজানো হয়েছিল অতি সুন্দর শিল্প-বৈচিত্র্যে। কালো পাথরের মেঝেতে সূক্ষ্ম শুভ্র বিরাট আলপনা উজ্জ্বল হয়ে শোভা পাচ্ছিল, তারই মাঝখানে কারুকার্য-করা ফুলদানীতে প্রকাণ্ড গোলাপের তোড়া ফুলে-পাতায় সুচারুরূপে সজ্জিত ছিল। আলপনার পশ্চিমদিকে দুখানি কোচ পাতা, একখানিতে প্রমথ চৌধুরী মশায়ের ছবি,

মালায় সাজানো; দ্বিতীয়টিতে ইন্দিরা দেবী এসে বসলেন। সবাই মালা-চন্দন দিয়ে এবং শাঁখ বাজিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। একটি গভীর আনন্দ ও স্নেহরসের আভা ইন্দিরা দেবীর মুখ ছেয়ে রইল। তিনি বলে উঠলেন—বাঃ ভারী সুন্দর সাজিয়েছে তো! মহিলাদের দিক থেকে অভিনন্দন পাঠ ও শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হল; তিনটি গান হল, তারপরে থরে-থরে উপহার এনে দেওয়া হল ইন্দিরা দেবীকে—মহিলাদের হাতে-তৈরি জিনিসই বেশি—বাতিকের টেবিল-ক্লথ, ট্রে-ক্লথ, সূচিকাজের ব্যাগ, রুমাল, নানারকম খাবার,—এ-ছাড়াও ছিল তাঁতের কটকী-কাজ-করা বেড্‌কাভার, পর্দা, গরদের চাদর প্রভৃতি বহুবিধ জিনিস। ইন্দিরা দেবী গাঢ়স্বরে বললেন—তোমরা আশী বছরের জন্মদিনের উৎসব করতে এসেছ, আমি বিশেষ করে আনন্দিত এজন্যে যে তোমাদের এ অনুষ্ঠান নিছক শ্রদ্ধার অনুষ্ঠান নয়, এর মধ্যে থেকে একটা গভীর প্রীতির স্পর্শ আমি পাচ্ছি। আমার ছেলেমেয়ে বা দৌহিত্র-দৌহিত্রী নেই। তোমাদের সঙ্গেই আমার সে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এখানে তোমাদের মধ্যে থেকে স্নেহ-প্রীতিতে একটি বৃহৎ পরিবারের মধ্যে আছি বলে আমার মনে হয়। আমার জীবনে আমি সকলের জন্য কতটুকু কাজ করতে পেরেছি বা সবাইকে কী দিতে পেরেছি জানিনে। এই স্নেহ-ভালবাসাই আমি দিতে চেয়েছি, পেয়েছিও। মনে হয় পেয়েছিই অনেক বেশি। মনে পড়ে আমি যখন "ভুবনমোহিনী পদক" পেয়েছিলাম, তখনও সবাই আমাকে এমনি অভ্যর্থনা জানিয়েছিলে। আমার সত্তর বছরের জন্মদিনেও অভিনন্দন পেয়েছি। এই সেদিনও কলকাতার নাগরিকবৃন্দ আমাকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন। তাঁদের শ্রদ্ধা-প্রীতি আমি অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করেছি। কিন্তু তোমাদের কাছে যতখানি ঘনিষ্ঠতার স্পর্শ পাই, এ-জিনিস বাইরে পাইনে, কারণ সেখানে বেশির ভাগ লোকই আমার অচেনা—আমার ছেলেমেয়ে, দৌহিত্র-দৌহিত্রী, পৌত্র-পৌত্রীর অভাব জীবনসায়াহ্নে তোমাদের তপ্ত স্নেহ, ভালবাসায় পূরণ হয়ে গেছে। বলতে-বলতে ইন্দিরা দেবীর চোখ থেকে আনন্দাশ্রু ঝরে পড়ল। তিনি চোখ মুছে বললেন—তোমরা মহিলা-সমিতি স্থাপন করেছ, আমি এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে আছি। বিদেশের ভারতীয় ও বিদেশী মহিলাদের কাছ থেকে আমি কত চিঠি পাই। তাতে তাঁরা লেখেন বিদেশে মহিলারা সমিতি করে কত রকমের কাজ করেন তার ইয়ত্তা নেই। তোমরাও তেমনিভাবে সমিতিটিকে কাজের মধ্য দিয়ে একটি প্রতিষ্ঠানের মতো গড়ে তোলো,—আজকের দিনে এই আমার আশীর্বাদ।

* * *

এই সংবর্ধনা-সভায় অনেক বিদেশী আশ্রম-পরিদর্শনার্থী ছিলেন। এ-সভাতে সহকারী কর্মসচিব শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ রায়—গুরুদেবের 'বিশ্ববিদ্যাতীর্থ-প্রাঙ্গণে' গানটির সুরে মহিলাদের দিক থেকে ইন্দিরা দেবীকে সংবর্ধনা করবার আনুষ্ঠানিক একটি গান রচনা করে দিয়েছিলেন। গানটি গাওয়া হলে সবাই খুব আমোদিত হন। শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী দীর্ঘকাল যাবত গুরুদেবের গান ও সুরের রক্ষয়িত্রী হয়ে আছেন এবং শান্তিনিকেতন-সংগীত-ভবনের অধ্যাপনা-কার্যেও নিযুক্ত আছেন। এখনও ছাত্রছাত্রীগণ তাঁর কাছে দুর্লভ গান ও স্বর শিখতে ভিড় জমিয়ে তোলে। তিনি গুরুদেবের গানের সাধনা নিয়ে আনন্দে আছেন। এতদিন তিনি উত্তরায়ণে বাস করতেন। গত জুলাই মাস থেকে বিশ্বভারতী তাঁর নিঃস্বার্থ সেবাকার্যের সম্মানস্বরূপ তাঁকে বিশ্বভারতীর একটি বড় বাড়িতে থাকতে দিয়েছে। তিনি সেখানে তাঁর ভাইপো স্বর্গত সুধীর ঠাকুরের স্ত্রী ও নাবালক ছেলেমেয়ে সহ বাস করছেন। ৭।১২।১৯৫৩

* * *

স্বাধীনতা-দিবস। সকালে আশ্রমের গৌর-প্রাঙ্গণে প্রতি-বছরের মতো পতকা উত্তোলনের অনুষ্ঠান হল। বেলা নয়টাতে গুরুদেবের "শ্যামলী"-গৃহে শিশুদের আনন্দ-পাঠশালার (Nursery School) উদ্বোধন করেছেন মহিলাগণ। মহিলা-সমিতি "আলাপিনী" কয়েক বছর পূর্বে একটি পাঠশালা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। ভুবনডাঙার গরীব দুঃখী হরিজন ছাত্র-ছাত্রীগণ তাতে বিনা-পয়সায় পড়ত এবং বই খাতা শ্লেট পেনসিল পেত। কয়েক মাস সেটি ভালভাবেই চলেছিল, তারপরে নানা অসুবিধায় বন্ধ হয়ে যায়। এবার আশ্রমের চার থেকে ছ-বছরের শিশুদের নিয়ে আনন্দ-পাঠশালা খোলা হল। বিশ্বভারতী থেকে যথাসাধ্য সাহায্য দানের ব্যবস্থা হতে পারে বলে জানা গেছে। প্রত্যহ সকাল সাড়ে আটটা থেকে সাড়ে দশটা—দুঘণ্টা পাঠশালা বসবে। মহিলাগণই খেলাচ্ছলে শিশুদের অক্ষর-পরিচয় করাচ্ছেন, মুখে-মুখে ছড়া বলা, সংখ্যাগণনা এবং নানারকম খেলা শেখাচ্ছেন। "শ্যামলী"-গৃহের সামনের ঘরখানি নীল রঙের ছোট-বড় বেলুন দিয়ে সাজানো রয়েছে,—ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের বেলুনে খুব আনন্দ। তারা পাঠশালায় এসেই খুসী হয়ে ওঠে—কত বেলুন! ক'টা? না,—এক দু তিন চার সাত পাঁচ—এক-একটিতে উল্টোপাল্টা গুণতে শুরু করে দেয়; শিক্ষয়িত্রীগণ শুধু কোন্‌টার পরে কোন্ সংখ্যা হবে তা বলে দেন। প্রায় ত্রিশটি শিশু জমেছে, তার মধ্যে পারসী ছেলে "সাহাব" আছে, বিদেশী এবং অবাঙালী শিশুও কম নেই। খাতা

পেনসিল শ্লেট নিয়ে বসে গেছে সবাই। —কী খেতে ভালবাস?—আম। আঁকতে পার?—হ্যাঁ। খুসী হয়ে শিশুরা গোলাকার আম এঁকে ফেলে।—বাঃ বেশ আম হয়েছে তো। আচ্ছা আ লিখতে জান?—হ্যাঁ। ম? জান না?—আমি লিখে দিচ্ছি। আ-এর পাশে ম লিখলাম, কী হল, একসঙ্গে বল।—আম। শিশুদের আনন্দ দেখে কে। সে আম খেতে ভালবাসে, আঁকতে পারে, লিখতেও পারে!

অন্য শিশুরা দেখে। আগ্রহে ঝুঁকে পড়ে। পারসী ছেলে সাহাব বছর চারেক বয়েস। সে তাড়াতাড়ি শ্লেট টেনে বড় বড় ইংরেজি অক্ষর লিখে ফেলল—MAM। মাকে সে ওই নামেই ডাকে। সবাই বলে ওঠে—বাঃ বাঃ।

—আচ্ছা এবার ছড়া বলা হবে। বাইরে গাছতলায় যাবে?—না, ঘরে?—বাইরে যাব। লাইন করে গেলে বেশ হয়?—না?—হ্যাঁ হ্যাঁ, দিদিরা লাইন করে,—তেমনি করব।—করো লাইন, আমরা কিছু বলব না। ওদের মধ্যে একজন আবার লাইন ঠিক করল, আরেকজন বলে উঠল— তা আমাদের লাইন ঠিক দিদিদের মতোই হয়েছে,—না?—হ্যাঁ বেশ ভালই হয়েছে। এদিকে কিন্তু এ মাথা-ও-মাথা-এঁকে-বেঁকে এদিক-ওদিক থেকে সব বেরিয়ে গেছে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শিশু-পাঠশালা দেখতে-দেখতে কোথা দিয়ে সময় কেটে যায়, বোঝা যায় না। ১৫।২।১৯৫৪

* * *

বিশ্বভারতী শিক্ষাভবনের রসায়ন-শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র দাশ-গুপ্তের স্ত্রী শ্রীমতী বেলা দাশগুপ্তা সম্প্রতি বিশ্বভারতী-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গবেষণারত-ছাত্রী-হিসাবে যে পি-এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করলেন, তাতে মেয়েদের পক্ষে বিশেষ গৌরবের কারণ আছে। এর আগে বিশ্বভারতী-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যদিও 'দেশিকোত্তম' উপাধিতে আরো তিনজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে ভূষিত করা হয়েছে সেক্ষেত্রে এরূপ আনুষ্ঠানিকভাবে 'থীসিস' দাখিল করবার কোনো অপেক্ষা ছিল না। সে ছিল সম্মান-নিবেদনের বিশিষ্ট উপলক্ষ। স্বয়ং চ্যান্সেলারের নিকট থেকে তাঁর নাম প্রস্তাবিত হয়ে আসে। দেশীয়দের মধ্যে শ্রীযুক্তা দাশগুপ্তাই প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে এ পথটি খুলে দিলেন। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, বিশ্বভারতীতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ডি লিট. ও পি-এইচ. ডি. উপাধি লাভ করতে হয়; উচ্চ 'দেশিকোত্তম' উপাধি কেবলমাত্র বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সম্মানার্থে প্রযোজ্য হয়ে থাকে। বেলা দেবী শান্তিনিকেতনে বাস ক'রে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাইভেট ছাত্রী-হিসাবে পরীক্ষা দিয়ে ১৯৪৬ সনে এম. এ. পাশ করেন। পরে বিশ্বভারতীর

বিদ্যাভবনের একটি বৃত্তি লাভ করে গবেষণার কাজে ব্রতী হন। ১৯৪৯ সন থেকে বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষ সুপ্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্ আচার্য প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে তিনি "নিত্যানন্দ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম" বিষয়ে গবেষণা শুরু করে তিন বছরে এ-কাজ সম্পন্ন করেন। এ বিষয়ে তাঁর আরো অগ্রসর হবার আশা আছে। বিশ্বভারতী গবেষণা-বিভাগ এঁর কাজের দ্বারা সমৃদ্ধ হবে, সন্দেহ নাই। ১৬।৬।১৯৫৪

গত জানুয়ারী মাস থেকে আশ্রমের মহিলা-সমিতি 'আনন্দ-পাঠশালা' (Children's Nursery School) গড়ে তুলেছেন। উত্তরায়ণের 'শ্যামলী'-গৃহে এতদিন সেটি বেশ চলছিল। বিশ্বভারতী জুলাই মাস থেকে সেটি আশ্রমের 'শমীন্দ্র কুটিরে' নিয়ে এসেছেন। শোনা যাচ্ছে, আসছে জানুয়ারী মাস থেকে এটি বিশ্বভারতীরই পরিচালনাধীনে চলবে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে তবে চার বছর থেকে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও আনন্দের মধ্যে লেখাপড়া শেখবার সুযোগ পাবে। এখন অবশ্য মহিলা-সমিতির মহিলাগণই স্বেচ্ছায় এ দায়িত্ব নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন এবং ছবি, খেলনা, গান প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে শিশুদের প্রথম পাঠটি শিক্ষা দিচ্ছেন। বিশ্বভারতীর সমর্থনে ও সাহায্য নিয়ে তাঁরা এমনভাবে শিশুদের শেখাচ্ছেন যাতে সাত বছরে পড়লেই তারা বিশ্বভারতীর পাঠভবনের নাইনথ্ গ্রুপে (Class II) পড়বার উপযুক্ত হতে পারে। বর্তমানে পঁচিশ-ত্রিশটি শিশু এ পাঠশালায় পড়ছে। ৬।৮।১৯৫৪

মাঝে মাঝে ছুটির আশ্রমেও বৈচিত্র্য মিলছে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজনে। ২৭শে মে সন্ধ্যা সাতটায় আশ্রমের চীনাভবনে স্থানীয় মহিলা-সমিতি 'আলাপিনী' থেকে 'রবীন্দ্র-জীবনী'কার শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে অভিনন্দন জানানো হল। সংক্ষিপ্ত আকারে অনুষ্ঠানটি বেশ মনোজ্ঞ হয়েছিল। সমবেত গানের সজীবতায় বোঝা যাচ্ছিল এ অনুষ্ঠানের আনন্দে সকলে অনুপ্রাণিত। সমিতির পক্ষ থেকে শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী একটি আশীর্বাণী ও মানপত্র নিজের হাতে লিখে দেন এবং তার চারিপাশে মনোরম কারুশিল্প রচনা করেন আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্রী এবং কবির স্নেহাস্পদা শ্রীযুক্তা চিত্রনিভা চৌধুরী। সভার পক্ষ থেকে শ্রীযুক্তা দাশগুপ্তা এবং শ্রীমতী বীণা মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্র-জীবনীকারের প্রশস্তি পাঠ করেন। 'আলাপিনী'র সদস্যদের অনুরোধে শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত রায়চৌধুরী 'রবীন্দ্র-জীবনী'কার সম্বন্ধে কিছু বলেন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আবিষ্কারক। তিনি মানুষের লুপ্ত শক্তি খুঁজে বের করে তার প্রকাশের সহায়তা করতেন। যে ক'জন সাধারণ ব্যক্তি তাঁর প্রভাবে অসাধারণরূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন তাঁদের একজন এই প্রভাতকুমার

মুখোপাধ্যায়; অপরজন শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রভাতকুমার তৎকালীন ব্রিটিশ-স্কুল-তাড়ানো ছাত্র। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে নিজের কাছে ডেকে নেন। তিনি এসে বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আশ্রমের সেই গরীব গ্রন্থাগারের অবস্থা এখনকার দোতলা অট্টালিকা আর পুস্তকের প্রাচুর্য দেখে অনুমান করা সহজ নয়। ঐ স্থানেই দোতলা খড়ের ঘরের একতলার একটি খুপরীতে বসে তিনি আপন মনে কাজে নিমগ্ন রয়েছেন; 'ভারতের জাতীয় আন্দোলন', 'ভারতবর্ষের ইতিহাস', 'ধর্মমঙ্গল', 'রোমের ইতিহাস' প্রভৃতি রচনা ও আলোচনায় তিনি দিনের পর দিন প্রভূত পরিশ্রম করেছেন। মাঝে মাঝে তাঁর পাশের খোড়ো ঘরে এসে কাজ করতেন স্যার যদুনাথ সরকার। প্রভাতকুমারের সুদীর্ঘ জীবনের সাধনার ফল চার খণ্ড 'রবীন্দ্র-জীবনী'। জীবনী অনেক লেখা হয়েছে এবং হচ্ছে; বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের জীবনী রচনার তো শেষ নেই। কিন্তু প্রভাতকুমারের 'রবীন্দ্র জীবনী' অনন্যসাধারণ। ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি ও রচনা-প্রণালী মিলেছে এই 'রবীন্দ্র-জীবনী'তে। এই গ্রন্থ শুধু রবীন্দ্র-জীবনে প্রবেশের সিংহদ্বার নয়, রবীন্দ্র-সাহিত্য-পরিক্রমা-রতদের দিক্-দর্শনী।

'রবীন্দ্র-জীবনী'ই প্রভাতকুমারের অসামান্য কীর্তি বলে প্রশংসা অর্জন করেছে কিন্তু তাঁর আরেক কীর্তিও বিশ্বভারতী চিরকাল স্মরণে রাখবে। সেটি হচ্ছে বিশ্ব-ভারতী-গ্রন্থাগার। বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে এই গ্রন্থাগারের যে অভাবনীয় উন্নতি হয়েছে তার মূলে রয়েছেন প্রভাতকুমার। তিনি একক চেষ্টা দ্বারা আধুনিকতম প্রণালীতে গ্রন্থাগারকে রচনা করেছেন। জীবনের দুই সাধনাতেই তিনি সফলকাম।

সংবর্ধনার উত্তরে শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন—আজ নানা স্থান থেকে, নানা সংস্থা থেকে আমার কাজের সম্মান দেওয়া হচ্ছে। অর্থ ও মেডেল জুটছে। অনেকে জিজ্ঞেস করেন বিশ্বভারতী থেকে কী দেওয়া হয়েছে। আমি গর্বের সঙ্গে বলেছি—বিশ্বভারতী দিয়েছে,—আমাকে। রবীন্দ্রনাথের স্নেহে, রবীন্দ্রনাথের সহায়তায় এবং আমার সহকর্মীদের আনুকূল্যে আমি এত কঠিন কাজ সম্পন্ন করতে পেরেছি। রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে শ্রেষ্ঠ যা দান আমি পেয়েছি সে হচ্ছে শ্রম-করার ক্ষমতা। পরিশ্রম-করা কাকে বলে সে শিক্ষা পেয়েছি তাঁকে দেখে। সাধারণের ধারণা রবীন্দ্রনাথ জমিদার, ধনশালী, আদরের দুলাল। কিন্তু কী অসাধারণ পরিশ্রম যে তিনি করতেন সে নিজের চোখে দেখেছি। বৃদ্ধ-বয়সে তাঁর সেক্রেটারী, কপিকারক সব এসেছেন, কিন্তু তাঁকে যখন আমি দেখেছি তখন তিনি পূর্ণবয়স্ক।

সে-সময় তাঁর সাহায্যকারী কেউ ছিল না। আশ্রমের মাটির ঘর 'দেহলীর' ছোট্ট কোঠাটিতে বসে তিনি অক্লান্তভাবে লিখে চলেছেন, দুপুরে বিশ্রাম নেই, পশ্চিমের রোদ এসে পিঠে পড়েছে, তিনি লিখেই চলেছেন দিনের পর দিন,—এ আমার নিজের চোখে দেখা, গল্প নয়। নিজের সমস্ত কাজ সারা করে হাজার-হাজার চিঠির উত্তর নিজের হাতে দিয়েছেন। তখনকার দিনের কেউ বলতে পারবেন না রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখে তার উত্তর পান নি। পনেরো বছরের স্কুলের ছাত্র তখনকার অমিয় চক্রবর্তী অবধি তাঁকে চিঠি লিখে উত্তর পেয়েছেন। সেই পরিশ্রম দেখেই পরিশ্রম করার প্রেরণা আমি পেয়েছিলাম। শ্রমের দ্বারাই আমি নিজেকে তৈরি করেছি এবং এখনও আমি সেভাবেই কাজ করে চলেছি।

মহিলা-সমিতির অভিনন্দনকে তিনি ঘরের মায়ের আদর ব'লে আনন্দ জ্ঞাপন করেন। মহিলা-সমিতি থেকে শুধু শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমারকে নয়, তাঁর সুযোগ্যা সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা সুধাময়ী দেবীকেও একত্রে সংবর্ধনা জানানো হয়। শ্রীযুক্তা সুধাময়ী দেবী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত সীতানাথ তর্কভূষণের কন্যা। তাঁর কঠিন পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ে বোলপুর নিম্ন প্রাথমিক বালিকা-বিদ্যালয় আজ উচ্চ বালিকা-বিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। দু'জনেই অক্লান্ত ও একাগ্র সাধনায় জীবনকে সার্থক করতে প্রয়াসী।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, প্রভাতকুমার কেবল 'রবীন্দ্র-জীবনী' রচনাতেই আপন ক্ষমতা সীমাবদ্ধ রাখেন নি। তাঁর চার খণ্ড 'রবীন্দ্র-জীবনী' সংক্ষিপ্তাকারে এক খণ্ডে 'রবীন্দ্র-জীবন কথা' নামে শীঘ্রই বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত হবে। সেও তাঁরই কৃত কাজ। এ ছাড়াও ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি থেকে তাঁর গ্রন্থাগারের বর্গীকরণপদ্ধতি-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ একখানি মুদ্রিত হচ্ছে এবং জেনারেল প্রিণ্টার্স বের করছেন তাঁর কৃত "জ্ঞানভারতী"। শান্তিনিকেতনের ইতিহাস এবং গবেষণামূলক আরো দু'তিনখানা গ্রন্থ-রচনায় তিনি নিযুক্ত আছেন। শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত রায়চৌধুরী যথার্থই বলেছেন—রবীন্দ্রনাথ অনেককেই বিশ্বভারতীতে এনে স্থান দিয়েছেন, সুযোগ দিয়েছেন আত্মপ্রকাশ করতে। কিন্তু প্রভাতকুমারের মতো দু'চারজনেই কেবল নিজেকে সফল করে তুলতে পেরেছেন, সেইখানেই তাঁদের স্বকীয়তা। ৩।৬।১৯৫৭

শিশু-বিভাগ

"একদিন নদীতীর ছেড়ে এখানে এসে আহ্বান করলুম ছেলেদের। এখানকার কাজে প্রথম যে উৎসাহ এসেছিল সেটা সৃষ্টির আনন্দ; শিক্ষণকে লোকহিতের দিক থেকে জনসেবার অঙ্গ করে দেখা যায়—সেদিক থেকে এখানে আমি কাজ আরম্ভ করিনি। প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে মানুষ হয়ে এখানকার ছেলেদের মন বিকশিত হবে,—আবরণ ঘুচে যাবে, কল্পনায় এইরূপ দেখতে পেতাম। যখন জানলুম একাজের ভার নেবার আর কেউ নেই, তখন অনভিজ্ঞতা সত্ত্বেও এ ভার আমি নিয়েছিলাম। আমি মনে করেছিলাম, আমার ছেলেরা প্রাণবান হবে, তাদের মধ্যে ঔৎসুক্য জাগরিত হবে। তারা বেশি পাশমার্ক পেয়ে ভালো করে পাস করবে এ লোভ ছিল না—তারা আনন্দিত হবে, প্রকৃতির শুশ্রূষায় শিক্ষকের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তায় পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হবে এই ইচ্ছাই মনে ছিল। অল্প কয়েকটি ছেলে নিয়ে গাছের তলায় এই লক্ষ্য নিয়েই কাজ আরম্ভ করেছিলাম।"

"বিরাট প্রকৃতির অন্তরে আদিম প্রাণের বেগ নিগূঢ়ভাবে চঞ্চল, শিশুর প্রাণে সেই বেগ গতিসঞ্চার করে।…আমাদের আশ্রমের ছেলেরা এই প্রাণময়ী প্রকৃতিকে কেবল যে খেলায়-ধূলায় নানারকম করে কাছে পেয়েছে তা নয়, আমি গানের রাস্তা দিয়ে নিয়ে গেছি তাদের মনকে প্রকৃতির রঙমহলে।" —রবীন্দ্রনাথ।

তেতাল্লিশ বছর আগেকার কথা। আশ্রম এত বড় ছিল না। ছাত্র-ছাত্রীও ছিল অল্প। তখন সন্ধ্যে হলেই গুরুদেব ছেলেদের নানারকম গল্প শোনাতেন। প্রত্যেক দিনই এ রকম সভা বসত। গুরুদেব ছেলেদের সঙ্গে থাকতেন, তাদের খুব ভালোবাসতেন, তাদের উপরই ছেড়ে দিয়েছিলেন তাদের সমস্ত ব্যবস্থা। তাদের পেছনে সারাক্ষণ কোনো লোক লেগে থাকত না। ছেলেদের মধ্যেই কেউ হত ক্যাপটেন—ছেলেদের সে চালিয়ে নিত, কেউ দোষ করলে তার বিচার ছেলেরা নিজেরাই করত, দরকার-মতো শাস্তিও দিত। এ বিচারে বড়রা হাত দিতেন না। ক্যাপটেনরাও ছিল তেমনি—দৃঢ়প্রতিজ্ঞ,—কাউকে রেহাই দিত না। প্রকাশ দত্ত ব'লে একজন ক্যাপটেন ছিলেন। তখন তার বয়স দশ-এগারো বছর। একটি ছেলে ছিল খুব অবাধ্য। অনেক বেলা অবধি সে ঘুমোত, নানারকম দুষ্টুমি করত। সে ছিল গুরুদেবের আত্মীয়। একদিন সকালে কিছুতেই সে

ঘুম থেকে উঠছে না। প্রকাশ গিয়ে ডাকল। তা-ও ওঠে না। যখন একটু জোর করল ছেলেটি রেগে বলল, জানো,—এটা আমার তাঐ-মশায়ের আশ্রম। প্রকাশ দৃঢ়স্বরে বললে—তাহলে তুমি তোমার তাঐ-মশায়ের কাছে গিয়েই থাকো, এখানে আমাদের মধ্যে থেকে ও-সব চলবে না। ছেলেদের কয়টি বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হত—ভদ্রতা, সত্যনিষ্ঠা অর্থাৎ মনের জোর, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সেটা ভদ্রতারই অঙ্গ, আর নিজের কাজ নিজে করা।

আশ্রমে নানারকম গাছপালা ছিল। ছেলেরা প্রত্যেকটি গাছকে যত্ন করত এবং ভালো করে সেই সমস্ত গাছের তথ্য সংগ্রহ করত। কোন্ মাসে কী ফুল হয়, কী ক'রে ফুলের থেকে ফল হয় ইত্যাদি। শুধু গাছ নয়, পশু-পাখিদের সম্বন্ধেও তারা অনেক খবর জানত—কোন্ সময়ে কোন্ পাখি ডিম পাড়ে, গায়ের রঙ কী রকম, কী খায়…। এ বিষয়ে শুধু পড়া-বিদ্যা ছিল না, প্রকৃতির থেকে তারা জ্ঞান লাভ করত। এখন দেখা যায়, ছেলেমেয়েরা গাছপালা ভাঙে, পশু-পাখিদের প্রতিও তারা নির্মম—প্রকৃতির সৌন্দর্য নষ্ট করে দেয়। ফলগুলিকে পাকবার সুযোগ দেয় না।

আরেকটি জিনিস ছেলেদের মধ্যে ছিল না—সেটা স্বার্থপরতা। কেউ কখনো কোনো ভালো জিনিস নিজে একা ভোগ করত না। বাড়ি থেকে খাবার এলে, কেউ একা খেত না। এতটুকু ক'রে পেত, তবু পঞ্চাশজনে মিলে ভাগ করে খেত। তখন শিশু-বিভাগ এত বড় ছিল না। প্রত্যেকেই নিজের জায়গাটি খুব পরিষ্কার রাখত। সন্ধ্যার সময় এক-একদিন ছাত্ররা সকলকে নিমন্ত্রণ করত। খেতে দিত নবাত আর মুড়ি। সভাগুলিকে তারা কী সুন্দর ক'রে সাজাত! আনত পদ্মফুল, কেয়াফুল,—আরো কত ফুলের রাশি। কী উদ্যম,—কোত্থেকে এসব আনত, কেউ জানত না।

একবার মহাত্মাজী এই আশ্রমে আসেন। তিনি বললেন—আশ্রমে ঝি-চাকর রাখা উচিত নয়। সব কাজ নিজেদের করতে হবে। রান্নাঘর থেকে ঝি-চাকরদের বিদায় দেওয়া হল। তিনি ছাত্রদের ডেকে জিজ্ঞেস করলেন—"কে কে কাজ করতে পারবে, প্রতিজ্ঞা করো।" পৃথিবীতে দু' প্রকার লোক আছে, একদল কেবলি খুব উঁচু গলায় বলে—"হ্যাঁ, নিশ্চয় পারব।" কিন্তু অনেক সময় কাজের বেলা দেখা যায়, তারাই পড়ে পিছিয়ে। আরেক দল আছে, তারা বলে, "চেষ্টা করব।" তারা প্রাণপণ চেষ্টা ক'রে দেখে। এখানেও তাই হ'ল। একদল বললে—প্রতিজ্ঞা করছি। আরেক দল বললে—চেষ্টা করব। দুটি আলাদা রান্না-

ঘর হল। শেষ অবধি "চেষ্টা করব" দলের ঘরেই "প্রতিজ্ঞা"র দলের সবাই এসে ঢুকে পড়ল।

ছেলেরা সেই সময় নিজের বাসন মাজত এবং তারা গুরুজনদের বাসনও মেজে দিত। মানা শুনত না। বাসনগুলি চকচকে ঝকঝকে থাকত। নেপালের মহারাজার এক আত্মীয় এখানে ছিল। সেও অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে মিলে সমস্ত মেজে ঠিক করে রাখত। গুরুজনদের বাসনও সে নিয়ে নিত। সকলেই বিস্মিত হত। সে উত্তর দিত,—"আপনি যে গুরুজন।" বুঝবার জো ছিল না সে এক রাজার বাড়ির লোক। নাম ছিল পুণ্যবজ্র।

আরেকটি ছিল জমিদারের ছেলে। নূতন ভর্তি হল। সঙ্গে একটি চাকর। বড়লোকের ছেলে,—ধুতিটি অবধি পরতে জানত না। চাকরে তাকে পরিয়ে দিত। তিনদিন চাকরটির থাকবার কথা ছিল। যখন সে চলে যাবে, ছেলেটি কাঁদ-কাঁদ হয়ে বলল,—"এ ঘন্নুয়া ভাই, তুমি চলে গেলে আমি কী করব।" ছেলেরা জমিদারের ছেলেটিকে শেষে 'ঘন্নুয়া ভাই' বলেই ডাকত। তার নাম ছিল জ্যোতিপ্রকাশ মিশ্র। এখানে থাকতে থাকতে সে সব কাজ শিখেছিল।

কিছুদিন পর আশ্রমে আবার চাকর এল। অবশেষে গান্ধীজীর নির্দেশ পালন-প্রথা শুধু একটি দিনে এসে ঠেকল। সেটি হচ্ছে দশই মার্চ। এখনো সেদিনটি আমরা পালন করি। তার নাম হচ্ছে এখন "গান্ধী-দিবস"। তাই দেখে মণি দত্ত নামক ছেলেটি এই আশ্রম ত্যাগ করল। গান্ধীজীর আশ্রম সবরমতি। সেখানে সে রওনা হল। পণ করল, এখানে আর থাকবে না। বাড়ি থেকেও এক পয়সা নিলে না। হেঁটে চলল। আজ এখানে কাল ওখানে, কুলিগিরি করল, নয়তো কারো কিছু কাজ করল, যা পেল তাই দিয়ে খেল, খানিকটা হাঁটত, খানিকটা ট্রেনে চলত। এ রকম করেই সে পৌঁছাল গিয়ে গুজরাটে,—দেড় হাজার মাইলের পথ, সেখানে গিয়েও সে কিন্তু দেখল, গান্ধীজীর আশ্রমেও সেবক আছে। তবু সে দমল না। কয় বছর নিজের হাতে রান্না করে সব কাজ করে সেখানে থাকল। সে কিন্তু শান্তিনিকেতনে ছিল "চেষ্টা করব" দলের,—প্রতিজ্ঞা করার দলের নয়। এদেরই বলে আদর্শবান, সত্যনিষ্ঠ ছেলে।

তখনকার আশ্রমের ছাত্রদের নির্ভীকতার কথা ধরা যাক। একবার তালতোড়ের জঙ্গলে একটা বাঘ বেরিয়েছিল। কয়েকজন শিকারী বাঘটাকে মারবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু মারতে পারেনি। ঘায়েল ক'রে ছেড়ে দিয়েছিল। ছেলেরা খবর

গেল, অমনি কজন ছাত্র কাউকে না জানিয়ে চলে গেল। সারা জঙ্গল তোলপাড় করলে, বাঘটা মারলে, তবে ছাড়লে।

সারাদিন ছেলেরা কাজ করত, পড়াশুনা ক্লাসেই করানো হয়ে যেত; ছাত্ররা কেবল ভাবত,—কখন সন্ধ্যা হবে, গুরুদেব আসবেন। গুরুদেবেরও সব কাজ ফেলে এই শিশুদের সভায় যোগ দেওয়া চাই-ই। বড় বড় নিমন্ত্রণ, সভা,—সব ছেড়েছুড়ে ছুটে আসতেন। কত গল্প বলতেন।

শোনা গেল,—একবার তিনি শিলাইদহে যাচ্ছিলেন। সন্ধ্যার ট্রেনে পৌঁছবার কথা ছিল। ট্রেন মিস্ ক'রে কুষ্টিয়াতে নেমেছেন রাত্রির ট্রেনে; রাতদুপুর; পদ্মার পারে অপেক্ষা করছেন। আশে-পাশে কোনো নৌকা নেই। এমন সময় দেখলেন, একটি মাত্র ছোটো নৌকা সেইদিকেই আসছে। নৌকার মাঝি গুরুদেবের চেনা, তাঁর জমিদারির এক পুরাতন প্রজা। বাবুকে সেলাম ক'রে বলল—আসুন কর্তা, আমার নৌকোয়; আপনাকে পৌঁছে দেব; গুরুদেব বললেন—আমার বড় বোটটা কোথায় গেল? সে বলল,—সেটা বোধ হয় আপনাকে না পেয়ে ফিরে গেছে। বিছানাপত্র সেই গুছিয়ে দিল। গুরুদেব নৌকোয় উঠে শুয়ে পড়লেন। অন্ধকার, ওদিকে দীর্ঘ পথ; সাড়া নেই, শব্দ নেই। মনে হচ্ছে নদীও নিশ্চল। শুধু লগির শব্দ, আর জলের ছপ্ ছপ্,—এই চলছে সমস্ত রাত! মাঝি প্রাণপণে বেয়ে চলেছে। ভোর হয়ে এল; মুরগীর ডাক শোনা যেতেই নৌকাটি পাড়ে এসে লাগল। অনুগত প্রজাটি নেমে এসে বললে—বাবু, একটু আসছি। এই ব'লে সেই যে সে গেল আর ফেরার নাম নেই! গুরুদেব নৌকোয় বসেই আছেন। বেলা হল; লোকজন এল। ঐ ছোটো নৌকোয় গুরুদেবকে বসে থাকতে দেখে সকলে তো অবাক,—কী ক'রে তিনি এখানে এলেন। রাত্রে তো ঘাটে কোনো নৌকা ছিল না। গুরুদেব বললেন, কেন? তার সেই প্রজাটিই তো সারারাত নৌকা বেয়ে নদী পার করে দিয়েছে। কিন্তু সে 'আসছি' বলে গেল কোথায়! গুরুদেবের মুখে লোকটির নাম শুনে তো সবার চক্ষুস্থির। সে যে ক'মাস আগে মারা গেছে! গুরুদেব চমকে উঠলেন, সে কি কথা! অন্য নৌকার ব্যবস্থা হল। গুরুদেব তাতে গিয়ে চড়ে বসলেন। পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখেন—সে কী! কোথায় গেল সেই ছোটো নৌকাটি!

এ গল্পের কতটা সত্যি, আর কতটা গুরুদেবের নিজের বানানো,—তিনিই জানেন, কিন্তু গল্প শুনে সকলের গা ছমছম করত। শুধু-কেবল ভূতপ্রেত নয়, বাঘ-ভাল্লুক নানা বিষয়ের গল্পই তিনি শোনাতেন। আবার,

নিজে কেবল বলে যেতেন না, মাঝে মাঝে ছেলেদের দিয়ে বলিয়েও নিতেন।

গল্প-বলা ছাড়াও গুরুদেবের নিজের রচিত নাটক গল্প প্রভৃতি শিশুদের পড়ে শোনাতেন। মাঝে মাঝে তাদের দিয়ে সেই সব নাটক অভিনয় করাতেন। 'শারদোৎসব' নাটকের গানগুলি তিনি প্রথমে আলাদা-আলাদা করে লেখেন। ছাত্রদের তাগিদেই শেষটা সেগুলি তিনি একদিনে একত্র করে নাটক লিখে ফেললেন।

ইংরেজরা তখন ভারতের পশ্চিম সীমান্তের কোনো এক স্থলে বোমা ফেলেছিল। তাতে তাদের খুব নিন্দা হয়। গুরুদেব ঘটনাটি পড়েছিলেন। একদিন তিনি গল্প করে বললেন,—ওরা নিজেরা যে দোষে দোষী তাই নিয়ে ওরাই আবার পরের নিন্দে করে বেড়ায়! তখন যিনি গল্প শুনছিলেন, তিনি একটু হেসে বললেন, ঠিকই বলেছেন গুরুদেব, অত্যাচারী পৃথিবীর সকল জাতই। দোষ সকলেই করে, কিন্তু দোষ দিয়ে বেড়ায় যে-দুর্ভাগা তাকেই। পূর্ববঙ্গে কথায় বলে,—

সকল পক্ষী মৎস্য-ভক্ষী
শুধু মৎস্যরাঙ্গা কলঙ্কিনী।

গুরুদেব শুনে বললেন, বাঃ ছড়াটিতো খুব লাগসই। তবে ছন্দটা একটু ঠিক করে নিলেই তো আরো সুন্দর হয়। এই বলে তিনি মুখে মুখেই বলে গেলেন, পংক্তিটা হবে এই :

সকল পক্ষী মৎস্য-ভক্ষী
শুধু মৎস্যরাঙ্গা কলঙ্কিনী।

শ্রোতা তখন কবিকে অনুরোধ করলেন, বাকি পংক্তিটা পুরিয়ে দিতে। কবি অনুরোধ রাখলেন। পরিপূরক পংক্তিটির পিছনে একটু ঘটনা আছে। লোকে যায় বড়লোকদের কাছে অটোগ্রাফ নিতে। কলম ফেলে রেখে আসে তাদের অনেকেই। তখন গুরুদেবের কাছেও ছিল অটোগ্রাফের ভিড়। কলম রেখেও কেউ কেউ চলে যেত। তিনি খোঁজ করে মালিককে তা ফিরিয়ে দিতেন। সেদিন রহস্য ক'রে ছড়ায় এই বিষয়টিই বসিয়ে দিলেন।

প্রথম লাইনে ছিল :

সকল পক্ষী মৎস্য-ভক্ষী,
শুধু মৎস্যরাঙ্গা কলঙ্কিনী,

মিল ক'রে দ্বিতীয় লাইনটি জুড়লেন :

সবাই কলম ধার করে নেন্,
আমি ক্যান্ বা কলম কিনি।

মৃত্যুর অল্প ক'দিন আগেও, শিশুদের নাম তিনি ছোট ছোট ছড়ার ভিতরে বসিয়ে রাখতেন। একবার ছেলেরা 'সৈনিক' নামে একটি হিন্দী পত্রিকা তাঁর কাছে নিয়ে যায়। এই পত্রিকার নাম মিলিয়ে একটা কবিতার জন্য ;—তারা গুরুদেবকে বলল, তিনি তখনি বলে গেলেন :

যদি পারো দৈনিক
চা খেও চৈনিক,—
আর, গায়ে যদি জোর পাও
হয়ো তবে সৈনিক।
জাপানীরা আসে যদি
চিঁড়ে নিক দই নিক,
আর, যত পারে আধুনিক কবিতার বই নিক।

'সৈনিক' পত্রিকাটি যে ছেলেটি এনেছিলেন, তিনি ছিলেন কাশীর শিবপ্রসাদ গুপ্তের আত্মীয়। —অর্থাৎ অ-বাঙালী।

গুরুদেব নিজের ছেলেবেলায় বৃদ্ধাদের মুখে গল্প শুনতে ভালোবাসতেন। তিনি শিশুদেরও নিজেদের ঠানদিদি, দিদিমার গল্প শুনতে বলতেন। তাদের মুখে গল্প শুনে আরাম আছে।

শান্তিনিকেতনের 'ঠাকুর্দা'র মুখে গুরুদেবের এমনি-সব গল্প আমরা শুনেছিলাম এক সাম্বৎসরিক স্মরণ-পর্বে,—সেটি ছিল গুরুদেবের প্রয়াণ-সপ্তাহ,—শিশু-বিভাগের আসর। ১৩৫৮ সন। শান্তিনিকেতনের আচার্য শ্রীক্ষিতিমোহন সেন মশায়কে অনেকে 'ঠাকুর্দা' বলে ডাকে। গুরুদেবের 'শারদোৎসবে'র অভিনয়ে প্রথমবার ঠাকুর্দার ভূমিকায় অভিনয় তিনিই করেছিলেন। প্রবন্ধ-বর্ণিত ইংরেজদের গল্পের ক্ষেত্রে শ্রোতা-ব্যক্তিটি ছিলেন ক্ষিতিদাদু নিজেই।

গুরুদেব যে সন্ধ্যাবেলা কেমনভাবে এবং কেন ছেলেদের গল্প শোনাতেন সে কথা তাঁর নিজের ভাষণেই বলা আছে "বিশ্বভারতী" নামক গ্রন্থে—"তখন আমার সঙ্গী-সহায় খুবই অল্প। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয় আমায় ভালোবাসতেন আর আমার সংকল্পে শ্রদ্ধা করতেন। তিনি আমার কাজে এসে যোগ দিলেন। তিনি বললেন, আপনি মাস্টারি করতে না জানেন আমি সে ভার নিচ্ছি।"

আমার উপর ভার রইল ছেলেদের সঙ্গ দেওয়া। আমি সন্ধ্যাবেলায় তাদের নিয়ে রামায়ণ, মহাভারত পড়িয়েছি, হাস্য করুণ রসের উদ্রেক ক'রে তাদের হাসিয়েছি, কাঁদিয়েছি। তা ছাড়া নানা গল্প বানিয়ে বলতাম, দিনের পর দিন একটি ছোটো গল্পকে টেনে টেনে লম্বা ক'রে পাঁচ সাত দিন ধ'রে একটি ধারা অবলম্বন করে চলে যেতাম, তখন মুখে-মুখে গল্প তৈরি করবার আমার শক্তি ছিল। এইসব বানানো গল্পের অনেকগুলি আমার 'গল্পগুচ্ছে' স্থান পেয়েছে। এমনিভাবে ছেলেদের মন যাতে অভিনয়ে, গল্পে, গানে, রামায়ণ-মহাভারত পাঠে সরস হয়ে ওঠে, তার চেষ্টা করেছি।

আমি জানি, ছেলেদের এমনিভাবে মনের ধারা ঠিক করে দেওয়া, একটা অ্যাটিচ্যুড তৈরি করে তোলা খুব বড়ো কথা। ১৩।১।১৯৫২ —সুব্রত কর

২৯শে নভেম্বর আশ্রমের উপাচার্য রথীন্দ্রনাথের জন্মদিন। বিকেলবেলা আশ্রমের কাজ বন্ধ রইল। সন্ধ্যায় একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হল।

দিন কয়েক আগে থেকেই বাসায়-বাসায় শিশুমহলের কলোচ্ছ্বাসে খবরটা কারোই বোধ হয় জানতে বাকি ছিল না—শিশুদের জলসা হবে সিংহসদনে; নাচ, গান, কবিতা, গল্প—সাত্যিকার সভা দাদা-দিদিদের মতো, সবাই নাকি দেখতে আসবে।

দু'দিন আগে থেকেই পথে যেতে যেতে শোনা গেল একজন আরেকজনকে বলছে,—ভাই, কতদিন আর বাকি? আজই কেন হয় না!

—আরে বোকাটা, এই আজকে ভোর, কালকে-ভোর, তারপরেই সন্ধ্যে, বাকি আর কই! সভার ঘণ্টা পড়বে? নাটকের সময় যেমন পড়ে!

নিশ্চয়ই পড়বে, নয়ত সভাতে সবাই আসবে কী করে?

অবশেষে ঠিক দিনটি এসে গেল। যেমন উৎসাহ শিশুদের, তেমনি উৎসাহ তাদের দাদা-দিদিদের, কিছুদিন আগেই যারা ওদের থেকে একটু উঁচুদলে স্থান পেয়েছে। ভোর না হতে সাজি ঝুরি যা পাওয়া গেল তাই নিয়ে ছুটল সবাই ফুল কুড়োতে। হিমে ফুলগুলি সব কুঁকড়ে গেছে। শুধু ফুটেছে গাঁদা, ঝরে পড়েছে হিমঝুরি আর এ-গাছে ও-গাছে অল্পস্বল্প আছে টগর। তাই নিয়ে দিদিরা গাঁথতে বসল মালা,—হাতের মালা, গলার মালা, সভা সাজাবার মালা, আর সভাপতির মালা। নাবার-খাবার সময় নেই। বিকেল হতে না হতে সাজবার ধুম—'শীগগির সাজাও, সন্ধ্যে হয়ে এল যে! ওদের তাড়ায় যে দুপুরটা সন্ধ্যে হয়ে যেতে কিছুমাত্র বাধছে না। আশ্রমব্যাপী পাড়ায়-পাড়ায় একটা উৎসবের স্রোত বইতে লেগেছে।

সান্ধ্য-উপাসনার ঘণ্টা শেষেই দেখা গেল সিংহসদন ভরতি। সভায় এমন ভিড় বোধ হয় শীগ্‌গির দেখা যায়নি, একেবারে ঠাসাঠাসি, সভা আরম্ভের আগে থেকেই সভার ভিড়টাই হয়ে উঠল দেখবার মতো। সিংহসদনের স্টেজে অর্ধেক অবধি সারি সারি বসেছে শিশুর দল—প্রায় পঞ্চাশটি—তিন বছর থেকে ছ'সাত বছর অবধি বয়েস। কেউ গুটিশুটি গম্ভীর, কেউ হাত-পা ছড়িয়ে বসে হাসিখুসী আহ্লাদী, কেউ বা পাশের জনের সঙ্গে বন্ধুত্ব জমাতে ব্যস্ত, আবার কেউ-কেউ বা পরস্পরের সাজ-পোশাক দেখেই মুগ্ধ। তাদের রকমসকম দেখেই সিংহসদন হাসিতে ভেঙে পড়ছিল; এরপর কী রকমটি হয় দেখার জন্য সবাই অধীর হয়ে উঠল। মায়ের দল দিদির দল বলছে—না জানি সব কান্নাকাটিই শুরু করে!—কোনটি বা ঘুমিয়েই পড়ে বা আরও কী করে! তাড়াতাড়ি শুরু হলেই তো ভালো হত; তাঁদের ভারি উদ্বেগ। কিন্তু স্টেজের দিকে তাকিয়ে মনে হল—ওদের ও-সবে ভ্রূক্ষেপও নেই। বাড়ী না স্টেজ, সেও তাদের মনে নেই;—বিশেষ যে কিছু-একটা করতে যাচ্ছে এখন যেন তা ভুলেই গেছে। তারা তো রোজই এ সময় বাড়ীতে নাচ-গানের জলসা আর সভা করে থাকে।

খানিক পরে সভার সংগঠক তাদের 'অমিয়দা' (শ্রীঅমিয়কুমার সেন) উঠে দাঁড়ালেন, বললেন—দেখে সবাই বুঝতে পারছেন এটা নেহাতই শিশু-আসর। পরিকল্পনাটি ক্ষিতীশ রায় মশায়ের। এরা রোজই নিজেদের বাড়ীতে বাড়ীতে বা পাড়ায় পাড়ায় সভা-সমিতি করে, নাচ-গান জলসা নিয়ে মেতে থাকে। এরা এখনো স্কুলে যাবার মতো বড়ো হয়নি; আশে-পাশের জিনিস দেখেশুনে শেখাটাই এদের সবার-বড়ো শিক্ষা। শান্তিনিকেতন-পরিবেশের মধ্যে দু'তিন বছর বয়স থেকেই শিশুরা যে কিভাবে গড়ে উঠতে থাকে এ-আসরে সেটাই দেখা যাবে। এখানে নাচ-গান সাহিত্যসভা নাটক প্রভৃতি দেখেশুনে শিশুরা হরদম অনুকরণ করে। এখানে-সেখানে যখন-তখন এদের নাচ-গান করতে দেখা যায়। একটু লিখতে-পড়তে শিখলেই এদের গল্প-কবিতা শিখবার ইচ্ছা জাগে, যেমন তাদের দাদা-দিদিরা সাহিত্য-সভার জন্য লেখে, যেমন পড়ে। এইসব শিশুদেরই বাড়ি-বাড়ি থেকে জোগাড় করে এই আসর জমানো হয়েছে। এদের আমরা কিছুমাত্র দেখিয়ে-শুনিয়ে দিইনি। এরা দাদা-দিদিদের নকল ক'রে নিজেরা যা করে তাই দেখানো হচ্ছে। এদের শুধু বলে দেওয়া হয়েছে তোমরা লেখা-পড়ার বা কবিতা-বলার মাঝখানে নমস্কার কোরো না। আর, একটু জোরে বোলো, সবাই যাতে শুনতে পায়। স্টেজে একদিন রিহার্সাল দেওয়াতে এনে দেখি—মজার

কাণ্ড। আগে এরা হয়তো বলেছে এ কবিতাটা বলব, বা এ গানটা করব। স্টেজে এসে যার যেটা মুখে আসছে শুরু করে দিচ্ছে। আবার, আরেকজনে একটা কবিতা বলছে, দেখল, সেটা তারও মুখস্থ আছে, অমনি মনে পড়ে গেল তার তো সেটা বলা হয়নি, অমনি তার ঝোঁক চাপল—ওটাও বলা চাই। একজনের নাচ দেখে আবো দু-তিন জনের অমনিতর নাচের ঝোঁক চেপে গেল। রিহার্সাল আর তাদের ফুরোয় না। অনেক কষ্টে তাদের বুঝিয়ে ব'লে এবারকার সভায় একটা-দুটো নাচ-গান বা আবৃত্তির ব্যবস্থায় তাদের খুসী করা গেছে। সভার শেষে সাধারণের বক্তব্যের পালা আজো আছে। তাতে শুধু যারা শিশু তারাই বলবেন আর বলতে পারবেন পঞ্চাশ পেরিয়ে যাওয়া প্রবীণ-শিশুরা। এবার এরাই বলবে, কে এদের সভায় আসন গ্রহণ করবেন।

অমিয়দা'র বলা শেষ হল। এবার সভাপতি নির্বাচনের পালা। শিশুদলের একজন উঠে বলে দিলে—আমি এ প্রস্তাব সমর্থন করছি—তার পরেই ভুল সেরে নিয়ে যথারীতি আরেকজন উঠে বললে—আমি প্রস্তাব করছি আমাদের সভায় বিবিদি (শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী) হবেন। আরেকজন আবার তাকে সংশোধন ক'রে দিলে—"বলো,—সভাপতি হবেন।" ইন্দিরা দেবী এসে হাসিমুখে সভার আসন গ্রহণ করলেন। একটি শিশু এসে তাঁকে মালা পরিয়ে দিলে, আরেকজন দিলে চন্দন; আরেকজন উঠে এল তাদের সঙ্গে। তার বন্ধুরা যে উঠেছে, সে উঠে আসবে না?

আজ সকলে তারা নিজেরাও সেজেছে মালা-চন্দনে। সাজে-সজ্জায় সকলকে দেখাচ্ছে যেন পুতুলনাচের জ্যান্ত পুতুলগুলি। ইন্দিরা দেবী খুসী হয়ে তাদের আদর করলেন।

এরপর শুরু হল "সত্যিকারের সভা"। কেউ বা দাঁড়িয়ে একটু হেসে নিল, কেউ বা একটু আড়ামোড়া ভেঙে নিল, কেউ বা আশেপাশে তাকিয়ে দেখলে, কেউ নমস্কার করলে, কেউ বা তা করলে না। কিন্তু ভয় পেলে না কেউ। একজন উঠে বললে—"নোটন নোটন পায়রাগুলি ঝোটন বেঁধেছে।" কেউ বা বললে—"মাসি গো মাসি পাচ্ছে হাসি।" কেউ বললে "আমাদের ছোট নদী চলে আঁকে-বাঁকে।" একজন একেবারে দিদির মুখে শোনা দীর্ঘ "সোনার তরী"ই আবৃত্তি ক'রে গেল। আরেকজন আরো-মস্ত একটা কবিতা গড়গড়িয়ে বলেই চলল, সে বলা আর শেষ হয় না—শুধু প্রথমটুকু আর শেষটুকুই তার শোনা গেল; কচি-কচি হাত-পা নেড়ে-চেড়ে বাঁশির মতো সুরে একের পর এক আবৃত্তি হচ্ছে, ইচ্ছামত সঙ্গে সঙ্গে নাচও

হচ্ছে, সে যে কী-এক অপূর্ব দৃশ্য! সিংহসদন-ভর্তি লোক। সবাই মুগ্ধ হয়ে দেখছে ও শুনছে। ঘন ঘন দর্শকদের সাধুবাদে সিংহসদন মুখরিত। মাঝে একজন বোধ হয় ঘুমের ঘোরে মেজাজ হারিয়ে ফেলছে, চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে বললে—বলব না তো, আমি বলবই না। একজন নাকি আবার উঠেকখন চলেই গেছে তার মার কাছে। একজন তো বলার শেষে একটি পুতুল কোলে করে এসে সভা দেখতেই বসে গেল। উল্লাসের উচ্ছ্বাসে শ্রোতাদের পেটে এদিকে খিল লাগার যোগাড়, মনোভাব অতি কষ্টে সকলেই চেপে রাখছে,—পাছে উপভোগে বাধা পড়ে। তবু এ-কোণ থেকে ও-কোণ থেকে উচ্ছ্বসিত চাপা হাসি মাঝে মাঝে থেকেই ফস্‌ফাসিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। যেমনি "খেলা ভাঙার খেলা" নাচটি হয়ে সভা শেষ হল, অমনি সে কী প্রচণ্ড হাসির রোল; প্রাণভরে সবাই একচোট হেসে নিল। আর, সবার মুখে এক কথা—চমৎকার, চমৎকার, এমন সভা আর দেখিনি।

সাধারণের বক্তব্যে পঞ্চাশোর্ধ্ব-প্রবীণ-শিশু গোঁসাইজী বললেন—সবাই আজ আনন্দ পেয়েছেন, এ-বিষয়ে বিশদ ক'রে বলার কিছু নেই, বললে রসভঙ্গ হবে। এরকম জিনিস শান্তিনিকেতনেও নূতন হল। এ একটি অপূর্ব জিনিস। দু-ঘণ্টা সময় যে কোথা দিয়ে কেটে গেল বুঝতেই পারিনি।

ইন্দিরা দেবীও সভানেত্রীর বক্তব্যে একথাই বললেন—এটা যে কেমন আনন্দ-দায়ক শিক্ষা, এদের এসব দেখে তা সকলে বুঝতে পারছেন। এরকম জিনিস আমাদের দেশে দুর্লভ। হাসি-খেলা নাচ-গানের মধ্য দিয়ে স্বাভাবিকভাবে পড়াশুনা শেখা, আনন্দে বড় হয়ে ওঠা,—এটিই তো আসল শিক্ষা, স্কুলের চাপ নেই, কী সুন্দর সুর-তালের জ্ঞান হয়েছে, দেখে আশ্চর্য লাগে। ছুটি হবার মুখে এরকম বাচ্চাদের নিয়ে শিশুমেলা, শিশুতীর্থ, নাচ-গান, নাটক রচনা পাঠ করালে খুবই ভালো হয়।

এদিকে তো এসব বলাবলি হচ্ছে,—ওদিকে শিশুরদল নিজেদের নিয়ে মহা ব্যস্ত। এ-ওর সাজ দেখছে, এ-ওর সঙ্গে গল্প করছে, তাদের আসর জমেছে, তখন দিব্যি জমে উঠেছে; তারা তাদের নিজেদের আনন্দে নেচেছে, গেয়েছে, আবৃত্তি করেছে। সিংহসদনের আলো ফুলমালা আর লোকজন দেখেই তারা মহা খুসী। নিজেদের আনন্দই তাদের পুরস্কার। বাইরের দিকে এখনো তাদের লক্ষ্যই হয়নি। যেই না সবাই গান ধরলে—

আমাদের শান্তিনিকেতন।
আমাদের সব হতে আপন।—

—অমনি তারাও সবাই দাঁড়িয়ে শুরু করলে "—আ-আ-আ আমাদের শান্তিনিকেতন।" কেউ বা এতটাও বলতে পারছে না, এর-ওর মুখের দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝে মহা উৎসাহে শুধু গেয়ে উঠছে "—তন"। মনে গানটা বাজছে, মুখে ফুটছে না।

বাইরে বেরিয়ে কেউ বা মায়ের হাত ধ'রে খুলে-যাওয়া কাপড়-চোপড় বুকে চেপে চলেছে, কেউ বা বাপের কোলে চেপে একটু যেতে না যেতেই ঘুমিয়ে পড়ছে, কেউ বা বলছে—আবার এমনি হবে? —সুব্রত কর ৫।১২।১৯৫২

ছুটির কয়েকদিন আগে জাপানের কোবে শহরের মায়া-প্রাইমারী স্কুল থেকে ষাটখানা মনোরম ছবিপূর্ণ একটি এলবাম আশ্রমের পাঠভবনের ছাত্রছাত্রীদের উপহার দেওয়া হয়েছে। টোকিওস্থিত ভারতীয় রাজদূত ডঃ মণি মল্লিক মারফত সে উপহার আশ্রমে এসেছে। একদিন সন্ধ্যাবেলা ভাইস-চ্যান্সেলার ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী মহাশয় আশ্রমের শিশুদের সে উপহারগুলি দিয়ে বলেন—ভারতের সঙ্গে জাপানের বহুদিন থেকে সখ্য রয়েছে। আমাদের সময় আশ্রমের সঙ্গে জাপানের বন্ধুত্ব আরও দৃঢ় হয়েছিল, গুরুদেব সে-দেশে যাওয়াতে। এই উপহারের দ্বারা তাঁর স্মৃতি ও সম্মান আরও বেশী বৃদ্ধি পেল। ভবিষ্যতে শান্তিপূর্ণ জগতে দেশে-দেশে শিশুদের মধ্যে এমনিভাবে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠবে, এ আশাই রাখা উচিত।

পাঠভবনের ছেলেমেয়েরা মায়া-প্রাইমারী স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের ধন্যবাদ দেয়। গ্রীষ্মের ছুটির পরে একটি বিশেষ প্রদর্শনী করে এই ছবিগুলি আশ্রমের সবাইকে দেখাবার কথা আছে। ২।৫।১৯৫৪

* * *

গত ৬ই আগষ্ট সন্ধ্যায় 'শমীন্দ্র কুটিরে' (গুরুদেবের কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথের নামানুসারে) আশ্রমের 'আনন্দ-পাঠশালা'র প্রথম সাহিত্য-সভা অনুষ্ঠিত হয়। আশ্রমের উপাচার্য ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। পাঁচ-ছ' বছরের শিশুদের রচনা, গান, নাচ ও আবৃত্তি প্রভৃতি দেখেশুনে তিনি সানন্দে বলেন—তোমরাই পাঠভবনের প্রথম সোপান, শিশু-তরু তোমরা একদিন আশ্রমের মহীরুহে পরিণত হবে। তোমাদের আনন্দধারা আমাদের মধ্যে প্রাণের বেগ সঞ্চার করবে।

উপাচার্য মহাশয় কার্যান্তরে চলে যাবার পূর্বে শিশুদের মিষ্টি খাবার জন্য দশ টাকা দিয়ে যান। তার পরে শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন। সেদিন ছিল অসহ্য গরম, আর শমীন্দ্র-কুটিরের ভিতর ও বাহির

কোথাও তিল-ধারণের স্থান ছিল না। কচি-কচি আধোস্বরে দুচার পংক্তির আবৃত্তি, দু'চার পংক্তির গল্প ও রচনা—শুনে সমবেত দর্শকবৃন্দ খুবই আনন্দ উপভোগ করেছেন. সবথেকে ভালো ল'গছিল তাদের হাসিখুসী সপ্রতিভ ভাবটি। কোথাও তাদের ভয় বা কৃত্রিমতার ছাপ নেই। হাসিখুসীতেই ভরপুর। সভাশেষে কয়েকজন দর্শক ও সভানেত্রী খুশী হয়ে সভাটির প্রশংসা করেন। ১৮।৮।১৯৫৪

৫ই নভেম্বর সান্ধ্য-উপাসনার পর পাঠভবনের নতুন ছাত্রাবাসের পড়বার ঘরে পাঠ-ভবনের ছাত্র-ছাত্রীদের ছবি দেখান কালিফোর্ণিয়ার রবার্টসন-স্কুলের শিক্ষক মিঃ ওরলি। রবার্টসন-স্কুলের ইতিহাস ও ভূগোলের শিক্ষক তিনি, বারো-তেরো বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের পড়ান। কিন্তু শুধু পুঁথি-পড়া জ্ঞান শিখিয়ে তাঁর আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হল না, নিজেই দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করে ইতিহাস-ভূগোলের জ্ঞান অর্জনে বেরিয়ে পড়েছেন প্রৌঢ় বয়সে। বিভিন্ন দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে পরিচিত হবার সম্বল এনেছেন নিজের স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুল ও বাড়ীর জীবনের ছবি। তাই দেখালেন। ছবি দেখানো শেষ হলে এখানকার ছেলেমেয়েদের প্রশ্ন করতে বলেন এবং প্রশ্নের উত্তরে খুসীর সঙ্গে বলেন,—তাঁদের স্কুলে ছোট-খাট একটি লাইব্রেরী আছে, তবে ছেলে-মেয়েরা টাউন-লাইব্রেরীতে গিয়েই পড়বার সুযোগ পায়। সপ্তাহে দু'দিন ছুটি—শনি ও রবি। বছরে জুন থেকে সেপ্টেম্বর অবধি স্কুল বন্ধ থাকে। পরীক্ষাও সারা বছরের ক্লাস রিপোর্টের উপরই নির্ভর করে। ক্রিকেট, টেনিস প্রভৃতি খেলা নেই, তবে বেইস্ বল, বাস্কেট বল প্রভৃতি তারা যথেষ্ট খেলে থাকে। বারো বছর অবধি ছাত্রছাত্রীদের বেতন বা বই-পত্তর স্টেট্ জোগায়। তাই পড়াশুনা করাটা খুবই সহজসাধ্য ব্যাপার। ১২।১১।১৯৫৪

গত জুলাই মাস থেকে বুধবার সন্ধ্যায় শিশু-বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের গল্প বলার নিয়ম পুনঃপ্রবর্তিত করা হয়েছে। এটি শান্তিনিকেতনে কিছু নতুন নয়। আদি অবস্থায় আশ্রম ছিল ছোট, যখন বিনোদন-পর্বে সভাসমিতি নাটক অভিনয় ইত্যাদির ব্যবস্থা ছিল বিরল, তখন থেকেই গুরুদেব সন্ধ্যাবেলায় ছোট ছেলেমেয়েদের নিকট গল্প-বলার রীতি প্রচলন করেছিলেন। শৈশবাবস্থায় সন্ধ্যাবেলায় পড়বার দুঃখ তিনি বড় হয়েও ভোলেন নি। 'জীবনস্মৃতি'তে তাঁদের গৃহ-শিক্ষক অঘোরবাবু সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন—"কিন্তু তিনি যত ভালোমানুষই হোন, তাঁহার পড়াইবার সময় ছিল সন্ধ্যাবেলা এবং পড়াইবার বিষয় ছিল ইংরেজি।" প্রাতঃকালে মনের আনন্দে পড়াশেখার কথাও এ প্রসঙ্গে বলেছেন। এখানে তিনি প্রথম থেকেই

ছোটদের সকালবেলায় ক্লাসে-ক্লাসে পড়া শিখিয়ে পাঠ দেওয়ার নিয়ম করেন। সন্ধ্যাবেলায় গল্প ব'লে ছেলেদের আনন্দ দান ও কল্পনার বিকাশসাধনের দিকে ছিল গুরুদেবের বিশেষ লক্ষ্য। এখানকার বিনোদনপর্ব কথাটার তাৎপর্য লক্ষ্যণীয়। এককালে তিনি নিজেই এই গল্প বলার ভার নিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে জগদানন্দ রায় সন্ধ্যাবেলা ছাত্রছাত্রীদের মাইক্রোপস্কোপের সাহায্যে গ্রহ-নক্ষত্রাদি দেখাতেন এবং সে বিষয়ে বহু গল্প শোনাতেন। অন্যান্য শিক্ষকগণ ছাত্রদের গল্প বলতেন নিয়মিত ও নানা বিষয়ে। পনেরো কুড়ি বছরের পুরোনো ছাত্রছাত্রীগণ এখনো শ্রীক্ষিতিমোহন সেন, নগেন্দ্রনাথ আইচ, তেজেশচন্দ্র সেন, নেপালচন্দ্র রায়, নিশিকান্ত রায়চৌধুরী প্রভৃতির গল্প-বলার কথা সানন্দে স্মরণ করেন। বহুদিন এধারা নিয়মিতভাবে চলেছিল; আবার সে ধারাটি প্রচলিত হলে ছাত্রছাত্রীদের আনন্দের সীমা থাকবে না। শোনা-গল্পগুলি ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে বলিয়ে নিয়ে গল্প বলার ক্লাস এবং গল্প বলার সভাও কয়েকবার এখানে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২০।১২।১৯৫৪

পাঠ-ভবনের ছাত্রছাত্রীদের তাঁতের ক্লাস আগে শান্তিনিকেতনেই ছিল। শান্তিনিকেতনে প্রেসের সামনে ঘরগুলি এ কাজের জন্য ব্যবহৃত হত। শান্তি-নিকেতনে আরেকটি তাঁত-ঘর ছিল 'নাট্যশালা' গৃহটি। সুইডেনবাসিনী মিস্ সিভার ব্লুম এসে সেখানে তাঁর দেশী-পদ্ধতিতে কিছুদিন তাঁত শিখিয়েছিলেন। 'মুকুট' গৃহেও তাঁতের দু'চারটে ক্লাস হত। সম্প্রতি পাঠ-ভবনের তাঁত ও কাঠের কাজের শিক্ষাব্যবস্থা শ্রীনিকেতনে স্থানান্তরিত করবার প্রচেষ্টা চলছে। পাঠ-ভবনের ষষ্ঠ ও পঞ্চম বর্গের ক্লাস এরই মধ্যে শ্রীনিকেতনে চলে গেছে। ছাত্রছাত্রীদের আশ্রমের বাসে বিকেলে শ্রীনিকেতন-যাতায়াতের ব্যবস্থা হয়েছে। সেখানে তাঁত ও কাঠের কাজ, বই বাঁধানো, কাগজ তৈরি প্রভৃতি নানারকম জিনিস শেখানো চলছে। শ্রীনিকেতন বিশ্বভারতীর কারিগরী-শিক্ষাকেন্দ্র। সেখানে গিয়ে ছাত্রছাত্রীগণ বহুবিধ কাজ দেখবার সুযোগ পাবে এবং শিখতে উৎসাহী হবে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কী ফূর্তি! তারা গান করতে-করতে বাসে যাচ্ছে, ওখানে কাজ শিখছে, ঘুরে ঘুরে সব দেখছে, আনন্দে কলরবে ফিরে আসছে। ১৪।৪।১৯৫৪

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, শুকনো খরার শূন্যতার ছায়ায় আচ্ছন্ন করে চোখ, কিন্তু ওরি মধ্যে নব-পল্লবের অকারণ চাঞ্চল্য চিত্তে আনে সবুজ শিহরণ—এক-একটা গাছে ডালে ডালে এমনি লাগে নবোন্মেষের মহোৎসব। তেমনি এখানে রৌদ্রদগ্ধ পরিবেশের শুষ্কতা ভুলিয়ে আশা-আনন্দের সরসতায় উল্লসিত করে—দুপুরের অবসরে পঠিত

শান্তিনিকেতন পাঠ-ভবনের সাহিত্যবার্ষিকী "আমাদের লেখা"-পত্রিকার ছোট্ট পাতাগুলি। নববর্ষের শুভ প্রভাতে ঘটে এর মধুর আবির্ভাব। এগারো বছর ধরে এই চলে আসছে। তা ছাড়া, রবীন্দ্র-জন্মোৎসবের পুণ্যতিথি এখন বিবিধ অনুষ্ঠানে ঐদিনেই শান্তিনিকেতনে উদ্‌যাপিত হয়। যাদের জীবনমুকুল বিকাশের সাধনা নিয়ে কবি সর্বপ্রথমে আশ্রমে বিদ্যালয়ের আকারে প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন করেছিলেন, তাদের সারা বছরের সংগৃহীত রচনা-অর্ঘ্যের প্রকাশ এই বিশেষ দিনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে খুবই শোভন ও সার্থক হয়েছে। নামপত্রে জানা যায়, "শান্তিনিকেতন-পাঠ-ভবনের শিশু-শিক্ষার্থীদের রচিত লেখা ও ছবি সর্বপ্রথমে নিজব্যয়ে ছাপিয়ে প্রকাশ করেছিলেন তনয়েন্দ্রনাথ ঘোষ। 'আমাদের লেখা'—নাম তাঁরই দেওয়া।" পরম দুঃখের বিষয়, এবার বার্ষিকীখানি প্রকাশের অল্প ক'দিন আগেই ছাত্রছাত্রীদের সুহৃদ্ এই প্রবীণ অধ্যাপক তনয়েন্দ্রনাথ পরলোকগমন করেন। তাঁর স্মরণেই এই বার্ষিকী এবার উৎসর্গীকৃত হয়েছে।

এখানকার শিশুরা কী ভাবে, কেমন ক'রে কোথা থেকে ভাবনার বিষয় সংগ্রহ করে, আর আপনাকে প্রকাশ করে কিরূপে, এই তাদের মনোজগতের বিস্ময় ও আনন্দপূর্ণ খবরে ভরতি হয়ে আছে "আমাদের লেখা"র লেখাগুলি। এর মধ্যে শেখা কথা নেই এমন নয়, কিন্তু দেখার কথাই আছে অনেক। তাদের মনের স্পর্শমণির ছোঁওয়ায় সে-কথাই আবার রূপ নিয়েছে, সোনার সৃষ্টিতে। এই সৃষ্টির সহজ আবেগই বেশির ভাগ রচনার মূল বস্তু। এদের অনেক আগে আরেক শিশু এসে একদিন খোয়াইর খাতে খুঁজে বেড়াত তার মনের মানিক, নুড়িতে ভর্তি হয়ে উঠেছিল সেদিন তার কোঁচড়; নারকেলগাছের তলাতে লেখা "পৃথ্বীরাজ পরাজয়" কাব্যের পাণ্ডুলিপি সেই 'লেট্‌স ডায়েরি'র রহস্যময় কাহিনীযুক্ত ইতিহাসের টুকরোটি ছাড়া সেদিনের আর কিছুরি অবশেষ নেই আজকের সামনে। তবু এই সূত্র ধরেই বলতে হয়, 'আমাদের লেখা'র আদি ধারা এভাবেই একদিন শুরু হয়েছিল, সে কথাও নিতান্ত অমূলক নয়। "মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে"—পৃথিবীর সহিত সম্বন্ধের এই নিবিড় বেদনাবাণী বহন ক'রে বিচিত্র সৃষ্টির ধারা বিশ্বে উৎসারিত হয়েছে যে মহাজীবন থেকে, তাঁর পরিবেশে অতঃপর আশেপাশের সহিত আত্মীয়তার ইতিহাস রচনা করে চলবে সেখানকার ছেলেমেয়েরা তাদের স্বাভাবিক সীমায়,—এ না হলেই অসংগত হত। তাদের সাহিত্য ও শিল্প সৃষ্টির মধ্যে এই লক্ষণটি সুপরিস্ফুট। আশ্রমেই থাক, আর বাড়ীতেই থাক, আর, যদিবা যায় কোথাও বেড়াতে, সর্বত্রই তারা আপন ক'রে পেয়েছে দু'চারটি জিনিসকে,—দু'চার কথায়

তাদেরই সহিত যোগ করিয়ে দেয় পাঠকদের মনকে। বটগাছে-বসা টিয়াপাখি, কাঞ্চন-গাছের ফেটে-পড়া ফলের শুঁটি, ছোটো বোন গোপা—সকলেই মিলে খেলায় ডাকছে যেন। জাপানী ছেলে কাসুগাই পিঁপড়েদের শিশিতে পুরে চিনি খাইয়ে পোষ মানাতে ব্যস্ত। ভাষার বাধা নেই, সিংয়ে-কাসুগাই দু'দিনের সঙ্গী জুটিয়ে নিয়েছে দিব্যি বাংলা-বোলেই। 'পলাশ গাছ'টির সুখ-দুঃখ রেখাপাত করে মনে। —'ছেঁড়াকাপড়ের কথা'ও ভোলা যায় না। 'ভীষণ গরমে সবাইকার প্রাণ ওষ্ঠাগত। এমনকি গাছগুলোর'ও, 'শরতের রোদ পেয়ে মাথা বের করেছে ঘাসফুলের দল',—কিন্তু তাই ব'লে 'সাইকেলের আত্মকথা'য়ও উদাসীনতা নেই। কল হয়েও সে শিল্পীর হাতে প'ড়ে সকলের উপর টেক্কা দিয়েছে। ফুল, পাখি, তৃণলতা, প্রকৃতির সব-কিছুর সঙ্গে সরস হয়ে মানিয়ে গেছে কলকলিতে। তেমনি, কথা কয়ে উঠেছে 'শ্যামবাজারের সকালবেলা'—"এখন সিনেমা আরম্ভ হবে তাই লোকেরা হলের ভিতর ঢুকছে।" প্রাচীন ঐতিহ্যের রাজ্য থেকে মাথা তুলেছে "মহিষাদল রাজবাড়ী", যার সুরক্ষিত অস্ত্রশালা এখনও প্রাচীন শৌর্যবীর্যের পরিচয় দেয়। "গুরু-শিষ্যে"র গল্পে জমে আসর। এর পরেই মিলে "রবীন্দ্রনাথের 'শিশু'র পরিচয়।" বিদেশী "রূপকথার যাদুকর অ্যাণ্ডারসেন" আনে দূরের নৈকট্য। 'নটরাজ ঋতু-রঙ্গশালা', 'নদীর আত্মকথা', আর 'আয় বিষ্টি ঝেঁপে'র মধ্যে অনুভূতির বুনানিতে লিখিত হয়েছে পুঁথিপত্রের জগতের সঙ্গে মিতালির কথা। এর সঙ্গে কাঠ-খোদাই চিত্রের বিচিত্রতায় বার্ষিকখানির আগাগোড়া রূপরেখার মেলা বসেছে। লেখার অংশে ভাষাভঙ্গীতে সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য রসের সমাবেশ যে পরিমাণ রয়েছে, মননধর্মী বিষয়-বৈচিত্র্যের আশা জাগে সেই পরিমাণই। কিন্তু বিজ্ঞান ও সমাজের নানা প্রসঙ্গের অভাব সেই কারণেই কিছুটা অঙ্গহানিকর হয়ে উঠেছে ব'লে প্রতীয়মান হয়। তবু প্রকাশের আকুলি-বিকুলির মাধুর্যটুকুই শেষ পর্যন্ত মনে থাকে। এবং তাতেই স্নিগ্ধ করে সকল পরিতাপ। আর, সবটা মিলে মনে করিয়ে দেয় যে, "মানুষের শ্রেষ্ঠ পরিচয় হচ্ছে মানুষ সৃষ্টিকর্তা।" (রবীন্দ্রনাথ—'সাহিত্যের পথে')

* * *

শান্তিনিকেতনে নানা দেশের ছেলেমেয়েরা এসে শিক্ষা গ্রহণ করে কবির সাক্ষাৎ ব্যক্তিত্বের ছাপমাখা পরিবেশে; ভৌগোলিকভাবে বাস্তব হয়ে নেই কোথাও এর দোসর আর-একটি প্রতিষ্ঠান। কিন্তু এতদিনে পৃথিবীর নানা দেশেই এর আদলে আরো দু-চার জায়গায় এ রকম প্রতিষ্ঠানের প্রসার না হয়েছে এমন নয়। ইংলণ্ডের ডারটিংটন হল, সুইজারল্যাণ্ডে ডঃ গেহিভের স্কুল, সিংহলের শ্রীপল্লী প্রভৃতি তার

নিদর্শন। সম্প্রতি আফ্রিকার বৃটিশ গায়েনাব 'টাগোর মেমোরিয়াল স্কুল'-এর কথা জানা গেছে; তার প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত ব্রজমাধব ভট্টাচার্য এম-এ, বি-টি, এক পত্রে লিখেছেন যে, সেখানে গত জানুয়ারী থেকে একটি স্টাডি সার্কেল-এরও পত্তন হয়েছে, শাখা-প্রশাখায় ঐ অঞ্চল ছেয়ে দেবার পরিকল্পনা নিয়ে তাঁরা কাজ আরম্ভ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রতি বছর বহু রচনা পাঠ ও আলোচনার বিস্তারই সে প্রতিষ্ঠানের অন্যতম উদ্দেশ্য। শান্তিনিকেতনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেই তাঁরা এ কার্যে অগ্রসর হবার আশা করেন। শত-বার্ষিকীর আনন্দ-উদ্দীপনায় সাড়া মিলেছে সেখান থেকেও। দেশে দেশে যে ঘর আছে, সেই ঘরের খবর এদেশেও সকলের মধ্যে আনন্দের যোগ বাড়াবে, সন্দেহ নাই। ২০।৬।১৯৫৮

*　　　*　　　*

শান্তিনিকেতনের বিবিধ প্রসঙ্গ শেষে তার চলতি জীবনের চিত্রখানি সেখানকারই একটি ছাত্রের লেখা থেকে উদ্ধার করা গেল :—

আমি শান্তিনিকেতনের ছাত্র; এখানেই থাকি। ভারতের বিখ্যাত শিক্ষা-তীর্থ এই শান্তিনিকেতন। সারা ভারতের নানা স্থান থেকে নানা জাতের ভারতীয় ছেলেরা এখানে এসে সাহিত্য, বিজ্ঞান, সংগীত, শিল্প প্রভৃতি নানা বিষয়ে শিক্ষা লাভ করে। পৃথিবীর নানা দেশ থেকে পণ্ডিতরা এসে এখানে শিক্ষা দেন। এক অপূর্ব শান্ত ও শান্তিময় পরিবেশের মধ্যে আমরা এখানে মুক্ত মন নিয়ে কিভাবে আনন্দ-উৎসবের ভিতর দিয়ে শিক্ষালাভ করি সেই কথাই এখানে কিছু-কিছু বলবার চেষ্টা করব।

শান্তিনিকেতনে আমরা সকালে উঠে হাত-মুখ ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে নিই। তারপর খেয়েদেয়ে, একসঙ্গে বই বগলদাবা করে আসন ঝুলিয়ে ইস্কুলে যাই। ঘণ্টার তালে তালে কাজ হয়। হোস্টেলের ছেলেমেয়েরা অনেক দূর দেশ থেকে এখানে আসে। বাপ-মা তাদের কোল-ছাড়া করে পাঠিয়ে দেন। খাওয়ার সময় হলে গুরুপল্লীতে বাসায় আমাদের মা খেতে ডাক দেন—ওঠার সময় মা স্মরণ করিয়ে দেন সকাল হয়েছে। হোস্টেলের ছেলেদের সঙ্গে তো আর মা নেই! কে স্মরণ করিয়ে দেবে? ঘণ্টাই ওদের জানিয়ে দেয় সকাল হয়েছে, খাওয়ার সময় হয়েছে। ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজে। শিশু-বিভাগের ও ডরমিটরীর ছেলেরা তখন সার বেঁধে দাঁড়ায়। ঘণ্টা শেষ হলেই সবাই রান্নাঘর অভিমুখে রওনা দেয়। জলখাবার খেয়ে সকলে গ্রন্থাগারের সম্মুখে জড় হয়। তারপর শ্রেণী-হিসাবে সকলে ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে লাইন ক'রে দাঁড়ায়। ছোট-বড়ো, ছাত্র-শিক্ষক সকলেই এসে তখন বৈতালিকে যোগ দেয়। সকলেই চুপ। সারা আশ্রমই সেই সময় নিস্তব্ধ থাকে। অতগুলি লোক এক জায়গায়

চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। দেখলে মনে হয় সারি সারি সব যেন পুতুল,—রূপারকাঠির ছোঁয়ায় যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। অনেক লোকের মেলা। ঘণ্টাই হচ্ছে আশ্রমের সোনার কাঠি। জীবন চলে তারি তালে। পাঁচ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকার পর ঘণ্টা পড়লেই ছাত্র-ছাত্রীরা বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করে। গ্রন্থাগারের বারান্দায় দাঁড়ায় গান করার দল। মন্ত্র শেষ হলেই আরম্ভ হয় গান। গান শেষ হলে যে-যার কাজে চলে যায়। আমরা যাই ক্লাসে। গাছতলায় ক্লাস। আসন পেতে সবাই বসি। অন্য স্কুলের মতো কাঠের বেঞ্চিও নেই, বন্ধ ঘরও নেই। বাইরের অনেকের কাছে এটা নিশ্চয়ই গল্পের মতো লাগবে। কিন্তু এ আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। গাছ-তলায় ক্লাস করায় মনটা শান্তিপূর্ণ থাকে। মাথাও থাকে ঠাণ্ডা। মনটা এক জায়গাতেই বন্ধ থাকে না। একই জায়গায় রোজ বসতে ভালো লাগে না। তাই প্রত্যেক ঘণ্টায় জায়গা অদল-বদল হয়। এতে মনে হয় সত্যি যেন আমরা আরেকটা ক্লাসে ঢুকলাম। আবার আরেকটা পাঠ্য-বিষয়ে মনটা পুরোদমে বসে। আগে কী হয়েছে না হয়েছে সেটা আর মনেই থাকে না। শিক্ষককে "স্যর" বলাটা এখানকার রীতি নয়। মাস্টারমশাই প্রত্যেক ছেলেকেই চেনেন। তাঁদের ভাইয়ের মতো নাম ধরে ডাকেন। আদর করেন। ছাত্ররাও মাস্টারমশাইদের যে শুধু গুরু মনে করে ভয় করে তা নয়! দাদাকে যেভাবে লোকে ভালবাসে, সম্মান করে, সেই রকম মাস্টারমশাইদেরও সবাই এখানে করে থাকে। তাই সকলের নামের শেষে 'দাদা' শব্দটি যোগ ক'রে মাস্টারমশাইদের কিংবা যে কোনো বয়োজ্যেষ্ঠ লোককে এখানে সম্বোধন করা হয়। এই দাদা শব্দটিই প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের আত্মীয়তা স্থাপন করে দিয়েছে এখানে। সাড়ে দশটায় সকালের-স্কুলের ছুটি হয়। তখন যে-যার বাসায় গিয়ে খেয়ে বিশ্রাম করে, আবার আড়াইটার সময় স্কুলে যেতে হয়। তিনটি পিরিয়ড্ ক্লাস হয়। এখানে বিকেলবেলায় ছেলেমেয়েদের নানারকম হাতের কাজ শেখানো হয়ে থাকে। শুধু-পুঁথিগত বিদ্যা ছেলেদের অকর্মণ্য করে রাখে, তাই ছাত্রেরা এখানে শুধু যে বই পড়েই খালাস, তা নয়। ছেলেদের কার্পেণ্টারি, ড্রয়িং, মডেলিং, বাগান করা ও মেয়েদের সেলাই ও চামড়ার ব্যাগ করা—এসব বুনিয়াদি-পদ্ধতিতে শিক্ষালাভ করতে হয়। সাড়ে চারটেতে স্কুলের পড়ার পালা শেষ। তারপর হোস্টেলের ছেলেদের নিজের নিজের ঘর ঝাঁট দিতে হয়। পাঁচ থেকে দশ বছরের ছেলেদের থাকবার ঘর হচ্ছে 'সন্তোষালয়' বা শিশু-বিভাগ। আশ্রমে সন্তোষ মজুমদার ব'লে একজন শিক্ষক ছিলেন। তিনি ছোট ছেলেদের খুব ভালবাসতেন। সরল ছিলেন শিশুদের মতোই। সকলের সঙ্গেই হেসে ভালবেসে কথা বলতেন। অকালে তাঁর

মৃত্যু হয়। তাঁরই স্মৃতি-রক্ষার্থে এই কুটির নির্মাণ করা হয়েছিল। বারো থেকে পনেরো বছরের ছেলেদের এখানে থাকবার তিনটি ঘর আছে। সত্য-কুটির, সতীশ-কুটির, আর মোহিত-কুটির। এর প্রত্যেকটি ঘরের নামকরণ আগেকার এক-একজন লোকের স্মৃতি-রক্ষার্থে করা হয়েছে। এঁরা প্রত্যেকেই এক-একজন আশ্রমের আদর্শ লোক ছিলেন। এরপর বিকেলে জলখাবার খেয়ে সবাই মাঠে আমরা একত্র হই। খেলার সুবন্দোবস্তের জন্য জেনারেল লাইন হয়। এতে এক-এক টিমের ক্যাপটেন থাকে। তারাই খেলার সব ব্যবস্থা করে। এই সময় সকলের উৎসাহ ও উদ্যম পুরোমাত্রায় প্রকাশ পায়। সকল প্রকারের খেলাই হয়ে থাকে এখানে। সকলে খেলা-শেষে বাড়ি ফেরে। এরপর সন্ধ্যায় উপাসনার ঘণ্টা পড়ে। খানিকক্ষণ চুপ করে বসে সবাই, তারপর দাঁড়িয়ে বৈদিক মন্ত্র পাঠ করে। তারপর আবার আরম্ভ হয় পড়াশুনা। রাত সাড়ে-আটটায় পড়ে খাবার ঘণ্টা। ন'টায় শোবার ঘণ্টা। মোটমাট এখানে এই তো হল আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা-প্রণালী। এর মাঝে মাঝে চলে কত আনন্দ-উৎসব। রোজই একটা-না-একটা-কিছু অনুষ্ঠান হয়। নাচ, গান, জলসা, সভা ইত্যাদি। স্কুলে ছাত্রদের মধ্যে তিনটি সাহিত্য-বিভাগ আছে। আদ্য-বিভাগ, মধ্য-বিভাগ ও শিশু-বিভাগ। একটি করে সভা তিনটি বিভাগ থেকে প্রতিমাসে হবেই। নবম বর্গ থেকে পঞ্চম বর্গের ছেলেমেয়েদের নিয়ে শিশু-বিভাগ গঠিত। চতুর্থ বর্গ ও তৃতীয় বর্গ নিয়ে মধ্য-বিভাগ গঠিত এবং দ্বিতীয় ও প্রথম বর্গের ছাত্রছাত্রী নিয়ে গঠিত আদ্য-বিভাগ। প্রত্যেক বিভাগে একজন সম্পাদক ও আর-একজন সম্পাদিকা থাকে। তারাই সবার কাছ থেকে লেখা জোগাড় করে। কেউ ভ্রমণ-কাহিনী, কেউ গল্প, কেউ প্রবন্ধ কিংবা কেউ স্বরচিত কবিতা দেয়। সভাপতির দ্বারা সভাগুলি নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হয়। এ ছাড়া বড় বড় উৎসবও হয়। দোল বা বসন্তোৎসব এখানকার একটি বড় উৎসব। সবাই বাসন্তী রঙের কাপড় প'রে আম্রকুঞ্জে এসে জড় হয়। মিছিল ক'রে নৃত্য-সহযোগে মেয়ের দল প্রাঙ্গণে ঢোকে। পিছনে থাকে গানের দল। বহুলোক আসে। মেয়েদের প্রত্যেকের পরনে থাকে বাসন্তী রঙের কাপড়। হাতে কারো শঙ্খ, কারো থাকে থালায় ভরা আবির। শ্রদ্ধেয় ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী মহাশয়ের বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করার পর আরম্ভ হয় গান, আবৃত্তি ও নাচ। অনুষ্ঠান শেষ হলেই আবির নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। মাঝখানে রাখা হয় আবিরের থালা। বাইরের মতো পিচকারিতে রঙ না দিয়ে চলে শুধু আবিরের খেলা। সকলে আবিরের রঙে লাল হয়ে যায়। গুরু-জনদের পায়ে আবির দিয়ে নমস্কার করি। এই রকম দোল ছাড়া আরো বহু উৎসব

আছে। সংখ্যায় সে-সব অফুরন্ত বললেই হয়। আশ্রমসম্মিলনী এর মধ্যে আর একটি বিশেষ উৎসব। এই সম্মিলনী কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি। এর উদ্দেশ্য ছিল বালক-বালিকাদের নিজের হাতে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করার অভ্যাস সৃষ্টি। তিনি শিক্ষা বলতে বুঝতেন—মানুষকে তার নিজের অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করা।

মধ্যে মধ্যে বেড়াতে যাওয়ার কথাটা ত' বলিই নি—সবচেয়ে আনন্দের ব্যাপার সেটা। কোনো-কোনোদিন মেঘলা আকাশে বাদলের পূর্বাভাস দেখা দিলেই ছুটি নিয়ে দু'তিন ক্লাস একসঙ্গে নিরুদ্দেশের পথে বেরিয়ে পড়ি আমরা; সঙ্গে থাকেন একজন মাস্টারমশাই। রেল-লাইনের ধার-ধ'রে কতদূর চলে যাই, কত সুন্দর অপূর্ব প্রাকৃতিক সব দৃশ্য ভেসে ওঠে চোখের সামনে। কত ফুল-গাছ, কুল-গাছ, ডোবা, পুকুর, ঝোপ-ঝাড় আর ধূ ধূ-করা রাঙা-মাটির মাঠ! যেতে যেতে কত গান, হাসি, গল্প-তামাশা চলে। সঙ্গে সঙ্গে পকেটে ঠেসে ঠেসে এত-এত কুল বোঝাই করি। যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ি তখন কোনো গাছের ছায়ায় বা নদীর ধারে বসে সবাই মিলে 'রুমাল-চোর', 'একটিং' প্রভৃতি খেলা করি। কেউ কেউ আবার সেই নদীতে স্নানও করে। কিছুক্ষণ পরে আবার গন্তব্যস্থলে রওনা দিই আমরা। এইরকম প্রায়ই মেঘলা দিনে কোনো-না-কোনো দল বেড়াতে যায়। মেঘলা দিনে আশেপাশে যখন ময়ূর আনন্দে পেখম ধরে নাচে, শান্তিনিকেতনে ছেলেরা তখন ক্লাসে চুপ করে বসে থাকতে পারে না। ঝিমনো দিনকে আমরাই সতেজ করে তুলি। ছ'টা ঋতু বিচিত্র খেলা খেলে যায় এই আশ্রমের প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে দিয়ে। চোখের উপর দেখতে পাই প্রকৃতির রঙ রোজই কিছু না কিছু বদলাচ্ছে। কোনোদিন হয়তো দেখলাম শালগাছগুলির একটিও পাতা নেই, শুকিয়ে সব ঝ'রে নীচে প'ড়ে আছে। পাতা-কুড়ানি-মেয়েরা কেবল বস্তা ভ'রে ভ'রে শুকনো পাতাই নিয়ে যাচ্ছে! কিন্তু কয়েক মাস পরেই আবার দেখি অন্য দৃশ্য! দেখি, কচি পাতায় সমস্ত শাখা ভর্তি হয়ে গেছে, আর সেই শাখায় ধরেছে অজস্র ফুল; অবিরাম পাখীগুলি ডেকে চলেছে তারই মধ্যে। পাতাকুড়ানীদের আর দেখা নেই। তারা তখন যদিই বা আসে, প্রকৃতিই তাদের তাঁর বন-সৌন্দর্যে ভুলিয়ে দেন। হয়তো তাদেরও আর পাতা-কুড়োবার কথা মনেই থাকে না। তাকিয়ে থাকি আমরা ফুলে-ফলেভরা সব গাছের দিকে। ছয়টি ঋতুকে বরণ করে নেবার জন্য উৎসব হয়। বসন্তোৎসবের কথা বলেছি। আরো আছে,—যেমন শারদোৎসব, নববর্ষ, বর্ষামঙ্গল ইত্যাদি।

মাঝে মাঝে চলে চড়িভাতি কোপাই-নদীর তীরে। গোয়ালপাড়া গ্রাম মাইল দু'এক হবে। আমরা সেখানে চলে যাই। স্কুলের প্রায় সব ছেলেমেয়ে ও শিক্ষকগণ এতে যোগ দেন। কোপাই নদীটি ছোট্ট। কুলু-কুলু ক'রে বয়ে চলেছে। হাঁটু অবধি জল। এই পাহাড়ে-নদী বর্ষার সময় কিন্তু ভয়ানক আকার ধারণ করে, তাতে বান ডাকে। অনেক সময় গ্রামকে-গ্রাম ভাসিয়ে দেয়। বর্ষাকাল ছাড়া স্বভাবতই এই নদীর জলটা স্বচ্ছ ; টলমল করে যেন আয়নার মতো। মুখ দেখা যায়। নদীর তীরেই আমবাগান। তার আশেপাশে ছোট ছোট বাড়ি। এক-একটি যেন শান্তির নীড়। ছায়ায়-ভরা আমবাগানেও মধ্যে মধ্যে আমাদের চড়িভাতি হয়। কবি বলেছেন : মানুষ আগে অসভ্য ছিল। তাদের নির্দিষ্ট বাসস্থান ছিল না। গুহায় গুহায় বাস করত। বনে বনে ঘুরত। পশু মেরে কাঁচা কাঁচাই অবেলাতে, অনিয়মেতে হৈ-চৈ করে খেত। আমরা তাদের উত্তর-পুরুষ। আমাদের সঙ্গে তাদের রক্তের যোগ একটু আছে। তাই মাঝে মাঝে রক্তে টান লাগে। সেইজন্য আমরাও মাঝে মাঝে বনে গিয়ে হৈ-চৈ ক'রে অবেলাতে চড়িভাতি করি। এই চড়িভাতিতে খুবই আনন্দ হয়। কেউ রান্নার জোগাড় করছে, কেউ গাছে হেলান দিয়ে বই পড়ছে, আবার কেউ কেউ নানারকম খেলা খেলছে। এখানে মাস্টার ছাত্র সবাই একসঙ্গে বসে গল্প করেন। খেলাধুলাও করেন। বেলা বারোটার সময় খাওয়া হয়। বিকেল চারটের সময় সবাই আবার বাড়ির দিকে রওনা দিই। সবার মুখে তখন আর তেমন হাসি দেখা যায় না। সমস্ত আনন্দ শেষ ক'রে দিয়ে শ্রান্ত-ক্লান্ত মনে চুপচাপ চলে আসি। সাত-ই পৌষের মেলায় পয়সা খরচ করে ফেলার মতই সেদিনকার সমস্ত আনন্দটুকু নিঃশেষ ক'রে ম্লান মুখে ফিরে যাই। পরদিন আবার আরম্ভ হয় ক্লাস। এমনি করেই এখানে কাটে আমাদের বাল্য-জীবনের, শিক্ষাশ্রমের দিনগুলি।

এক কথায় অপূর্ব শান্তি, শিক্ষা ও আনন্দের নিকেতন আমাদের এই শান্তিনিকেতন।

এখানের আরও বহু আকর্ষণ আছে,—মায়ের স্নেহ, পিতার কর্তব্য, ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে যেন এখানের আবহাওয়ায়। তাই এখানের শিক্ষা বোঝা ব'লে মনে হয় না, ভার বলে ভয় হয় না। শান্তিনিকেতন ছেড়ে কোথাও গেলে কয়েকদিন পরেই যতক্ষণ না আবার এখানে ফিরে আসি ততক্ষণ মন যেন কেমন ছটফট করে। আর চোখের উপর আশ্রমের এই ছবিগুলি ভেসে ওঠে—মনে হয় :

আমরা যেথায় মরি ঘুরে
সে যে যায় না কভু দূরে
মোদের মনের মাঝে প্রেমের সেতার বাঁধা যে তার সুরে,
মোদের প্রাণের সঙ্গে প্রাণে
সে যে মিলিয়েছে এক তানে,
মোদের ভাইয়ের সঙ্গে ভাইকে সে যে করেছে একমন।
আমাদের শান্তিনিকেতন॥ —সুব্রত কর

প্রাকৃতিক পরিবেশ

শান্তিনিকেতন-সৃষ্টিতে প্রথম সহায়তা আসে প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে। স্থানটির শান্ত-উদার আহ্বান মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে একদিন এখানে সাধনবেদী রচনায় আকৃষ্ট করে। তারপরে এসেছে মানুষ আর বিচিত্র কর্ম-আয়োজন। নানাদিকেই ক্রমে নানা পরিবর্তন দেখা দেয়।

* * *

আশ্রমের প্রাচীনতম গৃহগুলির অন্যতম 'গৈরিক',—বোলপুর-গোয়ালপাড়ার রাস্তার পাশেই সেটি অবস্থিত। মাটির বাড়ি, খড়ের চাল—গেরুয়া ধুলার সঙ্গে তার মিতালি। আশ্রমের পুরোনো অধিবাসীদের কাছে এটি 'পুরোনো হাসপাতাল' নামেই পরিচিত। আশ্রম-প্রতিষ্ঠার আদিপর্বে বহুদিন অবধি এই গৃহটি আশ্রমের হাসপাতালরূপে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। জীর্ণ অবস্থায় মেরামত করিয়ে এতদিন অবধি তাকে টিকিয়ে রাখা গিয়েছিল। এবারকার ঝড়ে সেটি ধ্বসে পড়েছে। আশ্রমের পুরোনো বাড়িগুলি এক-একটি করে প্রায়সকল ক'টিই ভেঙে পড়ছে, মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। আশ্রমে গুরুদেবের প্রথম বাসগৃহ 'দেহলি' এখনও 'গৈরিকের' পাশে ভগ্নপ্রায় অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে, কোন্‌দিন বা ধ্বসে যায় এই আশঙ্কা। রবীন্দ্রনাথের বহু স্মৃতি-বিজড়িত এই গৃহ, আশেপাশে খড়ের 'নতুন বাড়ি' আজো কোনোরকমে অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। ঐতিহাসিক মূল্যে কিন্তু 'উদয়ন', 'শ্যামলী' প্রভৃতির থেকে এদের মর্যাদা কম নয়।

* * *

সংগীত-ভবনের প্রেক্ষাগৃহটির নির্মাণ কাজ অনেকটা এবার এগিয়েছে। এ কাজ শেষ হলে একটি বিশেষ অভাব দূর হবে। কোনো জল্‌সা বা নাট্যাভিনয়ে এখন যে

জনসমাগম হয়, তাতে সিংহসদনের হলটিতে ধরে না। সারা বছরের লেখাপড়া নিয়ে পরীক্ষার বোঝাপড়ার-পালা জমে সেখানে। মাঝে মাঝে সুযোগমতো দু'চারটে ভারী রকমের বক্তৃতা বা কাজের বৈঠকের বেলা স্থানটি কাজে লাগে।

* * *

ভোজনশালা, আরোগ্যসদন ও শ্রীভবনের বাড়িগুলিরও আয়তন বৃদ্ধি হচ্ছে।

দেখতে দেখতে পূর্বপল্লীর মাঠঘাট বাড়িতে-বাড়িতে ছেয়ে গেল। ক্রমশই যে লোকজনও বাড়ছে, এসব তারি নিদর্শন। আরো লোক আসবে। আসাই স্বাভাবিক। বিশ্বভারতীকে কেন্দ্র ক'রেই এ সবের সমাবেশ হচ্ছে। বাড়িতে-বাড়িতে বিশ্বভারতীর প্রসার হলে,—সাংস্কৃতিক আবহাওয়াটি ছড়িয়েথাকলে,—সেইটি একটি পরম সার্থকতা ঘটাবে। আশ্রমের ভিতরে স্কুল-কলেজ-অফিস নিয়ে থাকবে বিশ্বভারতীর সাধনার কেন্দ্রীকৃত রূপ, আশেপাশের এই পল্লীগুলির বাড়িতে-বাড়িতে প্রসারিত হয়ে বিরাজ করবে—সেই সাধনার বিকেন্দ্রীকৃত রূপ। অথচ, এমন-একটি সহজ ব্যবস্থায় সবটাই আবার বাঁধা থাকবে, যাতে পরস্পর পরস্পরের যোগে বৈচিত্র্যের মধ্যেও ঐক্যের আদর্শটিকে এগিয়ে নিয়ে চলবে। ইতিমধ্যে এই উদ্দেশ্যের সার্থকতা সূচিত করছে দুই-একটি পরিবার বিশেষভাবেই। সকলেই জানেন, সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অন্নদাশংকর রায় সপরিবারে শান্তিনিকেতনে এসে বাস করছেন। তাঁর বাসা-বাড়িটি হয়েউঠেছে একটি সাংস্কৃতিক-আলোচনার রুচির কেন্দ্র। দেশীয়-বিদেশীয় নানাজাতীয় সুহৃদ্‌সজ্জনের নানা রচনা পাঠ ও মনোভাব-বিনিময়ের সুযোগে, যারা পর ছিল তারা পরস্পর ঘরের লোকের মতো মানসিক নৈকট্য অনুভব করছে। এরূপে বিশ্ব এসে নীড় যদি পায় ঘরে-ঘরে—তবেই বিশ্বভারতীর কাজ হল। শ্রীযুক্ত রায় এবং তার বিদুষী-পত্নী শ্রীযুক্তা লীলা রায় দু'জনে মিলেই এ কাজ সম্পাদন করে চলেছেন আশ্রমের সঙ্গে নিজেদের তেমন না জড়িয়ে। জনসাধারণের দৈনন্দিন-জীবনের একটি আকর্ষণ সিনেমা। এটিও কেউ-কেউ বলতে চান সংস্কৃতির বাহন। সে বাহন বোলপুর-শান্তিনিকেতনের, পথে ক'দিন খোঁড়া হয়ে পড়েছিল। সবাক-চিত্রের 'বিচিত্রা' গৃহের সামনে দিয়ে আসতে-যেতে লোকে অবাক হয়ে দেখেছে মুখ-বোজা তার মূক-অবস্থা। শোনা যায়, আলো বাতাস এবং মেয়ে-দর্শকদের আসন-ব্যবস্থার ত্রুটি না সারিয়ে নিয়ে ব্যবসা করা চলবে না,—মূক জনতার এটুকু সাংস্কৃতিক দাবীর জোর দেখা দিয়েছে;—বাইরের প্রতিবেশটাকে অসংস্কৃত রেখে তারা ভিতরে সংস্কৃতি ভরতে আর রাজী নয়। সরকারও নাকি সেই অনুযায়ী আবশ্যক ব্যবস্থা করে দিতে সিনেমার মালিকদের

সুবুদ্ধি জুগিয়েছিলেন। তাই কিছু সংস্কার সম্ভব হল। আবার দরজা খুলেছে।
৯।২।১৯৫২

'তিনপাহাড়'—বীরভূমের শেষ-সীমায় রেলওয়ে-স্টেশন নয়; শান্তিনিকেতনের পূর্বসীমায় বড়ো তিনটি মাটির ঢিবি। পাহাড়ের উপরে বিরাট এক বটগাছ। চারিদিকে আঁকা-বাঁকা তার মোটা-মোটা অসংখ্য শিকড়; তাকে জড়িয়ে-জড়িয়ে ঝুলে-ঝুলে নেবেছে কত ঝুরি; ডালপাতা ছড়িয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বট, রবীন্দ্রনাথের লেখা সেই 'বটগাছে'রই প্রতিমূর্তি—

লুটিয়ে পড়ে জটিল জটা
ঘনপাতার গহন ঘটা
হেথা-হোথায় রবির ছটা
পুকুরধারে বট।

এখানেও বটগাছটি রয়েছে পুকুরের ধারেই। তিন-পাহাড়ের চেহারায় পাহাড়ের উচ্চতা, পাহাড়ের গাম্ভীর্য এনে দিয়েছে এই বট। তার আশে-পাশে তাল-তেঁতুল আমলকি বাদাম প্রভৃতি জানা-অজানা কত গাছের ভিড়। কতকাল থেকে পাখী এসে বাসা বাঁধছে, চলে যাচ্ছে। যখন-তখন তাদের কিচির-মিচির কলরব ওঠে, কখনো ওঠে চ্যা-চ্যা চীৎকার। দারোয়ানদের পোষা গরু, ভেড়া, ছাগল সারাদিন ঘুরে বেড়ায় ওর গা বেয়ে।

* * *

'তিনপাহাড়' তৈরি হয়েছিল পুকুরের প্রয়োজনে। বীরভূমের রুক্ষ মাটি থেকে জলের ধারা বের করবার জন্যে আশ্রমে অনেক চেষ্টা হয়েছে। এ পুকুরটিও সেই প্রচেষ্টার নিদর্শন। পুকুরের মাটি পুবপাড়ে ফেলে-ফেলেই এই তিনপাহাড়ের সৃষ্টি। অনেক গভীর ক'রে খুঁড়েও দেখা গেল জল গ্রীষ্মকালে একটুও থাকে না, জলের যে-অভাব সে-অভাবই থেকে যাচ্ছে। তখন এর ভিতরে আরেকটি কুয়ো কাটাবার চেষ্টা হল। তবু জল মিলল না। অগত্যা পুকুরকাটা পরিত্যক্ত হল। এখন সেটা তিনপাহাড়ের পাশে বড় একটা ডোবার মতো হয়ে রয়েছে। বর্ষার জলে ভরে ওঠে, কুমুদ-কহ্লার ফোটে; অন্য সময় থাকে শেওলাদাম আর পাঁকে-ভরা। চারপাশে তালের সারি। বর্ষার দিনে শান্তিনিকেতনের পাশের গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা দিনে-রাতে আসে তাল কুড়োতে। আর আসে আশ্রমের ছেলেমেয়ের দল। তিনপাহাড় তাদের নেচার-স্টাডি অর্থাৎ প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণের স্থল।

প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণ আশ্রমের শিক্ষার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। কলাভবনের ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে আসে, কখনো আসে কেউ একা। দেখে গাছপালা, মাটি, জল, পশুপাখি। দেখে-দেখেই বেড়ায়—কখন্ কোন্‌টার কী রূপ ফোটে; কোন্‌টাকে কোন্ দিক থেকে কী রকম দেখায়। কিছু আঁকে, কিছু আঁকে না। শিক্ষকগণ বলেন—দেখো, বারবার করে দেখো। ভাবো, নানাভাবে ভাবতে থাকো একটা জিনিসকে।

তালগাছের যে স্তব্ধ সারি, সে কি শুধুই গাছের সারি! দেখে কি মনে হয় না—বোঝা-মাথায় যেন চলেছে হাটুরের দল। ঝড়ের বেগে এই তাল-শ্রেণীই কি ছুটে চলতে চায় না ঝড়ের সঙ্গে পাতার গুচ্ছ উড়িয়ে! বটগাছের যে মহিমা, সে কি তাকে নানাভাবে পর্যবেক্ষণ না করলে বোঝা যায়! বট, তাল, তেঁতুল; পাহাড়ের উপর থেকে আশ্রমের দৃশ্য, তার কোলে ওই পরিত্যক্ত ডোবাটি—কত-কিছুর আকর্ষণ রয়েছে চারিদিকে। কলাভবনের ছাত্রছাত্রী-দল কেবলই ঘুর-ঘুর করে তিনপাহাড়ের এপাশে-ওপাশে নীচে-উপরে।

* * *

পাঠভবনের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে ফিরে পাঠভবনের ছাত্রছাত্রী-দল; কত রকম খবর তারা জানে—তাল, তেঁতুল, বট, আমলকির মধ্যে কী-কী পার্থক্য; কোনে কতরকমের গুটিপোকা পাওয়া যেতে পারে। গুটিপোকা বাক্সে ভরে তারা খেতে দেয় পাতা; দেখে গুটি কেমন করে বাঁধে; কতদিনে গুটি কেটে বেরিয়ে যায় প্রজাপতি—রঙবেরঙের ডানা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে। পুকুরের জলের থেকে মশার বাচ্চা তুলে এনে ক্লাসে শেখে তাদের জন্মবৃত্তান্ত। নানা ফুল-ফল লতাপাতা সংগ্রহ করে বিজ্ঞানের ক্লাস ভরে ফেলে। এ ছাড়াও 'তিনপাহাড়' হাতছানি দিয়ে নেয় শিশুর দলকে। সেখানে উঠে বটের ঝুরিতে ঝুল্লু খেলতে কী মজা! তিনপাহাড়ের তেঁতুল যেন মিষ্টি গুড়! আর ওই টিবিতে চড়ে পাহাড়-চড়ার আনন্দও পাওয়া যায় নাকি! আশ্রমটি যেন চোখে লাগে নূতনতরো। ১৩।১২।১৯৫২

* * *

গ্রীষ্মের শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রনাথের গানে ও কবিতায় অমর হয়ে রয়েছে। রুক্ষ লাল মাটি, তার উপরে আগুন-ঝাঙা রোদ; তারই মধ্যে আশ্রমের দিকে-দিকে কৃষ্ণচূড়া তার রক্তিম-শিখা মেলে ধরেছে। ক্ষীণ বাসন্তী রঙের কানাইলরি-ফুলের চন্দন-শোভা; আনাচে-কানাচে কুর্চিফুলের সাদা স্তবকের অর্ঘ। এ তাপসী-প্রকৃতির রূপ দেখে বিস্ময়ে সকল মন ভরে ওঠে। সকাল আর সন্ধ্যাবেলা আশ্রমের বুকে

লোক-চলাচলের ভিড় দেখা যায় ; আর সারাটা দিন ঘরে-ঘরে দরজা-জানালা থাকে বন্ধ। জনশূন্য পথ-ঘাট-প্রান্তর সে সময় খাঁ খাঁ করে, 'যেন রৌদ্রময়ী রাত্রি' নেমে আসে। এরই মধ্যে এক-একদিন সহসা আকাশ কালো মেঘে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে ; তৃষ্ণাতপ্ত বিরহের নিরুদ্ধ নিশ্বাস ঝড়ের বেগে হু হু করে এসে বারিধারায় গ'লে-গ'লে পড়ে। আবার চলে তপ্ত কঠোর সাধনা। এবার দুদিন ঝড়-বৃষ্টি হয়ে গেছে। তাপ কিছুটা কম ; জলের অভাব এখনও তীব্র হয়ে ওঠেনি। ১৩।৫।১৯৫৪

*　　　*　　　*　　　*

গত এক বছরের মধ্যে বীরভূমের এ অঞ্চলে একদিনও জোর বৃষ্টি হয় নি। ফলে পুকুর, কুয়ো প্রভৃতিতে মোটেই জল জমতে পারে নি। পৌষ মাস থেকেই জলের অসুবিধা অনুভব করা যাচ্ছিল, এখন তো রীতিমতো জলকষ্ট শুরু হয়েছে। দোলের দিন আবির মেখে কাদা-গোলা জলে পরিষ্কার হওয়া গেছে। আশ্রমের জলের কলের জন্য তিনটে বাঁধ আছে, দুটো শুকিয়ে খটু-খটু করছে ; একটাতে কিছু জল আছে। হিসেব করে চললে, গ্রীষ্ম-পর্যন্ত কাটতে পারে। এর মধ্যে একটা কালবৈশাখীর আবির্ভাব ঘটা নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্তু সম্ভাবনা তার কিছুমাত্র দেখা যাচ্ছে না। আশ্রমের উত্তরের খোয়াই ভেদ করে খাল-কাটা প্রায় শেষ হয়ে এল। শোনা যাচ্ছে, আর বছর-খানেকের মধ্যেই ময়ূরাক্ষী-নদীর জল কঠিন মাটিকে সুজলা-সুফলা করে তুলবে। সেদিন আশ্রমের বহুদিনের একটা বড় অসুবিধা দূর হবে। এই শুষ্ক মরুর বক্ষ বিদীর্ণ করে "তৃষ্ণার জল" উৎসারিত করতে রবীন্দ্রনাথ কম চেষ্টা করেন নি ; বহু অর্থও ব্যয় করেছেন। তার সাক্ষ্য বহন করছে ইতিহাস আর রবীন্দ্রনাথের গান ও রচনায় হয়েছে এ দুঃখের অপূর্ব প্রকাশ। ১৯।৩।১৯৫৫

বছর-দুয়েক আগেও পয়লা-বৈশাখে নববর্ষ ও গুরুদেবের জন্মোৎসব সম্পন্ন হবার পরেই আশ্রমের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বাড়ি-যাবার তাড়া লাগত। সপ্তাহ না যেতেই দেখা গেল আশ্রম অর্ধেক খালি হয়ে গেছে। তখন এপ্রিলের কুড়ি-বাইশের মধ্যে শিক্ষা-বিভাগগুলিও বন্ধ হত। গত-বছর থেকে এর ব্যতিক্রম চলছে। বিশ্বভারতীর শিক্ষা-বিভাগগুলিতে ত্রিশে এপ্রিল অবধি ক্লাস হয়ে পয়লা মে থেকে দু'মাস বন্ধ থাকছে এবং নিয়ম হয়েছে ছাত্রছাত্রীগণ উপযুক্ত-কারণ-ব্যতীত একদিন আগেও চলে যেতে পারবে না। এখন তাই বৈশাখের মাঝামাঝি অবধি আশ্রম কলকোলাহল-পরিপূর্ণ ; নিদারুণ গরমেও কাজ পুরোদমে চলেছে। কেবলমাত্র এবার ছুটি দিতে হয়েছে বিনয়ভবনের শিক্ষা-চর্চা প্রভৃতি কেন্দ্রগুলিকে। এবারকার নিদারুণ জলকষ্ট আশ্রমের ওয়াটার-ওয়ার্কসের জল দিয়ে এবং আশ্রমের কুয়োগুলি ঝালাই করে নিয়ে

শমিত রাখা গেছে। কিন্তু বিনয়ভবন অত্যুচ্চ ভূমিতে অবস্থিত এবং ওয়াটার-ওয়ার্কসের পরিমিত জল এখনও অতদূর অবধি সরবরাহ করা সম্ভব হয় নি, তাই জলকষ্ট সেখানে সুতীব্র হয়ে উঠল। শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের জমি বীরভূমের উচ্চ ভূমির প্রকৃষ্ট নিদর্শন বলা যায়। শান্তিনিকেতনের প্রান্তর দিয়ে যে রেললাইন চলে গেছে, তার পাড়ির উপরে দাঁড়ালে সে-লাইনটি সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে গেছে মনে হয়। শ্রীনিকেতনের আশে-পাশের ঢেউখেলানো উঁচু-নীচু জমি পাহাড়-অঞ্চলের ভ্রম সৃষ্টি করে। বীরভূমের অন্যান্য স্থানের চেয়ে এখানে জল মেলা সমস্যা-বিশেষ। কয়েক বছর আগে যখন ওয়াটার-ওয়ার্কস স্থাপিত হয় তখনই বাঁধের জলে সমস্ত শান্তিনিকেতন শ্রীনিকেতনের জলাভাব দূর করা সম্ভব হবে না আশঙ্কা করা গিয়েছিল। তাই ওয়াটার-ওয়ার্কসের পাশেই একটি টিউব-ওয়েল খোঁড়ার চেষ্টা হয়েছিল। অনেক যন্ত্রপাতি এল, বিরাট-বিরাট নল যন্ত্রদ্বারা পুঁতে মাটির এমন একটা স্তরে পৌঁছাবার প্রয়াস করা গেল যেখানে জল-স্রোত অবিরাম অফুরান বয়ে চলবে, জল পাওয়ার সমস্যা যাতে ঘুচবে। কিন্তু স্বীকার করতেই হল, ব্যর্থ প্রচেষ্টা। কঠিন মাটির বাধা অতিক্রম করা গেল তো পথ রোধ করলে পাথর আর বালি। তাদের হৃদয় গলিয়ে উৎসধারা বের করার ধৈর্য আর রইল না। কিছুদিন চেষ্টা করে কাজে ভঙ্গ দিতে হল। এখনও সে-ভগ্নোদ্যমের চিহ্ন জলের কলের উত্তর-পশ্চিম কোণে বিদ্যমান। ৬।৫।১৯৫৫

*   *   *

জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি যে প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যা বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের উপর দিয়ে তাণ্ডবলীলা করে গেল, শান্তিনিকেতনেও তার দৌরাত্ম্য কিছু-পরিমাণে ভোগ করতে হয়েছে। চার পাঁচদিন আকাশ ছিল ঝঞ্ঝামত্ত—বাতাসের দাপাদাপি, বিদ্যুতের চমকানি এবং জল-ঝরার বিরাম ছিল না। তবে এ বৃষ্টি এখানকার পক্ষে সুখদায়ক। গ্রীষ্মের প্রদাহ দূর ক'রে বর্ষার স্নিগ্ধতা এনে দিয়েছে। এখন অবধি ক্ষণে-ক্ষণে আকাশ মেঘে ঢাকছে, হঠাৎ দু-এক পশলা বৃষ্টি হচ্ছে। অন্যান্যবার আষাঢ়ের মাঝামাঝি সময়েও এমন আবহাওয়া পাওয়া যেত না। গত দু'বছর তো এ অঞ্চলে খুবই কম বর্ষা হয়েছে। এবছর আশা করা যাচ্ছে বর্ষা ভালো হবে এবং কৃষিজাত-দ্রব্যাদি আশানুরূপ ফলবে। এ বৃষ্টি এখন অবধি চাষবাসের উপযুক্ত নয়। আষাঢ়-শ্রাবণে মাঠে-ঘাটে জল দাঁড়াবার মতো প্রবল বৃষ্টি এ-দেশের চাষের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। তাই হাল-লাঙল নিয়ে মাঠে নাববার উদ্যোগ এখনো তেমন দেখা যাচ্ছে না। শান্তিনিকেতনের আশেপাশের ধানের জমিগুলি ধূ ধূ

করছে। কিন্তু আশ্রম-প্রকৃতি হয়ে উঠেছে হরিতে পীতে নববর্ষার শোভায় মনোলোভা।

*   *   *

বিশ্বভারতীতে এখন দামোদর-ভ্যালি কর্পোরেশন থেকে আলো দেওয়া হচ্ছে। আশ্রমের রেল-লাইনের পাশে-পাশে এবং মাঠের মধ্যে নূতন লাইটপোস্টগুলি চকচক করছে। মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের কথা—এলো বুঝি তোদের নূতন আলো। আশ্রমে প্রথমে নিজস্ব ডায়নামো ছিল বর্তমান প্রেসের পাশের দুটি ঘরে। আশ্রমে শুধু সন্ধ্যার পর থেকে রাত দশটা-এগারোটা অবধি আলো জ্বলত। তারপরে সারারাত হোস্টেলের ঘরে-ঘরে মিটমিট করে জ্বলত হ্যারিকেনের আলো আর রাস্তাগুলি থাকত অন্ধকারে ঢাকা। তারপরে ভুবনডাঙার পাশে বড় আলো-ঘর (Power House) স্থাপিত হল। রবীন্দ্রনাথ শেষবার আশ্রম ছেড়ে কলকাতা যাবার পথে এ আলো-ঘরটি দেখেই পরিহাসচ্ছলে বলেছিলেন—পুরোনো আলো গেল, এলো বুঝি তোদের নূতন আলো। প্রায় চোদ্দ-পনেরো বছর এই আলো-ঘর থেকেই শান্তিনিকেতন ও বোলপুরে আলো দেওয়া হচ্ছিল, এবার আলো পাওয়া যাচ্ছে দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টারই জন্য আরো বড়ো-ব্যবস্থায়;—ক্রমে গ্রামে-গ্রামে শহরে-বন্দরে আলো জ্বলবে। এবার ভুবনডাঙার নূতন আলো-ঘর পুরোনো হয়ে গেল, তার কাজ ফুরোলো কিন্তু অস্তিত্বটুকু কোনোমতে টিকে রইল। মাঝে মাঝে ঝড়-বৃষ্টিতে যদি আশ্রমের আলোর কোনো ব্যাঘাত হয়, এই আলো-ঘরটি থেকে সাময়িকভাবে আলো দেবার ব্যবস্থা হবে।

শান্তিনিকেতনে দুঃসহ দাবদাহ। আবহাওয়া-বিভাগের তাপমান-যন্ত্রে স্বর চড়ছে তো চড়ছেই—১১২°, ১১৪°, ১১৭°। আশ্রমবাসী ঘর ছেড়ে উন্মুক্ত আকাশতলে আশ্রয় নিয়েও শান্তি পাচ্ছে না। বেলা আটটা বাজতে না বাজতে ঘরে-ঘরে বন্ধ হয় দরজা-জানালা। মেঝে ঠাণ্ডা করার তাড়া পড়ে। তারপরে অন্ধকার-ঘরে দীর্ঘ এক-একটা দুপুর পার হলে সকলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। কিন্তু দিবসের পরিশেষও লেশমাত্র রমণীয় নয়। বাতাস-শূন্য বদ্ধতায়, না-হয় তো, প্রচণ্ড গরম বাতাসে সন্ধ্যা দুর্বিষহ। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে উপভোগ্য হচ্ছে রাত্রিশেষের এবং ভোরবেলাকার ঘণ্টা দু'তিন সময়। ঝিরঝিরে বাতাসের স্নিগ্ধ আবেশে তখন দেহমন জুড়িয়ে যায়; শান্ত আলোর আভায় চোখের হয় আরাম। কিন্তু শান্তির আশ্বাস বহন ক'রে যে-দিনের শুরু, তার সমাপ্তিতেও থেকে-থেকে মনে জাগে কেবল কবির গানের সেই করুণ রেশ—"নাই রস নাই—"।

চৈত্রের মাঝামাঝি থেকেই উৎসুক হয়ে থাকা যেত কালবৈশাখীর উন্মত্ত-নৃত্যে উল্লসিত হবার প্রত্যাশায়। কিন্তু ঋতু-প্রকৃতির পরিবর্তন সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বৈশাখে এবার এখনো ঝড়ের দেখা নেই। মাঝে মাঝে দু'একদিন সুদূর আকাশে ক্বচিৎ মেঘের আভাস জেগে উঠছে; তারপরে দেখা দেয় ক্ষণিকের জন্য একটা জোর বাতাস, মিলিয়ে যায় মেঘের শেষ-বিন্দুটি। নীল-আকাশে, তারার আলো বিদ্রূপের হাসি মেলে ঝলসাতে থাকে। দিনের পর দিন খাঁ-খাঁ-করা-রোদ দেখে-দেখে চোখ পীড়িত হয়ে ওঠে। তথাপি এই অসহ গ্রীষ্মে এবার একমাত্র আনন্দ দিচ্ছে শুষ্ক মাটির বক্ষনিঃসৃত স্বচ্ছ কালো জল। অনেকের মতে গত বছরের অতিরিক্ত বৃষ্টির ফলে জলস্রোত মাটির উপরের স্তরে জমা রয়েছে। অনেকে বলছেন, আশ্রমের পরিবর্ধমান গাছপালার জন্যে জল আবদ্ধ হয়ে থাকছে শুষ্ক ডাঙায়। কারণ যাই হোক্, এবার কুয়োর জল শুকিয়ে যায় নি, এইটে একটা মস্ত সৌভাগ্য বলতে হবে। ওদিকে নিরাভরণা গৈরিকবসনা তাপসী আশ্রম-প্রকৃতিকে অপরূপ সাজে সাজিয়ে তুলেছে কর্ণিকার এবং কৃষ্ণচূড়া ফুলের রাশি। তাদের লোহিত-পীতের প্রগাঢ় সমারোহে নববসন্তের বর্ণসম্ভারও হার মেনে যায়। ৩৬।১৯৫৭

*　　　*　　　*

এবারে প্রথম থেকে বর্ষার আবির্ভাবে জাঁক-জমক দেখা যাচ্ছে। সকালের দিকে প্রায়ই বৃষ্টি নামে। আশ্রমে দু'তিন দিন এজন্য 'অনধ্যায়'ও ঘটেছে। কিন্তু মজা দেখা গেছে,—ঢং ঢং ঢং—ক'রে এগারোটা ধ্বনি হল, বাঁধা কাজে ছেদ পড়ে যে-যার ঘরমুখো হল, ছুটি ঘোষণার পরক্ষণেই অমনি আকাশ হয়ে গেল পরিষ্কার,—আর বৃষ্টির নাম নেই; মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির এই চাতুরি এখানকার জীবনে উপভোগ্য। সকালে এবং খোলা জায়গায় ক্লাস হয় বলেই এটা ঘটে থাকে। কোনোদিন আবার ছুটি না হয়ে আরেক ব্যবস্থা হয়। গানের আসর বসে সিংহসদনে। "ঝর ঝর বৃষ্টি কলরোলে"র মধ্যে সমবেত কণ্ঠে গান ওঠে—"এই সকালবেলার বাদল-আঁধারে, আজি বনের বীণায় কী সুর বাঁধা রে!"

কোনোদিন আবার ছেলেমেয়েদের নিয়ে অধ্যাপকেরা বেরিয়ে পড়েন গোয়াল-পাড়ার পথে; কোপাই নদীর আকুল বেগের খেলা দেখে, কেয়াপাতার নৌকো ভাসিয়ে, কেয়াফুল পেড়ে নিয়ে, খোয়াইডাঙার কোলে কোলে আলোছায়ায় ঘুরে ঘুরে ফিরে আসে দলবল সেই বেলা দশটা-এগারোটায়। সেদিনকার পড়া এই। পথে-পথে চলে গল্প, কবিতা, গান,—গল্পের ফাঁকে ফাঁকে প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণের

পাঠটা কখন যে মনে বসে যায়, কেউ জানতেও পারে না। কিন্তু এত বৃষ্টি হলেও এ অঞ্চলে চাষের জলের অভাব এখনো খুবই রয়েছে। ৪।৮।১৯৫৩

*　　　　*　　　　*

শান্তিনিকেতনে এবার প্রথম বর্ষণ হল ৩রা জুন। চার-পাঁচ মাসের মধ্যে একটু বৃষ্টি বা মেঘের দেখা পাওয়া যায় নি। কালবৈশাখীর ঝড় তো কয়েক বছর থেকে বিদায় নিয়েছে বলা যায়। সন্ধ্যা-আকাশ ঢেকে উত্তর-পূর্ব কোণে রাঙা মেঘের ভ্রূকুটি খেলছে না; গুরু গুরু ডমরু বাজিয়ে ত্রাস জাগিয়ে কালবৈশাখী ছুটে আসছে না। এবার দু'দিন কেবল হয়েছিল ধুলোর ঝড়;—পশ্চিমের আঁধি,—বাংলাদেশে তারি এক—ছোটোখাট সংস্করণ—, হু হু করে গাঢ় ধুলোর রাশি উড়ল, তার সঙ্গে না একটু জল না একটু গুরু গুরু মেঘের ডাক। ধুলোয় কেবল চারিদিক অন্ধকার। তারপরে মাঝে-মাঝে প্রকৃতিতে লেগেছে মেঘলাদিনের ছোঁওয়া, রাত্রে ঠাণ্ডা হাওয়া বয়েছে, দিনে রোদ একটু মিটমিটে হয়েছে; বোঝা গেছে, আশেপাশে বৃষ্টি হল। ৩রা জুন সেজে এল শান্তিনিকেতনে সেই অতি আকাঙ্ক্ষিত পিপাসা-হরা আঁখি-শীতল কৃষ্ণা নূতন-মেঘের দল। স্তরের পরে স্তর জমল। ঝারি ভরে ঝরকে ঝরকে জল ঢালল;—ঢেলেই উধাও হয়ে গেল কোথায়, আর দেখা নেই। ভিজেমাটির অপূর্ব গন্ধ বর্ষার আগমনবার্তা জানিয়ে দিল। উত্তরদিকের খোয়াইপারের তালীবনশ্রেণী নীলরেখায় ঘন হয়ে উঠল। কৃষ্ণচূড়া কদম কুর্চি বট অশথ মসৃণ চিক্কণ সবুজ পাতা দুলিয়ে-ফুলিয়ে নৃত্যোন্মত্ত ময়ূরের মতো মনোরম হয়ে দেখা দিল। আশ্রমবাসী প্রথম বর্ষার দিনটিকে হৃদয় ভরে উপভোগ করলে। তারপরে সপ্তাহ-দুয়েক আর বৃষ্টির দেখা নেই। তবে প্রকৃতিতে পরিবর্তন ঘটল। খররোদের শুষ্কজ্বালা স্তিমিত হয়ে গেল, পুবের হাওয়া এসে মিশল দক্ষিণে বাতাসের সঙ্গে। পর পর দু'তিনদিন আবার খুব বৃষ্টি নামল—যাকে বলে রীতিমতো বর্ষা। আবার ক'দিন খট্‌খটে রোদ চলছে। বর্ষা 'আসি আসি' করেও দ্বিধায় যেন এসে পৌঁচচ্ছে না। কিন্তু আসতে আর বিলম্বও নেই মনে হচ্ছে।

আকাশে আষাঢ়ের মেঘভার পাহাড় সেজে দেখা দিচ্ছে আর চোখে পড়ছে মাঠে-ঘাটে সবুজের 'সাজ সাজ' ভূমিকা। ২৬।৬।১৯৫৪

*　　　　*　　　　*

সপ্তাহখানেক যাবত শান্তিনিকেতনের প্রকৃতির আবহাওয়ায় যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছে। জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি গ্রীষ্মের যে প্রচণ্ড রূপ দেখা গিয়েছিল, তাতে আশঙ্কা হয়েছিল এবারও বোধ হয় বৃষ্টির অভাব ঘুচবে না। হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই,

পর-পর তিনদিন ঝড়বৃষ্টি হয়ে গেল। বহুদিন বাদে তৃপ্তিদায়ক হয়ে দেখা দিল কালবৈশাখী। প্রথম দিনের ঝড় স্বল্পকাল স্থায়ী হয়েছিল, বৃষ্টিও তেমন হয় নি। পরদিন ঝড় এল অভাবনীয়রূপে। আশাই করা যায়নি আগের দিনের ঝড়বৃষ্টির পরে আবার ঝড় আসবে। কোনো আয়োজনও তার ছিল না। হঠাৎ উত্তর-পশ্চিম কোণে একখণ্ড ধূসর মেঘ দেখা গেল, দেখতে দেখতে সেটা উপরে উঠে এল, ছেয়ে ফেলল সমস্ত আকাশ। হু হু করে ধেয়ে এল ঝড়, কী প্রচণ্ড তার বেগ! আশ্রম ধুলোয় অন্ধকার, অতি-কাছের জিনিসও দেখা যায় না। গাছের ডাল ভেঙে পড়ল, ইলেক্‌ট্রিকের তার ছিঁড়ে গেল, পুরোনো জীর্ণ বাড়ী ধ্বসে পড়ল মাটিতে। ঝড়ের তাণ্ডব বয়ে গেল আশ্রমের উপর দিয়ে। ধুলোর ঝড় কমলে নামল জোর বৃষ্টি। ক'দিন গরমে সবাই অস্থির হয়েছিল, আশ্রমের অনেকেই এই বৃষ্টিতে ভিজতে বেরুলেন। অনেক্ষণ ধরে বৃষ্টি হল। তৃতীয় দিনের বৃষ্টিও সম্পূর্ণই অপ্রত্যাশিত। তাকে এবারকার বর্ষার অগ্রদূত বলা যায়। ঝড়ের নামমাত্র ছিল না। কালো ইস্পাতের মতো মসৃণ মেঘ। শ্রাবণের ধারার মতো ঝরে পড়ল ঝরঝর করে। রাত্রে রীতিমতো ব্যাঙের ডাক শোনা যেতে লাগল, বাদলা হাওয়া বইতে লাগল, বর্ষার সূচনায় মন উঠল ভরে। তারপরেই একদিন রাত্রে আবার তেমনি বৃষ্টি; জলে সব জলময়। রোদের প্রচণ্ডতা স্নিগ্ধ হয়ে গেছে। গরম অবশ্য কমে নি। কিন্তু গ্রীষ্ম যে ফুরিয়ে এসেছে সে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। ধীরে ধীরে সবুজের তুলি রঙ বুলাচ্ছে গাছে-গাছে পাতায়-পাতায় ঘাসে মাটিতে। দীপ্ত জ্বালা দগ্ধ দীর্ণ করেছিল ধরার বক্ষ-পঞ্জর; সে-কুশ্রীতাকে দূর করবার আয়োজন চলছে দিকে-দিকে। কোমলে-কঠিনে কমনীয় হয়ে উঠছে চারদিক। ১৮।৬।১৯৫৫

*　　　　*　　　　*

গত বছরের অনাবৃষ্টির ত্রুটি এবার সংশোধিত হচ্ছে। সারাটা আষাঢ় মাস এ অঞ্চলে বেশ বৃষ্টি হয়েছে, শ্রাবণের মেঘও ক্ষণে-ক্ষণে ঘনিয়ে আসছে। আশ্রমের লালমাটি এখন সবুজ গালিচায় মোড়া, তারই মধ্যে ছোট-ছোট চুনির-ফোঁটার মতো টুকটুকে ভেলভেট-পোকা ছড়িয়ে রয়েছে। ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা বালি ও ঘাসের ঘর বানিয়ে তার মধ্যে সে-পোকা এনে ছেড়ে দিচ্ছে। গাছপালা লতাপাতা সব সবুজে-সবুজ হয়ে উঠেছে। রকমারী সবুজে চোখ ডুবে যাচ্ছে। আশ্রমের উত্তরদিকের খোয়াইতে ময়ূরাক্ষী-বাঁধের জল-প্রবাহের জন্য খাল কাটা হচ্ছিল; সে কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে, জল-সরবরাহের কাজ কিছু কিছু আরম্ভ হয়েছে। খাল জলে ভরে উঠেছে। তার স্রোতে মাছের খেলা দেখবার মতো। দলে দলে

আশ্রমের ছেলেমেয়েরা ক্যানেলে জলের শোভা দেখতে যাচ্ছে। কোন দল বা নেবে পড়েছে জলে। এ অঞ্চলের কৃষকগণ আরো বৃষ্টির আশায় উদ্‌গ্রীব হয়ে রয়েছে—তাদের উঁচু জমিতে এখনও জল জমেনি, চাষ করা যাচ্ছে না। আশা করা যায়, ক্যানেলের জল পেলে আর তাদের ভাবনা থাকবে না। ২২।৭।১৯৫৫

আশ্রমে বর্ষার ঘনঘটা শুরু হয়ে গেছে। সকালে-বিকেলে মেঘের পরে মেঘের খেলা দেখবার মতো। বেলাশেষে উত্তর-পশ্চিম আকাশের গায়ে কোন্ খেয়ালী কোন্ আনন্দে উজার করে ঢেলে দিচ্ছে রঙের বাটি। গ্রীষ্মের একরঙা বর্ণের দৈন্য ঘুচিয়ে দিলে বর্ণবৈচিত্র্যে। সেই অপর্যাপ্ত সমারোহের দিকে তাকিয়ে মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের কথা—রঙের তান উঠছে, তানের উপর তান; তাদের মিলও যেমন তাদের অমিলও তেমনি; তারা বিরুদ্ধ নয় অথচ বিচিত্র। রবীন্দ্রনাথ জাপান যাবার পথে আকাশে ও সমুদ্রে দেখেছিলেন সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের অপূর্ব রঙের ঐশ্বর্য। তারই স্তুতি ধ্বনিত হয়েছিল কবির বাণীতে। বর্ষার দিনশেষে আশ্রমের দিগন্ত-প্রসারিত আকাশের দিকে তাকিয়েও সেই স্তুতিই মনে আসে। ৪।৭।১৯৫৭

শান্তিনিকেতনে সবুজের অভিযান আকাশপ্রান্তর ব্যেপে যে কী বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে তা না দেখলে বোঝবার নয়। গ্রীষ্মতাপদগ্ধ তাম্র ধুলোমাটি, ঘাসে-ঘাসে ফুলেপল্লবে ভরে উঠল রঙের বান ডাকিয়ে। রঙের গাঢ়তা দিনেদিনেই বাড়ছে—বাদলার ঝাপটে ঝাপটে। সবুজের লেপ ক্রমে কালো হয়ে উঠল। ডালেডালে কচিপাতার দোলা-দুলি, আর ঝরকে-ঝরকে পাপড়ির ছড়াছড়ি—এই চলছে সারাবেলা। তার সঙ্গে ভিজে-বাতাসে ছুটে চলেছে একোণ-ওকোণ থেকে থোকা-থোকা কামিনী-বকুল-বেলি-চামেলির মিষ্টি গন্ধ। এর পরে এবার বহুদিন বাদে শোনা যাচ্ছে শান্তিনিকেতনের নানা পাখির কূজনের সঙ্গে কেবারবেরও চকিত আবেদন। সম্প্রতি রাঁচী শহরবাসীদের উপহারস্বরূপ আশ্রমে নূতন পাওয়া গেছে একজোড়া ময়ূর। আকাশে মেঘের সঞ্চার হয় ঘোরালো হয়ে, বর্ষণও হয় মাঝে মাঝে, কিন্তু গরমের তুলনায় এখনও বর্ষার বারিসেক আশানুরূপ নয়। আর নয়, এখনো আকাশ-বাতাসে কণ্ঠে-কণ্ঠে পাখামেলা বর্ষার গানের অবিরল অবাধ বিস্তার। তবে, নূতনে-পুরাতনে পরিচয়ের যোগ স্থাপিত হলে সম্ভবত স্ফূর্তি পাবে প্রাণের সেই সহজ সুরধারা। আর কদিনের মধ্যে শুরু হবে উৎসবের আয়োজন—আসছে পর্ব একে-একে রবীন্দ্র-স্মারণিকী, বৃক্ষরোপণ, বর্ষামঙ্গল, রবীন্দ্রসপ্তাহ। গানে-গানে ভরে উঠবে অলিগলি। তেমন দিক মাতিয়ে না হোক, তথাপি সর্বত্রই একটা কলোচ্ছল গতিউন্মুখতা লক্ষ্য করা যায়—ছেলেমেয়ে ও কর্মীদের হাসিগল্প, খেলাধুলা,

কর্মব্যস্ততার আকস্মিক অভ্যুদয়ে। গ্রীষ্মাবকাশের জনবিরলতা কেটে গিয়ে, বর্ষার ভিড় শুরু হল যেমন প্রকৃতির আসরে, তেমনি মানুষেরও পাড়ায়—সমভাবেই। সেটা আরো বোঝা যায়, সকালের বৈতালিকের পর ক্লাস-আরম্ভের সময়টিতে। বর্ষারম্ভে ঘাসে-ঘাসে ঘুরে বেড়ায় নয়নরঞ্জন ভেলভেট্-পোকার দল, আর, দেশে-বিদেশের নানাসাজে সজ্জিত সুকুমার বালক-বালিকাদের ঘোরাফেরা আশ্রমে তেমনি চোখের আরামদায়ক। ১৮।৭।১৯৫৭

আশ্বিন মাস এসে গেল, তেমন একটা বর্ষণ এখনো এদিকে হলই না। প্রকৃতির খেয়াল—আসাম, উত্তরবঙ্গ, বিহার বন্যায়-বৃষ্টিতে ভেসে যাচ্ছে; পশ্চিমবঙ্গে অনাবৃষ্টির বান হানল রুদ্র-বিধাতা। তার মাঠ হরিতে-পীতে ভরে উঠল না; শরতের 'সোনা রোদ্দুরে' লাগল না বৃষ্টি-শেষের জলে-ধোওয়া মধুর আমেজ। তবু কাশের শুভ্রতায় দিক হেসে উঠেছে; রাত্রি-শেষে শিউলি ঝরছে; শান্তিনিকেতনে 'শারদোৎসবে'র সাড়া জেগেছে; ছাত্রছাত্রী-মহলে 'আনন্দ-মেলা'র আয়োজন চলছে। ২৫।৯।১৯৫৪

*　　　*　　　*

যে সময়ের যেটা,—সেটা না হলেই অস্বস্তি লাগে, ভাবনা ধরে তার জের নিয়ে। পুরো পৌষটা কেটে যাচ্ছে—শীতের দেখা নেই। শীতের হাওয়ার নাচন আর জমছে না, ভয়ের কাঁপন লাগছে বসন্তের আগাম-আবির্ভাবের সম্ভাবনায়। গাছপালায় স্থবির নির্জীবতা, লোক-চলাচলেও গা-ঢালা ভাব। আকাশের অবস্থাও অনির্দিষ্ট। একদিন রাত্রিতে ক্ষীণ এক-পশলা বর্ষেও গেছে, ফুলগাছে জল-ছিটানোর মতো,—তারপরেও আবহাওয়ার উনিশ-বিশ ঘটেনি। টিকে নেওয়া হয়েছে—এখন টিঁকে থাকতে পারলেই হয়। ধারাবর্ষণ একটা হবে হয়তো,—তখন শীত ছুটে আসবে বসন্তের আঙিনায়—এখানকার প্রকৃতির আসরের এই পালা-বৈচিত্র্যের ধুয়া কবি আগেই সেধে গিয়েছেন একদিন আশ্বিনের আঙিনায় শ্রাবণের ক্ষ্যাপামি দেখে। সকালে থাকে ঘোলাটে আকাশ, দু'দিন থেকে দুপুরে মাতে উত্তুরে হাওয়া; তারপরেই সব নিঃসাড়। ঠাণ্ডা-গরমে সর্দি-কাশি দেখা দিচ্ছে। ১২।১।১৯৫৭

অনুমান মিথ্যে হয়নি, আগের 'চিঠি' ডাকে দেবার পরই বাদল নেমেছিল; সঙ্গে নিয়ে এসেছিল শীতের কাঁপুনি। সকাল থেকেই ঘরে বসে গরম কাপড়, চা-গরম, আর গালগল্পে কাটানো যাচ্ছিল। ঘোর, ঘর্ঘর, আর ঘূর্ণি হাওয়ার মধ্যে গগনের গাগরি-ঢালা-পালার গৌরচন্দ্রিকাটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। শেষ পর্যন্ত

গড়াবে কোন্‌দিকে বলা ছিল শক্ত। কেবল মনে হচ্ছিল, একটু রোদ উঠলে বাঁচা যায়। —শীতটা পড়ি-পড়ি করেও গড়িমসিতে দিন কাটানোর পর একেবারে হুড়মুড় করে ঘাড়ের উপর এসে পড়ার উপক্রম দেখাচ্ছল। —হালের খবর এই যে, শীত পড়েও পড়ল না; এখন আকাশ কখনো হাসছে, কখনো মুখ ঢাকছে মেঘে। ২৮।১১।১৯৫৭

* * *

পৌষমেলার পরে হঠাৎ দু'দিন বৃষ্টি হওয়াতে আশ্রমের লাল-ধুলা ধুয়ে-মুছে চারদিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। শীত বসেছিল আসর জমিয়ে। ক'দিন যেন এক হিমপ্রবাহ বয়ে গেল। তারপরেই আবার বেশ একটু গরম পড়ে উঠেছিল। মনে হচ্ছিল শীত বোধ হয় বিদায় নিল। দু'তিনদিন মেঘলার পরে ২১শে জানুয়ারী সকালবেলা বেশ খানিকটা জল হয়ে গেল। যাবার আগে শীত আবাব হি-হি কাঁপন জাগিয়ে দিলে। আশ্রমে ফুলের বাহার দিলে ঘুচিয়ে, পাতাশূন্য গাছগুলি অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে। মাঝে মাঝে এ রকম বৃষ্টি হলে আশ্রমের জলাভাবের ত্রাসটা কিছু ঘুচবে। ২৭।১২।১৯৫৫

"ওরে গৃহবাসী, খোল্‌ দ্বার খোল্‌…।" আচমকা ঘুম ভেঙে যায় রাতেব কুয়াসা-ভেদ-করে আসা গানের রাগিণীতে। গানের ইন্দ্রধনু ভেসে চলেছে শালবীথি ছাড়িয়ে অনেক দূরে। ধীরে ধীরে রাতের অন্ধকার তরল হয়ে আসছে! গানের সুরকে ছাপিয়ে মাতাল কোকিল ডেকে চলছে একমনে। ভোরের বাউল-বাতাসে ইউক্যালিপ্টাসের মাদকতা। গানের সুর এগিয়ে আসছে। হঠাৎ মনে পড়ে যায় এ তো বসন্ত-উৎসব। তাই এই প্রভাতী-বৈতালিক। এবার বসন্ত এল অনেক দেরী করে। এসেই ছড়িয়ে দিয়েছে ওর মায়াজাল। ডালে-ডালে ফুলে-ফলে পাতায়-পাতায় বুলিয়ে দিয়েছে ওর স্নেহের পরশ। শিমূল, পলাশ, কাঞ্চন, অশোক, রঙে-রঙে রাঙালো দিগন্ত। তারপরে এল শাল-মহুয়ার দিন। এবারকার বসন্তোৎসবে তারাই বসন্তকে আবাহন জানাল।

* * * *

চিত্রিত আম্রকুঞ্জে জনতার মিছিল। শালবীথির দু'ধারে লোক দাঁড়িয়ে। 'নন্দন' থেকে বেরিয়ে আসছে 'নৃত্যরতা' তরুণ-তরুণীরা, কারুর হাতে শাল-ফুলের গুচ্ছ, কেউবা হাতে নিয়ে চলছে আবীরের থালা। কপালে লাল আবীরের ছাপ। খোঁপায়-জড়ানো সাদা বেলফুলের মালা। "স্থলে জলে বনতলে লাগল যে দোল" গানের সুরে নাচের তালে লাল ধুলো উড়িয়ে আম্রকুঞ্জে প্রবেশ করল দলটি।

উদাত্ত কণ্ঠে সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করে বসন্তকে সাদর আহ্বান জানিয়ে উৎসব আরম্ভ হল। তারপর চলল গান, পাঠ ও আবৃত্তি। এবার আবীর-খেলার পালা। "রঙে রঙে রঙিল আকাশ।" আম্রকুঞ্জে ছড়িয়ে পড়েছে আবীরের লালিমা। যে দিকে তাকানো যায় সেদিকে লালের সমারোহ। "যা ছিল কালো-ধলো......রঙে রঙে রাঙা হল।" আবার যেখানে-সেখানে বসেছে ঘরোয়া গান-নাচের আসর। একটার পর একটা বসন্তের গান আর নাচ চলেছে সেখানে। যে যাকে পেয়েছে, বুলিয়ে দিয়েছে রাঙা আবীরের পরশ, কেউ দিয়েছে ললাটে, কেউ বা দিয়েছে পায়ে। এই সহজ সরল আনন্দের ভিতর দিয়ে--"রাঙিয়ে দিয়ে যাও যাও যাওগো এবার যাবার আগে" গান গেয়ে সকালের অনুষ্ঠান শেষ হল। সন্ধ্যায় গৌর-প্রাঙ্গণে অভিনীত হল 'শ্যামা' নৃত্যনাট্য। অগণিত দর্শককে তৃপ্তি দান ক'রে অভিনয় শেষ হল। বসন্তোৎসবে এ রকম ভীড় বহুদিন হয়নি। ১১।৪।১৯৫৬

ছুটি (গ্রীষ্মাবকাশ)

গ্রীষ্মের ছুটি শুরু হয়ে গেছে। দুপুর বেলায় আমবাগানটি এত নিস্তব্ধ থাকে যে কেউ বাইরে থেকে কথা বললে স্পষ্ট শোনা যায়। ক্লাস-নেবার বেদীগুলি খালি পড়ে আছে। সংস্কার-ভবনে একটি মাত্র লোক। গরমে সমস্ত আমগাছের পাতা মাটির মুখোমুখী হয়ে আছে। আমগুলি ঝুলে পড়েছে। বিরাট-বিরাট শালগাছের পাতা ঝরে গেছে। ডালগুলো শুধু আছে। পাখিরা নিশ্চিন্ত মনে ডালে-পাতায় মাটিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কাঠ-বিড়ালী গাছ বেয়ে নামল, খুট্-খাট্ কী তুলে নিয়ে একটু থামল, আবার হঠাৎ চমকে ছুট্ দিয়ে উপরে উঠে গেল। বেলগাছের পাতাগুলো পড়ে যাওয়ায় শুধু বেলগুলোই আছে। দূর থেকে গাছটা একদম নেড়া লাগছে। ঘন আমগাছের ফাঁক দিয়ে অল্প-অল্প রোদ প্রবেশ করছে। ঘরে অসহ্য গরম। কে যেন একজন বেদির উপর বসে একমনে বই পড়ছে। আর-একজন ওপাশে চুপ-চাপ কোন্ দিকে তাকিয়ে ব'সে। মাঝে-মাঝে হাওয়া লাগছে গায়ে। আম গাছের তলায় কার একটি গরু বাঁধা আছে। গরুটি শুয়ে আছে ও কতগুলি কাক কানের পোকা খাচ্ছে। গরুটা মাঝে-মাঝে লেজ দিয়ে কাক তাড়াচ্ছিল। শিশুবিভাগ ও ডরমিটরির দরজা-জানলা আধ-খোলা, কতগুলি একদম বন্ধ। বারান্দায় কতগুলো সাঁওতাল শুয়ে ঘুম যাচ্ছে। একটি মেঝেন্ আঁকশি দিয়ে মট্-মট্ করে শুকনো ডাল ভাঙছে।

এই আমবাগান হৈ-চৈ-এ পূর্ণ থাকত স্কুল খোলা থাকলে। এ রকম নিঃশব্দ হওয়াতে কেমন একটা অস্বাভাবিক লাগে। ভিতরের রাস্তাগুলো পাতায় আচ্ছন্ন। পরিষ্কার করা হয়নি। মাঝে-মাঝে শুধু সাঁওতালরা এসে সে পাতা কুড়িয়ে নিয়ে যায়। এ রকম নির্জন ছায়াময় আমবাগান শুধু মহর্ষির ভালো লেগেছিল তা নয়, প্রত্যেকেই এখানে মনের আনন্দ প্রাণের আরাম আত্মার শান্তি পাবে। আমলকী-গাছের কম্পমান পাতা ঝ'রে গেছে, সোঁ-সোঁ করে ঝাউপাতার শব্দ হচ্ছে। হঠাৎ জোর বাতাসে জোরে শব্দ হতে থাকে, ঠিক মনে হয় ঝড় আসছে। "তিন পাহাড়ে"র পারে পুকুরটিতে এক হাঁটুর বেশী জল নয়। "তালধ্বজ" বাড়ীর উপরের তালগাছটি বাতাসে কাঁপছিল। গাব গাছের সমস্ত কচি পাতা ঝরে গেছে। গাব একটিও নেই। কিছুদিন আগে ছেলেদের উৎপাতের অন্ত ছিল না। গাছের দিকে তাকালে এখনো তা বোঝা যায়। ডাল ভাঙা। একজন লোক কুয়ো থেকে জল নিয়ে স্নান করছে। জল-তোলার ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ অনেক দূর অবধি শোনা যাচ্ছে। এমন নির্জনতায় দিন-দুপুরেও গা ছমছম করে। যদি কোনো গাছ থেকে ব্রহ্মদত্যি লাফিয়ে পড়ে? অনেক আগে তো না কি এখানে মানুষ মেরে পুঁতে রাখত। ঐ যে কেমন একটা শব্দ! আম্রকুঞ্জের গাছ-পালার ছায়ায় যে বই পড়ছে সে ঘুমিয়ে পড়ল বোধ হয়, মুখে বই চাপা। যে বসেছিল সে চুপ করে বসেই রইল—গ্রীষ্মের দুপুর উপভোগ করছে বুঝি?……

চোখে একটু একটু তন্দ্রা আসছে। বাইরে ড্রেনটার পরিষ্কার সিমেন্টের উপর শুয়ে আছি। ঘরের মধ্যে টেঁকা দায়। বড্ড গরম। খুব অন্ধকার। আকাশে অগণ্য তারা। সামনে ধূ ধূ করছে ধানক্ষেত। মাঝখানে দু'-একটা খেজুর গাছ দাঁড়িয়ে আছে। সামনে উঁচু-নীচু জায়গা। শর-ঝোপে ভর্তি। মাঝে-মাঝে দু'-একটা পাখি বিকট চিৎকার করতে করতে উড়ে গেল। দূরে অন্ধকারের মধ্যে গাছ-পালায়-ঢাকা ভুবননগর দেখা যাচ্ছে। এক জায়গা থেকে জোরালো আলোর ছটা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। বোধ হয় কোনো বিয়ে বা ভোজ হচ্ছে। গ্রামের মাঝখান থেকে 'পাওয়ার হাউস'টা থেকে-থেকে যেন ব'কে উঠছে। বাঁধের পাড়ে আম গাছ-দু'টো যেন দু'টি ভাই দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক এইরকম দেখতে। পাতাগুলো গাছটাকে সমস্ত সময় যেন আড়াল ক'রে রক্ষা করছে। ঐ গাছ দু'টাকে কিছুদিন আগে দেখলে ভাবতাম ওর ভেতর কী-না-কী আছে। লোকের মুখে শুনতাম, ওর ভেতর ভূত আছে। রাত আটটার পর ঐ পথ দিয়ে গ্রামের কোনো লোক যায় না। যে যায় সে-ই না কি দেখে ব্রহ্মদত্যি লম্বা-লম্বা পা ফেলে খড়ম প'রে

গাছের ডালে পা ঝুলিয়ে বসে থাকে। যে যায় তাকে তিনি যদি লাথি মারেন তবে সেও ব্রহ্মদত্যি হয়ে যাবে।

কিন্তু আজ দু'টো গাছকে দেখে আগের সমস্ত ধারণা ভুলে গেলাম। গরমে বাঁধের জলগুলো যদিও শুকিয়ে গিয়েছিল, তবুও কী রকম যেন জলগুলো ফুলে-ফুলে দুলে-দুলে পারে উথলিয়ে পড়ছিল। বিরাট বাঁধ, দেখে মনে হচ্ছিল ঠিক যেন একটি ছোট-খাট নদীর জল বয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে চরগুলো অস্পষ্ট আলোয় চিক্-চিক্ করে উঠছিল। হঠাৎ দেখে মনে হচ্ছিল, নদীর মাঝখান থেকে যেন একটা শুশুক বার-বার তার পিঠটা বার করে নদীর থেকে ভেসে উঠছে, আবার গভীর জলে ডুবে যাচ্ছে। বাঁধের ওপারে বড় রাস্তা। দু'-একটা ইলেক্‌ট্রিক আলো মিট্‌মিটিয়ে জ্বলছে। দু'-একজন পথিক তখনো সেই রাস্তা দিয়ে কোনো বোঝা টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সারা দিনের কাজ তখনো তাদের শেষ হয়নি। হয়ত কোনো দূরের গ্রাম থেকে আসছে। কোথায় গিয়ে যে তাদের হাঁটা শেষ হবে তা কে জানে। একটু পরে কল-কল ক'রে রান্না-ঘরের ঝি-চাকররা কাজ সেরে চলল; একজন অজানা লোককে ঐ রকম রাত-দুপুরে শুয়ে থাকতে দেখে হঠাৎ তাদের গোলমাল সব থেমে গেল। কিন্তু তারপর দেখে—আমি। তখন আবার কল-কল করতে করতে চলে গেল। একটু পরে পাখির কল-কল যেমন ক্রমে থেমে যায় তেমনি সেই সমস্ত ঝি-চাকর নিজের-নিজের বাড়িতে ঢুকে পড়ল গোলমাল থামিয়ে। রাস্তার পাশে বিরাট বটগাছের নীচের কবরখানায় একটি মাত্র প্রদীপ জ্বলছে। সারি-সারি স্তম্ভ বটগাছের তলায় এক-একটি মানুষের মতো দাঁড়িয়ে আছে। কত কীর্তি ঐ কবরের তলায় চাপা আছে। সেই সব যদি মাটি ভেদ ক'রে উঠে আসত তবে কী-না-কী হত! মরেছে কেউ হয়তো প্রতিহিংসার জন্য, কেউ বা রোগের জন্য। আবার বড় বড় স্তম্ভ দিয়ে ঘেরা যে সব কবর, তার সমস্ত লোকরা হয়ত কোনো মহত্বের কাজ করেছিল, তার পর হয়ত কোনো আততায়ীর হাতে পতন হয়েছিল। প্রত্যেকেরই আত্মা মাটির নীচে ছটফট করছে;—বেরিয়ে যাতে না আসতে পারে তার জন্য মাটি দিয়ে তার উপর কোনো সমাধি-মন্দির স্থাপন করে দেয়। সেইজন্যই বোধ হয় শ্মশানে যেতে কবরের চেয়ে ভয় লাগে। শ্মশানে আত্মারা ঘুরে বেড়ায়, কখন্ এসে টুঁটি চেপে ধরে তার ঠিক নেই। এবং শ্মশানে গেলেই একটা বীভৎস দৃশ্য চোখে পড়ে এবং তখনই সবাই ভূত দেখে। কেউ কারো সঙ্গে বাজি ফেলে বলে—শ্মশানে যেতে। এই জায়গাটায় কবর দেওয়া হয় এই কথা কাউকে বললেই একটু হয়ত

ভয় হবে, কিন্তু না বললে কেউ বুঝতে পারবে না। ভাববে একটা সাধারণ জায়গা। কিন্তু যে-কোনো লোককে একটি শ্মশানে নিয়ে গেলে সে বুঝবে এটি শ্মশান। তার চার পাশে হয়ত মাথার খুলি, হাড়, লেপ-তোষক পড়ে থাকবে।

আরো খানিক-পরে রাস্তার আলো নিবে গেল। দূরের গ্রামের সেই জোরালো আলো মিলিয়ে গেল। বাড়ির আলোও আর দেখা গেল না। ছোট পিদিমের আলোও ক্রমশ তেল ফুরিয়ে যাওয়ায় ধীরে ধীরে নিবে গেল। মানুষ নিজের বুদ্ধি দিয়ে যে-আলো সৃষ্টি করেছে সেই আলো সমস্তক্ষণ-স্থায়ী নয়। ইলেক্‌ট্রিক সুইচেব আলো জ্বলে, তেমনি মানুষের বুদ্ধিতে তার কাজ চলে। কলের আলো নিবে গেলে আসল প্রকৃতির আলো ফুটে উঠল আকাশে। দুই আলো দু'টি ভাই; অন্ধকার যেন তাদের শত্রু। নিজের আলোর তেজ কম দেখে প্রকৃতি যেন কলের আলোর হাতে সেই শত্রুকে জয় করার ভার সমর্পণ করেছে। কলের আলো তার ডিউটি শেষ করল। এখন ধীরে ধীরে প্রকৃতির স্নিগ্ধ আলো চারি দিক পাহারা দিতে লাগল। চোখে ঘুম আসছে। ঘরে গিয়ে শুলাম।—সুব্রত কর, ১৩৫৭

বর্তমান গ্রীষ্মের অবকাশের আগে বিশ্বভারতী কর্ম-সমিতি থেকে ১৯৫৪ এবং ১৯৫৫ সালের এপ্রিল অবধি এক বছরের ছুটির দিনগুলির একটি তালিকা করা হয়েছে। নিম্নে সেগুলি দেওয়া গেল :—গ্রীষ্মের বন্ধ—পয়লা মে থেকে ত্রিশ জুন, ১৯৫৪। পূজার বন্ধ—পয়লা অক্টোবর থেকে একত্রিশ অক্টোবর ১৯৫৪। ১৯৫৪ সালের ছুটি—জুলাই ১৫ (বৃহস্পতিবার)—বর্ষামঙ্গল, জুলাই, ১৬ (শুক্রবার)—ধর্মচক্রপ্রবর্তন, আগষ্ট ৭ (শনিবার)—রবীন্দ্র-তিরোধান তিথি ও বৃক্ষরোপণ, আগষ্ট ৮ (রবিবার)—হলকর্ষণ, আগষ্ট ১৫ (রবিবার)—স্বাধীনতা-দিবস, সেপ্টেম্বর ১৬ (বৃহস্পতিবার)—শিল্পোৎসব, সেপ্টেম্বর ২৬ (রবিবার)—শারদোৎসব, সেপ্টেম্বর ২৭ (সোমবার)—রামমোহন-স্মরণতিথি, সেপ্টেম্বর ২৮ (মঙ্গলবার)—আনন্দবাজার, নভেম্বর ৯ (মঙ্গলবার)—ফতিহা দোয়াজ দহম্, ডিসেম্বর ১৮ (শনিবার)—দিনেন্দ্রনাথের স্মরণ-তিথি, ডিসেম্বর ২২ থেকে ২৫—পৌষ উৎসব ও বড়দিন, ডিসেম্বর ২৬ থেকে জানুয়ারী ৪—দেশভ্রমণ। ১৯৫৫ সালের তালিকা :—জানুয়ারী ২০ (বৃহস্পতিবার)—মহর্ষি স্মরণ-তিথি, জানুয়ারী ২৩ (রবিবার)—নেতাজী স্মরণ-দিবস, জানুয়ারী ২৫ (মঙ্গলবার)—মাঘোৎসব, জানুয়ারী ২৬ (বুধবার)—সাধারণ প্রজাতন্ত্র-দিবস, জানুয়ারী ২৭-২৮ (বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার)—বার্ষিক ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা, ফেব্রুয়ারী ৬

(রবিবার—) ও ৭ সোমবার—শ্রীনিকেতনের বার্ষিক-উৎসব, ফেব্রুয়ারী ১২ (শনিবার)—দীনবন্ধু স্মরণ-তিথি, মার্চ ৮ (মঙ্গলবার)—বসন্তোৎসব, মার্চ ১০ (বৃহস্পতিবার)—গান্ধী-পুণ্যাহ, এপ্রিল ১৪ (বৃহস্পতিবার)—বর্ষশেষ, এপ্রিল ১৫ (শুক্রবার)—নববর্ষ ও রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব পালন।

—এসব ছুটিগুলি কেবল স্কুল-কলেজ বন্ধ রেখেই শেষ হয় না। অধিকাংশ ছুটির দিনে আশ্রমের স্বকীয় উৎসব-অনুষ্ঠান করা হয়ে থাকে। কতকগুলি ছুটির দিনে আবার স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকে কিন্তু অফিস-লাইব্রেরী প্রভৃতি বন্ধ থাকে না। সে ছুটিগুলিতে সন্ধ্যাবেলা বিশেষ-বিশেষ উৎসব হয়। গুরুদেবের তিরোধানের পর এ ক'বছর তাঁর স্মরণ-দিবসের পূর্বে আশ্রমে অন্য কোনো উৎসব বা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় নি। এ বছর বর্ষামঙ্গল আগে হবে জানা যাচ্ছে। এ ছুটিগুলি ছাড়াও বর্ষার সময় বৃষ্টির জন্য আশ্রমের স্কুল-কলেজ প্রভৃতি প্রায়ই বন্ধ হয়। তাই গ্রীষ্মের ছুটি ও পূজার ছুটি কম করে দেওয়া হয়েছে।

বিশ্বভারতীর প্রথম পর্ব—জুলাই পয়লা থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর; দ্বিতীয় পর্ব—পয়লা নভেম্বর থেকে ২১ ডিসেম্বর ১৯৫৪; তৃতীয় পর্ব—জানুয়ারী ৬ থেকে ৩০ এপ্রিল ১৯৫৫। প্রথম ও তৃতীয় পর্বই ভর্তি হবার প্রশস্ত সময়।

শান্তিনিকেতনে সাপ্তাহিক ছুটির দিন—রবিবার নয়,—বুধবার। বিশেষ ক'রে 'বুধবার'-ই কেন ছুটির দিন ব'লে ধার্য হয়েছে,—সে তথ্য সম্বন্ধে আজকাল আশ্রমে অনেককে উৎসুক দেখা যায়। যতদূর জানা যায়, কলকাতায় আদি-ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিব-উপাসনার দিন ছিল বুধবার। সে-রীতি অনুসারে শান্তিনিকেতনেও মন্দিরে সাপ্তাহিক উপাসনা বুধবারে হত। এই ধর্মীয় ঐতিহ্য ছাড়া বুধবারের সঙ্গে শান্তিনিকেতনের আর-কোনো বিশেষ রকমের সংস্রবের কথা এ পর্যন্ত শোনা যায় নি। ১৬।১০।১৯৫৪

* * *

ছুটির আশ্রম প'ড়ে আছে। এধার থেকে ওধারে দৃষ্টি চলে যায়—সব ফাঁকা। গাছের ফাঁকে ফাঁকে লোক-চলাচল আর তেমন চোখে পড়ে না। আমবাগানে গাছগুলি খাড়া আছে;—আম নেই; যারা কাঠ-বিড়ালীর সঙ্গে সমান তালে এডালে-ওডালে খেলে বেড়াত, পাখিদের সঙ্গে কলকাকলীতে পাল্লা দিত;—সেই ছেলেমেয়ের দলই বা কোথায়। সকাল বেলা ৭টা থেকে সাড়ে-এগারোটা অবধি একবেলা এখন কাজ চলে। অফিস-মহলে ও লাইব্রেরীতে কিছু কর্মব্যস্ততা দেখা যায়। আর বিকেলে খেলার-মাঠে যা-একটুকু আনাগোনা জমে। পরীক্ষার

পাট এ-সময়টায় পড়েছে। তাই এখনো ছুটির আমেজ পুরোপুরি লাগেনি। এবং প্রকৃতির দয়ায় "দারুণ দহন-বেলা" ঘনাতেও আরো দু-চারদিন বোধ হয় দেরি আছে। তবে এমনিতেও যতই গরম পড়ুক, তাতে জ্বালা ধরায় কিন্তু ভ্যাপ্‌সা পচা গুমোটের ঘামে দেহ ক্লেদাক্ত ক'রে বিরক্তি জন্মায় না। দিনটাকে সহ্য ক'রে সন্ধ্যাটাও কোনো মতে কাটিয়ে উঠলে রাত আটটা থেকে ছুটিব আশ্রমে বাইরে আরামকেদারায় পড়ে থাকার মতো উপভোগ আবার কমই আছে। অন্য কোনোদিন এ জিনিসটি মেলবার নয়। মাঝরাত্রে গাছে-গাছে পাখিগুলির কিচিমিচি থেকে-থেকে হকচকিয়ে তোলে। এধার-ওধার থেকে বেজে ওঠে পাহারারত দারোয়ানদের হুঁইস্‌ল। তাদের ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত টর্চের ঝাঁঝালো আলোয় হঠাৎ একদিকটা জ্বল্‌-জ্বল্‌ করে। চৌকিদার দূরের গ্রামে হাঁক দিয়ে যায়—"কে····· হে—এ"। কুকুরের ঘেউ ঘেউ শুনতে শুনতে কখন্‌ আবার লোকের চোখে ঘুম লাগে। তারপর একটানা সুপ্তির মধ্যে দিয়ে পেরিয়ে এসে আবার যখন পাখির ডাকে ঘুম পাত্‌লা হয়, তখন ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় গায়ে চাদর জড়াতে জড়াতে মনে পড়ে সেই গানের কলি :—

বৈশাখের এই ভোরের হাওয়া
আসে মৃদু মন্দ—

যখন চোখ মেলা যায় তখন সামনে দেখা দিয়েছে অরুণ আলো। উঠে চারদিকটা ঘুরে না এসে থাকা যায় না। কিন্তু ঘুরতে গিয়েই বাড়ীর ঘেরায় ঠেকে-ঠেকে সচেতন হতে হয়,—মানুষের রাজ্যে এসে পড়া গেছে, এ যে জাগার সময়, যদি বা গোয়ালাপাড়ার রাঙা-মাটির পথে কতটা এগোনো যায়—কিন্তু অচিরেই যে কাজের সময়—সে কথা স্মরণ করিয়ে দেয়,—সে রাস্তা কেটে সরাসরি পাড়ি-দেওয়া নূতন ময়ূরাক্ষীর খাল, আর খালের পাড়ে পড়ে-থাকা কাজের সাজ-সরঞ্জামগুলি। মোটর-লরি, ইট-পাথর, কুলী-বস্তি, অফিস, গুদাম, তাঁবু, বাবু, কুলি-মজুর এসব মিলে খোলা মাঠের স্বপ্নাতুরতাকে ভোরের ঝিমুনির মতোই কোথায় দেয় ভাগিয়ে। ফিরে আসতে চেয়ে দেখা যায় শান্তিনিকেতনেরও চেহারা ফিরছে দিনে-দিনে। ৯।৫।১৯৫২

সকাল কাটে তো গরমের বিকেল আর কাটতে চায় না। সন্ধ্যার পর যে-যার আশ্রয় করে ঘরের দাওয়া। বাতাস থাকলে একটু বাঁচা যায়, না হলে আই-ঢাই ক'রে প্রাণ সারা। তখন অন্ধকারটাই তবু লাগে ভালো,—চাঁদনীরাত বাড়ায় জ্বালা। এমনি এক জ্যোৎস্না রাত্রে বেজে উঠল টুম টুম করে টিনের ঢোল, আর

ধুয়া তুলে গান উঠল পাড়া জাঁকিয়ে। শিশুদের সখের দলের কাণ্ড! চুপচাপ আশ্রমটির নিষ্ক্রিয়তা দিনের পর দিন একঘেয়ে হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। সান্ধ্যবিনোদনের আসরে নিত্য-নূতন আনন্দের উপলক্ষে যারা চির-অভ্যস্ত, তারা অকস্মাৎ বেরিয়ে পড়ল একটা-কিছু রকমারীর খোঁজে। ভুবনডাঙা-গ্রামের পাড়াপড়শি চাষীমজুর গৃহস্থেরা দল বেঁধে আসে 'ভাদুর গান' গাইতে ভাদ্র মাসে। উৎসাহের ঝোঁকে এদের ভাদু শুরু হয়ে গেল শরজ্যৈষ্ঠেই। শিশুরা আজ ভাদুর গানের সুরে নিজেরাই বেঁধেছে গান। সেই তালে সেই ভঙ্গীতে নিজেরাই বানিয়েছে নাচ। ছোট্ট একটি ভাদুমূর্তিও করেছে রচনা। তেমনি ভাঁজে ঘাঘরা আর জামা প'রে দুটি মেয়ে সেজেছে নর্তকী। তারপরে জ্যোৎস্না রাতেও ভাঙা একটি হ্যারিকেন জ্বেলে একজনা নিয়েছে হাতে ঝুলিয়ে। ছয় থেকে দশ-এগারো বছর বয়সের এই ছেলেমেয়ের মণ্ডলীটির মধ্যে বাঙালী আছে, মাদ্রাজী আছে, বৈদেশিক চীনাও রয়েছে মেতে। ভাদুর আসরে দেশের সমসাময়িক অবস্থাও যেমন গানের বিষয় হয়ে থাকে, তেমনি শিশুদের বাঁধা গানেও দেখা গেল, এসে গিয়েছে দুর্ভিক্ষের কথা। কেমন করে তাদের মনে খেলেছে,—যে-কংগ্রেস এমন বৃটিশকে সরাল, তারা দেশের এই দুর্ভিক্ষ সরাতে পারছে না! মূল গায়েন যেমনি ছড়াটি গেয়ে শেষ করল, অমনি তার আশেপাশে থেকে মালকোছা-মারা ঝুঁকে-পড়া দোহারের দল গলা-বাড়িয়ে ধুয়া ধরে চলল মহোল্লাসে—"দেখো দেখো ভাদুমণি, চেয়ে দেখ ভারত-পানে।" আর, ঢুলীটি অমনি তার টিনের ঢোলে জোরে জোরে দিতে লাগল ঘন ঘন চাটি, ঘূর্ণি-নাচে আসর মাৎ হয়ে গেল।

অবশেষে কবির রাজ্যে কালিদাসের মানরক্ষা হল। পয়লা আষাঢ়ের দুপুর থেকে প্রবল একচোট ধারাবর্ষণে চারদিকটা নেয়ে উঠল। "নীল নবঘনে আষাঢ়-গগনে তিল ঠাঁই" আর ছিল না। প্রচণ্ড বায়ুবেগের সঙ্গে সে কী ঝমাঝম্ বৃষ্টি! এখানে সেখানে জল দাঁড়িয়ে গেল, শিশুদের আটকায় কে! তারা মাঠে নেমে ছুটোছুটি করতে লাগল। দিন বয়ে গিয়ে আষাঢ়-সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল, তখনো মেঘের ভারে দিক্ রইল ভারী হয়ে। ঠাণ্ডা হাওয়ায় ভেসে ফিরতে লাগল ভিজে মাটির গন্ধ। ঘরে ঘরে পয়লা আষাঢ়ের স্মরণসভা জমে গেল। পরদিন ভোর হতে মাঠে বেরিয়েই প্রথম যে জিনিসটি চোখে পড়ল—সেটি আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের দান নয়, আশ্রমে নব-বর্ষার চিরঅনুচর—ভেল্‌ভেট পোকা। একরাত্রের মধ্যে সবুজ পত্রাঙ্কুরদলের ফাঁকে ফাঁকে কোথা থেকে কেমন ক'রে এসে তারা হাজির হয়েছে; গোলাপীবুটিদার শ্যামল আভাময় প্রান্তর, অদূরে বকের-পাতির সাদা

পাখার ছাপধরা বাঁধের বিস্তীর্ণ জলরাশি, উপরে মেঘের নীল-অঞ্জন-ঘন-পুঞ্জছায়াকীর্ণ স্নিগ্ধ-সজল আকাশ,—বর্ষা তবে এলই। কিন্তু নাচে-গানে যারা একে বরণ করে নেবে, শান্তিনিকেতনে সেই ছেলেমেয়ের দল, বাঁধভাঙা জলকল্লোলের সাথে সুর মিলিয়ে যারা সমস্বরে গেয়ে উঠবে,—

ঐ কি এলে আকাশপারে
দিক-ললনার প্রিয়

তারাই এ সময় রইল দূরে। স্কুল খুলতে এবং সবাই তারা এসে জমতে জমতে আরো মাসখানেকের মতো দেরি। তেসরা জুলাই ১৯শে আষাঢ়!—ততদিনে বর্ষার আবির্ভাব পুরোনো হয়ে না গেলে হয়। দেশে-দেশে-ছড়ানো সেই তাদের জন্য আজকের এই দিনগুলির কথা তাদেরি একজনের ভাষায় এখানে তুলে দেওয়া গেল। এইটুকু একটি মেয়ে লিখছে তার গল্পের খাতায়:

"কাল খুব বিষ্টি হল। হু-হু করে ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে লাগল। বিষ্টির ছাঁটে বারান্দাটা ভিজে গেল। আকাশটা মেঘে ঢেকে গেল। চারদিক কালো হয়ে গেল। এখন সকলের মুখে হাসি দেখা দিল। সবাই গরমে উঃ-আঃ করছিল। হাওয়ার চোটে গাছগুলো শুয়ে পড়তে লাগল। পাতাগুলো হাওয়ায় থর থর কাঁপতে লাগল। আমরা খুব মজা ক'রে বিষ্টিতে ভিজে-ভিজে স্নান করলাম। বিষ্টিটা প্রথম গুঁড়ি গুঁড়ি পড়তে থাকে। বিষ্টির দিনে আমরা সুর ক'রে-ক'রে রামায়ণ পড়ি। আর মার কাছ থেকে কিছু তেলমুড়ি নিয়ে খাই। বিষ্টির দিনে খিচুড়ি আর তেলমুড়ি খেতে খুব ভালো লাগে। আমরা চীৎকার ক'রে বলি—

আয় বিষ্টি হেনে,
কাক দেব মেনে,
কাকটি ম'ল ধড়ফড়িয়ে,
বিষ্টি এল চড়বড়িয়ে॥

বিষ্টির দিনে আমরা মজা করে পুতুল খেলি। আর, গান করতে থাকি। জানলা দিয়ে চেয়ে দেখি বাইরে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে আর খুব জোর বিষ্টি হচ্ছে। ২৩৷৬৷১৯৫২

শান্তিনিকেতন এখন ছোটোখাটো একখানি শহর—ছুটিতেও তার মধ্যে আগের সেই নিরিবিলি জনশূন্য পরিবেশটি পাওয়া যায় না। আগে ছুটি হলে ইলেক্‌ট্রিক লাইট যেত বন্ধ হয়ে, গ্রীষ্মের ছুটিতে এত কম লোক আশ্রমে থাকতেন যে, দিনের বেলাই রাস্তাঘাট খাঁ-খাঁ করত, রাত্রিটা থাকত নিস্তব্ধ। অন্ধকারে কিংবা চাঁদের

আলোয় সে যেন চুপ করে বিশ্রাম নিত—আশ্রমে এলেই বোঝা যেত ছুটি চলছে।
এখন সে কথা সহজে বুঝবার উপায় নেই, সহসা তো নয়ই। ভোর হতে না হতে আপিসে-আপিসে লাইব্রেরীতে দোকানে লোকের আনাগোনা শুরু হয়ে যায়। বোলপুর-শান্তিনিকেতন পথের মোড়ের বটতলায় 'শ্রীপদ'র চায়ের দোকানটি সারাক্ষণ সরগরম। চা-পায়ীদের গল্পগুজব চলে, হঠাৎ-হঠাৎ বাউলের একতারাও বেজে ওঠে, বেজে ওঠে বাঁদরওয়ালার ডুগডুগি; আর এক-একদিন বোলপুরে কোনো পার্টির সভা-সমিতির খবর লাউডস্পীকারে রাস্তাটা মাতিয়ে তোলে। এমনি ভিড় 'ভকতভাই' এবং 'কালোর দোকানে'। দেশ-বিদেশের লোক দিনে-রাতে এসে বেচাকেনা করছে সেখানে। এদিকে আছে হাসপাতাল, বুধবার একবেলা সেটি বন্ধ থাকে আর নয় তো সেখানে প্রত্যহ ব্যস্ততার সীমা থাকে না—এক্সরে, কাটাছেঁড়া, ইনজেকশান, ওষুধপত্র। তবে ইন্‌ডোর-ওয়ার্ডটি ছুটিতে বন্ধ আছে, সেখানেই মাত্র এখন ছেলেদের কলকলধ্বনি নীরব। সন্ধ্যার থেকে রাত ন'টা-দশটা অবধি ছুটিতেও আশ্রমের রাস্তায় লোক ঘুরে বেড়ায়। ছুটির আশ্রমের নির্জনতার ভীতি আর মনেই জাগে না। ২৬.৬।১৯৫৪

গ্রীষ্মের ছুটির শেষে প্রথম বুধবারের উপাসনা হল। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন ভাষণে ছুটির তাৎপর্যটি বুঝিয়ে বললেন—দু'মাস পরে ছুটির শেষে আবার আমরা একত্র হয়েছি। গানে এইমাত্র বলা হল—"আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া"—ছুটিতে সবাই বাইরে বেরিয়ে পড়েছিলাম। এই বাইরে-বেরোনোর খুবই প্রয়োজন আছে আমাদের আশ্রমের সাধনার পক্ষে। গুরুদেব নিজের জীবনে এই বাইরে-বেরোনোর প্রয়োজন বারবার বোধ করেছেন। প্রাচীনকালে তপোবনের মুনিঋষিগণও বর্ষে-বর্ষে ছাত্রগণকে নিয়ে দেশ-ভ্রমণে বেরিয়ে পড়তেন। তাতে দু'রকমের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হত। এক তো তাঁরা দেশের ও সমাজের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে পারতেন; দ্বিতীয়ত তাঁদের নিজেদের সাধনাকে সবার মধ্যে প্রচারিত করে দেশের ও সমাজের মঙ্গল সাধন করবার গুরুদায়িত্ব পালন করতেন এবং নিজেদের সাধনার সম্বন্ধেও তাঁরা নূতন করে সচেতন হতেন। তার অপূর্ণতা তাঁদের কাছে ধরা পড়ত। আমরা যে সব-সময় সব কাজে সজাগ থাকি তা নয়। গাঁয়ের লোকেরা যখন যাত্রাগানের পালা শুনতে যায়, ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে পালার পর পালা শোনে। জিজ্ঞেস করলে বলতেই পারে না—কী পালা হচ্ছে বা কী-কী ঘটল। আমরা অনেকটা সেরকমভাবেই সাধনা করে থাকি। তার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ থাকি

না; তার মধ্যে গলদ ঢুকলে তা অপনোদন করবার চেষ্টা করি না, দোষত্রুটি বুঝতে অপারগ হয়ে পড়ি। আমাদের সাধনার পক্ষে তাই বাইরে-বেরোনো খুব দরকার। ছুটিতে বাইরে বেরিয়ে সবার সঙ্গে যুক্ত হয়ে বুঝতে পারি আমরা কী সাধনা নিয়ে আছি, সে সাধনা থেকে সমাজের কোন্ মঙ্গল সাধন করতে চাই, তার মধ্যে কতটা পূর্ণতা লাভ করেছি। সমাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যে-সাধনা সে-সাধনাই সত্য;—একাকী সাধনায় কোনো মঙ্গল সাধিত হয় না। আমাদের আশ্রমের সাধনা মঙ্গলের সাধনা, দশের সঙ্গে যোগের সাধনা। ছুটিতে বাইরে গিয়ে দশের সঙ্গে আমরা মিলে আবার ফিরে এসেছি আশ্রমে। এবার নূতন উদ্যমে আমাদের সাধনাকে পূর্ণতর করবার তপস্যায় লাগব; আজকের উপাসনা সেই সাধনায় বল লাভের উপাসনা। ৬.৭।১৯৫৪

ছুটির আশ্রমে লোকজন কমে গেছে। ছেলেমেয়েদের কলকোলাহল বন্ধ। আশ্রমের প্রাকৃতিক পরিবেশটিই এখন বিশেষভাবে লক্ষ্যগোচর হয়। মানুষের খবর ছাপিয়ে উঠছে মাঠঘাট আবহাওয়ার খবর।

*　　　*　　　*

"নাই রস নাই, দারুণ দহন বেলা।" কী রুক্ষ শুষ্ক সর্বহারা প্রকৃতি। দুদিন আগেও যা ছিল, কোথায় তার সেই ফুলের বাহার,—ফলের সম্ভার; পাতাগুলি ক্লান্ত বিবর্ণ; গাছগুলি সব ঐশ্বর্য খুইয়ে তপ্ত আকাশের নীচে সরল সমুন্নতশীর্ষ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কেবল পাখিগুলি দিনে-রাতে কাকলি-মুখর; হু-হু বেগে বাতাস এসে ক্ষণে-ক্ষণে চাঞ্চল্য জাগিয়ে তুলছে, কিন্তু ধ্যানমগ্ন প্রকৃতির ভ্রূক্ষেপমাত্র নেই। আপন রিক্ত-মহিমায় অটল হয়ে সে বিরাজমান।

*　　　*　　　*　　　*

সারাটি দিন রুদ্ধ-গৃহে আবদ্ধ থেকে মানুষের মনমেজাজ বিরূপ হয়ে ওঠে। রোদ পড়তে না পড়তে উন্মুক্ত প্রান্তর নীরব আহ্বান জানাতে থাকে; নির্মল স্নিগ্ধ বায়ু আর গাঢ় নীল-আকাশ সকলকে ব্যাকুল করে তোলে; বহু দূর অবধি হেঁটে বেড়িয়ে জাগে তৃপ্তি।

*　　　*　　　*

এই প্রান্তর-প্রকৃতি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। পূর্ববঙ্গে ও উত্তরবঙ্গে দেখা যায় সর্বনাশা নদীর ভাঙন;—হা হা ক'রে নদী গ্রামগ্রামান্তর শহর-প্রান্তর আপন গ্রাসে পুরে নিশ্চিহ্ন করে ফেলে। পশ্চিমবঙ্গের এই রাঢ়-অঞ্চলে দেখা যায় আরেক দৃশ্য। এদিককার নদীতে বান ডাকে, ভাঙন লাগে না। কিন্তু এখানে ভাঙন ধরেছে

কঠিন মাটির বুকে। রূপকথার রাক্ষসী-রানীর মতো তার অতুলনীয় সৌন্দর্য-লহরী; অমনিতরোই নিঃশব্দে রস-শুষে-নেওয়া তার বুভুক্ষা। দিগ্‌দিগন্তবিস্তৃত এই ভাঙন-ধরা 'খোয়াই' ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে মানুষের বাসভূমিকে আপন কবলে কবলিত করে নেয়। মানুষ তার বাহ্যিক রূপেই মুগ্ধ; সহসা এর ভয়াল প্রকৃতিটি বুঝতে পারে না। খতিয়ানে ধরা পড়ে—মানুষ এর দ্বারা কতখানি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে; প্রতি বছর কত যোজন উর্বরা জমি এই মরুভূমি অধিকার করছে। শান্তিনিকেতনের উত্তর ও পশ্চিম প্রান্তরের দিকে তাকালে বন্ধ্যা-জমির এই ভীষণ রমণীয় রূপ উপলব্ধি করা যায়। মাইলের পর মাইল কেবল খোয়াই—"ঊর্মিল লাল কাঁকরের নিস্তব্ধ তোলপাড়।" রবীন্দ্রনাথ উত্তর-পশ্চিমের খোয়াইটি দেখেই লিখেছিলেন বিখ্যাত 'খোয়াই' কবিতা।

*　　　*　　　*

পশ্চিমের খোয়াইটি একসময় শান্তিনিকেতন-আশ্রমবাসীদের বৈকালিক-ভ্রমণের পক্ষে বিশেষ একটি প্রিয় স্থান ছিল। বেলা পড়তে না পড়তে দলে-দলে লোক শ্রীনিকেতনের-পথে পিয়ার্সন-পল্লীর মাঠে বেড়াতে যেত। বৃষ্টির দিনে ভিজে-ভিজে এ খোয়াইতে কতজন কেয়া ফুল তুলতে আসত। খোয়াইয়ের পশ্চিম-কোলে ছিল একটা সুবিস্তৃত সমতল জমি, তার শক্ত বুক ছিল যেন সান-বাঁধানো। একবার (১৯'৪, ৩৫ ?) তখনকার বিখ্যাত বাঙালী বৈমানিক বিনয় দাস ও আরেকজন ইউরোপীয়ান ভদ্রলোক স্বতন্ত্র দুটি এরোপ্লেনে করে গুরুদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। নামলেন এসে এই সমতল ভূমিতে। এমনই সে-অঞ্চলটি প্রশস্ত ছিল। আশ্রমের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে নিয়ে সকালবেলা শিক্ষক-কর্মী সবাই এরোপ্লেন-নামা দেখতে গিয়েছিলেন। পাশাপাশি রাখতে গিয়ে একটা এরোপ্লেনের পাখা আরেকটা এরোপ্লেনের গায়ে গেল ঢুকে। আরোহীগণ রক্ষা পেলেন বটে কিন্তু এরোপ্লেন-দুটি সাংঘাতিকভাবে জখম হল। তিনচার-দিন পড়ে রইল ওই মাঠে। আজ সেই সমতল জমির অর্ধেকেরও বেশি অংশ খোয়াইয়ে পরিণত হয়েছে। নদীর ভাঙনের মতো মাটির এ-ভাঙন সুস্পষ্টরূপে দৃষ্টিগোচর নয়। দুচার বছর পরে-পরে অকস্মাৎ একদিন চোখে পড়ে—খোয়াই যে অনেক দূর এগিয়ে এসেছে! উত্তর-পশ্চিমের খোয়াইতে বেড়াতে গেলে এখন যেন ধাঁধাঁ লাগে—এ কোথায় এলাম! তার রূপের ঘটেছে কত পরিবর্তন। তেমনি মানুষও পণ করে লেগেছে খোয়াইর ক্ষয় রুখতে। সরকারের ভূমি-সংরক্ষণ-বিভাগ ঐ অঞ্চলে বহু সোনাঝুরি গাছ পুঁতে দিয়েছে। ওর শিকড় নাকি মাটি আঁকড়ে রাখে। দু'তিন জায়গায়

সোনাঝুরি গাছের কুঞ্জ গড়ে উঠেছে; সঙ্গে আছে কাশ। এসব জায়গায় এখন আশ্রমের বিভিন্ন বিভাগ থেকে অনেক সময় পিকনিক করতে আসা হয়। গ্রীষ্মের ছুটির আগেই তো রাত্রিবেলা দু'তিনটে পিকনিক হয়ে গেল এখানে। সম্প্রতি আরো বিস্তৃতভাবে ভূমি-সংরক্ষণের কাজ শুরু হয়েছে। এদিকে আশ্রমের পাশে খোয়াইয়ের বুকে খোঁড়া হয়েছে দুটো পুকুর—"লাল বাঁধ।" মাছের চাষ হয়, ধোপারা কাপড় কাচে। বর্ষার জলধারা আশ্রমের গা বেয়ে পড়ে এসে এই পুকুর-গুলিতে; কলকল রবে ক্ষুদ্র-বৃহৎ স্রোতধারা খোয়াই দিয়ে আর বয়ে যায় না। এদিকের কেয়াঝোপগুলিও গেছে অদৃশ্য হয়ে, মাটির বুকের উঁচু-নীচু তরঙ্গগুলিও নানাভাবে রূপ বদল করেছে।

* * *

শান্তিনিকেতনের পশ্চিম দিকের খোয়াই নিজে পরিবর্তিত হচ্ছে, মানুষেরাও তার চেহারা কিছু-কিছু পাল্টে দিচ্ছে। কিন্তু উত্তর দিকের খোয়াই নিজে এমন দ্রুত পরিবর্তনশীল নয়। তার রূপায়ণ চলছে দিনে-দিনে মানুষের হাতে। আশ্রমও এ প্রান্তরের দিকেই ক্রমে বিস্তৃত হচ্ছে। উত্তরপল্লী, রতন-পল্লী, দিগন্ত-পল্লী, শ্যামবাটি প্রভৃতি পল্লীগুলি দেখা দিয়েছে। সেদিকে গড়ে উঠেছে কত বাড়ি-ঘর রাস্তা-ঘাট। সন্ধ্যার পর এ রাস্তা এখন আলোয়-আলোময়। খোয়াইয়ের শেষ-প্রান্তে ফুলডাঙার পাশে ক্যানেল কাটা হয়েছে। তার উঁচু পাড় শূন্য ফুঁড়ে উঠে তালপুকুর ও রেলওয়ে-লেভেল-ক্রশিংকে দূরে সরিয়ে দিলে। আশ্রম থেকে এই তালপুকুরের পাশ দিয়ে লেভেল-ক্রশিং অবধি খোয়াইয়ের মধ্যে দিয়ে একটা বহুদূর-প্রসারিত সমতল জায়গা ছিল। তারই মাঝখানে ছিল অনেকগুলি তালগাছের জমাট আসর। ক্যানেলের গহ্বরে তার অনেকখানি লোপ পেয়ে গেলেও এখনও কিছু বাকি আছে। এদিকটাই এখন একটু-যা নিরিবিলি। দূরে দূরে আদিত্যপুর, তালতোড়, পারুলডাঙা ও সাঁওতাল-গ্রামগুলি চোখে পড়ে। গ্রামবাসী ও সাঁওতালরা দিনের শেষে এ পথে বাড়ি ফেরে। সাঁওতাল-মেয়েরা যেতে যেতে ক্যানেলের বৃষ্টি-জমা জলে হাত-পা ধুয়ে নেয়, ওভারব্রিজের নীচে বসে বিশ্রাম করে। মৃদু গান ও বাঁশির স্বর শোনা যায়। পূর্বপল্লীর প্রান্তে রেললাইনের উঁচু-পাড় দিয়ে চলে এসেছে ছিন্ন-ছিন্ন তালের সারি, ফাঁকা-ফাঁকা ঘরবাড়ি, ছবির রাজ্য। তারপরেই এই এক-টুকরা সমতল-ক্ষেত্রে তালীকুঞ্জের অবশিষ্ট—নীরব নির্জন। মাঠের দুর্দান্ত হাওয়ায় তালগাছে তোলে নানারকম শব্দ। এখনও একটা নিবিড় রহস্যের আভাস মেলে এখানে আসার সঙ্গে সঙ্গে; বীরভূমের প্রাচীন ঠ্যাঙাড়ের কাহিনী মনে প'ড়ে শিউরে উঠতে হয়। বস্তুত

এখনও রাত দশটার পরে এ পথে চলতে সাহস হয় কম লোকেরই। মাঝে-মাঝে রাহাজানির গুজব রটে! কিন্তু দিনের বেলা এর অপরূপ এক গম্ভীর শোভা। এখানে-ওখানে রাখালেরা গরু চরাতে থাকে; শান্তিনিকেতনের ছেলেমেয়েরা ছবি আঁকতে যায়; বিকেলে অনেকে ক্যানেলের ধারে বেড়াতেও আসে। অদূরবর্ত্তী আশ্রমের সমগ্র শ্রীটুকু এখানে বসে নিরীক্ষণ করা যায়। ক্যানেলে জল এলে এই নির্জনতা থাকবে কি না সন্দেহ। কারণ এখনই এ-প্রান্তরে লোকালয় ঝেড়ে উঠেছে, আট-দশ বছর বাদে একেও কি আর চেনা যাবে। ৪।৫।১৯৫৫

১লা মে থেকে বিশ্বভারতীর শিক্ষা-বিভাগগুলি বন্ধ হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য বিভাগগুলিতে দুবেলাই কাজ চলছিল। বেলা এগারটার পরে এখানে এখন বাইরে বেরুনো মহা আতঙ্কের ব্যাপার। মাঝে-মাঝে ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে, মেঘলা-দিনও বেশ পাওয়া যাচ্ছে, তবু যে গরম সে গরম। রোদের চোখ-রাঙানির কমতি নেই এবং মেঘলা-দিনের ভিতর থেকে ফেটে বেরুচ্ছে প্রচণ্ড তাপ। তাই ১২ই মে থেকে দুবেলার কাজ বন্ধ করতে হয়েছে। সাড়ে ছ'টা থেকে সাড়ে-এগারটা অবধি বিশ্বভারতীর অফিসে-হাসপাতালে কাজ চলছে, তারপর থেকে ঘরে-ঘরে জানলা-দরজা বন্ধ। বিকেল সাড়ে-পাঁচটার আগে বাইরে তাকানো কষ্টকর। পর পর দু বছর বৃষ্টির স্বল্পতায় লোক শঙ্কিত হয়ে উঠেছে—এবারও কি বর্ষায় জল পাওয়া যাবে না! 'আমে ধান, তেঁতুলে বান' খনার বচন। কিন্তু এ অঞ্চলে এবার আমের বিশেষ কমতি দেখা যাচ্ছে। রোদে সব জ্বলে গেল। পটল অন্যান্যবার এসময় খুবই সস্তা হত, এবার টাকার কাছাকাছি, শাক-সব্জীও দুর্মূল্য। ছুটির মাঝামাঝি এখন বোঝা যাচ্ছে আশ্রম কতটা খালি। ছুটি হবার মুখে যাঁরা নিজেদের বিশেষ কোনো কাজকর্মে আশ্রমে থেকে গিয়েছিলেন, এখন তাঁরা বাইরে ছুটতে ব্যস্ত। এত দীর্ঘ অবসর এক স্থানে বসে যাপন করবার মতো মনের অবস্থা খুব কম লোকেরই আছে। যাঁরা নির্জনতাপ্রিয় তাঁরাও দশ-পনেরো দিন বাইরে ঘুরতে যাচ্ছেন। সারাদিন আশ্রমের নিস্তব্ধতাকে মুখর করে রাখছে, একমাত্র ঐ পাখির দল। তাদের কলকাকলির আর বিরাম নেই। আর সন্ধ্যা-রাতের দিকে শোনা যায় আশ্রমের পাড়ায় পাড়ায় ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের কলকল রব। নাটক, নাচ-গান ও সাহিত্য-সভা করে তারা ছুটির একঘেঁয়েমি কিছুটা দূর করছে।

এখনও ছুটির আশ্রমে দলে-দলে পরিদর্শকের আসা-যাওয়া চলছে। কিছুদিন আগে গুজরাট থেকে প্রায় তিন শ লোকের একটি শিক্ষানবিশ দল এসেছিলেন এখানকার ছাত্রগণ যাঁরা বর্তমানে রয়েছেন, তাঁরাই তাঁদের দ্রষ্টব্য স্থান ও বিষয়গুলি

দেখিয়েছেন। স্কুল-কলেজগুলি ছুটি হয়েছে, তাই ছাত্র-ছাত্রীর দলই অধিক সংখ্যায় শান্তিনিকেতনে বেড়াতে আসছেন। সকাল ও সন্ধ্যার দিকে তাঁরা ঘুরে ঘুরে বেড়ান এবং চারিদিকের শুষ্ক রৌদ্র আবহাওয়ার মধ্যেও ফুটে আছে যে গন্ধরাজ রক্তকরবী আর কুর্চি তারই দু-এক গুচ্ছ তুলে নিয়ে যান। ৬।৬।১৯৫৫

গ্রীষ্মের অবসান ক্ষণে ক্ষণে সূচিত হচ্ছে; নীলাঞ্জন ছায়ায় আশ্রমের আম্রকুঞ্জে শালবীথি বকুলবীথি শ্যাম হয়ে উঠছে, কুর্চিফুলে ছেয়ে গেছে গাছ। কিন্তু সজল বর্ষণে এখনও আশ্রম ভালো করে অভিষিক্ত হবার সুযোগ পাচ্ছে না। সামান্য বৃষ্টিপাত ধরিত্রী মুহূর্তে শুষে নিয়ে তৃষার্ত হয়ে থাকে। পাখি ডাকতে থাকে—ফটিক জল, ফটিক জল। তপ্ত মাটির তাপে চারিদিক অতি ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তবে এক-একদিন আশেপাশে বৃষ্টি হবার আভাস পাওয়া যাচ্ছে—দূরাগত শীতল বাতাসে এবং রোদের নরম তেজে। ১৫।৬।১৯৫৭

পুরো দু' মাস ছুটি উপভোগের পর আবার ছেলেমেয়েরা আনন্দের হাট বসিয়েছে আশ্রমে। পয়লা জুলাই থেকে বিশ্বভারতীর সমস্ত বিভাগ খুলে গেছে। নূতন উদ্যমে কাজ শুরু হয়েছে। ক্লাস বসেছে গাছের তলায়-তলায়। পুরোনো ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ভিড়ে' আসছে নতুন দল। কতকগুলো নতুন মুখের আবির্ভাব হল, কয়েকটা পুরোনো পরিচিত মুখ গেল হারিয়ে। যারা নতুন এল, তারা আবার মাতিয়ে রাখবে আশ্রমকে তাদের কলকাকলীতে। সকাল-বিকাল ক্লাস, বৃষ্টির দিনে বেড়াতে যাওয়া, সাঁঝে বসে পড়াশুনো, কোনোদিন সাহিত্য-সভা, নাটক-অভিনয়, মাঝে মাঝে নৃত্য-গীতের আসর,—আর তারই ফাঁকে ফাঁকে আসে বিভিন্ন উৎসব।—এই রকম বিচিত্রগতিতে এগোতে থাকবে আবার শান্তিনিকেতনের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা। ১৩।৭।১৯৫৭

জনবিরলতায় আগে শান্তিনিকেতনের ছুটির পর্বগুলি ছিল সুস্পষ্ট। বিশেষ করে গরমের ছুটির দু'মাস দিন-রাতই ছুটির ঘোষণায় নীরব থাকত পথঘাট। আর এখন? ঐ তো টেলিগ্রাম-পিওন লাল সাইকেলের পিঠে চড়ে ছুটোছুটি লাগিয়েছে এই সাত-সকালে। রেজিষ্ট্রারের অফিসে চলছে টেবুলেশন। লাইব্রেরীতে বই দেয়া-নেয়া। অফিসে-অফিসে রেমিংটনের খট্-খটাং। প্রেস, হাসপাতাল, ইঞ্জিনীয়ারিং-বিভাগ প্রতিদিনই জানিয়ে যাচ্ছে তাদের জাগ্রত অবস্থা। ব্যস্ততার হার নামা-ওঠা করলেও হঠাৎ-দেখে ছুটি বুঝবার উপায় নেই সেই আগের দিনের মতো। প্রতিষ্ঠান বড় হয়েছে, সীমাসরহদ্দ বেড়ে গেছে, আশেপাশে বসতি হয়েছে অনেক, লোকজনের কমতি নেই। নিরাবিল নির্জনের যে অখণ্ড স্নিগ্ধ শান্তি একদিন

মহানগরীর মহাপ্রাণকে হাতছানি দিয়েছিল, আজ তাকে পেতে গেলে মনের মধ্যে হাতড়াতে হবে, শান্তির ছায়া বাইরে থেকে এসে যখন-তখনই চোখে লাগবে না। একদিন এখানে মন্ত্র উঠেছিল—'শান্তং শিবং অদ্বৈতম্', আর একদিন গান শোনা গেল—"অশান্তির অন্তরের মাঝে শান্তি সুমহান্"। এই গানে-গানেই আজ বিশ্বভারতী আরতি করছে শান্তিনিকেতনের আরাধ্য আশ্রমদেবতাকে। রবের মধ্যে নীরবতার আমেজ দিয়ে ছুটির আশ্রম তার এ-কালের বাঁশী বাজাচ্ছে বন্ধ-অফিস-বিকেলবেলার খোলা-আসরে।

গোটা গ্রীষ্মটাই চলবে এই একবেলার ছুটি। আষাঢ়ের মাঝামাঝি, পয়লা জুলাই স্কুল-কলেজ খোলার পালা এলে অফিসমহলেরও এ-ছুটিটুকুর হবে অবসান। আপাতত, ছুটির রসোপভোগের বাস্তব উপলক্ষস্বরূপ রয়েছে কর্মীদের ঘরে ঘরে আর যে-একটি দুর্লভ ধারা, তার জোগান দিচ্ছেন ডেইরী থেকে শ্রীনিকেতনের পল্লী-সংগঠন-বিভাগ। ছুটির দু'মাস সস্তা দরে খাঁটি দুধের আস্বাদে স্বাদু হয়ে ওঠে গরমে-এলানো অবসরগুলি। ছুটিতে বাইরে বেরবার মুখে এ-সুযোগের প্রত্যাখ্যানের কথাও একটু মনে পড়ে বৈকি। তবে তা-ও মন থেকে উবে যেত তেমন গরম থাকলে। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হয়ে সে গরমকে ঠেকিয়েছে। নয়তো এ-খরজ্যৈষ্ঠে আজ 'ত্রাহি ত্রাহি' ডাক পড়ে যেত বীরভূমের এই কাঁকুড়ে-মরুডাঙায়। ঝড়ে-পড়া কাঁচা আম ঝুড়িতে ঝুড়িতে চালান আসছে গাঁ থেকে। ঘরে-পাকানো তার অম্ল-মাধুর্য গরমের দিনে মন্দ লাগে না। তার সঙ্গে তালশাঁসও এনে দেয় একটু আশ্বাস। চোখ জুড়ায় কৃষ্ণচূড়া; বেলি আর গোলকচাঁপার গন্ধের টানে ও মাঝে মাঝে দমকা হওয়ার আন্দোলনে উদাস প্রহরগুলির ঝিমুনি কেটে যায়, গুমটের গোমড়া মুখটাকে উপেক্ষা করে তার মুখের উপর তুড়ি দিয়ে রাত-বিরাতে বেজে ওঠে এদিকে-ওদিকে খোল-মাদলের আনন্দ-বোল। সুতরাং একেবারে মন্দা চলছে বলা চলে না। ৭।৬।১৯৫৮

শারদাবকাশ

ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি। শুভ্র কাশের আন্দোলন আর শিউলি-ফোটার সৌরভ। শান্তিনিকেতনে ছুটির সুর লাগে। দূরের সঙ্গে মিলনের আগে, কাছের যারা সঙ্গী,—দেশ-বিদেশের নানা জন এক হয়ে যারা এসে মিলেছিল—একত্রে থেকেছে, বাড়ির লোকের থেকেও যাদের সঙ্গে প্রাণের বন্ধন গড়ে উঠেছিল বেশি, বিচ্ছেদের আগে তাদের সঙ্গে আনন্দ জমে ওঠে নানা অনুষ্ঠানে। নাচ-গান, অভিনয়,

প্রদর্শনী, সাহিত্য-সভা। শুধু কি স্ফূর্তি।—দুঃস্থদের সাহায্যের কথাটাও সে সঙ্গে থাকে। বিশেষ অনুষ্ঠান—'আনন্দ-মেলা' এ সময়েই হয়।

এ পর্বের শুরু এবার ভাদ্রের ঝুলন-পূর্ণিমাতে। উত্তরায়ণের প্রাঙ্গণে গুজরাটী গরবা-নৃত্যের অনুষ্ঠান হয়েছিল। প্রথম দিন বৃষ্টি এসে সব-কিছু পণ্ড হয়ে গেল। দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় আবার সে-আসর জমে। চাঁদের আলোতে নাচ, কাঠি-নৃত্যের তালে তালে নূপুরের রুনুঝুনু। প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়ে উঠেছিল। যত নাচ এবং যন্ত্র-সংগীত সেদিন হল, সবই গুজরাটী গ্রাম্য-সংগীতের সহযোগে। মেয়েদের পোশাকও ছিল গুজরাটী ধরনের। জীবন-ধারণের প্রয়োজনে মানুষ কলসী ভরে জল আনে, কিন্তু তার মধ্যে যে নারীর রমণীয় গতি-ভঙ্গি এবং প্রাণের আবেগ আপনা থেকে ছন্দিত হয়ে ওঠে, সে ধরা পড়ে শিল্পীর চোখে; প্রকাশ পায় তা চিত্রে, নৃত্যে, গানে। সেদিন মেয়েদের কলসী-মাথায় জল আনতে যাবার নাচটি দেখে এ জিনিসই বিশেষ অনুভূত হচ্ছিল।

ছুটির আগে এবার তিন-চারটি ছোট-বড় অভিনয় হয়েছে। সংগীত-ভবনের মেয়েরা করেন 'বশীকরণ' এবং কলাভবনের ছাত্রছাত্রী অধ্যাপকগণ সবাই মিলে করেন 'অরূপরতন'। একদিন শুধু প্রথম-বর্গের ছাত্রছাত্রীগণ একটি জলসার আয়োজন করেন। নিজেরাই সব-কিছু করেছিলেন, বড়দের সাহায্য খুব সামান্যই ছিল। নাচ গান, বাংলা ও ইংরেজি নাটক। ছোটোর মধ্যে তাদের প্রচেষ্টা সফল হয়েছিল। বিশেষ উল্লেখযোগ্য তাদের ইংরাজি নাটক 'জোয়ান অব আর্ক'। একটি মাত্র দৃশ্য তারা অভিনয় করেছেন—জোয়ান রাজার কাছে এসে সৈন্য প্রার্থনা করছেন, নিজে তাদের দলপতি হয়ে যাবেন যুদ্ধে, একশ বছরের পরাধীনতা থেকে ফ্রান্সকে উদ্ধার করবেন। অভিনয় নিপুণ হয়েছিল প্রায় প্রত্যেকেরই, বিশেষ ক'রে জোয়ানের। এই নাটকের পিছনে সাহায্য জুগিয়েছিলেন স্বর্গীয় কান্তি ঘোষের স্ত্রী শ্রীমতী এটা ঘোষ। মধ্যযুগের ইউরোপীয় পোশাক-পরিচ্ছদ এবং জোয়ানের সেই ভগবদ্ বিশ্বাসের দীপ্তি এবং দৃঢ়তা খুব স্বাভাবিকভাবে দেখানো হয়েছিল।

এর কিছুদিন পরে আরেকটি ইংরেজি নাটকের অভিনয় করেন কলেজের ছেলেমেয়ে, অধ্যাপক এবং প্রাক্তন ছাত্রগণ মিলে। 'ওথেলো' নাটকের একটি দৃশ্য—ডেসডিমোনার মৃত্যু। সে নাটকটিও চরিত্র-চিত্রণে সুন্দর হয়েছিল। সমস্ত নাটকের মূল ভাবটি ফুটেছিল একটি দৃশ্যে।

একদিন জমলো 'বিচিত্র-সাজে'র আসর। সবচেয়ে উৎসাহ ছিল বাচ্চাদের দলের। তারা যে-যা-খুসী সেজে এসে হাজির—বর্মী মেয়ে, মণিপুরী, পাগলী,

সাওতালী, বাঁদরওয়ালা ও তার বাঁদর, মুসলমানের গাজির গান, ফুলওয়ালী, পাড়াগেঁয়ে বউ, চাষী, পুতুল-নাচ, আবুহাসানের সঙ্গে 'হুজাদে'র প্রথম দেখা—হরেক রকম। এরই মধ্যে এসে দাঁড়াল "S. R. Tooth-Paste,"—তার এপিঠে-ওপিঠে কতমতো দাঁতের মাজনের বিজ্ঞাপন। তাকে ঠেলে ঠেলে চালাতে হয়, তাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাতে হয়। সবার হাততালি আর হাসির ঠেলায় শেষটা সে চলন্ত হয়েই দৌড়ে পালালো। বলা হল—"নারায়ণ চক্রবর্তী" ওরফে "তাতাবাবু" আসছেন। তিনি কলেজের ছেলে, হাতে বই, বুকের বোতাম খোলা, হাতে চাবী ঘোরাচ্ছেন আর আকাশের দিকে মাটির দিকে তাকিয়ে কী ভাবছেন, কী দেখছেন। কেউ ধরতেই পারল না এ সত্যিকার বাঙালী "তাতা" নয়,—এ অবাঙালী,—কলেজেরই আরেকটি ছেলে নাম মহেশপ্রসাদ। সংগীত-ভবনের ছেলেমেয়েরা এল, বাক্স-পেঁটরা, বাচ্চা-কাচ্চা কুলীমজুর নিয়ে। কী? না,—"ট্রেনের যাত্রী।" ট্রেন আসবার আগে এবং ট্রেন ছাড়বার মুহূর্তের দৃশ্য। নাকে নথ, ঝকমকে শাড়ি-পরা ম্যাথরানী ঝাঁট দিচ্ছে, যাত্রী-গিন্নীরা বকছেন ধুলো ওড়াচ্ছে ব'লে। ফেরিওয়ালা চা আর চানাচুর বিক্রী করছে, কাগজওয়ালা কাগজ হাঁকছে, চেঁচামেচি ঠেলাঠেলি সে কী ভীড়। বোলপুর-স্টেশন থেকে কুলীদের ইউনিফরম অবধি জোগাড় করা হয়েছিল। আর স্টেশনের কুলীরাও এসেছিল মজা দেখতে—বাবুদের কী ব্যাপার! আনন্দের ভাগ পেয়ে গেছে তারাও। পুতুল-নাচ, বাঁদর-নাচ, আবুহাসান, হুজাদ, নারায়ণ চক্রবর্তী, টুথপেস্টের কৌটা, স্টেশনের দৃশ্য প্রভৃতি দু'বার ক'রে দেখাতে বলা হল। তখন হুজাদের আবুহাসান পালিয়েছে, পুতুল-নাচের লোক উধাও, পুতুলটাই শুধু নেচে গেল। 'টুথপেস্টে'র বাক্স খুঁজে পাওয়া গেল না, কিন্তু নকল "নারায়ণ চক্রবর্তী" ঠিক এসে হাজির আর আসল নারায়ণ চক্রবর্তী দর্শকের মধ্যে দাঁড়িয়ে হেসে খুন।

ছুটির আগের শেষ অনুষ্ঠান আনন্দ-মেলা। ২৯শে সেপ্টেম্বর, বিকেল থেকে রাত ন'টা অবধি এই মেলা বসলো গৌর-প্রাঙ্গণে। শুধু আশ্রমের এবং শ্রীনিকেতনের ছাত্রছাত্রীগণই এ মেলার বিক্রেতা। তারা দলে দলে এক-একটি জিনিসের দোকান দিয়ে বসে। কেউ বা বেচে পান, সরবৎ, পুতুল, ফুলের গয়না, কেউ বা দেয় খাবার দোকান, কেউ বা নিয়ে বসে ছবি, মডেল, কাঠের কাজ, আসন, বাক্স,—যে-যা পারে। শুধু ঘণ্টা-তিনচারের জন্য এ মেলা, কিন্তু সবচেয়ে বেশি জমে এ অনুষ্ঠানটাই। এর লাভের সব টাকা দেওয়া হয় গ্রামের কাজে, গরীবদের সাহায্যে, বন্যাপীড়িত কিংবা রোগীদের। এবার শান্তিনিকেতন বিনয়-ভবনে এবং বোলপুর

ছেলেদের বিদ্যালয়ে নানা জায়গা থেকে চার পাঁচ শ' জুনিয়র এবং সিনিয়র শিক্ষার্থী জাতীয়-সৈন্যদল এসেছিল, আশ্রমের কলেজ কলাভবন, সংগীতভবন প্রভৃতি বিভাগের ছাত্রগণ এবং অধ্যাপকগণও যোগ দিয়েছেন এতে। সেই শিক্ষার্থিগণও এবার আনন্দ-মেলায় যোগ দিয়েছিলেন।

গৌর-প্রাঙ্গণে সকাল থেকে সানাই বাজতে থাকল, ভদ্রজন এবং জনসাধারণ এমন কি সাঁওতালরা অবধি এ মেলায় ঘুরে গেল। রাত ন'টা বাজতে না বাজতে ঘণ্টা পড়ে, মেলা ভাঙে, উৎসব-আনন্দ ফুরিয়ে যায়, তারপরে বাইরে-ছোটার পালা। ৪ঠা অক্টোবর থেকে ৪ঠা নভেম্বর অবধি এবার আশ্রমের বিদ্যালয়ের ছুটি। এখন দিনরাত কেবল বাস্ ও রিক্সা বোঝাই হয়ে সবাই চলেছে স্টেশনে ; গান গাইছে—

আমাদের শান্তিনিকেতন
আমাদের সব হতে আপন—

আশ্রম ছেড়ে যেতেও তাদের এ গান, আশ্রমে ফিরতেও এ গান, পাখির কলধ্বনির মতো এ গান কণ্ঠে-কণ্ঠে প্রতি বছরেই ধ্বনিত হয়ে ওঠে।

এবারকার মেলা কেমন জমেছিল, তার আরো সজীব চিত্র পাওয়া যাবে, এমন দুটি মজার লেখা এখানে তুলে দিচ্ছি আশ্রমের ছোটদের খাতা থেকে। একটি তার বর্ণনা, অন্যটি গল্প। প্রথমটি দিদির (খুকু) লেখা, দ্বিতীয়টি তারি ছোটবোনের (টুকু)। একটি দিনের একটুক্ষণের মেলামেশা, সে যে কত খুশি কতই নেশায় ভরা,—বাইরের সকলে তা এদের এই খাতার পাতার—বাঁশীর সুরগুলি থেকে বুঝতে পারবেন।

আনন্দবাজার

কাল "আনন্দ-বাজার"—সবারই খুব আনন্দ। আগে থেকেই ঠিক করছে কে কী কিনবে। ছোটবোন বলল, দিদি আমি একটা মটর কিনব। আমি হেসে বললাম, এই মেলাতে মটর পাওয়া যায় না। দাদারা একটা মনিহারি-দোকান দিচ্ছে। সকাল থেকে তারা বোলপুর দৌড়চ্ছে, এতে তাদের কষ্ট নেই। কাল আনন্দ-মেলা, কথাটা শুনেই কষ্ট দূর হয়ে যায়। দাদা আগে থেকেই দুধ-ওয়ালাকে বলে রেখেছে পদ্ম-ফুলের কথা। সকালে বাজনার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। তাড়াতাড়ি উঠে হাত-মুখ ধুয়ে ওখানে গেলাম। দেখি, সবাই খুঁটি পুঁতছে। আজ তাদের মনে কী উৎসাহ। সবার মুখে হাসি। আর, ভাবছে—আমার দোকানে

বেশি বিক্রী হবে। বাড়ি থেকে তারা কাপড় নিয়ে এসেছে। সবাই নিজের দোকান সাজাতে ব্যস্ত। মেলা বসে লাইব্রেরীর সামনে। এই মেলাতেই একরকম প্রত্যেকের সঙ্গে শেষ-দেখা। কলেজের ছেলেরা একটা স্টল করছে প্রাক-কুটিরের সামনে। আরেকটা করছে স্কুলের ছেলেমেয়েরা। শাল-বীথির ধার দিয়ে লাইন করে দোকান বসে গেছে। সকালবেলা দাদারা কিছু খেয়ে পদ্মফুল আনতে গেল। সে কত দূরে। তবুও তাদের যাওয়া চাই। ঘণ্টাতলার কাছে কতগুলো দোকান বসছে, স্টলগুলো খুব সুন্দর করে সাজিয়েছে। মণ্টুদারা অনেক বাঁশ এনেছে। ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের আজ কী আনন্দ। বিকেল তিনটেয় মেলা আরম্ভ। যে-যার জিনিস দোকানে নিয়ে এল। আমিও গেলাম। দেখি সবাই তাদের দোকান সাজিয়েছে। কী সুন্দর লাগছে। কত রং-বেরংয়ের শাড়ি দিয়ে ফুলের মালা দিয়ে সাজিয়েছে; দেখলে চোখ ঝলসে যায়। সবার দোকানের একটা করে নাম,—"পল্লীশ্রী", "খাই-খাই", "খেলা-ঘর"—অনেক কিছু। সবাই চীৎকার করছে,—এই যে এদিকে আসুন। ছোট ছোট মেয়েরা ফুলের তোড়া ও মালা হাতে করে বিক্রী করছে। এবার এন্-সি-সিরা এখানে এসে মেলাটা খুব জমিয়ে তুলেছিল। সবার দোকানে খুব বিক্রী হচ্ছে। লাইব্রেরীর সামনে বড়রা একটা দোকান করেছে। অনেকে আবার ঘুরে ঘুরে পান বিক্রী করছে। স্টলগুলোতে খুব লোক খাচ্ছে। রাত্রিতে আবার নাটক হয়। রাত আটটা পর্যন্ত মেলা থাকে। তারপর সব দোকান উঠে যায়। মেলা শেষ হয়ে যায়।

পান-বিক্রী

কাল আনন্দ-বাজার হল। তাতে দাদারা দোকান দিয়েছিল। পুতুল, ঘোড়া, সাপ, ব্যাঙ, গাধা ইত্যাদি অনেক খেলনার জিনিস এনেছিল। তাই তার নাম দিল 'খেলা-ঘর'। মেলার দিন আমি খুব সকালে উঠে একটা খুব বড় মালা গাঁথলাম। তারপর সূর্য-ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই 'আনন্দ-মেলা'য় গেলাম। সেখানে গিয়ে দেখি কত লোকে খুঁটি পুঁতছে। আবার কেউ কেউ কাপড় টাঙাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর একদল লোক হারমনিয়াম সানাই এনে প্যাঁ প্যাঁ করে বাজাতে লাগল। সবার দোকান সাজানো হয়ে গেলে সবাই খেতে গেল। খাওয়া হয়ে গেলে সবাই একটু বিশ্রাম করল। তারপরে দোকানের যা-যা জিনিসপত্র লাগবে সে-সব একটা ঝুড়িতে করে নিয়ে দোকান সাজালো। তারপর ঘণ্টা পড়তে

লাগল আর দলে দলে লোক মেলা দেখতে এল। আনন্দ-মেলা দেখতে অনেক এন. সি. সি. এসেছিল। তারা এসে মেলাটাকে জমিয়ে তুলেছিল। তারা এসেই স্টলে খেতে বসে গেল। কিছুক্ষণ পর বোলপুরের এন. সি. সি.-দের যাবার সময় হল। অমনি হুইস্‌ল বাজল। ওরা খাবার ফেলে পয়সাটা দিয়ে দৌড়ে গিয়ে লাইন করে দাঁড়াল। তারপর আরেকটা হুইস্‌ল পড়ার সঙ্গে-সঙ্গেই ওরা মার্চ ক'রে যেতে লাগল। কিন্তু আমাদের এখানকার বিনয়-ভবনের এন. সি. সি.-দের কী মজা! তারা রাত আটটা পর্যন্ত সব দেখতে পাবে।

দাদা এবার পদ্মফুলের জন্য ব্যস্ত। সে এ'কে বলে ওকে বলে যে, তোমাদের পাড়াগাঁয়ে কি পদ্মফুল পাওয়া যায়? সবাই বলে, না। কিন্তু একজনে বলে, আমাদের গাঁয়ে আছে, কিন্তু আনতে দেরী হবে। তখন দাদা বলে, আচ্ছা তাহলে থাক। আমি অন্য-কারু কাছ থেকে পদ্মফুল জোগাড় করব। শেষকালে দেখে যে, কেউ তার কথায় মত দিচ্ছে না। তখন সে আমাদের দুধওয়ালী গৌরীকে বলল, তোমাদের গাঁয়ে কি পদ্মফুল পাওয়া যায়? গৌরী বলল, হ্যাঁ। দাদা বলল, তুমি মেলার আগে কি দিতে পারবে? গৌরী বলল, হ্যাঁ। তা বেশ কথা, ঠিক এই সময়ই এনে দেব। দাদা আনন্দ-মেলার দিন একেবার রোদের মধ্যে দৌড়তে দৌড়তে এসে বলে, মা, গৌরী কি পদ্মফুল এনেছে? মা বলে, না। এমনি করতে করতে দাদা যে কতবার বাড়ীতে এল পদ্মফুলের জন্য তা ঠিক-ঠিকানা নাই। এবার খুব চিন্‌চিনে রোদ উঠে গেছে। তাই দাদা আর পদ্মফুলের জন্য বারে-বারে বাড়ীতে আসতে পারল না, ওখানেই রইল। একটু পর গৌরী পদ্মফুল নিয়ে এল আর সবার তখন কী আনন্দ। আমি ছুটে গিয়ে দাদাকে খবর দিলাম। দাদা ছুটতে ছুটতে এসে দেখে সত্যিসত্যিই ফুল এনেছে। দাদা সে ফুলের তোড়া বেঁধে দোকানে সাজিয়ে রাখল। অনেকেই দোকান দিয়েছিল। সেই দোকানগুলোর এক-একটার নাম 'মঞ্জুষা', 'খাই-খাই', 'খেলাঘর', 'শিশুসত্র', 'শিশুহাসি', 'শিশুখুসি', 'মজলিশখানা', 'পল্লীশ্রী' ইত্যাদি। আরো-অনেক নাম ছিল। মেলাতে অনেক পানওয়ালা এসেছিল। রাত্রে মেলাটা বেশ জমে উঠেছিল। রাত্রে বিনয়-ভবনের একজন এন. সি. সি. এসে আমাদের সঙ্গে গল্প করতে লাগলেন। আমরা তখন তাঁকে একটা বিনাপয়সায় পান দিয়ে দিলাম। ১৩।১০।১৯৫১

অক্টোবর মাস—পূজার মাস। শান্তিনিকেতনে পূজা হয় না। কিন্তু পূজার আনন্দ এখানে কম নয়। আশ্বিন মাসের পয়লা থেকে 'প্রথম ফুলের প্রসাদ'-পাবার

গান গেয়ে শরতের হিরণ-কিরণে ছাত্র-ছাত্রীদল ঘুরে বেড়ায়। তারপরে পূজার ছুটির দু'তিন দিন আগেও তাদের আনন্দোৎসব ফুরায় না। এবারও ব্যতিক্রম হয়নি। ১১ই অক্টোবর ছুটি হয়েছে; তার আগে নৃত্যগীতের জলসা, 'মুক্তধারা'-নাটক, আনন্দ-মেলা এবং এরই সঙ্গে পাঠভবনের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্গের ত্রৈমাসিক পরীক্ষা, অন্যান্য ক্লাসের পরীক্ষা ও ম্যাট্রিক ও আই-এর কম্পার্টমেণ্টাল পরীক্ষা হল। এর থেকে এই একটা জিনিস বোঝা যাচ্ছিল যে, পড়াশুনা এবং উৎসব-আনন্দ একসঙ্গে চলতে পারে যদি যথাসময়ে যথা-কাজে মন দেওয়া যায়। গালগল্প ক'রে যত সময় নষ্ট করা হয়, তার অর্ধেকও খেলাতে বা উৎসবে ব্যয় হয় না। সময়ের ঠিক ব্যবহার করা হয় না বলেই আমাদের দেশে দু' জিনিস একত্র চলতে দিতে আপত্তি ওঠে। কিন্তু এখানে ছাত্রগণ জীবনকে সমভাবে কাজে ও খেলাধুলা-উৎসবে লাগিয়ে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করে।

ছুটি হতেই ছাত্রছাত্রী ও কর্মীদল যাঁরা বাইরে-যাবার বেরিয়ে পড়লেন। যাঁরা গেলেন না, তাঁরাও পূজার আনন্দ এবং ছুটি দুই-ই এখানে থেকে উপভোগ করলেন। আশ্রমে পূজা না হলেও আশ্রমের মাইল-দুয়েকের মধ্যে ভুবনডাঙা বোলপুর সুরুল প্রভৃতি জায়গায় প্রায় কুড়িখানা দুর্গাপূজা জাঁকজমক ক'রে সম্পন্ন হয়। ভুবনডাঙা ও বোলপুরের পথে পূজার তিনচার-দিন লোকের ভিড়ের অন্ত ছিল না।

বিজয়া-দশমীতে কয়েক বছর রীতিমতোই আশ্রমে বিজয়া-সম্মিলনীর অনুষ্ঠান হয়েছে। এখন হয় না। আশ্রমিকগণ পরস্পরের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ ক'রে প্রীতি-নমস্কার বিনিময়ে বিজয়া উদ্‌যাপন করেন।

বিজয়ার পরের দিন থেকে বিশ্বভারতী-গ্রন্থাগার সকালবেলা খোলা থাকছে। তবে বাড়িতে বই নিতে দেওয়া হয় না। ওখানে বসেই সবাই পড়াশুনা করে। ৩০শে অক্টোবর থেকে জেনারেল-অফিস ও অন্যান্য অফিস সবই খুলে যাবে। ১২ই নভেম্বর খুলবে শিক্ষা-বিভাগগুলি। বাইরের হৈ-হল্লা থেকে নিরিবিলি আশ্রমে ছুটি উপভোগ করতে অনেকেই এখানে থাকেন, বাইরের থেকেও অনেকে এখানে এসে কয়েকদিন বাস করে যান। এ সময় এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য অত্যন্ত মনোরম। আশে-পাশের মাঠগুলি হরিৎ-ধানে ভরা থাকে। শালবীথিতে আম্রকুঞ্জে জ্যোৎস্না রাতে নীরব মাধুরীর বন্যা বয়ে যায়। ৩১।১০।১৯৫৩

*　　*　　*

গত ৩রা অক্টোবর থেকে বিশ্বভারতীর পূজাবকাশ শুরু হয়েছে। আগামী ১৭ই অক্টোবর অবধি এই উপলক্ষে এখানকার সমস্ত কর্মবিভাগ বন্ধ থাকবে; পনেরো দিনের

ছুটির পরে ১৮ই অক্টোবর অফিস-সমূহ খুলবে; স্কুল-কলেজ বিভাগগুলির পড়াশুনার কাজ শুরু হবে ১লা নভেম্বরে। পূর্ব-পূর্ব বছরে লক্ষ্মীপূজার পরেই লাইব্রেরী খোলা হত। এবার থেকে সমস্ত বিভাগের সঙ্গে তারও কাজ চলবে পনেরো দিনের সম্পূর্ণ ছুটির পরেই।

পূজার ছুটি।—পূজা নেই আশ্রমে; কিন্তু জমে উঠেছে প্রাকৃতিক সমারোহ। এতদিনে কাঁচা সোনার রঙ লেগেছে শরৎশেষের ভোরের রোদে; অস্তরাগের রঙ্-বেরঙের খেলা চলছে বেলাশেষের মেঘে-মেঘে; সন্ধ্যার বুকে লাগছে হৈমন্তিক কুয়াশার ছোঁওয়া। রাতের আলো আঁধারি শিউলি ছাতিম প্রভৃতি নানা ফুলের ঘন গন্ধে আমোদিত। দু-একজন লোক চলে পথে, দূরে দূরে ইলেক্‌ট্রিক আলো। নির্জন নিস্তব্ধ চারদিক; হঠাৎ কোথায় ডেকে উঠল একটা ঘুমন্ত পাখি, অমনি ভয়-খাওয়া পাখির দল কলকল রব তুললে; চমকে প্রকৃতি যেন সজাগ হয়ে ওঠে; শাল তাল বকুল ছাতিম আম জাম মর্মর-শব্দে অস্তিত্ব জানায়। পরক্ষণেই সব নিঝুম নিরব। ঝিঁঝির ঝিঁঝিঁট বাজতে থাকে নিশীথিনীর অদৃশ্য বীণায়। এক সময়ে সুর ধরে কোন্ দূরের গাঁয়ে সাঁওতালের বাঁশি, নাগ্‌রা আর মাদলের তালে ঝাঁঝর বাজে ঝম্ ঝম্। ১৬।১০।১৯৫৪

পরিভ্রমণ

বিশ্বভারতী-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিভাগগুলিতে ছুটি শেষ হল, ২ই নভেম্বর থেকে শুরু হল ক্লাস। ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক ও অধ্যাপকগণ দলে দলে ফিরে আসছেন। সবার চোখে-মুখে পরিপূর্ণ আনন্দ ও কৌতূহল—এই যে তাদের চির-পরিচিত আশ্রম, লাল কাঁকরের নেপাল-রোড, শাল তাল শিমূল পলাশ গাছগুলি! গুরুদেবের দেওয়া নাম 'বকায়ন'—ফুলগাছের সারি আকাশ ছুঁয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। সাদা সাদা ফুলের স্তবকে-স্তবকে অপূর্ব বেশে এখন সেজে দাঁড়িয়েছে যেন অভ্যর্থনা করতে। তাদের দিকে তাকিয়ে সবার চোখ স্নিগ্ধ, গন্ধে মন পরিতৃপ্ত। পথ চলতে চলতে কেবল শোনা যাচ্ছে—নমস্কার! ভালো তো? কবে এলেন? কোথায় গিয়েছিলেন? কী রকম কাটল ছুটি? কেউ বা দাঁড়িয়ে ছুটির গল্প বলে চলেছেন, কেউ বলছেন, —ঘণ্টা পড়ে গেল, ক্লাস আছে। আসুন বিকেলে চায়ে, গল্প করা যাবে। নয় তো বেরিয়ে পড়া যাবে রেল-লাইনের ধারে বেড়াতে।

* * *

এবার আশ্বিন মাসে এ অঞ্চলে বৃষ্টি হয় নি। শীতও নামে নি। ছুটি ফুরোবার মুখে সে কী হঠাৎ সুদীর্ঘ লয়ে ঢিমে তালে বৃষ্টি নেমে বসল। সবাই হেসে বললে—আশ্রমের বর্ষাই ফুরোয় নি, শরৎ হেমন্ত বাদে শীত এসে যাবে। কেউ বলছে—এ বৃষ্টির জন্যেই শীতটা বাকি ছিল, এবার উত্তুরে হাওয়া বইতে শুরু করবে। আশ্রম কিন্তু এখন বৃষ্টির জলে ধুয়ে ঝকঝকে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। চারপাশের মাঠে পাকা ধানের সোনার রঙ তার আরো শোভা বাড়িয়ে দিলে। একটা হাসিখুসী উৎসবের ভাব লেগে গেছে আশ্রমের কাজের শুরুতেই। পূজার ছুটিতে একদল ছাত্র জাতীয়-সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে বর্ধমান-দুর্গাপুরে গিয়েছিল। অন্যান্য জায়গা থেকেও ছাত্রদল এসেছিল। মোট সাত শ' ছাত্র মিলে বার শ' ফিট লম্বা, আশি ফুট চওড়া এবং তিন ফুট গভীর এক খাল কেটেছে। কাজটা ছিল ময়ূরাক্ষী-পরিকল্পনার অন্তর্গত। আশ্রমের ছাত্রদল ফিরে এসে সেখানকার গল্প জমিয়ে তুলেছে।

* * * *

শান্তিনিকেতনে এখন চলছে—সাতই পৌষের ছুটি—বড়দিনের ছুটি; একুশে ডিসেম্বর থেকে শুরু ক'রে একেবারে পয়লা জানুয়ারী পর্যন্ত। এর পরে গিয়ে ক্লাস শুরু হয়। উৎসবের ধুমের সঙ্গে-সঙ্গেই দেশভ্রমণে বেরুবার সাড়া পড়ে। দশই পৌষের উৎসবও শেষ হয়, প্রত্যেক ভবন বেরিয়ে যায় দেশভ্রমণে—রাঁচী, রাজগীর, নালন্দা, কাশী, পুরী, ভুবনেশ্বর, কনারক, মুর্শিদাবাদ, লক্ষ্ণৌ, ভীমবাঁধ—যেখানে আছে শিল্পসংগীতের ঐতিহ্য, আছে ঐতিহাসিক স্মৃতি, আছে নানারকম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য-সম্ভার। ছাত্রছাত্রীদল কত ছবি এঁকে আনে, আশ্রমে ফিরে এসে ম্যাজিক-লণ্ঠনের সাহায্যে সবাইকে তা দেখানো হয়; লিখে আনে নানা বিষয়, সেগুলি তারা পড়ে তাদের সাহিত্য-সভায়। এখানকার শিক্ষার সঙ্গে এই দেশভ্রমণের শিক্ষাও অপরিহার্য। পৌষের ছুটিতে বাইরে-যাওয়া বড়ো রকমের দেশভ্রমণ। এ ছাড়া ক্লাসের দিনেও এক-এক গ্রুপকে কাছাকাছি নানা জিনিস দেখাবার জন্য প্রায়ই এখানে-সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়। সেটা হল "বেড়াতে নিয়ে যাওয়া।" মেঘলা দিনে শীত-ঋতুতে, কুয়াশার দিনে অর্থাৎ যেদিনগুলিতে পড়ায় মন লাগে না, সে-দিনগুলিতে এখানকার ছেলেমেয়েরা কাছাকাছি মাঠ-ঘাট-গ্রাম-নদী প্রভৃতি ঘুরে দেখতে অভ্যস্ত।

* * * *

মাসাঞ্জোরে ময়ূরাক্ষী-নদীর বাঁধ দেখবার জন্যে এখানকার ছেলেমেয়েদের ভারী ঔৎসুক্য ছিল। তারা যে রোজই দেখছে শান্তিনিকেতনের শুষ্ক বন্ধুর

খোয়াইয়ের বুক চিরে বিরাট খাল কাটা হচ্ছে—জলে নাকি সে-খাল ভরে যাবে; কৃষককুলের কৃষির-জলের ধারাবেগ থেকে বিজলী-বাতি জ্বলতে পারবে বীরভূমের গ্রামে-গ্রামেও। এই জলের ধারা কোত্থেকে আসছে, কেমন ক'রে সে ধারা বিহার ও বীরভূমের মধ্যে চালানো হবে—এ সবই তো জানা চাই। দু-তিন দলে ছেলেমেয়েরা গিয়ে ময়ূরাক্ষী দেখে এল। কিছুদিন আগেই প্রথম এবং দ্বিতীয় বর্গের ছাত্রছাত্রীদল বেরুল, সঙ্গে ভূগোলের অধ্যাপক এবং সস্ত্রীক পাঠভবনের অধ্যক্ষ। তাঁরা ট্রাকে করে রওনা দিলেন—কাটা-খালের পাড়ে-পাড়ে সব-কিছু দেখতে দেখতে যাবে। পথে কাঁচা মাটিতে ট্রাক গেল আটকে। ছেলেমেয়েরা নেবে ঠেলেঠুলে তাকে তুললে। ফিরবার পথে ট্রাক একেবারেই বিগড়াল। অনেক চেষ্টা হল, তাকে ঠিক করা গেল না। অগত্যা মাইল-দশবারো রাস্তা সকলে হেঁটেই পেরিয়ে এল। অন্ধকার, হিমের রাত। পথে হাঁটু-অবধি কাদা। রাত হবে দুটো—দলের সবাই এসে আশ্রমে হাজির হল, চেনা যায় না—এমনি তাদের চেহারা। তবু কী ফুর্তি—তারা তো দেখেছে। বীরভূম আর বিহারের প্রায় সীমা-ঘেঁসে যে দুমকা পাহাড়, তারই "হৃদয়-গলা জলের ধারা" নেবে গেছে ময়ূরাক্ষী নদীর স্রোতে। নদীতে বাঁধ দেবার যেখানে সবচেয়ে বেশী সুবিধা, সেখানে বিরাট এক বাঁধ দিয়ে জল আটকানো হচ্ছে; বদ্ধ বিপুল জলরাশি তৈরি করে তুলেছে এক কৃত্রিম হ্রদ, সেই থেকে ইচ্ছেমতো জলের ধারা ছাড়া হবে। হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিসিটি তৈরি হচ্ছে; বিজলীর আলো পাওয়া যাবে, এই হ্রদ থেকে জল গিয়ে জমা হবে আরেকটি বাঁধে—শিউড়ি থেকে মাইল-পাঁচ-সাতেক দূরে তিলপাড়া;—সেখানে আরেকটি কৃত্রিম বাঁধ আছে। দুদিকে দুটি খাল কাটা হচ্ছে—একটি খাল শিউড়ি-শান্তিনিকেতন হয়ে বীরভূম-বর্ধমানের সীমানায় অজয়ে গিয়ে মিশবে; আরেকটি খাল চলে গেছে বিহারের দিকে। অফুরন্ত জলের উপর ব্যারেজটি দেখবার মতো। দূর থেকে ঠিক যেন হাওড়া-ব্রিজ। সদ্যতৈরি, চক্‌চক্ করছে—রোদের আলো যেন জমাট-বাঁধা। ব্যারেজে ঢুকতেই পাশে ফুলবাগান, রুচির পরিচায়ক।

* * * *

সারা পৌষ মাসটাই বেড়াবার আনন্দে ভরা। বাইরের দেশভ্রমণ শেষ ক'রে ফিরে আসতে না আসতেই এসে পড়ে পৌষসংক্রান্তি,—কেন্দুলিতে জয়দেবের মেলা। শান্তিনিকেতন থেকে মাত্র আটাশ মাইলের তফাত কেন্দুলি, দলে দলে ছাত্রছাত্রী, শিক্ষককর্মিগণ প্রত্যেক-বছর জয়দেবের-মেলায় যান। কোনো দল যায় ট্রাকে, কোনো দল যায় হেঁটে। শালবনের মধ্য দিয়ে সংক্ষিপ্ত পথ আছে,—আটাশ মাইলের

পথ সংক্ষেপে হয় বারো চোদ্দ মাইল। বিদেশী ছাত্রছাত্রীরা এ-সব ভ্রমণে অত্যন্ত উৎসাহী। প্রত্যেকটি জিনিস তারা অতীব আগ্রহে দেখে, ক্যামেরা নিয়ে ছবি তোলে; তাদের চোখমুখ দেখলে বোঝা যায়—কী তাদের অনুসন্ধিৎসা। কেন্দুলি থেকে ফিরবার পথে সবাই দেখে আসে ইলামবাজারের এক জমিদার বাড়া—সেখানে আছে সিংহবাহিনীর মন্দির, শিবের মন্দির। প্রায় দেড়শ বছর আগের তৈরি, ইটের খোদাই কাজ (টেরাকোটা)-এর অপূর্ব নিদর্শন।

* * *

এমনিভাবে শান্তিনিকেতনের ছেলেমেয়েরা দলে দলে দেখে থাকে চণ্ডীদাসের নান্নুর এবং সতীর কঙ্কাল পড়েছিল যেখানে সেই কঙ্কালীতলা প্রভৃতি আশেপাশের দ্রষ্টব্য জিনিসও। বছর দু'তিন আগে "বিনয়-ভবনে"র ছেলেমেয়েরা এই পৌষের দেশভ্রমণটা হেঁটে-হেঁটে শুধু বীরভূম দেখতেই কাটিয়ে দিলে। ছাত্রছাত্রীরা দূরেরটা দেখে, দেখে ঘরেরটাও। বছর চার-পাঁচ আগে তারাশঙ্করের "হাঁসুলিবাঁকের উপকথা" প'ড়ে একদল কলেজের ছেলে বেরিয়ে পড়ল—কোপাইর তীর ধ'রে হাঁসুলিবাঁকের রূপ দেখতে—এই তো দু'চার মাইলের মধ্যেই কোপাই। সারাদিন ঘুরে দেখে এল তারা কোপাইয়ের রূপ, তার তীরের গ্রামগুলি।

এবারও যথারীতি সব বেরিয়ে গেছে, কেবল যায় নি সংগীতভবন। গভর্নমেণ্ট-হাউসে "চিত্রাঙ্গদা" নাটকের অভিনয় হবে। তারই রিহার্স্যাল চলছে পুরোদমে। আর জাতীয়-সৈন্যবাহিনী দলের ছেলেরা পয়লা জানুয়ারী থেকে দিন-পনেরোর জন্যে ক্যাম্পে যাচ্ছে রাঁচীর কাছে। আশ্রমের অফিস, লাইব্রেরী প্রভৃতি খোলা আছে; কাজকর্ম চলছে মন্থরগতিতে। আশ্রমের ঘণ্টাই বাজছে না, এখন আশ্রমের ছেলেমেয়ের কলকোলাহল জমে উঠছে না, শুধু জনবিরল রাস্তায় রাস্তায় দু'চারটি আগন্তুক শান্তিনিকেতন দেখতে এসে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, এই দেখা যায়। ৫।১।১৯৫৩

সাঙ্গ হল দেশভ্রমণের পালা; শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদলের বার্ষিক পরীক্ষার ফল—তাও বেরুলো; ৬ই জানুয়ারী থেকে ঢং ঢং ঢং ঢং ঘণ্টাধ্বনি জানিয়ে দিতে লাগল—আশ্রমে পূর্ণভাবে কাজের পালা আবার শুরু হল। নূতন ক্লাসে নূতন উৎসাহে ছুটে চলছে ছেলেমেয়েরা, লাইব্রেরীতে ভিড় জমছে, সন্ধ্যায় সভা-সমিতি শুরু হচ্ছে। ১৬।১।১৯৫৩

৪ঠা জানুয়ারী—সকল ভবনের দেশ-ভ্রমণরত ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপকগণ আশ্রমে ফিরে এসেছেন। আবার আশ্রম ভরে উঠেছে। শিক্ষাভবন গিয়েছিল কোডারমা। সেখান থেকে দলের সকলে গিয়ে তিলাইয়া-বাঁধ, রাজগির, নালন্দা প্রভৃতি জায়গা

দেখে এসেছেন। কোডারমার মাইকার খনিতে তাঁরা নেমেছিলেন। শিক্ষাভবনের প্রাক্তন অধ্যক্ষ এবং বর্তমানে ভারতের কেন্দ্রীয় উপমন্ত্রী শ্রীযুক্ত অনিলকুমার চন্দ তাঁর স্ত্রী রানী চন্দকে নিয়ে একদিনের জন্য শিক্ষাভবনের ভ্রমণে যোগ দেন। 'অনিলদা' ও 'রানীদি'কে পেয়ে ছাত্রছাত্রীদল খুব খুসী হয়েছিল। পাঠভবনের একদল গিয়েছিল বোখারো, অন্য দল মহারাজপুর। কলাভবন ও বিদ্যাভবন গিয়েছিল রাজগির। সেখান থেকে তাঁরাও নালন্দা প্রভৃতি জায়গায় গিয়েছিলেন। ১৬।১।১৯৫৪

বার্ষিক পাঠ-পর্ব এবং সাতই পৌষের পরব পার করে দিয়ে আশ্রমের বিভিন্ন শিক্ষা-বিভাগের যে ছাত্রদলগুলি দেশ-পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়েছিল, একে-একে তারা ঘরে ফিরে আসছে। পাঠভবন গিয়েছিল উড়িষ্যার ছত্রপুর; শিক্ষাভবন দিল্লী ও আগরা আর বিদ্যাভবন অজন্তা-ইলোরা ঘুরে এল। সংগীতভবন রাঁচি হয়ে এসেছে,—কলাভবন শিগ্‌গিরই যাবে অজন্তায়, সেখানে দিন-পনেরো থাকতেও হবে, ফ্রেস্কো দেখার কাজে। আজ ৬ই জানুয়ারী রবিবার থেকে শুরু হল সব বিভাগের ক্লাস। সবচেয়ে উৎসাহ শিশু-মহলে। আগের দিন রাতে শুতে গিয়ে হাজার বার করে তাগিদ চলেছে ভোরে উঠিয়ে দিতে—রুটিন জোগাড় হয়ে গেছে আগেই,—নূতন ক্লাসের নূতন মুখ দেখতে ঘুমের ব্যবধান সইছে না,—যত বলা হচ্ছিল, আজ তো ঘুমোও, ততই তাদের অধৈর্য উঠছিল বেড়ে—কাল ভোরে বৈতালিক থেকে কী যে ধুম আরম্ভ হবে, কেউ যেন তা কল্পনাও করতে পারে না—চোখের পাতার পিটপিটুনিতে এমনি ছিল উল্লাসের রেখা। গৌর-প্রাঙ্গণ আমবাগান আবার দৌড়-ঝাঁপে, হাসি-কলরবে মুখর হয়ে উঠেছে। বকুল-কুঞ্জের বেদী আর শাল-বীথিতল ছেয়ে বসছে শুভ-সম্ভাষণের আসর,—ক্লাসে ক্লাসে নূতন পড়ার খবরাখবর তো আছেই।

*　　　　*　　　　*

ঘুরতে-ফিরতে গিয়ে আজ পুরোনো-চোখে আশ্রমের ঘর-বাড়ীগুলি অনেক স্থলে লাগবে নূতন। দু'এক জায়গায় পথঘাটেও ধোকা না লাগলে হয়। রাতারাতি আলাদিনের পিদিম-ঘষায় কোথা দিয়ে কী ঘটে গেল—আল্‌গোছে কে যেন বসিয়ে দিয়ে গেছে এক-এক জায়গায় রং-করা এক-একটা সুরম্য নূতন বাড়ী—তাদের মোলায়েম গোলাপী আভায় ভুলিয়ে দেয় চোখ,—পাখামেলা বকের পাঁতির মতো উড়েও যেন যেতে পারে এরা এক্ষুনি;—সংগীত-ভবন, নূতন বিদ্যা-ভবন, সিংহ-সদন, তোরণ-গৃহদুটি পুরোনো গেস্ট-হাউস, গেট, হাসপাতাল, রান্নাঘর,—সমস্তই যেমন একে-একে ভোল-ফেরানো, তেমনি গোল বাধাতে আছে পরিচিত এলাকায়

নাট্যগৃহ, পুরোনো হাসপাতাল ওরফে গৈরিক, পুরোনো শ্রীভবন ওরফে দ্বারিক এবং গুরু-পল্লীর অনেক বাড়ীর—নিশ্চিহ্ন দেয়ালের শূন্য ভিটেগুলি। ছাতিমতলার দক্ষিণ প্রবেশপথ-মুখে খাড়া নূতন তোরণটিতে চমক্ একবার লাগবেই—শিরোদেশের মার্বেলে লেখা সেই "আমার প্রাণের আরাম মনের আনন্দ ও আত্মার শান্তি"—বাণী চোখে পড়বে ঠিকই,—সুপরিচ্ছন্ন সংস্থানের তারিফও জাগবে মনে, কিন্তু পরিবেশটির সেই নিরাভরণ নিরাবরণ শ্যামল আত্মীয়তার স্পর্শটুকু ঠিক আছে কিনা,—সেটাও একটু ভেবে নিতে হবে। পাবলিশিং-বিভাগের পাড়াটি দেখতে হয় দু'বার। "দিনে হই একমতো রাতে হই আর,"—জানা না থাকলে সেখানেও লাগবে ভ্রম—ধোপ-দুরস্ত তার আগাগোড়া—ফুলেভরা বাগানের সাজে আভিজাত্যের জলুস ছিল তার পূর্বাপরই; দ্বিতলের জাফরিকাটা বারান্দার মাঝখানটিতে লতায়িত বোগেন-বালিয়ার আরক্তিম ললিত পুষ্পার্ঘ্য গৃহস্বামীর অভ্যর্থনায় সততই রয়েছে পরিশোভিত;—সাঁঝ পেরিয়ে সামনের চৌমাথায় এসে পড়লে দিগ্ ভুলিয়ে দেবে তখন পাবলিশিং-এর আওতার একতলাস্থিত "বিশ্বভারতী ক্লাব"-এর দীপ্ত দব-দবি। ক্লাবটি নূতন হলেও জমে উঠেছে হাবেভাবে। অনেক দিনের একটা বড় অভাব মিটিয়েছে ওর বেসরকারি মেলা-মেশায়। নিরিবিল অথচ একইকালে আশ্রমের কেন্দ্রস্থানিক ওর অবস্থানের হেতু আশ্রম-কর্মীমণ্ডলীর ছোটো-বড়ো সকলেরই আসা-যাওয়া এবং আলাপ-আলোচনা ও খেলাধুলা গাল-গল্পের সুযোগ হয়েছে; রেডিও, পত্রিকা, ক্যারম্, ব্যাড্মিনটন, তাস—সব কিছুরই আয়োজন থাকায় চিত্তবিনোদন-বৈচিত্র্য বেড়ে গিয়ে অনেকের নিকটই ওকে উপভোগ্য করে তুলেছে। টগর গাছের সবুজ সারি-ঘেরা তৃণাচ্ছাদিত 'লন'টুকুতে সুতীব্র বিজলি মশালের আলো-বিচ্ছুরিত ব্যাড্মিনটনের জমাট আসরটি যখন চোখে পড়ে তখন সেটা ভুবনডাঙার মাঠ না বালিগঞ্জের পার্ক—হঠাৎ সেটা ঘুলিয়ে গেলে গলতি হবে না কোনো পক্ষেই। কারণ, কলকাতাকেও তো কোল দিতে হয় হালেচালে—কেবল সে বেমালুম কবলিত না করলেই হল। কালে-কালে শান্তিনিকেতনে অনেক প্রান্তের লোকই এসে মিশছেন। এখানে দেশ-বিদেশের ছাত্রছাত্রী ও কর্মীদল যেমন আছেন, তেমনি এসে বাসা বেঁধেছেন জ্ঞানী-গুণী এবং আরো সাধারণ দশজন। সকলের জীবনধারাকে সমন্বিত করেই এর 'এক-নীড়ত্বের' সার্থকতা। সেখানে সামাজিকতার প্রসারের জন্য পরিমিত যে আয়োজন করা হয়, তার সুষ্ঠু সমীচীনতা অস্বীকার করা যায় না।

*　　　*　　　*　　　*

শান্তিনিকেতনের অধিবাসী সাধারণ-সমাজের পুরোবর্তীরূপে এতদিন যাঁদের

ধরা গেছে, শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় ও লীলা রায়, ডঃ ধীরেন্দ্রমোহন দত্ত ও অধ্যক্ষ সুধেন্দু রায় প্রভৃতি ছিলেন তাঁদের অন্যতম; আশ্রমের বিষয়-আশয়িক দিকে সম্পৃক্ত না থেকে তার বৈদগ্ধিক নিরাবিল আবহাওয়ায় বাস করবার আকাঙ্ক্ষাতেই তাঁরা আশ্রয় নিয়েছেন এর এক-এক কোণে। মনন, অধ্যয়ন, রচনা, আলাপন ও মেলামেশা এঁদের দৈনিক কৃত্যের অঙ্গ। সভা-সমিতি, লাইব্রেরী ও পুঁথিপত্রের নানা প্রসঙ্গে মাঝে মাঝে সক্রিয় সহযোগেও এঁরা এসে থাকেন। এঁদের সেই সাহচর্যে আশ্রম-জীবনও স্বল্পাধিক নিশ্চয়ই সমৃদ্ধ হয়ে থাকে। এই আশ্রমিক সজ্জন-শ্রেণীর তালিকায় সংযোজিত অধুনা আরেকটি নামও উল্লেখযোগ্য। প্রাক্তন-ছাত্র প্রথিতনামা ডঃ সৈয়দ মুজতবা আলি তাঁর সাহিত্য-সাধনার আসন পাতলেন এসে অবশেষে শান্তিনিকেতনে। চাকরির পথ তাঁকে নানাদিকে নিয়েও টেনে রাখতে পারল না। বই লিখে, আড্ডা জমিয়েই তিনি মশগুল থাকবেন, দেশ-বিদেশের ঘাটে-ঘাটে ঘোরা লোক,—আপাতত—বন্ধু-মহল আর বই'র বন্দর—লাইব্রেরীটি ঠিক থাকলেই তাঁর হল। পরিচিত পুরোনো পরিবেশের অভাব তাঁকে ভাবিত করবে না, কারণ অপরিচিত নূতনকেও তিনি আপন করতে পারেন। বিশ্ব-দেখা মন নিয়ে, বিশ্বভারতীর যে কোণেই তিনি থাকুন,—অনেক দিকের নিঃস্বতা তিনি যে ভরিয়ে তুলবেন এ আশা নিতান্ত অবিশ্বাস্য নয়।

* * *

কোনো কাজে ব্রতী থাকার দরকার নেই, শুধু যাঁদের সান্নিধ্য বা অবস্থানটুকুই মাত্র একটা মস্ত সম্পদ-বিশেষ—এমনতর ব্যক্তিত্বের গৌরব করবার সৌভাগ্য শান্তিনিকেতনবাসীকে এখনো দিচ্ছেন—কয়েকজনই। বয়োজ্যেষ্ঠ জ্ঞান-বৃদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, আচার্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন, শিল্পাচার্য শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুকে বাইরে আর দেখা না যাক,—তাঁদের কাছে গিয়ে বসলে এখনো নানা বিষয়ে অনেক-কিছু জ্ঞান ও ভারত-রত্ন সংগ্রহ করে আনা যায়। আরো একজন আছেন যাঁর অন্তরের মাধুর্য ও সংস্কৃতির সৌন্দর্য সংগীতের ছন্দে মিশে শান্তিনিকেতনে সুন্দরের আরাধনা ক্ষেত্রের অভিমুখে নিরন্তর প্রবাহিত হচ্ছে। চুরাশী বছর বয়সেও শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীকে দেখা যাবে আসরে-আসরে এবং আজো বাড়ীতে বসে তিনি গানের দলকে তৈরি করছেন হাজারো বার সুরের পুনরাবৃত্তি ক'রে ক'রে। মহিলা-সমিতি 'আলাপিনী'র কাজ তো আছেই, তার মুখপত্র নূতন প্রকাশিত 'ঘরোয়া'র তদ্বির, প্রদর্শনীর জন্য শিল্প-সামগ্রীর সংগ্রহ, তার খুদে-খুদে হিসেব-নিকেশ—কত কী খুঁটিনাটি, তদুপরি, সভাসমিতির ভাবণ—কাজের তাঁর অন্ত নেই

এমনিতেই,—তা সত্ত্বেও ক'দিন আগে যেমনি এল আহ্বান, অমনি সাড়া দিয়ে তুলে নিলেন হাতে বিশ্বভারতীর উপাচার্যের কাজ। জরুরী দায়িত্ব চুকিয়ে দিয়ে ঘরে একটু বসেছেন তো, আবার পড়ল এসে রবীন্দ্র-শতবার্ষিকীর উৎসব-আয়োজনের তাগিদ। প্রধান যখন হয়ে আছেন তখন শীর্ষে বসে সমাধান করতে হবে তাঁকেই যত দাবি-দাওয়া। উৎসব-সমিতির সভাপতিত্ব থেকেও তাই তিনি বাদ পড়েননি। আর, যে কাজ করবেন, তার এতটুকুতেও খুঁৎ রেখে করা তাঁর ধাতে লেখা নেই। পেয়েছিলেন তিনি মনস্বীতা, সৌকুমার্যবোধও তাঁর সহজাত,—সে সঙ্গে নিখুঁত করার কর্মাভ্যাসটি থাকায় খাটুনি থেকে তাঁকে রেহাই দেবে কে। সেদিক দিয়ে তাঁর শক্ত-পিতৃব্যের উপযুক্ত এক ভ্রাতৃষ্পুত্রী তিনি। সেকালের লোকদের আরেকটি স্বভাবও তাঁকে পেয়ে বসেছে—ঘরে-ঘরে লোকের খোঁজ-নেওয়া। আর, কাছে পেলে, খুঁটিয়ে সকলের কুশল জিজ্ঞাসা,—সেই প্রসঙ্গে নিজেরও হয়তো দু'দশ কথা—সংসারের সম্বন্ধে কৌতূহলের যে কত জিনিস আছে—তার হিসাবপত্রে তাঁর কাছে হার মানতে হবে তরুণদেরও। আর রচনার রম্যতায়?—সে কথাই সকলের হয়ে বললেন সেদিন শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁর বিগত জন্মোৎসবের সভায় শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে গিয়ে। গত ২৯শে ডিসেম্বর সান্ধ্যবিনোদনপর্বে চীন-ভবনে 'সাহিত্যিকা'র তরফ থেকে শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবীর তিরাশী পেরিয়ে চুরাশী (৮৪) বছরে উপনীত হওয়া উপলক্ষে শুভ-জন্মতিথি উদ্‌যাপনের আয়োজন করা হয়েছিল। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভার প্রারম্ভে মালাচন্দনে যথারীতি ইন্দিরা দেবীকে বরণ করা হলে পর আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন-প্রেরিত একটি শুভেচ্ছার বাণী পাঠ করে শোনান সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত সুবোধ রায় মহাশয়। কয়েকটি সুমধুর গান ও সুলিখিত কবিতা, গীত ও পঠিত হয় ছাত্র-ছাত্রী ও অধ্যাপক-মহল থেকে। স্বর্গত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের একটি অপ্রকাশিত গদ্য রচনা এবং শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবীর সদ্য-রচিত অপ্রকাশিত রচনার প্রথম শ্রুতি-আস্বাদনের সৌভাগ্য হয়েছিল সকলের সভার দু'দফা পাঠ-প্রসঙ্গে। ইন্দিরা দেবীর লেখাটি ছিল শ্রীবিমল মিত্র রচিত "সাহেব-বিবি-গোলাম" বইখানির সমালোচনা। আন্তরিক উদ্দীপনায় চিন্তার প্রাখর্যে, অপূর্ব সরসতায় মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিল তার প্রতিটি কথা সমগ্র সভাকে। সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় উঠে বললেন—আমাদের আধুনিক সাহিত্যিকদের মধ্যে ক'জন এ লেখা লিখতে পারবেন, জানিনে। শ্রীযুক্তা লীলা রায় বললেন,—এ বয়সেও তিনি চৈত্রের দুপুরে পথে পেয়ে আমাকে ধমকান—"কেবল কাজ করলেই হবে?—

শরীর দেখতে হবে না?—শিগগির ঘরে যাও—আমি একটু ওদের দেখে আসি।" তিনি যে নিজে এ সময় 'আলাপিনী'র আলাপে বেরিয়েছেন—সে কথা তখন তাঁকে কে বলে। সভার পরিশেষে শ্রীযুক্ত প্রবোধ সেন মহাশয় তাঁর ভাষণে বিবিধ বিদ্যাবত্তা ও গুণাবলী নির্দেশ ক'রে, এই মহীয়সী নারীর জীবনে তাঁর পিতৃ ও পতিগৃহাগত ঐতিহ্যের যে নির্যাস নিহিত রয়েছে ঐতিহাসিকের ভঙ্গিতে ও সাহিত্যিকের ভাষায় তার সুন্দর ব্যাখ্যা করেন। ১২।১।১৯৫৭

—শিউড়ি, অজয়,—এই যে বোলপুর……।

আরেকজন চেঁচিয়ে উঠল—কেন্দুবিল্ব……।

ট্রাক ছুটে চলেছে, আগ্রহে ঝুঁকে পড়েছি, দেখছি বীরভূমের ম্যাপ। সু-দা'রা দেখাচ্ছেন—বোলপুর থেকে ইলামবাজার হয়ে কেন্দুবিল্ব মাইল আটাশ দূর, শিউড়ি থেকে হবে মাইল কুড়ি দক্ষিণে……।

ম্যাপের সরু মোটা রেখা, ওতে কেন্দুলির অবস্থান আর রাস্তার বিবরণ কতটুকুই বা জানতে পারছি—রাস্তার বাস্তব পরিচয় যে মিলছে হাতে-হাতে। ট্রাক ছুটতে থাকলে ধুলোটা ওড়ে পিছনে, ছোটার একটু কমতি হল আর রক্ষে নেই। দৈত্যের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ছে ধুলোর রাশি, শ্বাস চেপে ধরছে। আশ্চর্য মানুষ ভূ-দা, স্থানাভাবে দাঁড়িয়েছেন ট্রাকের পাদানিতে, অবস্থা শোচনীয়, তবু উৎসাহের কমতি নেই; বলেই চলেছেন—"বোলপুর নয়, বলিপুর, সুরথ রাজার দেশ। ওই যে ভাঙা-মতো মন্দির, ওই সুরথ রাজার মন্দির। দুর্গার অকালবোধন ক'রে হৃতরাজ্য ফিরে পেয়েছিলেন। মন্দিরে কারুকাজ আছে দেখবার মতো……।"

ঐতিহাসিক, পৌরাণিক যত কাহিনী আছে, এক নাগাড়ে তিনি বলে চলেছেন; তিনি কত কিছু দেখে চলেছেন, আমরা যে বিচ্ছুটি দেখতে পাচ্ছি না, সে-কথাটি বলতে পাচ্ছি না। ধুলোয় ধুলোয় কণ্ঠ রোধ হয়ে যাচ্ছে। দিগ্বলয়হীন মহাপ্রান্তর, কাটা-ধানের শুকনো গুঁড়িভরা, মাঝে-মাঝে সবুজের ছোপ—আখ ক্ষেত, কলাই ক্ষেত। উপরে দুপুরের কড়া রোদ, নীচে রসহীন বর্ণহীন গেরুয়া-প্রান্তর। যেটুকু দেখছি এই রূপ। মাঝখানে সরু রাস্তাটি ধরে আমাদের ট্রাক ছুটে চলেছে; গরুর গাড়ি যাচ্ছে, মোটর গাড়ি ছুটছে, বোঝাই হয়ে চলেছে যত মানুষ—

একদিকেই গতি, একই গন্তব্য। ইলামবাজারের ঘন শালবনের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে—কত চেনা দল হৈ হৈ করে উঠল, কত দল তাকাতে তাকাতে এগিয়ে গেল, কতদল রইল পিছিয়ে। গায়ে-মুখে লাল ধুলোর প্রলেপ। জয়দেব

যাওয়ার পথ পথের ধুলো দিয়েই চেনা; বর্ধমানে নেবে অজয় পেরিয়ে আসছে কত লোক; বোলপুরের পথে আসছেই বা কত; এদিকে আসছে শিউড়ির পথ বেয়ে। বাঙালীর অন্তরে আজ ডাক পৌঁচেছে জয়দেবের।

আটশ' বছর আগে যে সুর বাঙলাতে প্রথম উঠেছিল বেজে জয়দেবের পদাবলী-গানে, সেই সুর বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের মধ্য দিয়ে একদিন জীবন্ত রূপ ধরেছিল শ্রীচৈতন্যে। সে সুরে প্লাবিত হয়েছে দেশ, বর্ষে-বর্ষে পৌষ-সংক্রান্তির দিনটিতে দেশের ছেলে-বুড়ো সবার অন্তরে ধ্বনিত হয়ে ওঠে—

সজলনলিনী দল শীলিত শয়নে,
হরিমবলোকয় সফলয় নয়নে।

আমাদের ট্রাকেও জয়দেবের সম্বন্ধেই আলোচনা হচ্ছে। একজন বললেন—মকর-সংক্রান্তিতে অজয়ে জোয়ার আসত, গঙ্গার সঙ্গে ছিল যোগ, স্রোত বইত। সূর্যের দক্ষিণায়ন আরম্ভ হল তো, দেবযান পক্ষ পড়ল। এ ক'মাস পুণ্য মাস বলে মনে করা হয়, ভীষ্ম অপেক্ষা করেছিলেন দেবযান পক্ষে মরবার জন্যে। পৌষ-সংক্রান্তির থেকে এই পক্ষের আরম্ভ মনে করা হয় বাঙলায়। তাই সারা বাঙলা জুড়েই এ দিনটিতে উৎসব হয়ে থাকে। রাঢ়দেশে সংক্রান্তির ব্রাহ্মমুহূর্তে গঙ্গাস্নান পরম পুণ্যের। অজয় এবং কাটোয়ার গঙ্গার তীরে-তীরে গ্রামের লোকেরা এসে জমে, মেয়েপুরুষ ছেলেবুড়ো সবাই স্নান করে, বনভোজন হয়। কিংবদন্তী—জয়দেবের জরাতুর মা স্নানে যেতে পারলেন না, বড় দুঃখ মনে। জয়দেব অজয়ে পতিতপাবনী জাহ্নবীর ধারা বইয়ে আনলেন, মা আনন্দে স্নান করলেন।

এ-পাশে তর্ক উঠেছে কেন্দুবিল্ব গ্রামের নামটি নিয়ে। কেউ বলছেন—কেন্দু হচ্ছে কেঁদ ফল, আর, বিল্ব তো বেল। হয়তো এখানে এসব গাছ একসময় প্রচুর ছিল, তাই গ্রামের নাম হয়েছিল কেন্দুবিল্ব।

কেউ বা বলছেন—কেন্দুলি ব'লে আলাদা একরকমের গাছও আছে, বার্মা অঞ্চলে দেখেছি। হয়তো-বা সে গাছ এ অঞ্চলেও ছিল, তাকেই সংস্কৃত করে নেওয়া হয়েছে—কেন্দুবিল্ব।

নানা রকম তর্ক, নানা রকম আলোচনা চলছে, এক সময় সামনে-বসা ক'জন চেঁচিয়ে উঠল—'এসে গেছি, ওই যে কেন্দুলি।'

সাদা দিক্-রেখা। মহাসাগর যেন। মানুষে মানুষে এ কী অপূর্ব মেলা। মনটা দুলে উঠল।

*　　　*　　　*

গাড়ি এসে থামল। গ্রামে ঢোকবার মুখ। এক পাশে তেলে-ভাজা, মিষ্টি, বিড়ির দোকান আর বেলুনের দোকান, এ পাশে একটা পানাপুকুর, বাঁশে কাঠে লম্বা ঘাট তৈরি হয়েছে। শেওলায় বিবর্ণ জল। সেই জলেই মেয়ে-পুরুষেরা হাত মুখ ধুয়ে নিচ্ছে। আমরা নেবে ভিতরে চললাম। জমিদারবাড়ি যেতে হবে।

গ্রামে ঢুকেও দেখি মেলা। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামের মেলা আগে দেখিনি, ধারণা ছিল না। পূর্ববঙ্গের মেলা হয় কালীতলায়, হাটতলায়—খোলা মাঠে। এ মেলা দেখলাম তা নয়। গ্রামের অলি-গলিতে মেলা, ঘরের দোরে ছাঁচতলায় মেলা, সারা গ্রাম জুড়ে পথ জুড়েই মেলা। খুব মজা লাগল।

মেলা দেখতে দেখতে, পথের লোকদের ঠেলতে ঠেলতে এক সময় দেখি সামনে এক পাশে প্রকাণ্ড মন্দির, উল্‌টো দিকে প্রকাণ্ড এক পিতলের রথ। কোন্‌টাকে দেখব! ভাবতে-না-ভাবতে দেখি আগে-পাছের তাড়া খেয়ে জমিদারবাড়ির বিরাট জীর্ণ দ্বার দিয়ে কখন সদর-বাড়িতে ঢুকে গেছি। একটু সরু গলি-মতো, পেরিয়েই বিশাল ফাঁকা প্রাঙ্গণ। ওপাশে তিনদিকেই দালান, এপাশে কুয়ো, শিবের মন্দির, চৌকোণা চত্বর, ছাউনি ঘেরা—সভাখানা। সেখানে চেয়ার টেবিল বেঞ্চ পাতা। জমিদার নন, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সেখানে বসেছিলেন; এগিয়ে এলেন মহান্ত—জমিদারবাড়ির বিগ্রহের পূজারী। ম্যাজিষ্ট্রেট বললেন—"সারা গাঁ জুড়ে মেলা, বাইরে তো আপনাদের থাকা সুবিধের হবে না। জমিদারবাড়ির ভিতরেই তাঁবু ফেলুন, মেয়েরা অতিথিশালার দোতলায় থাকবেন। ঘর খালি নেই।"

মহান্ত হেসে বললেন—খালি কি আজ থাকবে? একটা ঘর খালি করিয়ে দিচ্ছি, মেয়েরা জিনিসপত্র রেখে আসুন গে। এখানেই চা খাবেন সবাই।

একজন লোক দিলেন, সঙ্গে গেলাম। এ প্রাঙ্গণ পেরিয়ে আরেক প্রাঙ্গণ—

উঁচু-নীচু এবড়ো-খেবড়ো ঘাসে-ভরা, খানিকটা জমি, পশ্চিম দিকের উঁচু প্রাচীর অর্ধেক ধ্বসে পড়েছে। মাঝে এক সারি ঘর ছিল, ভেঙে-চুরে এখন তা স্তূপ হয়ে উঠেছে। পুবে মন্দিরের দিকে দোতলা অতিথিশালা। এককালে বিরাট ব্যবস্থা ছিল। নীচে সারি সারি থাকবার ঘর। বাইরের বারান্দা মাটি-সিমেণ্ট এক হয়ে গেছে। দু' তিন জায়গায় উনুন জ্বলছে, বড়-বড় হাঁড়িতে রান্না হচ্ছে, পরাত-ভরতি বেগুন আলু কফি রয়েছে—কিছু কোটা কিছু আ-কোটা। এক পাশের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলাম। সামনের ঘরটা পেরিয়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম—এক পলকে গ্রামের পূর্বদিকের পরিপূর্ণ দৃশ্যটি চোখে পড়ে গেল। সামনেই জয়দেবের রাধাবিনোদ-বিগ্রহের মন্দির—হাত দশেক মাত্র তফাত। কাছে দূরে অলিগলিতে

মেলা—ঝকমক সাজসজ্জা, কলকল মানুষের কলরব। দূরে গ্রামের প্রান্তসীমা, যত ঘর—সব খোলার-চাল মাটির-দেওয়াল। দু'একটি ডোবাও আছে। দাঁড়িয়ে এক-পলক দেখে নিলাম। হাজির হলাম গিয়ে থাকবার ঘরে। "বুড়ো বুড়ি তার ঝুরঝুরে বাড়ি"—'আবোল তাবোলের' ছড়া; এ দোতালা-বাড়ি তারও বাড়া। টালির ছাদ জায়গায় জায়গায় হুমড়ি খেয়ে পড়েছে, দরজা ভেঙে ঝুলে রয়েছে, আর সামনের দিকের এ বারান্দাটা চলতে গেলে দোলে। এরই মধ্যে ওদিকে খান তিন-চারেক ঘর একটু অক্ষত রয়ে গেছে কী করে; লোকটি একটা ঘর সাফ করে দিলে। তালা দিলে, চাবি দিলে, বললে—যখনই বেরুবেন, তালা-চাবি দিয়ে বেরুবেন। এ তিনদিন কি আর লোকের শেষ আছে, বর্ধমান-বীরভূমের দূর-দূর গাঁ থেকে লোক আসে, এ জায়গায় রাতের পর রাত কাটিয়ে যায়।

জিনিসপত্রগুলি নামিয়ে রেখে স্বস্তি পেলাম। চা খেতে-খেতেই রাত নেমে এল। শুনেছিলাম রাতে এ মেলাতে বাউল-বোষ্টমের গান হয়। প্রধান আগ্রহ ছিল সে-সব শুনবার। কিন্তু চা খেয়ে সবাই তাঁবু খাটাতে লেগে গেলেন, যোগাড় শুরু হল। এদিকটা না সেরে রেখে ওদিকে গেলে রাতের থাকবার-খাবার ব্যবস্থা আর হবে না। দু' একজন সান্ত্বনা দিলে—একটু রাত হলে বাউল গান হয়।

কে আবার ধুয়ো তুললে—পরশু দিন ছুটি আছে, কালকের দিনটা থেকে পরশু যাওয়া যাবে।

শুনলাম পরদিন ধুলোট—অর্থাৎ বাউল-বোষ্টমদের গানের শেষ দিন। সেদিন গান নাকি খুব জমে। আশ্বস্ত হলাম। বেলা দশটা-এগারোটায় খেয়ে রওনা দিয়েছি, পুরো তিনঘণ্টা এসেছি, ট্রাকে দেদার ঝাঁকুনি খেয়েছি, পেটের নাড়িভুঁড়িও হজম হয়ে যাবার কথা। ভাতের ব্যবস্থা আশু প্রয়োজন। হী-হী হু-হু পৌষের হাওয়া বইছে, খোলা মাঠে থাকা চলবে না, তাঁবুও খাটানো চাই। বাস্তব প্রয়োজন না মিটতে আধুনিক মানুষ অবাস্তবের পিছনে ছুটতে চায় না। থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হতে লাগল। এক ফাঁকে এলাম বেরিয়ে। জমিদারবাড়ির অতিথি-শালায় গ্রামের লোকেরা রান্না করছিল, দেখতে এগিয়ে গেলাম। এ পাশে একদল রান্না করছে, ওপাশে আরেকদল। মাঝে একদল; একজন মাঝারি গোছের লোক সেখানে রান্না করছে দু' তিনটি বউ-ঝি তরকারী কুটছে। কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই প্রশ্ন করলে—কোত্থেকে আপনাদের আসা হচ্ছে বটে?

চোখে-মুখে আগ্রহ, বীরভূম, বর্ধমানের মিশোল ভাষা, কথায় গ্রামের টান। পরিচয় দিলাম, জিজ্ঞেস করলাম—এখানে কি সবারই জন্তে রান্না হচ্ছে?

—না মা, যার-যার দলে-দলে রান্না হচ্ছে।

—জমিদারের দান?

—জমিদার কোথায় মা, এ সব গাঁ এক কালে দেবত্র সম্পত্তি ছিল, এ মেলাতে কত লোকজন আসে, অতিথিশালায় থাকে, রান্না করে, খায়-দায়। জমিদারের সঙ্গে যোগ কোথায়?

বললাম—আচ্ছা, কী উপলক্ষে এ মেলা?

আমাদের অজ্ঞতায় ওদের সংকোচটুকু গেল কেটে। হেসে বললে—বলেন কী, জয়দেব ঠাকুর, যিনি কবিতা লিখেছেন 'দেহি পদ পল্লব মুদারম্'—তিনি যে এ তিথিতে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। কবিতা আর মেলে না, ভাবতে ভাবতে গেলেন স্নানে। মস্ত ভক্ত ছিলেন, ভগবানের নামে কবিতা লিখছেন, ভগবান কি থাকতে পারেন! ঠাকুরের বেশ ধরে এসে কবিতা লিখলেন, পদ্মাবতীর কাছ থেকে চেয়ে ভাত খেলেন। এদিকে জয়দেব ঠাকুর ফিরে এসে শোনেন এই ব্যাপার, দেখলেন কবিতার মিল হয়ে রয়েছে, তখন দু' জনের কী আনন্দ! স্বামী-স্ত্রী সেই পাতে একত্র আহার করলেন।

একজন প্রৌঢ়া বলে উঠলেন—বেটাছেলের সঙ্গে কি মেয়ে-মানুষের কখনো এক সাথে খেতে আছে? স্বামী গুরুজন। কিন্তু এখানে এ তিন দিন আমরা মেয়ে-পুরুষ এক পাতে একত্রে খাওয়া-দাওয়া করে থাকি।

স্মিত লজ্জিত হাসিতে তাদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। রান্নার লোকটি বললে—এখানে এ তিন দিন ভাগবত পাঠ হয়, জয়দেবের কথা হয়, কত লোক ব'সে শোনে, ঐ উঠোনে।

কৌতুকে সভাখানার কাছে গিয়ে বসলাম। একটা করবী ফুলের গাছ, সামনে ছোট টেবিল, আর-একটা চেয়ার পাতা। শতরঞ্চিতে বসে গেছে কত মেয়ে-পুরুষ। একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পুরাণ-কথা শোনাচ্ছেন। ভদ্রলোক সাধারণ-শিক্ষিত মনে হল। খানিকক্ষণ বসে শুনলাম, বেশিক্ষণ শুনবার ধৈর্য রইল না। অলৌকিক কাহিনী, অলৌকিক ব্যাখ্যাই বেশি হচ্ছে। ফিরে আসতে আসতে সেই নিঃশব্দ নিস্তব্ধ উন্মুখ শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে মনটা মোচড় দিয়ে উঠল। এই উত্তুরে হাওয়া সয়ে, শিশিরে-সিক্ত হয়ে এতগুলি লোক এ কী শুনছে! এত জানবার শুনবার আগ্রহ এদের, সে পিপাসা কী দিয়ে মেটানো হচ্ছে! কী পাচ্ছে এরা!

চল্লিশ-পঞ্চাশ জনের রান্না, খাওয়া, সে কি দু' এক ঘণ্টাতেই হয়। কাজে ব্যস্ত

আছি, শ-দা এসে বললেন—করছ কী? কী কাজে ব্যস্ত রইলে? গান যে শেষ হয়ে গেল।

—আজ না হয় শুনব কাল, ধুলোট না কি খুব জমে!

—জমে তো; কাল থাকা হবে কী করে? পরশু ছুটি নেই, ভুল খবর। গান শুনব ব'লে এসেছি, সে শোনা হবে না! থাক্ পড়ে খাওয়া, থাক্‌গে ঘুম। তাড়া-হুড়ো লাগিয়ে কোনো রকমে খাওয়া সেরে বেরিয়ে পড়লাম পাঁচ মিনিটে। সরু গলি, দোকানে দোকানে ভরা, আলোয় সব ঝলমল করছে। ঘুরতে ঘুরতে অল্প পরেই এসে পড়লাম রাস্তায়—মেলাহীন আলোহীন জায়গা। রাত প্রায় এগারোটা। বাউলদের গান ঝিমিয়ে পড়েছে। দু' কাতারে মেলার লোক আর বাউল-বোষ্টম ঘুমিয়ে পড়েছে, নিশীথ রাতে চাঁদ উঠেছে, শান্ত-স্নিগ্ধ। দূরে বটতলায় তখনো গান হচ্ছে। দ্রুত পায়ে এগিয়ে চললাম। যেখানে এসে থামলাম সে অলৌকিক স্বপ্নরাজ্য। বিরাট-বিরাট অশথ গাছ, একটার সঙ্গে আরেকটা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। এমনি মোটা-মোটা গুঁড়ি। এ পাশে কীর্তন হচ্ছে আর ওপাশে বাউল-গান, এদিকের গান ওদিক থেকে শোনা যাচ্ছে না। উপরে ডালে-পাতায় নিশ্ছিদ্র চন্দ্রাতপ। ফাঁকে-ফুকোরে চাঁদের আলো, দুটি-একটি সোনালী তারা দেখা যাচ্ছে। গাছগুলি থেকে অজস্র ঝুরি নেমেছে। প্রাকৃতিক সভাখানা। হাজার-হাজার বাউল-বোষ্টম। বেশীর ভাগ ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। দু' তিন দল তখনো গান করছে। আমরা গিয়ে বসতে ওদের গানে এল ফুর্তি। গুপীযন্ত্রে মারতে লাগল ঘন ঘন ঘা, ঘুঙুর-পায়ে, ঘুরে-ঘুরে নাচতে লাগল, গলা খুলে আপন ভুলে গাইতে লাগল গান,—

—মনে করি পায়ে ধরব না, তবু মন-প্রাণ কাঁদে।
তুমি গো রাজনন্দিনী, তোমায় না দেখে পরান কাঁদে॥

কত শত গান, গানে-গানে রাত্রি সজীব হয়ে উঠল, গাছপালায় গান প্রতিধ্বনিত হতে লাগল, আমরা স্তব্ধ হয়ে শুনতে লাগলাম। কোন্ অজানার প্রেমের রসে মজে উঠল বাউল, কাকে পেয়েছে আজ বহুদিনের পরে অতি কাছে, অভিসারে বেরিয়ে পড়েছে অন্তরে-অন্তরে। তাকে পাওয়া-না-পাওয়া যেন এক হয়ে গেছে; বিরহ দুঃখে উপচিয়ে বেজে উঠছে যে মাধুরী তাতে শোনা যাচ্ছে যেন বহুদিনের সুর—

তামহং হৃদি সঙ্গতামনিশং ভৃশং রময়ামি।
কিং বনেঽনুসরামি তামিহ কিং বৃথা বিলপামি॥

আমার পাশেই বসেছিলেন আমাদের দলের একটি পারসিক ভদ্রলোক, আর,

দু'টি আমেরিকান ছাত্র। একটি ছাত্র বলে উঠলেন,—ভারতবর্ষে এমন জিনিস আছে, জানা ছিল না তো।

পারসিক ভদ্রলোক বললেন—না দেখলে বই পড়ে কি আর এর স্বরূপ বোঝা যেত।

প-দা বললেন—ভারতবর্ষের এ একটি ঘাঁটি, দেশী জিনিস দেখতে পেলে। শহরের জিনিস যেন ভারতবর্ষের বাইরের কারু কাজ; দেশের ভিতরে-ভিতরে সবার চোখের আড়ালে এসব ধারা বয়ে চলেছে।

ওরা বললে—গানের মানে বুঝিয়ে দাও।

প দা ইংরাজি করে মানে বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করলেন, ওরা খুব খুশি। বাউলদের দল ঝিমিয়ে পড়ছে, ক্লান্তিতে নিজেদেরও চোখ বুজে আসছে, এ জায়গা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছে না।

শ-দা বললেন, আমি চা খেয়েই চলে এসেছিলাম। তোমরা কতটুকু আর দেখতে পেলে? হাজার হাজার বাউল-বোষ্টম একসঙ্গে নাচ-গান করে, সে এক অপূর্ব দৃশ্য। একটি বাউল যা দেখলাম, তাঁকে না দেখলে বুঝতে পারবে না সে কী মানুষ! যেমন তাঁর গান, তেমনি নাচ; অনেক বলে-কয়ে রাজি করিয়েছি; ওদিকে নির্জনে গাছের আড়ালে গিয়ে দেখালে।

দোতালায় উঠতে গিয়ে হতবুদ্ধি। পা ফেলতে জায়গা পাইনে। ঢুকবার ঘরে ভিতরের বারান্দায় তিল ধরে না। গায়ে-গায়ে মানুষ শুয়ে আছে, যেন স্ক্রু দিয়ে আঁটা। শেষটা রেলিঙের পাশে-পাশে পা ফেলে-ফেলে চললাম। ঝরঝরে নড়বড়ে রেলিং, ভয়ে-ভয়ে পা ফেলি, না পড়ে যাই! একজন বলে উঠল—যে ভিড় হয়েছে, গোটা দোতালাটাই না ধ্বসে পড়ে। অবিশ্বাস্য নয়, কিছু উপরে নীচে শ'পাঁচেক লোকের ভিড় তো হয়েই-ছে। চাপা পড়বে, একদিন খবরের কাগজে হয়তো খবরটা বেরুবে, তার পরে······সান্ত্বনা এই—তীর্থস্থানে মরলে স্বর্গলাভ হয়; অপমৃত্যুতেও নরক অবধি—নিশ্চয় যেতে হবে না। মেলাতে আধুনিক উপদ্রব বায়াস্কোপের কান-ফাটানো গান থেমে এল; মেলা ঘুমিয়ে পড়ল, ঘুমে আমাদেরও চোখ জড়িয়ে এল।

"বহুদিনের সাধ জয়দেবে আসা, হয়ে কি আর ওঠে। সেই যে গল্পে আছে......।"

আধ-ঘুমে বুঝে উঠতে পারিনে—কোথায় আছি, কারা সব গল্প করছে; কোত্থেকে বা ভেসে আসছে অতি সুললিত সুর। ভাঙা টালির ভিতর দিয়ে, ভাঙা

জানলার ফাঁক দিয়ে ডুবে-আসা চাঁদের ম্লান আলো ঘরটাকে ভরিয়ে তুলেছে। ঘুম ভেঙে গেল। হুঁশ হল জয়দেবের জন্মস্থান কেন্দুলিতে আছি। বারান্দায় যাত্রীরা শুয়ে গল্প করছে, কত দেব-মাহাত্ম্যের গল্প, কত তীর্থের কাহিনী, নিজের নিজের সংসারের গল্পই বা কত। সেই বটতলাতে তখন চলছে প্রভাতী-কীর্তন গান, গাইছে বোধ হয় বাউলরা কয়েকজন মিলে; অস্পষ্ট সুর পাখির কাকলির মতো ভেসে আসছে। ইচ্ছে হল ছুটে যাই। কিন্তু দলের সবাই আছে ঘুমিয়ে। কনকনে শীত, ডাকাডাকি ঠেলাঠেলি করে তুলব, সাজ-পোশাক পরা হবে: নির্ঘাত বেলা হয়ে যাবে, গান কি ততক্ষণ থাকবে! চুপ করে শুয়েই শুনতে লাগলাম।—"ওঠো জাগো শ্রীনন্দের নন্দন।"—অতি কাছেই গান শোনা গেল। আর কি শুয়ে থাকা চলে? দোর খুলে চৌকাঠে দাঁড়ালাম। আলো-আবছাওয়ার শান্ত ক্ষণ। মন্দিরের চূড়ায় জ্যোৎস্না চিকচিক করছে। একজন প্রভাতী গেয়ে গ্রাম ঘুরছে! প্রদক্ষিণ করছে মন্দির। দোকানীরা সবে দোকানের ঝাঁপ তুলছে, জলের ছিটে দিচ্ছে ঘরের দোরে, নাম গান করছে। গৃহস্থ-বধূরা জলের ছিটে দিতে দিতে জয়দেবের মন্দিরে ঢুকল।

চা-খাওয়া চলছে, সু-দা বললেন—বৈষ্ণবশাস্ত্রে বিখ্যাত পণ্ডিত, যিনি বীরভূম সম্বন্ধেও বই লিখেছেন, বসে আছেন নাকি সভাখানায়। তাঁকে এখানকার বিষয় কিছু জিজ্ঞেস করে নেওয়া যাক।

প্রৌঢ় পণ্ডিত-ব্যক্তি পরম উৎসাহে আলাপ-আলোচনা করলেন। বললেন—এবার তো তেমন বাউল-বোষ্টম আসেনি, সারা ভারতের বাউল-বোষ্টমরা এখানে এসে মিলত। জয়দেবের জন্মস্থান তাঁদের প্রধান তীর্থস্থান। আগে কত মুসলমান ফকির-দরবেশকেও আসতে দেখেছি, আজ ক'বছর থেকে দেখছি তাঁরা একেবারেই আসছে না। এবার একটিও খুঁজে পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ। ভদ্রলোক বললেন—জয়দেবের মেলা কবে থেকে হচ্ছে ঠিক জানা যায় না, হয়তো তাঁর তিরোধানের পর থেকেই হচ্ছে। না হলেও, এ মেলা বহুকালের পুরানো, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

দেখতে বললেন,—লাউসেন-তলাও, ইছাই-ঘোষের গড়। অজয় পেরিয়ে যেতে পথ অল্প, কিন্তু গহন অরণ্য, বাঘের ভয় আছে। ঘোরা-পথে যাওয়া নিরাপদ, কিন্তু মাইল-তিনেক দূর হবে।

একদিনের মধ্যে কি আর সে-সব হেঁটে দেখা সম্ভব! স্থানীয় দ্রষ্টব্য জয়দেবের মন্দির, কুশেশ্বর শিবমন্দির, কদমখণ্ডীর ঘাট—যেটা জয়দেবের সিদ্ধিস্থান বলে খ্যাত,

এসব দেখতেই বেরিয়ে পড়লাম। আগে চোখে পড়ল রথটি। শুনলাম—কোনো এক মোহান্ত এই পিতলের রথ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। আষাঢ় মাসে রথযাত্রা। খুব সমারোহ হয়। পৌষ-সংক্রান্তি এবং রথযাত্রা—এ দু'টিই কেন্দুবিল্বের প্রধান উৎসব। জয়দেবের মন্দির ব'লে কথিত মন্দিরে গিয়ে উঠলাম। মন্দির খুব প্রাচীন বলে মনে হল না। ষোড়শ শকাব্দে বর্ধমানের মহারাণী নৈরাণী দেবী নাকি এই নূতন মন্দিরটি তৈরি করে দিয়েছেন। রাধাবিনোদ-মূর্তিটি শ্যামরূপার গড় থেকে আনীত। প্রবাদ জয়দেবের রাধাবল্লভ-বিগ্রহ তাঁর সঙ্গে এ স্থান ত্যাগ করেছিল। মনে-মনে ভাবতে লাগলাম—কিংবদন্তীর মূলে কি সত্যের আভাস লুকিয়ে আছে। জয়দেবের সময় দ্বাদশ শতাব্দী, তারপরে দেড়শ' বছর ধরে যে মুসলমান আক্রমণ চলেছিল, মন্দির লুণ্ঠিত, বিগ্রহ চূর্ণিত হয়েছিল, কেন্দুলি কি রেহাই পেয়েছিল তার থেকে? জয়দেবের কৃষ্ণভক্তি বিখ্যাত ছিল সেই সময়ই, সেখ-শুভদয়ায় এমন ইঙ্গিত রয়েছে। মুসলমান-আক্রমণ হওয়া অসম্ভব নয়। মন্দিরের বাইরে ইটের কাজ ঝাপসা হয়ে এসেছে। ভিতটি বড় নয়, একটি মাত্র কোঠা। ভিতরে ঢোকা নিষিদ্ধ। বিগ্রহমূর্তির সামনে পাথরে খোদাই—"স্মরগরল খণ্ডনং, মম শিরসি মণ্ডনং দেহি পদপল্লবমুদারম্"।

কদমখণ্ডীর ঘাটে এসে দেখলাম অজয়। ঘাট বলে কিছু নেই উঁচু-নীচু ভাঙা পাড়। একটা অশথ গাছ মাটিতে দাঁড়িয়ে আছে। বালির স্তর আর বালির চর। রাশি রাশি বালির মধ্যে একটিমাত্র ক্ষীণ স্রোত, বয়ে চলেছে, কি, না-চলেছে। জলে বোধ হয় পা ডোবে-না। এ জলেই মকর-সংক্রান্তির ব্রাহ্মমুহূর্তে হাজার হাজার বাউল-বোষ্টম এবং পুণ্যার্থীরা স্নান করছে। পাড়ে দাঁড়িয়ে দেখতে ভারী সুন্দর। ভোরবেলাকার স্নিগ্ধ রোদ, সাদা বালির চর, এখানে-ওখানে জলের ধারা, স্নান করছে, আহ্নিক করছে কত লোক! কদমখণ্ডীর ঘাটের উপরে মন্দির—ছোটোখাটো ঘর। কুশেশ্বর শিবের মন্দির, মাঝারি গোছের শিবলিঙ্গ। কাঠের শিকের দরজা বন্ধ। সিঁদূরে-চন্দনে লেপা শিক। মন্দিরের গায়ে লেখা—"এইখানে এক টাকা দিলে সন্ধ্যা ছ'টায় জয়দেবের খাঁটি হস্তলিপি দেখিতে পাওয়া যাইবে," ইত্যাদি। পাশের মন্দিরে একটা পাথরে পায়ের ছাপ রয়েছে।—জয়দেব ঠাকুরের? এদিকে আরো দু'খানা ঘর, দেবদেবীর মূর্তি আছে, সঙ্গের একজন বললে—চলো, এ সব দেখার চাইতে বরং বিল্বমঙ্গল দেখে আসা যাক্। মাইলখানেকের মধ্যেই আছে।

আর-একজন বললে—বিল্বমঙ্গল তো দক্ষিণ দেশে।

বললাম—ঘুরে আসাই যাক, সারা গাঁটা তো দেখা হবে।

তিন-চারজনে মিলে বেরিয়ে পড়লাম। মেলার একজন সেবাব্রতী, জানা গেল সে আমাদেরই একজনের চেনা, চললেন তিনিও। ক'দিন থেকে এখানে আছেন। গ্রাম কিছুটা তাঁর জানা-শোনা। বললেন—গ্রামটা খুব বড়ো নয়। পোষ্টাফিস আছে, মহান্তদের বড়ো-বড়ো আখড়া আছে,—কাঙাল খেপা, খোটরি বাবা ও মনোহর দাস বাবাজির ; জমিদার আছেন, এ ছাড়া আর সাধারণ গৃহস্থ।

মেলা পাশে রেখে নদীর তীর ধ'রে চললাম। গাছপালার নীচে এক-এক জায়গা এত স্তব্ধ, এমন মনোহর—পা আর চলতে চায় না।

খানিকটা এসে নদী ছেড়ে মাঠের পথ ধরলাম। আখ-ক্ষেত, কলাই-ক্ষেত, শর-ঝোপ। সামনেই টিকরবেতা গ্রাম। পেরিয়েই প্রান্তর, তারই বনের মধ্যে বিল্বমঙ্গল সাধুর আশ্রম। কেন্দু বা বিল্ব গাছের প্রাচুর্য দেখলাম না, এখানে এসে তমাল-গাছের ঘনকুঞ্জ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। কালো গাছে পুঞ্জপুঞ্জ কালো পাতা। গাব ফলের মত ফল। মনে পড়ে গেল—

"মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈ—নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়।"

একজন প্রৌঢ় বাবাজী আছেন, আলাপ হল। একখানা মাটির কুটীর ; তার ভিতরে দেওয়ালে কয়েকখানা ছবি ; বিল্বমঙ্গল সম্বন্ধে নানারকম কথা হল, তাঁর কাছে সব শোনা গেল। সরল মানুষটি বললেন—পঁচিশ বছর আছি এখানে। চেষ্টা করছি বিল্বমঙ্গল ঠাকুর সম্বন্ধে তথ্য জানতে। এই যে অজয় দেখছেন এ অজয় বর্ষার জলে ভেসে যায়, এক-একবার ভাসিয়ে নিয়ে যায় এ সব জায়গা, বড় বড় সাপ ভেসে আসে, গাছে উঠে থাকতে হয়।

বিল্বমঙ্গল দেখে ফিরে আসতে-আসতে বেলা দুপুর। আসবার পথে মেলাটা একটু ভাল করে দেখে এলাম। তাঁতের কাপড়, মটকা কাপড় প্রচুর উঠেছে, আর উঠেছে পাকা কলা, বিরাট-বিরাট কাঁদি অজস্র। শ্বেত পাথরের জিনিস সব সস্তা। নানান রকমের পাখি এসেছে, বিক্রী হবে। এ ছাড়া বিদেশী দ্রব্য। এদিকে এসে দেখি আমাদের খেতে বসবার ব্যবস্থা হচ্ছে। তার পরই নাকি রওনা দিতে হবে।

পথে আছে ইলামবাজারের মন্দির ; সবারই দেখে যাবার ইচ্ছে। জমিদার-বাড়ির সভাখানা। কাছেই কুয়ো। গেলাম হাত-মুখ ধুতে। অমনি ঘুরে আসা গেল ভিতরটা—জমিদারের ঠাকুরবাড়ি। কৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্তি। রাম-লক্ষ্মণ-সীতার মূর্তি। সুন্দর বিগ্রহ। বহুমূল্য পোশাক-পরিচ্ছদ, কত রকম

অলংকার। কাছে গিয়ে দেখি কাপড়ের বিড়ার উপর কালো কালো পাথর—সারি সারি সব শালগ্রাম শিলা। শুনলাম, মানত ক'রে ফল পেয়েছে যারা, শালগ্রাম শিলাগুলি তাদের দান।

সঙ্গী আমাকে চুপি-চুপি বললেন—ভগবানের বিবেচনা আছে, সবার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলে এতদিনে ঘরটা শালগ্রাম-পাথরে ঢাকা পড়ত যে।

খেতে বসে মনটা খারাপ হয়ে গেল। ধূলোটি না দেখে যাচ্ছি! গুম হয়ে আছি, শ-দা বুঝলেন, কোন্‌খান থেকে ঘুরে এসে চুপি-চুপি বললেন—বাউল-বোষ্টমদের মচ্ছোব হচ্ছে, কাউকে জানিয়ো না, চলে এসো। বেঁধে-ছেঁদে রওনা হতে ঘণ্টাখানেক আরো' দেরী। এর মধ্যে একবার ঘুরে আসি গে।

চুপ ক'রে শ-দার সঙ্গে বেরিয়ে এলাম। প্রেমদাস বাবাজি, মনোহরদাস বাবাজি, সবার আখড়া, বড়-বড় পাকা বাড়ি। উল্টো দিকে নদীর তীরে বাঁশের বাখারি দিয়ে ঘেরা খাবার জায়গা। স্তূপীকৃত সব রান্না। দেখতে-দেখতে খাবার জায়গায় এসে দাঁড়ালাম। বাঁশের বাখারির বাইরে দর্শকদের ঠাস বুনোট। ভিতরে ঢুকব সাধ্য কী। যাঁরা পরিবেশন করছিলেন একজন শ-দার পরিচিত। ভাগ্যক্রমে তাঁরই সঙ্গে শ-দার চোখাচোখি হয়ে গেল। হাতের ইসারায় ডাকলেন। শ-দা বললেন—অভেদ্য ব্যূহ।

তিনি হেসে একটু এগিয়ে এলেন। বললেন—"ওদিকে যান, ও কোণটা একটু ফাঁকা আছে, বাউল-বোষ্টম ভিন্ন অন্যের ঢোকা নিষেধ।"

এ কাঠরায় শ' তিন-চারেক লোকের বৈঠক সবে বসেছে। ওপাশে শ' তিন-চার লোকের বৈঠকে পায়েস-মিষ্টি দেওয়া চলছে। কলকাতা থেকে সেবাব্রতীরা এসেছেন, স্থানীয়ও কত আছেন, শৃঙ্খলার সঙ্গে পরিবেশন চলেছে—ভাত-ডাল, ভাজা, তরকারী, চাটনী, পায়েস-মিষ্টি। পরিচিত ভদ্রলোক এক ফাঁকে শ-দার কাছে এসে দাঁড়ালেন, বললেন—তিন দিন এমনি চলে। বারোটা থেকে সূর্যাস্ত অবধি বাউল-বোষ্টমদের আহার হয়, তার পরে আছে সাধারণের ভিড়। রাত ন'টা অবধি এমনি চলে।

যে-দলের খাওয়া শেষ হয়ে এসেছিল সে-দল সুন্দর সুরে কী একটা কলি গাইতে লাগল। একজন প্রথম একটি কলি গেয়ে দিচ্ছে, ধুয়ো টেনে উঠছে সবাই। জোরে নয়, মৃদুমন্দ সুরের ধুয়ো, একটু উঁচু, একটু নীচু, কখনো-বা স্থির মধ্যম। চমৎকার মিলিত সুরের ধুয়ো, কান পেতে শুনতে ইচ্ছে করে। শ-দা সঙ্গীতজ্ঞ, বলে উঠলেন—ঠিক যেন বেদের সূক্ত গাইছে, সেই সুর সেই লয়…।

কান পেতে শুনলাম। গান থামল, পাতা হাতে উঠে দাঁড়াল সবাই, সার বেঁধে বেরিয়ে গেল একে-একে। আর এক দল এসে ঢুকল। শ-দা বললেন—এবার চলো, ট্রাকের হর্ণ বাজছে।

পরিচিত ভদ্রলোকটিকে বিদায় নমস্কার জানাতে তিনি অবাক হয়ে গেলেন—

"চলে যাচ্ছেন! সন্ধ্যে লাগতেই যে ধুলোট আরম্ভ হবে, না দেখেই যাবেন? সম্পূর্ণ কেন্দুলি মেলা দেখতে হয় পৌষ-সংক্রান্তি থেকে আরম্ভ করে তিন দিন। মেলা ভাঙতে অবশ্য চার-পাঁচ দিন লেগে যায়। তবে আজ ধুলোট হলেই কাল বাউল-বোষ্টম সব চলে যাবে।"

শ-দা বললেন—"কাল আমাদের ছুটি নেই, যেতেই হবে।"

যেটুকু দেখলাম আর যা রইল অদেখা, তারই দুঃখ-আনন্দে হৃদয় রইল ভ'রে; ছেড়ে চললাম জয়দেবের দেশ।

বিবিধ

গত ১০ই ডিসেম্বর সিংহসদনে মানবাধিকার-দিবসের অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবেই উদ্‌যাপিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের বাণী ও সংগীতের সঙ্গে বিভিন্ন দেশের জাতীয় সংবিধানের প্রাসঙ্গিক ধারাগুলির পঠন ও আলোচনা ছিল এ-সভার প্রধান কৃত্য সভার শেষে 'জনগণমন' গানটি গীত হয়েছিল।

* * *

নূতন অতিথিশালার কাজ শুরু হয়েছে। ৩২ জন লোক ধরে এমন ব্যবস্থা আছে। আগে চিঠি লিখে ম্যানেজারের সম্মতিলাভ-সাপেক্ষ। ভারতীয় ও য়ুরোপীয় দু'রকম খাবারই পাওয়া যাবে, যথাক্রমে মূল্য তার দিনপিছু ৫৲ ও ৬৲ টাকা। একটাকা ভাড়া হচ্ছে হলে, দু'টাকা এক-একটি কক্ষে।

* * *

আমেরিকা থেকে তিনজন সাহেব-শিক্ষার্থী এসেছেন। ভারতীয় বিদ্যা, বিশ্ব-সংস্কৃতি ও দর্শনাদি তাঁদের শিক্ষার বিষয়। ২০।১১।১৯৫১

গত জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর অবধি অতিথিশালায় ৬৮০ জন অতিথির সমাগম হয়েছিল। তার মধ্যে সিংহল, পাকিস্থান, নেপাল মরিসাস, জাপান, চিলি, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা থেকে সমাগত অতিথি ছিলেন সত্তরজন।

* * *

পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন-প্রধানমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ গত সেপ্টেম্বরে শান্তিনিকেতনে

এসেছিলেন। তিনি আশ্রমের বিভিন্ন বিভাগ ও শ্রীনিকেতনের কার্যাদি পরিদর্শন করেন। তাঁর নিজের কার্যস্থল বলরামপুরের বুনিয়াদি-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিতে কিভাবে কাজ হচ্ছে, সে বিষয়ে শ্রীনিকেতনের কর্মিগণের এক সভায় কিছু বলেন। ২৫।১১।১৯৫২

অতিথি-অভ্যাগতদের সংখ্যা প্রতিবারই এসময়টায় বাড়তে থাকে। দলের পর দল আসছে যাচ্ছে। মেয়েদের আগ্রহও কম নয়। ইতিমধ্যে সেদিনই একদল এসে গেলেন—তাঁরা কোনো কলেজের ছাত্রী হবেন।

বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে গত ৩রা ডিসেম্বর, বুধবার আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত মশায়ের আগমন উল্লেখযোগ্য। রাস্তার মোড়ে এখানে-সেখানে পুলিশের অবস্থিতি বিশেষ ক'রেই রাজপুরুষের মহিমা ঘোষণা করছিল। রাষ্ট্রপ্রতিনিধি মিঃ বোল্‌জের কন্যা বর্তমানে বিশ্বভারতীর ছাত্রীরূপে শান্তিনিকেতনে বাস করছেন। ১৩।১২।১৯৫২

মধ্য-বয়সে, আশ্রমের বহুদিনের পরিচারক টাটাভবনের পাচক পঞ্চানন অকস্মাৎ মারা গেল। কত দেশ-বিদেশের লোক একে জানত; বিশেষ করে তার সেবা ও স্বভাবের জন্য সকলেই তাকে ভালোবাসত। সে ছিল আশ্রমের প্রথম দারোয়ান ভুবনডাঙার 'দ্বারিক ডোমে'র নাতি। ১৯।২।১৯৫৩

সম্প্রতি বিখ্যাত বেহালাবাদক শ্রীযুক্ত বি ভি যোগ শান্তিনিকেতন-আশ্রম-পরিদর্শনে এসেছিলেন। ত্রিশে নভেম্বর তিনি রাত ন'টা থেকে একটা-দেড়টা অবধি সংগীত-ভবনের স্টেজে বেহালা শোনান। সেদিন নোটিশ দিয়ে সভা আহ্বান করবার সময় ছিল না। কিন্তু যোগের অপূর্ব বাজনার কথা পরদিন শ্রোতাদের মুখে-মুখে ছড়িয়ে পড়ে এবং পয়লা তারিখ সিংহসদনে প্রকাশ্য-সভায় শ্রীযুক্ত যোগ বাজনা শোনালেন। ২রা ডিসেম্বর বিদ্যাসাগর-কলেজ-টীমের সঙ্গে শান্তিনিকেতন-আশ্রম-টীমের প্রীতি-সম্মিলনী ক্রিকেট-খেলা হয়। বিদ্যাসাগর-কলেজ চল্লিশ রাণে শান্তিনিকেতন-টীমকে পরাজিত করে। ৩রা ডিসেম্বর—শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয়ের জন্মদিবস। ভোরের বিহগ-কাকলির সঙ্গে-সঙ্গে আশ্রমের বৈতালিক দল গান গেয়ে দিনটিকে স্বাগত জানালেন প্রতিবারের মতো। তারপরে ছাত্র-ছাত্রীগণ তাঁদের "মাস্টার মশাই"কে প্রণাম দিয়ে এলেন। কলাভবনে "নন্দন"-গৃহে শ্রীযুক্ত বসুর চিত্র-প্রদর্শনী হল। মস্কোর ভারতীয় রাজদূত শ্রীযুক্ত কে, পি, এস, মেনন সম্প্রতি শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে এক পত্রে জানিয়েছেন যে, আমি মস্কোতে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত এবং হাঙ্গেরীতে মন্ত্রীর পদে নিয়োজিত হয়েছি। বুডাপেস্টে

বাসকালে আমি জানতে পারলাম যে, আপনার পিতা ১৯২৬ সালে এখানকার লেক-বালাটন-স্যানাটরিয়ামে কিছুদিন তাঁর হৃদ্‌রোগের চিকিৎসার জন্ম ছিলেন। সেখানে তিনি একটি বাতাবীলেবু-জাতীয় লিণ্ডেন-গাছ লাগিয়েছিলেন; খুবই আনন্দের বিষয় যে, এখনও বালাটন এবং তার আশে-পাশের গাঁয়ের লোক গাছটিকে শ্রদ্ধার জিনিস বলে শ্রদ্ধা করছে ও যত্ন নিচ্ছে। রবীন্দ্রনাথকে তাঁরা খুবই ভালবাসে। সেই গাছের কিছু বীজ তারা আমাকে উপহার দিয়েছে, আমি তার থেকে কিছু বীজ আপনাকে পাঠালাম। শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ সে বীজ আশ্রমের উদ্যান-বিভাগকে দিয়েছেন এবং গুরুদেবের রোপিত গাছের বীজ থেকে আশ্রমে গাছ সৃষ্টির চেষ্টা চলছে। ১৪।১২।১৯৫৩

* * *

বিশ্বভারতী-লোকশিক্ষার লালদহকেন্দ্রে কিছুদিন আগে বয়স্ক-নারীশিক্ষা বিভাগ খোলা হয়েছে। শ্রীনিকেতন-শিক্ষাচর্চা থেকে ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত দু'জন প্রাক্তন ছাত্রী লালদহে বুনিয়াদী শিক্ষাকেন্দ্রে কাজ করছিলেন, তাঁরাই এ বিভাগ খুলেছেন।

* * *

শ্রীনিকেতনের থেকে উৎসাহ ও সাহায্য পেয়ে শ্রীনিকেতনের সংলগ্ন কয়েকটি গ্রাম একটি পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ ক'রে কয়েকটি রাস্তার উন্নয়ন করেছেন। ভারত-রাষ্ট্রের থেকে শতকরা পঞ্চাশ টাকার মতো অর্থ-সাহায্য পাওয়া গেছে। বাকিটা স্থানীয় গ্রামবাসিগণ কায়িক পরিশ্রমে এবং নিজেদের মধ্যে টাকা তুলে কাজটি সুসম্পন্ন করেছেন। এর মধ্যে কয়েকটি রাস্তা নূতনভাবে তৈরি হয়ে গিয়েছে—কোপাই-আদিত্যপুরের রাস্তা (চার মাইল); সুরুল-শুকবাজারের রাস্তা (এক মাইল); রায়পুর-মিরজাপুরের রাস্তা এবং শ্রীনিকেতন-শান্তিনিকেতনের রাস্তা (এক মাইল)। ২।৬।১৯৫৪

বিনয়ভবন থেকে এবার প্রায় ষাটজন ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষা দিয়েছেন। ভারতের নানা প্রদেশ থেকে তাঁরা এসে থাকেন। শোনা যাচ্ছে, এবার তিনশ' ছাত্র-ছাত্রীর আবেদন-পত্র এসেছে। ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর চাহিদা দিন দিন বেড়ে চলেছে। বিশ্বভারতীর শিক্ষাকেন্দ্রটি আন্তর্জাতিক; তার পঠনরীতির মধ্যেও একটু স্বাতন্ত্র্য আছে। এই বিভাগে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে; বিনয়ভবনে বি-টি ট্রেনিং ব্যতীত কম্যুনিটি-প্রজেক্টের ট্রেনিং-কেন্দ্রও অবস্থিত রয়েছে। গ্রামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষার জন্ম সে কেন্দ্রটি শ্রীনিকেতনে স্থানান্তরিত করার কথা হচ্ছে। ২৬।৬।১৯৫৪

ভারত-গভর্ণমেণ্টের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর পশ্চিমবঙ্গের গভর্ণমেণ্টের সুপারিশে বিশ্বভারতীর শিল্পসদনে বার্ষিক ১৬০০০৲ টাকার একটি সাহায্য ব্যবস্থা অনুমোদন করেছেন। এর দ্বারা গ্রাম্য কুটিরশিল্পগুলির প্রসার ও উন্নতি করা হবে এবং শিল্পসদনের ব্যয়ভারও লাঘব হবে। এছাড়াও ভারত-গভর্ণমেণ্ট শিল্পসদনকে আরো ৩৪,৬০০৲ অর্থ দান করেছেন। এই অর্থে কাঠের কারখানায় কাঠ এবং শিল্পসদনের অন্যান্য কাঁচামাল মজুত করে রাখবার জন্য বাড়ি তৈরি হবে, এবং একটি জিপ-গাড়ি কেনা হবে কাঁচামাল আনা, তৈরি মাল স্থানে-স্থানে দেওয়া এবং শান্তিনিকেতন শ্রীনিকেতন এবং অন্যান্য শিল্পকেন্দ্রের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করা হবে। ৮।৭।১৯৫৪

৭ই জুলাই ঠিক এক মাস আগে ভারত-গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা-বিভাগের উদ্যোগে এবং ফোর্ড-ফাউণ্ডেশনের অর্থানুকূল্যে অল্পশিক্ষিত ও সদ্যশিক্ষিতদের মধ্যে সাহিত্য ও শিক্ষা-প্রসারের প্রচেষ্টায় একদল লোককে শিক্ষা দেবার একটি যে কেন্দ্র শান্তিনিকেতনে খোলা হয়েছিল, এই দিন তার অবসান হল। তার নাম দেওয়া হয়েছিল 'Literary workshop for the eastern zone.' অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন একমাস শান্তিনিকেতনে বাস করে এ জিনিসটি পরিচালনা করে গেলেন। শিক্ষাদান বিষয়টি তিনভাগে ভাগ করা ছিল। প্রথমভাগে বক্তৃতা দিয়ে বিষয়টি বিশ্লেষণ করা, দ্বিতীয়ভাগে লিখবার বিষয়বস্তু সংগ্রহ ও পাঠ্যপুস্তক রচনা, তৃতীয়ভাগে রচনা, সংশোধন করে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা। প্রধানত (Director) পরিচালক মহাশয় এবং তাঁর সহকারী শ্রীযুক্ত মহেশ্বর নিয়োগী ও শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (Assistant Directors) সকাল নয়টা থেকে এগারোটা অবধি এবং বিকেল চারটা থেকে সাতটা অবধি এসব কাজ করাতেন। মাঝে মাঝে বাইরে থেকে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এসে বক্তৃতা দিয়েছেন, তার মধ্যে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র বসু এবং শিল্পী শ্রীযুক্ত রমেন্দ্র চক্রবর্তীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁরা ছবির সাহায্যে গ্রামের সাধারণ-লোকের জীবনযাত্রা দেখিয়েছেন এবং তাদের সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানিয়ে দিয়ে গেছেন যাতে শিক্ষার্থীদের পুস্তিকা লিখতে সুবিধা হয়। দিন পনেরো এমনিভাবে ক্লাস হবার পরে একুশজন ছাত্র-ছাত্রীর প্রত্যেকে এক-একটি বিষয় নিয়ে লিখতে শুরু করেন। কেউ লেখেন পুরানো কাহিনী নিয়ে, কেউবা লেখেন গাঁয়ের কোনো-এক পরিবারের বাস্তব কাহিনী নিয়ে ষোল পাতার মতো ছোট ছোট পুস্তিকা।

প্রতি-সন্ধ্যায় শিক্ষার্থিগণ একটু বিনোদনের আয়োজন করেন এবং জলসা ও কবিগান প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। ১৬।৭।১৯৫৪

*　　　*　　　*

১৯২৪ সালে শান্তিনিকেতনে প্রথম শিক্ষাসত্র (গ্রাম্য বালকবালিকাদের আবাসিক বিদ্যালয়) খোলা হয়েছিল। ১৯২৬ সালে সেটি শ্রীনিকেতনে স্থানান্তরিত করা হয় এবং সেখানে জীবন-কেন্দ্রিক নানা বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হতে থাকে; তারই সঙ্গে সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত একটি এম-ই স্কুলও চলছিল, গ্রামের ছেলেমেয়েরা দৈনিক সেখানে এসে পড়াশুনা করত। সম্প্রতি দুটি শিক্ষাকেন্দ্রকে একত্র করে শিক্ষাসত্র পরিচালনার নূতন পরিকল্পনা চলছে। জন ত্রিশ ছাত্রের বাসোপযোগী একটি হোস্টেল রাখবার কথাও হয়েছে।

*　　　*　　　*

শ্রীনিকেতনে ১৯৩৬ সালে শিক্ষাচর্চা (বর্তমানে বুনিয়াদী শিক্ষকদেরও শিক্ষাকেন্দ্র) খোলা হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-বিভাগ কর্তৃক সেটি স্থাপিত ও অর্থসাহায্য প্রাপ্ত হচ্ছিল; পরিচালনা করছিলেন বিশ্বভারতীর শ্রীনিকেতন পল্লী-সংগঠন বিভাগের অধ্যক্ষ। বর্তমানে সেটিকে বিনয়-ভবনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং তা বিনয়-ভবনের অধ্যক্ষ মশায়ের পরিচালনাধীনে চলছে।

*　　　*　　　*

বিশ্বভারতী থেকে বাঁধগোড়া ও ইলামবাজারে শিল্পকেন্দ্র খোলার জন্য দশ হাজার টাকা মঞ্জুর হয়েছে। এই দুটি নূতন কেন্দ্র নিয়ে বর্তমানে শ্রীনিকেতনের অধীনে নয়টি শিল্পকেন্দ্র রয়েছে।

*　　　*　　　*

দীনবন্ধু স্মৃতি-হাসপাতালের এক লক্ষ টাকা দিয়ে একটি যক্ষ্মা-নিবারণী হাসপাতাল খোলা স্থির হয়েছে। অর্ধেক অর্থ ব্যয় করা হবে গৃহনির্মাণ ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্য; বাকি অর্থে হাসপাতালের ব্যয়ভার বহন করা হবে।

*　　　*　　　*

বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে সম্প্রতি বিভিন্ন বিষয়ে অনেক নূতন গ্রন্থ এসেছে। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গের ডেভেলপমেণ্ট-কমিশনার শ্রীযুক্ত এ. কে. মিত্র ১১৪খানা দুর্লভ ভৌগোলিক অভিধান এবং সরকারী বিবরণী দান করেছেন। কলিকাতাস্থিত আমেরিকার বার্তা-বিভাগও কিছু পুস্তক পাঠিয়েছেন।

*　　　*　　　*

বিশ্বভারতীর বিনয়-ভবন (B. T. College) এবার চতুর্থ বর্ষে উপনীত হল। অল্পদিনের মধ্যেই এ বিভাগটি আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করেছে। এখানকার নানাবিধ শিক্ষাব্যবস্থার সুখ্যাতি শোনা যাচ্ছে। এ বছর ১৯০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে পঞ্চাশটি ছাত্র-ছাত্রীকে গ্রহণ করা হয়েছে; কারণ পরিমিত শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা মাত্র রয়েছে। পঞ্চাশজন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে—ত্রিশ জন (২৪ জন ছাত্র, ৬ জন ছাত্রী) পশ্চিমবঙ্গের; ত্রিপুরা (৩ ছাত্র, ১ ছাত্রী); মণিপুর (৫ ছাত্র); বিহার (৪ ছাত্র); হায়দ্রাবাদ (১ ছাত্র); মাদ্রাজ (১ ছাত্র); দিল্লী (১ ছাত্রী); পাঞ্জাব (২ ছাত্র, ১ ছাত্রী); বৃটিশ ইস্ট আফ্রিকা (১ ছাত্র)।
২৫।৭।১৯৫৪

শোনা যাচ্ছে, বিশ্বভারতীর কর্মীদের মাছ দুধ ঘি প্রভৃতি যাতে বিশ্বভারতীর গোপালন-বিভাগ ও মৎস্য-বিভাগ থেকে সরবরাহ করা যায় তারই একটি পরিকল্পনা চলছে। এটি যদি কার্যকরী হয় অত্যন্ত আনন্দের বিষয় হবে সন্দেহমাত্র নেই। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। একটিকে বাদ দিলে আরেকটি পঙ্গু হয়ে থাকে, জীবনশক্তি হয় অচল। রবীন্দ্রনাথ প্রথম থেকে শেষাবধি ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্যের প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রেখেছেন এবং বারে বারে লেখায় ভাষণে এ বিষয়ে সবাইকে সতর্ক করে দিয়েছেন। মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে শিক্ষালয় গড়ে তোলাই তার একটি বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত। তা ছাড়া ছাত্রদের দুধ জোগাবার জন্য তিনি আশ্রমে এনেছিলেন মুলতানী গাই; ভাতের ফেন অপচয় করা হয় এ তাঁকে ব্যথা দিত। প্রত্যেক বুধবার ছাত্র-ছাত্রীদের ওজন নেওয়া এখানকার এক প্রচলিত নিয়মের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে। জানা যায়, একবার ছাত্রগণ বরাদ্দ খাবারের থেকে চিনি জমিয়ে সে টাকা দিয়ে দেশের সেবা করতে ইচ্ছুক হয়েছিলেন। গুরুদেব তখন বাইরে ছিলেন। খবরটি জানতে পেরে তৎক্ষণাৎ নিষেধ করে পাঠালেন—দেশের সেবা বহুরকমভাবে করা যেতে পারে; স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা করে নয়। শর্করাতে যেটুকু পুষ্টিকরতা আছে তা উপেক্ষা করা অনুচিত। এমনি সজাগ দৃষ্টি ছিল রবীন্দ্রনাথের। শান্তিনিকেতন কেবলমাত্র জ্ঞানচর্চা শিল্পচর্চার কেন্দ্র নয় শরীরচর্চা বিশেষরূপে সাধিত হবে—এটি ছিল রবীন্দ্রনাথের কাম্য। আজকাল ভেজাল দুধ ঘি ও চালানি মাছ খেয়ে দেশের লোকের অর্থ ব্যয় হচ্ছে কিন্তু স্বাস্থ্যের অবনতি ভিন্ন উন্নতি দেখা যাচ্ছে না। স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা আজ আমাদের জাতির প্রধান কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষেরও সেদিকেই নজর পড়েছে বিশেষরূপে। বিশ্বভারতী তার ছোট্ট ক্ষেত্রে যদি মাছ দুধ প্রভৃতি সরবরাহ

করতে সক্ষম হন তবে নির্ভেজাল দুধ ও ঘি জ্যান্ত মাছ পেয়ে আশ্রমিকগণ যথেষ্ট উপকৃত হবেন এবং বিশ্বভারতীর গোপালন-বিভাগ ও কৃষি মৎস্য প্রভৃতি বিভাগগুলি উন্নততর হবার সুযোগ পাবে। সমস্ত দেশেও এমনি একটি দৃষ্টান্ত উৎসাহ জোগাবে,—ছোট ছোট কেন্দ্রে ভাগ করে মাছ দুধ কৃষি প্রভৃতি নিজেদের মধ্যে সরবরাহ করতে।

* * *

'শিক্ষা সমিতি'র অনুমোদনক্রমে বিশ্বভারতীতে কয়েকটি নতুন শিক্ষা-বিভাগ খোলা হয়েছে। ইতিহাস ভূগোল অর্থনীতি ও রাজনীতি প্রভৃতি সবই একটি বিভাগের অন্তর্গত ছিল। এখন সেখানে দুটি বিভাগ করা হয়েছে—একটি ইতিহাস ও ভূগোল বিভাগ; অন্যটি রাজনীতি ও অর্থনীতির বিভাগ।

* * *

সংগীতভবনে ক্ল্যাসিক্যাল সংগীত, রবীন্দ্র-সংগীত ও নৃত্য—এ তিনটিকে দুইটি বিভাগে ভাগ করা হয়েছে—একটি রবীন্দ্র-সংগীত ও নৃত্য বিভাগ এবং আরেকটি হচ্ছে ক্ল্যাসিক্যাল সংগীত ও যন্ত্র-বিভাগ। ভারত-সরকারের শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য-মন্ত্রীর দ্বারা অনুমোদিত বিশ্বভারতী শিল্পকেন্দ্র শান্তিনিকেতনের পার্শ্ববর্তী ভুবনডাঙা, সুরুল ও লালদহ গ্রামে সম্পূর্ণভাবে গঠিত হয়েছে। লালদহ এবং সুরুল গ্রামের শিল্পকেন্দ্রের জমি লালদহ পল্লীসংস্কার-সমিতি ও শ্রীভূধর মুখার্জি দান করেছেন। ইলামবাজার ও বাঁধগোড়া শিল্পকেন্দ্রের জমি দান করেছেন আশ্রমের প্রাক্তন-ছাত্র শ্রীযুক্ত শিবদাস রায়ের স্ত্রী শ্রীযুক্তা অন্নপূর্ণা রায় এবং শ্রীযুক্ত কালীপদ মণ্ডল। ভুবনডাঙা কেন্দ্রের জমি বিশ্বভারতীর নিজস্ব। বর্ষা শেষ হলেই বাঁধগোড়া ও ইলামবাজার শিল্পকেন্দ্রের গৃহনির্মাণ শুরু হবে। ১৬।১০।১৯৫৪

ছুটির মধ্যে বিশ্বভারতী য়ুনিভারসিটির অতিথিশালা সাধারণভাবে বন্ধ থাকে। বাইরের আগন্তুকদের জন্য সেখানে কোনো আয়োজন থাকে না; কিন্তু অফিসের কাজকর্মে সরকারী-কর্মচারীদের আনাগোনা অবিরতই চলে এবং তার জন্য অতিথিশালাতেও বন্ধের সময় কিছু ব্যবস্থা চালু রাখতে হয়। বিশেষ করে শ্রীনিকেতনে নানা সরকারী সংস্থার যোগ রয়েছে, তাই এই দায়িত্ব আরও বেড়েছে। বিশ্বভারতীর নতুন অতিথিশালাটি আশ্রম থেকে কিছু দূরে অবস্থিত বলে অনেকের মনে এই ধারণা জাগে যে, এটি বুঝি স্বতন্ত্র ব্যবস্থায় চলে। বস্তুত তা নয়। এটি সর্বতোভাবে বিশ্বভারতীরই নিজস্ব প্রতিষ্ঠান। য়ুনিভারসিটিই এর পরিচালক। গ্রীষ্মাবকাশ ও পূজাবকাশ ভিন্ন আর সবসময়ই এটি খোলা থাকে।

একটানা তিনদিন থাকা যায়। বিশ্বভারতীতে আরেকটি অতিথিশালা আছে—'রতন কুঠি' বা 'টাটা বিল্ডিং'। পরলোকগত রতন টাটা বিশেষ করে বৈদেশিক অতিথিদের বাসের জন্য এই ভবনটি প্রতিষ্ঠার্থে অর্থ দান করেছিলেন। এখন বিদেশী অতিথি ছাড়াও প্রয়োজনস্থলে অফিসিয়াল অতিথিদের এখানে থাকবার ব্যবস্থা করা হয়। আশ্রমে ঘরবাড়ির অভাব এখনও মেটেনি। পুরোনো পান্থশালা'টি সেজন্য কর্মীদের সাময়িক আবাসস্থলরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। ১৮।৬।১৯৫৫

আমাদের দেশে প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতির নানাবিধ দোষত্রুটি বহুদিন থেকে দেশের চিন্তাশীল ও মনীষী ব্যক্তিদের দ্বারা আলোচিত হয়ে আসছে। দেশ ছিল পরাধীনতাপাশে আবদ্ধ, জাতি শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ পরিবর্তন সাধন করতে পারেনি। ভারত স্বাধীন হবার পর থেকে দেশের লোকের বিশেষ দৃষ্টি পড়েছে এই দিকে। কোন্ শিক্ষা-পদ্ধতিতে দেশের আর্থিক, সামাজিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি সাধন হতে পারে, সে সম্বন্ধে ভারত-সরকার সচেষ্ট হয়ে উঠেছেন। নানারূপ চিন্তা হচ্ছে, পরিকল্পনা ও তথ্যানুসন্ধান চলছে। ভারত-সরকার কর্তৃক নিয়োজিত মুদালিয়র-কমিশন, আন্তর্জাতিক-কমিশন, ইউনিভারসিটি-কমিশন, ভারত-সরকারের উপদেষ্টা পর্ষৎ (Advisory Board) প্রভৃতি বহু দল শিক্ষাক্ষেত্রসমূহ পরিদর্শন ও দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে শিক্ষা-পদ্ধতির পরিবর্তনে অগ্রসর হচ্ছেন। সম্প্রতি কেন্দ্রীয়-সরকারের একটি পরিকল্পনা বিশ্বভারতী গ্রহণ করেছে। সেকেণ্ডারী এডকেশন পদ্ধতির উন্নতির প্রচেষ্টায় সেকেণ্ডারী স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণকে কার্যরত অবস্থাতেই একটা বিশেষ ট্রেনিং (Extension Service Training) দেবার ব্যবস্থা পরিকল্পিত হয়েছে। ১৯৫৪ সনের ২:শে নভেম্বর হায়দ্রাবাদে যে ট্রেনিং-কলেজ সম্মেলন হয়েছিল তাতেই প্রথম এই পরিকল্পনা উত্থাপিত হয়। পরে কাশ্মীরে শ্রীনগরে যে শিক্ষামন্ত্রী-সম্মেলন হয় সেখানে সে পরিকল্পনাটি গৃহীত হয়। হায়দ্রাবাদ-সম্মেলনে বিশ্বভারতী বিনয়ভবনের অধ্যক্ষ শ্রীসুনীলচন্দ্র সরকার যোগদান করেন এবং কাশ্মীর সম্মেলনে শ্রীযুক্ত সরকার ও বিনয়ভবনের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত সরকার এই ট্রেনিং-কমিটির মেম্বর ও সাব-কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। পূর্বোক্ত পরিকল্পনাটি অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল অব সেকেণ্ডারী এডুকেশন থেকে গৃহীত হয়েছে। চাব্বশটি ট্রেনিং-কলেজে এই সেকেণ্ডারী স্কুলের In-Service Training কেন্দ্র খোলা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে, বিশ্বভারতীর বিনয়ভবনে তারি একটি কেন্দ্রের কাজ চলেছে। এই ট্রেনিং দেওয়ার উদ্দেশ্য শুধু শিক্ষক-শিক্ষিকাগণকে আধুনিক

শিক্ষাধারার সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল রাখা নয়, বিভিন্ন স্কুলের প্রতিদিনের নানাবিধ অসুবিধা ও সমস্যা প্রভৃতির আলোচনা ও সে সব দূরীকরণের চেষ্টা করা, সামাজিক মেলামেশা, সাংস্কৃতিক চিন্তাধারার আদানপ্রদান প্রভৃতি বহুবিধ কার্যসূচী নির্ধারিত হয়েছে। একটি বছর ধরে প্রতি-রবিবারে এই ট্রেনিং নিতে হবে। সম্প্রতি দশ-বারোটি স্কুলের থেকে প্রায় একচল্লিশজন হিন্দু-মুসলমান শিক্ষক-শিক্ষিকা বিনয়ভবনে একত্র হন। সরকার থেকে আসা-যাওয়া, থাকা-খাওয়ার ব্যয় বহন করা হয়ে থাকে। রবিবার এঁদের আগমনে বিনয়ভবনে কর্মব্যস্ততার অন্ত থাকে না। -নিয়াদী শিক্ষা-বিভাগ ও বি-টি বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীগণের সঙ্গে অল্প সময়ের মধ্যে এঁদের ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হয়েছে। এবারকার বিনয়ভবনের বৃক্ষরোপণ-উৎসবে এঁরা অংশগ্রহণ করেন। দূর গ্রামাঞ্চলের স্কুলের শিক্ষকগণ এই উৎসবটি দেখে ও অংশ গ্রহণ করে আনন্দলাভ করেছেন। সেদিন In-Service Training-এর সোশ্যালএক্টিভিটি-ক্লাসে বোলপুরের জনৈক শিক্ষক একথাই বলেছিলেন,—বিশ্বভারতী আজ বিশ্বকে যেমন তার শান্তিনিকতনে ডেকেছে, তেমনি তার অতি-কাছের অতি-নগণ্য স্কুলগুলিকেও অস্বীকার করেনি, বরঞ্চ আপন ব'লে নিজের মধ্যে টেনে নিয়েছে। তার শিক্ষাকেন্দ্রের মধ্যে শিক্ষকদের ডেকে এনে তার উচ্চতর শিক্ষা ও সংস্কৃতির আদর্শ দেখবার, বুঝবার ও গ্রহণ করবার সুযোগ দিয়েছে; আবার বিভিন্ন স্কুলে গিয়ে তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবার পন্থাও গ্রহণ করবেন বলে জানিয়েছেন। শিক্ষকগণ নিছক শিক্ষকই রইলেন না, তাঁরাও ছাত্রের মতোই নূতন নূতন জিনিস শিক্ষা পেতে-পেতে শিক্ষা দেবেন। শিক্ষাদানের কাজটি এভাবে হয়ে উঠবে প্রাণবান।

* * *

পঁচিশে সেপ্টেম্বর বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনজন প্রতিনিধি চীনগামী প্রতিনিধিদলে যোগ দিয়ে চীন যাত্রা করেছেন: বিদ্যাভবনের-অর্থনীতি বিভাগের টমাস বাটা-অধ্যাপক ডঃ শ্রীকরুণাময় মুখোপাধ্যায়; এম-এ পরীক্ষার্থিনী শ্রীমতী অম্বুলু, জাতিতে মাদ্রাজী, তাঁর পিতা মিঃ আয়ারস্বামী বহুদিন যাবত শান্তিনিকেতনে কাজ করছেন, অম্বুলু বিশ্বভারতী থেকেই পরীক্ষা পাশ করেছেন। বাংলাভাষায় তিনি সুদক্ষ, চীন ভাষাও জানেন; শ্রীমান কল্যাণ সরকার ইতিহাসে স্কলারশিপ পেয়ে গবেষণারত আছেন। ৩০।৯।১৯৫৫

* * *

সম্প্রতি আশ্রমে একটি আন্তর্জাতিক-বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে। আশ্রম-অধিবাসী শ্রীযুক্তননীভূষণ গুপ্ত মহাশয়ের (শ্রীক্ষিতিমোহন সেন মশায়ের শ্যালিকার) একমাত্র

পুত্র শ্রীঅজয় গুপ্তের সঙ্গে ব্রিস্টলঅধিবাসিনী শ্রীমতী জিনের বিবাহ ১৫ই জানুয়ারী শনিবার সন্ধ্যাবেলা তাঁদের পূর্বপল্লীর বাসভবনে অনুষ্ঠিত হয়। আশ্রমের বহুলোক এবং শ্রীযুক্তা প্রতিমা দেবী ও শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। ডঃ সরোজকুমার দস মশায় ঐ উৎসবে পৌরোহিত্য করেন। অনুষ্ঠান-শেষে তিনি নব-দম্পতিকে আশীর্বাদ করে বলেন,—আমাদের দেশে দু'টি নদীর ধারা এসে যেখানে মিলিত হয়েছে, সে সংগমস্থলটিই পুণ্যতীর্থরূপে গণ্য হয়েছে। দুটি বিভিন্ন হৃদয় যখন এক হয়ে মিলিত হয়, তখন সে যে এক পরম মিলন, সুতরাং, এই বিবাহ অনুষ্ঠানটি আবহমানকাল পরম পবিত্র বলে গণ্য হয়েছে। সুখে-দুঃখে বহু কর্মে ও সাধনায় দুটি অচেনা মানুষ চির-চেনা হয়ে জীবন-ব্রত সমাধা করে চলবে—বিবাহিত জীবনে সেই দায়িত্ব ও পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ থাকবে এটাই কাম্য।
২০।১২।১৯৫৫

সংকটাকীর্ণ সভ্যতার নানা দুর্লক্ষণ দেখেও, পৃথিবী ছেড়ে যাবার মুখে রবীন্দ্রনাথ দেউলে-মানুষের জন্য রেখে গেছেন একটি সম্পদ—সে হচ্ছে দুর্গত এই অসম্পূর্ণ মানুষের উপরেই অপরিসীম এক সুদৃঢ় আস্থা; মানুষ ভুল করে, অন্যায় করে—কিন্তু শুধ্‌রে নেবার শক্তিও আছে সেই মানুষেরই মধ্যে। সেই শক্তিটার দিকে মানুষকে সচেতন ও সক্রিয় ক'রে তোলাই সব দুর্ঘটনার পরবর্তীকালের প্রধান কাজ,—যা হিতৈষী মাত্রেরই কর্তব্য। রবীন্দ্রনাথও সেই কর্তব্যই করে গেছেন এই তাঁর অমর বাণী রেখে গিয়ে যে, আমরা নেমেছি বটে, কিন্তু আমরা উঠতেও পারব। ঘটনা যতই লজ্জা ও দুঃখজনক হোক, মনে রাখতে হবে, এই ঘটনাই এনেছে রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠানের সম্মুখে রবীন্দ্রনাথের সেই শেষ আশার অমোঘ দাবী। অন্যায় ঘটেছে, কিন্তু সে অন্যায় করার শক্তির মুখ ঘুরিয়ে দিয়ে ন্যায়েতেই নিয়ে তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এজন্য চাই বীর্যবন্ত সুব্যবস্থা।—গ্রহণ করা চাই তাকে পারস্পরিক সহানুভবতার ভিত্তিতে। যথোচিত ব্যবস্থার অভাবই মাত্র সূচিত হয় সমস্ত অন্যায়-অসংগতির জমাটরূপধরা আকস্মিক এক-একটা দুর্ঘটনায়। অধিকাংশ মানুষই অস্থিরচিত্ত হয়ে বকাবকি মারামারি করে মরে,—অনির্দিষ্ট নানা *টিনাটি নিয়ে। কিন্তু, রবীন্দ্রনাথের কথাই এ স্থলে আমাদের বুদ্ধিকে ব্যবস্থিত হতে সাহায্য করতে পারে। বহুদিন আগেই তিনি বলেছিলেন, বিবাদ ক'রে ঘুষোঘুষি ক'রে ঘরের অন্ধকার দূর করা যায় না, একটি আলোকশিখা এনে ধরো', নিমেষে সবেরই সুরাহা হয়ে যাবে। যে কাজের জন্য যে জিনিসটির দরকার, সেই জিনিসেরই মাত্র সুষ্ঠু ব্যবস্থা চাই। এক্ষেত্রেও তেমনি চাই সহানুভূতির সঙ্গে

বুদ্ধিব্যবস্থার সুপ্রয়োগ। যে-যে স্থলে তা বিকল হয়ে গেছে সে-সে স্থলে চাই সে বুদ্ধি ও ব্যবহারকে সারিয়ে নেওয়া। কোনো ব্যবস্থা সাময়িক সমাধান আনতে পারে, কিন্তু চাই আমরা স্থায়ী ও মহত্তর সমাধান। তার কথা আরো উপরে যায়—মানুষকে স্বাঙ্গীকরণে।—এজন্যই বলা হয়ে থাকে—'পাপকে ঘৃণা কোরো পাপীকে নয়।' স্পর্শমণি রয়েছে আমাদের চেতনার সামনে,—রবীন্দ্রনাথের বাণী; তিনি বলেছেন,—আমার কালে বাপে-খেদানো মায়ে-তাড়ানো দলের ছেলেদের নানা উৎপাত আমি সয়েছি, তাড়াবার কথা ভাবতে পারিনি; সুখের বিষয়, তারাও শেষ পর্যন্ত আমাকে হতাশ করেনি। অর্থাৎ মানুষের ত্রুটির শক্তিকেই তিনি বড় করে দেখেন নি, তার কাছে অক্ষমতায় ভীত হয়ে হার মানেন নি। ত্রুটিকে বাস্তবকে সহজভাবে স্বীকার ক'রে মানুষকে তার মহৎ বিকাশের পথে উত্তরিত করে নিয়ে যেতেই তিনি আত্মশক্তিতে তৎপর ছিলেন; সেখানেই তিনি আমাদের চিরশক্তির উৎস হয়ে আছেন। তাঁর পথ ধ'রে আমরাও আজ বলতে পারি—লজ্জা ঘুচাবার চেয়েও বড় গৌরব আছে যে নূতন প্রাণ-সৃজনে, পারস্পরিক সহায়তায় আমরা নেব সে প্রাণসৃজনেরই গুরুদায়িত্ব। বিশ্বের বিবদমান মানবসমাজের মধ্যে নিয়ত চলেছে অসংখ্য সংঘর্ষের অশোভন শত পুনরাবৃত্তি, আর, সেই অন্যায় অসংগতির সামাজিক আবহাওয়ার মধ্যে ছোট বড় সবাই আমরা বর্ধিত হচ্ছি দিনে-দিনে। কিন্তু তারও উপরে সেই বিকল সমাজের পদে-পদে ব্যাহত অভিযাত্রা চলেছে ক্রমিক সুপরিণতিরই আশা ক'রে। শৈশবের অসম্পূর্ণ অবস্থার থেকেই মানুষের জীবনে সে-যাত্রার শুরু, আর, মহান্ লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়ার প্রণালীবদ্ধ অধ্যবসায়ের উপর চলেছে সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সার্থকতা-নির্ণয়—বিশ্বভারতীরও শ্রেষ্ঠ সাধনা তাই; সে সাধনা আরো জটিল, দুরূহ, আরো অব্যবহিত হয়ে দেখা দিল আজকের দিনে এখানেই। এর আহ্বান যেমন সুকঠিন, উত্তর দেওয়া চাই তেমনি যোগ্যভাবে। সহজ নিকাশে এর দায় চুকাতে গেলে পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাত হয়তো হবে দুর্বার ও আরো পঙ্কিলতর হবে এর প্রতিক্রিয়া। বলা যায়, সকল বিশ্ববিদ্যালয়েই দিনে দিনে অর্থ ও মানকে লক্ষ্য ক'রে বিদ্যার চর্চাটাই প্রধান হয়ে দাঁড়াচ্ছিল; জীবনের যোগ থেকে সে চর্চা চলেছিল দূর হতে দূরে সরে। বিদ্যা যে বিনয় দান ক'রেই নিজের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা সম্পাদন করে, সে কথা ভুলতে বসেছিল সকল লোকে। কিন্তু সেই জীবনযোগের মধুর সূত্ররূপ বিনয়চর্চার অপরিহার্যতা এমনি-সব ঘটনাতেই এখন এখানে-ওখানে প্রকট হচ্ছে। ছাত্র, শিক্ষক এবং সাধারণেরও নিকট সেদিকে

অবহিত হবার ডাক এনেছে এই দুর্ঘটনা। বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে কায়মনোবাক্যে প্রকৃত বিনয়ের সাধনা-প্রভাব যদি এখন থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যক্তিজীবনগুলিকে স্নিগ্ধ ক'রে রাখে, তবে প্রীতি ও প্রসন্নতা বাড়বে, বর্বরোচিত অশিষ্টতা সেই পরিমাণেই আত্মগোপনে হবে বাধ্য। ২০।১১।১৯৫৭

মানুষকে ধোঁকা দিতে প্রকৃতি উঠে-পড়ে লেগেছে। মনে করা গিয়েছিল, ছুটিটা কাটবে ছুটাছুটি না ক'রেই। মোটামুটি গরমটা সয়ে-যাওয়ার মতো সীমাতেই আছে—সুতরাং দুর্ধর্ষ প্রকৃতিকে মনে-মনে হার-মানা ভূমিকায় ফেলে, নিজেদের ভাগ্যদেবতাকেই একটু তোয়াজ করা যাচ্ছিল বিশেষ অনুগ্রহের দরাজ পারমিট বিতরণের জন্য। এমন কি উৎসাহের ঝোঁকে সাহসী হয়ে কাগজে-পত্রেও কথাটাকে খবরের পর্যায়ে তুলে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল একটু ফলাও করেই,—কিন্তু কে জানত—প্রকৃতির পরিহাস যে এত নির্মম, আর এমন দুঃসহ হয়ে দেখা দেবে কদিন না যেতেই। সপ্তাহের মধ্যেই ফের উলটো কলমে লিখতে বাধ্য করল সে,—বাঁচি কিসে! হাফ্‌ডে ছুটি, দুধ আম ফুল পাতা, শান্তি-অশান্তি—সব উঠল শিকেয়, পথ দেখ্‌ছিনে—পালাই কোথা। সকালটা একরকমে কাটে, দুপুরে যেন বিছুটি লাগে গায়ে,—কাঁকড়াবিছের কামড়ও বোধ হয় ভালো। একনাগাড়ে খরা চলেছে প্রখরতাপে। জ্বলুনির চেয়ে পুড়ুনি ভালো কিনা,—এই পড়ছে মনে। ভূমির বীরত্বের কথা আর ভুল হবার নয়। এখানে অসময়ে শান্তিস্নিগ্ধতার সুর ভেঁজে জানা ছিল না যে প্রকারান্তরে প্রকৃতির রাজ্যে সিডিসন প্রচার হয়ে যাচ্ছিল। ক'দিন যা হাল হল, তাতে না বলে উপায় নেই যে জমানা বদলায়নি, দোর্দণ্ড প্রতাপের পাট ঠিকই আছে, এটা যে বীরভূমের গরমের দিন, মর্মে-মর্মে তা বোঝা যাচ্ছে—যদিবা কারো সন্দেহ থাকে, সন্ধ্যায় হাঁফ ছেড়ে, যদি সে ধারণার ধাক্কাটাকে কেউ সরিয়ে দিতে চায়, তখনো কি ত্রাণ আছে? সভাসমিতি আর সার্কাসের মাইক ছুটে এসে কান ফাটিয়ে বাজিয়ে দিয়ে যাচ্ছে কালোচিত ব্যঞ্জনায় জ্বালাধরানো হাঁক। খোলমাদলের টুং-টাং-কে পিছু হটিয়ে ঠিকই চলছে কালের লাগসই কলের প্রচার। দুর্দম এই নিদাঘের কাছে মাথা নত ক'রে এখন শুধু এই বলা,—ঢের হয়েছে, আর দাগা না দিয়ে, দেবতা, এবার একটু প্রসন্ন হও, দু'এক পশলা ছিটেফোঁটা কৃপাবারি বর্ষণে, তোমার ছা-পোষা প্রাণীদের প্রাণে রক্ষা করো। তাতে মান বাড়বে বই কমবে না। আর, রাগে-ঢিলে মিলেই তো চলছে রাজ্যের খেলা।—জানিনে, দুদিন বাদেই আবার বানভাসি বা দার্জিলিং-এর আবহাওয়া পাবার খবর লিখতে হবে কিনা,—

প্রকৃতির যা মর্জি।—যেদিকে হোক ক্ষেপলেই হল। সুতরাং, বেশি কিছু না বলাই ভালো।

* * *

আম খাওয়া গেল এবার,—গুরুদেবের বাড়ির। উল্লেখযোগ্য হত না আর-কোনো জায়গার হলে,—কিন্তু এ আম হচ্ছে উত্তরায়ণের। ল্যাংড়া, বোম্বাই, ক্ষীরসাপাতি, বাদামফুলি,—তালিকা ফুলিয়ে লাভ নেই, কেবল ক্ষোভ বাড়ানো হবে অনেকের, কেননা অনেকেই ফললাভে বঞ্চিত আছেন, খবরও পাননি অনেকে। দু'চার ঝুড়ি যা হয়েছিল, তা উড়ে গেছে খবরের আগেই। তবু, এ খবরটাই দেবার মতো সে ফল ধরেছে। সে ফল শুধু দেশের নয়, বিদেশেরও। এবং মরুর মাটিতেও জরুর যে ফল ফলাবার স্বপ্ন নিয়ে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের বাগান সাজিয়েছিলেন, এতদিনে তার বাস্তব সফলতা প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে। 'শ্যামলী'র আশেপাশের গাছগুলি ভরে দিচ্ছে ডালা। আজ এ ফল খেতে গিয়ে মনের চোখে ভেসে উঠেছে সেই ছবি, সকালের পায়চারমুখে—নাগালের ডাল থেকে হাত বাড়িয়ে কবি ছিঁড়ে নিচ্ছেন একটি আমের কড়া, সেটিকে আঙুলের জোরে দু'খণ্ড করে মুখে ফেলে দিলেন শিশুর মতো আনন্দে,—কিনা, বাড়ির গাছের ফল। মর্ত্যের অমৃতরসিক কবিবরের আমের প্রতি যে আন্তরিক একটু টান ছিল, তা তিনি গোপন করেননি—

"বেতের ডালায় রেশমি রুমাল-টানা অরুণবরন আম এনো গোটা কত।" বলেছেন,—"বোধ করি অমৃতে অনটন ঘটে না ব'লেই আমের প্রাত দেবতাদের আহারে লোভ নেই।" কবির আকর্ষণের কারণ?—এই ফলে সব-প্রথমে যেটা মনকে টানে সে হচ্ছে ওর প্রাণের লাবণ্য; এইখানে সন্দেশের চেয়ে তার শ্রেষ্ঠতা। আমের যে বর্ণমাধুরী তা জীববিধাতার প্রেরণায় আমের অন্তর থেকে উদ্ভাসিত, সমস্ত ফলটির সঙ্গে সে অবিচ্ছেদে এক। ...তার সঙ্গে আমের আছে স্পর্শের সৌকুমার্য, সৌরভের সৌজন্য। তারপরে তার আচ্ছাদন উদ্ঘাটন করলে প্রকাশ পায়, তার রসের অকৃপণতা।..."—এমন তাঁর গাছ-পাকা আম তিনি ততটা না খেয়ে যেতে পারুন, বহুবিধ বাধা সংশয় পেরিয়ে এতদিন যে তাঁর ধারাবাহী আশ্রমিক দু'চারজনেরো স্বাদের সম্ভাবনায় এল আজ এই পৌর-ভোগাধিকারের সুযোগ সৃষ্টির জন্য কোন্-ব্যক্তিবিশেষকে ধন্যবাদ দেওয়া যায়,—মূলস্রষ্টা গুরুদেব না তাঁর উদ্ভিদ্-রচনাশিল্পী পুত্র রথীন্দ্রনাথ, না, বর্তমান-মন্ত্রি ব্যবস্থাপক বিশ্বভারতীকে? আপাতত রামবাবুর কথাই মনে পড়ছে, কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি

হয়ে যিনি ডেকেছিলেন অমৃতোৎসবে। রামবাবুর আম-খাওয়ানোর কালোচিত বৈশিষ্ট্য ছিল এইটুকু যে, খেতে হয়েছিল তা দাম দিয়ে। মূল্য দিয়ে এখন মূল্য বুঝতে হচ্ছে মহাকবির অমূল্য সব দানের। তিনি বেঁচে থাকতে, তাঁর দপ্তরের পরিমণ্ডলটি ছিল ছোট; বাগানে ফলপ্রসূ বড় গাছেরও ছিল না প্রাচুর্য, কর্তার কাছ থেকে ভেট যেত আম সেদিন কর্মীদের ঘরে,—বোধ হয়, সে ছিল এক রকমের দাম, তবে সেটা দিতে হত না, নিতে হত—শ্রদ্ধার বিনিময়ে স্নেহ;—অফিসের বিলে তার হিসেব ছিল না, দেনা-পাওনা মিলে যেত দিয়ে-নিয়েই।

* * *

এখানে এইদিনে আমের টানেও টেনে আনছে যাঁর নাম, চিরদিন দেশে-বিদেশে দিলখুশ সবাই তাঁর আরেক অমৃতফলের স্বাদে।—সে-ফল তাঁর সাহিত্য, তাঁর বিশ্বভারতী, তাঁর জীবনবাণী। এই মানস-ফলের উপভোগ্যতার সুযোগও দিন-দিন বাড়ছে এবং বাড়াবার জন্য চারিদিক থেকে আরো ব্যগ্রতা দেখা দেবে। আন্তরিক সেই রস-মহোৎসব ফল-বিতরণের ভার যাঁদের হাতে ন্যস্ত, তাঁরা প্রতিদিনই এখন অনুভব করবেন, বাগান-পরিচর্যা ও পরিবেশনের গুরুত্ব। বোম্বাই, ল্যাংড়া প্রভৃতি মাটির গুণাগুণে এবং চাষেরও রকমফেরে মূল রস-রূপ,—দো-আঁশলা না হয়ে যায়!—তাহলে বিদেশেও আদরে ঘটাবে বাধা।

* * *

রবীন্দ্র-রচনামৃত-ফলের জাতের মৌলীন্য রক্ষা সম্বন্ধে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরও যে ভাবনা ছিল, তাঁর, গানের সুরের উপর 'রোলার চালনা'র উক্তি থেকে সে-ইঙ্গিত মেলে। তাঁর সাহিত্য, কর্ম-প্রতিষ্ঠান এবং জীবনধারা সম্বন্ধেও অবিকৃতির ব্যবস্থা কালের দূরত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে সুষ্ঠুতর হওয়া চাই। এজন্য, সমগ্রভাবে বিশ্ব-ভারতী এবং বিশেষভাবে তার গ্রন্থন-বিভাগ ও 'রবীন্দ্রসদনের' সংগঠন-গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি পাবার কথা। আজ সকলেই একমত যে, রবীন্দ্ররচনার আরো বেশি ভালো অনুবাদ নানা ভাষায়, নানা দেশে বিস্তার লাভ করা আবশ্যক। খারাপ অনুবাদের জন্য কবিরও নাম খারাপের আশঙ্কা থাকে। মূল রচনা যে বাংলা ভাষায় রক্ষিত, অনুবাদ প্রচারের মতোই সেই বাংলা ভাষায় অনুশীলনও বিদেশে বাড়াতে হবে, কারণ, তাহলে আরো সহজে সোজাসুজি খাঁটি আস্বাদনের সৌভাগ্য লাভ করবে অ-বাঙালী বিশ্বজন। রাশিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া সেই

পথ-ই ধরেছে। কিন্তু ইতিমধ্যে অবহিত হবার কাজ রয়েছে রবীন্দ্র-রচনাবলীর বিশুদ্ধ পাঠযুক্ত সুসম্পাদিত সংস্করণ তৈরীর ক্ষেত্রে। দেশে-বিদেশে মূল রচনার খোঁজখবর যখন বাড়বে, তখন বিশ্ব-সুধীসমাজের সম্পাদনা-মানের তুলনায় রবীন্দ্র-রচনাবলীর পরিবেশনও যাতে রুচিকরতায় সন্তোষজনক হয় তাই দেখতে হবে। পাঠ-সম্পাদনার সেই কাজে গ্রন্থন-বিভাগের মনোযোগের পরিচয় পাওয়া যায় গ্রন্থ-পরিচয়গুলিতে; গোটা বই ধরে সর্বাঙ্গীণ সম্পাদনার সাক্ষ্যও দিচ্ছে দু'চারখানা বই,—কিন্তু আরো অভিনিবেশ ও নিষ্ঠাযুক্ত পরিশ্রমের সঙ্গে মূল বইগুলির আদ্যন্ত নিখুঁত পাঠ-প্রস্তুতির অব্যবহিত বিপুল কাজ রয়েছে সামনে,—টীকাটিপ্পনীর পালা আসবে পরে। সম্প্রতি বাজারে লভ্য ২৪ খণ্ড 'রচনাবলী'র মধ্যে নব-সংস্করণের কোনে-কোনো খণ্ড এই পাঠ-বিশুদ্ধির বিশেষ প্রয়াসের সমধিক প্রমাণ বহন করছে, সে-কথা হয়তো এখনো সকলের পরিমাপ করবার অবকাশ ঘটেনি। অনুবাদ প্রচার এবং মূল বাংলার সঠিক পাঠ নির্ণয়ের কাজ ছাড়াও, জনসাধারণের জন্য একখানি সুলভ সংক্ষিপ্ত 'রবীন্দ্রবাণী' সংকলন ও 'রবীন্দ্র-জীবনী' প্রকাশেরও আবশ্যকতা কম নয়। শেষোক্ত কাজটি শুরু হয়েছে, নিশ্চয়ই এ খবরটি হবে আনন্দজনক; সুবৃহৎ 'রবীন্দ্র-জীবনীর'ও ২য় সংস্করণের প্রথম খণ্ডটি প্রায় পুনর্লিখিত হয়ে নব-সংস্করণের জন্য যন্ত্রস্থ হয়েছে, এ-ও সুখের বিষয় বলতে হবে। কিন্তু এ-সঙ্গে দুঃখের ছোঁয়াচ লাগে এই ভেবে যে, রবীন্দ্র-শতবার্ষিকীর নিখিল-ভারত-উদ্যোগী-মণ্ডলে প্রভাতকুমারের এই নিষ্ঠার অর্ঘ মনোযোগের বিষয় হল না। তা' যদি হতো তবে হয়তো ইতিমধ্যেই অন্তত হিন্দী এবং ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশের ব্যবস্থায় যথোচিত উদ্যমও তাঁদের দেখা যেত। ভারত-সরকারের সাংস্কৃতিক দপ্তরের দায়িত্বও কি এ-বিষয়ে কিছুই নেই? এ-প্রসঙ্গেই মনে হয়, প্রবীণ প্রভাতকুমারকে দিয়ে ভারতরাষ্ট্র, শতবার্ষিকী কমিটি বা বিশ্বভারতী, যে-মহল থেকেই হোক, শান্তিনিকেতনের একখানি পূর্ণাঙ্গ প্রামাণিক ইতিহাস লিখিয়ে রাখা ছিল একান্ত কর্তব্য। তাঁর উৎসাহ এবং পরিশ্রমের বয়স পার না হতে, এদিকে তাঁকে নিযুক্ত করা শ্রেয় নয় কি? কিছুটা তিনি নিজেই এ-কাজে অগ্রসর হয়ে আছেন, বাকিটা করিয়ে নেবার অপেক্ষা করে কোনো পাকা ব্যবস্থাপকের। কাজটি যে কত দরকারী আর দুরূহ, দূরকালে অব্যবসায়ীদের হাতে কেবল তারি নজির বাড়তে থাকবে মাত্র। এর প্রতি ঔদাসীন্য রবীন্দ্র-নাথের সাধনার ধারা বিকাশের প্রতি মূল্যবোধের বা নিষ্ঠার অভাব সূচিত করে চলবে, সে-কথা যেন আমরা না ভুলি। ৭।৬।১৯৫৮

'পয়লা ডিসেম্বর' তারিখটিকে আজকাল স্বাধীন ভারতে একটি শুভদিন বলেই গণ্য করা যেতে পারে। এই বিশেষ দিনে ভারতের সর্বত্র "সামাজিক শিক্ষা দিবসের" উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। স্কুল-কলেজের বাঁধারীতির আঁকজোক, সূত্রব্যাখ্যা ও পরীক্ষা-বাহিত শিক্ষা এক ধরনের; সে গণ্ডীর বাইরে পড়ে আছে বৃহৎ দেশের বৃহৎ এক সাধারণ-সম্প্রদায়, যাদের ঘরসংসার করে খেতে হয়, সারাক্ষণ যারা জীবিকার ধান্দাতেই ব্যস্ত, বসে বই-পড়া বা বক্তৃতা-শোনা—যাদের পক্ষে এক-প্রকার বিলাসিতা বললেও চলে। অথচ তাদের নিয়েই সমাজ। সমাজের গতিবিধি, ওঠাপড়া—তাদের মতিগতি ও ব্যবহারের উপরেই নির্ভর করে বেশি। এদের চালচলন, রুচি ও চিন্তা যাতে অন্তত কিছুটা আধুনিক জগতের জীবন-মানের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারে, তার জন্য এদের বিশেষ প্রয়োজনীয় তথ্য সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল রাখা দরকার। সে বিষয়ে যে শিক্ষা এদের পক্ষে উপযোগী হতে পারে—তারই চর্চা হচ্ছে নিখিল-ভারত সরকারী সামাজিক-শিক্ষা-প্রচার সংস্থার কাজ। শ্রীনিকেতন পল্লী-সংগঠন বিভাগের সঙ্গে মিলে সে সংস্থা বীরভূমে এ-কাজ করে আসছেন। শ্রীনিকেতনের উদ্যোগেই পয়লা ডিসেম্বরের দিনটিতে সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার চিত্তাকর্ষক কার্যসূচী অনুসরণ করে উৎসব-আনন্দ জমে ওঠে। এবার সে আনন্দ জমাবার ভার নিয়েছিলেন বিশ্বভারতী 'বিনয়ভবনের' কর্মী ও শিক্ষার্থীবৃন্দ। এই শিক্ষার্থী দলে আছেন তাঁরাই যাঁরা স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের শেখাবেন। বিনয়ভবন ও শান্তিনিকেতনের মধ্যবর্তী জায়গায় পিয়ার্সন-পল্লীতে সাঁওতালদের বস্তী। সেখানে একটি বুনিয়াদী স্কুল আছে। সামাজিক শিক্ষা-প্রচার সমিতির ব্যবস্থায় শিক্ষাপ্রাপ্ত জনৈক সাঁওতাল যুবক এখন সেখানকার নৈশ-বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছেন। শ্রীনিকেতন, বিনয়ভবন ও শান্তিনিকেতনের কর্মী ও ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে সাঁওতাল ছেলে-বুড়ো নরনারী সকলেই সোৎসাহে যোগ দিয়েছিল। বয়স্কদের সভা, হাতের কাজের প্রদর্শনী, ছোটোদের ও বড়োদের খেলাধুলা, সন্ধ্যায় আমোদ-প্রমোদ—নানারকম ব্যবস্থা ছিল। বিকাল ৫টার আসরটি ছিল একটু বিশেষ ধরনের; বিনয়ভবনের ছাত্রীরা অভিজ্ঞতার ও আন্তরিকতার বিনিময় করবার জন্য মিলেমিশে নানা আলাপ ও গল্পগুজব করেছিলেন গ্রামের সাঁওতাল মেয়েদের সঙ্গে। এই ঘরোয়া-বৈঠকটি দুই শ্রেণীর পক্ষেই আনন্দজনক ও সামাজিক শিক্ষার পক্ষে মূল্যবান অনুষ্ঠান সন্দেহ নাই।

পয়লা ডিসেম্বর দিনটি-র বিচিত্র প্রাণোচ্ছল অনুষ্ঠানধারা সেদিক থেকে স্বস্তিকর। প্রধানত যাদের জন্য এই শিক্ষা বিস্তারের প্রয়াস, তাদের ভিতর থেকেই

শিক্ষার মূল্যবোধ সম্বন্ধে যে চিন্তার উদ্রেক দেখা যাচ্ছে—এর মূল্য কম নয়। জল যে মূল ছুঁয়েছে—এইটুকুই আশাজনক।

* * *

প্রচার, বিচার, ব্যবহার ও সংরক্ষণের সুব্যবস্থা চাই সর্বাগ্রে মহাকবির নিজের যাবতীয় রচনা-কাজেরই। তাঁর বিশ্বভারতী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, সাহিত্য, সংগীত, চিত্র ও পল্লীসেবার বিবিধ কাজ এ-বিষয়ে সকলেরই মনোযোগ আকর্ষণ করবে। নূতন অনেক-দিকে অবশ্য অনেক প্রসার হচ্ছে, সংযোজন চলছে, সাহায্য আসছে, কাজের পরিকল্পনাও পড়ে নেই কিন্তু তেমনি কোনো কোনো দিকে তাকালে কবির প্রবর্তিত কাজের বিলুপ্তিও চোখে না পড়ে এমন নয়। তার মধ্যে সমবায়-ভাণ্ডারের অভাবটি প্রত্যেকেই প্রতিদিন অনুভব করছেন। তার সঙ্গে আবার সম্প্রতি শ্রীনিকেতন শিল্প-বিভাগের শান্তিনিকেতনস্থিত শাখা-কেন্দ্রটির অবলোপ ভাবনার কারণ হয়েছে। বিশ্বভারতীর সাধারণ ভোজনাগারের ব্যবস্থা কণ্ট্রাক্টরের হাতে যাওয়ার উপক্রমও প্রচলিত ধারার ব্যতিক্রম সৃষ্টি করছে। নূতন কালের চাহিদা নূতন ব্যবস্থার অপেক্ষা রাখে, কবিও তাকে স্বাগত জানিয়েছেন কিন্তু বহুদর্শী কবির প্রবর্তনাগুলিকে সার্থক করে সচল রাখাও সর্বকালের দায়িত্বের বিষয়; এমন কি, তার সুষ্ঠু সম্পাদনার মধ্যেই যে নব নব কালের বিচক্ষণতা, পারদর্শিতা ও অনুরাগ পরিচয় নিহিত রয়েছে, সে-কথাও মিথ্যা নয়। ২৭।৫।১৯৫৮

প্রতিবেশ

"ভারতবর্ষে যদি সত্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তবে গোড়া হইতেই সে বিদ্যালয় তাহার অর্থশাস্ত্র, তাহার কৃতিত্ব, তাহার স্বাস্থ্যবিদ্যা, তাহার সমস্ত ব্যবহারিক বিজ্ঞানকে আপন প্রতিষ্ঠা-স্থানের চতুর্দিকবর্তী পল্লীর মধ্যে প্রয়োগ করিয়া দেশের জীবনযাত্রার কেন্দ্রস্থান অধিকার করিবে। এই বিদ্যালয় উৎকৃষ্ট আদর্শে চাষ করিবে, গো-পালন করিবে, কাপড় বুনিবে এবং নিজের আর্থিক সম্বল লাভের জন্য সমবায় প্রণালী অবলম্বন করিয়া ছাত্র শিক্ষক ও চারিদিকের অধিবাসীদের সঙ্গে জীবিকার যোগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইবে। এইরূপ আদর্শ বিদ্যালয়কে আমি 'বিশ্বভারতী' নাম দিবার প্রস্তাব করিয়াছি।"—রবীন্দ্রনাথ

শান্তিনিকেতনের পরিচয়েই একালে বোলপুর সকলের কাছে পরিচিত। এমন

কি, স্টেশনের নামটি অবধি পরিবর্তিত হয়ে 'বোলপুর-শান্তিনিকেতন' আখ্যা পেয়েছে। কিন্তু একদিন ছিল এর বিপরীত। বলা হত 'বোলপুর-ব্রহ্মচর্যাশ্রম'। শান্তিনিকেতনে যাবার পথে বোলপুরের মাটিই স্পর্শ করতে হয়। অতীতেও একদিন শান্তিনিকেতনে পৌছাবার আগে বোলপুরেই রবীন্দ্রনাথ শুভ পদার্পণ করেছিলেন। এই আসা-যাওয়ার পথের ধুলাতেই বোলপুরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সব কথার শেষ নয়।

* * *

বোলপুরের সঙ্গে শান্তিনিকেতনের মনোগত সূক্ষ্ম ধারার একটি সংযোগও স্থাপিত হয়েছিল বহু আগে; এমন কি, শান্তিনিকেতনের পরিবৃদ্ধির মূলে সে ধারা স্বল্পাধিক কার্যকরও হয়েছিল। শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম তখনও স্থাপিত হয় নি, জমি কিনে রাখা হয়েছে মাত্র। বোলপুরবাসী জনকয়েক ধর্মপিপাসু ব্যক্তি মিলে বেড়াতে বেড়াতে তখনকার সেই পোড়ো বাগানে গাছের তলায় এসে বসতেন এবং নিরিবিলিতে অধ্যাত্ম-আলোচনায় মগ্ন থাকতেন; তাঁদের এই নিষ্ঠার কথা সুদূর থেকে শুনলেন মহর্ষিদেব এবং আশ্রমের জন্য স্থায়ী রকমের একটা ব্যবস্থা করতে তিনি উদ্যোগী হলেন—প্রথম 'আশ্রমধারী' স্বর্গত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'শান্তিনিকেতন-আশ্রম' গ্রন্থের মধ্যে এমনি একটি বিবরণী লিপিবদ্ধ আছে। এই প্রসঙ্গে আরেকটি কথা স্মরণযোগ্য। শান্তিনিকেতন-আবিষ্কারের কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য আজও প্রকাশ পায়নি। মহর্ষিদেবের প্রথম-আগমনের অধ্যায়টাই অস্পষ্ট হয়ে আছে। মহর্ষি কি রায়পুরের নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে রেলযোগে বোলপুর-স্টেশন দিয়েই প্রথম অবতরণ ক'রে শান্তিনিকেতনের এই ডাঙাটি আবিষ্কার করেছিলেন, না, বোটে করে গঙ্গা বেয়ে কাটোয়া-গুণটিয়া-সুরুলের সড়ক ধরে পাল্কীযোগে এ অঞ্চলে আসতে আসতে এখানে এসে বিশ্রামার্থ বসেছিলেন; অথবা, রায়পুরে অবস্থানকালে আশেপাশে বেড়িয়ে দেখবার পথে ভুবনডাঙার মাঠের সপ্তপর্ণীতল তাঁকে এখানে আকর্ষণ করে আনে, নানা তথ্য ও নানা ধারণা এ বিষয়ে জট পাকিয়ে আছে। যা হোক দেখা যায় সেই সূচনাকাল থেকেই ঘটেছে বোলপুরের সঙ্গে শান্তিনিকেতনের যোগ। এরপরে কবি যখন থেকে বিদ্যালয় স্থাপন ক'রে শান্তিনিকেতনের কর্মজীবন শুরু করলেন, তখন থেকে বোলপুরবাসী প্রধানত দর্শক ও শ্রোতার ভূমিকাই গ্রহণ করে চলেছিল সাময়িক-উৎসবে, সভাসমিতিতে ও খেলাধুলার মাঠে। ক্ষীণধারায় হলেও এরই সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক যোগও যে একটু বয়ে না চলেছিল এমন নয়। এবার যেই উচ্চ-ইংরেজি-বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে

রবীন্দ্র-জন্মোৎসব-সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে, বোলপুরবাসীদের কাছ থেকেই শোনা যায়, সেখানে অতীতে একবার এক পুরস্কার-বিতরণী সভায় রবীন্দ্রনাথ এসে যোগদান করেছিলেন এবং ছাত্র-সমাজকে উদ্দেশ করে একটি ভাষণও দান করেছিলেন। কবির বহু ভাষণের মতো সে-ভাষণটিও অনবধানে সংরক্ষিত হয়নি। এ ছাড়াও কবির জীবিতকালেই কবি বোলপুরের ছাত্রছাত্রীদের বিশ্বভারতীর শিক্ষাভবনে অধ্যয়নের সুযোগ দান করে গেছেন। সংগীতে, নৃত্যে, অভিনয়ে, প্রতি-আনন্দোৎসবে, এমন কি, ব্যাঙ্কের উদ্বোধনে অবধি বোলপুর-শহরের বিষয়কর্মের পাশে পাশে আবির্ভাব ঘটেছে বিশেষ সাংস্কৃতিক রুচির। শুধু উচ্চ বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সম্মেলনেই নয়, সাধারণ-শ্রেণীর যোগে সম্পাদিত নানা সম্মেলন উপলক্ষেও সে রুচি অঙ্কুরিত হতে দেখা গেছে। রবীন্দ্রনাথের স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতার সংস্পর্শে আজ বোলপুরের কঠিন আব্রুর আবরণ ঘুচে গেল; উচ্চ মধ্য প্রায় সমস্ত শ্রেণীর মেয়েরাই শিক্ষার ক্ষেত্রে এগিয়ে চলেছে; নৃত্যগীত এবং নানা সুকুমার ও কুটীর-শিল্পের তারা অনুশীলন করছে; স্বল্পাধিক সকল দিক দিয়েই বোলপুর বর্তমানে উন্নতিশীল। শান্তিনিকেতনের ৭ই পৌষের মেলার অব্যবহিত পরেই ইদানীং অনুষ্ঠিত হচ্ছে 'বোলপুরের মেলা।' মানুষের মনোগত মেলামেশার পক্ষে এই মেলাগুলি সাময়ক-বাহন। সাংস্কৃতিক-যোগের প্রসারকল্পে বোলপুরে স্থায়ী একটি প্রতিষ্ঠান এখনও গড়ে ওঠেনি। নাগরিক জীবনের সর্বতোমুখী বিকাশের পরিচয় পাওয়া যায়, এমন একটি 'পৌরজন-ভবন' গড়বার প্রয়োজন সেখানে খুবই রয়ে গেছে। সভা-সমিতি, প্রদর্শনী, অভিনয়, জলসা, গ্রন্থাগার প্রভৃতি নিত্যনৈমিত্যিক সকল অনুষ্ঠানের সমাবেশ সুষ্ঠুরূপে ঘটবার স্থান বর্তমানে বিরল। একটি সর্বজনীন কেন্দ্রীয়-গৃহ স্থাপিত হলে পৌরজীবনে সর্বতোমুখী বিকাশের সেই স্থায়ী সুযোগটি দেখা দেবে। সেই ভবনকে অবলম্বন করে বোলপুর, শান্তিনিকেতন ও তার আশেপাশের জনগণ মিলে নানাভাবে শিক্ষা ও সংস্কৃতির চর্চা সুসাধ্য হবে। রবীন্দ্রনাথের সর্বাঙ্গীণ-সমাজ ও বিদ্যাসমবায়ের পরিকল্পনা সেখানেও অনেকটা সেই থেকে কার্যকর হয়ে উঠবার সম্ভাবনা থাকবে। রবীন্দ্রনাথের অনুরাগপ্রবুদ্ধ, উদ্যোগী জনসাধারণের প্রথম উদ্যম সে আশাও জাগ্রত করে। শান্তিনিকেতনের আড়ম্বর না হলেও তার পার্শ্ববর্তী বোলপুর-শহরে জনসাধারণের উদ্যোগে এবারই প্রথম বিশেষ আয়োজনে রবীন্দ্র-জন্মোৎসব পালন করা হয়েছে। বোলপুর উচ্চ-ইংরেজি-বিদ্যালয়ের-প্রাঙ্গণে সভার আয়োজন হয়; সুবিখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় তাতে পৌরোহিত্য করেন। প্রথমবারের

সংগঠন সম্পূর্ণ প্রতিনিধিমূলক না হলেও এরকম একটি প্রচেষ্টা যে জেগেছে, সেটাই আনন্দের কথা। শান্তিনিকেতন-থেকেও কেহ কেহ যোগ দিয়েছিলেন। আবৃত্তি, পাঠ নৃত্যগীত ভাষণ যথারীতি সম্পন্ন হয়।

'বিচিত্রা'-সিনেমা হলে ২৫শে বৈশাখ সকালে কবির জন্মতিথি-পালন করেছেন বোলপুরের 'সাহিত্য সংঘ'। শহরের প্রবীণ চিকিৎসক ও সর্বজনাদৃত ডঃ শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয় ছিলেন তাতে আহ্বায়ক। বিশ্বভারতী বিনয়-ভবনের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কুলদা চৌধুরী এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

রবীন্দ্র-পরিচয় প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন শহরের 'কিশোর সংঘ'। তিনদিন তাঁদের এই অনুষ্ঠান চলেছে। সংগ্রহ প্রচুর হয়েছে এবং শিক্ষণীয় অনেককিছুই তাকে সমৃদ্ধ করেছে।

সংস্কৃতি-সংঘও তাঁদের শ্রদ্ধা-নিবেদনের আয়োজন করেন। অনুষ্ঠানটির সময় ও অধিবেশনস্থল ছিল ২৮শে বৈশাখ রবিবার বোলপুর-স্কুলপ্রাঙ্গণে।

বোলপুর উচ্চ-বালিকা-বিদ্যালয়ের উদ্যোগে 'রবীন্দ্র-জন্মোৎসব' উদ্‌যাপিত হল দু'দিন, ২৬শে ও ২৭শে বৈশাখ। এঁরা সভা-সমিতি বা অন্য কোনো অনুষ্ঠান না ক'রে রবীন্দ্রনাথের একখানি গীতিনাট্য অভিনয় করলেন। কবির আদিকালের রচনা 'কালমৃগয়া'। সেকালের আদি-কবিগুরু বাল্মীকিরও মহাকাব্যের আদি ঘটনা। অপুত্রক রাজা দশরথ কর্তৃক অন্ধ-মুনির পুত্র সিন্ধু-বধ এর উপাখ্যান; কাহিনী করুণ, তাকে আরো মধুর করেছে গানে, তার উপর নৃত্যের ললিত-সুষমা-যুক্ত হয়ে, অভিনয়কে পরম উপভোগ্য করে তুলেছিল।

* * *

শান্তিনিকেতনের পাশে শান্তিনিকেতনের জিনিসই যখন অন্য পরিবেশে ও ও অন্যদের মধ্যে দিয়ে দেখা দেয়, তখন তার একটি স্বতন্ত্র মূল্য থাকে। বাইরের লোক কবিকে আপন করে নিয়েছে—কবি তাঁর গুণের প্রশংসার চেয়ে এই আত্মীয়তার কামনাই জানিয়েছেন বেশি ক'রে। বালিকা-বিদ্যালয় অভিনয়ের মধ্য দিয়ে সেই আত্মীয়-পরিবেশই সৃষ্টি করেছিলেন; হাটবাজারের ছাপ এখনো বোলপুরে লেগে আছে। এইসব শিল্পের সূক্ষ্ম আবেদন ক্রমে ক্রমে পথ করে নিচ্ছে তার অলিগলি দিয়ে। যে-সব শিল্পী রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাধারণের যোগকে এসব অনুষ্ঠানের সাহায্যে সহজ করে তুলছেন, তাঁরা নেপথ্যে থেকে একটি মহৎ কাজ করেছেন সন্দেহ নেই। শান্তিনিকেতনে বা কলকাতায় নাচ ও গানের শিক্ষার জন্য আজকাল বিশেষভাবেই পাকা আয়োজন আছে। অনেকস্থলে ফলাও

রকমেই তা হয়ে উঠছে। এরই জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষালয় ও শিক্ষক আছে একাধিক। কিন্তু মফঃস্বলে তার কিছুই নেই বললে অত্যুক্তি হবে না। বোলপুরের বালিকা বিদ্যালয়ে রবীন্দ্র-সংগীতের একটু ব্যবস্থা যদিবা আছে, মার্গসংগীত বা নৃত্য ও বাদ্যাদির শিক্ষাব্যবস্থার একান্তই অভাব। তার মধ্যে সাময়িক উৎসাহে এদিক-ওদিক থেকে টেনেবুনে দু'চারজন শিল্পীকে ধরে এনে এক-একটা এমনি উৎসব জমিয়ে নেওয়া হয়। অস্থায়ী অল্প কয়েকদিনের আধখাচড়া শিক্ষায় তবু যা হয়ে ওঠে!

*　　　　*　　　　*

অতি ধৈর্যে প্রবীণা প্রধান-শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী সুধাময়ী দেবী আজ দশ-বারো বছর ধ'রে বোলপুরে সাংস্কৃতিক এবং আনন্দময় এই পরিবেশ তাঁর ছাত্রীদের সাহায্যে গড়ে চলেছেন। এতদিনে এই ভাঙাচোরা প্রচেষ্টা সংহত রূপ নিয়ে একটি সর্বাঙ্গসুন্দর সৃষ্টির পথে এসে দাঁড়াল। ছোটখাটো ত্রুটিগুলি চোখে পড়লেও মনে লাগে না। যেমন, রঙ্গমঞ্চের মধ্যে অভিনয়কালে দৃশ্যের ফাঁকে-ফাঁকে বিরাম-বাহুল্য, আর সেই বিরতির কালে মঞ্চ-শিল্পীদের আটপৌরে আনাগোনা। কিন্তু সে-ত্রুটি ছাপিয়ে যায় মঞ্চসজ্জার বিচিত্র আয়োজন। মুগ্ধ করে বর্ণাঢ্য আলোক বিচ্ছুরিত সৌন্দর্যলীলায়। গানগুলি সুগীত হয়েছে, অভিনয় হয়েছে অনবদ্য। বিশেষ ক'রে, দশরথ, দস্যুসর্দার, সিন্ধু এবং সর্বোপরি অন্ধমুনি,—এঁরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকটি দৃশ্যে অভিনয়কে প্রাণবন্ত ক'রে তুলেছিলেন সহজ আবেদনে; মাঝে মাঝে বনের প্রজাপতির ঝাঁকের মতো এসে নাচের অপরূপ ভঙ্গিতে গভীরে দোলা দিয়ে যাচ্ছিল বনদেবিগণ। নৃত্যের ভঙ্গির মধ্যে অভিনয়ের ব্যঞ্জনা মনোহারী হয়ে উঠেছিল, নাটকে নৃত্য স্বতন্ত্র হয়ে আনন্দ দেয়নি, অভিনয়কেও তা জমাট করতে সাহায্য করেছে। গানটি ছিল,—

সমুখেতে বহিছে তটিনী,
　　দুটি তারা আকাশে ফুটিয়া।

বালিকাদের শৈশব বাহুলীলায়, বঙ্কিম দেহচ্ছন্দের দোলায়-দোলায় তটিনীর লাবণ্যপ্রবাহ-রেখা দেখা দিয়েছিল, তেমনি আবার তাদের কেশচূড়ায়, মালায়, অঙ্গাবরণে হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে নদীর জলে তারার খেলাও ফুটে উঠেছিল।

*　　　*　　　*　　　*

কিন্তু নাটকের সমস্ত বেদনাকে বিকীর্ণ ক'রে দিয়ে গেল তাদের শূন্যমুখী

আন্দোলিত করমুদ্রার শেষ টানরেখা; তখন গানের তুলিতে রূপ দিয়ে কথায় ধ্বনিত হচ্ছে—

"কোথা সে হায়!"

নাটক শেষ হল। তারপরে সব অনুষ্ঠানটির উপসংহারে দেখা দিল—"খেলা ভাঙার খেলা" নাচ। অনুষ্ঠানটির আরম্ভ হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের প্রথম রচিত "জন্মদিনের গান"—

"ভয় হতে তব অভয় মাঝারে
নূতন জনম দাও হে"—

দিয়ে। যে উৎসবের সূচনা হল অভয় যেচে, তার শেষকে দেখা হল মৃত্যুভয়ের মধ্যে নয়, খেলা-ভাঙার খেলার অনাবিল আনন্দে। এই তো রবীন্দ্রনাথের জীবন-দর্শন। উৎসব সেই দেখাটির ইঙ্গিত দিয়ে এবারকার মতো তার পালা চুকাল। পুরা অভিনয়টির তৈরির ভার নিয়েছিলেন শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী সাহানা দেবী, তাঁর সহযোগিনী ছিলেন শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী দেবী—নৃত্যগুলি গড়ে তুলেছিলেন শ্রীমতী সুব্রতা ঘোষ, বিদ্যালয়ের প্রাক্তন-ছাত্রী, বিশ্বভারতী সংগীত-ভবনেরও তিনি উপাধিপ্রাপ্তা প্রাক্তন-ছাত্রী। গান, নাচ ও অভিনয় এত অল্প সময়ের মধ্যে এইসব ছোটো মেয়েদের এমন সুন্দরভাবে শিখিয়ে নিয়ে জিনিসটি যে এত সহজে উৎরে দিলেন,—এতে শুধু তাঁদের যত্ন নয়, তাঁদের সৃষ্টি-কুশলতাও প্রকাশ পেয়েছে। আবহ-সংগীতের ব্যঞ্জনায় যোগ দিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনের সুরশিল্পী শ্রীযুক্ত জ্যোৎস্নাকুমার ঘোষ ও শ্রীযুক্ত বিভুপ্রসন্ন সিংহ। সংগত করেছিলেন শ্রীযুক্ত উমাপদ ঘড়, আর সাজসজ্জা ও মঞ্চ-ব্যবস্থার সম্পাদনায় ছিলেন বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা শ্রীমতী সুপ্রিয়া ঘোষ, হৈমন্তী বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শান্তিনিকেতনের কলাভবনের ছাত্র শ্রীযুক্ত ননীগোপাল ঘোষ। প্রথমদিন বৃষ্টির জন্য দর্শক-সংখ্যা আশানুরূপ হয়নি, দ্বিতীয় দিন কিছু হয়েছিল। কিন্তু তার মধ্যেও সাধারণের দিকে একটু-একটু গণ্ডগোল হচ্ছিল। বিশিষ্ট রসজ্ঞমণ্ডলীর কাছে সুরম্য এ অনুষ্ঠানটি নিশ্চয়ই আরো সমাদৃত হত। কিন্তু উৎসব তার চেয়ে বেশি সার্থকতা পেয়েছে এই আসরেই। সেকথা বুঝতে পারি রবীন্দ্রনাথেরই কথার থেকে। কারণ, তাঁর গানেই রয়েছে—

যাব যেথায় বেসুর বাজে নিত্য।

লোকের রুচি এমনি করেই তৈরি হবে। কিন্তু এ-কাজের লোকেরই অভাব। কবির ভাষায় বলতে গেলে "সেইখানেই পরীক্ষা।" ১৪।৫।১৯৫২

বোলপুর ও শান্তিনিকেতনের মাঝামাঝি বাস করেন 'রবীন্দ্রজীবনী'-কার

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। দুই জায়গার সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনের যোগাযোগেরও সূত্র হয়ে রয়েছেন তিনি এবং তাঁর পত্নী শ্রীমতী সুধাদেবী। চারিদিকে যখন রবীন্দ্রনাথের আলোচনা ও উৎসবের সাড়া পড়েছে,—সে-সময়ে কবির সাধনা-স্থল ও সংস্কৃতি-কেন্দ্র শান্তিনিকেতনের এবং শান্তিনিকেতনের পার্শ্ববর্তী বোলপুরের প্রসঙ্গে এসে, স্বভাবতই এই আজীবন শান্তিনিকেতনের কর্মী, সংস্কৃতির সাধক ও রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কে শ্রেষ্ঠ-সম্পদ-স্রষ্টার কথা মনে পড়ে। বয়সে প্রায় ষাটের কাছে এসে তিনি পৌঁছেছেন। শীঘ্রই হয়তো কাজে অবসর নেবেন। কিন্তু তাঁর আসল কাজের বিরাম নেই। "রবীন্দ্র-জীবনী"-রচনাকেই বলব সেই আসল কাজ। কেননা, বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারিক অনেক লোকেই হতে পারবেন, কিন্তু "রবীন্দ্র-জীবনী"-কার বলতে অনেকদিন অবধি আমাদের জানতে হবে এই এক-জনাকেই। ৩।৫।১৯৫২

বোলপুরের হাইস্কুলটি বহুদিনের। একটি গুরুট্রেনিং স্কুল ছিল। সেটি স্থানান্তরিত হয়ে শ্রীনিকেতনের 'শিক্ষাচর্চা'য় নামান্তরিত হয়ে আছে। তারই পরিত্যক্ত আবাসে বোলপুর বালিকা-বিদ্যালয় এসে হল প্রতিষ্ঠিত। ইতিমধ্যে সেটি উচ্চ-বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়েছে। গত পূজার আগে তার নবনির্মিত গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন সম্পন্ন হয়ে গেছে। এ ছাড়া আছে বাসন্তী-বিদ্যালয় ও হরগৌরী-পাঠশালা। নিম্নতর মানের এই শিক্ষালয় দুটিও শহরের বহু শিশুর সম্মেলন-কেন্দ্র। শহরের পশ্চিম পার্শ্ববর্তী গ্রাম বাঁধগড়া। বহু আগে বোলপুরের উচ্চ বালক-বিদ্যালয়টি সেখানেই অবস্থিত ছিল। সেটি বোলপুরে উঠে আসার পর থেকে বাঁধগোড়ায় একটি মাধ্যমিক-মানের বিদ্যালয় চলতে থাকে। এখন সেটিও উচ্চ-মানে এসে দাঁড়াচ্ছে। দুটি হাইস্কুলের মধ্যে ভৌগোলিক ব্যবধান আধ মাইল। এদিকেওদিকে ছোটোখাটো পাঠশালা আরও দু'একটি আছে। কিন্তু এতেও ছাত্রের ভীড় সামলানো দায়। দু'বেলা স্কুল ক'রেও সুবিধে হচ্ছে না। চারদিকের থেকে ছাত্র আমদানি হচ্ছে। তাতে আরো দু'একটা হাইস্কুল চলে যেতে পারে।

বোলপুর ব্যবসার জায়গা,—ধানচালের বিকি-কিনিই তার বড়ো পরিচয়,—একপাশে ছিল একটি মুন্সেফি আদালত,—জনকয়েক উকিল, ডাক্তার ও মাস্টারে,—উচ্চ-শিক্ষিতের মণ্ডলীটি ছিল সীমাবদ্ধ। পুরোনো দিনের দু'একটি প্রতিষ্ঠানের নাম শোনা যায়। 'হরিসভা' তার একটি ; অন্য একটি প্রতিষ্ঠান আজো আছে,—সেটি 'বোলপুর সাধারণ পাঠাগার।' শহরের বাইরে প'ড়ে-যাওয়ায় তার আকর্ষণ হ্রাস পেয়েছে। বোলপুরের 'তরুণ সমিতি' এবং 'দেশবন্ধু ক্লাব' নবীন-প্রবীণের

মিলিত উদ্যমের পরিচয় বহন ক'রে বহুদিন চলেছিল। এখন তার স্থলে আছে একটি সর্বজনীন সমিতি—'টাউন ক্লাব'। অল্পদিন আগেও 'কিশোর সংঘ' মাতিয়ে রেখেছিল স্থানীয় কিশোরদের। 'আদ্যাশক্তি ক্লাব' নানা কাজে এখনো সজীবতা রক্ষা করে চলেছে। 'মহিলা সমিতি'র কথাও বলতে হয়। যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে কয়েক বছরের মধ্যে এসে গেল কয়েকটি ব্যাঙ্ক,—মহাযুদ্ধ যেতে না যেতেই এল দেশ-ভাগাভাগির দুর্যোগ;—লোকে-লোকে ছেয়ে গেল পথঘাট। বাইরের নানা ঘাত-প্রতিঘাতে, ঘটনার জোয়ার-ভাঁটায় পলিমাটি জমতে জমতে যে-একটি কাজের ক্ষেত্র রূপ ধরে উঠল,—সৌভাগ্যের বিষয় আর-কিছু না হয়ে এ অঞ্চলে সেটি হল শিক্ষার কেন্দ্র,—'বোলপুর কলেজ।' আবছা-আলোর মধ্যে কলেজ যেন ডে-লাইট জ্বেলে দিল। সুন্দর সমুজ্জ্বল হয়ে দেখা দিচ্ছে বোলপুরের ধোঁয়া ও ধূলিমাখা আনাচ-কানাচ। পিচেঢালা পথ আর ইলেক্‌ট্রিকের আলো তার চেহারায় জৌলুষ এনেছে বাইরে; তার ভিতরের রূপান্তরও জানিয়ে দিচ্ছে পথেঘাটে উচ্চ-শিক্ষারত ছাত্রছাত্রীদলের সহজ-সঞ্চরণ এবং নানা উৎসব-অনুষ্ঠানাদিতে তাদের সক্রিয়তা। ওদিকে বিশ্বভারতীও হল বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত। বোলপুরে শিক্ষার আঁচ ও সামাজিকতা দিনে-দিনে নানাযোগে আরো বাড়তে থাকল—বোলপুর ও শান্তিনিকেতনের মধ্যবর্তী স্থানে পথপার্শ্বে দেখা দিল 'বিচিত্রা'-ছায়াচিত্রগৃহে নানা আমোদ-আহ্লাদের সম্ভার। চোখ-ধাঁধানো তার আলো। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সিনেমার দান যদি জাতীয় স্বীকৃতি পেয়ে থাকে, তবে বলতে হবে, 'বিচিত্রা'র বিচিত্র রস-রূপের আরতিও একেবারে উপেক্ষণীয় নয়।

এর আগে থেকে বোলপুর, ভুবনডাঙা ও শান্তিনিকেতনের নাগরিক ও গ্রামবাসীদের মিলিয়ে রবীন্দ্র-সংস্কৃতির অনুশীলন করে আসছে 'রবীন্দ্র-উৎসব-সংঘ।' প্রধানত রবীন্দ্রনাথের গানের আসর জমানো ছিল তার কাজ। গানের সঙ্গে নাটক, আবৃত্তি ও নাচের কিছু-কিছু আয়োজনও ছিল। সাধারণের মধ্যে সংঘ সাহিত্যের চর্চাও শুরু করেছিলেন। সে কাজ শুধু মৌখিক আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, গ্রামের কারিগরসমাজের ছেলেরাও অবসর-সময়ে রসস্নিগ্ধ রচনা-অভ্যাসে সেখানে আনন্দ জমিয়েছে। বোলপুরের বাইরে কলকাতায় এবং পশ্চিমবঙ্গের নানা অঞ্চলে, এমন কি বহির্বঙ্গে বিহারেও এই 'রবীন্দ্র উৎসব সংঘ' জনসংযোগের আদর্শ প্রচার ও সংস্কৃতির একটি বিশেষ পন্থাকে রূপায়িত করে দেখাবার জন্য নানা উৎসবের আয়োজন করেছেন, অন্যান্য অনেকের অনেক অনুষ্ঠানেও অংশ গ্রহণ করেছেন।

বিশ্বভারতীর বিশ্ববিশ্রুত সংস্কৃতির কেন্দ্রের পাশেই রয়েছে বোলপুর শহর।

জ্ঞানের চর্চায় সেখানটিও থাকবে আলোকিত, তবেই হয় পরিবেশের যথার্থ গৌরব। এবার বাণীর পূজায় বোলপুরের উৎসাহ-উদ্দীপ্ত সেই রূপের আভা একটু ফুটে উঠেছিল। সেদিন পথে বেরিয়ে চারিদিকেই চোখে পড়েছে আলো। লোকজনের যাতায়াত, গানবাজনা, জটলা, কথাবার্তা, হাসিখুশিতে বৎসরের বড়ো উৎসব দুর্গাপূজার দিনগুলির সমারোহই যেন ফিরে এসেছিল। শুধু ঠাকুর-দেখা নয়, জায়গায়-জায়গায় 'দীয়তাং ভুজ্যতাং'-এর দরাজ ব্যবস্থাও ছিল। তারপরে আমোদ-আহ্লাদের তো কথাই নেই। খেলাধুলাও এক-একস্থলে উৎসবের ক'দিনই যুগিয়েছে মহা-উল্লাস। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে উৎসাহে পাল্লা দেবে কে। কিন্তু নিতান্ত কাজের-লোক যাঁরা, অফিস-আদালতের রাজ্যে থেকেও তাঁরা পেছিয়ে থাকেননি। জ্ঞানের বেদীতে প্রণতি জানিয়ে 'ইরিগেশন ক্লাবে'র কর্মীরা নিজেদেরই সংস্কৃতির পরিচয় দিয়েছেন; পাড়ায়-পাড়ায় সংঘ-সমিতির উদ্যোগেও উৎসবের সাড়া পড়ে গিয়েছিল বিচিত্র রকমে।

গ্রামেও আজকাল নানা উৎসব হচ্ছে সর্বজনীন সহযোগে। বাণীর অর্চনা-উৎসবে বোলপুরের উপকণ্ঠ গ্রাম ভুবনডাঙা, তথাকার ছেলেদের আয়োজনও লক্ষ্য করবার ছিল। নিজেরাই একজনে প্রতিমা গড়েছে। যাত্রাগানের পালায় তরুণেরা তালিম দিয়েছে। পূজার পরদিন সন্ধ্যায় এখানে জলসা হয়, জলসার পরে কীর্তনের আসর জমে। গ্রামের পাঠশালাটিতেও শিশুদের আনন্দের হাট বসেছিল বিদ্যামায়ের আরাধনা উপলক্ষ্য ক'রে। সেখানে ছায়াচিত্রযোগে শিক্ষামূলক আমোদ-আহ্লাদের ব্যবস্থা হয়েছিল।

বাস্তহারা, যাঁরা বাইরে থেকে এসেছেন, তাঁরাও ডাকবাংলার মাঠের এক কোণায় সমবেত হয়ে বাগ্‌দেবীকে অর্ঘ্য-নিবেদন করেছেন। রাত্রে খোলকরতালে কীর্তনের ধ্বনি মুখরিত করেছিল উৎসব-প্রাঙ্গণ।

কার্যসূচী একটু বড় রকমের ছিল নব-উদ্যোগী 'ইরিগেশন ক্লাবে'র। ময়ূরাক্ষী নদী অবধি খাল কেটে-নেওয়ার-কাজে সরকারী সেচ-বিভাগের যে ক'জন কর্মী এখানে নিযুক্ত আছেন,—তাঁরাই এবার উৎসাহের সহিত স্থানীয় জনসাধারণকে আমন্ত্রণ ক'রে উৎসব করেছেন। গান ও খেলাধুলার প্রতিযোগিতা ছিল সেখানকার বিশেষ অনুষ্ঠান। আদর-আপ্যায়নে সকলের সঙ্গে একটি মধুর সম্বন্ধ তাঁরা স্থাপন করেছেন। ফাঁকা মাঠের সুজলা সুফলা রূপ তাঁরা কবে দেখাবেন কে জানে, কিন্তু হৃদ্যতার ছোঁওয়ায় লোকের মনে সরসতা সৃষ্টির পক্ষে তাঁদের এই সাংস্কৃতিক আয়োজন যে কিছু-ফলপ্রসূ হবে, তা মিথ্যে নয়। বিশ্বভারতীর সংগীতভবনের

অধ্যাপকদের মধ্যেও কেহ কেহ এ অনুষ্ঠানে সহযোগিতা করেছেন। খেলাধুলার প্রতিযোগিতাটি মুলতবি রয়েছে দশই ফেব্রুয়ারীর জন্য।

শালবাগানের অফিস-পাড়াটি ছাড়িয়ে দক্ষিণে এগোলে রাস্তার ডাইনে বাঁয়ে বিদ্যায়তন-পাড়া। স্কুল-কলেজ, মেয়েদের স্কুল, অদূরে সাধারণ-পাঠাগার ও ফোনেটিক কমার্শিয়াল ইন্‌স্টিটিউট। কাতারে-কাতারে লোক চলেছে এধারে-ওধারে। নির্মল নীলিমায় পঞ্চমীর চাঁদের হাসি। মানুষের হাসি-গাথায় মানুষের মন স্নিগ্ধ। কলেজের প্রাঙ্গণে বসেছিল গানের আসর। শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রী ও অধ্যাপকগণ তাতে যোগ দিয়ে আনন্দ বৃদ্ধি করেছিলেন। স্কুল নাম করেছে খাওয়ানোর দিকে। না খেয়ে কেউ সেখান থেকে ফিরতে পারেনি। এক কোণায় একটি প্রাথমিক স্কুল আছে। সকালবেলার দিকেই শিশুদের উৎসব সারা হয়ে গিয়েছিল। সন্ধ্যায় ছোট্ট স্কুল-গৃহটির সামনে কলাগাছের গেট খাড়া ছিল। ভিতরে পূজার জায়গা থেকে কেঁপে-কেঁপে প্রদীপশিখার ক্ষীণ আলোকটুকু বেরিয়ে আসছিল। ধুমধামের মাঝে তার নিরিবিলির অনাবিল আকর্ষণটিও লাগছিল মনোরম।

পুজোর কাজে মেয়েদেরই উৎসাহ জাগে বেশি। বাড়িঘরে তারাই নিয়ে থাকে আয়োজনের ভার। কিন্তু স্কুলে এসে ছোটো-ছোটো মেয়েরা চাঁদা-তোলা থেকে শুরু ক'রে নেমন্তন্ন, খাওয়ানো-দাওয়ানো, উৎসব-ক্ষেত্র সাজানো-গোজানো, আদর-অভ্যর্থনা, জলসা, প্রোসেসন,—সব-কিছুরই দায়িত্ব পায় নিজেদের হাতে। ভুলচুক করলেও বকাঝকার ভয় থাকে না। সংগঠনের একটা বড় শিক্ষা এর মধ্য দিয়ে হয়ে যায়। এজন্য শিক্ষয়িত্রীরা সঙ্গে থাকলেও তাঁরা থাকেন যতটা সম্ভব বুদ্ধিপরামর্শের দ্বারা সাহায্যকারিণী-হিসাবেই। শুধু অভিভাবক নয়, বৃহৎ জনসাধারণকে সেবায় পরিতুষ্ট করবার সাক্ষাৎ সুযোগ এটি। মনোমতো গড়নের প্রতিমা ধারে কাছে না পেয়ে একদল ধেয়ে গেল বর্ধমান। তার সাজসজ্জা অনেকই হল। ইন্‌জিনীয়ারিং ফলিয়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহযোগে বিরামহীন ঘূর্ণায়মান জ্যোতিচক্রও দেবীর পটভূমি করল চমকপ্রদ উজ্জ্বল। বাদ্য বাজল পাড়া কাঁপিয়ে। ছেলেদের চেয়ে তারা কম যাবে না কোনোদিকে। তারাও (উচ্চ-বালিকা-বিদ্যালয়ের ছাত্রীরাও) জলসা করল জাঁকিয়ে। শুধু নাচগান মামুলি-ধরনের হলে হবে না। চাই একটু নাটকের বৈশিষ্ট্য। এই উৎসাহের মুখে ঘষেমেজে যে-জিনিসটি শেষ পর্যন্ত তৈরি হয়ে উঠল, দেখা গেল সেটি নিতান্ত মন্দ হয়নি। নাচগান ভাষণ ও কথিকায় মিলে দেড়-ঘণ্টাকাল লোককে আনন্দ-বিতরণের উপলক্ষ্য হল সেটি। গীতিনাট্যটির

সূচনায় উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে ছোট একটি ভাষণে অভিনেয় বিষয়ের মর্মকথাটুকু বলে নেওয়া হল ;—তারপরে একটানা চলল নৃত্যগীতের রূপায়ণ। ছেলে-মেয়েদের মধ্যে অনেক স্থলে অনেক সময় নাচগানে-সমৃদ্ধ অভিনয়োপযোগী নাটিকার প্রয়োজন হয়ে থাকে। বোলপুর উচ্চ-বালিকা-বিদ্যালয়ের সারস্বত-উৎসবে-অভিনীত ছোট্ট এই নাটিকাটুকু সেদিক দিয়ে স্থলবিশেষে সাহায্যকারী হতেও-বা পারে।

ভূমিকাটিকে সময়োপযোগী করে নিয়ে আগে বলে নিলে ভাবটি অনুসরণ করবার পক্ষে সাধারণের সুবিধা হয়। বসন্তকালে তো বটেই,—তা ছাড়া, নববর্ষ বা পঁচিশে-বোশেখের রবীন্দ্র-উৎসব-স্থলে এ ধরনের জিনিস পরিবেশন করা চলে। এবার এখানকার উৎসবের ভূমিকায় জনৈক শিক্ষক উঠে বললেন :—

"শীত শেষ হয়ে এল। ঋতুর রাজা বসন্ত আসছে এগিয়ে। হাতে তার অশোক-পলাশের সাজি, কোকিলকণ্ঠে তার বন্দনাগান। রূপ-রসের ফোয়ারা ছুটেছে দিকে-দিকে। আজ শুক্লা শ্রীপঞ্চমী। এমন-দিনে সকলের সঙ্গে আমরাও করেছি বাগ্‌দেবীর বন্দনা-অনুষ্ঠান। এ উপলক্ষে যে পালাগানের আয়োজন হয়েছে, তার নামটি হচ্ছে—"বসন্তের বাণী।"

যে-বাণী নিয়ে বসন্ত পৃথিবীতে এসে সকলকে উৎসবে মাতিয়ে তোলে, সে বাণীটিকেই নানা গানে-গানে নৃত্যভঙ্গিতে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা গেছে বাণীর বরপুত্র রবীন্দ্রনাথের কথা ও সুরের সাহায্য নিয়ে। ঘটনাটুকু এই :

"বসন্তের দেবতা ধরায় এল। পথের ধারে ছোট্ট বনফুলও তার খবর পেলে। তারার দল আকাশ-ছেয়ে প্রকাশ করছে সে দেবতার বাণী। গাছে গাছে নবীন কিশলয়দল দুলে উঠল পুলকে। কারো কারো সংকোচ রয়েছে তখনো। কিন্তু আজ দ্বিধাদ্বন্দ্ব সব ঘুচিয়ে উৎসবে যোগ দেবার ডাক আসছে চারদিক থেকে। আমের কচিপাতাগুলি অকারণে চঞ্চল হয়েছে সে ডাকে।

এত আনন্দ। ক্রমে মিলনের গানের রেশটুকুতে লাগে বিরহের ও ব্যথার আভাস। ধীরে ধীরে তারি মধ্যে এক সময় চলে-যাওয়ার সুরও শোনা গেল।

আসা-যাওয়ার সুখ-দুঃখের টানা-পোড়েনে মিলন-বিরহের আলো-ছায়াতলে জীবনের জাল-বোনা। কবি বাঁধছে ব'সে এই জাদুময় জাল-বোনা রহস্যেরই গান। সে গানই সে নিবেদন করছে বিশ্বস্রষ্টা পরম জাদুকরের উদ্দেশ্যে।

দেবতার বাণী সে শুনতে পায়। সে বাণী বলছে,—সুখদুঃখ সবই আনন্দের উপাদান মাত্র। মরণে-বাঁচনে হাত ধ'রে চলছে খেলার নাচন। এই খেলায় সকলে যোগ দাও,—জয়ধ্বনি ক'রে চলে যাও।"

শিক্ষকের এই ভাষণের পরে একটি সমবেত সংগীতে মেয়েরা নমস্কার জানাল। তারপরে শুরু হল নাটকের 'পালা। একটি মেয়ে, দলের পক্ষ থেকে রঙ্গমঞ্চের সম্মুখে বসে মাঝে মাঝে কথাগুলি আবৃত্তি করে যাচ্ছিল। সেই কথার ভাবটিকেই পর-পর একক, দ্বৈত বা কখনো সমবেত-সংগীত দ্বারা ব্যক্ত করে তুলছিল অন্যান্য মেয়েরা। নাচগুলিতে ঝলমল করছিল সুরের রূপটি। আলো এবং সাজসজ্জার বর্ণসুষমায় উৎসবস্থলটি হয়ে উঠেছিল জাদুপুরী। অভিনীত-নাট্যরূপটি ছিল এই :

"বসন্তের বাণী"

কথা। বসন্তের বাণী অরণ্যের সব জায়গাতেই প্রবাহিত হচ্ছে দক্ষিণ-সমীরণে; যেখানে সে বাণী সাড়া পায়, প্রাণ জেগে ওঠে, সেখানেই আমাদের উৎসবক্ষেত্র রচিত হয়, সৃষ্টিকার্যের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিত্ত আপনাকে উপলব্ধি করতে থাকে।

গান। (একক)

একটুকু ছোঁওয়া লাগে একটুকু কথা শুনি,
তাই দিয়ে মনে মনে রচি মম ফাগুনী।

কথা। ঐ দেখো ঐ বনফুল, মহাপথিকের পথের ধারে ও ফোটে, তাঁর পায়ের করুণ স্পর্শে সুন্দর হয়ে ওঠে তাঁর প্রণতি। সূর্যের আলো ওকে আপন ব'লে চেনে; দখিন হাওয়া ওকে শুধিয়ে যায়, কেমন আছ।

গান। (নৃত্যযোগে)

আজ দখিন বাতাসে
নাম-না-জানা কোন্ বনফুল ফুটল
বনের ঘাসে।

কথা। (আবৃত্তি)

প্রশ্ন জানাই পুষ্পবিভোর ফাগুন-মাসে
কী আশ্বাসে,
হায় গো আমার ভাগ্যরাতের তারা,
নিমেষ গণন হয় না কি মোর সারা।
প্রত্যহ বয় প্রাঙ্গণময় বনের বাতাস
এলোমেলো,
'সে কি এলো।'

গান। (একক)

আজি যত তারা তব আকাশে
মোর প্রাণ ভরি সবে প্রকাশে।
নিখিল তোমার এসেছে ছুটিয়া
মোর মাঝে আজ পড়েছে টুটিয়া,
তব নিকুঞ্জের মঞ্জরী যত
আমারি অঙ্গে বিকাশে।

কথা। উৎসবের সোনারকাঠি ছুঁয়েছে, চোখ খুলেছে। এইবার সময় হল চারিদিক দেখে-নেবার। আজ দেখতে পাবে, ঐ শিশু হয়ে এসেছে চির-নবীন, কিশলয়ে তার ছেলেখেলা জমাবার জন্যে।

গান। (সমবেত)

আজ কি তাহার বারতা পেল রে কিশলয়,
ওরা কার কথা কয় রে বনময়।

গান। (একক)

যাদ তারে নাই চিনি গো,
সে কি আমায় নেবে চিনে,
এই নব ফাগুনের দিনে, জানিনে।

কথা। আজ সব ভীরুদের ভয় ভাঙানো চাই। ঐ অবগুণ্ঠিতাদের সাহস দাও। বেরিয়ে পড়বার হাওয়া বইল যে। যে-পথিক আপনাকে বিলিয়ে দেবার জন্যেই পথে বেরিয়েছে তার কাছে আত্মনিবেদনের থালি উপুড় ক'রে দিয়ে তবে তাকে আনতে ·ারবে ।নিজের·আঙিনায়। কৃপণতা ক'রে সময় বইয়ে দিলে তো চলবে না।

গান। সমবেত (নৃত্যযোগে)

আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে,
তব অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠিত জীবনে
কোরো না বিড়ম্বিত তারে।

কথা। নন্দিনী, ওই দেখে নাও শিশুর লীলা। মুখরিত হয়ে উঠল প্রাণ-গীতিকার প্রথম ধুয়োটি।

গান। (নৃত্যযোগে)

ওরা অকারণে চঞ্চল,—
ডালে ডালে দোলে বায়ুহিল্লোলে
নব পল্লবদল।

কথা। দূরের ডাক এসেছে।

গান। (নৃত্যযোগে)

দূরের বন্ধু সুরের দূতিরে
পাঠাল তোমার ঘরে।
মিলনবীণা যে হৃদয়ের মাঝে
বাজে তব অগোচরে।

কথা। দোল লেগেছে এবার। পাওয়া আর না-পাওয়ার মাঝখানে এই দোল। এক-প্রান্তে মিলন আর-এক প্রান্তে বিরহ, এই দুই প্রান্ত স্পর্শ ক'রে ক'রে দুলছে বিশ্বের হৃদয়।

গান। (একক)

বসন্তে আজ ধরার চিত্ত হল উতলা।
বুকের প'রে দোলে তার পরান-পুতলা।

গান। (নৃত্যযোগে)

ঘরেতে ভ্রমর এল গুনগুনিয়ে
আমারে কার কথা সে যায় শুনিয়ে।

কথা। বিদায়-দিনের প্রথম হাওয়াটা এবার উৎসবের মধ্যে নিঃশ্বসিত হয়ে উঠল। সভার বীণা বুঝি নীরব হবে, পথের একতারায় এবার সুর বাঁধা হচ্ছে। দূর-দিগন্তের নীলিমায় দেখা যায় অশ্রুর আভাস—অবসানের গোধূলি-ছায়া নামছে।

গান। (একক)

চলে যায় মরি হায় বসন্তের দিন,
দূর-শাখে পিক ডাকে বিরাম-বিহীন।

কথা। হে সুন্দর, যে-কবি তোমার অভিনন্দন করতে এসেছিল তার ছুটির দিন এল। তার প্রণাম তুমি নাও। যে গানগুলি এতদিন গ্রহণ করেছ সেই তার আপন গানের বন্ধনেই সে বাঁধা রইল তোমার দ্বারে।

গান। (একক)

দিয়ে গেনু বসন্তের এই গানখানি।
বরষ ফুরায়ে যাবে ভুলি যাবে জানি।

গান। (একক)

বসন্তে বসন্তে তোমার এবরে দাও ডাক,—
যায় যদি সে যাক্।

রইল তাহার বাণী রইল ভরা সুরে,

রইবে না সে দূরে,

হৃদয় তাহার কুঞ্জে তোমার রইবে না

নির্বাক॥

কথা। খেলা-শুরুও খেলা, খেলা-ভাঙাও খেলা। খেলার আরম্ভে হল বাঁধন, খেলার শেষে হল বাঁধন-খোলা। মরণে বাঁচনে হাতে হাত ধ'রে এই খেলার নাচন। এই খেলায় পুরোপুরি যোগ দাও—শুরুর সঙ্গে শেষের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলিয়ে নিয়ে জয়ধ্বনি ক'রে চলে যাও।

গান। (সমবেত—নৃত্যসহযোগে)

তোমার আনন্দ ঐ এল দ্বারে এল গো

ওগো পুরবাসী।

বুকের আঁচলখানি ধুলায় ফেলে

আঙিনাতে মেলো গো।…

তোমার পরানপ্রদীপ তুলে ধ'রে ঐ আলোতে

জ্বেলো গো॥

বোলপুরে এবার ৩০।৪০ খানি পূজা হয়েছে। এর দ্বারা সংগঠন-কাজের শক্তি উৎসাহ-উদ্যমের ভালো দিকটাও যেমন সূচিত হচ্ছে, মন্দের আশঙ্কাও তেমনি কোণায়-কোণায় না দেখা দেয় এমন নয়। বাজে হৈহল্লা এবং দলাদলি তার সঙ্গে অহাম্মকার প্রশ্রয়ে পূজার ভাবের দিকে কমতি না পড়ে—এটুকু হলেই ভালো। একসঙ্গে মিলেমিশে কাজ করবার শিক্ষাই এখন বেশি দরকার।

* * *

"গ্রামছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ"—দেখতে হয়তো, এখনো তা পড়ে আছে শান্তিনিকেতন ও গোয়ালপাড়া-গ্রামের মাঝে, উঁচু-নীচু আঁকাবাঁকা,যাকে দেখে মনে হবে,—"এ-পথ গেছে কোন্‌খানে তা কে জানে তা কে জানে!" এপাশে ওপাশে কাঁকরের রাজ্য খোয়াই। গরুর গাড়ির ক্যাচ্‌কোঁচ্, গোধূলিতে ঘরে-ফেরা ধেনু-বৎসের হাম্বারব, তাদের গলায় বাঁধা ঘুন্টির ধ্বনি,—সে সঙ্গে রাখালের বাঁশী আর বৈরাগীর একতারার টুং-টাং—এই ছিল এতদিন এপথের মন-ভুলানো মন্ত্র। গো-খুর-ধূলির গেরুয়া রঙে মাখা হয়ে যে-সব পথিক এপথে আনাগোনা করছে, কবির মন ভুলিয়েছে সেই গেঁয়ো চাষী, তিনটাকা মাইনের গুরুমশায়, ধনুক হাতে সাঁওতাল ছেলে—হাটের পথের যত নিরালা যাত্রী। কবি ছাড়া এপথের খোঁজ-খবর কেইবা তখন

রাখত। পুরোনো সেই খড়ো-চালের আশ্রমের সঙ্গে তার পাড়া-পড়শি এই পথখানির চালচলনে একটা ছন্দ বাঁধা ছিল। আজ প্রাসাদপুরী শান্তিনিকেতনের পাশে এই পথটিকে দেখে কথা বদলে গিয়ে মনে খেলে যায়—

"খাপছাড়া ঐ রাঙামাটির পথ......"

—পরিবেশের সঙ্গে মিশিয়ে, এই পথের শান্তিনিকেতনের সন্নিহিত অংশটুকু অন্তত পাকা করা দরকার। দিনরাত চলছে মটর-লরি, তার ভেঁপুর আওয়াজে প্রান্তরের প্রাণ কাঁপিয়ে তোলে, কান পাতা দায়। প্রাণ হাতে নিয়ে পা ফেলতে হয় পথে; হুঁকো-হাতে তামাক টেনে চলবার দিন আর নেই। এই আপাত কঠোরতার পারে আছে সরকারী সেচ-বিভাগের ঐন্দ্রজালিক সৃষ্টি, খালের সাহায্যে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে জল-সরবরাহের অপেক্ষমান রমণীয়তা। কবির 'সোনার বাংলা'র রূপ দেখে এপথেও একদিন গান উঠবে;—কিন্তু যন্ত্রযানের পদ-দাপনে ক্ষত-বিক্ষত কাঁচা-পথের দগ্‌দগে ঘা আজ লোকের চক্ষে নিতান্তই ভীতিসঞ্চারক। পালাক্রমে ধুলো-কাদায় ঋতুতে-ঋতুতে যা ভিতরে-বাহিরে রাঙিয়ে দিয়ে যায় তাতে 'ত্রাহি মধুসূদন' ব'লে প্রলয়নৃত্যে পথ ছেড়ে যাওয়া ছাড়া উপায় মিলছে না। চলবার জন্যই পথ, সে ধারণায় ধোকা লাগিয়ে অচলতার সৃষ্টি করে তুলছে পথের বিসদৃশ-পরিস্থিতি। চারিদিকে যখন পাকা ব্যবস্থা, তখন এ পথটাকে আর কাঁচা রেখে লাভ কী? "ভাঙা পথের রাঙা ধুলো"র গান সেকালে যতই শোনা গিয়ে থাক, আধুনিকতর বাউল হচ্ছে,—"আমার পথে-পথে পাথর ছড়ানো।" ২৩।৬।১৯৫২

*　　　*　　　*

শান্তিনিকেতন-আশ্রম থেকে মাইল দু'তিনেক দূরে কঙ্কালিতলা—মহাদেবের কাঁধ থেকে সতীর দেহের কাঁকাল নাকি খসে পড়েছিল এখানকার জলকুণ্ডে, তাই এটি পীঠস্থান। কোনো মূর্তি নেই, চৈত্র-সংক্রান্তির দিনে কুণ্ডের জলে পূজা হয়, রাশি-রাশি পাঁঠা-বলি হয় আর তিন-চারদিন জমে মেলা। দলে দলে আশ্রমের রাস্তা দিয়ে মাঠ দিয়ে লোক চলেছে দিনে-রাতে। নূতন বছরের হাসিখুশীতে আনন্দোচ্ছল চারদিক। আশ্রমে বর্ষশেষ নববর্ষ ও গুরুদেবের জন্মোৎসবের আড়ম্বর; মেলায় যেতে-যেতে যাত্রীদল উৎসুক-চিত্তে যোগ দিয়ে গেল সে-সব উৎসবে। এই একটি বিশেষ পরিবর্তন আশ্রমের উৎসবে লক্ষিত হচ্ছে। আগে বিশেষ করে শহরবাসী এবং শিক্ষিত-জনগণই এখানকার ক্রিয়াকর্মে আগ্রহে ছুটে আসত; আশ্রমের আশে-পাশের জনসাধারণ এখানকার সম্বন্ধে কিছুটা উদাসীন বা একরকম বিরূপই ছিল বলা যায়। আজকাল প্রায় সব উৎসবে নাটক-অভিনয়ে

স্থানীয় জনসাধারণ স্বেচ্ছায় ব্যগ্র হয়ে এসে যোগ দিচ্ছে। প্রিয়নাথ শাস্ত্রীর লেখা 'শান্তিনিকেতন আশ্রমে মঠ প্রতিষ্ঠা'র বিবরণীতে দেখা যায় যে, প্রথমবার মঠ-প্রতিষ্ঠার সময় আশ্রমের স্থানীয় প্রায় দুশো লোক সভায় সমবেত হয়েছিলেন। তারপরে এখানকার শিক্ষা আদর্শ ও ধর্মকর্মহীন উৎসব-অনুষ্ঠানের তাৎপর্য স্থানীয় লোক হয়তো তেমন বুঝে উঠতে পারেনি। আজ দেশবাসীর দৃষ্টি ও শিক্ষাদীক্ষার পরিবর্তন ঘটেছে, রবীন্দ্রনাথকে জানবার বুঝবার আগ্রহ দেশবাসী জনসাধারণের চিত্তেও প্রবল হয়ে উঠছে। আজ শুধু দুশো স্থানীয় পুরুষ নয়, নরনারী সমবেতভাবে এখানে এসে সভাসমিতি উৎসব অনুষ্ঠান দেখে যাচ্ছে। তারা যে রবীন্দ্রনাথের সীন-সীনারি-মুক্ত সূক্ষ্ম তাৎপর্যপূর্ণ অভিনয় উপভোগ করতে পারছে, কথার রস ও মর্ম সম্বন্ধে উৎসুক হচ্ছে, এটি নিঃসন্দেহ দেশের লোক-প্রগতির পরিচায়ক। ২৩।৪।১৯৫৫

আলাপ-আলোচনা

খদ্দর ও অবনীন্দ্রনাথ

বহুদিন পূর্বে একবার (১৯শে শ্রাবণ রবিবার, ১৩৩৬) শিল্পাচার্য শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় শান্তিনিকেতনে শুভাগমন করেন। ঐ সময়, শান্তিনিকেতনবাসের অবকাশে 'খদ্দর' সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে আমার নিম্নলিখিতরূপ আলাপ-আলোচনা হয়।

"শিল্পের দিক থেকে খদ্দর-আন্দোলন সমর্থন-যোগ্য কি না এবং সমর্থন আন্তরিক, ব্যবহারিক ও অত্যাবশ্যক হওয়া উচিত কি না," এই একটি মূল প্রশ্ন উত্থাপন করতে গিয়ে আমি তাঁকে আগে ব্যাপারটা সঠিক বুঝবার জন্য একখণ্ড কাগজে লিখে জানাই,—

"আপনি নিজেই গতকল্য বক্তৃতায় "শিল্পসৃষ্টির ইতিহাস" বিবৃত করতে গিয়ে নানা উদাহরণ দ্বারা দেখিয়েছেন যে, প্রয়োজন থেকেই শিল্পের উৎপত্তি ও প্রসার। এখন যেহেতু শিল্পের পিছনে প্রয়োজনের তাগিদ নেই, বাস্তব জীবনের সঙ্গে তা বিযুক্ত, সেজন্য শিল্পী বিংশ-শতাব্দীর বস্তু-তান্ত্রিক জগতে যুগপৎ তার প্রয়োজন প্রতিষ্ঠা ও শিক্ষার মূল্য হারাতে বসেছে।

"আজকালকার শিল্পকে কতকটা অবাস্তব আখ্যা দেওয়া যেতে পারে না কি? এই অবাস্তবতা দু'রকমে প্রকাশ পাচ্ছে। একদল শিল্পী সাংসারিক প্রয়োজনের

পীড়নে স্থূল দেহের বাস্তব ক্ষুধাকেই একান্ত সত্য বোধে একদিকে যেমন জীবনের অতি কুৎসিত দিকটাকেই আর্টের উপজীব্য করে ধরেছে, অন্যত্র শুধু সূক্ষ্মতম আনন্দ রস উপভোগের আয়োজনকে উপলক্ষ্য করে একদল শিল্পী আধ্যাত্মিকতা বনাম আদর্শতাত্ত্বিকতাকেই সাধ্য বস্তু জ্ঞানে ক্রমশ ইঙ্গিত থেকে সংগীত ও সংগীত থেকে অরূপ ভাবব্রহ্মের ব্যঞ্জনামূলক প্রচেষ্টায় তাকে কুহেলিকাচ্ছন্ন করে তুলছে। এদের কারো শিল্পসম্ভারই লোকসাধারণের উপভোগ্য নয়। কারণ বস্তুতান্ত্রিক আর্টের স্থূল নগ্নতা যেমন একদিকে কামরসায়ন-তুল্য প্রমত্তকারক, অপরদিকে আদর্শবাদী আণবিক আর্টের কায়াবিলীন ছায়াসর্বস্ব আলেখ্যগুলিও তেমনি অবোধ্য, তেমনি অনাবেদনীয়। এ দুয়ের কোনোটাই কি আমাদের কাজে লাগে? দেহ-বাঁচানো আমাদের যেমন কাজ, প্রাণ বাঁচানো তেমনি। প্রাণের খাদ্য অনুভূতি। সাহিত্য, সংগীত, চিত্রকলাদি শিল্পের উপকরণ থেকে আমরা সেই অনুভূতির রসদই সংগ্রহ করতে চাই, কিন্তু আজ 'আত্যন্তিকতা-দোষে-দুষ্ট' দেহ-বিলাসী আর্ট যেমন দেহের পক্ষেই মারাত্মক, তেমনি তাত্ত্বিক আর্ট প্রেতাত্মার মতোই অশরীরী বৈরূপে আমাদের জীবনের শান্তি-অপহারক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

"আজ লোকচক্ষুর অগোচরে একদিকে আমরা প্যারিস-পিক্‌চারের পরিপোষক হয়ে উদগ্র দেহক্ষুধাকে উগ্রতর করে মাতালের মতো মরিয়া হয়ে সমাধি-নির্বেদ উপভোগ করি, অন্য দিকে,—'ও রসে বঞ্চিত গোবিন্দদাস'—হলেও ভারতীয় চিত্রকলার সুপ্রাচীন ও আধুনিকতম নিদর্শনে ঘর সাজাই শুধু বিদগ্ধ অভিজাত শ্রেণীতে সস্তাদরে 'গুণী' নাম কেনবার জন্য।

"ফলে মেকীর কৃত্রিমতায় ও কুচক্রীর মিথ্যাচারে আর্টের ক্ষেত্রও কলুষিত হয়ে উঠছে। সাধনার সে বিশুদ্ধতা, সে নিষ্ঠা ও সাধুভাব প্রতিদিন লোপ পাচ্ছে বলে আশঙ্কা হয়। আর্টের নামে এই বিলাসিতাই দেশের মধ্যে সকলের দুর্গতি আনয়নের অন্যতম কারণ।

"প্রয়োজনের জিনিস নিজ হাতেই যে যুগে গড়ে তুলতে হত, তখন থেকে,—আর্টের সে-জন্ম-মুহূর্ত থেকে দেখি, স্বাবলম্বন হয়েছে আর্টের ভিত্তি। আজ স্বাবলম্বনের অভাবেই জাতি পরদ্রব্য (বিলাতী বসনভূষণ) ব্যবহারে এত অনুরাগী যে স্বাদেশিকতার আবেদন আর্টের ক্ষেত্রে একটা কূপমণ্ডুকতার বিষয় হয়ে উঠেছে। এই বিলাতীর মোহ, পরানুকরণের আশক্তি ত্যাগ করাবার কামনা এবং স্বাবলম্বনের আচরণে দেশকে আত্মপ্রতিষ্ঠ করে প্রকৃত শিল্প-সংস্কারের আদর্শেই খদ্দর-আন্দোলন দেশে উপাস্থত হয়েছে। বিলাতী-বর্জন এর 'নেতিবাচক' দিক

(Negative-side),—স্বাবলম্বন ও শিল্পসৃষ্টি এর 'ইতিবাচক' (Positive-side) দিক। প্রথমটি ধ্বংসের দ্বিতীয়টি সৃষ্টির রূপ। শুধু এর ধ্বংসের লীলা দিয়ে বিচার করলে একে ছোটো করে দেখা হবে, সুতরাং তাতে একদেশদর্শিতায় অবিচার হওয়ার সম্ভাবনা আছে। নূতন সৃষ্টির জন্যই জীর্ণ দেওয়ালকে ভাঙ্তে হয়। আমাদের বিশ্বাস,—স্বাবলম্বনই এর মুখ্য উদ্দেশ্য; আর এর প্রতিক্রিয়ার দিকটাকে একটু উদার দৃষ্টিতে দেখতে গেলে দেখব,—সত্যিকার এবং সর্বাঙ্গীণ শিল্প-প্রচেষ্টার সূত্রপাত করাই এর অন্যতম সাধনা। স্বাবলম্বনের আদর্শ জাগলে শিল্প জাগবে, যথার্থ শিল্পীও দেখা দেবে,—তা শুধু বস্ত্র-শিল্পে নয়, সাহিত্য, সংগীত, চিত্রকলা সব দিকেই।

"তথাকথিত দেশকর্মী ও শিল্পীদের সহযোগিতায় আন্দোলন যথাযথ পরিচালিত হলে খদ্দর দেশবাসীকে বিলাসবিমুখ, স্বাবলম্বী ও আত্মপ্রতিষ্ঠ করে তুলতে সাহায্য করবেই। তার প্রমাণের সূচনা বাংলাদেশেই কয়েকটি বৃহৎ জাতীয় কর্ম-প্রতিষ্ঠানে আমরা দেখতে পাই।

"খদ্দর তো শুধু মোটা ও টেঁকসই অবস্থায় এসেই তার রূপের পরিপূর্ণতা স্বীকার করেনি। তা ক্রমশ সুচিক্কণ, মসৃণ ও সুদৃশ্য হওয়ার জন্য কত না চেষ্টা করছে, তা কর্মীদের কর্মকেন্দ্র পরিদর্শনেই জানা যায়। খদ্দরের গায়ে সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর লতাপাতার বাহার দেখাবার কাজে কত যে সূচী-শিল্প-নিপুণ স্ত্রী-পুরুষ সাধনারত রয়েছে, তারই খোঁজ কি আমরা একবার ভুলেও নিতে চেষ্টা করি?

"এ শুধু শিল্পের ব্যবহারিক দিক বললাম। তা ছাড়া ঐ সব প্রতিষ্ঠান থেকে ভাবাত্মক (Theoretical) লোকশিক্ষা বিস্তারের জন্য বিদ্যালয় ও ছায়াচিত্র-বক্তৃতার ব্যবস্থা করে কর্মিগণ সাধারণকে খাঁটি শিল্পের সমঝদারিতা-কার্যে অভ্যস্ত করে তুলছেন। শিক্ষা না হলে কী করে লোকসাধারণ শিল্পের সমাদর করবে, তাদের যথার্থ শিল্পজ্ঞান আসবে কোথা থেকে? এই সমস্ত প্রচেষ্টা খদ্দর-আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই চলছে। সাধারণের কাছে অন্ন ও বস্ত্র সমস্যাই আজ দেশের সবচেয়ে সুস্পষ্ট ও প্রধানতম সমস্যা। সুকুমার-শিল্পচর্চা করবার মতো সময় এবং শিক্ষা দু'য়ের কোনোটাই আজ তাদের পক্ষে সুলভ নয়। তাই দেশ-কাল-পাত্র বিচার করেই কর্মিরা খদ্দরের শিল্পের দিক ধ'রে আগে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করতে যাননি। তাঁরা জানেন, সেদিকে তাঁদের প্রচেষ্টা বিফলতা ছাড়া সুফল প্রসব করবে না। এইজন্য খদ্দর মোটা হোক, চিক্কণ হোক, তার উপর তেমন খুব জোর না দিয়ে দেশবাসী সকলে সমবেতভাবে চরকা-খদ্দর গ্রহণ করুক এই প্রবর্তনের

(Introduction-এর) কাজে তাঁরা বিশেষ যত্নবান হয়েছেন। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে দেশে, চরকা-খদ্দর সুফল প্রদর্শনে নিজের প্রয়োজনীয়তা সপ্রমাণের দ্বারা একটু প্রতিষ্ঠা পেলেই, তখন বিপুল উদ্যমে দেশের অবলুপ্ত সুকুমার শিল্পের পুনরুত্থানকল্পে এই সকল খাদি-কর্মিগণ নিজেদের কর্মশক্তির যথাসাধ্য নিয়োগ করবেন, এটাই তাঁদের অন্তর্গূঢ় উদ্দেশ্য।

"সুতরাং দেখছি, খদ্দর তো শিল্পের বিরোধী নয়, বরং অত্যন্ত সহযোগী। তাই এই আন্দোলনকে শিল্পীর তরফ থেকেও সমর্থন এবং আন্তরিকভাবে সার্থক করবার চেষ্টা করা উচিত নয় কি।"

অবনীন্দ্রনাথের উক্তি

তোমার প্রশ্নের উত্তর দেয়ার আগে খদ্দর সম্বন্ধে কতগুলো কথা আমার জানবার আছে। খদ্দর দেশে কী বাণী প্রচার করতে চায়? এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য কী? কোন্ আদর্শে কী ভাবে খদ্দর উৎপন্ন হচ্ছে, এসব বিষয় পরিষ্কার জানতে পারলে, তবেই "শিল্পের ক্ষেত্রে খদ্দরের স্থান" বিচার করা সম্ভব।

আমাদের যা ধারণা,—খদ্দর মোটা, Rough এবং Crude form-এর শিল্প,—বিশেষ করে দেখতে গেলে Primitive যুগের আর্টের নিদর্শনই ওর মধ্যে কিছু মিলতে পারে। খদ্দর থেকে আমরা যে বাণী শুনি, সে হচ্ছে স্থূল প্রয়োজনের বাণী। Utility-র দিক দিয়েই ওকে কিছুটা সমর্থন করা যায় বটে, তাও সেই Utility-র demand-ই বা পূরণ করছে কৈ? Competition-এ খদ্দর হেরে যাচ্ছে মিলের কাছে। তুলনায় মিলের কাপড় ঢের সস্তা, ঢের পাতলা,—তার উপর আবার টেঁকসইও বেশি ছাড়া কম নয়। কেন তবে লোকে তোমার খদ্দর কিনতে যাবে?

শিল্প চায় গতি-পথে নিত্য নূতন বৈচিত্র্য। জীবনে অহেতুকী সৌন্দর্য সৃষ্টি দ্বারা অনাবিল আনন্দ উপভোগ করা নিয়েই তার কারবার। তাকে কোনো মত বা পথ দিয়ে এক মুহূর্ত আড়ষ্ট করবার জো নাই। যেখানে যখনই সে বাধা পড়বে, সেখানে তৎক্ষণাৎ তার মৃত্যু। শিল্পের অভিযানে "ব্যস্, এই শেষ" বলে গন্তব্যের কোনো সীমা রেখাই টানা যায় না।

খদ্দরকে শিল্পের পদবীতে উঠিয়ে নিতে বাধে আমাদের কতকগুলি কারণে। প্রথমত ওর 'গোঁড়ামী', দ্বিতীয়ত—ওর আঁটাসাঁটা হিসেবি ধাতটা, তৃতীয়ত ওর আর্টিস্টিক ভোগাবিমুখতা।

'গোঁড়ামী' বলছি এজন্য যে, খদ্দরওয়ালা মনে করেন, জগতে এ জিনিস ছাড়া কিছুই করবার নেই। আর-সব ছেড়ে দিয়ে উঠে-পড়ে এইটের পেছনেই সকলে লেগে যাক্। খদ্দর যারা বুনবে, যারা পরবে, তারাই শুধু দেশের মুক্তিকামী, তাদের সাধনাতেই হবে দেশের মুক্তি, বাকী কর্ম সব অকর্ম, বাকী লোক সব দেশের কাজে অকেজো। খদ্দর এখন 'স্বদেশীর' একটা ট্রেড্‌মার্ক হয়ে উঠেছে।

তারপর ও নিজেই একটা 'বাজারে'-জিনিসের মতো হিংসবনিকেশের মাল। নিতান্ত সাংসারিক প্রয়োজনেই ওর দাবী সীমাবদ্ধ। খাওয়া-পরার অভাব মেটানো ছাড়া খদ্দরের মধ্যে কি আর বড়ো-কিছু সৃষ্টির আদর্শ আছে?

দেহের ক্ষুধা ছাড়া মনের ক্ষুধা বলে একটা জিনিস আছে—শুধু এমনি থাকা নয়, সেইটেই আজ মানবসভ্যতার বড় কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে জাতির মনের ক্ষুধা যত কম, সভ্যতার মাপকাঠিতে তার স্থানও তত নিম্নে। সাহিত্য, সংগীত, চিত্রকলা ইত্যাদি—এক কথায় আর্ট, এই মনের ক্ষুধারই উপজীব্য। আজ এ সমস্তকে অসাময়িক বলে শৌখীনতার অপবাদ দিয়ে অস্বীকার করা হচ্ছে, তার বদলে খদ্দর এনে দিচ্ছে দেশে Primitive যুগের সেই মোটা-ভাত মোটাকাপড়ে খেয়ে-প'রে সন্তুষ্ট থাকবার স্থূল ভোগবুদ্ধি।

আর যাই বল, আসল কথা, খদ্দর হচ্ছে তোমার Political agitation-এর একটা অস্ত্র বিশেষ। এটা জেনো,—Politics-এর সঙ্গে আর্টের সম্বন্ধ চিরবিচ্ছিন্ন। সুতরাং কী করে ওকে শিল্পের ক্ষেত্রে স্থান দান করি।

২

তুমি একটা প্রশ্নের ছলে দেখছি অনেক কথারই অবতারণা করে বসেছ। যা-হোক, ধীরে ধীরে আমি সব কথারই উত্তর দোব। মোটামুটি-ভাবে দেখতে পাই, বিচার্য বিষয় দাঁড়িয়েছে দুটো,—এক Utilitarian Art আর খদ্দর।

আজ সকালে বেড়াতে বেরিয়েছিলুম। পথের মধ্যে একটু জল এল। ফেরবার মুখে দেখি, আকাশের এক-কোণে রামধনু উঠেছে। ভাবলুম,—'রামধনু কেন'? রং তো ভারী সুন্দর, দেখতেও বেশ লাগে। কিন্তু এ জিনিস দিয়ে কোন্ কাজ হয়? আশেপাশে চাই, সবুজ মাঠ, দু'চোখ জুড়িয়ে গেল। শুধু চোখের তৃপ্তি নয়, ওর থেকে উদরেরও তৃপ্তি হয়ে থাকে। ঐ যে মেঘ মাথার উপরে এদিক-ওদিক

ভেসে বেড়াচ্ছে,—ওরও একটা সার্থকতা বুঝি রসবর্ষণের কাজে। কিন্তু রামধনু দিয়ে তো কারোও কোনো লাভ নেই, কেবল রংএর বাহার দেখাই সার। দূর থেকে ঐ দেখেই যত আনন্দ। একবার ভাবি, রংএর 'রংমহাল' কি ঐ? রহস্যের আর পার পাইনে।

আমাদের আর্টও কেবল রংএর বাহার মাত্র। আপনাকে অমনিতর অহেতুকী-ভাবে রঙের লীলায় আত্মপ্রকাশ করেই তার মুক্তি, তার সার্থকতা—আর কিছুই নয়।

তবে সাধারণত একটা কথা ভাববার আছে। সবুজ মাঠ, নিবিড় মেঘ,—এরা যেমন মন নাচাবার রঙ দেখায়, আবার দেহ বাঁচাবার রসদও যোগায় সঙ্গে সঙ্গেই,—রামধনুর বেলায় সেই উভয়ত লাভ ঘটবার সুযোগ হয় কৈ? এজন্য রামধনুর চেয়ে সংসারের পক্ষে বেশি মূল্যবান জিনিস হয় অন্য দুটি।

আর্টিস্টের কাছে রামধনু যত সমাদরই পাক না কেন, তা দিয়ে বাস্তব জগতের আর্টের বাঁচবার কোনো সুবিধে হবে না। অনেক ঠেকে শিখেছি—আজ আর্টের দুটো দিকই সমান দরকার। 'Art for Art's Sake' এটা আর্টিস্টের আদর্শ মতবাদ থাকতে পারে। কিন্তু আর্টিস্টকে সংসারে চলতে হবে Utility-র সূত্র ধরে।

এখানেই আসে খদ্দরের কথা। Utility-র দিক দিয়ে তো বলেইছি, খদ্দরের একটা মূল্য সেদিকে আছে, Pure আর্টের কথা যদি বল, তো সেখানে আমাদের কারবার feeling নিয়ে—শুধু বস্তু নিয়ে নয়। আমরা চাই texture এবং feeling। খদ্দরও তা দাবি করতে আসবে, সে আমরা আর্টিস্টরা কেন, কেউ সে দাবি স্বীকার করবে না।

খদ্দর একহারা, মোটা, খসখসে খাটো-খাটো বিদঘুটে চেহারা নিয়ে এল; সিল্ক, মলমল এল সুচিক্কণ সুকুমার চেহারা নিয়ে। এখন এই যে নানা quality-র বস্তু কমিয়ে এক মোটামুটি-জিনিসের মধ্যে আমাদের কাপড় ইত্যাদি সম্বন্ধে শিল্পজ্ঞানকে বদ্ধ রাখার চেষ্টা হচ্ছে—ঐ জিনিসটাই আমার ভালো লাগে না।

প্রথম-প্রথম আমরাও খদ্দর পরতুম। এক ছাত্র আমাকে একসুট খদ্দরের পোশাক উপহার দিয়েছিলেন, পরেছিলুম। কিন্তু ও পোশাক দু'চারদিন বাদেই আমার কাঁধে ঝন্‌ঝন্‌ করে বাজল।—ভার সইতে পারলুম না। সেটা বাক্সে তুললুম। আজকালও শীতের দিনে নামিয়ে নিয়ে মাঝে-মাঝে পরি। খদ্দরের টুপীগুলো দেখতে বেশ লাগত। কিনে মাথায় দিলুম। কিন্তু যেদিন দেখলুম,

ওকে কংগ্রেসওয়ালারা তাদের কংগ্রেসী 'ব্যাজ' বলে গণ্য করতে লাগল—খদ্দরধারী না হলে ভোট পাবে না, ভোট দেবে না,—এই যখন ব্যাপার গড়াল,—রেখে দিলুম সেই টুপী। বুঝলুম,—পলিটিক্যাল ধ্বজা, ওতে আমাকে পোষাবে না। সাঁওতালের মেয়েরা নিত্য খদ্দর পরছে, তাই পরে সাজছে ত তারা। তাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে জড়িয়ে গেছে যেভাবে ঐ মোটা চাল মোটা কাপড়, সে ভাবের যোগ আমাদের খদ্দর-প্রচারকদের সঙ্গে ঘটেছে কি কাপড়খানার বা মোটা চালের?—খদ্দর যে 'ব্যাজ' হয়েই মরে গেল। কোনো বিশেষ দেশ বা কোনো বিশেষ কাল বা কোনো বিশেষ creed-এর গণ্ডীবদ্ধ হয়ে থাকা শিল্পীর ধর্মবিরুদ্ধ কাজ।

আর একটা বড় অভিযোগ, খদ্দরে প্রগতি (Progress) নেই।—সেদিকে কারো লক্ষ্য তো নেই-ই, অধিকন্তু একরকম বিরুদ্ধ চেষ্টাই আছে। শুধু খদ্দর বলে নয়, সূক্ষ্ম-শিল্প মাত্রেই বিলাসিতা নামে খদ্দর-পন্থীদের দ্বারা প্রসারে বাধা পাচ্ছে।

ঢাকার তাঁতীরা দেখালে—কত সূক্ষ্ম সব কাপড়ের পাড়ের কাজ, তাঁদের সরঞ্জাম ইত্যাদি। দেখে আমি অবাক্! বললুম,—"তবে না কি দেশ থেকে মসলিন্ শিল্প লোপ পেয়েছে!" তারা বললে—"কোথায় লোপ পেয়েছে বাবু! ফরমাশ দিন, খরিদ্দার জুটুক, দেখাব মসলিন্ আবার হয় কি না দেশে।"—এদের কেউ উৎসাহ দিচ্ছে না, সবাই মোটা খদ্দর করতে ব্যস্ত। শিল্প গড়বে কী করে? শিল্পী যে না খেয়ে মরছে, এদের মারছে কারা?

তোমরা বল,—ইংরেজ ওদের আঙুল কেটে দিয়েছে। আমি বলি—"তার নজির কোথায়? আঙুল কাটত আগেকার নবাবরা। পছন্দ-মাফিক ভাল জিনিস তৈরি না হলে, সেই ছিল সেদিনকার তাঁতীদের প্রতি তাঁদের শাস্তির ব্যবস্থা। বরঞ্চ কী করে স্বদেশী-শিল্প উন্নত করতে হয়, সে বিষয় ইংরেজরাই আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত। ওরা আমাদেরই দিয়ে আমাদের আনাচে-কানাচের স্থূল-সূক্ষ্ম হরেকরকম শিল্পের ছাঁচ সংগ্রহ করেছে। রাশি রাশি টাকা ঢেলে তার নির্মাণ-কৌশল কারিগরদের কাছ থেকে শিখে নিয়েছে। তার পরে নিজেরা সে-সব শৌখীন জিনিস Manufacture করে আমাদের দেশে সস্তায় চালান দিয়েছে। তাদের হাত থেকে সস্তা পেয়ে আমরা সেই নকল-শিল্পের নমুনা দিয়ে ঘর-বাড়ি দেহ-মন ছেয়ে ফেলেছি।—ফেঁপে উঠেছে ওরাই, আজ দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে আমরা যাচ্ছি মারা। দোষ দেব কা'দের—স্বখাত-সলিলে ডুবে মরছি যে আমরাই।

খদ্দর দেশের কী করলে? এক সময়ে এই দেশেই হাতে যে মসলিন্ তৈরি হত, আজো এই বিজ্ঞানের জগতে কোনো কালে সে জিনিস তৈরি করতে সমর্থ হয় নি। মসলিন্ শিল্পের ক্ষেত্রে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করে আছে। খদ্দর সে স্তরে উন্নীত হতে পারবে কি?

আমার কথা

আগে বলেছি এখনো বলি, খদ্দর চায় দেশের অন্নবস্ত্রাভাব দূর করে দারিদ্র্যের হাত থেকে দেশকে বাঁচাতে। দেশবাসীর স্থূল দৈহিক ভোগবিলাস-প্রবৃত্তি ছাড়িয়ে তাকে স্বাবলম্বনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে সত্যিকার শিল্পী করতে। স্বাবলম্বনই শিল্পীর ধর্ম।

খদ্দর মোটা Rough-এ সবই সত্য। কিন্তু ওর আদর্শ রয়েছে মসলিন্। অনভ্যাসে এবং পরাধীনতার পাপে দেশ ভুলে গিয়েছে স্বাধীনভাবে স্বহস্তে সূক্ষ্ম সুতো তৈরির কাজ। আগে চরকায় সুতো হবে, তবে তা তাঁতে উঠবে। জনকয়েক ঢাকাই তাঁতী হয় তো বা সূক্ষ্ম কাপড় বুনতে পারে, কিন্তু দেশের লক্ষ লক্ষ তাঁতী সে বিষয়ে অনভিজ্ঞ। সুতোর সঙ্গে সঙ্গে তাদেরও হাত সূক্ষ্ম হবে। একদিনেই সব আর হয়ে ওঠে না—উঠবেও না। সাধনা সময়-সাপেক্ষ। এই সাধনার কৃচ্ছ্রতা (যেমন মোটা খদ্দর পরিধান, বেশি দাম সত্ত্বেও খদ্দর ক্রয়, অধ্যবসায় সহকারে চরকা কাটা, হিসেবি হয়ে খদ্দরকেন্দ্র খুলে খদ্দর তৈরি করা ইত্যাদি) স্বীকার না করে নিলে সিদ্ধি অসম্ভব। সকলে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় চরকা না ধরলে, খদ্দর না পরলে—খদ্দর তৈরি বা হবে কী করে, বিক্রীই বা হবে কার কাছে—সূক্ষ্ম Texture হওয়া তো দূরের কথা। অন্যান্য দেশে ও জিনিস ছোঁবে না। আমাদের সমস্যা আমাদেরই। যদিও ওর সুকুমার-শিল্পের দিকটাকে কর্মিগণ এখনও ততটা মনোযোগের সহিত গ্রহণ করেননি, তবু খদ্দর কোথাও নিজের অভিযানের মুখে শেষ-সীমারেখা টেনে দিয়েছে, এ কথা বললে ওর প্রতি খুব অবিচার করা হবে। প্রাণপণে সে চলছে, এগিয়েই চলেছে। ব্যবসায় এবং ব্যবহার দুটা দিকই ওর আপেক্ষিকভাবে পরস্পর পরস্পরকে উন্নতির দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আপনারা সহানুভূতি ও সাহায্য করুন, পাড়ের ভালো ভালো নক্সা দিন, দেখবেন বিলাতী ছাপ-ব্যবহার আপনিই বন্ধ হয়ে যাবে। আপনারা শিল্পের ক্ষেত্রে খদ্দরের সমর্থন করলে দেশের অভিজাত ও শিক্ষিত-সম্প্রদায় ঝুঁকে পড়বে এর দিকে।

জিনিসটাকে নেহাত 'বস্ত্র' হিসাবেই দেখবেন না। ওর পিছনে যে স্বাবলম্বনের আদর্শ আছে, নির্যাতিত-মানবের জন্য যে সংহত সহানুভূতির ইঙ্গিত আছে, সেইটে দিয়েই ওকে বিচার করবেন। এখানে কবিকে (রবীন্দ্রনাথকে) মহাত্মাজী চরকা ধরতে অনুরোধ করে যে যুক্তিপূর্ণ কারণ নির্দেশ করেছিলেন, সেইটুকুই উদ্ধৃত করে কথাটা পরিষ্কার করতে চাই। তিনি বলেছিলেন—"সত্য কথা এই যে, আমি কাহাকেও স্ব-স্ব জীবিকা ত্যাগ করতে তো বলিই নাই, পক্ষান্তরে স্ব-স্ব নির্দিষ্ট কাজের উপর প্রত্যহ মাত্র ৩০ মিনিট চরকা কেটে সমগ্র জাতির জন্য কিঞ্চিৎ ত্যাগ-স্বীকারে অনুরোধ করেছি। যে-সমস্ত ক্ষুধাতুর নরনারী কর্মের অভাবে বেকার বসে আছে, তাদেরও আমি চরকাই জীবিকারূপে গ্রহণ করতে এবং যে সমস্ত কৃষক-পরিবার অর্ধাশনে কাল কাটায়, তাদের অবসর-কালে চরকা দ্বারা আয় বৃদ্ধি করতে অবশ্যই আমি বলেছি। যদি কবি প্রত্যহ আধ ঘণ্টা করে চরকা কাটেন, তা হলে তাঁর কবিতা আরও সমৃদ্ধ হবে। কেন না তাতে দারিদ্র্যের অভাব ও বেদনা অধিকতর সত্যভাবে কবির মধ্যে প্রকাশিত হবে।"

খদ্দর-সম্বন্ধেও আমি এ কথাটাই শুধু জানাতে চাই। আপনি বলেন সিল্ক-মখমলের মতো খদ্দরে তেমন সুকোমল স্পর্শ বা মনোহর রূপ অনুভব করা যায় না। স্থূলতা দেখলে সে বিষয়ে দ্বিরুক্তি করবার উপায় নাই সত্য। কিন্তু জনসাধারণের কথা ছেড়ে দিয়ে বিশেষ করে আর্টিস্টদের কাছ থেকে আরো গভীরতর অন্তর্দৃষ্টি আশা করা বোধ হয় অসংগত নয়। মহাত্মাজী যখন কটিবাস পরেন বা তাঁর অনুবর্তীরা যখন আর-কেউ সক্ষম হয়েও সূক্ষ্ম দামী কাপড় রেখে ঐ মোটা Rough খাদিই ব্যবহার করেন, তখন সেই তুচ্ছ বস্ত্রটুকুর ভিতরে কি তাঁর বা তাঁদের মানবের প্রতি ব্যাপক একটা সহানুভূতি বা যাকে বলেন feeling তা ফুটে ওঠে না? কোনো একটা dogma-র থেকেই যে তাঁরা সব-সময় ঐ খাটো কাপড় পরেন, তা নয়,—দেশের প্রয়োজন ও পারিপার্শ্বিক অভাবান্বিত-অবস্থা বিবেচনা করেই, নিজেদের দেশের দশজনের অশনবসনের standard তাঁরা একটা ঠিক করে নিয়েছেন এবং কতকটা সেই standard-এ-ই আপন-আপন জীবনযাত্রা নির্বাহ করছেন। তাঁদের সেই আদর্শটিকে যদি আমরা বস্ত্রের উপর আরোপ করে দেখি, তবে সেই আদর্শেরই মহিমালোকে ওর যা-কিছু Roughness বা নগ্নতা সব ঢাকা পড়ে যায়। অবশ্য নিছক ভাবের আবরণ দিয়ে সাধারণ লোকের কাছে তাকে ঢাকা পড়ানো খুব শক্ত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ তাদের অত সূক্ষ্মবোধ নেই। তবু এ-ও তো দেখা যায়, ঐ সাধারণ-লোকও খদ্দর-পরিহিত

কাউকে দেখলেই কিছু-না-কিছু সত্যের প্রতি অনুরাগী ও নির্যাতিতের উপর সহানুভূতিশীল বলে তাকে ধারণা করে থাকে। সবখানেই যে খদ্দরধারিগণ তাদের সহজ সরল বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষা করে চলেন, তা বলে আমি সত্যের অপলাপ করতে চাই না। মোট কথা হচ্ছে এই যে, খদ্দর দেখে তাদেরও মনে একটা feeling জাগে। কিন্তু খদ্দরকে আরো সুন্দর ও সস্তা না করতে পারলে বেশিদিন শুধু এই feelling দিয়ে কাজ চালানো যাবে কি না সে বিষয়েও খুব সন্দেহ বিদ্যমান।

এই তো গেল feeling-এর কথা। Texture-এর কথা আগেই বলেছি। সে ক্ষেত্রের দায়িত্ব বিশেষ করে আপনাদেরই। আপনারা ভালো-ভালো ডিজাইন্ খাদি-কর্মিদের কাছে উপস্থিত করুন, শিক্ষিত দেশবাসীর মধ্যে দেশীয় শিল্পের সমাদর যে-করে-হোক, বৃদ্ধি করুন, আমার তো মনে হয়—texture আপনি ভালো হয়ে যাবে। তা না করে অপবাদ দিচ্ছেন খাদি-কর্মিদের নামে যে, তাঁরা 'গোড়া', তাঁদের হিসেবি-ধাত, তাঁরা সূক্ষ্ম-ভোগবিতৃষ্ণ। রাজদ্বারে স্বদেশবাসীর হাতে শত সহস্র অপবাদ, বাধাবিঘ্ন সহ্য করেও নিজেদের বিশ্বাস অটল রেখে, অবিচলভাবে সত্যকে কর্মক্ষেত্রে যাচাই করবার সাধনায় আজ তাঁরা ব্রতী। তাঁদের সেই নিষ্ঠাকেই বিরুদ্ধবাদীর দল তাঁদের 'গোঁড়ামী' বলে ভুল করেছেন। আপনারাও সে ভুল করলে দুঃখ হয়।

দ্বিতীয়ত তাঁরা যে হিসেবী, সে কথাও সত্য। কারণ সংসারে খাদি-চরকা শুধু আদর্শের উপরই দাঁড়াতে পারে না, যেমন পারে না 'রামধনু' শুধু রংএর আনন্দ দিয়েই একান্তভাবে আদৃত হতে। খাদির অর্থনৈতিক দিকও সুপ্রতিষ্ঠিত করা দরকার। খেয়ে বাঁচলে তবে আদর্শ নিয়ে চলা যায়। বেঁচেই আমরা শিল্প গড়ি, মরে নয়; এ কথাটা সত্য মান্‌লে, শিল্পের এই Utilityর দিকটাকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। আর Utility মান্‌লে, Politics-এর সঙ্গে আর্টের যে একেবারেই কোনো সম্বন্ধ নেই, এ কথা সম্পূর্ণ স্বীকার করতে পারিনে। আপনার নিজেরই কথা এখানে মনে হচ্ছে। আদর্শকে সার্থক করতে গিয়ে কত বিরুদ্ধতা, নিরাশার আঁধার ভেদ করে আপনাকে এগুতে হয়েছে!—ঠিক খাদি-প্রচারকদের মতোই। তবে সৌভাগ্যের কথা,—রাজশক্তি আপনার অনুকূলে ছিল প্রথম থেকেই। এখনো তাই আছে। সেই কারণেই সর্বতোভাবেই না হোক্, অনেকাংশে আপনার সাধনা আজ এমনি ফলবতী হবার অবকাশ পায়নি কি? রাজশক্তির পোষকতা পেয়েই যে একদিন আদর্শ বস্ত্র-শিল্পের নিদর্শন মসলিন্ জন্ম নিয়েছিল,

সে ঐতিহাসিক সত্য আপনার কাছ থেকেই আমাদের শোনা। বর্তমানেও আপনার-স্কুল কতকটা সে সাক্ষ্যই দিচ্ছে। এবং এ-ও চোখের উপরই দেখছি, যে-কোনো শিল্প সরকারের স্বার্থের বিরোধী, তা-ই তাদের কাছ থেকে প্রসারে বাধা পাচ্ছে,—তবে কী করে বলি Politics-এর সঙ্গে আর্টের সম্বন্ধ চিরবিচ্ছিন্ন? Political agitation-এর পিছনে ভিত্তির মতো রয়েছে বলেই এখনো 'খাদি-চরকা' দেশে শত সংগ্রামের মধ্য দিয়েও দৃঢ়ভাবে টিকে আছে।

আর এক কথা,—আর্টিস্ট তার দেশ, কাল, পাত্রকে, এক কথায় বাস্তবকে অস্বীকার করলে, চলবে কেন? 'আকাশ কুসুম' কল্পনাও নিছক কল্পনাই নয়। বাস্তব আকাশ এবং উদ্যানের কুসুম, এ দুই-ই আপেক্ষিকভাবে ওর উপাদান হয়ে আছে। আপনাকে বলতে পারি, আপনার এই জোব্বা পোশাক ছেড়ে আপনি কেন আটপৌরে স্যুট পরেন না? তার কারণ আপনিই বলেছেন—ওটা আপনার বংশের ধারার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ওই জোব্বাটি আপনার বংশের একটি বিশেষ পরিচয় বহন করে—সুতরাং বিশেষ একটি feeling জাগায়। কংগ্রেসের দ্বারা খদ্দর যদি বা সেই স্বজাতীয় বিশেষ পরিচয়ের পোশাক হিসেবেই গণ্য হয়,—হোক্ না,—তাতেই বা ওর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবার কী আছে? জাতি-মাত্রেই পোশাক-পরিচ্ছদের বিশেষত্ব রক্ষায় সতর্ক এবং সচেষ্ট। তা বলে আর্টের ধ্বজা সেখানে অবনত হয়নি। বিশেষ করে প্রাণবন্ত জাতির অনুরাগ ও বীর্যের আশ্রয়েই সে দিন-দিন বর্ধিত হচ্ছে। যে জাতির বীর্য আছে, প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগও তার স্বাভাবিক চারিত্রিক সম্পদ। আমরা বীর্যহীন—জাতীয়তার নামে আমরা সংকীর্ণতার বিভীষিকা দেখি। তাই সাহস করে কেউ সচেষ্ট হয়ে জাতির সত্য পরিচয় আজো সম্পূর্ণ উদ্ধার করতে অগ্রসর হল না।

আপনারা তবু একদল সাধক সে-পরিচয়ের সাধনায় সমাহিত থেকে একদিক দিয়ে দেশের কত না মহৎ কাজ করছেন—ঠিক অপরক্ষেত্রে আপনাদেরই মতো অন্য আর-এক দল দেশের অন্য-এক রূপের পরিচয় উদ্ঘাটন করতে প্রাণপণে ব্রতী হয়েছেন। আমাদের তো মনে হয়, দুয়ের আদর্শই এক, সত্যে কারো কোনো বিরোধ নেই। কেবল যত কিছু ভুল ধারণা, গণ্ডগোলের সৃষ্টি, তা ঐ দূর থেকে পরস্পর পরস্পরের কাজে উদাসীন হয়ে থাকাতেই।

এক খদ্দরই যে মানব-সভ্যতার সর্বাঙ্গ নয়, এ কথা খদ্দর-কর্মিরাও ভালো করেই জানেন। জানেন বলেই খদ্দরকে উপলক্ষ্য করে ও দিয়ে দু'মুঠো ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থা করে, সংঘবদ্ধ জনসাধারণের সহানুভূতি, তাদের মনোবৃত্তিকে সত্য সাধনার

অনুকূল করে নিয়ে শেষে আর যা-কিছু উন্নততর জ্ঞানবিস্তারের ব্যবস্থা করবেন,—এই ধারণাতেই তাঁরা কাজ করছেন।

আমার শুধু শেষ নিবেদন এই, খদ্দরকে শুধু খদ্দরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না দেখে ওর আদর্শ ও দৃঢ় ভবিষ্যের ক্রিয়াটিতে আপনারা লক্ষ্য রাখবেন, তবেই ওর সত্য পরিচয় লাভ সহজ হবে, ওর থেকে বড়-কিছুব আহ্বান আসবেই আসবে।—সে আহ্বান হচ্ছে মানবের প্রতি মানবের সহানুভূতি আর স্বাবলম্বন—শিল্প-সাধনার যা প্রথম ও প্রধান উপায়।

অবনীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্ত

(লিখিতভাবে)

আমি বলি,—খদ্দর প্রচার করতে চলা মানে তাঁতিদের বলা তোমরা কেঁচে গণ্ডুষ করে এসো।

যার হাত সূক্ষ্ম বুনতে নিপুণ ও অভ্যস্ত হল বংশপরম্পরা ধবে, সেই তাঁতিকে মোটা কাপড় বুনতে নিযুক্ত করা,—তাব উপর জুলুম কবা মোটা রকম চলনসই কাপড় বোনবার তাঁতি—তা'ও আছে, দেশে তারাই আদর পাবে আর সুনিপুণ তাঁতিরা তাঁত বুনে খেতে পাবেন। এই কারণেই ঐ দুই রকম কাপড় অর্থাৎ মোটা ও সূক্ষ্ম পোশাকি ও আটপৌরে—এ সব রকমই চলন হওয়া চাই। তবে মিটবে দেশের মস্ত একটা শিল্প-সমস্যা। এ কাজ শিক্ষিত লোকদেরই করতে হবে, এটা বলাই বাহুল্য। ব্যবহার এবং ব্যবসায় দুই দিক দিয়েই কাপড়গুলোকে প্রচার করা, দেশের সুশিক্ষিতদেরই কাজ।

আচার্য নন্দলাল বসু

১৮৮৩ সনে ৩রা ডিসেম্বর, দ্বারভাঙা স্টেটের খড়্গপুরে আচার্য নন্দলাল বসু জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার। অল্প বয়েস থেকেই নন্দলাল কাদামাটির মূর্তি-গড়া ও খড়িমাটি দিয়ে অঙ্কনকার্যে নৈপুণ্য লাভ করেন। ম্যাট্রিক পাশ করে তিনি কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন কিন্তু সে-শিক্ষা বেশিদূর অগ্রসর হয়নি। কলকাতায় গভর্মেণ্ট-আর্টস্কুলে আচার্য অবনীন্দ্রনাথের ছাত্র হিসাবে তিনি যোগদান করেন। শিক্ষানবিশী সমাপ্ত করে ১৯১৪ সালে তিনি শান্তিনিকেতনে আসেন।

১৯১৯ সনে নন্দলাল শান্তিনিকেতনে কলাভবনের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। এবং দীর্ঘ কাল এ বিভাগের অধ্যক্ষ থেকে তিনি শান্তিনিকেতনের আর্ট-বিভাগটিকে গ'ড়ে

তোলেন। কলাভবনের আরম্ভ থেকেই নন্দলাল বসু এর সঙ্গে জড়িত। 'রবীন্দ্র-জীবনী'কার বলেছেন—

"১৩২৬ পূজাবকাশের পর আসেন নন্দলাল বসু। সুরেন্দ্রনাথ, অসিতকুমার ও নন্দলাল এই ত্রয়ীর যোগে কলাভবনের পত্তন হইল।"

নন্দলাল বসুর একটি স্কেচ থেকে রবীন্দ্রনাথ লেখেন—'ছড়ার ছবি'র গ্রন্থের 'খ্যাকরা' কবিতাটি। নন্দলালের পঞ্চাশতম-জন্মতিথি-উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতায় লেখেন—

"তোমারই খেলা খেলিতে আজি
উঠেছে কবি মেতে।"

৯ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮ পূর্ণিমা

এবং নন্দলাল বসুর নামে কবিতাটি উৎসর্গ করেন। তাঁকেই উৎসর্গীকৃত কবির 'বিচিত্রিতা' কাব্যগ্রন্থে সেটি মুদ্রিত হয়। ১৯২৪ সালে নন্দলাল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দূরপ্রাচ্য—চীন-জাপান প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করেন। কাশী হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫০ সালে তাঁকে ডক্টরেট, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় "দেশীকোত্তম" এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় "ডি. লিট." উপাধিতে ভূষিত করেছে। ১৯৫২ সালে তিনি কলাভবনের অধ্যক্ষ-পদ থেকে অবসর নিয়ে শান্তিনিকেতনেই বাস করছেন। তাঁর অসংখ্য ছাত্রমণ্ডলী দেশবিদেশে ছড়ানো। শিল্পাচার্যরূপেই তিনি শ্রদ্ধেয় ও সুপ্রতিষ্ঠ কিন্তু আশ্রমে জীবন-রচনার-শিল্পের ক্ষেত্রেও তাঁর চরিত্র ও কর্মের দানে তিনি আদর্শ হয়ে আছেন। রবীন্দ্রনাথ এক ভাষণে বলেন—

"এদের অনেক পরে আশ্রমের সাধনাক্ষেত্রে দেখা দিলেন নন্দলাল। ছোটো বড়ো সমগ্র ছাত্রের সঙ্গে এই প্রতিভাসম্পন্ন আর্টিস্টের একাত্মতা অতি আশ্চর্য। তাঁর আত্মদান কেবলমাত্র শিক্ষকতায় নয়, সর্বপ্রকার বদান্যতায়। ছাত্রদের রোগে, শোকে, অভাবে তিনি তাদের অকৃত্রিম বন্ধু। তাঁকে যারা শিল্পশিক্ষা উপলক্ষে কাছে পেয়েছে তারা ধন্য হয়েছে।" —আশ্রমের রূপ ও বিকাশ।

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর উনসত্তরতম-জন্মতিথি-উপলক্ষে কলাভবনের ছাত্র-ছাত্রিগণ ৩রা ডিসেম্বরে একটি জলসার আয়োজন করেছিলেন। ৬—৯ ডিসেম্বর চারদিন-ব্যাপী হ্যাভেল-হলে একটি চারু ও কারুশিল্পের প্রদর্শনী হয়েছিল।

২৩।১২।১৯৫১

সৌন্দর্যতত্ত্বে নন্দলাল

এক-সময়ে শান্তিনিকেতন কলাভবনে শিল্পাচার্য শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয়ের সহিত শিল্প ও সৌন্দর্যতত্ত্ব বিষয়ে কিছু আলাপ-আলোচনা করবার সুযোগ লাভ করি।

আমার প্রশ্নগুলি আমি একখানি কাগজে ধারাবাহিকভাবে লিখে পূর্বেই তাঁকে দিয়েছিলুম। তার একটির সমাধান আর-একটির সমাধানের অপেক্ষা করায় বারে-বারে খণ্ডিতভাবে উত্তর দেওয়া সম্ভবপর হয়নি। আমার খণ্ডিত প্রশ্নগুলি ও তাঁর অখণ্ড উত্তরটি তাই আমি পৃথক-পৃথকরূপেই এখানে লিপিবদ্ধ করলাম।

আমার প্রশ্ন ছিল:

১। সৌন্দর্য কী?

২। সৌন্দর্য-বিচারের কোনো সর্বজনীন আদর্শ আছে কি না?

৩। এই-এইভাবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির সংস্থান হলে গতির ভঙ্গীটি এরূপ আকারে হলে, তা সুন্দর হবে।—সুন্দর,—কেন সুন্দর হবে?—ব্যক্তিগত অনুভূতি ছাড়া এর আর-কোনো কারণ নির্দেশ করা যায় কি?

৪। যা সৎ (চিরন্তন), যা মঙ্গলকর, যা চিত্তচমৎকারী ও যুগপৎ বিশুদ্ধ আনন্দ-বিধায়ক, তাই সুন্দর কি না?

৫। সৌন্দর্য-বিচারে অনুভূতি-বৈষম্য সৃষ্টি হয় কেন? এক কবি বর্ষাকে আনন্দের রূপে, আর-একজন তাকেই দুঃখের রূপে দেখতে পান কেন?

৬। সৌন্দর্য কি রস অথবা রূপ?

৭। অনুভূতিই যদি সৌন্দর্যের মূল হয়, তবে জীবমাত্রেরই সে অনুভূতি (সুপ্ত থাকুক বা জাগ্রতাবস্থায়ই থাকুক) মূলে থাকে কি?

৮। সেই অনুভূতি-বস্তুটি কি অনুশীলনলভ্য?

৯। অনুশীলনলভ্য হলে চেষ্টা করে কেন কবি বা শিল্পী হওয়া যায় না?

১০। সৌন্দর্য-উপলব্ধির সাধারণ কৌশলটি কী?

সৌন্দর্য কী, প্রথমে এই কথাটির ব্যাখ্যান দিতে গিয়ে আচার্য বলতে শুরু করলেন,—"এ তত্ত্ব নিয়ে মনীষীমণ্ডলে বহু আলোচনা চলেছে, তা থেকে মত-বৈষম্যেরও সৃষ্টি হয়েছে কম নয়। এই মত-সংঘাত থেকে সৌন্দর্যকে নানা দিক দিয়ে নানারকমে দেখবার অনেক আলো যে আমরা পেয়েছি, এইটেই একটা মস্ত বড় লাভ বলতে হবে। মহামতি টলস্টয় তাঁর 'What is Art' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে এরূপ বহু সমালোচকের আদর্শ সংগ্রহ করে, তার উপরে তাঁর নিজেরও একটি বিশেষ মত স্থাপন করেছেন। এ পর্যন্ত আমি যতদূর এ সম্বন্ধে অনুধাবন করবার সুযোগ পেয়েছি, তার অভিজ্ঞতা থেকেই আজকের আলোচ্য বিষয়ের সমাধানে সচেষ্ট হব।

সৌন্দর্য কী, তা এক কথায় বলা শক্ত, তবে মোটামুটি এই পর্যন্ত বলা যেতে পারে যে, সৌন্দর্য হচ্ছে পূর্ণতারই প্রকাশ। বস্তু, মন ও অভিব্যক্তি (expression)—এই তিনটি জিনিস নিয়ে তবে পূর্ণতার উদ্ভব হয়। কবি তাঁর কাব্যে যে সৌন্দর্যের সমাবেশ করে, বিশ্লেষণ ক'রে দেখলে, আমরা গোড়ায় গিয়ে দেখতে পাব, সেখানে রয়েছে স্থূলত দুটি জিনিস—একটি বস্তু, আর একটি তাঁর মন; তাছাড়া "মনের মাধুরী" বলে আরও একটি জিনিস আছে সেখানে—দৃষ্টির অগোচরে। এই মনের মাধুরীই হচ্ছে—ইংরেজিতে যাকে বলা হয় mood of expression! শিল্পী যিনি, তিনি এই 'আপন মনের মাধুরী' মিশিয়েই তাঁর 'সোনার স্বপন সাধের সাধনার ধন' মানসীকে রচনা করেন। বস্তুত অহরহই দেখি, মনও হয়ত সে-দেখাতে কখনো-কখনো সাড়া দেয়, কিন্তু এক এই mood জিনিসটির অভাবে সকলে আমরা কবি বা শিল্পীর পদ লাভ করতে পারিনে। মনের এই মাধুরী-লাভ সাধনা-সাপেক্ষ। মানবমাত্রেরই সৃষ্টির প্রথম থেকে হৃদয়-বীণাটি নয় রকম অনুভূতির নয়টি তারে সমান করে বাঁধা থাকে এবং এ কথাও সত্যি যে, প্রতি বস্তুরই অন্তরে এক-একটি বিশিষ্ট সত্তা বা ধর্ম আছে—জগতে যা নিয়ে তার অস্তিত্ব। মানুষের সেই প্রাণের তারে বস্তুর যে গুণ (বা ধর্মটি) যখনি যতখানি জোরে আঘাত করে, তখনি তার চেতনা বেশী জাগ্রত ও আবিষ্ট হয়ে পড়ে। এই আবেশের অবস্থায় দুটি ভাবের উদ্ভব হয়—একটি রস আর একটি ভাবাবেগ বা emotion।

রস ও ভাবাবেগ দু'টিকে সাধারণত আমরা একই জিনিস বলে গণ্য করে থাকি। কিন্তু ঐ করে এখানে একটা মস্ত ভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে; রস ও ভাবাবেগ দুটিই একেবারে স্বতন্ত্র বস্তু। একটা উদাহরণ দিলে আশা করি, সে-স্বাতন্ত্র্যটা

বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠবে। একটি অসামান্য সুন্দরী ষোড়শীকে সাধারণভাবে দেখলে সাধারণ-মানুষ মনে একটা নিবিড় আকর্ষণ অনুভব করে। সেটা নিছক ভাবাবেগ বা মোহ—কামজ ভোগেই তার পরিণতি। কিন্তু শিল্পীর চোখে যদি দেখতে যাই, তরুণীর যৌবন-বিকশিত তনুর তনিমা, রূপ-সায়রে সে যেন একটি সদ্যপ্রস্ফুটিত পূর্ণ শতদলের মতোই আমার মানসপটে প্রতিভাত হবে এবং তখন তার রূপের স্বর্ণমায়াটি আমার চিত্তে নিরাবিল আনন্দ-রসের উদ্রেক করে আমাকে সুন্দরের মহিমার ধ্যানে গভীরভাবে সমাহিত করে দেবে। শিল্পীও ভোগ করে, কিন্তু ধারাটি আলাদা। সে বস্তুর ব্যাহ্যিক রূপেই বিহ্বল হয়ে মোহের বন্ধনে জড়িয়ে পড়ে না—আগে রূপের পথেই ভিতরে প্রবেশ করে, তারপর সেখানে তার সত্তাগত গুণ বা স্বরূপটিকে ধ্যানের দ্বারা উপলব্ধি করে নিয়ে পুনরায় তার শিল্পকলার সাহায্যে বাহ্যিক রূপ ও আভ্যন্তরীণ রসের একত্র সমাবেশে পূর্ণতাকে ফুটিয়ে তুল্‌তে চেষ্টা করে। এখানে কাম নয়, বস্তুত এখানেই হচ্ছে প্রেমের লীলা। প্রেমিক যে সে এমনি করেই আপন মনের মাধুরী দিয়ে মানসীকে আত্মগত করে নেয়।

সংযত-ঘন ভাবাবেগই রসের স্রষ্টা; সুতরাং রস ও ভাবাবেগকে আমরা ঠিক একই পরিমাপে ফেলতে পারিনে। রস চিরন্তন—সে কিছু সৃজন করে, ভাবাবেগ বিহ্বলতায় ক্ষণিকের অবসরে বিলীন হয়ে যায়। রস বস্তুর প্রাণ, রূপ তার দেহ, যে-পটের মধ্যে প্রাণ এবং দেহের পূর্ণযোগ ঘটে, সেইখানেই সৌন্দর্য আপনার রহস্য-অবগুণ্ঠন অনাবৃত করে প্রকাশ পায়।

তবেই দেখতে পাচ্ছি,—সৌন্দর্য নিছক রসও নয় আবার রূপও নয়—অথচ এ দুয়েরই যৌগিক পরিণতিতেই তার পত্তন। ব্যক্তিগত অনুভূতি রসেরই নামান্তর। একমাত্র অনুভূতির উপরেই যদি সৌন্দর্যের ভিত্তি হত, তবে চিনি না খেয়েও কেবলমাত্র শুনে-শুনেই তার মিষ্টত্বের রসাস্বাদন করা যেত—সেটা একেবারেই অসম্ভব। আবার যদি একান্ত রূপের দ্বারাই সৌন্দর্য-রচনা সম্ভবপর হত, তবে সামান্য এই একটা কাষ্ঠ-পেটিকা আমার চোখে এত সুন্দর, এমন মূল্যবান, এরূপ পবিত্র হয়ে উঠত না। এর না আছে গঠনশ্রী, না আছে সূক্ষ্ম কারুকার্য—তাতে কাঠটা আবার আকাঠা। বাইরের দিক দিয়ে এ একটা নেহাত সাদাসিধে চৌকো আকাঠার বাক্স ভিন্ন আর কিছুই তো নয়! তবে, কেন এ'কে এত অভিনব দেখ্‌ছি? —তার একটা কারণ আছে। সত্যিই সাধারণ হলে পরে এর কোনোই মূল্য থাকত না—আমার কাছেও না, পরের কাছে তো নয়ই। কিন্তু, এরও একটি বিশেষত্ব

আছে—বাক্সটি আমার একজন নিকট-আত্মীয়ের প্রীতি-উপঢৌকন। আমি যখন বাক্সটিকে দেখছি, তখন শুধু এর বহিরাবরণটাই একান্ত করে দেখছি না—এর বহিরাবরণের মধ্য দিয়ে দেখতে পাচ্ছি—সেই আত্মীয়টির প্রীতিপূর্ণ হৃদয়েরই অনুপম মাধুরী,—কত বিচিত্র হয়েই না তা এতে বিকশিত হয়েছে। হৃদয়ের তো মূল্য নেই—তাই সে মাধুরী অমূল্য। যদি এই নিদর্শনটি না থাকৃত, তবে যতই না প্রীতির গভীরতা থাক্ আত্মীয়ের সঙ্গে, এখন এমন সৌন্দর্য-উপভোগের সুযোগ ঘটত না কোনোমতেই। তবেই, দেখলুম রূপের উপর রস এসে যখন রং ফলালো, তখনই তাতে একটি অনুপম মাধুরী সৃজনের সূত্রপাত হল, এখনো একটি কথা বাকি রইল—কথাটি আর কিছু নয়—সেই গোড়াকার expression।

হোক না আমার আত্মীয়ের উপহার, তাকে যেমন-তেমন ভাবে যেখানে-সেখানে ফেলে রাখলে আমি ছাড়া অন্য কোনো লোকের চোখে তো সেটি আর পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হবে না। তারা শুধু দেখে যাবে—একটা আকাঠার অকেজো বাক্সমাত্র।

এখনও সর্বজনীনতার অভাবে সৌন্দর্যের পূর্ণ বিকাশ হতে একটু বাকি রয়েছে। সুন্দর যা তা শাশ্বত, আর-একটা তার বিশেষ লক্ষণ এই যে, সহজ স্বাভাবিকতার গুণে সে সকলের চিত্তেই কোনো-না-কোনোভাবে কিছু-না-কিছু আনন্দের স্পর্শ দিয়ে যাবেই,—কাব্যের সেই চিত্তবীণাটির তারগুলি যদি একেবারেই বিকল হয়ে না গিয়ে থাকে তবেই অবশ্য সেক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য হবে। নয়তো, অনুশীলনের অভাবে অনুভূতি যার সমূলে বিলয়প্রাপ্ত হয়েছে, তার কাছে কোনো-দিনই সুন্দরের আবির্ভাব যে ঘটবে না, তা বলাই বাহুল্য।

যদি কারুর দুঃখের অনুভূতি খুব জাগ্রত হয়, তবে সে একই জিনিসকে দুঃখের রূপে সুন্দর দেখবে—আর সে দেখা থেকে আনন্দলাভ করবে,—আর যেখানে হর্ষের অনুভূতিটি তীব্র, সেখানে সে ঐ একই বিষয়কে দুঃখের না দেখে আনন্দের রূপে দেখবে—আর সে-দেখাতেও হৃদয়ে তার আনন্দের উৎসই প্রবাহিত হবে।

এখানে একটা মজা হচ্ছে এই, যিনি সত্যকার অনুভাবক হবেন, সুখের ভিতর দিয়েই দেখুন আর দুঃখের ভিতর দিয়েই দেখুন—চরমে দু'য়েরই লাভ ঐ এক; সে ঐক্যের মিলনক্ষেত্র হচ্ছে আনন্দ। বিশুদ্ধ আনন্দেই সৌন্দর্যের প্রতিষ্ঠা। তবেই, বর্ষাকে আনন্দের রূপে বা দুঃখের রূপে—যে ভাবেই যে দেখুক না কেন, তা বলে পরিণতির বেলায় লাভের দিকে বর্ষার সৌন্দর্য-ভাণ্ডার থেকে সৌন্দর্য কেউ কম উপভোগ করছে না এবং সে-উপভোগের দাক্ষিণ্য বা ফলশ্রুতিস্বরূপ আনন্দও

কারো ভাগ্যে অলভ্য থাকছে না। সৌন্দর্য-বিচারে মতবৈষম্যের মূল রহস্যটি এইখানেই।

সুন্দর যা—তা চির সত্য, বিশুদ্ধ আনন্দদায়ক এবং কল্যাণকরও বটে। জগতে সত্য নিয়ে মারামারি নয়—যত মারামারি তার তত্ত্ব-নির্ণয়ে। যার যে অনুভূতিটি প্রখর সে বস্তুকে তাতেই নিষিক্ত করে হৃদয়ে বরণ করে নেয়। তবে শিল্পী যদি তার উপলব্ধ সৌন্দর্যের আলেখ্যটিকে অনুরূপ আধারে যথার্থভাবে সাজিয়ে ধরতে পারে, তবে ঠিক অনুভূতিশীল ব্যক্তিমাত্রেই তার মর্মানুধাবন না করে যায় না। কথাটির আর-একটু স্ফুটতর সহজ ব্যঞ্জনা প্রয়োজন। এখানেই সেই আগের অসমাপ্ত কথাটিতে ফিরে আসা যাক। আমার আত্মীয়ের উপহৃত সেই বাক্সটিকে যদি আমি আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে সযত্নে বস্ত্রাচ্ছাদিত অবস্থায় এমন-একটি ঝকঝকে তকতকে কাঁচের আলমারিতে সাজিয়ে রাখি, যার মধ্যে কেবল আমার জীবনস্মৃতির অতি সাধের জিনিসগুলিই শুধু রক্ষিত হয়ে আসছে, তা হলে যে-কেউ দেখবামাত্র, সেই সাধারণ জিনিসটিকেই একটি মূল্যবান সুন্দর জিনিস বলে মনে করবে না কি? কিন্তু সেটিকেই আবার ঘরের এককোণে আবর্জনাস্তূপে ফেলে রাখলে, কারো সেদিকে দৃষ্টিও যাবে না। এখানে দেখা যাচ্ছে, সৌন্দর্য তার পূর্ণতায় উপনীত হবার পথে প্রকাশ-পদ্ধতিরও কিছু অপেক্ষা রাখে। আগের ঐ অনুরূপ আধার ও যথার্থ ভাবের ইঙ্গিতে আমি যে-বিষয়টি নির্দেশ করতে চেয়েছি, তা এই প্রকাশ-পদ্ধতি বা mode of expression বই আর কিছু নয়।

এই modeটিই হচ্ছে শিল্পীর শিল্প-প্রতিভা। এই জিনিসটিই সৌন্দর্যকে সর্বজনীন করে তুলবার পরম সহায়ক। বস্তুর মধ্যে কেমন করে কোথায় আমি সৌন্দর্যের সন্ধান পেলুম, তার পরিচয়টি ফুটে উঠবে আমার শিল্পকলায়। সময়ে রূপ যেমন অনুভূতিকে আলোড়িত করে, দু'য়ে মিলে একটা সৌন্দর্য গড়ে তোলে, তেমনি অনুভূতিও রূপের রং ফলিয়ে সময়ে সুন্দরের আবির্ভাব ঘটায়। কিন্তু সে-আবির্ভাবকে আমরা পূর্ণ বলতে পারিনে; কারণ, তখনো তা বিশিষ্টজনের নিভৃত মনের উপভোগ্য হয়ে থাকে বলে। কিন্তু একবার যদি সে উপলব্ধ সৌন্দর্যকে 'মনের মাধুরী' দিয়ে বাইরে দশের দর্শন, স্পর্শন ও আস্বাদনের উপযোগী করে তুলতে পারি, তখনই বলব—'এবার যথার্থই সৌন্দর্য সৃজিত হয়েছে।'

নিজে আমি বিশ্বাস করি, অনুশীলনের দ্বারা সৌন্দর্য-ভোগ ও তাকে অপরের

ভোগ্য করে তুলবার কৌশলটি আয়ত্ত করা যায়। একজন্মেই আয়ত্ত হবে—তার কোনো নিশ্চয়তা নেই, ক্রম-অভিব্যক্তি বিশ্বব্যাপারে একটা প্রাকৃতিক-বিধানেরই জয়-জয়কারে ঘোষণা করে গেছে। ক্রম-অভিব্যক্তিবাদ যদি স্বীকার করি, অবশ্য আজ তা অস্বীকার করবারও উপায় নাই একরকম,—তবে অনুশীলন দ্বারা যে শক্তিবৃদ্ধি ক'রে একদিন আমরা সৌন্দর্য-ভোগে সৌভাগ্যবান হব না, তাই বা বলি কী করে? আমরা যে সৌভাগ্যবান হবই, তার কয়েকটা সম্ভাবনাও আমি হাতে-হাতে দেখতে পেয়েছি। অবনীন্দ্রনাথ যেদিন ভারত-শিল্পের চর্চা আরম্ভ করেছিলেন, সেদিন তিনি কাউকে তাঁর পথে সহযাত্রী পান নি: যে-ধারায় এদেশে তখন শিল্পচর্চা চলছিল, তার থেকে নূতন কোনো পদ্ধতিতে যে সৌন্দর্য রচনা করা যেতে পারে এ ধারণাই একটা পাগলামির লক্ষণ বলে গণ্য হত। তিনি কিন্তু ভগীরথের মতো তাঁর একনিষ্ঠ সাধনার বলে ভারত-শিল্পের ভাগীরথী ধারাটিকে নানা বাধাবিঘ্নের হাত এড়িয়ে এদেশের বুকে প্রবাহিত করে দিলেন। তাঁর সিদ্ধি ঘটেছে চল্লিশ বছরে। তারপর আমরা যখন তাঁর কাছে গেলুম, আমরা সে শিল্পটিকে বিশ বছরেই একরকম করে আয়ত্ত করতে সমর্থ হলুম। তখন আমাদের কাছে যারা আসতে লাগল তাদের লাগল দশ বছর—পাঁচ বছর; শেষে আজ এমনও অভাবনীয় ব্যাপার দেখবার সৌভাগ্য হচ্ছে যে, ঘর থেকে একেবারে তৈরি ছেলে এসে হাজির! ভারতের আকাশে-বাতাসে আজ অবনীন্দ্রবাবুর চিত্রকলা আপন প্রভাব বিস্তার করে দিয়েছে। তাই তাঁর অধস্তন বংশধরগণ জন্ম হতেই আশ্চর্যরূপ উন্নত সৌন্দর্যবৃত্তিলাভের অধিকারী হচ্ছে।

সে অনেকদিন আগের কথা, আমাদের কলাভবনে একবার একজন শিক্ষার্থী এসেছিলেন—তাঁর বয়স ছিল প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি। অদম্য তাঁর অধ্যবসায়—বিপুল তাঁর প্রচেষ্টা। ভারত-শিল্প তিনি শিখবেনই। আমরা তাঁকে একটু পরিহাসচ্ছলে বলতাম—"দেখ, তুমি আর ক'দিনই বা বাঁচবে, শিখবেই বা কত? বৃথা তোমার এই পরিশ্রম।" তাতে তিনি উত্তর দিতেন বড় চমৎকার, বলতেন—"যে ক'দিনই বাঁচি না মশায়, তবু তো কিছুটা এগিয়ে থাকব। আসছে জন্মে খাটুনিটা তবু কিছু লাঘব হবে। আর-কিছু হোক-না-হোক, এই শিল্পের ধাতটা তো অন্ততঃ পাব।" আমারও ধারণা তাই। যথাযথ অনুশীলন করলে, শক্তির বিকাশ হবেই।

সৌন্দর্য ধ্যানের বস্তু, বইয়ের পাতায় এর অতি অল্প-পরিমাণই খোঁজ মিলে। যে বইতে শুধু পাণ্ডিত্য ফলানো—যাতে জীবনগত অনুভূতির মাত্রা কম, সে-সব

বই তো এতে কোনো কাজই দেবে না। নিবিষ্ট মনে ধ্যান করে-করে বস্তুর অন্তর-সত্তার সন্ধান পেতে হবে। রবীন্দ্রনাথ কত রাত জেগে-জেগে যে এক-একটি গাছের, একটি রাত্রির, একটি তারার সঙ্গে আত্মপরিচয় করেছেন, তা তাঁর জীবনস্মৃতি পড়লে বেশ বুঝতে পারা যায়। তেমনিতর সাধনা না হলে সুন্দরকে ধরা সহজ নয়। ক্রমাগত অনুধ্যান ও যাঁরা সত্যি-সত্যি ব্যক্তিগত জীবনে সৌন্দর্যের অনুভূতি লাভ করেছেন, তাঁদের সান্নিধ্যে বসে আলাপ-আলোচনা করা বা তাঁদেরই লেখা অভিনিবেশ-সহকারে অধ্যয়ন, আমি এই মাত্র কৌশল জানি সৌন্দর্য-উপলব্ধির।"

বিশ্বভারতী সাহিত্য সভা

মানব-সভ্যতা, বিশেষত ভারতীয় সভ্যতার অনুশীলন-কেন্দ্র বলিয়া বিশ্বভারতীর একটি বিশিষ্ট পরিচয় আছে। সভ্যতার দুইটি বিভাগ—এক তার জ্ঞান, অপরটি কর্ম। বিশ্বভারতীর অনুশীলন মুখ্যত জ্ঞান-বিভাগেই নিবদ্ধ।

মানব যাহা ভাবে বা করে, সেই ভাবনা ও অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়াই তাহার যথার্থ সত্তাটি প্রকাশ পায়। সাহিত্য ভাষার সূত্রে দেশ হইতে দেশে-দেশে, কাল হইতে কালে-কালে, লোক হইতে লোকান্তরে তাহার বাণী-পরিচয় বহন করিয়া ফিরে আর ঐ সঙ্গে সীমা-অসীমের অজ্ঞতার ব্যবধান দূর করিয়া জ্ঞানের মিলনডোরে পরস্পরকে যুক্ত করিয়া দেয়। বিশ্বভারতী চায় জ্ঞানের সাধনায় পূর্ব-পশ্চিমকে এক করিতে। এইজন্য জ্ঞানতীর্থ বিশ্বভারতীতে সাহিত্য যে গভীর শ্রদ্ধা ও পরম নিষ্ঠার সহিত অনুশীলিত হইবে, ইহা আশা করা খুবই সংগত ও স্বাভাবিক।

আর, সত্যই শান্তিনিকেতনের সাধনার ধারা অনুসরণ করিলেও দেখি, স্বয়ং মহর্ষিদেব হইতে আরম্ভ করিয়া পূজ্যপাদ বড়বাবু, গুরুদেব, সতীশবাবু, অজিতবাবু ও আরো অনেকানেক সুধী মহোদয়ের জীবনব্যাপী মহতী সাধনা সেই আশাকেই সাফল্য দান করিয়া চলিয়াছে। এখানে শুধু সাহিত্য-আলোচনাই হয় নাই, সাহিত্য-সৃষ্টিও হইয়াছে। এখানকার মানুষ কেবল প্রাচীনের পরিচয় গ্রহণই নয়, নবীনের পরিচয় দানও কিছু করিয়াছে—ইহাই এখানকার গৌরব।

আত্মীয়তা ও সুরুচি—সাহিত্য-সৃষ্টির দুইটি মূল উপাদান। আমাদের বিজ্ঞানাচার্য একটি চমৎকার কথা বলিয়াছেন—"ভালবাসিয়া দেখিলেই নাকি অনেক গুণ দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক কথা শুনিতে পাওয়া যায়।" জিনিসকে বুঝিতে হইলে তাহাকে ভালবাসিয়া তাহার সহিত আত্মীয়তা স্থাপন করা দরকার, তবে তাহার মর্ম-উপলব্ধি হইতে পারে, আর, এই উপলব্ধি যত বেশী নিবিড় হইবে, তত

বেশী তাহাকে প্রকাশ করিবার জন্য অন্তরে ব্যাকুলতা জন্মিবে—ইহাই স্বাভাবিক। এই ব্যাকুলতারই নামান্তর শিল্পপ্রেরণা। প্রিয়কে নয়নে-বচনে-মনে নিরন্তর শোভনরূপে ধরিয়া রাখিতে কোন্ প্রেমিক না উৎসুক?—তাহাকে কোনোমতে একটু কুশ্রী দেখিলে মনে হয়, যেন আপনারই জ্ঞানইন্দ্রিয়গুলিকে দু'হাতে উপড়াইয়া ফেলি। শিল্পী বা সাহিত্যিকের স্বভাবই বস্তুকে আত্মানুগত করিয়া দেখা, আর সেই দেখার ফলেই ভিতরে প্রবল-প্রেরণা-সংঘাতে সৃষ্টির প্রচেষ্টা জাগে। তখন অন্তরের সেই প্রিয়বস্তুকে তাহারা যথাসাধ্য মনোহর করিয়া প্রকাশ করে এবং ঐভাবে চিরন্তন-রূপে তাহাকে ধরিয়া রাখিতে চায়। এইজন্যই আত্মার সম্পর্কিত বলিয়া সত্যিকার সাহিত্য কি শিল্প কখনো কুরুচির পরিচায়ক হইতে পারে না।

আত্মীয়তাই মিলনের যোগসূত্র। উহা আবার সাহিত্যের প্রাণ হওয়ায়, সাহিত্যের স্বধর্মই হইয়াছে সংহতি-রচনা। এই কারণেই দেখা যায় যে-স্থলটিতে কিছুমাত্র সাহিত্য-সাধনার সূত্রপাত হইয়াছে, তাহা বিদ্যালয়ের রুটিন-বাঁধা ক্লাস নয়, বা মহাজনের মালগুদাম কি আদালতের দপ্তরখানাও নয়,—তাহা একটি স্বতন্ত্র সামাজিক প্রতিষ্ঠান 'সাহিত্য-সভা'। শিক্ষক, কেরানী, মহাজন, ডাক্তার, উকিল, ইঞ্জিনিয়ার প্রত্যেকের কর্মস্থল বিভিন্ন, সেখানে প্রত্যেকে নিজ গণ্ডীর মধ্যে অবরুদ্ধ থাকিয়া একে অন্যের সহিত পৃথক। কিন্তু সাহিত্য-সভা এমন একটি ক্ষেত্র, যেখানে ইহাদের সবাই আসিয়া প্রাণে প্রাণ মিলাইতে পারে, ভাববিনিময়ে ভেদ-, বৈষম্য দূর করিয়া সামাজিক জীবনের সৌহার্দ্যসুখ উপভোগ করিতে পারে।

বৃত্তি (পেশা) হইতে আমাদের জীবন সমগ্রতায় বিচিত্র ও বৃহত্তর। সে কত অভাব-অভিযোগ, স্নেহ-প্রেম, সুখ-দুঃখ, ঘাত-প্রতিঘাত কত-কিছু ভালমন্দ অভিজ্ঞতার পথ বাহিয়া তাহা কোন্ অজানা গন্তব্যে ছুটিয়া চলিয়াছে—তাহা কে জানে! জীবনে আমরা অনেক দেখি, অনেক শুনি, তাই, সেখানে ভিতর হইতে অনেক-কিছু দেখাইবার ও শুনাইবার তাগিদ অনুভব করি বলিয়াই জীবন সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লীলাভূমি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জৈবধর্মে মানুষ আত্মবিকাশোন্মুখ। তার এই বিকাশবৃত্তিই তাহাকে সামাজিক করিয়া তুলিয়াছে। তলে-তলে সাহিত্য-সৃষ্টিতেও এই আত্মবিকাশবৃত্তির উদ্দীপনা অনেকখানি কাজ করে। এই উদ্দীপনাতেই পেশার গণ্ডীবদ্ধ কর্মস্থল ছাড়িয়া বাহিরে সাহিত্যসম্মিলনাদি প্রতিষ্ঠা দ্বারা মানব জীবনপথে সহযাত্রী জুটাইয়া পরস্পর আত্ম-অভিজ্ঞতা আলোচনা করিয়াছে, এবং এই করিয়াই সংহত জীবনযাত্রাকে সহজ ও উপভোগ্য করিয়া চলিতে পারিয়াছে।

এখানেও তেমনি ভাবেই বিদ্যালয়ের বাহিরে একদিন সাহিত্য-সভা স্থাপিত হইয়াছিল। সে কত দিনকার কথা। কত মহাসাধক এই সাহিত্য-সভায় সমবেত হইয়া জীবনের অভিজ্ঞতা একে অন্যকে শুনাইয়াছেন, শুনিয়াছেন, প্রীতির যোগে মনে-প্রাণে বাঁধা পড়িয়াছেন—আর সেই অবসরেই কালপ্রবাহের ব্যবধান জুড়িয়া প্রাচীন ও নবীনে চিরমিলন স্থাপনের জন্য তাঁহারা সাহিত্য-সেতু গড়িয়া তুলিয়াছেন। এই সভাতেই একদিন দ্বিজেন্দ্রনাথের "গীতাপাঠ" পড়া হইয়াছিল, অজিতবাবু ও সতীশবাবুর সাহিত্য-বিষয়ক সুচিন্তিত নিবন্ধগুলি এই সভার পাঠসূত্রেই রচিত হইয়াছিল। তাহা ছাড়া, গুরুদেবের অমূল্য সাহিত্যসম্পদ ও আরো-অনেক মনীষীর সমৃদ্ধ রচনা এই সভাতেই প্রথম শ্রোতৃহৃদয়ের আত্মীয়তা লাভ করে। এই সাহিত্য-সভা বিশ্বভারতীর একটি বিশেষ কীর্তি। ইহার পরিচালনার কাজটিও তাই অত্যন্ত দুরূহ। এখানে সাহিত্যসাধনা কতখানি শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন হয়, তাহা লোকে এই সভাটির অনুষ্ঠান-সূচী হইতেই পরিমাপ করিয়া থাকে।

আমাদের এই শিক্ষা-অনুষ্ঠানে আমরা যে জ্ঞানের চর্চা করি, তাহার ফলে জগতের সহিত আমাদের নিত্য-নূতন পরিচয় লাভ করিবার কথা। আর তাহার নিবিড়তার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য ও শিল্পের কিছু-কিছু নিদর্শন পাইবার আশাও অযৌক্তিক বা নিরর্থক নয়। ক্লাস আমাদের পেশাস্থল, তাহা যেমন ছাত্রের, অধ্যাপকের পক্ষেও তেমনি। সেখানে ঐ সাহিত্য-শিল্পাদির নিদর্শন দেখাইবার অবকাশ কোথায়? সাহিত্য-সভা সেই অবকাশের অভাব পূরণ করিয়াছে। আমাদের জ্ঞানের গভীরতা, আত্মীয়তার নিবিড়তা সাহিত্য-সভার রচনাদি হইতে প্রতিপন্ন হয়। অনেকে বলিবেন—কিছু জানিতে গেলে যে কিছু নিদর্শন রাখিতেই হইবে, এমন কী কথা আছে? আমরা বলি—যে-মন পৌরুষ-সতেজ, যাহা জাগ্রত ও অধ্যবসায়ী, তাহা কখনো শুধু অপরের জ্ঞানের চর্বিত চর্বণ করিয়াই তৃপ্ত ও নিরস্ত থাকিতে পারে না, সে অপরের জ্ঞান তো পরিপাক করেই, অধিকন্তু তাহা হইতে নবলব্ধ জীবনীরসে উজ্জীবিত হইয়া স্বাধীন পর্যবেক্ষণ দ্বারা নূতন নূতন জ্ঞান আহরণে উদ্যোগী হয়। অতঃপর সেই আহৃত জ্ঞানের বহুল-বৈচিত্র্যসম্ভার তাহার হাতে কোনো-না-কোনো শিল্পকলায় ফুটিয়া উঠে। কারণ, ভাব চিরদিনই রূপের মাঝে আত্মপ্রকাশ করিয়া চলিয়াছে, তাহার এ ধারা কেহ রোধ করিতে পারে না। তবে এ কথাও সত্য, খুব গভীর ও স্বচ্ছ না হইলে ভাবের সেই স্বতঃ-রূপস্ফূর্তিও ঘটিয়া উঠে না। এই ভাবগভীরতা লাভ করিবার জন্য অভিনিবেশ-সহকারে অনেক

দর্শন, শ্রবণ, মনন, অধ্যয়ন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় প্রয়োজন। অবশ্য, তাহা কিছু সময়সাপেক্ষ বটে। কিন্তু সময়সাপেক্ষতার অজুহাতে যদি দিনের-দিন কেবলই আমাদিগকে শিক্ষাসাহিত্য-রচনাকার্যে পরাঙ্মুখ করিয়াই রাখে, তবে তাহাও তো বাঞ্ছনীয় নয়। তখন আমাদের মধ্যে ঠিক-ঠিক অনুসন্ধিৎসা, সরলস্বচ্ছ ভাবগ্রাহিতার শক্তি ও সর্বোপরি নব-নবোন্মেষশালিনী বুদ্ধি আছে কিনা, এবং থাকিলেও আমরা তাহার যথাযথ অনুশীলন করি কিনা, অথবা মূলেই আমরা গড্ডালিকা-প্রবাহধর্মের উপাসক, এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ উপস্থিত হয়।

কিছুদিন আগে শ্রদ্ধাস্পদ জনৈক অধ্যাপকের মুখে প্রসঙ্গক্রমে শুনিয়াছি—বিশ্বভারতীর এই সাহিত্য-সভা আশ্রমবাসীদের একটি প্রাণের মিলনকেন্দ্র ছিল। যিনি যেই বিষয় লইয়া অনুশীলন করিতেন, তিনি লিখিত-আকারে বা মৌখিকভাবে আর-দশজনকে লইয়া সেই বিষয়ের আলোচনা করিতেন। প্রত্যেকেই সেই আলোচনায় উৎসাহ-সহকারে অংশ-গ্রহণ করিতেন। এইভাবে জীবনের শ্রেয় সাধনায় সকলেই সকলের সতীর্থ হইয়া পরম প্রীতির জীবন উপভোগ করিতেন। এখন আর সেই সৌভাগ্য ঘটে না। সকলেই যার-যার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বাড়িয়াছে, সঙ্গে-সঙ্গে সাহিত্য-সভার 'সহিত'-ভাব ক্রমশ দূর হইতেছে। এ জিনিসটা মোটেই আশাপ্রদ নয়। ইহার মধ্যে একটা উদ্যমহীনতার আভাস আছে। জাগ্রত জীবন নব-নব সৃষ্টির দ্বারাই নব-নব আত্মীয়তার ক্ষেত্র প্রশস্ততর করিয়া তোলে। আমাদের এই মোহগণ্ডী দূর করিয়া যাহাতে আবার আগের মতো সাহিত্য-সভার সূত্রে সংহতিবদ্ধ প্রীতির জীবন গড়িয়া তোলা যায়—তাহার প্রচেষ্টা আশু প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

পূজারী পূজার সময় কায়মনে শুচিতা ও ভাবভক্তি উদ্রেকের জন্য মন্দিরে শঙ্খ-ঘণ্টা, ধূপ-দীপ স্রকচন্দনাদির সমাবেশ করে। বহিরঙ্গ এই পূজা-উপচারই অন্তরকে বহির্জগতের আবিলতা হইতে আকর্ষণ করিয়া ইষ্ট-সাধনায় সমাহিত রাখে। অবশ্য যাহারা উচ্চস্তরের সাধক, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। আমাদের মতো সাধারণের বেলায় এখানেও মনকে নিবিষ্ট রাখিবার জন্য যে কিছু বাহ্যিক উপকরণের প্রয়োজনীয়তা আছে, এ-বিষয়েও আমরা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। সভাস্থলের শোভন সাজ-সজ্জা, সুললিত সংগীত আবৃত্তি প্রভাবে চিত্তবৃত্তি যে একটি সুকুমার অবস্থায় পরিণত হইয়া সাহিত্যের রসাস্বাদনে উন্মুখ হইয়া উঠিবে, সেরূপ কোনো বিনোদনের ব্যবস্থা থাকিলে ভালো হয়।

কী শিল্প কী সাহিত্য, সবই তার স্রষ্টাদের অতি দরদের বস্তু। যাহা আমার

কাছে প্রিয়, তাহা আমার অন্য-দশজন বন্ধু-বান্ধবদের নিকট প্রিয় হইয়া উঠুক, অথবা যে দ্রব্যটি আমার আনন্দ-বিধায়ক, তাহা হইতে আমার বন্ধুবর্গও আনন্দলাভ করুক, এই দুটি সদিচ্ছাই সাধারণত শিল্পীকে তাহার বন্ধুমহলে স্বরচিত শিল্পনিদর্শনাদি পরখ করাইতে উদ্বুদ্ধ করে। ইহার সঙ্গে আর-একটি উদ্দেশ্য থাকে—গুণীর হাতে গুণ পরীক্ষা। ব্রজলীলায় রাধা ও কৃষ্ণের আত্মীয়তার ক্ষেত্রে মধ্যবর্তিনী গোপিকাকুলের যে সার্থকতা, আমাদের মনে হয়, শিল্পী তাহার শিল্পে যে-বিষয়টির পরিচয় ধরিতে চায়, সেই বিষয় এবং শিল্পীর নিজের মধ্যে তৃতীয় বস্তু সমালোচকেরও সেই সার্থকতা। যে পরিচয় গভীর হয় নাই, অথবা, যাহা স্ফুটনোন্মুখ হইয়া নানা কারণে অস্ফুট রহিয়া গিয়াছে, তাহা সহৃদয় ইঙ্গিতের প্রসাধন দ্বারা গভীর ও অনাবিলভাবে পরিস্ফুট করিয়া তোলাতে সাহায্য করাই সমালোচকের ন্যায্য কাজ।

লেখার উপর লেখকের স্বাভাবিক দরদের কথা মনে রাখিয়া, তাহার ভাল ও মন্দ, দুই-ই এমন সুকৌশলে বলা উচিত যাহাতে লেখক বা শ্রোতা কাহারও সুকুমার-হৃদয়বৃত্তিগুলিকে তাহা অসৌজন্য অকরুণ রূঢ়তায় আঘাত না করে। বলার কৌশলে অনেকের গালমন্দগুলিও কান পাতিয়া শুনিতে ভাল লাগে, আবার বলার দোষে অনেকের ভাল কথাটিও লোকের বিরক্তি উৎপাদন করে। সমালোচকদের চাই রস ও রূঢ়তার মাত্রাজ্ঞান, চাই সহৃদয়তা। একথাও সকলের স্মরণ রাখা উচিত যে অনধিকারীর মুখের স্তুতি-নিন্দা উভয়ই সমান। উভয়ের কার্যকারিতায় ভালর চেয়ে বরং মন্দের ভাগই অধিকতর। এরূপ সমালোচকদের সমালোচনায় অনেক সময় অন্য সাধারণ শ্রোতাদেরও মতবিপর্যয় ঘটে। লেখকগণ নিজেদের সাধনার ধনকে অপাত্র দ্বারা যথেচ্ছ অবিচারিত হইতে দেখিয়া ক্ষুব্ধ হন এবং উপর্যুপরি কয়েকবার এক ধারাতেই রায় পাইলে—"অরসিকেষু রসস্য—" নীতির সূত্র ধরিয়া সাহিত্য-সভার সংস্রবই শেষাবধি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

ভাল সমালোচক হইলে, তাঁহার দ্বারা সৎসাহিত্য ও সুসাহিত্যিক গড়ার সাহায্যও হইয়া থাকে। সভায় যাহাতে বিজ্ঞ অথচ রসিক সমালোচকের সমাবেশ হয় ও তাঁহারা যাহাতে সুষ্ঠু সমালোচনায় ব্রতী হইয়া সাধারণের রসগ্রহণ-শক্তি-বৃদ্ধির সহায়তা করেন, তাহার ব্যবস্থা আবশ্যক।

এজন্য বিষয় বুঝিয়া সভাপতি নির্বাচন বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন মনে করি। সভাপতির আসন যেমন উচ্চ তাঁহার দায়িত্বভারও তেমনি গুরু। সচরাচর সভায় তাঁহার কথার মূল্যই অধিক ধরিয়া অভিভাষণ শুনিবার জন্য অনেকে উদ্‌গ্রীব-

চিত্তে শেষ-পর্যন্ত অপেক্ষা করেন। ছাত্রদের মধ্য হইতে সভাপতি নির্বাচনের প্রথা আমরা একেবারে দোষণীয় বা অনাবশ্যক মনে করি না,—যদি সভাতে সভাপতি ছাড়াও দু'-একজন প্রবীণ ও যোগ্য সমালোচক উপস্থিত থাকেন। যেহেতু আমাদের বিশ্বাস, সভাপতির দায়িত্ববোধ এবং পরিচালনা-কৌশল অন্যতম শিক্ষণীয় বিষয়। অন্য দশটা বিষয়ের সহিত উহাও আচার্যের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিয়াই বিদ্যালয়ের শিক্ষাজীবনে শিক্ষা করা উচিত।

অনেকের ধারণা, এই অনুষ্ঠানটি একান্তভাবে ছাত্রদের। তাই ইহার রচনা, সমালোচনা ও সভাপতিত্ব-আদি যাবতীয় কাজই ছাত্রদের দ্বারা নির্বাহিত হইবে। কিন্তু ইহার গঠনপ্রণালী ও অনুষ্ঠানপত্র দৃষ্টে স্পষ্টই বুঝা যায় যে শুধু ছাত্র নয়, ইহার পরিচালন-কার্যে অধ্যাপক-মহাশয়দেরও সমান অংশ রহিয়াছে। কারণ, তাঁহারাও ইহার নিয়মিত-সভ্য। কাজেই মুখ্যত ছাত্রদের হিতসাধনে ইহার প্রতিষ্ঠা হইলেও, ইহার সহিত অধ্যাপক-মহাশয়দের কোনো সংস্রব থাকিবে না, এমন কথনো হইতে পারে না। বরঞ্চ তাঁহাদের যোগ বেশী করিয়া দরকার এইজন্য যে, তাঁহাদের লেখাতে আদর্শ এবং সমালোচনার উপদেশ হইতে আলোক ও পাথেয় সংগ্রহ করিতে পাইলে ছাত্রদের সাধনার পথ অধিকতর সমুজ্জ্বল ও সুগম হইতে পারে।

সম্প্রতি বিশ্বভারতীর কলেজ-বিভাগে একটি অতিরিক্ত-শ্রেণী খুলিয়া রবীন্দ্র-সাহিত্য আলোচনার সূত্রপাত হইয়াছে[১] অনুষ্ঠানের মুখরক্ষার জন্য আমরা আমাদের অধ্যক্ষ-মহোদয়কে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। কিন্তু শিল্পকলা এখনো কলাভবনেই আবদ্ধ রহিল। বাহিরের লোকের সে-বিষয়ে কিছু শুনিবার সৌভাগ্য আর-কখনো কি হইবে না? স্কুল-কলেজের ক্লাসে যোগদান করিয়া সকলের সব বিষয় জানিবার সময়-সুবিধা ঘটিয়া উঠে না। তাই বিনোদন-ছলে সহজে অথচ সংক্ষেপে নানা বিষয়ে কিছু-কিছু বহু-দর্শিতা লাভ হয়; এইভাবে দেশের পরিষদ-সমূহ পত্রিকাপ্রকাশ ও সাধারণ সভাসমিতির অনুষ্ঠান করিয়া লোকশিক্ষা বিতরণ করিয়া থাকেন। আমরা জানি, এই রকমেই শিল্পকলা-বিষয়ে ধারাবাহিক আলোচনার ব্যবস্থা করিবার সংকল্পও এক-সময়ে কর্তৃপক্ষের কারো কারো মনে জাগিয়াছিল[২] বিশ্বভারতীর সহৃদয় কর্তৃপক্ষ লোকশিক্ষার

১ রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন প্রাইভেট-সেক্রেটারি বর্তমানে প্রখ্যাতনামা কবি ও সমালোচক ডঃ শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী এই বিশেষ বিষয়ে অধ্যাপনা করিতেন।

২ কিছুদিন পরেই 'রবীন্দ্র-পরিচয়-সভা' স্থাপিত হইলে, তাহার মাসিক-অধিবেশনে শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয় "শিল্পকলা" সম্বন্ধে ছায়াচিত্রযোগে ধারাবাহিক বক্তৃতা দান করেন।

সহায়তাকল্পে সাহিত্য-সভার মধ্য দিয়া রবীন্দ্রসাহিত্য ও শিল্পকলার ধারাবাহিক আলোচনার ব্যবস্থায় অগোণে-উদ্যোগী হউন, ইহাই আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ।

প্রস্তাব সমূহ

আমরা এখন উপসংহারে মূল-প্রস্তাব-কয়টি সংক্ষেপে উত্থাপন করিতেছি। উহা পূর্বাহ্নেই আপনাদের গোচরীভূত করা হইয়াছিল। বলা আবশ্যক, ইতিমধ্যে আলাপ-আলোচনার ফলে একটি-মাত্র শেষোক্ত-প্রস্তাব সম্বন্ধে আমরা আমাদের পূর্ব-সিদ্ধান্তের কিছু পরিবর্তন করিয়াছি।

১ম প্রস্তাব :—

এই সাহিত্য-সভার মধ্য দিয়া বিশেষভাবে রবীন্দ্রসাহিত্য—ঐ সূত্রে বাংলা-সাহিত্য, শিল্পকলা ও বিশ্বভারতীর আদর্শ এবং কার্যকারিতার ধারাবাহিক আলোচনার ব্যবস্থা করা হউক।

২য় প্রস্তাব :—

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকগণও এই সাহিত্য-সভায় রচনাপাঠ, সমালোচনা ও সভাপতিত্বের অংশ গ্রহণ করিয়া ছাত্রদের সাহিত্যসাধনায় সহায়তা করুন।

৩য় প্রস্তাব :—

মাসে দুইবার অধিবেশনের ব্যবস্থা করিয়া তাহার প্রথম অধিবেশনটিতে স্থানীয় রচনা ও দ্বিতীয় অধিবেশনটিতে বাহিরের বিশেষ-বিশেষ রচনা পাঠ ও আলোচনার জন্য নির্ধারিত রাখা হউক এবং নিয়মিতভাবে প্রতি অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতেই সেই দুইটি অধিবেশন করা হউক।

৪র্থ প্রস্তাব :—

ছাত্র, অধ্যাপক ও কর্মিবৃন্দের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় সাহিত্য-সভার উন্নতিকল্পে ছাত্র ছাড়া কর্মী ও অধ্যাপকদের প্রতিনিধি-হিসাবে আরো-একজন সাধারণ-সম্পাদক নিয়োগ এবং সাহিত্য, সমাজতত্ত্ব, দর্শন, শিল্প, বিজ্ঞান ও নারীপ্রগতি এই ছয়টি শাখাবিভাগ সৃষ্টি দ্বারা চলিত 'পরিচালক-সমিতিকেই' নূতনভাবে গঠন করা হউক। ঐ ছয়ট শাখা-বিভাগীয় বিভিন্ন সম্পাদক[১] নিজ রচনা ও বক্তৃতা

১ বিশ্বভারতী-সম্মিলনীর এক অধিবেশনে লেখক কর্তৃক এই প্রবন্ধটি আশ্রমিকদের সমক্ষে পঠিত হয় এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আলোচনা-অনুসারে ও সর্বসম্মতিক্রমে অতঃপর শান্তিনিকেতনে সংস্কৃতি-সাধনার সর্বজনীন নূতন সংস্থা 'রবীন্দ্রপরিচয়-সভা'র উদ্ভব ঘটে; 'রবীন্দ্রপরিচয়-সভা' স্থাপিত হইলে, বাহিরের বিশেষ-বিশেষ রচনা পাঠেরও তাহাতে ব্যবস্থা হয়।

দ্বারা,[১] উৎসাহ ও হাতে-কলমে সাহায্য দানে অন্য আরো লেখক বা বক্তা তৈরি করিয়া এবং লেখকদের লেখার সুষ্ঠু সমালোচনা করিয়া নানাভাবে নিজ-বিভাগীয় বিষয়ের উন্নতি সাধনে দায়ী থাকিবেন।

১। সভা-সংগঠনের সম্পাদক—প্রবন্ধ সংগ্রহ, প্রবন্ধপাঠের ব্যবস্থা, পরিষদের কার্যবিবরণী-সংকলন ও পাঠসভা পরিচালনা করিবেন।

২। পত্রিকা-সম্পাদক—পত্রিকায় প্রতি-মাসে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সমাবেশ রাখিবেন:—(ক) মৌলিক রচনা, (খ) রবীন্দ্রনাথের পুরোনো লেখা হইতে উপযোগী অংশবিশেষ, (গ) তাঁহারই নূতন লেখা, (ঘ) রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বাহিরের মতামত, (ঙ) আশ্রমিক সংবাদ, (চ) পরিষদের কার্যবিবরণী।

৩। আলোচনা-সংকলনকারক,—রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অনুকূল ও প্রতিকূল দুই মতেরই পুস্তক-পত্রিকা ইত্যাদি সংগ্রহ এবং তাঁহার গ্রন্থাবলী ও সমালোচনামূলক পুস্তক-পত্রিকা সংবলিত পাঠাগার পরিচালনা করিবেন।

পরিষদের কার্যালয় ঐ পাঠাগারেই অবস্থিত থাকিবে।

উক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিতে যাইয়া রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত বিজয়বিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয় আরও দুই-একটি নূতন প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তিনি বলেন,—অনেকেই রবীন্দ্রনাথ পড়েন, কিন্তু জাতীয়-জীবনে রবীন্দ্রনাথ কতখানি প্রয়োজনীয় স্থান অধিকার করিয়া আছেন, তাহা কেহই দেখাইলেন না; দেশবাসীর অন্তরের মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিতে, সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার আবশ্যকতা ও অভাব দুই-ই প্রভূত পরিমাণে রহিয়াছে এবং সেই দুইটি জিনিসের বিজ্ঞাপন ও পূরণ শান্তিনিকেতন হইতেই সর্বপ্রথম হইবে বলিয়া আশা করি। দ্বিতীয়ত রবীন্দ্রনাথের প্রাচীনতম হইতে আধুনিকতম সমগ্র লেখার একটি পূর্ণ, বিশুদ্ধ অথচ সস্তা-সুলভ সংস্করণ না হইলে আমাদের মতো দরিদ্র দেশবাসীর পক্ষে উহার সংস্পর্শে আসা একরূপ অসম্ভব। কিন্তু দেশকে রবীন্দ্রনাথের অবদানে লাভবান করিতে হইলে তাঁহার রচনা-সম্পদকে সুলভে দ্বারে-দ্বারে পৌঁছাইয়া দিতেই হইবে।—

১ "গত ২৮শে জুলাই রবিবার (১৯২৯) বিকাল ৫টার সময় বিদ্যাভবনের বারান্দায় "রবীন্দ্র-পরিচয়-সভা" গঠন সম্পর্কে এক আলোচনা-সভার অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় তাহাতে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র কর কর্তৃক পরিষদ-গঠনের আলোচনা উত্থাপিত হয়। তিনি পরিষদের কাজকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করিয়া কাজ আরম্ভ করিতে বলেন: এক—সভা সংগঠন, দুই—পত্রিকা সম্পাদন, তিন—আলোচনা-সংকলন। এই তিন বিভাগের কাজের জন্য তাঁহার মতে পৃথকভাবে তিনজন সম্পাদক থাকিবেন।

রবীন্দ্রপরিচয়-সভার পুনরারম্ভ-পর্বের কার্যবিবরণী, ২৮শে জুলাই (১৯২৯) অধিবেশন।*

অভয়-ব্রতী

কবির 'জন্মদিনের গানে'র প্রথম-কথাটিই হচ্ছে—

ভয় হতে তব অভয়-মাঝারে
নূতন জনম দাও হে।

কবির 'নৈবেদ্যে'র মন্ত্র আগাগোড়া অভয়েরই মন্ত্র। ভয় আনে বাধা ও ধ্বংসের বিভীষিকা, কিন্তু 'অভয়-ব্রতী'দের কাছে এই অভয়-মন্ত্রই একদিন দুয়ার খুলে দিয়ে সাধকজীবনে পরায় জয়টীকা।

১৯৩০ সালের মে-মাসে লবণ-আইন-আন্দোলনে আমি বন্দী হই 'অভয়-আশ্রম'-এর কলকাতা-শাখা থেকে। সংবাদপত্র তখন বন্ধ। গোপনে সম্পাদনা করে সাইক্লোস্টাইলে ছাপিয়ে একখানি বুলেটিন-প্রকাশের কাজে ছিলাম। পত্রিকাখানির নাম ছিল 'অভয়-বাণী'। ছ-মাসের জেল হয়। আলিপুর জেলে থাকি। 'অভয়-আশ্রম'-এর আমি প্রাক্তন-কর্মী। আশ্রমের সভাপতি এবং সম্পাদক যথাক্রমে ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ স্পেশাল ওয়ার্ডে পাশাপাশি-কক্ষে ছিলেন। ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সুরেশদা' আমাকে তাঁর কক্ষে থাকার ব্যবস্থা করে দেন। বাইরে থেকে কর্মীদের নিয়ে লবণ-সত্যাগ্রহের সে-পর্যায়ের আন্দোলন পরিচালনা করেন 'অন্নদা',—শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী। ক্রমে সরকারের পীড়ন এত কঠোর ও এত ব্যাপক হয়ে উঠল যে, এবারে শুধু কর্মীর পরীক্ষা নয়, কর্তাদেরও পরীক্ষার সময় হয়ে এল। সব কেন্দ্র তো বন্ধ হয়েইছে, মূল-কেন্দ্র কুমিল্লার আশ্রমও এবার ছেড়ে দিতে হবে,—যদি আন্দোলন চালাতে হয়। আন্দোলন-চালানো, কিংবা 'অভয়-আশ্রমে'র লোপ,—এই সিদ্ধান্ত জানবার জন্য একদিন ইণ্টারভিয়ুতে এলেন অন্নদা। সব শুনে সেই সংকট-সময়ে উদ্বেগ নিয়ে কাটাচ্ছি প্রতি-পল;—ফিরে এলেন নেতাদ্বয় সাক্ষাৎ সেরে। গাম্ভীর্যের মধ্যেও মুখের আভা দুজনেরই হর্ষোৎফুল্ল। সেদিন দুজনেই সিদ্ধান্ত করে গিয়েছিলেন একটি বিষয়,—আন্দোলন চালানো চাই, যাক্ আশ্রমের পরিচালনা। 'উত্তিষ্ঠত'-কেই চাই, 'প্রতিষ্ঠার' চেয়ে। 'সুরেশদা' বললেন,—

* রবীন্দ্রসদনে-সংরক্ষিত হস্তলিখিত 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'র বর্ষা-সংখ্যা হইতে সংকলিত। পত্রিকাটি জীর্ণ, তাহাতে গোড়ার দিকের নাম-পত্রাদি নাই, কোথাও সন বা সালের উল্লেখ মিলে না।

"জাতীয়-মুক্তির জন্যই গড়া হয়েছিল প্রতিষ্ঠান, আজ যদি মুক্তিযজ্ঞে তার আহুতি অনিবার্য হয়ে থাকে, তবে অন্য বিচার কিসের। . আদর্শের পায়ে আমরা সব বলি দিতে পেরেছি—এতেই আমাদের সব সার্থক হয়েছে; সবই পাব যদি মূলকে ঠিক রাখি। ক্ষয়ক্ষতির ভাবনা নয়, নির্যাতনের ভয় নয়, আজ পরীক্ষা অভয়ের।"

অন্নদা সে-বাণী নিয়ে ফিরে গেলেন। তারপরে অভয়-আশ্রমে পড়ল তালা। কিন্তু কাঁথির লবণ-সত্যাগ্রহের হল জয়। দেশের স্বাধীনতাও পরে এল।

এই 'অভয়-আশ্রমে'র সঙ্গে রবীন্দ্রজীবনের একটি অধ্যায় জড়িত। অধ্যায়টি ছোট্ট; কিন্তু মর্মগত-মূল্যে নিতান্ত উপেক্ষণীয় নাও হতে পারে।

'অভয়-আশ্রম' প্রতিষ্ঠার পূর্বে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ডাঃ সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একবার দেখা-সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা হয়। একথা সুরেশদার কাছে শোনা। সুরেশদা তাঁর 'জীবনপ্রবাহ'-নামক গ্রন্থেও লিখেছেন,—"কলিকাতা হইতে বোলপুরে গিয়াছিলাম। শান্তিনিকেতনের পক্ষ হইতে মহাত্মাজিকে-দেওয়া বৈদিক-ধরনের অভিনন্দন আমার চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া' দিল, বিদেশী সভ্যতার স্রোতে ভাসিয়া আমরা আমাদের চিরন্তনী ভাবধারা হইতে কতদূরে সরিয়া পড়িয়াছি। 'গুরুকুল ও শান্তিনিকেতনে পার্থক্য কী'—আমার এই প্রশ্নের উত্তরে মহাত্মাজি বললেন,—শান্তিনিকেতনে আর্ট আছে গুরুকুলে আর্ট নাই, যেখানে আর্ট সেইখানেই জীবন" (পৃঃ ২১৮, ২২০)। সম্প্রতি প্রফুল্লদা (ডঃ ঘোষ) তাঁর আত্মজীবনীমূলক-রচনায় লিখেছেন—"১৯১৭ সালে কবিগুরুর শান্তিনিকেতন দেখতে যাই।...হেঁটে যাই।...৭ দিন ছিলাম সেখানে। কবিগুরুর কাছ থেকে খুব স্নেহপূর্ণ ও সহৃদয় ব্যবহার পাই। মুগ্ধ হই জ্ঞানতপস্বীর কার্যাবলী দেখে।...শান্তিনিকেতনে থাকা হ'ল না বটে, লাভ হল কবি গুরুর সান্নিধ্য, তাঁর স্নেহপ্রাপ্তি ও হিন্দী শিক্ষার সুযোগ।...ফিরলাম। কিন্তু মনে-মনে কেমন যেন একটা আকর্ষণ রয়ে গেল শান্তিনিকেতনের প্রতি। শান্তিনিকেতনের কর্মী না হ'লেও আজও তা আছে।" (সবিতা, কার্তিক ১৩৭১) তখন তাঁরা ভারতের রাষ্ট্রীয়-স্বাধীনতার জন্যই বেশী ব্যগ্র ছিলেন। প্রতিষ্ঠান গড়বার আগে শান্তিনিকেতন, গুরুকুল ইত্যাদি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়ে ভ্রাম্যমান-অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন। মহাত্মাজির আন্দোলন ও সবরমতীর জীবনই তাঁদের বেশী আকৃষ্ট করে। কিন্তু তাঁরা স্বাধীনভাবেই প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। তার মধ্যে আশ্রমের সাধারণ-জীবনযাত্রার এবং বিশেষ ক'রে 'অভয়-আশ্রম শিক্ষায়তনে'র পরিবেশে কবির শান্তিনিকেতনের ব্যবস্থা-প্রণালীর সমন্বয় ছিল বিশেষভাবেই। 'অভয়-

আশ্রমে'র নাম প্রথমে 'সবিতা-আশ্রম' রাখার প্রস্তাব হয়। 'অভয়-আশ্রমে'র হাতে-লেখা মুখপত্রের নাম ছিল 'সবিতা'। 'রবি'-নামের প্রতিশব্দ হয়ে সে ছিল কারো-কারো মনে একটি সূক্ষ্ম সাংস্কৃতিক যোগের স্মারক-সূত্র। 'অভয়-আশ্রমে'র প্রথম-বার্ষিক উৎসবে অভিনীত হয় রবীন্দ্রনাথেরই তখনকার সদ্যরচিত নাটিকা 'রথের রশি'। আশ্রমের দ্বিতীয়-বার্ষিক উৎসবে কবির 'অচলায়তন' নাটক আশ্রমের ছোটোবড়ো সমস্ত কর্মিগণের প্রভূত উৎসাহের দ্বারা অভিনীত হয়ে স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যেও আনন্দ ও উদ্দীপনা জাগায়। এই নাটক-অভিনয় উপলক্ষেই স্থানীয় সাপ্তাহিক-কাগজ 'ত্রিপুরা-হিতৈষী'তে আমার রচনার প্রথম প্রকাশ ঘটে। লেখার বিষয়টি ছিল 'অচলায়তনের'ই আলোচনা। অভিনয়ে মিলেছিল পঞ্চকের ভূমিকা। ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় সেজেছিলেন ঠাকুরদাদা, অন্নদা হয়েছিলেন উপাধ্যায়। খুব-সম্ভব সেবারেই উৎসবে যোগ দিতে গিয়েছিলেন সেকালের 'আনন্দ-বাজার'-সংশ্লিষ্ট শ্রীযুক্ত চপলাকান্ত ভট্টাচার্য। শান্তিনিকেতন থেকে আচার্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন, কালীমোহন ঘোষ মাঝে-মাঝে কুমিল্লায় যেতেন। তাঁরা 'অভয়-আশ্রমে' সাদরে অভ্যর্থিত হতেন। দল বেঁধে কর্মীরা শহরে আসতেন শান্তিনিকেতনের ক্ষিতিবাবুর ভাষণ শুনতে। কর্মী শ্রীযুক্ত পরিমল দত্ত সুমিষ্ট-কণ্ঠে রবীন্দ্র-সংগীতে ভরিয়ে রাখতেন আশ্রম। তাঁর থেকে লেখকের রবীন্দ্র-সংগীতের প্রাথমিক রসগ্রাহিতা ও সুরশিক্ষা। শ্রীযুক্ত দেবেন সেন নবাবগঞ্জের (ঢাকা) আশ্রম থেকে মাঝে-মাঝে আসতেন। রবীন্দ্র-সাহিত্য এবং সাধারণ-রচনাদি কার্যে তিনি ছিলেন লেখকের পরম উৎসাহদাতা। একরূপ তাঁর উৎসাহে উদ্দীপিত হয়েই আমি ক্রমে শান্তিনিকেতনের-জীবনে অগ্রসর হই। অভয়-আশ্রমের তৎকালীন আর-একজন কর্মী আমাকে এ বিষয়ে প্রেরণা যোগান এবং শেষাবধি শান্তিনিকেতনে আসার পথ করে দেন অনেকটা তিনিই। ইনি হচ্ছেন প্রখ্যাত কবি ও 'লোক-সেবকে'র প্রাক্তন-সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়। তখন তিনি ছিলেন শান্তিনিকেতনের বাংলার অধ্যাপক।

এবারে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অভয়-আশ্রমের সাক্ষাৎ-সংযোগ ঘটবার বিবরণটি শান্তিনিকেতনের গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের লেখা "রবীন্দ্র-জীবনী" থেকে উদ্ধার করে সবিস্তারে নিম্নে সংকলিত করা হল। প্রভাতবাবু লিখেছেন,—

"১৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯২৬ শুক্রবার রাত্রে রবীন্দ্রনাথ সদলবলে কুমিল্লায় পৌছান;

কবির সঙ্গে ছিলেন প্রতিমা দেবী, তাঁহার কন্যা নন্দিনী, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালীমোহন ঘোষ ও মিঃ মরিস্। ফার্মিকি ও তুচি যান নাই। কুমিল্লায় অভয়-আশ্রমে তাঁহাকে লইয়া যাওয়া হয়। পূর্বাহ্নে ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহাকে অভয়-আশ্রমের তরফ হইতে নিমন্ত্রণ পাঠাইয়াছিলেন। আশ্রমের তৃতীয়-বার্ষিক উৎসব-উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ সভাপতি।

অভয়-আশ্রম কুমিল্লায় ১৩২৯ সালে (১৯২৩) স্থাপিত হয়। ইহার প্রধান কর্মী ছিলেন সর্বত্যাগী ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। আশ্রমের আদর্শ—মাতৃভূমির সেবা দ্বারা ভগবান-লাভ। অপর-কোনো দেশের অনিষ্ট না করিয়া সত্য ও ভগবানের সেবাই মাতৃভূমির সেবা। আশ্রমের উদ্দেশ্য স্বরাজ-লাভ। এই স্বরাজ-লাভের জন্য হিন্দু-মুসলমানের প্রেম অত্যন্ত আবশ্যক। অস্পৃশ্যতা ও জন্মগত-জাতিভেদ হিন্দুসমাজের অকল্যাণকর। খদ্দর-উৎপাদন ও পরিধান স্বরাজ-সেবকদের কর্তব্য। সংক্ষেপে এই কয়টি উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য তাঁহারা জনসেবার কাজে চিকিৎসালয়, খদ্দর-শিল্প-বিভাগ ও শিক্ষা-বিভাগাদি স্থাপন করেন। কর্মীদের অদম্য চেষ্টায় তিন বৎসরের মধ্যে অভয়-আশ্রমের নাম শুধু এই জেলায় নয়, সমগ্র বাংলাদেশে বিস্তারিত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ ইঁহাদের কর্মনিষ্ঠা, একাগ্রতা ও পল্লীসেবার আদর্শে মুগ্ধ হইয়া বার্ষিক-উৎসবে সভাপতি হইতে স্বীকৃত হইয়া কুমিল্লায় আসিলেন।

"২০, ২১, ও ২২শে ফেব্রুয়ারী আশ্রমের উৎসব। প্রথমদিন আশ্রমের উৎসবের উপাসনার পর কর্মীরা রবীন্দ্রনাথকে এক মানপত্র দেন। তিনি উত্তরে বলেন, "আত্মাই শক্তির উৎস, এই শক্তির সহিত পরিচয় লাভ করতে হলে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে বিলিয়ে দিতে হবে। অভয়-আশ্রমের কর্মীরা এইরূপে আত্মত্যাগ করেছেন বলে শারীরিক অসুস্থতা-সত্ত্বেও আমি এখানে এসেছি।"

"দিনব্যাপী বিচিত্র উৎসব-অনুষ্ঠানের অনেকগুলিতেই কবি যোগদান করেন। ২১শে ফেব্রুয়ারী রবিবার প্রাতে শহরের বহু গণ্যমান্য লোক ও মহিলা কবির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। দ্বিপ্রহরের ক্রীড়া-কৌতুক-প্রতিযোগিতা ও সার্বজনিক ভোজ হয়। ইহাতে ভদ্রলোক ও মেথরেরা এক পংক্তিতে ভোজন করেন। দুইটার পর চরকা-প্রতিযোগিতা চলে।

"সেইদিন দ্বিপ্রহরেই কুমিল্লার মহিলা-সমিতি কবিকে এক অভিনন্দন দেন। বৈকালে এক বিরাট জনসভায় প্রায় ৬।৭ হাজার লোক অভয়-আশ্রমের প্রাঙ্গণে সমবেত হয়। এইদিন আশ্রমের বার্ষিক-সভা। রবীন্দ্রনাথ সভাপতি; সুরেশচন্দ্র

বন্দ্যোপাধ্যায় কার্যবিবরণী পাঠ করেন। অভিভাষণকালে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "বৈচিত্র্যের ভিতর সৃষ্টিরহস্য নিহিত। বিভিন্ন মত থাকা ও বিভিন্ন পথে কাজ করা জাতির দৌর্বল্য সূচিত করে না। কর্মধারাকে শতদল-পদ্মের মতো ফুটাইয়া তোলাই কাজের সার্থকতার মূলমন্ত্র।"

"সেইদিন সন্ধ্যার পর সুরেশচন্দ্রের রচিত "গৌরাঙ্গ" নাটকের অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত উপস্থিত ছিলেন।

"২২শে প্রাতে উপাসনার পর রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং কিছু উপদেশ প্রদান করেন। দ্বিপ্রহরে তিনি মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য-প্রতিষ্ঠিত 'রামমালা ছাত্রাবাসে' যান; সেখানে ছাত্রেরা তাঁহাকে অভিনন্দিত করে। সেখান হইতে ভিক্টোরিয়া-কলেজে যান। নমঃশূদ্র-কনফারেন্সে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন। (এর উদ্যোক্তা ছিলেন 'অভয়-আশ্রম', লেখক); সন্ধ্যার পর মহেশ-প্রাঙ্গণে এক সভায় তিনি বক্তৃতা করেন; অভয়-কর্মীদের কথা এখানে তিনি খুব প্রশংসার সহিত বলেন। এইদিন রাত্রে কবি আগরতলা রওনা হন।"

অভয়-আশ্রমের সঙ্গে গুরুদেবের এই যোগের ইতিহাসের মধ্যে দেখা যাবে, তিনি যে আত্মশক্তি-প্রতিষ্ঠ জাতিবর্ণ-নির্বিশেষিক সৌহার্দ্য-সংযুক্ত সমাজ-জীবনের বিস্তার দ্বারা "মহামানবে"র আগমন-ভূমিকা প্রস্তুত করতে চেয়েছিলেন, অভয়-আশ্রমের মধ্যেও সে-প্রেরণা অনেকখানি মূর্ত হয়ে উঠেছিল। তাঁর আশীর্বাদপূত এই অভয়-আশ্রম দেশের একটি সম্পদ ছিল। সাংস্কৃতিক দিকে বিশ্বভারতী রবীন্দ্র-সাধনার যে-রূপ মেলে ধরেছে,—জনসেবায়, ভাত-কাপড়-যোগানো কাজের দিকে এবং জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনে বেশি সংশ্লিষ্ট থাকলেও রবীন্দ্রনাথের সেই সর্বাঙ্গীণ-মুক্তিসাধনায় অভয়-আশ্রম কখনো উদাসীন থাকেনি। বরং, বিপুল শ্রদ্ধা নিয়ে তার প্রতি সে বরাবর আগ্রহপূর্ণ ছিল। কিন্তু আয়োজন বেশী সম্ভব হয়নি। না-হলেও তার অন্তরে ছিল অভয়-মন্ত্র। সেখানেই কবির মন্ত্রের মানস-দীক্ষা সে পুরে রেখেছিল।

পুরোনো-দিনের-শান্তিনিকেতনে এই অভয়-সাধনার একটি বাস্তব-চিত্র মেলে শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর রচনায়। লিখেছেন, "একটি গোপন দল গঠন করা হয়েছিল কয়েকটি ছাত্রকে লইয়া। ঐ দলের নাম ছিল 'অভয়-ব্রতী'। 'অভয় ব্রতী'দের নেতা করা হইল শ্রীযুক্ত ভূপেশচন্দ্র রায়চৌধুরীকে। ৺বঙ্কিম রায়ও (তৎকালের অঙ্কের শিক্ষক) ঐ দলের অন্তর্গত হইলেন। উভয়েই বরিশালের লোক। এই সময়ে আশ্রমে পূর্ববঙ্গের কায়েত, বদ্যি, ব্রাহ্মণের প্রভাব

বেশ ছিল। এই 'অভয়-ব্রতী'দের একটা বিশেষ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ভয়হীনতা-চর্চার জন্ম মাঝে মাঝে রাত্রে আশ্রমের প্রান্তরে, শ্মশানে,. কবর-স্থানের কাছাকাছি যাইতে হইত, কখনো একা, কখনো সঙ্গে দুইজন, কখনো একজন। পাছে এই সাধনায় কেহ ভয় পাইয়া একটা-কিছু বিপদ বাধাইয়া বসে, সেইজন্য নেতাদের মধ্যে অর্থাৎ ভূপেশবাবু ও বঙ্কিমবাবুর মধ্যে একজনকে গোপনে ঐসব ছেলেদের কাছাকাছি থাকিতে হইত। সঙ্গে থাকিত নেভানো-লণ্ঠন। এই 'অভয়-ব্রতী'রা রাজনৈতিক কোনো কাজের মধ্যেই থাকিত না, কিম্বা বৃটিশ-শাসনের অবসান ঘটাইবার জন্মও কোনো রকমের অ্যানারকিজম্ চর্চা করিত না। কিন্তু বৃটিশ-রাজের ডিটেক্‌টিভ-ডিপার্টমেণ্টের নজর আশ্রমের উপর জাগ্রত ছিল। ঐ বিভাগের দ্বারা যাঁহাদের চিঠিপত্র পাঠ করা হইত, তাঁহাদের নামের ভিন্ন-ভিন্ন নম্বর থাকিত। রবীন্দ্রনাথ খোঁজ পাইয়াছিলেন যে, ঐরূপ আসামীদের মধ্যে তিনি নিজে ছিলেন ১৩ নম্বরের আসামী। এই ১৩ নম্বর লইয়া রবীন্দ্রনাথ কতবার কত চিঠি-খোলার গল্প করিয়াছেন কত লোকের কাছে। একবার ডিটেক্‌টিভ্ অতি সতর্কতার জন্য অন্য আর-এক নম্বরের আসামীর চিঠি পাঠ করার পর পুনরায় সেই চিঠিটা সেই নম্বরের নামের খামের মধ্যে না ভরিয়া ভরিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথের নামের খামের মধ্যে। এইরূপ কয়েকটি কাণ্ড ঘটায় রবীন্দ্রনাথ, কেন এই রকম হয়, ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারেন যে, আই. বি. হইতে তাঁহার চিঠি খোলা হয়, ইণ্টারসেপ্ট্ করা হয় অর্থাৎ গাপ করা হয়। তবে একথাও সত্য যে, ঐ সময় আশ্রমে উৎকট সরকারদ্রোহীদের আনাগোনা গোপনে এবং প্রকাশ্যে হইত।"
—শান্তিনিকেতনের স্মৃতি, রবীন্দ্রস্মৃতি

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র-জন্মোৎসব

রবীন্দ্রনাথের ৬৮তম জন্মতিথির উৎসব শান্তিনিকেতনে বিগত ২৫শে বৈশাখে অনুষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয়ের গ্রীষ্মাবকাশ চলছিল। বৈশাখের শেষ—আকাশে এক ফোঁটা মেঘের দেখা নেই, তাতে ভুবনডাঙার যোজনব্যাপী ভাঙা খোয়াই; আগুনে-পোড়া লাল টক্-টকে লোহার-গুটির মতো দুপুরবেলার রাঙা কাঁকরগুলি পথে-ঘাটে চোখ পাকিয়ে পথিকদের পদসঞ্চরণে ভীতি জাগাচ্ছে। শাল-বীথিকার শান্তিনিকেতন যেন এই মরুভূমিতে মরূদ্যান-বিশেষ। কিন্তু জলের অভাবে এখানকার অবস্থাও শোচনীয়; নিদাঘের নিদারুণ শুষ্কতা এর কোমলকম শ্যামল শ্রীকে ধূম্রমলিন করে তুলেছে। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী কর্মী অধ্যাপক সকলেই

ছুটি-উপভোগে বাইরে চলে গেছেন। আশ্রম একরূপ জনশূন্য। নির্জন নীরবতার মধ্যে তবু যে-কয়জন শূন্যতাকেই আশ্রয় ক'রে ছিলেন তাঁরাই স্মরণের মাধুর্য দিয়ে প্রাণকে পূর্ণ করে নেবার জন্য উৎসাহের সহিত গুরুদেবের জন্মোৎসবের আয়োজন করলেন।

২৫শে ভোরে উঠে বাইরে চোখ মেলতেই আকাশের এক অভিনব রূপ হৃদয়কে আকর্ষণ করল। মেঘে-মেঘে আকাশ ছেয়ে গেছে। ছায়া প'ড়ে ধরণীর দাহ-বিশীর্ণ মুখখানিতে এত দিন পরে একটু উল্লাসের স্নিগ্ধ আভা ফুটে উঠেছে। দিগ্‌বধূ যেন গান ধরেছে—'এস হে এস সজল-ঘন বাদল-বরিষণে—'

বিকালের দিকে—আমাদের মধ্যে তখন উৎসবের সাজের সাড়া জেগেছে, হঠাৎ এ কী শুনি—"গুরু গুরু গগন-মাঝে"; বাদল-মেঘে যে মাদল-বাজা শুরু হয়েছে।

প্রকৃতির উৎসবই শুরু হল আগে। সে কী মেঘ, সে কী তার জয়ধ্বনি, সে কী বায়ুবেগ আর বারিবর্ষণ। পথঘাট ভেসে গেল। ছলছল কলকল শব্দে কূল ছাপিয়ে জল-ধারা ছুটে চলল। দাদুরীর কণ্ঠও নীরব রইল না। দিন থাকতেই সন্ধ্যা হল। আকাশের কালো গায়ে নিকষে-কনক-রেখার মতো ক্ষণে-ক্ষণে বাঁকা বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল। ভিজে মাটির গন্ধ দমকা-বাতাসে ভেসে আসছে। জনকয়েক যুবক ও বালক তখন উৎসব-ক্ষেত্রে যাবার পথে বাইরের বাধায় একটা ঘরের বারান্দায় আটকা পড়েছে। বাইরের উন্মাদনায় ভিতরেও একটা আলোড়ন উঠেছে। সঙ্গে ছিল, একখণ্ড 'পুরবী' ও 'বিচিত্রা'র নটরাজ-সংখ্যা। হল্লা ক'রে তারি পাতা থেকে বেছে বেছে বিচিত্র সুরে-তালে কবিতা-গানের ফোয়ারা ছুটানো গেল। ছেলেদের ধ'রে রাখে কে। তাদের নাচ, তাদের ছুটাছুটি, কী স্ফূর্তি। তারা ঝড়ো হাওয়ারই মতো অবাধ।

কিছুক্ষণ পরে বাইরে বর্ষণ ক্ষান্ত হল—অমনি ঘরের উৎসবের মধুর আহ্বান শোনা গেল ঘণ্টারবে—"ঢং ঢং ঢং ঢং"; দল বেঁধে সকলে ছুটলাম। উত্তরায়ণে রথীবাবুর উদয়ন-গৃহে ছিল উৎসবের আয়োজন। সেখানে সাজের উপকরণ বেশী কিছু নয়—পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন একটি প্রশস্ত-কক্ষে মেজের উপর ফরাস পাতা, তার একধারে একটি বেদী, বেদীর আশেপাশে গুটিকয়েক শুভ্র শতদল দেহলতা আনত করে প্রণতির ভঙ্গিতে হেলে পড়েছে। ঘনঘটার মধ্যেও জনসমাগম হয়েছে মন্দ নয়। বীরভূমের প্রসিদ্ধ জমিদার ও সাহিত্যিক রায়-বাহাদুর নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় ও রায়-বাহাদুর বিজয়বিহারী মুখোপাধ্যায় এসেছেন, তা ছাড়া

শ্রীনিকেতন ও শান্তিনিকেতনের ছাত্র, কর্মী ও মহিলাগণ এবং অধ্যাপকদের মধ্যে জগদানন্দ রায়, কালীমোহন ঘোষ ও অনাথনাথ বসু, বৈদেশিকদের মধ্যে মিঃ বেনোয়া ও মিঃ স্প্র্যাট এবং 'বীরভূম-বাণী'-সম্পাদক সুধাকান্ত রায় চৌধুরী মহাশয়ও সেখানে রয়েছেন।

একটি গান দিয়ে উপাসনা শুরু হল। কালীমোহনবাবু আচার্যের আসন গ্রহণ করলেন। প্রার্থনার সময় তিনি বলেলন—"যিনি আজ এ উৎসবের উপলক্ষ্য, তাঁর কবিতায় তাঁর আদর্শে জগতের কত না লোক অনুপ্রাণিত। তারা তাঁকে নানাভাবেই সেজন্য শ্রদ্ধা করে কিন্তু আমাদের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধটি একটু বিচিত্র রকমের। এ আশ্রম তাঁরই হাতে গড়া। আমরা তাঁর কাছ থেকে উপদেশ ও আচরণ শিখে শুধু ভাবুকতার ক্ষেত্রে খণ্ড ভাবে নয়, অখণ্ড জীবনের পথেই অগ্রসর হয়ে চলেছি। আমরা যদি অখণ্ড জীবন দিয়েই তাঁর আদর্শকে সার্থক করবার কাজে লাগতে পারি তবে সেই হবে আমাদের যথার্থ শ্রদ্ধা-প্রকাশ। তিনি এমনি আরো বহুদিন আমাদের মধ্যে থেকে আমাদের জীবন ও বিশ্ববাসীর জীবনকে জীবন্ত আদর্শ ও কাব্যালোকে উদ্ভাসিত ক'রে তুলুন,—শুভ-জন্মতিথি উপলক্ষ্য করে ভগবানের কাছে আমরা এই কামনাই নিবেদন করছি।"

উপাসনার শেষে রবীন্দ্র-প্রসঙ্গের পালা। সকলের আগ্রহে নির্মলশিববাবুর উপরেই আলোচনা-পরিচালনার ভার ন্যস্ত হল। অনাথনাথ বসু "পূরবী" থেকে '২৫শে বৈশাখ' কবিতাটি পাঠ করেন, তারপর রবীন্দ্র-নাট্য বিষয়ে স্বরচিত একটি রচনা পাঠ করেন শ্রীযুক্তা সুধাময়ী মুখোপাধ্যায়। তার সারাংশ এই—

"—অচলায়তন, অরূপরতন ও ফাল্গুনী, এই তিনটি নাটকের কাব্য-পরিকল্পনা ও ঘটনাবলীর প্রভেদ-সত্ত্বেও একটি নিগূঢ় ভাবের ঐক্য আছে বলিয়া মনে হয়। এই ঐক্য যেমন কাব্যের দিক দিয়া চরম পরিণতির সাহায্য দিতেছে তেমনি জীবনেরও পরিণতির দিক নির্দেশ করিতেছে। কাব্যের বিচার ছাড়িয়া দিয়া জীবনের পরিণতির যে-দিকটি কবি ইহাদের মধ্যে নির্দেশ করিয়াছেন তাহাই এখানে আমাদের আলোচ্য।

তিনটি নাটকের মধ্যে একদল লোক দেখা যায়, যাদের নিকট চোখে চাওয়া, কানে শোনা, হাতে পাওয়া, পায়ে চলাই একমাত্র সত্য। 'ফাল্গুনী'র নবযৌবনের দল, 'অরূপরতনে'র সুদর্শনাকে বলা যায় এই দলের। আবার বিপরীত দিকে একদল লোকের নিকট কর্তব্য ও ত্যাগই একমাত্র লক্ষ্য। 'ফাল্গুনী'র দাদা, 'অচলায়তনে'র অধিবাসীগণ এই দলে। ক্রমে দেখা যায় দুই দলের লোকেরই অবসাদ ঘনাইয়া

আসে। আত্মপ্রতিষ্ঠার অভাব যেখানে, সেখানেই উত্তম ও নিষ্ঠা সহজে বিচলিত হয়। আত্মশক্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত যারা, তারা শেষ-পর্যন্ত একাই লড়িতে সক্ষম। 'ফাল্গুনী'র চন্দ্রহাস, 'অরূপরতনে'র বিক্রম, 'অচলায়তনে'র শোণপাংশুগণ এবং স্থিতিশীল-দলে মহাপঞ্চক এই শ্রেণীর। পথ ঠিক জানা না থাকিলেও দ্বিধা-বিচলিত দুর্বল চিত্তের অপেক্ষা এই দৃঢ়-চিত্ত নিষ্ঠাবানেরা আগেই পথের সন্ধান পায়। দ্বিধা-কম্পিত চিত্তকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলে সংস্কারমুক্ত স্বচ্ছপ্রাণ সাধক,—যে সুরের পথের পথিক। 'ফাল্গুনী'র অন্ধ বাউল, 'অরূপরতনে'র সুরঙ্গমা ও 'অচলায়তনে'র পঞ্চক—ইহারা বিশ্বের সুরের সহিত সুর মিলাইয়া সকল বিরোধের ঊর্ধ্বে উঠিয়াছে। ইহারা মুক্তির সুর গাহিয়া বিশ্বের অন্তর্নিহিত সেই 'বৃহৎ আমি'র সহিত 'ক্ষুদ্র-আমি'র যোগসাধন করিয়া দেয়। এই মিলনক্ষেত্রে দুই বিপরীত দল আসিয়া দেখে তাদের দুই পক্ষেই আংশিক সত্য রহিয়াছে। মিথ্যা দম্ভ পরিত্যাগ করিতে পারিলেই দেখা যায় যে পরিপূর্ণ-একই সকল বস্তুকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে; ব্যক্তিগত শক্তি অথবা আত্মশক্তি সেই বৃহৎ-একেরই শক্তির অংশ। সুতরাং আত্মশক্তির উপলব্ধির পথ দিয়া যাইলেই বিশ্বের অন্তর্নিহিত বৃহৎ আত্মাকে উপলব্ধি করা যায় এবং এই উপলব্ধিতেই অমরত্ব লাভ হয়।"

এর পরে কলাভবনের জনৈক-ছাত্র কবি-'নিশিকান্ত'-কর্তৃক তাঁর স্বরচিত কবিতা পঠিত হলে একটি গান হয়; তখন মৌখিক-আলোচনার সূত্রপাত করেন বিজয়বিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয়। রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক বাংলা-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন, বিশ্বসমাজে স্বদেশের গৌরব-প্রতিষ্ঠা ও তাঁর কাব্যের নিখুঁত ছন্দ পদলালিত্য এবং অপূর্ব ভাব-সম্পদের শ্রেষ্ঠত্ব উল্লেখ ক'রে তিনি কবির প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। পরে নির্মলবাবুর আহ্বানে সুধাকান্তবাবু বলেন,—"আমার কাছে রবীন্দ্রকাব্যে একটা জিনিস খুব প্রাধান্য পেয়েছে মনে হয়—সে হচ্ছে 'প্রকৃতি-প্রেম'। প্রকৃতির কতকগুলি গুণ আছে যেগুলি পশুর মধ্যেই মুখ্যভাবে প্রকাশ পায় আর কতকগুলি আছে মানুষের মধ্যেই যার বিশেষ-স্ফূর্তি। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিকে দেখেছেন প্রাণহীন পাশবিক মূর্তিতে নয়—অনুভূতির রসদৃষ্টিতে, দেখেছেন তিনি মানবীয় প্রেমময় জীবন্ত প্রতিমারূপে। তাই যখন তাঁর কাব্য পড়ি,—দেখি সে তো শুধু জড়বস্তু মাত্র নয়, সে যেন আমারই সংসারে নিত্যকার পরমাত্মীয়। তার মধ্যেও মানুষেরই আশা, মানুষেরই ভাষা স্নেহ প্রেম সুখ দুঃখ—সবই মানবের মতো ক'রে স্বতঃ-উৎসারিত হচ্ছে। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটিতে নির্ঝরের মুখে শুনতে পাচ্ছি আমাদেরই ব্যর্থতা হ'তে

সফলতার নবালোকে নব-আশা-প্রবুদ্ধ প্রাণের বিশ্ববিজয়ী অভিযানের তূর্যধ্বনি; 'গীতালি'র সেই—"শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি—" গানটিতে ছন্দে সুরে যে ছবিটি মানসপটে ভেসে ওঠে সে কি আমাদের গৃহবিরাজিত শুভ্র শুচি তন্বী কুমারীর লাবণ্যময়ী লক্ষ্মী-মূর্তিটি নয়? সব চেয়ে ভাল লাগে আমার—'সোনার বাংলা' গানটি। বস্তুতান্ত্রিক-কবিতার এটি একেবারে চরম আদর্শ। সাদা চোখে, জল মাটি আলো বাতাস প্রভৃতি পঞ্চভূতের সংমিশ্রণে যে বস্তু-জগৎ তাই তাঁর অনুভূতির পরশমণির ছোঁয়া লেগে একেবারে 'সোনার বাংলা'র রূপ ধরেছে। এর মধ্যে দেখি, পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতরভাবে প্রকৃতির সৌন্দর্য-মহিমা উপলব্ধিতে তার সাথে তাঁর আত্মযোগ ঘটেছে। প্রথমে আকাশ-বাতাস বাঁশীর সুরে তাঁর মন হরণ করল, তারপর আমের বনের ঘ্রাণ করল পাগল, শেষে অঘ্রানের ভরা ক্ষেত মধুর হাসি দেখিয়ে তাঁকে রূপ-সৌন্দর্যের পূজায় আত্মবিহ্বল ক'রে ফেলল। যেখানে রূপ নাই সেখানে গন্ধ, যেখানে গন্ধ নাই সেখানে সুরের গোপন-পথ ধ'রে কবি প্রকৃতির অন্তরগুহায় গিয়ে পৌঁচেছেন। বস্তু বাহ্যত যতই নীরস হোক না কেন, তার হৃদয়দুয়ারে সহৃদয়তার আবেদনে ভিতরের অবরুদ্ধ রসনির্ঝরকে বাইরে না বইয়ে এনে তিনি ছাড়েন নি; প্রকৃতির সাথে সেই প্রেমলীলাটি তাঁর যেমন মধুর তেমনি পবিত্র, তেমনি সূক্ষ্ম ও সুন্দর।"

সুধাকান্তবাবুর সুচিন্তিত আলোচনাটি তাঁর সরস-বাক্‌পটুতার গুণে সকলেরই হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল। অতঃপর জগদানন্দ রায় মহাশয় এই জন্মতিথির স্মরণার্থে রবীন্দ্রসাহিত্যের গবেষণার প্রসার কামনায় বিশ্বভারতীর কলেজ-বিভাগ ও বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে রবীন্দ্রসাহিত্যের উপর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ-রচনাকারকে দুইটি পুরস্কার প্রদান ও তাহার অর্থ সংগ্রহ এবং যাবতীয় ব্যবস্থার জন্য ক্ষিতিমোহন সেন মহোদয়কে সভাপতি ক'রে একটি ধনভাণ্ডার-স্থাপনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন; সর্বসম্মতিক্রমে তা গৃহীত হয়। এই প্রসঙ্গেই রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বিশ্বভারতীতে রবীন্দ্রসাহিত্যের ধারাবাহিক উচ্চ-গবেষণার জন্য ১,০০০৲ হাজার টাকার একটি বৃত্তি স্থাপনের অভিলাষ প্রকাশ করেন। নির্মলশিববাবু উপসংহারে তাঁর রসাললেখনীর স্বাভাবিকতা অক্ষুণ্ণ রেখে নাতিবৃহৎ-নিবন্ধে রবীন্দ্র-সাহিত্যে তাঁর অকৃত্রিম অনুরাগ ও ব্যক্তিগতভাবে রবীন্দ্র-সঙ্গলাভের কৌতুককর বর্ণনা প্রদান করেন। শেষে রবীন্দ্রনাথের একটি কীর্তন গীত হলে গৃহস্বামীর সুব্যবস্থায় জলযোগের দ্বারা বিচিত্র রসবস্তুর বাস্তব-রসাস্বাদনে সকলের দেহ-মনের সর্বাঙ্গীণ-পরিতৃপ্তি সাধিত হয়ে উৎসব সমাধা হয়।

নির্ঘণ্ট